সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত।

১৩০৮।

কলিকাতা,

৮২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ও

৫৩ নং সিমলা ষ্ট্রীট, সাহিত্য যন্ত্রে

মুদ্রিত।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

চিত্র-সূচী।

মাসানুক্রমিক সূচী।

মাসানুক্রমিক সূচী।

ভাদ্র

আশ্বিন

কার্ত্তিক

অগ্রহায়ণ

পৌষ

মাঘ

ফাল্গুন

চৈত্র।

জ

দ

ন

প

ব

স

হ

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত।

১৩০৮।

কলিকাতা,

৮২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ও

৩৯ নং সিমলা ষ্ট্রীট, সাহিত্য যন্ত্রে
মুদ্রিত।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

ক

খ

গ

ঘ

চ

ছ

চিত্র-সূচী।

মাসানুক্রমিক সূচী।

বৈশাখ।

জ্যৈষ্ঠ।

আষাঢ়।

শ্রাবণ

মাসানুক্রমিক সূচী।

ভাদ্র

আশ্বিন

কার্ত্তিক

অগ্রহায়ণ

পৌষ

মাঘ

ফাল্গুন

চৈত্র।

জ

দ

ন

প

ব

স

হ

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

হিমারণ্য।

প্রায় চারি বৎসর অতীত হইল, আমি মানস-সরোবর ও কৈলাস প্রভৃতি তিব্বতদেশীয় তীর্থ ভ্রমণ করিতে হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতদেশে যাত্রা করি। তিব্বতে যাইবার সময় তিব্বতদেশীয় কোন বিবরণ সংগ্রহ করিবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তথাকার নানা প্রকার রীতিনীতি দর্শন করিয়া এবং থুলীং মঠের বৃহৎ পুস্তকাগার ও দেবমূর্ত্তি সমূহ দর্শন করিয়া মনে হইল, এই সব বিবরণ সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের নিকট প্রচার করা উচিত। কারণ, থুলীং মঠের পুস্তকাগারে যখন পাঁচ লক্ষেরও অধিক পুঁথি দেখিলাম ও সাত আট লক্ষ দেবমূর্ত্তি দেখিলাম, তখন মনে হইল, যদি আমি ইহা গোপন করিয়া যাই, তাহা হইলে চিরদিন মুনিঋষিদিগের নিকট ঋণী রহিব। আমার এই লেখা দেখিয়া যদি কেহ থুলীং মঠে যাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন, এবং প্রধান প্রধান পুস্তকগুলি সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইব। এই মনে করিয়া "তিব্বত-ভ্রমণ" লিখিতে আরম্ভ করি। আগে এই ভ্রমণবৃত্তান্তের নাম 'হিমালয়' রাখিয়াছিলাম। পরে এক জন প্রসিদ্ধ লেখক 'হিমালয়' নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন; সুতরাং আমার পুস্তকের এখন 'হিমারণ্য' নাম দেওয়া হইল। এই পুস্তক প্রথম ও দ্বিতীয় দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। দ্বিতীয় ভাগ অগ্রে প্রকাশিত হইবে; কারণ, আমি তিব্বত হইতে আসিয়াই পীড়িত হই, সেই পীড়ার অবস্থাতেই অগ্রে দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ করি। তিব্বতযাত্রার সময় আমি ক্ষুদ্র একখানি নোটবুক সঙ্গে লইয়া যাই। সেই নোটবুকে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহাই প্রকাশিত হইল। প্রথম ভাগ সম্বন্ধে আমার নিকট বিশেষ বিবরণ সংগৃহীত আছে; তাহা ক্রমে ক্রমে 'সাহিত্য'-পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিব।—লেখক।

প্রথম অধ্যায়।

'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥'

হিমালয় তপোভূমি। যেখানে মনের স্থৈর্য্য, প্রাণের আরাম, জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি, ভক্তির বিকাশ, ইন্দ্রিয়ের নিস্তব্ধতা সম্পাদিত হয়, সেই স্থানই তপস্যার উপযুক্ত। এইরূপ তপস্যার স্থানেই পুরাতন ঋষিরা বাস করিয়া অপূর্ব্ব শান্তি ও অমেয় আরাম লাভ করিতেন। অদ্য প্রায় দুই মাস কাল অতীত হইল, আমি হিমালয়ের শিখরে শিখরে ভ্রমণ করিয়া কন্দরের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে করিতে অদ্য মধ্যাহ্নে পুণ্যতীর্থ যশীমঠে উপস্থিত হইলাম। হিমালয়-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া

অদ্য পর্য্যন্ত যে যে স্থানে গিয়াছি, সেই সেই স্থানেরই তীর্থত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছি। পুরাতন ঋষি ও পুরাতন তীর্থের আমি বিশেষ পক্ষপাতী। সেই জন্যই হিমালয়স্থ যশীমঠকে মহাতীর্থ বলিয়া অভিহিত করিতেছি। যশীমঠ শোভাময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে স্থাপিত। উহার চতুর্দ্দিক্ হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গমালায় পরিবেষ্টিত; মধ্যে সমতলভূমি। সেই সমতলভূমিতেই মঠটি স্থাপিত। মঠের উর্দ্ধদিকে রাজকীয় পথ; নিম্নে বিষ্ণুপ্রয়াগ। এই বিষ্ণুপ্রয়াগের উত্তর দিক্ হইতে অলকানন্দা এবং পূর্ব্ব দিক হইতে ধৌলীগঙ্গা আসিয়া একত্র সংগত হইয়াছেন। এই উভয় নদীর সঙ্গমস্থান বিষ্ণুপ্রয়াগ বলিয়া অভিহিত।

পূর্ব্বোক্ত পথের উভয় পার্শ্বে দোকান, পান্থনিবাস, দাতব্যচিকিৎসালয়, ডাক-ঘর ও থানা। এই পথটি হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ রাজ্যের প্রান্ত-সীমা 'নিতি' পর্য্যন্ত গিয়াছে। পথের নিম্নে অল্প দূর অবতরণ করিলেই বাম দিকে মঠের প্রাঙ্গণ। মঠ-প্রাঙ্গণের বাম দিকে একটি সুবৃহৎ প্রবেশদ্বার। দক্ষিণে একটি নির্ঝর। আমি এই নির্ঝরিণীতে স্নান করিয়া বামভাগস্থ প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিয়া মঠের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তথায় যাইয়া মন্দিরস্থ নারায়ণ ও অপরাপর দেবতা দর্শন করিলাম। এই সব দেবতার দর্শনান্তে মন্দির হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে পুণ্যগিরি দেবী ও অপরা-পর দেবতার দর্শন ও প্রণাম পূর্ব্বক পান্থনিবাসে প্রত্যাবৃত্ত হই। এই মঠের সংলগ্ন অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে। সংস্কারাভাবে মঠ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; মন্দির সকল ভগ্নপ্রায়; ধর্ম্মশালাগুলিও সেই প্রকার।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সনাতন ধর্ম্মসংস্থাপনসম্বন্ধে যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মঠসংস্থাপনই প্রধান কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পশ্চিমে দ্বারকা ক্ষেত্রে সারদা মঠ; পূর্ব্বে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভোগবর্দ্ধন মঠ; দক্ষিণে রামেশ্বর ক্ষেত্রে শৃঙ্গগিরি মঠ; উত্তরে বদরিকাশ্রম ক্ষেত্রে যশীমান মঠ। ভগবান্ আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে চতুর্দ্দিকে এই চারিটি মঠ সংস্থাপন করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে অভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করের প্রত্যেক মঠেই পৃথক পৃথক ক্ষেত্র, আশ্রমপদবী, সম্প্রদায়, বেদ, আচার্য্য, ব্রহ্মচারী, দেবতা, দেবী ও তীর্থ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দ্বারকাক্ষেত্রে মঠ সারদা, দেব সিদ্ধেশ্বর, দেবী ভদ্রকালী, আচার্য্য বিশ্বরূপ, তীর্থ গোমতী, বেদ সাম, সম্প্রদায় কীটবার, আশ্রমপদবী তীর্থ ও আশ্রমব্রহ্মচারী স্বরূপাখ্য। পুরুষোত্তমে মঠ ভোগবর্দ্ধন, সম্প্রদায় দোনবার, আশ্রমপদবী বন ও অরণ্য, দেবতা জগন্নাথ,

দেবী বিমলা, আচার্য্য পদ্মপাদ, তীর্থ মহোদধি, ব্রহ্মচারী প্রকাশক, বেদ ঋক্। দক্ষিণে ক্ষেত্র রামেশ্বর, মঠ শৃঙ্গগিরি, সম্প্রদায় ভূমিবরাহ, আশ্রম-পদবী সরস্বতী, ভারতী ও পুরী, দেবতা আদিবরাহ, দেবী কামাখ্যা, আচার্য্য পৃথ্বীধরা, তীর্থ তুঙ্গভদ্রা, ব্রহ্মচারী চেতন, বেদ যজুঃ। উত্তরে ক্ষেত্র বদরিকাশ্রম, মঠ যশীমান, সম্প্রদায় আনন্দবার, আশ্রমপদবী গিরি, পর্ব্বত ও সাগর, দেবতা নারায়ণ, দেবী পুণ্যগিরি, আচার্য্য ত্রোটক, তীর্থ অলকানন্দা, ব্রহ্মচারী নন্দাখ্য, বেদ অথর্ব্ব।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বপ্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসীদিগকে তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, সরস্বতী, ভারতী, পুরী, গিরি, পর্ব্বত ও সাগর, এই দশ নামে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদিগের জন্য চতুর্দ্দিকে চারিটি মঠ সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক মঠে বেদ, আচার্য্য এবং মঠ-সেবক ব্রহ্মচারী নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মচারীও চারি ভাগে বিভক্ত ও চারি নামে প্রসিদ্ধ; যথা,—স্বরূপ, প্রকাশক, চেতন ও নন্দ। ব্রহ্মচারীদের কর্ত্তব্য আশ্রমসেবা, দেবসেবা, অতিথিসেবা, মঠের ধনরক্ষা ও ধনবিতরণ, এবং স্ব স্ব মঠের নির্ণীত বেদপাঠ। আচার্য্যের কর্ত্তব্য,—অধ্যাপনা, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেশ, ভিক্ষান্নে জীবিকানির্ব্বাহ। এই শ্রেণীর আচার্য্যেরা বর্ত্তমান সময়ে দণ্ডী স্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতেই প্রতীয়মান হইবে, ভগবান শঙ্কর জীবোদ্ধারের জন্য দেবোপাসনা, তীর্থদর্শন ও স্নান এবং বেদচতুষ্টয় অনুসারে কর্ম্মকাণ্ডাদির অনুষ্ঠানেরই বিধান করিয়া গিয়াছেন। দশনামী সন্ন্যাসীদিগকেও এই পথের অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি দশনামী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী; সুতরাং ভগবানের প্রতিষ্ঠিত দেবতাদর্শন, তীর্থস্নান ও মঠসন্দর্শন করিয়া বিগতপাপ, ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। এখন আমার হিমালয়ের অপরাপর তীর্থদর্শনের অধিকার হইল। হিমালয় নিজেই দেবভূমি ও মহাতীর্থ। ইহাতে স্বনামপ্রসিদ্ধ শত শত তীর্থ আছে। সেই সকল তীর্থকে আমি মহা মহাতীর্থ বলিয়া ভক্তির সহিত প্রণামপূর্ব্বক মানস-সরোবর ও কৈলাসসন্দর্শনে যাত্রা করিলাম।

অদ্য ১৩০৫ অব্দের ২৬এ জ্যৈষ্ঠ। অদ্য যশীমঠেই বিশ্রাম করিলাম। এখানে থাকিয়া তিব্বত-যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ করিতে হইল। কল্য প্রত্যূষে উঠিয়া দেবতাদিগের বিহারভূমি কৈলাস ও মানসসরোবরে যাত্রা করিব। কল্যকার সূর্য্যোদয় আমার যাত্রার সহায়তা করিবে, কল্যকার হিমহিল্লোল

অবকাশ দিবে, এই সব চিন্তাতে নিদ্রা আসিল না। প্রাতঃকালের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। প্রভাতসূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বেই আমি আসন পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিলাম, এবং সঙ্গীদিগকে জাগাইলাম। পূর্ব্বে যে রাজকীয় পথের উল্লেখ করিয়াছি, সেই পথ অবলম্বন করিয়া আমাকে 'নিতি' পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। 'নিতি' ইংরাজ রাজ্যের শেষ সীমা. তাহার পরই তিব্বতের সীমা আরম্ভ। পূর্ব্বে যে ধৌলীগঙ্গার উল্লেখ করিয়াছি, যশীমঠ হইতে পথটি সেই ধৌলীগঙ্গার উপত্যকাভাগকে আলিঙ্গন করিতে করিতে 'নিতি' পর্য্যন্ত গিয়াছে। ধৌলীগঙ্গার উৎপত্তিস্থান তিব্বত।

প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই যাত্রার আয়োজন করিয়া যশীমঠের উপরিস্থিত পথটি অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলাম। অনুমান বেলা ১২টার সময় 'ঢাক' নামক গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ঢাক গ্রাম ভেদ করিয়া নিতির পথ পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে। যশীমঠ হইতে ঢাক ছয় মাইল। ঢাক গ্রামের নিম্নেও ধৌলীগঙ্গা। অদ্য আমাকে এইখানেই বিশ্রাম করিতে হইবে। কারণ, এই স্থান হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া না লইলে, চারি পাঁচ দিনের মধ্যে, পথে আর লোকালয় পাইব না, খাদ্যও মিলিবে না। সুতরাং আমার সঙ্গী ও দোভাষী ভৃত্য বিষ্ণুসিংহকে আহার্য্যসংগ্রহের আদেশ করিয়া, আমি একটি ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় লইলাম। ব্রাহ্মণটি আমাকে অতি আদরের সহিত স্থান দিলেন ও আহারীয় প্রস্তুত করিয়া দিলেন। দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই বিষ্ণুসিংহ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আমার নিকটে আসিল, এবং নিতি পর্য্যন্ত যাইবার জন্য দুইটি কুলীও ঠিক করিয়া রাখিল।

যাঁহারা তিব্বতের মানসসরোবর ও অপরাপর তীর্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সঙ্গে এক জন দোভাষী ভৃত্য রাখা আবশ্যক। যাহারা হিন্দুস্থানী ও তিব্বতীয় ভাষা জানে, তাহাদিগকে দোভাষী কহে। 'নিতি' ও 'নীলং' পাসের নিকটবর্ত্তী 'জোহার'-বাসীরা হিন্দী ও তিব্বতীয় ভাষায় অভিজ্ঞ। আমার ভৃত্য বিষ্ণুসিংহ জোহারী। আমি এই ভৃত্যের সহায়তায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন করিয়া প্রত্যূষে যাত্রার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এই সব কার্য্য করিতে করিতে জ্যৈষ্ঠের অষ্টাবিংশ দিবস অতীত হইল।

২৯এ জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে 'নিতি' অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ঢাক গ্রামের নিম্নে তপোবন। ঢাক হইতে তপোবন ভেদ করিয়া পথটি

পূর্ব্ব দিকে চলিয়া গিয়াছে। তপোবন যথার্থই তপোবন নামের সার্থকতা পূর্ণরূপে সম্পাদন করিতেছে। উহার নিম্নে ধৌলীগঙ্গা, ঊর্দ্ধে তপোবন গ্রাম, মধ্যভাগে দুইটি প্রাচীন অর্দ্ধভগ্ন মন্দির। এই মন্দিরে শিব ও শিবানী প্রতিষ্ঠিত। এখানে শিবানী নন্দা দেবী বলিয়া অভিহিতা। দেবীপুরাণের ৩৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে, "পরম পবিত্র হিমালয়ে বরুণ দেব নন্দা দেবীর পূজা করিয়াছিলেন।" নন্দা দেবী অষ্টভুজা শক্তিমূর্ত্তি। নন্দা দেবীর মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে এক ক্ষুদ্র প্রস্রবণ। প্রস্রবণের তীরে একটি বৈষ্ণব সাধুর কুটীর। কুটীরটি ফলপুষ্পে সুশোভিত। এই কুটীরের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্ব দিকে এক উষ্ণপ্রস্রবণ। এই উষ্ণপ্রস্রবণটি মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত। শীতলতাপূর্ণ হিমালয়ে এই উষ্ণপ্রস্রবণ বড়ই আরামপ্রদ। আমি এই উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করিয়া এবং সাধুটিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। পরিচয়ে জানিলাম, সাধুটির পূর্ব্ববাস অযোধ্যা, বয়স অশীতি বৎসর; তিনি সর্ব্বদা জপে নিরত; এখানে একাকী বাস করিতেছেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, এই পবিত্র হিমালয়ে নন্দাক্ষেত্রে দেহ রাখিবেন।

পার্ব্বতীয় পথ আমার পক্ষে কষ্টকর হইলেও স্বভাবের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া উদ্ভ্রান্তের মত চলিতে লাগিলাম। হিমালয়ের স্নিগ্ধ ও শীতল বায়ু আমার শ্রান্ত দেহের ক্লান্তিনাশ করিতে লাগিল; এবং সম্মুখস্থ হিমমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গ আমার মনকে উচ্চ হইতে উচ্চতর দিকে টানিতে লাগিল। ঘনসন্নিবিষ্ট দেবদারু ও চীর প্রভৃতি বৃক্ষের মোহন গাম্ভীর্য্যে আমাকে মুগ্ধ করিয়া একটি গিরিগুহার দিকে টানিয়া লইল। অদ্য আমরা এই গুহাতেই বিশ্রাম করিলাম। এই পথে গিরিগুহাই পথিকদের আশ্রয়স্থল। যেখানে গিরিগুহা, সেইখানেই দুই চারি জন পথিক। অদ্য যে গুহাতে আশ্রয় লইলাম, সেই গুহাতে আমরা ছয় জন বিভিন্নদেশীয় পথিক ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে উপস্থিত। কেহ বণিক, কেহ তীর্থযাত্রী, কেহ বা মৃগয়ার্থী। কিন্তু সকলেই শ্রান্ত ও আশ্রয়প্রার্থী; সুতরাং আমরা ভেদাভেদজ্ঞানরহিত হইয়া এই গুহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিশ্রামস্থান নির্ণীত করিলাম। গুহাটি ধৌলীগঙ্গার উপকূলে অবস্থিত। গুহার ঊর্দ্ধভাগে রাজপথ। রাজপথের ঊর্দ্ধে অত্যুচ্চ পর্ব্বতে ভবিষ্য-বদরিনারায়ণ ও নন্দা দেবীর অপর একটি মন্দির।

এবং নর পর্ব্বত ও নারায়ণ পর্ব্বত একত্র মিলিত হইয়া অলকানন্দার গতি ও বদরিকাশ্রমের পথ রুদ্ধ করিবে, তখন আর কাহারও অদৃষ্টে নারায়ণ-ক্ষেত্রে বদরিনারায়ণের দর্শন হইবে না; তখন এই ভবিষ্য-বদরিনারায়ণই যাত্রীদিগের দর্শনীয় হইবেন, এবং ভবিষ্য-বদরিনারায়ণ দর্শন করিলেই বদরি-নারায়ণ-দর্শনের ফল হইবে।”

আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ ভবিষ্য-বদরিনারায়ণ, কেহ কেহ নন্দাদেবীদর্শনে চলিয়া গেলেন। আমি অদ্য একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, সুতরাং উচ্চ ও বিকট পর্ব্বত আরোহণে অক্ষম বলিয়া এই গুহাতে বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলাম। অপরাহ্নে আমার সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কাষ্ঠ, কেহ ফল, কেহ মূল আহরণ করিয়া গুহাতে ফিরিয়া আসি-লেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমাদের স্নান ও আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই স্থান যশীমঠ হইতে বারো মাইল। অদ্যকার রাত্রিতে নদীতীরস্থ গুহাতেই বাস করিলাম। পরদিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আজিকার পথ অতিশয় দুর্গম। কখনও অতি উচ্চ চড়াই, কখনও অতি নিম্ন উৎরাই। এই আরোহণ ও অবরোহণে ৩।৪ মাইল চলিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম; অথচ নিয়মিত স্থানে উপস্থিত না হইলে জল, কাষ্ঠ ও আশ্রয় পাওয়া যাইবে না। পার্ব্বতীয় পথে দূরতার পরি-মাণে আরামস্থান মেলে না। যেখানে জল ও কাষ্ঠ সুলভ, এবং কিয়ৎপরিমাণে সমভূমি আছে, সেই স্থানেই আড্ডা বা আরামস্থান। গুহা মিলিলে তো কথাই নাই, নতুবা প্রস্তর দ্বারা ‘ঘের’ বানাইয়া তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিতে হয়। ‘ঘের’ অর্থাৎ গোলাকার প্রস্তরপ্রাচীরবেষ্টিত বিশ্রামস্থান। এই পথে একটিমাত্র ধর্ম্মশালা আছে; তাহাও অনেক দূরবর্ত্তী। সে স্থানে অদ্য যাইতে পারিলাম না। অদ্য আমাদিগকে একটি গুহাতেই আশ্রয় লইতে হইবে। সুতরাং ধীরে ধীরে সেই দিকে যাইতে লাগিলাম।

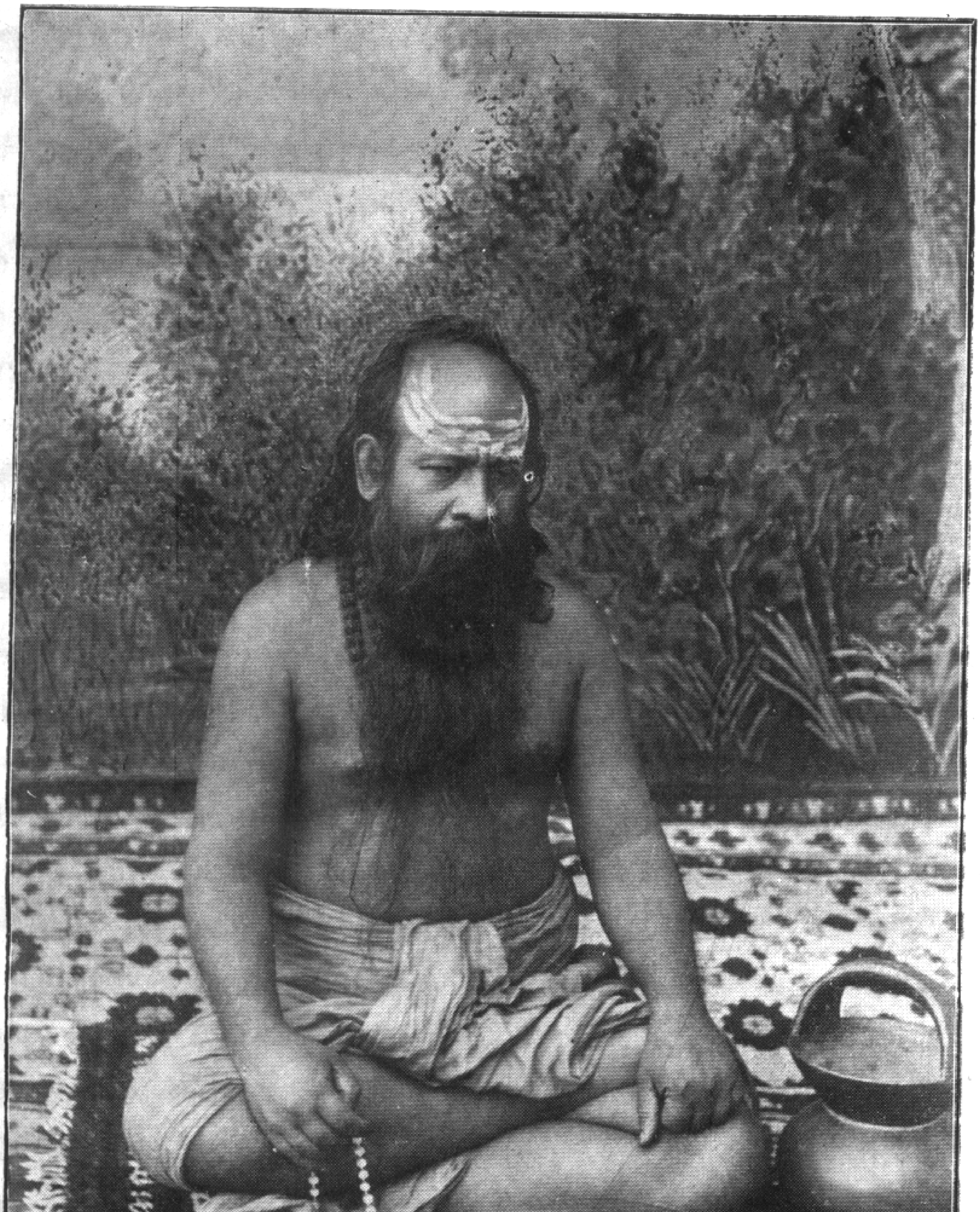
শনৈঃ কন্থাঃ শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।—এই বলিতে বলিতে, অতি উচ্চ এক স্থানে উঠিয়া দেখি, তুষারাবৃত অনেক উচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া এমন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি যে, চতুর্দ্দিকেই অভ্রভেদী হিমশিখর শ্বেতাবরণে আবৃত হইয়া ভগবৎকীর্ত্তির শুভ্র কেতুস্বরূপে যেন ইঙ্গিতে আমাকে কত কি বলিতেছে। সেই ইঙ্গিতে আমি যাহা বুঝিলাম, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার নহে; তবে এইমাত্র জ্ঞানলাভ হইল যে, “সাদা প্রাণে

সাদা মনে সাদা পথে চল, সাদা হইতে পারিবে।" এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে নিম্নে আসিয়া পড়িলাম। দৃশ্যের সহিত ভাবনা দূর হইল। অবিলম্বেই একটি গুহাতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদিগকে অদ্য এই গুহাতেই অবস্থিতি করিতে হইবে।

এই স্থানটি অতি মনোহর। সম্মুখে রাজকীয় পথ; ঊর্দ্ধে গুহা; নিম্নে বেগবতী স্রোতস্বতী। স্রোতস্বতীর উভয় তটে অভ্রভেদী উচ্চ পর্ব্বতমালা। নদীর পূর্ব্বতটস্থ পর্ব্বতের নাম 'দোনাগিরি'। এই দোনাগিরির পৌরাণিক নাম গন্ধমাদন। লক্ষ্মণ যখন লঙ্কা-সমরে শক্তিশেলে হতজ্ঞান হন, তখন মহাবীর হনুমান গন্ধমাদন উৎপাটন করিয়া লঙ্কাতে লইয়া যান। অদ্যাবধি তাহার চিহ্ন আছে। দোনাগিরির উচ্চ শৃঙ্গ নাই; দেখিলে বোধ হয়, কে যেন শৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়া দিয়াছে। অদ্যাবধি দোনাগিরিতে নানাবিধ ওষধি পাওয়া যায়। রাত্রিতে ইহার উপর সহস্র সহস্র উজ্জ্বল দীপশিখার ন্যায় আলোকরাজি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু দিবসে তাহার কোন চিহ্ন থাকে না। যদি কেহ এখন এই পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করে, তবে সে পত্র ও পুষ্পের গন্ধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিবে। দোনাগিরিতে উঠিতে হইলে 'মল্‌হারী' গ্রাম দিয়া উঠিতে হয়। অদ্য তিন দিবস অতীত হইল, ঢাক গ্রাম ছাড়িয়াছি; পথিমধ্যে অন্য গ্রাম দেখিতে পাই নাই। তবে আমি যে ধৌলী উপত্যকা দিয়া যাইতেছি, সেই উপত্যকার উচ্চ পর্ব্বতশিখরের সানুপ্রদেশে ছোট ছোট গ্রাম আছে। সেই গ্রামগুলি এত উচ্চ যে, তাহা দর্শন করিলে অবরোহণ ও আরোহণের ভয়ে আত্মাপুরুষ শুখাইয়া যায়—তথায় যাইয়া আশ্রয় লওয়া তো দূরের কথা। শুনিলাম, কল্য বার তের মাইল চলিতে পারিলে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই 'মল্‌হারী' নামক গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারিব। অদ্য ২৯ শে জ্যৈষ্ঠ; অদ্য এই গুহাতেই বিশ্রাম করিলাম। অদ্যকার আড্‌ডা পূর্ব্ব আড্‌ডা হইতে ৬।৭ মাইলের অধিক হইবে না। অদ্য অনবরত পূর্ব্ব দিকেই চলিয়া আসিয়াছি।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমরা গুহা পরিত্যাগ করিলাম। কারণ, আজ ১২।১৩ মাইল চলিতে হইবে। রাস্তা বিকট চড়াই। এত চড়াই যে, রাস্তার উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র আপাদমস্তক কম্পিত হইতে থাকে। আমরা চড়াইয়ের নীচেই ছিলাম; ধীরে ধীরে চড়াই চড়িতে লাগিলাম, এবং অনুমান বেলা

একটি ধর্ম্মশালা আছে, এবং জল ও কাষ্ঠের বিশেষ সুবিধা আছে; আর আমরা সকলেই পথশ্রমে ক্ষুধাতুর ও পিপাসার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছি ; চলিবার আর শক্তি নাই। সুতরাং এইখানে বিশ্রাম করিতে হইল। আমার সঙ্গিগণ কেহ কাষ্ঠ-আহরণে চলিয়া গেল ; কেহ জল আনিতে গেল। আমি ধর্ম্মশালাটি পরিষ্কার করিয়া তাহার মধ্যে আমার আসন করিলাম। সঙ্গীরা কাষ্ঠ ও জল আনয়ন করিয়া 'চা' প্রস্তুত করিল। আমরা সকলেই 'চা' পান করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুধা ও পিপাসার হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম। আমি বিশ্রামান্তে প্রাতঃকৃত্য ও আহ্নিকাদি করিবার জন্য নদীতটে চলিয়া গেলাম। সঙ্গীরা আহার্য্য প্রস্তুত করিতে বসিল। আমি নদীতটে যাইয়া দেখি, এখানে বিভিন্নদেশীয় বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। ইহারা সকলেই তিব্বতযাত্রী। তিব্বতীয় ব্যবসায়ীরা শীতঋতুতে দিল্লী, অমৃতসহর, কাণপুর প্রভৃতি স্থানে আসিয়া পশম, কম্বল, মৃগনাভি, চামর, শিলাজতু প্রভৃতি বিক্রয় করে, এবং গুড়, মিছরী বস্ত্র, বাসন প্রভৃতি ক্রয় করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষেই স্বদেশে যাত্রা করে। ইহারা 'নিতি' পাসের নিকটস্থ নদীতীরে তাম্বু খাটাইয়া পথ খুলিবার দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকে। অদ্য যাহাদের সঙ্গে দেখা হইল, তাহারাও নিতি পাসে যাইয়া অপেক্ষা করিবে ; এবং ২।১ দিনের মধ্যেই সকলে যাইয়া তথায় উপস্থিত হইবে। যাহারা গিয়াছে, তাহারা নিতি পাসে গিয়া থাকিবে ; ইহারাও তথায় যাইবে। আর যাহারা এখনও আসে নাই, তাহারাও ২।৪ দিনের মধ্যে নিতি পাসে গিয়া জুটিবে। যশীমঠ হইতে নিতি গ্রামের মধ্যে আট দশখানি গ্রামের লোক পূর্ব্বকাল হইতে তিব্বতে বাণিজ্যার্থ যাইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন গ্রামের লোক এই সময় তিব্বত যাত্রা করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাহাদের নিকট যাইয়া পথের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, এখনও রাস্তা খুলে নাই। রাস্তা খুলিবার সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে। দাপা হইতে পুলিসের লোক 'নিতি'তে আসিয়াছে। বার দিবস পরেই নিতি বা হোতি পাস অতিক্রম করিয়া তিব্বত যাইবার রাস্তা খুলিবে। 'সড়্জী' অর্থাৎ পুলিসের প্রধান কর্ত্তা এখনও আসেন নাই। দুই চারি দিনের মধ্যে তিনিও আসিবেন। তিনি আসিলেই পথ খুলিবার হুকুম বাহির হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার মনে বড় আনন্দ হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, অচিরেই তিব্বত রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আমার অভীষ্ট দিকে যাত্রা



শ্রীযুক্ত স্বামী রামানন্দ ভারতী।

KUNTALINE PRESS.

করিতে পারিব। তবে আমাকে ১২।১৩ দিবস কোন স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে। ইহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, "পথিমধ্যে কোনও গ্রাম আছে কি না, আর তথায় আমার মত লোকের অবস্থানযোগ্য স্থান পাওয়া যায় কি না?" তাহারা বলিল, "পথিমধ্যে ৬ ৭ খানি গ্রাম আছে, এবং প্রত্যেক গ্রামেই ধর্ম্মশালা আছে। যে গ্রামে ইচ্ছা করেন, সেই গ্রামেই আপনি থাকিতে পারেন। অদ্য আপনি 'মল্‌হারী' গ্রামে যাইতে পারিবেন। তাহার পর 'কুরকুতী', 'মরগাঁও', 'গমশালী', 'নিতি' প্রভৃতি গ্রাম পাইবেন। ইহার মধ্যে যে গ্রামে আপনার বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হয়, সেই গ্রামেই আপনি বিশ্রাম করিবেন। এবং ইহার প্রত্যেক গ্রামের নিকট জল ও প্রচুরপরিমাণ কাষ্ঠ পাওয়া যাইবে; এবং গ্রামবাসীরাও যথাসাধ্য আপনার সেবার ত্রুটি করিবে না। যেখানে আপনি থাকিবেন, সেই গ্রামের লম্বরদার অর্থাৎ মোড়ল আপনার মানসসরোবরে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।" আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া আহারান্তেই চলিতে আরম্ভ করিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই 'মল্‌হারী' গ্রামে পঁহুছিলাম। অদ্যও ধৌলী উপত্যকা দিয়া অনবরত উত্তর দিকে চলিয়া আসিয়াছি। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ যশীমঠ পরিত্যাগ করি।

শ্রীরামানন্দ ভারতী।

বাউল সম্প্রদায়ের আদি।

শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যখন রাজধানীর নামানুসারে এক্ষণকার 'বাঙ্গলা' দেশ গৌড়দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল, এবং তাহার সিংহাসনে রণমত্ত প্রজাপীড়ক মুসলমান নরপতিগণ সমাসীন ছিলেন, ঘোর কলিযুগের আবির্ভাব দেখিয়া যে সময়ে এতদ্দেশের অনেক ধর্ম্মভীরু সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণও বিষয়কর্ম্ম ও সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসপন্থা অবলম্বন করিতেন, এবং ইহজীবন অতীব অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীতি হওয়ায় চিন্তাশীল লোকে কেবল পরলোকের শুভানুধ্যানেই অধিকাংশ কাল ব্যাপৃত থাকা শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ করিতেন, তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্থানে স্থানে, হাটে বাটে, বিশেষতঃ মঠ, মন্দির বা আখড়ায়

এক জন পরিব্রাজককে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইতেন। সন্ন্যাসীরা তখন দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইত। তাহারা প্রায়ই 'ভেক না লইলে ভিক্ষা হয় না' দরের লোক ছিল। তাহাদিগকে পৃথিবী গ্রাস করিয়াছেন; এক্ষণে আর কেহই তাহাদের অস্তিত্বের কথা অবগত নহে। কিন্তু উপরি-উক্ত পরিব্রাজকে লোকে কিছু অসাধারণ গুণ নিরীক্ষণ করিয়াছিল, এবং তজ্জন্য তিনি অনেকের নিকট এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া গণনীয় হইয়াছিলেন। কোথায় তাঁহার জন্ম, কেবা তাঁহার পিতামাতা, কেনই বা তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, ইহা কেহই অবগত ছিল না। তিনি অন্যান্য সন্ন্যাসীর ন্যায় যাক্কা করেন না; স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কেহ কিছু দিলে আহার করেন, নতুবা উপবাসী থাকেন, ইহা দেখিয়া লোকে তাঁহাকে সমধিক ভক্তি করিত। অধিকন্তু তাঁহাকে সর্ব্বদাই উন্মনা দেখা যাইত। নিভৃত স্থানে বসিয়া হয় ত তিনি কাঁদিতেছেন বা হাসিতেছেন,—অথচ হর্ষ বা শোকের বাহ্য কারণ কিছুই নাই,—ইহা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত; অনেকে তাঁহাকে বাতুল বা 'বাউল' সন্ন্যাসী বলিয়া অবধারণ করিয়াছিল। কিন্তু পণ্ডিত লোকে তাঁহার সহিত আলাপ করিলে বুঝিতে পারিত যে, তাঁহার বাহ্য বাউল প্রকৃতির মধ্যেও শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারশক্তি আছে। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত; মধুর গভীর ভাবব্যঞ্জক শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার অযাচক নিরীহ প্রকৃতি দেখিয়া যেমন আপামর সাধারণ লোক তাঁহাকে ভক্তি করিত, তাঁহার শ্লোক শুনিয়া পণ্ডিতও তেমনি মুগ্ধ হইতেন। এরূপ ব্যক্তির খ্যাতি-প্রচার অস্বাভাবিক নহে।

তাঁহার অনেকগুলি শিষ্যও জুটিয়াছিল। তাহাদের নিকট লোকে অবগত হইল যে, তিনি এক জন শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠাপিত পুরী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী—নাম 'মাধবেন্দ্র'। মাধবপুরী 'পুরী গোঁসাঞী' নামে বিখ্যাত হইলেন। পুরী সম্প্রদায়ীরা অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী। কিন্তু লোকে অবগত হইল, মাধব অদ্বৈতবাদসম্মত ব্রহ্মজ্ঞানকে অবজ্ঞা করেন; উহা শুষ্ক ও নীরস পদার্থ বলিয়া তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে ভগবদ্‌ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেমকে উপাদেয় পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এক জন প্রেমিক ভক্ত; এবং যাঁহারা তাঁহার মনের কথা অবগত হইল, তাহারা জানিতে পারিল যে, তিনি এক জন বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক। তিনি ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে যত্নবান না হইয়া বিষ্ণুমন্ত্রজপের দ্বারা

হৃদয়ের মধ্যে বিষ্ণুকে দেখিবার কামনা ও আশা করেন। ভাগবতের কৃষ্ণ-কথায় তাঁহার বড় আনন্দ। কৃষ্ণের লীলা শুনিলে তিনি অনন্যসাধারণ ভাব সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া অধীর হইয়া পড়েন, এবং বিহ্বল হইয়া নৃত্য করেন, অথবা অশ্রুপাত করিয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হয়েন। সাধারণের চক্ষে যাহা বাউলভাব বা বাই মাত্র, বিবেচক লোকেরা বুঝিলেন যে, উহা তাঁহার অদ্ভুত প্রেমভক্তির বিকাশমাত্র। মূলকথা, তিনি ভাবগ্রাহীদের মধ্যে এক জন ভাবুক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন, এবং সাধারণ লোকের মধ্যে 'বাউলা' বা বাউল সন্ন্যাসী বলিয়া তাঁহার অভিধান হইল।

দৃশ্যটি তৎকালের পক্ষে কিছু নূতন হইল। মাধবের সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা শঙ্করের শারীরক ভাষ্যকেই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র, এবং তৎপ্রতিপাদ্য অদ্বৈতবাদকেই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া বিবেচনা করিতেন। মাধব তৎপরিবর্ত্তে শ্রীমদ্‌ভাগবতকে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র এবং তৎপ্রতিপাদ্য ভগবদ্‌ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেমকে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া খ্যাপন করিলেন। কিরূপ যুক্তির অনুসরণ করিয়া তাঁহার এতাদৃশ মতপরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা অনুমান ভিন্ন অবধারণের অন্য উপায় নাই। কিন্তু দেখা যায় যে,তাঁহার এইরূপ মতের পরিবর্ত্তনে তাঁহার শিষ্যেরা দুই থাকে বিভক্ত হইয়াছিলেন। এক দল পূর্ব্বের ন্যায় অদ্বৈতবাদীই থাকিলেন, এবং উত্তরকালে তাঁহার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিলেন; আর এক দল অদ্বৈত-বাদকে শুষ্ক ও অসার পদার্থ বলিয়া তদীয় মত অঙ্গীকার করিয়া 'বৈষ্ণব' হইলেন, এবং তাঁহাকে সমধিক ভক্তি করিতে লাগিলেন। প্রথমোক্ত শিষ্যদের মধ্যে আমরা রামচন্দ্রপুরী নামক এক জন সন্ন্যাসীর উল্লেখ দেখিতে পাই। শেষোক্ত দলের মধ্যে ঈশ্বরপুরী নামক আর এক জন সন্ন্যাসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মাধবের সহিত ঈশ্বর প্রভৃতি 'বাউল সন্ন্যাসী' বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। কিন্তু রামচন্দ্রপুরী প্রভৃতি প্রাচীন পন্থার সন্ন্যাসীরা সে দলে মিশিলেন না, এবং তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রাচীন হইতে এতদ্দেশে এক নূতনের উদ্ভব হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে সে সময়ে একবারে নূতন ছিল, তাহা নহে। দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন আমরা এ দেশে জয়দেব গোস্বামীকে দেখিতে পাই, তখন মাধবের সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মও এক পুরাতন পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু মাধবের দ্বারা বৈষ্ণব-সমাজে এক অপূর্ব্ব সংযোগ সাধিত হইয়াছিল। তাঁহা হইতে বৈষ্ণবসমাজ 'বাউল' সমাজে পরিণত হইল। অক্ষয়কুমার দত্তের 'উপাসক-সম্প্রদায়ে'

যাঁহারা বাউলের বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, বাউল সম্প্রদায়ের আধুনিক পরিণাম তাঁহাদের অবিদিত নহে। কিন্তু ইতিহাসরসিক পাঠকের জানা উচিত যে, এক্ষণেও বহুসংখ্যক লোকে এতদ্দেশে যাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করেন, সেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আদিম বাউলদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তৎকালের বাউলেরা পূজিত ছিলেন। অদ্বৈত মহাপ্রভু মাধব গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য হইয়া 'বাউল' হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মাধবের অপর মন্ত্রশিষ্য ঈশ্বরপুরী বাউলের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইয়া 'বাউল' হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বাল্যেই এক জন সন্ন্যাসীর চেলা হইয়া বাহির হইয়া যান। তিনি পরিব্রাজক হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণকালে মাধবের দলে মিশিয়া গিয়াছিলেন, এবং বাউলদের মধ্যে তিনি এক জন মহাবাউল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

বাউল সমাজের অভ্যুদয়কালে, যাঁহারা ঈশ্বরপ্রেমে 'পাগল', তাঁহারাই 'বাউল' ছিলেন;—ঈশ্বরের নাম ও মহিমা শ্রবণ করিয়া ও মধুর প্রকৃতি স্মরণ করিয়া যাঁহারা অধীর হইয়া হাস্য ও ক্রন্দন করিতেন, তাঁহারাই 'বাউল'। এই সকল বিকৃত ভাব 'প্রেমের বিকার' বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং হরিনামশ্রবণে যাঁহাদের তাদৃশ বিকারের আবির্ভাব হইত, তাঁহারা ভাগ্যবান্ ও ঈশ্বরপ্রসাদে প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া গণ্য হইতেন। প্রেমের বিকার কাহারও কাহারও এতাদৃশ অধিক হইয়া দাঁড়াইত যে, হরিনাম শ্রবণে তাঁহার রোমাঞ্চ হইত, অথবা শরীর কম্পিত হইত,—অথবা তিনি একবারে মূর্চ্ছিত হইতেন। প্রাচীন বৈষ্ণব হইতে এই নূতন বাউল বৈষ্ণবদের ইহাই প্রধান বৈলক্ষণ্য। ইঁহারা প্রশান্তভাবে হরিনাম করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না;—অট্ট অট্ট হাসিয়া অথবা ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ধূলিলুণ্ঠিতশরীরে অথবা উদ্দণ্ড নৃত্যের সহিত, অশ্রুকম্প, পুলক ও স্বেদ-প্রদর্শন পূর্ব্বক হরিনাম করিবারই সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন।

৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল।

কল্যাণী।

১

"শুভলগ্ন বহি যায়!"—সত্বরে অমনি
সকলে সুবেশে রঙ্গে
বাহিরিল পাত্র সঙ্গে;
পুরাঙ্গনা উচ্চকণ্ঠে দিল হুলু-ধ্বনি।

উঠিল নৌবত বাজি খাম্বাজ নিখাদে,
দাঁড়াইল দিয়া সারি
দু'ধারে আলোকধারী,
হ্রেষিল ঘর্ষিল পদ তুরঙ্গ আহ্লাদে।

নিল মাতৃ-পদধূলি পিতৃ-অনুমতি।
চলে চতুরঙ্গ ঠাট,
বন্দী করে স্তুতিপাঠ,
কত রঙ্গ, কত নাট, কত রথ রথী।

পুড়িছে আতসবাজি, উড়িছে নিশান,
ঘন তূরী ভেরী নাদে,
গবাক্ষে গবাক্ষে ছাদে
স্মিতমুখ রমণীর উৎসুক নয়ান।

বিচিত্র খধূপ জ্বলে নয়ন ধাঁধিয়া।
মৃতা দয়িতার মাতা
মাটিতে খুঁড়িল মাথা,—
ঘুমন্ত দৌহিত্রীমুখ চুম্বিল কাঁদিয়া।

ঈশানে অদৃষ্ট অন্ধ বিদ্যুতে হাসিল—
হুহু হুহু মেঘদল
ছায়িল আকাশ-তল,
মুষলের ধারে জল রুষিয়া আসিল।

মুহুর্মুহু বজ্রপাত ঝটিকা-গর্জ্জন।
ছত্রভঙ্গ যাত্রিদল,
প্রাণভয়ে কোলাহল,
ছুঁড়ি আলো ফেলি বাদ্য করে পলায়ন।

ব্যস্তে সবে উপস্থিত কন্যকা-ভবনে।
দীপে গঙ্গোদকে বরি
নিল পাত্রে করে ধরি,
বসাইল সমাদরে মহার্ঘ্য আসনে।

ক্রমে সুস্থ, পট্টবস্ত্র করে পরিধান।
সহসা আঙ্গিনা-পাশে
হেরিল, কাঁপিল ত্রাসে,
মৃত প্রণয়িণী-মূর্ত্তি যেন বিদ্যমান!

ভ্রম বুঝি, আঁখি মুছি চাহিল আবার।
সেই দৃষ্টি—অতি দীন,
সেই মুখ—বিমলিন,
সেই দেহ—অতি ক্ষীণ, অতি দীর্ঘাকার।

"শীতক্লিষ্ট পাত্র অতি,"—শ্বশুর প্রবীণ
জামাতারে সযতনে
সুচিত্রিত কাষ্ঠাসনে
বসাইল বেদী-অগ্রে অগ্নি-সম্মুখীন।

বসি কাষ্ঠমূর্ত্তি-প্রায়, দৃষ্টি ভয়ে স্থির।
সেই মূর্ত্তি ধীরে এসে
দাঁড়াইল দ্বারদেশে,
দুখে যেন ভেঙ্গে পড়ে—বহে না শরীর।

অনল ব্রাহ্মণ সাক্ষ্যে হ'লো অঙ্গীকার।
এলো রত্ন-বিভূষিতা
রূপে গুণে প্রশংসিতা
মন্থরা গম্ভীরা ধীরা সম্রাজ্ঞী ধরার।

বসি পাত্রী পাত্র-অগ্রে, মধ্যে হোমানল;
সেই মূর্ত্তি ঘুরি যেন
সম্মুখে দাঁড়াল হেন,
ভিত্তি'পরে পৃষ্ঠ চাপি—নয়ন নিশ্চল।

মন্ত্র-অন্তে পুরোহিত নিয়া পাত্র-কর
স্থাপিল মঙ্গল-ঘটে;
মূর্ত্তি এলো সন্নিকটে,
আপন বিশুষ্ক কর দিল তদুপর!

কন্যা-কর ল'য়ে পিতা প্রদানিতে যায়—
সহসা ঝটিকা এলো,
আলোক নিবিয়া গেল,
পুরোহিত অন্যমনে মালিকা জড়ায়!

স্তব্ধ অন্ধকার গৃহ—অতি শুদ্ধ তমঃ।
সুধু দুই আঁখি দিয়া
আসে দৃষ্টি ঠিকরিয়া,
দুই নীল অগ্নিশিখা—সর্পজিহ্বা সম।

না পড়ে নিশ্বাস কারো, না নড়ে বাতাস,
কোথা না গোধিকা নড়ে;
সুধু রহি রহি পড়ে—
আনাভি ঘর্ঘরি এক গভীর নিশ্বাস।

ভয়ে বা বিস্ময়ে সবে অর্দ্ধ-অচেতন।
ভিতে ভিতে ছাদে ছাদে,
যেতে যেতে যেন বাঁধে,

প্রাঙ্গণে অশ্বথ-শিরে পড়িল অশনি।
নারীগণ কেঁদে উঠে,
যাত্রিগণ ভয়ে ছুটে,
বাদিত্র বাজায় বাদ্য করি ঘোর ধ্বনি।

আলো ল'য়ে ছুটে ভৃত্য বিবাহ-মণ্ডপে।
বিস্মিত—গন্ধকধূমে,
পাত্র অচেতন ভূমে,
দীর্ঘ নর অস্থিমালা দুলে চন্দ্রাতপে!

নিমেষে তন্দ্রার শেষে সকলে জাগিল।
কেহ স্পর্শে পাত্র-দেহ,
দেখিছে বা নাড়ী কেহ,
কেহ শিরে হানে কর, কেহ পলাইল।

২

নিশান্ত আকাশ—যেন পরিশ্রান্ত অতি;
প্রশান্ত দিগন্ত-গায়
শশী অস্ত যায় যায়,
অদূরে মন্দিরে বাজে মঙ্গল-আরতি।

একাকী, দুর্ব্বহ দেহ, দাঁড়ায়ে কল্যাণী।
আলিসায় দিয়া ভর,
কপোলে দক্ষিণ কর,
অসম্বদ্ধ কেশপাশ, ম্লান মুখখানি।

শূন্যদৃষ্টে শূন্যপানে চাহি অন্যমনা।
আর্দ্র পক্ষ ঝাড়ি—পাখী
হেথা হোথা উঠে ডাকি,

ধীরে ধীরে তারাগুলি মিলাইয়া যায়।
দূরে প্রাচী-মেঘপুটে
উষা যেন ফুটে ফুটে,
অধীর সমীর, নিশা পোহায় পোহায়।

নীরবে জননী আসি দাঁড়াল নিকটে,
চাহিল কন্যার পানে—
কি অব্যক্ত ব্যথা প্রাণে!
অশ্রু যেন পথহারা হৃদয়-সঙ্কটে।

চাহিতে পারে না আর বুকে টেনে লয়,
যেন শত বাহু দিয়া
রবে চির আলিঙ্গিয়া,
নামাইতে ভূমে আর সাহস না হয়।

আঁখিতে মিলিতে আঁখি নতমুখীবালা
হেরিছে তোরণ-পাশে
ছিন্ন তাঁবু জলে ভাসে,
লুটিছে কর্দ্দমে ধ্বজ-পত্র পুষ্পমালা।

বজ্রদগ্ধ ভগ্নতরু দাঁড়ায়ে প্রাঙ্গণে।
পোড়া আলো, ভাঙা বাঁশ,
পড়ি স্তূপাকার খাস—
নিঃশব্দে কুক্কুর কাক নিযুক্ত ভোজনে।

লণ্ডভণ্ড বেদীমঞ্চ, ভগ্ন ঘট পড়ি।
ছিন্ন শামিয়ানা দিয়া
পড়ে জল গড়াইয়া,
আসন তৈজস বাস যায় গড়াগড়ি।

চমকি উঠিল বালা—বিগত রজনী
নহে তবে স্বপ্ন নহে!
অশ্রুস্রোত বহে বহে,
জনক আসিল ছুটে, কহিল—"বাছনি

হয়নি বিবাহ তোর। সম্প্রদান-আগে
কভু না বৈধব্য হয়—
এই কথা শাস্ত্রে কয়।"
জননীর ভাঙা বুকে আশা-ঢেউ লাগে।

বালিকা তুলিল মুখ। সমস্ত আকাশ
অরুণ-আলোকে হাসে,
শীতল সমীরে ভাসে
পিককণ্ঠ-কলকল কুসুম-সুবাস।

জনক চকিত ভীত, জননী বিহ্বল,
বজ্র যেন পড়ে মাথে;
দেখিল—কঙ্কণাঘাতে
সীমন্তে শোণিত-ধারা—সিন্দুর উজ্জ্বল!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

মাটীর বাসন।

কুম্ভকারের কুলালযন্ত্রোৎপন্ন পাত্রাদির নাম কৌলালক হইতে পারে, এবং মৃণ্ময় বলিয়া মার্ত্তিক বলাও চলে। ঐ দুই শব্দের পরিবর্ত্তে আমরা বাঙ্গলায় কুমরের বা মাটীর বাসন, হাঁড়ি কুঁড়ি বলিয়া থাকি। যাহা হউক, নামে কিছু আসে যায় না, হাঁড়ি কুঁড়ির পরিচয় সকলেরই আছে।

এক হিসাবে হাঁড়ি কুঁড়ি অমরও বটে। মাটীর জিনিস মাটীতে ফেলিয়া বা পুতিয়া রাখিলে তাহার ক্ষয় হয় না; লোহা বা অন্য সামান্য ধাতু ক্ষয় পায়। বহু বহু পুরাতন হাঁড়ি—এত পুরাতন যে যাহারা সেই হাঁড়ী ব্যবহার করিয়াছিল—সেই অতি প্রাচীন মানবকুল নির্ম্মূল হইয়াছে,—কিন্তু সেই হাঁড়ী এখনও সেই মানবজাতির অস্তিত্ব, তাহার শিল্পজ্ঞানের সাক্ষ্য হইয়া আছে। ইতিহাস সে মানবজাতিকে জানে না, প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সে জাতির অস্ত্র শস্ত্র লৌহের পরিবর্ত্তে প্রস্তরের দেখিতে পান। কোথায় প্রাচীন মিশর, খ্রীষ্টজন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের হাঁড়িকুঁড়ি সেই প্রাচীন মিশরবাসীর নিত্য-ব্যবহৃত কৌলালকের নিদর্শনস্বরূপ হইয়া আছে। কোথায় প্রাচীন বেবিলন, প্রাচীন নিনেভে; খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর ইটে তাহাদের যুদ্ধ ব্যাপার, দলিল দস্তাবেজ যাঁহারা পড়িতে পারেন, তাঁহারা পড়িয়া জানিতে-ছেন। যদি বা সামান্য মার্ত্তিকের বিনাশ আছে, কাচের বিনাশ নাই বলি-লেও চলে। ইটে লোণা লাগিতে পারে, হাঁড়ি লোণায় জর্জ্জর হইতে পারে, কিন্তু কাচের কিছুই হয় না। বলা বাহুল্য, কাচও মৃত্তিকাবিশেষ।

ইহা মার্ত্তিকের সামান্য গুণ, কিন্তু অসামান্য প্রয়োজন। আমমাংসাশী অসভ্য বর্ব্বর, যাহারা রন্ধনের ব্যাপার জানে না, তাহাদের রাঁধিবার হাঁড়ী না থাকিলেও কোন না কোন মৃৎপাত্র থাকে। যে নিতান্ত নিঃস্ব, অন্নবস্ত্রের ভিখারী, তারও ভাঙ্গা কুঁড়েতে বা গাছতলায় দুই একটা হাঁড়ি অবশ্য আছে।

হাঁড়ীর প্রচলন এমন বহুব্যাপী, কিন্তু 'যোজনান্তে ভাকা'র ন্যায় উহার রূপ ভিন্ন। রূপ ব্যতীত, উহার উপাদান, উহার অলঙ্কারবিধানও সকল জাতির সমান নহে। এই তিন বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। এই প্রকার তিন ভাগ না করিয়া আলোচ্য বিষয় দুই ভাগ করিলেও চলে। হাঁড়ি কলসী শিল্পজাত; সুতরাং উহাতে ব্যবহারযোগ্যতা যেমন আছে, সৌন্দর্য্যপ্রকাশের চেষ্টাও তেমন আছে। মৃৎপাত্রের রূপ যেমন তেমন দিয়া, তাহার বর্ণ, তাহার দেহসৌন্দর্য্য উপেক্ষা করিয়া কুম্ভকার প্রয়োজনীয় ঘট নির্ম্মাণ করিতে পারিত, কিন্তু এ পর্য্যন্ত পারে নাই। প্রয়োজন-সাধন করিতে গিয়া সে নিশ্চিত তাহার রচিত সামগ্রীতে নিজের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইবে। শিল্পজাত দ্রব্যমাত্রেরই এই দুই দিক্ দেখিবার আছে। তৈলভাণ্ডে তৈল রাখিতে পারিলেই হইল, এ কথা অশিল্পী

যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারে না, সৌন্দর্য্যস্পৃহা ত্যাগ করিতে পারে না; যে হেতু মানব সৌন্দর্য্যভক্ত। তথাপি সৌন্দর্য্যের আগে কারুজ দ্রব্যের উপযোগিতা লক্ষ্য করিতে হয়। কর্ম্মসাধনের সম্যক্ উপযুক্ত না হইলে মার্ত্তিকের উৎপত্তিই বৃথা। গৃহশোভার নিমিত্ত মার্ত্তিকের ব্যবহার এ দেশে নাই, অন্য দেশে পূর্ব্বকালে ছিল না, এক্ষণে সভ্যদেশে হইয়াছে। মৃণ্ময় পুত্তলিকা এ দেশেও আছে; শিশু সর্ব্বত্র আছে, তাহার চিত্তবিনোদন নিমিত্ত পুত্তলিকা চাই; কিন্তু তাহা অতি ভঙ্গুর, কর্কশকলেবর হইলে চলে না। তৈলরক্ষার নিমিত্ত ভাণ্ড আবশ্যক; কিন্তু যে ভাণ্ডে তৈল রাখিলে তৈলের অর্দ্ধেক ভাণ্ডই শোষণ করে, অবশিষ্ট তৈল বাহিরে নির্গত হয়, সে ভাণ্ডের প্রশংসা করিতে পারি না। মার্ত্তিক দ্রব্য অমর বটে, কিন্তু পাচক ঠাকুরের মতে ক্ষণভঙ্গুর হইলে তাহাতে কর্ম্ম চলে না।

মৃণ্ময় হইলেও সকল পাত্রের উপাদান সমান নহে। উপাদান দেখিলে আজ কাল নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার মার্ত্তিক পাওয়া যায়।

১। সামান্য মাটীর। যে মাটীতে ইট হয়, সে মাটীতে গামলা, নাদ, গুড়ের কলসী, জালা না হইলেও, সকলগুলির উপাদান প্রায় এক। ইটের মাটীর পাইট তত আবশ্যক হয় না, মাটীতে কাঁকর থাকিলেও বড় একটা ক্ষতি হয় না, কিন্তু সেই মাটীই পাইট করিলে গামলা নাদ প্রভৃতি গড়িবার যোগ্য হইতে পারে। হাঁড়ি কুঁড়ির মাটীও এই প্রকার। তাহাতে কাঁকর থাকিলে গড়িবার সময় ফাটিয়া যায়, পোড়াইলে ফাটিয়া যায়। এ নিমিত্ত ইহাদের মাটীর পাইট করা আরও আবশ্যক। সামান্য মাটীতে অনেক প্রকার পদার্থ মিশ্রিত থাকে। তন্মধ্যে শুদ্ধ মৃত্তিকা, বালুকা, লৌহ, চূণ প্রভৃতি প্রধান। চীনের বাসনে শুদ্ধ মৃত্তিকা থাকে। লৌহাদি না থাকিলে মাটী পোড়াইলেও সাদা থাকে। ইটের লাল রঙ্গের কারণ, লোহা। কুমরের বাসন পোড়াইবার পোয়ানের ধূঁয়া বাহির হইতে না দিলে সেই লোহার গুণে বাসন কাল বর্ণ, ধূঁয়া বাহির করিয়া দিলে লাল দেখায়।

২। পাথুরে মাটীর। বঙ্গদেশের কুম্ভকার সামান্য মাটীতেই সন্তুষ্ট। ফলে তাহার হাঁড়ি কুঁড়ি তেমন দৃঢ় হয় না, হাত হইতে পড়িলেই ভাঙ্গিয়া যায়। বাজারে এক প্রকার পাথুরে মাটীর দোয়াত, ঘটী, ভাঁড় বিক্রয় হয়, তৎসমুদয় সামান্য মাটীর মত ভঙ্গুর নহে। রাণীগঞ্জে বরন্ কোম্পানী এই প্রকার পাথুরে মাটীর জিনিস নির্ম্মাণ করাইতেছেন। জল-নালার নল ও

চোঙ্গ এই মাটীতে হইয়া থাকে। পাথুরে মাটী বলিয়া যে কোন পাথর গুঁড়া করিয়া মাটী প্রস্তুত হয়, এমন নহে। স্থূল উপাদান দেখিলে উহা বালুকা-প্রধান সামান্য মাটী বলিতে পারা যায়। পোড়াইবার গুণেও এই মাটীর জিনিস এত দৃঢ় হয়।

৩। চীনের মাটীর। চীনেরা এই মাটীর বাসন প্রথমে নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এ জন্য নাম চীনের বাসন। ইহাদের উপাদান শুদ্ধ মৃত্তিকা ও এক প্রকার কাচ। চীনের একটা পাহাড়ের গায়ে এই শুদ্ধ মৃত্তিকা স্বভাবতঃ পাওয়া যায়। ইহার সহিত অন্য এক প্রকার মৃত্তিকা মিশাইয়া চীনেরা তাহাদের শাদা বাসন প্রস্তুত করিয়া থাকে। বহু পূর্ব্বকাল হইতে তাহারা এই প্রকার বাসন গড়িতেছে। য়ুরোপে গত দুই শতাব্দী উহার আবিষ্কার ও নির্ম্মাণ হইতেছে। ইটালীর ভাষায় চীনের বাসনকে পোর্স্লেন বা কড়ীর বলা হইত। তাহা হইতে বঙ্গদেশেও কড়ীমাটীর দোয়াত নাম হইয়াছে। বস্তুতঃ উহাতে কড়ীর সম্পর্কমাত্র নাই। চীনের বাসনের বর্ণ, দীপ্তি কড়ীর মত বলিয়া এই নামের উৎপত্তি। দুই শত বৎসর চেষ্টার পর য়ুরোপে চীনের বাসন প্রস্তুত হইয়াছে। ইটালী ও ফ্রান্স এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিল। পরীক্ষার নিমিত্ত এত কাল লাগিবার প্রধান কারণ এই যে, তৎকালে লোকে চীনের বাসনের মাটীকে একটা বহুদ্রব্যমিশ্রিত মৃত্তিকা মনে করিত। বস্তুতঃ চীনের বাসন দেখিতে মাটীরও নয়, কাচেরও নয়। কাচ স্বচ্ছ, চীনের বাসন প্রায় স্বচ্ছ, মাটীর বাসন অস্বচ্ছ। যে তাপে চীনের বাসন পোড়ান হয়, তাহাতে কাচ গলিয়া যায়, মাটী ঝামা হইয়া পড়ে। বহু পরীক্ষার ফলে নানা দ্রব্য মিশাইয়া ইটালী ও ফ্রান্সে চীনের বাসনের অনুকরণ হইয়াছিল। জর্ম্মানীতে এক বিচিত্র ঘটনাচক্রে চীনের মাটী আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারে কোন রাজার অনুগ্রহও যথেষ্ট ছিল। মাটী অনুসন্ধানে নয় দশ বৎসর গিয়াছিল। যে রাসায়নিক এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এক দিন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার পরচুলায় মাখাইবার নিমিত্ত এক প্রকার ভারী মৃত্তিকাচূর্ণ আসিয়াছে। সেই মৃত্তিকার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি স্বাভাবিক শুদ্ধ মৃত্তিকার তত্ত্ব জানিতে পারেন। আবিষ্কারটি গোপনে রাখিবার চেষ্টা বিলক্ষণ হইয়াছিল, কারখানা জেলখানায় পরিণত হইলেও ড্রেসডেন পোর্সেলেনের উপাদান প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংলণ্ডে দ্বিতীয় জর্জ রাজার প্রসাদলাভে তথায় চীনের বাস-

নের শীঘ্র উন্নতি হইয়াছিল। এ দেশে দিল্লীতে চীনের মাটীর কুঁজো, রেকাবী প্রভৃতি অল্পপরিমাণে প্রস্তুত হয়। কিন্তু যে কালে কুম্ভকার নিজের চেষ্টায় তাহার বাসনের উন্নতি ও প্রচার করিতে পারিত, সে কাল আর নাই। দেশে ধনী ও উৎসাহী লোকও নাই। দুই তিন শত বৎসরের চেষ্টাতে য়ুরোপে এক্ষণে মার্ত্তিকের যে উন্নতি হইয়াছে, এ দেশে সে উন্নত অবস্থা আছে, অথচ নাই। বিদ্যা লুপ্তও হয় নাই, তদপেক্ষা অধম অবস্থায় আছে।

শুধু কুমরের বাসন কেন, কাচের জিনিসেরও মৃত দশা বর্ত্তমান। কাচও মাটীমাত্র, কুমরের চাকে হয় না, এই প্রভেদ। বঙ্গদেশে কাচের কারখানা জন্মিয়াই মরিয়া গেল। যাহা হউক, উত্তর পশ্চিম, মাদ্রাজ, বম্বে এখনও এ দেশের প্রাচীন ব্যবসায় জীবিত রাখিয়াছে। যজুর্বেদে যে কাচের উল্লেখ আছে, তাহা অদ্যাপি জীবিত, ইহা শুনিয়াই আমাদের তৃপ্তি। যে দেশে স্বভাবতঃ কাচের জন্ম, সে দেশের লোক কাচের বোতলের নিমিত্ত দূরদেশের জাহাজের প্রতীক্ষা করে। আরও বিচিত্র, দেশের কাচ বম্বে হইতে বিলাতে গিয়া যাদুকরের হাতে পড়িয়া নানা রূপ ধরিয়া সেই বোম্বেতেই আবার উপস্থিত হইতেছে!

এই প্রবন্ধে কাচ আলোচ্য নহে। কিন্তু মাটীর বাসনের উপর কাচ লাগান অর্থাৎ তাহাকে কাচল করার বিষয় আলোচ্য বটে। বস্তুতঃ মৃদ্‌ভাণ্ডে কাচের লেপ লাগাইলে এক দিকে উহা যেমন দৃঢ় হয়, অন্য দিকে তেমনই তৈলজলাদির নির্গমন রুদ্ধ হয়। কাচ স্বচ্ছ ও রঞ্জিত হইতে পারে। এরূপ কাচের প্রলেপ থাকিলেও ভিতরের মাটীর বর্ণ অদৃশ্য হয় না। স্বচ্ছ কাচের সহিত মৃত্তিকা, রাঙ্গ প্রভৃতি মিশাইলে উহা অস্বচ্ছ হয়। সেরূপ কাচ লাগাইলে ভিতরের মাটীর বর্ণ দেখা যায় না। এই প্রকার অস্বচ্ছ বস্তুর প্রলেপকে পশ্চিমে মীনা বলে। সে দেশে, বিশেষতঃ জয়পুরে, স্বর্ণ রূপ্য অলঙ্কার মীনা করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, মীনা ও ইংরাজি এনামেল অর্থে এক। ওড়িশায় এরূপ প্রলেপকে কিংবা প্রলেপমাত্রকে পুট (আবরণ) বলে। শব্দটি ভাল বোধ হইল, তাই মীনা করা না বলিয়া পুটল বলা যাইবে। কুঁজো কলসী প্রভৃতি অল্প মার্ত্তিক আছে, যাহাকে সচ্ছিদ্র রাখা আবশ্যক। এতদ্‌ব্যতীত যাবতীয় হাঁড়ি কুঁড়ি কাচল কিম্বা পুটল হইলে দেখিতে সুন্দর, ব্যবহারে যোগ্য হয়। বঙ্গদেশে হাঁড়ি কলসীর গলার নীচে এক প্রকার পুট দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পুটের গুণে সে

অংশ মসৃণ, উজ্জ্বল, এবং জলের দুষ্প্রবেশ্য হয়। কিন্তু উহা এত সূক্ষ্ম যে, তদ্দ্বারা পুটের প্রয়োজন সাধিত হয় না। তবে, নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল। ঐ পুটটি তেমন কঠোরও নহে। বস্তুতঃ উহা কুম্ভকারের পোচমাটী মাত্র। সুতরাং উহাকে প্রকৃত পুট বলিতে পারা যায় না। উহার লালবর্ণ হইবার কারণ উহার লৌহাংশ। রুদ্ধধূমদ্বার পোয়ানে পোড়াইলে উহাই কৃষ্ণবর্ণ হয়। বঙ্গদেশে এই লাল ও কাল বর্ণের মার্ত্তিক ব্যতীত অন্য বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায় না। পূজার ঘটে ও কন্যার দ্বিরাগমনের মিষ্টান্নের হাঁড়িতে সাদা রঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তেমনই ছেলেদের পুতুলও বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হয়। কিন্তু এ সকল রঙ্গ পুটের নহে, সুতরাং সম্প্রতি বিবেচ্য নহে।

বঙ্গদেশ ছাড়িয়া ভারতের অন্যান্য কোন কোন প্রদেশে পুটল মার্ত্তিক প্রস্তুত হয়। কিন্তু সে সকল মার্ত্তিক সেই সেই প্রদেশ ভিন্ন অন্যত্র প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্ততঃ তাহাদের বাণিজ্য নাই। পুটল করিবার নিমিত্ত সে সকল প্রদেশে আবশ্যক উপাদান পাওয়া যায়। তাই তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। ওড়িশা এ বিষয়ে বঙ্গদেশ অপেক্ষাও অধম। কৃষ্ণবর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণের মার্ত্তিক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে বঙ্গদেশের 'পোচ'ও নাই।

সামান্য মাটীর বাসনে 'পোচ' কিংবা কাচ কিংবা পুট দিলেও উহা ঠুন্‌কোই থাকে। পাথুরে মাটীর বাসন করা দূরের কথা, অপেক্ষাকৃত কঠিন মৃত্তিকার বাসনও বঙ্গদেশে দুর্ল্লভ। অনুসন্ধান বা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা আমাদের কুম্ভকারের নাই। বাপ পিতামহ যে মাটীতে বা যে ভাবে বাসন করিত, তাহাই তাহাদের সম্বল। নদীয়া কৃষ্ণনগরের কুম্ভকার সম্প্রতি মাটীর দোয়াতে রজন ধূনার পুট লাগাইয়া উহার জলাদিশোষণ নিবারণ করিতেছে। কিন্তু মাটী যেমন, তেমনই; এ বিষয়ে কোনও উন্নতি দেখিতে পাই না। রজনের পুটটিও নূতন নহে। পশ্চিমে বহুকাল হইতে উহা চলিত আছে। সেখানে রজনের পরিবর্ত্তে গন্ধবিরজা ব্যবহৃত হয়। তথাপি, মন্দের ভাল বলিতে পারা যায়। পাথুরে মাটীর বাসন উপাদানে যেমন কঠিন, পুটে আরও কঠিন। উহাতে নুনের পুট বা পোড় প্রচণ্ড উত্তাপে লাগান হইয়া থাকে। ছুরী দিয়া ভাঙ্গা গায়েই দাগ বসাইতে পারা যায় না, পুটের উপরে ত কথাই নাই। চীনের বাসনের চাক্‌চিক্য তাহার পুটের

ফল। সকল পুট কিন্তু সমান কঠোর নহে, এবং পুট না থাকিলে বাসন কেবল শাদা দেখাইত, মসৃণ হইত না। যাবতীয় পুটকে স্থূলতঃ দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। এক প্রকার পুটে সীসা থাকে, এ নিমিত্ত উহা অল্প উত্তাপে গলিয়া যায়। সীসার পুট তেমন কঠোর হয় না, এবং কালক্রমে উহা বিষকর হইয়া উঠে। অন্য প্রকার পুট এক প্রকার কাচ, সুতরাং নির্দ্দোষ এবং বিলক্ষণ কঠোর। লোহার গেলাস বাটী প্রভৃতির উপর শাদা পুট লাগাইয়া আজ কাল ঠুন্‌কো বাসনের কাজ করা হইতেছে। কিন্তু উহার সীসার পুটে স্বাস্থ্যনাশের আশঙ্কা মনে রাখা আবশ্যক।

উপযোগিতা গেল, এখন শিল্প সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্যের হেতু দেখিতে মার্ত্তিকের রূপ, বর্ণ ও অলঙ্কার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এই সকল বিষয়ের যথোচিত আলোচনা করিবার পক্ষে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে স্থান নাই। এ নিমিত্ত সংক্ষেপে ঐ ঐ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যাইবে।

রূপ অর্থে গড়ন বা আকার বুঝিতে হইবে। সকলেই দেখিয়াছেন, যোজনান্তে ভাকা বদলের মত হাঁড়িকলসীর আকারের ভিন্নতা হয়। যেমন এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে প্রবেশ করিলে লোকের কথাবার্ত্তা, টানটোন আচার ব্যবহারে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হয়, তেমনই তাহাদের হাঁড়িকলসীরও হয়। ইহার কারণ বুঝা কঠিন নহে। হাঁড়িকলসী শিল্পজাত; শিল্পে শিল্পীকে দেখিতে পাওয়া যায়। দুই জন শিল্পীর মনের গতি এক হয় না। মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে কোন জাতির হাঁড়িকলসীতে তাহার উন্নতাবনতাবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন হাতের লেখা দেখিয়া লেখকের প্রধান প্রধান ধর্ম্ম বুঝিতে পারা যায়, তেমনই কোন জাতির হাঁড়িকলসী দেখিয়া সেই জাতির শিল্পচাতুর্য্যের সীমা পাওয়া যায়।

ভারতখণ্ডে হিন্দু ও মোসলমান, দুই সম্প্রদায়ের লোকই অধিক। হাঁড়িকলসীতেও দুই সম্প্রদায় বুঝিতে পারা যায়। একটা রূপ হিন্দুর, অন্যটা মোসলমানী। মোসলমানী শব্দটা ঠিক হইল না। পারস্যদেশীয় বলিলে ঠিক হয়। সে যাহা হউক, হিন্দু কুম্ভকারের প্রদত্ত রূপ, মোসলমান কুম্ভকারের প্রদত্ত রূপের মত নহে। উভয় জাতির রূপের যেমন প্রভেদ, তাহাদের হাঁড়িকুঁড়িতেও সেই প্রভেদ লক্ষ্য হয়। বঙ্গদেশের হিন্দু রমণী ও মোসলমান রমণী দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। ওড়িশার হিন্দু ও মোসলমানের মুখের রূপ একবারে ভিন্ন। কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যেখানে হিন্দু ও

মোসলমান সামাজিকতায় আচারে পরিচ্ছদে অনেকটা এক, সেখানে মুখের রূপবৈষম্য অনেকটা অল্প, এবং শিল্পকল্পনাতেও উভয়ে প্রায় সমভাবাপন্ন। এক নিশ্বাসে সাত কাণ্ড রামায়ণ বলার মত বলিতে গেলে, মোসলমানকল্পনা পরীর মত সূক্ষ্ম, হিন্দুকল্পনা দৈত্যের মত স্থূল। মোসলমানের কল্পনা যেন হাওয়ায় উঠে, হিন্দুর কল্পনা শক্ত মাটীতে বেড়ায়। মোসলমান কল্পনার নিদর্শন তাজমহল, হিন্দু কল্পনার নিদর্শন কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির, পুরীর মন্দির।

শিল্পকল্পনার সহিত শিল্পীর রূপের যেন একটা সম্পর্ক দেখিতে পাই। যে জাতি যত সুন্দর, তাহার শিল্পকল্পনাও প্রায় তত সুন্দর হয়। ওড়িশার হাঁড়িকুঁড়ি দেখুন; দেখিলেই বলিবেন, ওড়িয়া, অন্ততঃ ওড়িয়া কুম্ভকার সুন্দর পুরুষ নহে। মান্দ্রাজী কুম্ভকার দেখুন, তাহার রচিত হাঁড়িকুঁড়িও সুঠামতাহীন। বম্বের বারহাট্টা দেখুন, আর তথাকার হাঁড়ির রূপ স্মরণ করুন। দিল্লীর মোসলমান দেখিতে যেমন সুপুরুষ, তাহার গঠিত কুঁজোও তেমনই সুঠাম।

এই নিয়ম কিন্তু সর্ব্বত্র ঠিক নহে। সাধারণ ওড়িয়া অপেক্ষা সেই শ্রেণীর বাঙ্গালী সুশ্রী। অবশ্য ম্যালেরিয়াভোগী লাবণ্যহীন প্লীহায় লম্বোদর বাঙ্গালীর কথা বলিতেছি না। কিন্তু চিত্রাঙ্কনকার্য্যে, পুত্তলিকার রূপকল্পনায় বাঙ্গালী কুম্ভকার অপেক্ষা ওড়িয়া কুম্ভকার শ্রেষ্ঠ। চিত্রাঙ্কনে ওড়িয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, বাঙ্গালীর সে ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। বঙ্গদেশের স্থলবিশেষে দুর্গা সরস্বতী প্রভৃতির যে বিচিত্র রূপ কুম্ভকার বা সূত্রধারের শিল্পকল্পনার নিদর্শন, তাহা অনেকের চোখে অস্বাভাবিক সৌন্দর্য্যচেষ্টা বোধ হয়। তেমন আকর্ণলোচনা মানবীকে কেহ সুন্দরী বলিবেন না। বঙ্গদেশের সত্যপীরের ঘোড়ায়, বালকবালিকার পুতুলে বাঙ্গালীর সৌন্দর্য্য-জ্ঞান প্রকাশিত আছে। এত বিচারে না গিয়া বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণনগরের পুতুল অপেক্ষা লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীর পুতুলে নৈপুণ্য অধিক, মান্দ্রাজ ও বম্বের পুতুল অপেক্ষা বাঙ্গালার ও ওড়িশার পুতুলে কমনীয়তা অধিক। অবশ্য সমস্তই সামান্যতঃ বলা গেল।

শিল্পসৌন্দর্য্যের কথা হইলেই প্রাচীন গ্রীশ ও ইটালী মনে পড়ে। গ্রীশ সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। তাহার নিদর্শন প্রাচীন গ্রীক দেবদেবীর মূর্ত্তিকল্পনাতে যেমন, মৃৎপাত্রাদিতেও তেমনই ব্যক্ত হইয়াছিল।

রোমও গ্রীশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিল। যে বলিষ্ঠ জর্ম্মণ ও ইংরাজ জাতি চীনের মাটীর বাসনে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, শিল্পকল্পনায় তাহা গ্রীসের কুৎসিত অনুকরণ। ইহাদের অপেক্ষা ফরাসীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যজ্ঞান অধিক। অপরূপ কদাকার মূর্ত্তিকল্পনায় চীনেরা দক্ষ; সুসভ্য জাপানের স্বাভাবিক রুচি তত প্রকট নহে। জিনিস সস্তা করিতে গিয়া ইংরাজের শিল্পের যেমন অধঃপাত হইয়াছে, বোধ করি, জাপানের দশা তাহাই হইবে। সস্তার দিনে শিল্পের মর্য্যাদা থাকে না।

মৃদ্‌ভাণ্ডের বর্ণবিকাশে রূপের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়। যেখানে উহা পুটল হয় না, সেখানে মৃত্তিকার গুণে যে বর্ণ প্রকাশিত হয়, তাহাতেই কুম্ভকারকে সন্তুষ্ট হইতে হয়। কুলালচক্রে কুম্ভকার মৃত্তিকায় জীবন দিতে পারে, কিন্তু বর্ণ দিতে পারে না। পোচ লাগাইয়া, ঘষিয়া কুঁদিয়া মার্ত্তিকের বিষমতা দূরীভূত হইতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন মৃত্তিকা না মিশাইলে, পোড়াইবার সময় তাপের পরিমাণ ও ধূমনির্গমনের ব্যবস্থা না করিলে অসঙ্গত উৎকট বর্ণ উৎপন্ন হয়। বর্ণজ্ঞানে, বোধ করি, ভারত এখনও প্রাচীন অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে নাই। বিলাতী রঙ্গের বাহুল্যে শীঘ্র এই গুণ লোপ পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। পুতুলে রঙ্গ দিতে টিনের বিলাতী রঙ্গের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। এই হোলী খেলার আবির পর্য্যন্ত বিলাতী রঙ্গে রঞ্জিত দেখিতেছি। হিন্দুর দেশটা দার্শনিকের। দার্শনিক ও কবির চক্ষে বিকট উজ্জ্বল বর্ণ কখনও শোভন বোধ হয় না। মন্দপ্রভ কিন্তু দীপ্তিমান্ বর্ণের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে অসভ্যেরা পারে না। বিকট হাস্যে ও চারু মন্দহাস্যে যেমন প্রভেদ, বস্তুর উপরের ঘোর উজ্জ্বল বর্ণে ও নয়নানন্দকর দমিত বর্ণের সেই প্রভেদ। আশ্চর্য্যের বিষয়, বস্ত্রেই দেখি, মৃদ্‌ভাণ্ডেই দেখি, ডোমের বাঁশের বাসনেই দেখি, অন্য প্রাচীন কারুকার্য্যেই দেখি, সর্ব্বত্র ভারতের প্রাচীন বর্ণচারুতার নিদর্শন পাই। জানে না, ভাবে নাই, প্রকৃত শিল্পীর হাতে বিশ্রী আকার বাহির হয় না, বিশ্রী বর্ণের সমাবেশ ঘটে না। জন্মকবির ন্যায় প্রকৃত শিল্পী অবশ্য দুর্লভ; কিন্তু জাতিগত ব্যবসায়গুণে শিল্পীর পুত্রপৌত্রাদি সে গুণের অল্পাধিক অধিকারী হইয়া পড়ে।

মৃদ্‌ভাণ্ডে লতাপাতা ফুল জীব জন্তু মানুষ প্রভৃতির মূর্ত্তি আঁকিয়া তুলিয়া খুদিয়া অলঙ্কারের চেষ্টা ইতিহাসাতীত কাল হইতে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। যখন কুলালচক্র উদ্ভাবিত হয় নাই, হাতে গড়া হাঁড়ি কুঁড়ি

থুরীতেই মানবজাতি তৃপ্ত হইত, তখনও অলঙ্কারচেষ্টা ছিল। মার্ত্তিকের দেহে মৃদ্‌বিন্দুসমূহ ঋজু ও ভগ্ন রেখায় শোভা পাইত। এই প্রকার অলঙ্কার আজিও বঙ্গ ও ওড়িশায় একমাত্র অলঙ্কার রহিয়াছে। প্রভেদের মধ্যে আদিম মানুষ বক্র ও তরঙ্গ রেখার সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারে নাই, আমাদের কুম্ভকার তরঙ্গরেখা প্রচুর ব্যবহার করে। ছুরী দিয়া সারি সারি রেখা কাটিয়া, কখনও বা সেই রেখাগুলি খড়িমাটীতে পূর্ণ করিয়া শোভাবৃদ্ধি করে। যাহাই করুক, এ বিষয়ে বঙ্গদেশ ও ওড়িশা অত্যন্ত হীন অবস্থায় আছে। পুটের ব্যবহার না থাকাতে এরূপ অলঙ্কারপ্রয়োগের সুবিধা তত নাই। একরঙ্গা লতাপাতার জীবজন্তুর মূর্ত্তি মাটীর ভাঁড়ে করিতে গেলে কাজ দ্রুত হয় না, অধিকন্তু ভালও দেখায় না। এ জন্য যে সকল জাতির মধ্যে পুটল মার্ত্তিক ছিল বা আছে, তাহাদেরই মধ্যে অলঙ্কারপ্রয়াস অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে প্রাচীন গ্রীক জাতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। এমন বিষয়সমাবেশ, মূর্ত্তির এমন স্থিরতা, এমন মাধুর্য্য, এমন স্বাভাবিকত্ব কেবল গ্রীক জাতিরই মনে উদিত হইতে পারিত। বলা বাহুল্য, মাটীতে সূক্ষ্ম চিত্রাঙ্কণ নিষ্ফল। এই সামান্য নিয়ম ভুলিয়া গিয়া গ্রীশের অনুকরণলালসায় জর্ম্মাণ ও ইংরাজ কুম্ভকার চীনের বাসনে এত অনুচিত সূক্ষ্ম চিত্রের আড়ম্বর করিয়াছিল যে, তাহারা মাটী ও সোনা রূপা, মাটী ও পটকারের পট এক মনে করিয়াছিল। এখন এই বৃথা প্রয়াস ত্যক্ত হইলেও রাসায়নিকদত্ত বহুবিধ নূতন রঙ্গের মৃদু পুটের লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছে না। মার্ত্তিকের গায়ে চিত্র আঁকিয়া রঙ্গ দিয়া পোড়াইয়া তাহাকে কাচল করিতে পরিশ্রম ও ব্যয় অধিক হয়। তৎপরিবর্ত্তে মার্ত্তিক প্রথমে পুটল করিয়া তদুপরি অল্পতাপসাধ্য রঞ্জিত পুটলেপ দ্বারা চিত্রকার্য্য করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, ভিতরের পুটের মত উপরের পুট কঠিন হয় না, ঘষাঘষিতে চিত্রের বর্ণও যায়, মূর্ত্তিও যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সস্তার বাজারে কুমরের চাকার বদলে যেমন ছাঁচের চলন বাড়িয়াছে, তেমনই কুম্ভকারবিদ্যার অন্যান্য অঙ্গের অবনতি ঘটিয়াছে। ছাঁচ সহস্র উত্তম হইলেও প্রাণশূন্য মূর্ত্তি প্রসব করে, কিন্তু তাহাতে শিল্পীর জীবন্ত পরিবর্ত্তনশীল ভাব প্রবেশ করিতে পারে না। কুমারের চাঁচনীর এক আঁচড়ে, চিত্রকারের তূলির এক টানে যে ভাব প্রকাশিত হয়, তাহা নির্জীব ছাঁচে সম্ভবে না।

আর একটি কথা বলিয়া এই সংক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ আলোচনার শেষ করা যাইতেছে। কথাটি প্রাচীন মিশরের। কুমারের চাকায়, তাহাতে হাঁড়ি কুঁড়ি গড়িবার ধারায়, পোড়াইবার পোয়ানে, প্রাচীন মিশরের সহিত ভারতের সাদৃশ্য দেখিতে পাই। ইতিহাসে দেখিতে পাই, আচার ব্যবহারে, পূজা পার্ব্বণে, জ্যোতিষে, ধর্ম্মে প্রাচীন মিশরবাসীর সহিত আমাদের পূজ্যপাদ আর্য্যগণের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। এমন কি, উভয়কে একদেশবাসীর দুই শাখা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রাচীন মিশর কাচল ও পুটল বাসন করিতে পারিত। কাচল করিতে সীস ধাতু দিত না, এবং পুটল কাজ নীল হরিৎ পিঙ্গলাদি নানাবর্ণ করিতে পারিত। অলঙ্কারে কত প্রকার জীবজন্তু মানুষের মূর্ত্তি শোভা পাইত। কিন্তু এ দেশে যদিও কাচল ও পুটল কাজ বহুকাল হইতে আছে, তথাপি ইহার তেমন চলন দেখিতে পাই না। এই প্রকার কাজ প্রদেশবিশেষে আবদ্ধ। অন্ততঃ উহার জন্য এ দেশ প্রসিদ্ধ নহে।

আর একটি কথা তুলিব কি? কলিকাতার রাধাবাজারে যাই, কেবল বিলাতী বাসনে, বিলাতী পুতুলে বড় বড় দোকান পরিপূর্ণ দেখি। মাদ্রাজ ও বম্বে, রাজপুতানা ও পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, এমন কি, কৃষ্ণনগরেরও পুতুল দেখিতে পাই না। কলিকাতার বাজারে কোথায় পাওয়া যায়, এবং আদৌ পাওয়া যায় কি না, জানি না। বঙ্গদেশে কাচল ও পুটল করিবার উপাদান নাই, কিন্তু রেল আছে। আর একটি আছে। বঙ্গদেশে বিদ্বান্ আছে, কিন্তু ব্যবসায়বিদ্বান্ নাই। কালে অন্যান্য ব্যবসায়ের যে অবস্থা হইয়াছে, কুম্ভকারের ব্যবসায়ের উন্নতি না হইলে তাহারও সেই অবস্থা হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সেকালের অন্নকষ্ট।

বর্ত্তমানে দেশব্যাপী স্থায়ী দুর্ভিক্ষ লক্ষ্য করিয়া অতীতের দিকে ফিরিয়া চাহিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। (১) জেয়াউদ্দীন্ বারণী প্রণীত তারিখ-ই-ফিরোজ-

শাহী ইতিহাসে ভারতে মুসলমান অধিকারকালের প্রথম দুর্ভিক্ষ সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। এই সময়ে খিলিজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা জেলালুদ্দীন ফিরোজ শা দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। সমসাময়িক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, সিদ্ধি মৌলা নামক জনৈক সাধু দিল্লীতে আসিয়া অনেক লোককে স্বীয় শিষ্য ভাবে গ্রহণ আরম্ভ করেন। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও নগরের প্রধান কাজিও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনায় রাজনৈতিক বিপ্লবের আশঙ্কা করিয়া জেলালুদ্দীন সন্ন্যাসীকে নিহত করেন। অতঃপর 'কৃষ্ণবর্ণ প্রলয় পবনে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল ; (ইহা পশ্চিমাঞ্চলের 'লু' ঝড় হইতে পারে) দিল্লী ও শিবালিক (উত্তর দোয়াব) প্রদেশে এ বর্ষে বিন্দুপাতও হইল না। দ্রব্যাদি বিষম মহার্ঘ্য হইয়া উঠিল ; সাধারণ শস্য প্রতি সের এক জিতাল মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল (২) দুর্ভিক্ষসময়ে দোয়াব্ অঞ্চলের হিন্দু প্রজাবর্গ দলে দলে দিল্লী আগমন করিল। সুলতান ও নগরবাসী ধনাঢ্য লোকে অকাতরে দান করিয়াও দুর্ভিক্ষনিবারণে সক্ষম হইলেন না। অনাহারক্লিষ্ট অনেকে পরস্পরের হাত ধরিয়া যমুনা-সলিলে প্রাণবিসর্জ্জন করিল। পরবর্ষে অভূতপূর্ব্ব বারিবর্ষণ হইয়া গেলে দুর্ভিক্ষের অবসান হইল।'

এই সঙ্গে একালের বাজার-দর বিবেচ্য। বারণীর গ্রন্থেই নির্দ্দিষ্ট আছে, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বাদশাহ আলাউদ্দীন্ সেনাবিভাগের ব্যয়সংক্ষেপ উদ্দেশ্যে রাজ্যমধ্যে শস্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া এক অনুশাসনপত্র প্রচারিত করেন। নিম্নে এই মূল্যতালিকা প্রদত্ত হইতেছে :—

গম	একমণ	৭½ জিতাল্
যব	„	৪
শালি (ধান্য বা চাউল ?)	„	৫

অঞ্চলের অস্থায়ী ডেপুটী কমিশনর সিভিলিয়ান কাপ্তেন উল্‌সলী হেগ্, বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ এবং তন্নিবারণোপায়সমূহের সহিত তুলনায় সমালোচনার উদ্দেশ্যে মুসলমান অধিকারকালে ভারতের ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষের এক বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। সাহেব মহোদয় এই সঙ্গে সেকালের 'সুভিক্ষে'র কথা নির্দ্দেশ করেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাসের জন্য বর্ত্তমান লেখক এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহারই একাংশ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল।

(২) জিতাল বর্ত্তমান পয়সার মত। ফেরেস্তার নির্দ্দেশ মত ৫০ জিতালে এক তঙ্কা হইত; মতান্তরে ইহার ওজন ১¼ তোলা। See, Thomas,—Pathan Kings. P. 159.

মাষ	এক মণ	৫
নাখুদ্ (বুট)	”	৫
মটর	”	৩
লবণ	”	২
চিনি	এক সের	১ ১/২
গুড়	”	১/৩
চর্ব্বি বা ঘৃত (১)	২ ১/২ সের	১
তৈল	৩	১

বাদশাহ যথেচ্ছাচারের অব্যাহত ক্ষমতায় এই বাজার দর স্থির রাখিয়াছিলেন স্বীকার করিয়া দ্রব্যাদির তাৎকালিক মূল্য ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ছিল বলিলে বিশেষ প্রত্যবায় নাই। সমসাময়িক অপক্ষপাতী ঐতিহাসিক বারণী প্রজাপীড়ন বা অত্যাচার করিয়া এই দর স্থায়ী রাখিবার কথা বলেন না; অন্যত্র আলাউদ্দীনের দোষোল্লেখেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। আলার সুদীর্ঘ রাজ্যকালে দুর্ভিক্ষ হয় নাই। এখানে স্মরণ রাখা উচিত, দক্ষিণাপথের লুণ্ঠিত ভাণ্ডারের কৃপায় এ সময়ে দিল্লীদরবারে টাকার মূল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া পড়িয়াছিল। মহম্মদ তোগলকের রাজ্যকালে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ দর্শন দিয়াছিল। বিকৃতমস্তিষ্ক বাদশাহের অসঙ্গত করবৃদ্ধি, অকারণ রাজধানীপরিবর্ত্তন, চীন প্রভৃতি আক্রমণের বৃথা প্রয়াস, তাম্রমুদ্রার প্রচার এবং অবশেষে মূল্য আদির প্রতিগ্রহ ইত্যাদি খাম্‌খেয়ালীতে রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল। তথাপি সাত বৎসর ধরিয়া পশ্চিম ভারতে ক্রমাগত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে মহম্মদ তোগলক মুক্তহস্তে অর্থদান ও তাগাবী সাহায্য বিতরণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর তৈমুরের ভারত আক্রমণ ও পরবর্ত্তী বিপ্লবে ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অন্নকষ্ট ও মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর অন্নকষ্টকে সাধারণ দুর্ভিক্ষের অন্তর্ভুক্ত করিলে সমীচীন হয় না। ক্রমান্বয়ে বিপ্লবের পর যৎকালে শূরবংশীয় মহম্মদ আদিল্ শাহের দুর্ব্বল হস্তে রাজদণ্ড পতিত হয়, সেই সময়ে দিল্লী ও আগরা প্রদেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল (৯৬২ হিঃ—১৫৫৪ খৃঃ)। বাদাওনী লিখিয়াছেন, “এক সের জোয়ারীর

---

(১) [illegible]

মূল্য দুই অৰ্দ্ধ তঙ্কা (১) হইয়া উঠে—সময়ে তাহাও পাওয়া যায় নাই। অবস্থাপন্ন লোকেরও (মুসলমান) দশ বিশ জন এক এক স্থানে মরিয়া পড়িয়াছিল ; কবর দিবার লোক ছিল না। হিন্দুগণেরও ঐ দুর্দ্দশা ; অনেকে বাবলার ফল, লতা পাতা, এমন কি, মৃত বা নিহত জন্তুর চৰ্ম্ম ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতেছিল। কিয়ৎকাল পরে হাত পা ফুলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই কয় পৃষ্ঠার লেখক পাপ চক্ষে এ সময়ে মানুষকে মানুষ খাইতে দেখিয়াছেন। দুই বৎসর এইরূপ দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতায় সোনার দেশ ছারখার হইয়াছে ; কৃষক ও শ্রমজীবী লোকের বিলোপসাধন হইয়াছে।”

৯৮২ হিঃ অব্দে (১৫৭৪—৭৫ খৃঃ) আকবর বাদশাহের রাজ্যকালে গুজরাট প্রদেশে একবার দুর্ভিক্ষ হয়। অনেকে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। এক মণ শস্য ১২০ দাম (৩ টাকা) মূল্যে উঠিয়াছিল। চারি মাস ধরিয়া অশ্বগবাদি পশুর আহাৰ্য্য মিলে নাই। একালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আর কোনও দুর্ভিক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায় না। আকবরের সময়ে দেশের অবস্থাজ্ঞাপন জন্য আইন-আকবরীর নির্দ্দেশমত সাধারণের ব্যবহার্য্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্যতালিকা প্রদত্ত হইল। মনে রাখা কৰ্ত্তব্য, ইহা রাজধানীর (দিল্লীর) বাজার-দর।

গম	এক মণ	১২ দাম	৩/১০ টাকা	।০ ৲১৬ গণ্ডা
যব	”	৮ ”	১/৫ ”	৶ ৪ ”
চাউল	”	” ”	২ টাকা হইতে আট আনা	
কলাই দাল	”	১৬ দাম	২/৫ টা	।৵৮
মুগের দাল	”	১৮ ”	৯/২০	।৶৪
বুটের দাল	”	১৬½ ”	৩৩/৮০	।৵১২
মটর দাল	”	১২ ”	৩/১০	।০ ৲১৬
ময়দা	”	২২—২৫	—	।।৲১০—।৵
বেসম	”	২২	—	।।৲১০
তৈল	”	৮০	—	২৲ টাকা
ঘৃত	”	১০৫	—	২।।৵০
মেষমাংস	”	১।।৵	গোলমরিচ এক সের ১৭ দাম	

(১) এই তঙ্কা 'দাম' মনে হয়। ৪০ দাম = এক টাকা।

ছাগমাংস	„	১।✓০	আদা	„	২১/২ „
দুগ্ধ	„	।।০✓০			১০ „
দধি	„	।৶৪	জাফ্রান		।০
চিনি	„	৩৶৪			
গুড়	„	১।০✓৮			

তরকারি ও ফলমূল এইরূপই সুলভ ছিল। সাধারণের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যও খাদ্যের অনুপাতে ছিল, বলাই বাহুল্য। নিম্নে বস্ত্রাদির বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইল।

তসর কাপড়	এক থান	১/৪ হইতে ২ টাকা
বাফ্তা	„	১১/২ টা হইতে ৫ মোহর
উৎকৃষ্ট মলমল	„	৪ টাকা
ঢাকাই মস্লিন্	„	৩ টা হইতে ১৫ মোহর
সুতী কাপড়	„	১/২ টা হইতে ২৲
পট্টু	„	১৲ হইতে ১০৲
কম্বল	এক থান	চারি আনা হইতে ২৲ টাকা

সাধারণ তসর বা সুতী কাপড় দিল্লী অঞ্চল হইতে বাঙ্গালায় অধিক সুলভ ছিল, এ কথার উল্লেখ সম্ভবতঃ অনাবশ্যক। এই সময়ে বিবাহের বধূর নিমিত্ত খুঞা শাটী (ক্ষৌম) ৪১/২ গণ্ডায় পাওয়া গিয়াছে। (১) আকবর বাদশাহের সুদীর্ঘ রামরাজত্বে আর অন্নকষ্টের কথা শুনা যায় না। এ সময়ের অবস্থা বিশেষ অনুধাবন করিতে হইলে লোকের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সূত্রধর—দৈনিক	৭ দাম	হইতে	২ দাম
আরাকোশী (কাঠ করাতী)	...	...	২ দাম
ইষ্টকনির্ম্মাতা ...	৩১/২	হইতে	৩ দাম
সুর্কি কোটা—৮ মণে ...	...	...	১১/২ দাম
বাঁশ ডোম দৈনিক ...	...	...	২ দাম
ভিস্তীওয়ালা ...	৩ হইতে ২ দাম (৪০ দাম = ১ টাকা)		

এক্ষণে সৈন্যবিভাগের বেতন দেখুন, দশ হাজারী সেনাপতি বার্ষিক

(১) মাধবাচার্য্যের চণ্ডী—দীনেশচন্দ্র সেন।

ষষ্টি সহস্র, ৮ হাজারী ৫০ সহস্র, তিন হাজারী ১৬।১৭ হাজার ও এক হাজারী সেনানী ৮ হাজার টাকা বেতন পাইতেন। সাধারণ অশ্বারোহী সৈনিক ৩০৲ হইতে ১২৲ টাকা পদাতিক ৫০০ হইতে ২৪০ দাম, এবং দ্বারবান ২০০ হইতে ১২০ দাম মাসিক বেতন পাইত।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু তাঁহার বর্ত্তমান হিন্দু সভ্যতার উৎকৃষ্ট ইতিহাসে দেখাইয়াছেন, পশ্চিমাঞ্চলের ডালরুটীভোজী এক জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় মাসিক খাদ্য এ কালে নিম্নলিখিত রূপে সংগৃহীত হইতে পারিত।

আটা	২৫ সের	মূল্য	৩ আনা	৯ পা
দাল	৫ "	"	"	৭½ পা
ঘৃত	১ "	"	১ "	½ "
লবণ	১ "	"	"	২¼ পা
		মোট	৫ আ	৭¼ পা

অন্যান্য আবশ্যক সামগ্রীর নিমিত্ত কিঞ্চিৎ হস্তে রাখিয়াও এই অবস্থার স্ত্রী ও তিনটি শিশু সহ এক পরিবারের পাঁচ সিকায় মাস চলিতে পারিত। অতএব এক জন ভিস্তীওয়ালারও এরূপে মাসিক আট আনা পয়সা অন্য সংসারখরচের নিমিত্ত থাকিয়া যাইত। এ কালের আট আনা পয়সার ক্রয়ক্ষমতা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মূল্যতালিকা হইতেই সবিশেষ উপলব্ধ হইবে। আদর্শ নরপতি আকবর শাহের সুদীর্ঘ রাজ্যকালে অন্য দুর্ভিক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায় না। জাহাঙ্গীরের সময়েও কোনরূপ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় নাই।

বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে বালাঘাট ও দৌলতাবাদ প্রদেশে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন গুজরাট ও খান্দেশ প্রভৃতি অঞ্চল লইয়া এক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় ১০৪০ হিঃ (১৬৩০—৩১ খৃঃ)। মোগল রাজত্বে এই প্রধান অন্নকষ্ট; ইহার বর্ষব্যাপী প্রকোপে দক্ষিণপশ্চিমের উপকূলভাগ বিত্রস্ত হইয়াছিল, একখানি রুটীর জন্য জীবনবিক্রয়ে লোকে উদ্যত, কিন্তু ক্রেতা কেহই ছিল না। কসাইগণ ছাগমাংস বলিয়া কুকুরের মাংস বিক্রয় আরম্ভ করে; ময়দায় মৃতমনুষ্যের হাড়ের গুঁড়া মিশাইয়া দেয়। অপরাধিগণ শাস্তি পাইলেও দুর্ভিক্ষের প্রতীকার হয় নাই। আদিলশাহী দুর্ভিক্ষের মত এবারও লোকে নরমাংসে উদরপূর্ত্তি করিয়াছিল। "লোকে সন্তানের স্নেহ অপেক্ষা তাহার মাংসই অধিক সুস্বাদু মনে করিয়াছিল"—

লিখিয়া সমসাময়িক ঐতিহাসিক এই দুর্ভিক্ষের ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কত কত উর্ব্বর ভূমিখণ্ড জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। মুসলমান লেখকের বিশ্বাস, এরূপ দুর্ভিক্ষ "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি"—ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ দুর্ভিক্ষ বলিয়া পরিচিত রহিবে, তিনি এইরূপ ভবিষ্যৎবাণীও করিয়াছেন। এই দুর্ভিক্ষপ্রশমনের যে উদ্যম হইয়াছিল, তাহা সেকালের ব্যবস্থায় যথেষ্ট মনে হইলেও, প্রতিকার কিছুই হইয়া উঠে নাই। বাদশাহ এ সময়ে দেশবিজয়কামনায় দক্ষিণাপথে ছিলেন। নানা স্থানে অন্নসত্র স্থাপন করিয়া রুটী ও ঝোল বিতরণ এবং প্রতি মঙ্গলবার (বাদশাহের জন্মদিনে) বুর্হান্‌পুর বাদশাহ-শিবিরে পাঁচ হাজার ও আমেদাবাদে আড়াই হাজার টাকা দান চলিয়াছিল। পাঁচ মাসে এইরূপে অর্থাদি বিতরিত হইলেও দুর্ভিক্ষের অবসান হয় নাই; প্রধান দুই নগরের এইরূপ দান দূরে জনসাধারণের নিকট পঁহুছে নাই। অতঃপর বাদশাহ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া চল্লিশে এক টাকা হিসাবে দুই বৎসরের রাজস্ব রেহাই দেন। পাদশা-নামা গ্রন্থকারের মতে সমগ্র রাজত্বের রাজকরের $\frac{১}{১১}$ অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হয় (সমগ্র রাজকর তাঁহার মতে প্রায় কুড়ি কোটি টাকা)।

আরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ রাজ্যকালে কোনও অন্নকষ্টের উল্লেখ নাই। যুদ্ধকার্য্য ও বিপ্লবে সাময়িক কৃচ্ছ্রতা ধর্ত্তব্য নহে। শাহজাহানের দুর্ভিক্ষ হইতে সহরৎ-ই-আম (পূর্ত্ত ও সাধারণহিত) বিভাগে এই উদ্দেশ্যে প্রধান প্রধান স্থানে শস্য মজুদ রাখিবার ব্যবস্থা কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইতেছিল। দক্ষিণাপথের ইতিহাসেও সাময়িক দুর্ভিক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গদেশে একালে কোনও অন্নকষ্টেরই প্রমাণ নাই। একালের বাঙ্গালার অবস্থা অনুধাবন করিতে হইলে সুবিখ্যাত পরিব্রাজক বার্ণিয়ারের বিবরণী লক্ষ্য করিতে হইবে। বার্ণিয়ার লিখিয়াছেন, (১৬৫৬—৫৮ খৃঃ) "চিরকাল মিশর দেশই পৃথিবীর মধ্যে সমধিক উর্ব্বর ও শস্যশালী প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু আমি দুইবার বাঙ্গালায় গিয়া স্বচক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে বঙ্গদেশেরই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দাবী। এখানে তণ্ডুল এত অধিকপরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, নিকটবর্ত্তী প্রদেশের কথা দূরে থাকুক, বহুপরবর্ত্তী নানা দেশের লোক এই অন্নে পালিত হয়। করমণ্ডল উপকূলে মছলীপত্তন প্রভৃতি বন্দরে এবং সিংহল মালদ্বীপ আদি নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে এই চাউল প্রেরিত হয়। চিনি এখানে যথেষ্টপরিমাণে

উৎপন্ন হয়, এবং দক্ষিণাপথে ও আরব, মিসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হয়; নানারূপ সুখাদ্য ফল ও মিষ্টান্নের জন্য বঙ্গদেশ সুবিখ্যাত। লোকে অন্নভোজী বলিয়া গোধূমের চাষ অল্প; মিশরের মত না হইলেও গোধূম এখানে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। চাউল, ঘৃত ও নানাপ্রকার তরকারী এখানে অতি তুচ্ছ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এক টাকায় বিংশত্যধিক উৎকৃষ্ট পক্ষী পাওয়া যায়; ছাগল ও মেষ প্রচুর; শূকর এতই অপর্য্যাপ্ত যে, পর্ত্তুগীজেরা এই মাংস খাইয়াই প্রাণধারণ করে। নানারূপ মৎস্য অপর্য্যাপ্ত মিলে। এক কথায়, লোকের জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ, এই জন্যই পর্ত্তুগীজগণ স্থায়িভাবে এ দেশে বাস করিয়াছে।"

পরবর্ত্তী কালে বঙ্গের অবস্থার যে ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা এই :—বাদশাহ আরঙ্গজেবের রাজ্যকালে অন্বর্থনামা শায়েস্তা খাঁর সুশাসনে কিয়ৎ কাল বঙ্গদেশে টাকায় আট মণ চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। নবাব শায়েস্তা খাঁ এই কারণে মহোল্লাসে ঢাকার পূর্ব্ব দিকে একটি তোরণদ্বার নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার শিরোভাগে দিব্য দিয়া লিখিয়া যান, যে রাজার রাজ্যকালে পুনরায় এইরূপ সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি না পাওয়া যাইবে, তিনি যেন ঐ দ্বার উন্মোচন না করেন। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবাব মুর্শিদ কুলীখাঁর রাজত্বে চাউল সাধারণতঃ টাকায় ৫।৬ মণ ছিল, অন্যান্য দ্রব্যও সেই পরিমাণে সুলভ ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। মুসলমান ঐতিহাসিক এ জন্যই সানন্দে লিখিয়াছেন, (১) 'এমন কি, মাসে এক টাকা আয় হইলে এক জন লোকে দু'বেলা উদর পূর্ত্তি করিয়া কালিয়া পোলাও খাইতে পারিত। দরিদ্র ফকীরগণ একালে সুখে সচ্ছন্দে ভগবানের নাম করিয়া কালযাপন করিত।' ইহার কিয়ৎকাল পরেই মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর নামে যশোবন্ত রায় (২) ঢাকায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তাঁহার শাসনগুণে অচিরে পূর্ব্ববঙ্গে কৃষিবাণিজ্যাদির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। এই সময়ে পুনরায় ঢাকা প্রদেশে টাকায় আট মণ চাউল হওয়ায় তিনি মহাসমারোহে উল্লিখিত আবদ্ধ তোরণদ্বার মুক্ত করেন।

এই কালের ইংরেজ কোম্পানীর হিসাবের কাগজপত্রে (৩) দৃষ্ট হয়,

(১) রিয়াজ উস্ সালাতীন্ (অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের তারিখ বাঙ্গালা অবলম্বনে)।

(২) স্বর্গগত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ইঁহাকে মেদিনীপুর কর্ণগড়ের সদ্গোপবংশীয় যশোবন্তের সহিত অভিন্ন ব্যক্তি বলেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য অন্যত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩) Wilson's Early Annals and Records—vol, I.

১৭১০ খৃষ্টাব্দে একবার কলিকাতা অঞ্চলে লোকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে চাউলের দর টাকায় এক মণ দশ সের হইয়া পড়ে। এ সময়ে কোম্পানীর বাঙ্গালী শিকদারের বেতন মাসিক ৪৲ টাকা ছিল। তহশীল্‌দারের তিন টাকা হইতে ২½ টাকা ও পাইকের ২৲ টাকা ছিল। তহশীলদার বা পদাতিক শ্রেণীর উপরি আয় ছিল, স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। পাঁচ টাকার গ্রাম্য গোমস্তার বাটীতে দোল দুর্গোৎসব হইত। সাধারণ লোকের দিনমজুরী তিন শতাব্দী ধরিয়া দৈনিক এক আনা ছিল, দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্গীর হাঙ্গামায় পশ্চিমবঙ্গ বিধ্বস্ত হইলেও পূর্ব্বদেশে লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। বর্গীর হাঙ্গামায় রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলে অন্নকষ্ট দর্শন দিয়াছিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ২০ শে নবেম্বর কলিকাতার কোম্পানীর প্রধান তহশীলদার গোবিন্দরাম মিত্র রিপোর্ট করিয়াছেন, 'ষাট বৎসর ধরিয়া যেরূপ অন্নকষ্ট ঘটে নাই—বর্ত্তমানে দুই বৎসর ধরিয়া তাহাই উপস্থিত হওয়ায় কোম্পানীর মাশুলখানায় অল্প জমা ধার্য্য করিতে হইয়াছে। (৪) তাঁহার নির্দ্দেশ মতে ১৭৫১ ও ৫২ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে চাউল ৩২ ও ১৬ সের, অন্য শস্য এক মণ ও ১২ সের, এবং তৈল ৮ ও ৩¾ সের হইয়াছিল। কলিকাতা কাউন্সিলের মন্তব্যপত্রে দৃষ্ট হয়, ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে কার্পাস দুই টাকা হইতে আড়াই টাকা মণ এবং চাউল দুই মণ বিশ সের হইতে তিন মণ করিয়া বিক্রীত হইত; কিন্তু ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে সকল সামগ্রীর মূল্য শতকরা ত্রিশ টাকা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সরু চাউল ৩২½ ও মোট এক মণ দর হইল, এবং প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় ভবিষ্যৎ ভরসা বিশেষ সন্তোষজনক হইয়া উঠিল। এ সময়ে খাজাঞ্চী তহশীলদারের মাসিক বেতন পাঁচ টাকায় উঠিয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বহরমপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট নির্ম্মাণের প্রথম প্রস্তাবে জঙ্গল পরিষ্কার ও মাটী কাটিবার কার্য্যে কুলীগণকে দিবার নিমিত্ত 'আনা' মুদ্রিত করিবার কল্পনা হইল। ইতিপূর্ব্বে কড়ি দ্বারা এই শ্রেণীর লোকের দৈনিক বেতন দেওয়া হইত; বহুলোকের কার্য্যে কড়ির বিনিয়োগে গোল হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই এই প্রস্তাব। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের ফোর্ট উইলিয়ম নির্ম্মাণে সাধারণ কুলীগণকে মাসিক তিন টাকার অপেক্ষাও অল্প দিতে আরম্ভ করিলে অনেকে কার্য্যত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; সাধারণ কৃষক এ সময়ে মজুরগণকে ইহা অপেক্ষা অধিক দিত।

(৪) Rev. Long's Selections from Bengal Records, P. 38.

নবাবী আমলের শেষাবস্থার বিপ্লবেও বিশেষ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় নাই। ইংরেজ কোম্পানীর দেওয়ানী-গ্রহণের পর ইংরেজ কর্ম্মচারী ও তদনুগত মহম্মদ রেজা খাঁর বর্দ্ধিত রাজকর আদায়ের প্রয়াসে অত্যাচার উৎপীড়নে এবং কিয়ৎপরিমাণে দৈবদুর্ব্বিপাকে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ বঙ্গভূমির এক দেশ উৎসন্ন করে, সেই ছেয়াত্তুরে মন্বন্তরের (বাং ১১৭৬ সন) কথা অনেকের নিকট সুপরিচিত। এই সময় হইতে কতিপয়বর্ষব্যাপী অন্নকষ্ট ও অরাজকতায় বাঙ্গালার অযত্নসঞ্চিত ধনভাণ্ডারের যথেষ্ট ক্ষয় হইয়া যায়। অতঃপর লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশসালা বন্দোবস্তের এবং কিয়ৎপরিমাণে রাজ-পুরুষগণের কৃপাদৃষ্টির ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে কিয়ৎকাল পুনরায় দ্রব্যাদির সুলভতা ও কৃষি শিল্পের উন্নতি লক্ষিত হয়। অশীতি বর্ষ পূর্ব্বের বর্দ্ধমান কাটোয়া অঞ্চলের জমা-খরচে ও প্রাচীন লোকের মুখে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, ঘৃত কাঁচি ৮ সের ও তৈল ১৫ সের করিয়া মিলিত। আশু ধান্যের গ্রাহক হইত না। ত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে লেখক এক ষষ্টিবর্ষবয়স্ক তন্তুবায়কে দেখিয়াছেন। তাহার পূর্ণযৌবনাবস্থায় তাহার পিতা জনৈক কৃষকের গৃহজাত কার্পাসসূত্র দ্বারা আটখানি বস্ত্র প্রস্তুত করে। ইহার মজুরী এক টাকার বিনিময়ে কৃষকরাজ তন্তুবায়ের গৃহ হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে খামারে আশু ধান্য প্রদান করেন। সমস্ত দিন পিতা পুত্রে মস্তকে বহন করিয়া ঐ ধান্যের শেষ না হওয়ায় বৃদ্ধ তন্তুবায় মহাক্রোধে অন্য ধান্য মিশ্রিত করিয়াছে বলিয়া কৃষকের প্রতি অনুযোগ করে। প্রথিত "সব ধান বাইস্ পশুরি" প্রবচনে কাটোয়া অঞ্চলের পরবর্ত্তী কালের শস্যের দর অবগত হওয়া যায়।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনু ও সাক্ষ্যবিষয়িণী ব্যবস্থা।

মৎসমালোচিত রঘুবংশ প্রবন্ধটি লক্ষ্য করিয়া এক জন আইনব্যবসায়ী বন্ধু বলিয়াছেন যে, মনু যখন মিথ্যার প্রশ্রয়দাতা, তখন তাঁহার আদর্শ লইয়া বাড়াবাড়ি করা ভাল হয় নাই। জানি না, এই শ্রেণীর লোক আরও কত আছেন। যাহা হউক, এ বিষয়ে দু চারিটি কথা লিখিলে পাঠকদিগের বিরক্তি না হইতে পারে।

আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, ভৃগুব্যাখ্যাত মনুসংহিতার সাক্ষ্যবিষয়িণী ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করিয়াই মনুকে মিথ্যার প্রশ্রয়দাতা বলা হয়। কথাটা পুরাতন। বিলাতী ব্যবস্থাবিদ্যাবিশারদ বেন্থাম প্রথমতঃ এই কথা লিখিয়াছিলেন ; পরবর্ত্তী লেখকগণ সেই ধুয়াটাই অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। বেন্থাম সংস্কৃত জানিতেন না ; সেই জন্ত তাঁহার উক্তিটিতেও সতর্কতা আছে। তিনি বলিয়াছেন যে, "যদি মনু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা যথাযথ হয়," ইত্যাদি। বাঁশ অপেক্ষা কঞ্চির দৃঢ়তা অধিক বলিয়া, পরবর্ত্তীদিগের লেখায় "যদি"-টুকুর সহিত সাক্ষাৎলাভ হয় না। বেন্থামের কথাগুলি এই,—Of all the religious codes known, the Hindu is the only one, by which, in the very text of it, *if correctly reported*, a license is in any instance expressly given to false testimony delivered on a judicial occasion. etc. etc."—*Bentham's Judicial Evidence.* vol. I. pp. 235—236.

এখন দেখা যাউক যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে মনুসংহিতায় সাক্ষ্যবিষয়িণী ব্যবস্থা কি প্রকার আছে। অষ্টম অধ্যায়ে ৮০ হইতে ১০১ শ্লোক পর্য্যন্ত সাক্ষীকে শপথ দিবার নিয়ম, মিথ্যা সাক্ষ্য বিষয়ের দোষবিচার, এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাহার জন্য দণ্ডবিধি প্রভৃতি বিধিবদ্ধ আছে। সত্য প্রমাণীকৃত করিবার জন্ত এত চেষ্টা যে, কোন্ বিষয়ে কে সাক্ষ্য দিবার পক্ষে উপযোগী, কাহার কথা কি ভাবে প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহা বিশেষভাবে ব্যবস্থাবদ্ধ আছে। এই দেখুন,—

গৃহিণঃ পুত্রিণো মৌলাঃ ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রযোনয়ঃ।
অর্থ্যুক্তাঃ সাক্ষ্যমর্হন্তি ন যে কেচিদনাপদি।

পুনশ্চ,—

আপ্তাঃ সর্ব্বেষু বর্ণেষু কার্য্যাঃ কার্য্যেষু সাক্ষিণঃ।
সর্ব্বধর্ম্মবিদোহলুব্ধা বিপরীতাংস্তু বর্জ্জয়েৎ।

তাহার পর অতিশয় বৃদ্ধ বা বালকাদি বর্জ্জিত করা হইয়াছে, এবং আকস্মিক উপদ্রবে সকল প্রকার লোকের সাক্ষ্যগ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এই স্থলে আবার কথনপ্রণালী প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া সত্য মিথ্যার বিচার করিবার ইঙ্গিত আছে,—

বালবৃদ্ধাতুরাণাঞ্চ সাক্ষ্যেষু বদতাং মৃষা।
জানীয়াদস্থিরাং বাচমুৎসিক্তমনসাং তথা।

এ সকল স্থলে এত সাবধানতা থাকিলেও, অষ্টম অধ্যায়ের ১০৪ শ্লোক লইয়াই চিরকাল সংহিতার প্রতি আক্রমণ চলিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার জন্য লোকে মিথ্যা বলুক, এই ব্যবস্থা নাকি মনু করিয়া গিয়াছেন ; অন্ততঃ ইংরাজী গ্রন্থে ১০৪ শ্লোকটির এইরূপ টীকাই দেখিতে পাই। শ্লোকটায় কিন্তু আছে, "শূদ্রবিট্ক্ষত্রবিপ্রাণাং" ; অথচ এই অর্থ কি করিয়া বাহির হইল, জানি না। যাহা হউক, সকলের জন্য হইলেও মিথ্যার ব্যবস্থা কেন, এ কথা উঠিতে পারে। কিন্তু ঐ শ্লোকের কুল্লূকভট্টকৃত টীকায় দেখিতে পাই, "এতচ্চ প্রমাদস্খলিতা ধর্ম্মবিষয়ত্বে নত্বত্যন্তাধার্ম্মিকে সন্ধিকারস্তেনাদিবিষয়ে।" প্রমাদস্খলিত অবস্থায় বধাদি করিলে একালের ব্যবস্থায় কোন দণ্ড নাই। সেকালেও প্রকারান্তরে সেই প্রকার ব্যবস্থাই ছিল, এইরূপই বুঝিতে হইবে। অন্যান্য সকল শ্লোকের সহিত মিল রাখিয়া ব্যাখ্যা করাই ত নিয়ম। সকল শ্লোকগুলি মিথ্যার বিরোধী, আর একটি শ্লোক আপাতদৃষ্টিতে স্বপক্ষীয়। এরূপ স্থলে কিরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহা একালের আইনব্যবসায়িগণ, Maxwell কৃত Interpretation of Statutes আদর্শ করিয়া লইলেই দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের ব্যাখ্যাই উপযোগী বলিয়া প্রতীত হইবে।

মনুর বিরুদ্ধে আর একটি শ্লোক উদাহৃত হইয়া থাকে, সেটি এই ;—

কামিনীষু বিবাহেষু........................

......................শপথে নাস্তি পাতকম্।

এ স্থলে "মিথ্যা কহিও" বলা হয় নাই ; ব্যবহৃত কথাটি 'নাস্তি পাতকং'। ১১৮ এবং ১১৯ শ্লোকে মিথ্যা সাক্ষ্যের দণ্ডের ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু এ স্থলে নাস্তি পাতকং বলায় রাজদণ্ড হইবে না, ইহাই বুঝিতে হইবে। টীকাকারেরাও এইরূপ বুঝিয়াছেন। যদি কেহ কামপরায়ণচিত্তে স্ত্রীলোকের কাছে কোন অঙ্গীকার করে, তবে তাহার সেই অঙ্গীকার অঙ্গীকারই নহে, টীকাকার এইরূপ বুঝাইতেছেন। এই সভ্য (?) যুগেও সে প্রকার অঙ্গীকারের জন্য কাহাকেও বাধ্য করা যায় কি ? চুক্তি আইনের ২৬ ধারা এবং ২৩ ধারার ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলেই কথাটা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মনুর প্রতি শ্রদ্ধা থাকুক বা নাই থাকুক, অযথা সমালোচনা করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না কি ? এ কালের অভক্তিমান স্বদেশদ্রোহিগণ এইটুকু স্থধু স্মরণ রাখিবেন যে, যাঁহার প্রতি যে প্রকার মান্য করা উচিত,

তাহা না করিলে, আপনাদিগেরই শ্রেয়ঃ বিঘ্নসংকুল হয়। কবি কালিদাস যথার্থই বলিয়াছেন,—

প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আতিথ্য।

১

বাঙ্গালা ১১৭২ সাল। ২৮এ পৌষের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রজনীর অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। যশোহরের তিন চারি ক্রোশ উত্তরে একটি মাঠের মধ্য দিয়া তিনটি লোক হন্ হন্ করিয়া দক্ষিণ মুখে যাইতেছে। সহসা তাহারা সম্মুখে কিছু দূরে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইল। লোক তিনটি মাঠের পথ ছাড়িয়া উর্দ্ধশ্বাসে পশ্চিমদিকের গ্রামে প্রবেশ করিল। ইচ্ছা, রাত্রির জন্য গ্রামের কোনও বাটীতে আশ্রয় লইবে।

এই তিনটি লোকের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ; নাম চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী। পশ্চাতের দুইটি লোক হিন্দুস্থানী; নাম রামশরণ ও রঘুবীর সিং। ইহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়াই প্রথমতঃ কয়েকটি দরিদ্র মুসলমানের বাড়ী দেখিতে পাইল, এবং এক বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া চণ্ডীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিকটে কোন হিন্দুর বাড়ী আছে কি না?" এক জন মুসলমান উত্তর করিল, "সম্মুখে কিছু দূর গেলেই একটি সঙ্গতিপন্ন বণিকের বাড়ী পাওয়া যাইবে।" চণ্ডীচরণের অনুরোধে মুসলমানটি তাহাদিগকে মধু বণিকের বাড়ী দেখাইয়া দিতে সম্মত হইল। বণিকের নাম মধু। গ্রামে সে মধু বেণে বলিয়া পরিচিত।

পথে যাইতে যাইতে মুসলমান কহিল, "আপনাদিগকে লইয়া চলিলাম বটে, কিন্তু মধু বেণের বাড়ীতে যে আপনাদিগকে যায়গা দিবে, তার তত ভরসা নাই। বণিকের পয়সা খুব আছে। দু পাঁচ গ্রামের মধ্যে ওর টাকা না ধারে, এমন লোক কম। কিন্তু খরচের হাত একবারেই ছোট। ভগবান বসুর বাড়ী গেলে আপনারা নিশ্চয়ই যায়গা পেতেন, কিন্তু সে আরও খানিকটা পশ্চিমে যেতে হয়। তাঁর পয়সা বেশী না থাক, দু চারি জন লোক গেলে তা

ফেরত যাবার কথা নাই।” চণ্ডীচরণ কহিলেন, “আমরা একটু থাক্‌বার যায়গা পেলেই যথেষ্ট মনে করিব।” মুসলমান তাহাদিগকে মধুর দরজায় পহুঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

চণ্ডীচরণ দেখিলেন, মধুর বাড়ীটি ক্ষুদ্র নহে। বাহিরে কাঁচা ঘর, ভিতরে একতলা দালান। বাহিরের ঘরে একটি মাটির প্রদীপ জ্বলিতেছে। গৃহস্বামী একটি চণ্ডাল চাকরের সঙ্গে তথায় বসিয়া আছেন। তাহাদের মধ্যে কথা হইতেছে। মধুর বাড়ীতে কিছু দেশী তামাক জন্মিয়াছিল, তিনি হুকুম দিয়াছেন, ঐ তামাক মাখিয়া বাড়ীর খরচ চলিবে। চাকরটি সেই তামাক মাখিয়া কর্ত্তাকে নমুনা দেখাইতেছে, এবং বলিতেছে, কেনা তামাক কিছু না মিশাইলে এ খাওয়া যাইবে না। মধু বলিতেছেন, “আমি খেতে পারি, আর তোর মুখে রোচে না?”

চণ্ডীচরণ এত কথা শুনিতে পান নাই। মধু যখন গরম হইয়া ভৃত্যকে তিরস্কার করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ব্রাহ্মণ এবং তাহার সঙ্গিদ্বয় বণিকের বাহিরের ঘরের বারাণ্ডায় উঠিলেন। মধু তাহাদের পদশব্দ পাইয়া “কে কে?” বলিয়া রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিল।

চণ্ডীচরণ কহিলেন, “ব্রাহ্মণ, রাত্রে থাক্‌বার জন্য একটু স্থান চাই।”

“এখানে থাক্‌বার স্থান হবে না।” মধুর স্বর আরও কর্কশ হইয়া উঠিল।

চণ্ডী। এ রাত্রে যাই কোথা? আমরা যাচ্ছিলাম যশোরে। ১৬ ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এসেছি। আজই যাব ঠিক করেছিলাম। পথে বাঘের ডাক শুনে রাস্তা ছেড়ে গ্রামে ঢুকেছি। আমরা কেবল একটু থাক্‌বার যায়গা চাই।

মধু। যায়গা টায়গা হবে না। অন্যত্র দেখুন।

চ। এখন কোথায় যাই? গ্রামের কা’কেও চিনি না। পথে বের হয়ে বাঘের হাতে মর্‌ব?

ম। ঠাকুর! আর কত বার বল্‌ব?

মধু এই সময়ে চণ্ডীচরণের সঙ্গী দুটির প্রতি এক বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

চণ্ডীচরণ কহিলেন, “ইহারা হিন্দুস্থানী। আমরা মনিবের চাকর। লাটের কিস্তির খাজনা দিতে যাচ্ছি। এদের কাছে হাজার বার শ’ টাকা আছে।”

ম। টাকা আপনার ন' শ' পঞ্চাশ থাক্, আর দু' হাজার থাক্,—সঙ্গেই আছে। আমার এখানে থাকা হচ্ছে না।

চ। আপনার ঘর দোর আছে—ঘরে লক্ষ্মী আছেন। তিনটি অতিথিকে যায়গা দিতে এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন? আমরা এই বাহিরের ঘরটায় পড়ে থাক্‌ব।

ম। কড়া কথা না শুন্‌লে আপনারা নড়্‌বেন না। বল্‌ছি যে, বিদেশী লোককে আমি কখনও যায়গা দিই না।

চ। স্বদেশী লোক হ'লে আর এমন ভাবে আস্‌বে কেন?

ম। আপনার কথার ত বেশ বাঁধুনী আছে।

চণ্ডীচরণ বেগতিক দেখিয়া কহিলেন, "আমরা কোথায় গেলে রাত্রের জন্যে একটু যায়গা পাই বল্‌তে পারেন?"

প্রশ্ন করিবার সময়ে চণ্ডীচরণ মধুর ভৃত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

মধু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ভৃত্যটি কহিল, "মশাই,ভগবান বোসের বাড়ীতে যান, নিশ্চয় যায়গা পাবেন।

চ। পথ ত চিনি না, আর এই রাত্রি।

মধুর চাকর মহেশ বলিল, "চলুন,আমি আপনাদিগকে দিয়া আসিতেছি।"

মধু এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না।

পথে বাহির হইয়া চাকরটি কহিল, "এমন বাড়ীতে মানুষ আসে? কি করিব? কতকগুলি টাকা ধারি। সুদের সুদ তার সুদ দিতে দিতে শোধ হয় না। গায়ে খেটে শোধ কর্‌ছি। এমন চামারের ব্যবহার আর দেখি নাই। অল্প টাকা? কত লোকের গয়নাপত্র থালা বাসন বাঁধা রেখে রেখে শেষে বেচে নিয়েছে। এখনও কত ঘরে মজুত আছে। হাত পাত্‌তেই শিখেছে;—উপুড় কর্ত্তে আর শেখে নাই। চলুন ভগবান বোসের বাড়ী। টাকা কড়ি বেশী নাই সত্য, মধ্যে মধ্যে এই বেণের টাকাও কর্জ্জ করেন;—কিন্তু মন কত বড়! গঙ্গাস্নানের যাত্রী—ব্যারাম হয়ে পথে পড়ে আছে। খবর পেলেই বসু মহাশয় তারে তুলে এনে বাড়ীর লোকের মতন তার সেবা করেন। অতিথ ফকীর বৈষ্ণব গেলে যেমন সাধ্য দেবেনই দেবেন। মুখের কথা শুনেই লোকে তুষ্ট।"

চণ্ডীচরণ কেবল সায় দিতেছিলেন। বণিকের ব্যবহারই তাঁহার মনে হইতেছিল। তিনি এমন লোক অতি অল্পই দেখিয়াছেন। ভগবানের প্রশং-

সায় বিশ্বাসস্থাপন করিতেও যেন তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। সহসা মহেশ কহিয়া উঠিল, "এই সাম্‌নে বসু মহাশয়ের বাড়ী।"

তাঁহারা দেখিলেন, বাহিরের ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিন্তু তথায় কোন লোক নাই। মহেশ "কর্ত্তা বাড়ী আছেন?" বলিয়া ডাকিতেই ভগবান বাড়ীর ভিতর হইতে আসিলেন। ভগবানের মুখ প্রফুল্ল নহে। চণ্ডীচরণের মনে আশঙ্কার উদয় হইল। তিনি কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত তাঁহাদের গ্রামে আগমনের কারণ ও বণিকের ব্যবহার সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। ভগবানের গুণকীর্ত্তন জ্ঞাপন করিতেও ভুলিলেন না। ভগবান "আপনি ব্রাহ্মণ, প্রাতঃ প্রণাম, বসুন" এই কথা বলিয়া বসিবার আসন দেখাইয়া দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

চণ্ডীচরণ আশ্বস্ত হইলেন। মধু বণিকের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তাঁহার যেমন মনে হইতেছিল যে, এমন গ্রামে আসা আর বাঘের মুখে যাওয়া প্রায় একই কথা, সেই ভাবটা মন হইতে অনেকটা দূর হইল।

২

কিয়ৎকাল পরেই একটি ভৃত্য পা ধুইবার জল ও তামাকু আনিয়া দিল। চণ্ডীচরণের পাকে দুইটি হিন্দুস্থানী খাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া লোকটি দুইটি রন্ধনের স্থান পরিষ্কৃত করিতে লাগিল। চণ্ডীচরণ নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীর ঘাটে মুখ হাত ধুইয়া এবং সন্ধ্যা পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, রন্ধনের সমস্ত প্রস্তুত। গৃহস্বামীকে আর একবারও দেখিতে না পাইয়া চণ্ডীচরণের মনে একটু কেমন কেমন বোধ হইল, কিন্তু তিনি তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলেন না। জঠরানল বড়ই জ্বলিতেছিল, ব্রাহ্মণ পাক উঠাইয়া দিলেন।

সহসা গৃহস্বামী চণ্ডীচরণের রন্ধনগৃহের সম্মুখে আসিয়া চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রন্ধনের সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে কি না। ভৃত্য হাঁ বলিয়া উত্তর করিলে ভগবান একবার ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং কোন কথা না কহিয়াই পুনরায় বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্যও তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল।

কিছুকাল পরেই একটি লোক চণ্ডীচরণের সম্মুখ দিয়া বাটির ভিতর হইতে

যে, লোকটি হয় অন্য স্থান হইতে আসিয়াছেন, নয় অন্যত্র যাইবেন। তিনি বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া চাকরকে ডাকিয়া তামাকু চাহিলেন। চণ্ডী-চরণও এই সময়ে তামাকু খাইতে বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। চণ্ডী-চরণ এই লোকটিকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, "আমি কবিরাজ।"

চণ্ডীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাড়ীতে কাহারও অসুখ আছে কি?"

কবিরাজ। আজ্ঞা হাঁ, ভগবান বসু মহাশয়ের একমাত্র কন্যা, তাহারই অসুখ। পীড়ার অবস্থা খুবই খারাপ। আজ বৈকাল থেকে আমি এখানে আছি। রাত্রিতে কি হয় বলা যায় না।

চণ্ডীচরণ আরও দু' চারিটি প্রশ্ন করিয়া রোগের অবস্থা অনেকটা বুঝিয়া লইলেন। কবিরাজ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া শেষে কহিলেন, "মহাশয়! মনে হইতেছে যেন আমার নিজের সন্তানের অসুখ হইয়াছে। বসু মহা-শয়ের ন্যায় এমন সাধুপ্রকৃতি পরোপকারী লোক এ অঞ্চলে নাই বলিলেও চলে। এই একমাত্র পাঁচ বৎসরের কন্যাই বসুজার ও তাঁহার গৃহিণীর সংসারের অবলম্বন। ভগবান আছেন—এর চেয়ে খারাপ অবস্থা হয়েও ত দু'চারিটি রোগীকে বাঁচ্‌তে দেখেছি।"

সমস্ত শুনিয়া চণ্ডীচরণের প্রাণ ভগবানের প্রতি ভক্তি ও সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, এমন লোক রাস্তা থেকে ওলাউঠার রোগী কুড়াইয়া আনিবে, ইহা বিচিত্র নয়। তাঁহার মনে হইল, মধু বণিকের ন্যায় লোক যেমন তিনি অল্প দেখিয়াছেন, তেমনই ভগবান বসুর ন্যায় লোকও বোধ হয় তিনি দেখেনই নাই।

কবিরাজের কথা শেষ হইলে চণ্ডীচরণ মুহূর্ত্তমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রাণের আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান ত আছেনই; তিনি এ বালিকাকে অবশ্যই বাঁচাইবেন।"

চণ্ডীচরণ যে ক্ষুদ্র গৃহে পাক করিতেছিলেন, উহা অতিথির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট রন্ধনশালা, অন্দর হইতে বাহিরের ঘরে আসিবার পথে। ভগবান পুনরায় কন্যাকে ছাড়িয়া তথায় আসিয়াছেন, এবং চণ্ডীচরণকে দেখিতে না পাইয়া চাকরকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ঠাকুরটি কোথায় গেলেন? তাঁর ভাত বুঝি নষ্ট হয়ে গেল।"

চণ্ডীচরণ হুঁকা ছাড়িয়া রন্ধনগৃহের দিকে আসিলেন।

মুখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণের আবেগ বর্দ্ধিত হইল। তিনি কহিলেন, "আমি সমস্তই শুনিয়াছি। আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আপনার কন্যা নিশ্চয়ই আরোগ্য-লাভ করিবে। ভগবান আপনাকে কষ্ট দিবেন না। আমি একবার কন্যা-টিকে দেখিতে চাই।"

ভগবান কহিলেন, "আপনি আহার করুন, তার পর দেখিবেন।"

৩

আহারান্তে চণ্ডীচরণ বাটীর ভিতরে গেলেন। বাড়ীর কোন আত্মীয়ের ন্যায় তিনি একবারে রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে নীত হইলেন। চণ্ডীচরণ দেখিলেন, পীড়ার অবস্থা অতিশয় আশঙ্কাজনক বটে। ২১ দিনের জ্বরে কন্যাটি কঙ্কাল-সার হইয়াছে। এখন কঠিন বিকারের অবস্থা। বালিকা প্রলাপ বকি-তেছে। তাহার মুখ ও চক্ষের অবস্থা ভীতিজনক।

ভগবানের গৃহিণী চণ্ডীচরণের শুইবার বিছানা একটি চাকরের নিকট দিতে-ছিলেন। চণ্ডীচরণ আসিতেছেন দেখিয়া তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া যান। ব্রাহ্মণ ঘরে আসিলেই তিনি বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তিনি কন্যাটিকে দেখিতে পান—অথচ তাঁহাকে গৃহস্থিত কেহ দেখিতে না পায়, এমন স্থানে রহিলেন। সহসা দুহিতার দু' একটি অসম্বদ্ধ বাক্য শুনিয়া তাঁহার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

চণ্ডীচরণ সহজেই বুঝিতে পারিলেন, বালিকার মাতাই এ ক্রন্দন করিতে-ছেন। ব্রাহ্মণের সহানুভূতি শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। ভগবানের অশ্রুসিক্ত চক্ষুর প্রতি দৃষ্টি করিয়া তিনি আর হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। অন্তঃকরণের অন্তস্তল হইতে অতিশয় দৃঢ়তার সহিত কহিয়া উঠিলেন, "আপ-নারা কাঁদিবেন না। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি,—এই কন্যা আরোগ্যলাভ করিবে। যদি আমি ব্রাহ্মণ হই, আমার আশীর্ব্বাদ সফল হইবে; এ বালিকা বাঁচিবেই বাঁচিবে।"

চণ্ডীচরণ কোন্ সাহসে এত বড় কথাটি বলিয়া ফেলিলেন, তাহা আমরা বুঝাইয়া দিতে পারিব না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মানুষের ভক্তি ভাল-বাসা কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি বৃত্তিনিচয় পবিত্র ও অকৃত্রিম আবেগময় হইলে অনেক সময়ে তাহা পার্থিব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখে না, যুক্তিতর্কের ধার ধারে না, এবং অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলে।

গৃহস্বামী অতিথি ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার কথা

কয়েকটি ভগবানের হৃদয়ে যেন বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্য করিল। চিন্তা ও আশঙ্কার তিমির অপসৃত হইয়া সহসা তথায় আশার আলো জ্বলিয়া উঠিল। তিনিও প্রাণের আবেগে কহিয়া উঠিলেন, "ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া যখন এরূপ কথা বাহির হইয়াছে, তখন আমার কন্যা অবশ্যই বাঁচিবে।" চণ্ডীচরণের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "আপনি এই বালিকাকে বাঁচাইতেই আমার বাড়ীতে পদ-ধূলি দিয়াছেন।"

ভগবান নত হইয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া নিজের ও কন্যার মস্তকে লেপন করিতে লাগিলেন। স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "ঘরে এস, লজ্জা নাই; ঠাকুরকে প্রণাম কর,—পদধূলি নাও।"

গৃহিণী স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করিলেন, এবং তাঁহার কথামতই আর গৃহত্যাগ করিলেন না; অবগুণ্ঠনে মস্তক ঢাকিয়া কন্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

চণ্ডীচরণ চিকিৎসক না হইলেও এক জন বহুদর্শী লোক বটেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া দু'একটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করিলেন। কবিরাজ তাহার অনুমোদন করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। চণ্ডীচরণ বালিকার মস্তকে হস্ত রাখিয়া দু' একটি স্তব পাঠ করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের পরে বালিকার তন্দ্রার আবেশ হইল। চিকিৎসক কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। ভগবান ও গৃহিণীকে বালিকার নিকটে রাখিয়া তিনি ও চণ্ডীচরণ বাহিরে আসিলেন।

৪

চণ্ডীচরণ শয়ন করিলেন। তাঁহার কেবলমাত্র নিদ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে দূরে এক বিষম গোল শুনিয়া তিনি জাগরিত হইলেন। দেখিলেন, সঙ্গের হিন্দু-স্থানী দুই জন উঠিয়া বসিয়াছে। মানুষের চীৎকার ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য ভগবানের এক জন সাহসী ভৃত্য যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

রামসেবক ও রঘুবীর সিং চণ্ডীচরণকে কহিল, "আপনি যদি টাকাটা আগুলিয়া বসিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা একবার দেখিয়া আসি।" চণ্ডীচরণ বিশেষ আপত্তি করিলেন না। হিন্দুস্থানীদ্বয় ভগবানের ভৃত্যের সহিত দৌড়াইল।

মধু বণিকের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে। দস্যুগণ সংখ্যায় অধিক নহে। আট দশ জনমাত্র। দুই জন মধুকে ধরিয়া রাখিয়াছে ও তাহাকে নির্য্যাতিত করিতেছে। অবশিষ্ট লোকেরা গৃহে প্রবেশ করিয়া সঞ্চিত অর্থের অনুসন্ধান করিতেছে। ভগবানের বাঙ্গালী ভৃত্যের সাহসে কুলাইত না। কিন্তু রঘুবীর ও রামশরণের শরীরে বাঙ্গালীর রক্ত নহে। তাহারা তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া অসীম সাহসের সহিত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল, এবং বিষম জোরে একটা শব্দ করিয়া মধুর সমীপস্থ আততায়ী দস্যুদ্বয়ের উপর পতিত হইল। দস্যুগণ এরূপ বাধার জন্য প্রস্তত ছিল না। যমকিঙ্করসদৃশ দুই দীর্ঘদেহ হিন্দুস্থানী ও তাহাদের হস্তস্থিত বংশখণ্ড দেখিয়া তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল, এবং নিজেদের মধ্যে একটি সঙ্কেতবাক্য উচ্চারণ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। রঘুবীর ও রামশরণের পক্ষে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা অসম্ভব।

উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মধু প্রথমেই অনুসন্ধান করিতে লাগিল, তাহার কি কি অপহৃত হইয়াছে। সে যখন জানিতে পারিল যে, নগদ টাকা ও মূল্যবান্ অলঙ্কারাদি যাহা কিছু সমস্তই গিয়াছে, তখন তাহার পরিতাপের পরিসীমা রহিল না। সে কেবল বলিতে লাগিল, "আমি কেন মরিলাম না। যখন আমার সকলই গেল, তখন আমি কেন রহিলাম। ডাকাতেরা আমাকে মারিতে আসিয়াও কেন আমাকে মারিল না?"

বস্তুতঃ যখন রঘুবীর ও রামশরণ মধুর বাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন দস্যুরা তাহাদের কাজ গুছাইয়াছে। আরও কিছু আছে কি না, তাহারা কেবল এই অনুসন্ধান করিতেছিল, এবং যখন তাহারা পলাইয়া যায়, তখন মধুর প্রায় সর্ব্বস্বই তাহাদের হস্তগত হইয়াছিল।

দুইটি লোক আসিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিয়া থাকিলেও মধু উদ্ধারকর্ত্তাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের অবসর পায় নাই। হিন্দুস্থানীদ্বয় তাহার কৃতজ্ঞতা পাইবার প্রত্যাশীও ছিল না। মধু ঘরে আসিয়াই সমস্ত দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। দস্যুগণের আগমনসময় হইতেই তাহার মনে সংস্কার হইয়াছিল যে, সন্ধ্যার পর যে তিনটি লোক অতিথিভাবে তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহারাই ডাকাইতি করিতেছে। মধুর সে বিশ্বাস এখনও অপনীত হয় নাই। মধু কাঁদিতে

ঘর সব দেখিয়া গিয়াছিল। তখনই আমি জানি যে, আজ আমার সর্ব্বনাশ হবে।” মধুর সেই চাকরটি নিকটে ছিল। সে দূর হইতে সমস্তই দেখিয়াছিল। মধুর কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, “সেই অতিথিই তোমাকে বাঁচালে। তাদের যদি যায়গা দিতে, তা হলে আর এমন একখানা হ’ত না।”

মধুর চমক ভাঙ্গিল। তাহার মনে হইল, যে দুইটি লোক আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছে, তাহারা সেই সন্ধ্যাকালের ব্রাহ্মণের সঙ্গের লোকের মতন বটে।

রঘুবীর ও রামশরণ ফিরিয়া যাইয়া চণ্ডীচরণকে সমস্ত কহিল। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ইহারা কেহই আর নিদ্রা গেল না। চণ্ডীচরণ প্রাতঃকৃত্যের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে যশোহর-যাত্রার পূর্ব্বে চণ্ডীচরণ একবার ভগবানের কন্যাটিকে দেখিয়া গেলেন। তখন তাহার অবস্থা কিছু ভাল। চক্ষের অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ। কবিরাজ কহিলেন, এখন জীবনের আশা করা যাইতে পারে। চণ্ডীচরণ হৃষ্টচিত্তে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

৫

চণ্ডীচরণ এক জন কায়স্থ জমীদারের কর্ম্মচারী। তাঁহার সঙ্গীয় হিন্দুস্থানীদ্বয় ঐ জমীদারেরই ভৃত্য। জমীদারের নাম যোগেশচন্দ্র রায়। বার্ষিক আয় ত্রিশ সহস্র টাকা হইবে। যোগেশ নাবালক। বয়স ১০।১১ বৎসর মাত্র। তাঁহার মাতা জীবিতা আছেন। চণ্ডীচরণ যোগেশের পিতামহের সময় হইতে ইঁহাদের কর্ম্ম করিতেছেন। চণ্ডীচরণ অতিশয় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী; জীবনে কখনও মনিবের হানিজনক কোন কাজ করেন নাই। তাঁহার প্রতি যোগেশের মাতার অখণ্ড বিশ্বাস। যোগেশ তাঁহাকে ঠাকুরদাদা বলিয়া সম্বোধন করেন। জমীদারীর সমস্ত ভারই চণ্ডীচরণের হস্তে। এবার দু’ একটি মহালের প্রজা উপযুক্ত সময়ে খাজনা দেয় নাই বলিয়া পৌষ কিস্তির রাজস্ব দিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সময় অল্প বলিয়া এবং অন্যকে বিশ্বাস করা ঠিক নহে বিবেচনায়, চণ্ডীচরণ স্বয়ং যশোহর যাইতেছিলেন। পথে এক রাত্রিতে যাহা ঘটিয়াছে, পাঠক অবগত আছেন।

চণ্ডীচরণ বেলা এক প্রহরের পূর্ব্বেই যশোহরে পঁহুছিলেন, এবং সমস্ত দিনে মনিবের কার্য্য শেষ করিয়া পুনরায় সন্ধ্যার সময়ে ইচ্ছা করিয়া ভগবানের বাটীতে আসিলেন। কন্যাটির অবস্থা তখন বিশেষ আশাপ্রদ।

চণ্ডীচরণকে দেখিয়া ভগবান যেন তাঁহার এক জন নিকট আত্মীয় পাইলেন বলিয়া মনে করিলেন। এক রাত্রির পরিচয়েই তাঁহাদের আত্মীয়তা এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ভগবান তাঁহাকে এক জন মুরুব্বির স্থায় দেখিতে লাগিলেন। ভগবানের এক খুড়ার নাম ছিল চণ্ডী, ইহার উল্লেখ করিয়া ভগবান তাঁহাকে খুড়োঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে চণ্ডীচরণ যখন বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন, তখন কবিরাজ কহিলেন, "ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছে। বালিকা রক্ষা পাইবে, এখন নিশ্চয় এ কথা বলা যায়।"

বাড়ীর সকলেই চণ্ডীচরণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ভগবান অশ্রুপূর্ণ-লোচনে কহিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদেই আমি কন্যার জীবন পাইলাম। প্রার্থনা এই যে, যখনই এ পথে আসিবেন, যেন দুটি পদধূলি পাই।"

সেই দিন সন্ধ্যার পরেই চণ্ডীচরণ গৃহে ফিরিলেন। অন্যান্য কথা বলিয়া তিনি যোগেশ ও তাহার মাতার নিকট মধু বেণের কথা ও ভগবান বসুর কথা কহিলেন। রাত্রিতে তাঁহারা কিরূপ বিপদে পড়িয়া ভগবানের বাটীতে যান, ভগবান কি অবস্থায় তাঁহাদিগকে আহার ও স্থান দেন, তাঁহার কন্যার পীড়া, ইত্যাদি সমস্ত বর্ণিত হইল।

যোগেশচন্দ্র দু' একটি প্রশ্ন করিলেন। কহিলেন, "মধু আপনাদের ডাকাত ঠাওরাইয়াছিল?"

চণ্ডীচরণ উত্তর করিলেন, "হাঁ।"

যো। তার যথাসর্ব্বস্ব গেছে?

চ। যথাসর্ব্বস্বই প্রায়। সে রাত্রে হয় ত ডাকাতি হ'তই। আমাদের থাকৃতে না দেওয়া লোকে তার কারণ বলে বিশ্বাস করিল। ক্ষুধার্ত্ত বা বিপন্ন অতিথিকে ফিরানো সহজ কথা নয়। তোমার ঠাকুরমা সাবিত্রী ব্রতের উপবাস করে একদিন নীচের ঘরে শুয়ে আছেন। সহসা বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে ঘুম হইতে উঠিয়া বলিয়া উঠিলেন,'আমাদের বীরপুরের কাছারী পুড়িয়া গেল। এক জন ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া কাছারীতে আহার করিতে চাহিয়াছিল,তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়ার কিছু কাল পরেই আগুন লাগিয়াছে।' তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তখন তোমার ঠাকুরদাদা জীবিত ছিলেন। তোমার ঠাকুরমার মত পুণ্যবতী স্ত্রীলোক আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার

কাছারীবাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে ফিরাইবার কথা নায়েব অস্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তোমার পিতামহ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, কথাটা ঠিক। তদবধি নায়েবকে অতিথির খোরাকি বলিয়া বৎসরে ১২০৲ অতিরিক্ত দেওয়া হইয়া থাকে। কাছারী এখন পাকা হইয়াছে।

যোগেশচন্দ্র মন দিয়া সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে বাড়ীতে আপনারা যায়গা পেলেন, সে বাড়ীর সে মেয়েটি ভাল হবে ঠিক ?"

চ। নিশ্চয়ই ভাল হবে। এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে। মেয়েটি ত নয় যেন মোমের পুতুল।

যো। আপনি একখানা চিঠি লিখে খবর নেবেন।

চ। তা নেব।

এই ঘটনার পর ৭।৮ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চণ্ডীচরণ দশ বারো বার যশোহর যাইবার সময়ে ভগবানের বাড়ীতে গিয়াছেন। ভগবান, তাঁহার গৃহিণী ও কন্যাটি তাঁহাকে অসীম ভক্তি করেন। চণ্ডীচরণকে বাটীতে আসিতে দেখিলেই বালিকা যাইয়া মাকে বলে, "মা, সেই দাদাঠাকুর আসিয়াছেন।" বালিকা অনেক সময় ব্রাহ্মণের পা ধুইবার জল আনিয়া দেয়, বাড়ীর ভিতর হইতে তাঁহার নিমিত্ত দুধ, জলখাবার, পান ইত্যাদি লইয়া আসে। বৃদ্ধ চণ্ডীচরণ তাহার সরল আদর ও সুমিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যান। বাড়ী ফিরিলে তাঁহার মুখে ভগবানের কন্যার সুখ্যাতি ধরে না। এমন সুলক্ষণা কন্যা আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি, যেমন রূপ তেমনই গুণ, এ মেয়ে যে ঘরে যা'বে সে ঘরের উন্নতি হ'বেই হ'বে, ইত্যাদি কত কথাই তিনি বলেন।

চণ্ডীচরণ লক্ষ্য করিতেন না যে, যখনই তিনি ভগবানের কন্যার কথা তুলিতেন, তখনই যোগেশচন্দ্র কান পাতিয়া তাহার কথা শুনিতেন। যোগেশের সহিত এই বালিকার বিবাহ হইতে পারে, এমন সম্ভাবনা ব্রাহ্মণের মনে আসে নাই। কেন না, উভয় পরিবারে অবস্থার অতিশয় পার্থক্য। যোগেশের মাতা পুত্রের বিবাহের কথা উঠিলেই ধনবান বৈবাহিকের কথা বলেন।

বরের দর এই সময়ে চড়িয়া উঠিয়াছে। সহরে কায়স্থের কন্যার বিবাহ বিষম ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে পল্লীগ্রামে পাত্র খুঁজিতেছেন। কলিকাতার কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের কন্যার সহিত যোগেশের বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য আজ এক জন ঘটক তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছেন।

চণ্ডীচরণ ঘটকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। যোগেশের মাতা অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত শুনিতেছেন। যোগেশচন্দ্র নিকটে নাই।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঘটক উঠিয়া মুখহাত ধুইতে গেলেন। যোগেশচন্দ্র বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আগমনের ভাব দেখিয়া চণ্ডীচরণ বুঝিলেন, তিনি যেন ঘটকের স্থানত্যাগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। যোগেশচন্দ্র পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, এবং চণ্ডীচরণকে দেখিতে পাওয়া যায়—এইরূপ স্থানে উপবেশন করিলেন। নিজের কতকগুলি কাগজ-পত্র নাড়িয়া তিনি সহসা চণ্ডীচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরদাদা, আপনার সেই নাতিনীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে?"

এমন সময়ে এমন ভাবে এই প্রশ্ন? চণ্ডীচরণ মুহূর্ত্তমধ্যে ইহার অর্থ বুঝিয়া লইলেন, এবং কহিলেন, "কেন? বিবাহ হয় নাই। পাত্রের অনুসন্ধান চলিতেছে। আমার সে নাতিনীকে বিয়ে করিবে দাদা?"

চণ্ডীচরণ যোগেশকে দাদা বলিয়া আদর করিতেন।

যোগেশচন্দ্র নতমুখে উত্তর করিলেন, "আপনি যদি মাকে বুঝিয়ে রাজি কর্ত্তে পারেন।"

চ। হীরের আঙ্গটী, সোনার ঘড়ি, এ সব কিছুই কিন্তু দিতে পারিবে না।

যো। আমি কিছুই চাহি না। আপনার কাছে যত দূর শুনিয়াছি, এমন পিতা মাতার সন্তান কখনও সামান্য স্ত্রীলোক হইবার কথা নহে। সংসারে আমার আপনার বল্‌তে মা আর আপনি। আমি শৈশবে পিতৃহীন। আপনিই ত আমার সমস্ত রক্ষা করিয়াছেন। এ বিবাহে আপনার মত হইবে, আমি নিশ্চয়ই জানি। যদি মার মত কর্ত্তে পারেন। সেই রাত্রিতে বসু মহাশয় আপনাকে ও আমার লোক দুটিকে বাটীতে স্থান দিয়া যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন, যে উপকার করিয়াছেন, যদি তার বিন্দুমাত্রও শোধ হয়—"

চণ্ডীচরণ যোগেশের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া কহিলেন, "এই বিবাহই হবে দাদা। আমার কথা মা অবহেলা করিবেন না।" ব্রাহ্মণ যোগেশের মাকে মা বলিতেন।

বস্তুতঃ চণ্ডীচরণের মুখে এই বালিকার কথা শুনিয়া অবধি যোগেশচন্দ্র মনে মনে তাহার একটি ছবি আঁকিয়াছিলেন। বালিকার বয়স যত বাড়িতেছিল, চণ্ডীচরণের মুখে তাহার বর্ণনা শুনিয়া যোগেশের চিত্তে সেই ছবি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছিল। তিনি এ পর্য্যন্ত মনের কথা বলিবার

সুযোগ পান নাই। সেই দিন রাত্রিতেই যোগেশচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া চণ্ডীচরণ তাঁহার মাতার নিকট এই প্রস্তাব উথাপিত করিলেন। যোগেশের মনের ভাব তাঁহাকে জানান হইল। জননী দু' চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পুত্রের ও ব্রাহ্মণের মতে মত দিলেন।

উপসংহার।

যোগেশচন্দ্রের সহিত ভগবান বসুর কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যোগেশ এখন অর্দ্ধবয়স্ক। তাঁহার দুইটি সন্তান জন্মিয়াছে। যোগেশের মাতা কাশীতে গিয়াছেন,—জীবনের শেষভাগ সেখানে যাপন করিবেন। ভগবানও সস্ত্রীক সেখানে আছেন। বৃদ্ধ চণ্ডীচরণের কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার পুত্র এখন যোগেশের প্রধান কর্ম্মচারী। ইহার উপর সমস্ত ভার রাখিয়া যোগেশ-চন্দ্র স্ত্রীপুত্র সঙ্গে কাশীতে মাকে ও শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে দেখিতে যাইতে-ছেন। ডাকগাড়ীতে একখানি গাড়ী রিজার্ভ করিয়া তাঁহারা রাত্রিতে হাবড়া হইতে রওনা হইয়াছেন। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। বালক বালিকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। স্বামী স্ত্রী জাগরিত থাকিয়া মধুপুরের পাহাড় ও জঙ্গল দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন। যোগেশের পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ জঙ্গলে বাঘ আছে ?"

যো। বাঘ আছে বই কি ?—বাঘের কথা উঠ্‌লেই আমার সেই চণ্ডী ঠাকুরদাদাকে বাঘে তাড়ানোর কথা মনে হয়। এমন উপকারী বন্ধু আর হবে না—

উভয়ের মুখ বিষণ্ণ হইল। স্বর্গীয় ব্রাহ্মণের উদ্দেশে দম্পতি দু' চারি বিন্দু অশ্রুপাত করিলেন।

যোগেশচন্দ্র অশ্রুসংবরণ করিয়া কহিলেন, "চণ্ডী ঠাকুরদাদাকে বাঘে তাড়া করেছিল, আর মধু বণিক যায়গা দেয় নাই বলেই আমি এমন রত্নের অধিকারী হইয়াছি।" "এমন" কথাটির সঙ্গে সঙ্গে যোগেশচন্দ্র অতি আদরের সহিত স্ত্রীর চিবুক ধারণ করিলেন।

স্ত্রী উত্তর করিলেন, "রত্নলাভ তোমার না আমার ?"

যো। যারই হ'ক,—হয়েছে। এখন একটু ঘুমোও। রাত্রি কম হয় নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

শতাব্দীর কবিতা।

কালের রঙ্গমঞ্চে আর এক অঙ্কের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বীয় বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া উনবিংশ শতাব্দী অনন্তের অন্ধকারগর্ভে প্রবিষ্ট। উনবিংশের অস্ত, বিংশের উদয়;—একের অবসান, অপরের অভ্যুদয়। উনবিংশ শতাব্দীর বিসর্জ্জনের বাদ্যরব নীরব; বিংশ শতাব্দীর স্বাগততূর্য্যধ্বনি ধ্বনিত। বিগত শতাব্দীর সালতামামী হইতেছে; হিসাবনিকাশের সময় আসিয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে, এই শতাব্দীতে সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রচুর সম্পদ সঞ্চিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর বিবরণ যখন প্রত্নতত্ত্বের অন্তর্গত হইবে, উনবিংশ শতাব্দীর দর্শন যখন একান্ত প্রাচীন হইয়া দাঁড়াইবে, উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান যখন নূতন বিজ্ঞানের ভিত্তিমাত্রে পরিণত হইবে, উনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার যখন উন্নত উত্তরবংশীয়দিগের নিকট ছেলেখেলামাত্র বলিয়া বোধ হইবে, তখনও উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য বহু মানবের শোকে শান্তি, বিজনে সঙ্গী ও সজনে আলোচ্য থাকিবে।

এক কবিতার কথাতেও বলিতে পারা যায়, এই শতাব্দীতে বহু কবির মানসনন্দনে কল্পনা-মন্দাকিনীকূলে প্রতিভার মন্দারকুঞ্জে বহু তিলোত্তমার আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা কেহ গর্ব্বস্ফুরিতাধরা; কেহ প্রেমালোকস্ফুরিতনয়না; কেহ ব্রীড়াসঙ্কুচিতা; কেহ সারল্যাকুণ্ঠিতা; কেহ কুসুমকুন্তলা; কেহ তরলিতরত্নহারা; কেহ শান্তিসমুজ্জ্বলা; কেহ দিব্যোন্মাদমত্তা; কেহ বরাভয়দাত্রী; কেহ প্রশান্তশ্রীশালিনী; কেহ বিলাসলাবণ্যময়ী; কেহ বিষাদবিধুরা; কেহ আনন্দোৎফুল্লা; কেহ চিন্তাবিষ্টা; কেহ শ্যামশষ্পাস্তৃত বৃক্ষচ্ছায়ায় শ্লথকুসুমাকুলকুন্তলা; কেহ কিশলয়শয়ননিবেশিতা—অলসনিমীলিতলোচনা; কেহ উর্দ্ধোৎক্ষিপ্তনয়না—ভক্তিবিহ্বলা। এই শত তিলোত্তমা উনবিংশ শতাব্দীর। ইহাদিগের মধ্যে কে "অতুল্যা রূপসী", কে নন্দনে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, তাহাই বিচারের বিষয়। যে বিশ্বকর্ম্মা মানসরাজ্যের সেই মায়াকানন-বাসিনীর স্রষ্টা, তিনিই উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি—কাব্যের পঙ্কজ-রবি। ইংলণ্ডের কবিদিগের মধ্যে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,তাহার বিচারের আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। শত কবির শত ভক্ত, শত শিল্পীর শত উপাসক। মিষ্টার মার্ডক এ বিষয়ের যে আলোচনা করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই আমাদের অবলম্বন।

প্রায় বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে আর্ণল্ড প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শতাব্দীশেষে কবিতার রাজ্যে কাহাদের নাম প্রথম দৃষ্ট হইবে? আজ শতাব্দীশেষে সেই কথার বিচারকাল—সেই প্রশ্নের মীমাংসার সময় উপস্থিত। শতাব্দীব্যাপী সমালোচনার তরঙ্গতাড়নে কে? বহু সামান্য কবির যশের রেখা কালের শিলাবক্ষ হইতে অপসৃত। কালের প্রভাবে খদ্যোতের ক্ষণিক দীপ্তি নির্ব্বাপিত, কেবল সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্করাজিই দৃশ্যমান। কিন্তু সে তর্কের শেষ হয় নাই। এক দল বায়রণকে রত্নসিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার অর্চ্চনারত,—তাঁহাদের নিকট ওয়ার্ডসওয়ার্থ তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত। আবার মনীষী জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ কেহ কেহ বায়রণকে নটের দলে ফেলিয়া ওয়ার্ডসওয়ার্থকেই গুরুপদ-

বাচ্য বলিয়া থাকেন। সুকবি সুইনবরণের মতে, এই দুই জনের অপেক্ষা শেলী ও কীটসের স্থান উচ্চে। কেহ কেহ রবার্ট ব্রাউনিংকেই কবিগুরু বলিয়া—তাঁহার রচনা লইয়া সদা বিব্রত। আবার ইংরাজী পাঠকসমাজে টেনিসনের ভক্তের অভাবমাত্র নাই। যে স্থানে নানা মুনি নানা মতের প্রচারক, সে স্থানে আমাদের গন্তব্য পথ কি? কোন্ মহাজনের গতানুগতিক হইব? কাহার চরণচিহ্নের অনুসরণ করিব?

আদর্শ ব্যতীত বিচার হয় না। কবিতার কি আদর্শ লইয়া বিচার করা সঙ্গত? কি গুণে কবিতার স্থায়িত্ব? যে সকল কবিতা কালের অন্ধকার বক্ষে দেদীপ্যমান, সে সকলের গুণ পরীক্ষা করিলে দৃষ্ট হইবে, যে কবিতা জাতীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষার

স্থায়িত্ব।

ক্ষেত্রে উপ্ত ও জাতীয় ভাব ও ভাবনার রসে পুষ্ট, সেই সকল কবিতাই বরেণ্য—চিরাদৃত। স্বাভাবিক ও সুস্থ জাতীয় জীবনের সহায়তা ব্যতীত প্রকৃত কবিতার স্ফূর্ত্তি হয় না। কি ভাষায়—কি ভাবে কৃত্রিমতা কবিতার স্থায়িত্বের বিরোধী। আমরা এই আদর্শ লইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ কবিদিগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমন বহু ইংরাজ কবির আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা সুকবি সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা যায় না। আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ; তাঁহাদিগকে ভালবাসি। কিন্তু তাঁহাদিগকে দেবতার সিংহা-

বহু কবির কথা।

সনে বসাইতে পারি না। হুডের রহস্যরচনার কথা ছাড়িয়া দিয়া—Song of the shirt ও Bridge of sighs ধরিলে তেমন করুণ রস আর কোন্ কবির কবিতায় পাইব? ওমর খৈয়ামের অনুবাদক ফ্রিটজিরাল্ড স্বয়ং সম্ভবতঃ ওমরের অপেক্ষা বড় কবি। মিসেস ব্রাউনিং আবেগপ্রাচুর্য্যে ও কুমারী রসেটি সংযমে কবিতারাজ্যে অতি উচ্চস্থানের অধিকারিণী। এই দলে অষ্টিন, ডবসন, ব্রাউন, বার্ণেস, ডেভিস প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ইঁহারা সুকবি, কিন্তু ইঁহাদের স্থান সর্ব্বোচ্চে নহে।

রসেটির স্থান সর্ব্বোচ্চে নহে। তাঁহার ভাষা অতি মধুর। তাহা অপ্সরোনূপুরনিক্কণের মত কর্ণে আসিয়া মিলাইয়া যায়! সে যেন কুসুমময়ী লতিকা—মৃত্তিকায় অবলুণ্ঠিতা; তাহার দাঁড়াইবার শক্তি নাই। রসেটির কবিতা-কুসুমে বর্ণ বড় সমুজ্জ্বল।

রসেটি ও মরিস্।

সে ফুল মুক্তপবনস্পর্শে বিকশিত নহে; তাহা কাচগৃহের অভ্যন্তরে লালিত, মানবের চেষ্টার ফল। কেবল যে ভাষায় ও উপমায় কবিতা হয় না, কবি তাহাই বুঝেন নাই। রসেটির কাব্যসমালোচনায় বহু বর্ষ পূর্ব্বে "এডিনবরা রিভিউ" যাহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদের কবিদিগের পক্ষে তাহা বিবেচনার বিষয়। "রিভিউ" বলিয়াছিলেন, এখন কি শিল্পে কি সাহিত্যে—অস্বাভাবিকের বিকাশ। চিত্রে বা সাহিত্যে চিত্রিত চরিত্র মানবস্বভাবসঙ্গত নহে; তাহারা কবির মানসবাসিনী—স্বপ্নরাজ্যের মায়াকাননবিলাসিনী দুষ্টকল্পনার প্রসূত। তাহাদের নয়নে আলস্য, অধরে লালসা। সে সকল সৌন্দর্য্যপ্রতিমা মানবের নহে। রসেটির কবিতায় এই লালসার আতিশয্য দেখিয়া কার্লাইলের কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়,—"যে সকল গুপ্ত কথা সকলেই জ্ঞাত, সে সকলের কথা আপনি আপনার কাছেও বলিও না।" সে কবিতায় কেবল রূপ—কেবল যৌবন। যৌবনমদিরার উচ্ছলিত স্রোতে আর সব ভাসিয়া গিয়াছে। রসেটি ভাষায় অতুলনীয়—ভাবে সামান্য। তাঁহার কবিতায় 'গীতগোবিন্দের' মাধুরী আছে, 'কুমারসম্ভবের' গাম্ভীর্য্য নাই; 'বিদ্যাসুন্দরের' কোমলতা আছে, 'দশমহাবিদ্যার' মেরুদণ্ড নাই। ভাষার কুসুম প্রচুর—কিন্তু ভাবের সৌরভ নাই।

উইলিয়ম মরিসও সুকবি; কিন্তু তাঁহার আপনার কথায় তিনি "শুধু শূন্য দিবসের অলস

গায়ক।" যে কবি স্বেচ্ছায় সমসাময়িক গুরুতর প্রশ্ন সকল পরিহার করেন, তাঁহার আসন উচ্চে হইতে পারে, অত্যুচ্চে নহে। কবির পক্ষে তাঁহার সমসাময়িক মানসভুবনবিলোড়ী প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাই টেনিসনের সাফল্যের অন্যতম কারণ।

জীবিত কবিদিগের মধ্যে কেবল সুইনবরণ ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে আসন পাইবার যোগ্য। তাঁহার কবিতার শব্দলালিত্য অনুকরণাতীত; তাঁহার-কবিতাকুঞ্জে কলকণ্ঠ কোকিলের কলগান বহুদিন ইংরাজী-পাঠকের চিত্তবিনোদন করিবে। তাঁহার ভাষার পরিপূর্ণ ধ্বনি বিস্ময়কর। তাহা কোথাও বাত্যাবিক্ষুব্ধ বারিধির গর্জ্জন, আবার কোথাও উদ্দামপ্রহ্লাদিনী তরঙ্গিণীর মৃদু কলধ্বনি; কোথাও ভেরী-নিনাদ, কোথাও মধুর মুরলীধ্বনি। তাঁহার ছন্দ ও ধ্বনির মাধুর্য্য টেনিসনও আকাঙ্ক্ষা করিতেন। কিন্তু যদি কেবল ছন্দোমাধুরী ও শব্দলালিত্যই কাব্যের উপাদান হইত, তবে সুইনবরণের স্থান সেক্সপীয়রেরও উপরে। সুইনবরণের বিষম দোষ আতিশয্য,—সেই দোষে সুইনবরণের কবিতা-কুসুম লুপ্তশ্রী। এত আতিশয্য ব্রাউনিংএরও ছিল না। তিনি কেবল শব্দমাধুরীর স্রোতে ভাসিয়া বিপুল পুলকে চরণের পর চরণ রচনা করিয়া থাকেন। তাঁহার কবিতাগুলি সংক্ষিপ্ত হইলে সুন্দর হইত; কিন্তু কোন অংশ পরিহার করিলে ভাল হয়, তাহা তিনি ব্যতীত কেহ বুঝিবে না।

সুইনবরণ ও আর্ণল্ড।

কাব্যে আর্ণল্ডের কৃতিত্ব বোধ করি সুইনবরণই প্রথম স্বীকার করেন। সুইনবরণের কবিতায় আতিশয্য ও প্রাচুর্য্য—আর্ণল্ডের কবিতায় কঠোর সংযম। একের কবিতায় ভাষাভিব্যক্তি অস্পষ্ট, অপরের সুস্পষ্ট। একের চাঞ্চল্য, অপরের স্থৈর্য্য। একের অত্যধিক অপ্রাসঙ্গিকতা, অপরের পূর্ণ প্রাসঙ্গিকতা। সম্ভবতঃ আর্ণল্ডের এই পবিত্রতা ও অচঞ্চলতা কালের প্রবাহে অটল রহিবে। কিন্তু তাঁহার কবিতায় সঙ্গীতধ্বনির একান্ত অভাব। সেই অভাবেই তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চে নহে।

কীট্‌স জীবিত থাকিলে হয় ত কবিকুলচূড়া হইতে পারিতেন; কিন্তু যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখনও তাঁহার "ফুটিতে অনেক বাকি।" তখনও তাঁহার রচনায় অপূর্ণতা ও ক্ষমতার অভাব সুস্পষ্ট। এখন তিনি কবির কবি, অর্থাৎ কবিজনের নিকট আদৃত। অসমাপ্ত সম্ভাবনামাত্র সকলে বুঝে না। শেলীর মাধুরী কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু মানুষ কেবল শিশির ও অনল উপভোগ করিয়া থাকিতে পারে না। তিনি তাঁহার চাতককে যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়,

কীট্‌স ও শেলী।

"ঊর্দ্ধ হ'তে আরো ঊর্দ্ধতর
মর্ত্ত্যভূমি ত্যজি' চলি' যাও;
অগ্নিময় যেন জলধর
নীল শূন্যে উড়িয়া বেড়াও;
গীতরত শূন্যে উঠিয়াও;
ঊর্দ্ধগামী শুধু গীত গাও।"

যেমন অনেক প্রকার আলোক আমাদের চক্ষে দেখা যায় না, যন্ত্রবিশেষে ধরা পড়ে, তেমনই অনেক অনুভূতি কেবল কবি-হৃদয়েই সম্ভব। যে গীত সাধারণ মানবকর্ণে অশ্রুত, তাহা কবির হৃদয়কুঞ্জে ধ্বনিত। যে দৃশ্য সাধারণ চক্ষের অগোচর, তাহা কবিহৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত। শেলীর অনুভূতি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর। তাই তিনি সকলের পক্ষে অধিগম্য নহেন।

কোলরিজ যাদুকর। তিনি পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধবৎ রাখিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার উৎকৃষ্ট কবিতার সংখ্যা একান্ত অল্প। সেগুলি আবার মানবস্বভাববিরুদ্ধ। যত দিন ইংরাজী ভাষা থাকিবে, তত দিন বায়রণের আদর অক্ষুণ্ণ রহিবে। Don Juan রহস্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ, Vision of Judgment গালির চূড়ান্ত। ইহা ব্যতীত Prison of Chillon অশ্রুজলসিক্ত। বায়রণের ক্ষমতা বহু দিকে বিকশিত। বায়রণের আন্তরিকতা ও ক্ষমতা অসাধারণ। কেবল সেই জন্যই তিনি দুর্দ্দিনে ফ্রান্সের পক্ষ ত্যাগ করেন নাই। ফরাসীবিপ্লব য়ুরোপে স্বাধীনতার বিজয়-তূর্য্য। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই উপহাস যে, ফ্রান্স সহস্রযাতনানিপীড়িত হইয়া যাহা লাভ করিয়াছে, অন্য সকল দেশ অতি সহজে সেই ফল লাভ করিয়াছে। ফ্রান্স পরার্থে সব সহিয়াছে। যখন বিপ্লবের প্রথম প্রলয়বিষাণ বাজিয়া উঠিল, তখন বোধ হইল, যেন স্বাধীনতার অন্তিমকাল উপস্থিত। তখন কোলরিজ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ ফ্রান্সের পক্ষ ত্যাগ করেন। কিন্তু বায়রণ ও শেলী অটল। বায়রণের প্রকৃতি চঞ্চল। তিনি Evil heritage of blood দুষ্ট; তাই দুঃখ করিয়াছেন,—

কোলরিজ ও বায়রণ।

"চিত্তবৃত্তি নিরোধিতে না শিখি' যৌবনে,
আমার জীবন-উৎস হ'ল বিষময়।"

বায়রণ জাতীয় উন্নতির কি করিয়াছেন? তাঁহার সাহায্য কি? যাহারা কবিতার সাহায্য সন্ধান করিবে, তাহারা বায়রণের ক্ষুণ্ণ গর্ব্বের অনলশ্বাসে কিছুই পাইবে না। হ্যাজলিট বলিয়াছেন, ক্ষমতাবান পুরুষ অপরের হৃদয়গঠন করিতে পারেন। বায়রণ তাহা পারেন নাই। তিনি জ্ঞানী ছিলেন না; জ্ঞানদান করিবেন কোথা হইতে? তাঁহার কথা,— "আমি অসুখী;" এই কথাই তিনি অসাধারণ শক্তিসহকারে প্রকাশ করিয়াছেন। 'লরা', 'করসেয়ার', 'জওয়ার'—সেও এখন পুরাতন। বায়রণে শিক্ষা নাই; কিন্তু তিনি চিরদিন কাব্যামোদীর সহচর থাকিয়া পাঠককে বিপুল পুলক দান করিবেন।

স্নিগ্ধ শান্তিদানেই ওয়ার্ডসওয়ার্থের গৌরব। সাধারণ পাঠকের নিকট তাঁহার দোষ-রাশি বড় স্পষ্ট। ভক্ত বলিবেন,—

"দোষরাশি তৃণ সম ভাসে ত উপরে;
যে জন মুকুতা তরে সন্ধান করিয়া ফিরে
তাহারে ডুবিতে হবে অতল সাগরে।"

কবির পক্ষে হাস্যরসের অভাব বড় মারাত্মক; ওয়ার্ডসওয়ার্থ সে রসে বঞ্চিত। যদি তাঁহার সমস্ত কবিতা পাঠ কর, তবে অনেক সময় বিরক্তি অনিবার্য্য। তাঁহার কবিতায় গতি ও বহ্নি উভয়েরই অভাব। তবে তিনি শ্রান্ত জনের পক্ষে বিশ্রামবর্ষী। তাঁহার কাব্যসুধা-পানে বহু শ্রান্ত পাঠক নূতন আনন্দে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ঋষিকল্প। তাঁহার আপনার কথায়,—

"আমার আনন্দ শুধু নিদাঘ-ছায়ায়
গাহিতে সরল গীত চিন্তাশীল তরে।"

এক দল বলেন, তিনি উৎসাহোৎফুল্ল ধর্ম্মযাজকমাত্র; কিন্তু অনেকের পক্ষে তিনি গুরু, পূজ্য, দেবতা,—সেক্সপীয়র ও গেটের সমকক্ষ।

ব্রাউনিং সম্বন্ধে সহজে কিছু বলা সঙ্গত নহে; কারণ, তাঁহার বহু ভক্ত ব্রাউনিং-সংহিতার

সাহায্যে তাঁহার কবিতায় সব পাইয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রাউনিংকে বুঝিতে সংহিতার আবশ্যক কি? তাহার উত্তর এই যে, ব্রাউনিং উদ্যানের আগাছা দূর করেন নাই, ফুলগাছের পার্শ্বেই আগাছা রহিয়া গিয়াছে।

ব্রাউনিং।

তিনি অনাবশ্যকবর্জ্জিত আবশ্যক অংশমাত্র লোকচক্ষুর গোচর করেন নাই। তাঁহার পক্ষে ছয় চরণে ভাবপ্রকাশ অপেক্ষা সহস্র চরণে ভাববিস্তার সহজসাধ্য ছিল; তিনি তাহাই করিয়া গিয়াছেন। কাজেই তাঁহার ষোড়শ খণ্ড গ্রন্থাবলীর মধ্যে পঞ্চদশখানি অনাবশ্যক। আবার তাঁহার অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট চরণ গদ্যের মত শুনায়। তাঁহার মানসিক ক্ষমতা অসাধারণ; তাঁহার চরিত্রজ্ঞান অসামান্য। কিন্তু তাঁহার চরিত্র-অধ্যয়ন-প্রণালী কাব্যানুমোদিত নহে। তাঁহার নাটকগুলিকে প্রকৃতপক্ষে নাটক বলা চলে না। কারণ, চরিত্র ও ঘটনা ব্যতীত নাটক হয় না; ঘটনাসমাবেশ ব্রাউনিংএর সাধ্যাতীত। কিন্তু জীবন, মৃত্যু ও অমরত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বহু উক্তি চমৎকার। তিনি যদি আপনার ভাণ্ডার হইতে বাছিয়া রত্ন দিতেন, তবে হয় ত মিল্‌টনের স্বর্ণসিংহাসনের পার্শ্বেই তাঁহার স্থান হইত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।

গত কয়েক বৎসর সমালোচকগণ টেনিসনের সমালোচনাপ্রাচুর্য্যে পাঠকগণকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ফলে তাঁহাদের অনুবীক্ষণতলে দোষ ও গুণ উভয়ই বড় দেখাইতেছে; টেনিসনের কবিতা কুতূহলী বৈজ্ঞানিকের নখরবিচ্ছিন্ন কুসুমের দশা প্রাপ্ত হইতেছে। টেনিসনের যথেষ্ট দোষ আছে। এমন যে মধুর May Queen, তাহার করুণ রস কৃত্রিম। Dora প্রভৃতি রচনামাধুর্য্যে চিরসুন্দর, কিন্তু তাহাতে আকর্ষক কি আছে? প্রচলিত ধর্ম্মমত ও বিজ্ঞান মধুর কবিতায় সন্নিবিষ্ট করা কি প্রতিভার সদ্ব্যবহার? তবে তাঁহার রচনাচাতুরী অসাধারণ; তিনি কখনও অসম্পূর্ণ দ্রব্য লোকচক্ষুর সম্মুখে আনেন নাই। নিভৃতে সম্পূর্ণ করিয়া তবে বহির্জগতে আসিয়াছেন। কবিতা হীরকখণ্ড বুঝি আর কেহ তেমন উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তিনি শিল্পিমাত্র; তাই যখনই তিনি বড় কিছু চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই বিফলমনোরথ হইয়াছেন। Maud ও In Memoriam সমগ্র ধরিলে সামান্য—স্বতন্ত্র গীতিকবিতার হিসাবে অতুলনীয়। Idylls ও তেমন হয় নাই; তবুও সে Splendid failure. তাঁহার নাটকগুলি ভাল নহে; কারণ, তিনি গীতিকবি। কিন্তু যখন Maudএর কথায় প্রেমোন্মত্ত চরিত্র স্মরণ করি, যখন বুঝিতে পারি যে, সেক্সপীয়র ব্যতীত আর কেহ উন্মাদের তেমন চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই, যখন বহু সমুজ্জ্বল কবিতার হার-রূপে In Memoriam পাঠ করি, যখন তাঁহার শত গীত হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে থাকে, তখন সব ভুলিয়া তাঁহাকে কবিগুরুর সিংহাসনে বসাই। সমালোচককে বলিতে ইচ্ছা করে, কোকিলের কুহুর উৎস দেখিবার জন্য তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিও না; ফুলের উপাদান বিজ্ঞান লক্ষ্য করুক,—তুমি আমি তাহার সৌন্দর্য্যের উপভোগ করিয়া ধন্য হই।

টেনিসন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিদিগের অগ্রণী ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও টেনিসন। একের গৌরব ভাবের গভীরতায়, গাম্ভীর্য্যে ও জ্ঞানে; অপরের গৌরব সৌন্দর্য্যরচনায়, শিল্পকলায়—সঙ্গীতে।

হুমায়ুন ও শের শাহ।*

১

মোগলকুলতিলক বাবর পরলোকগমন করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসের উদ্দিন মহম্মদ হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে হুমায়ুনের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল; তিনি ফলিত জ্যোতিষের আলোচনায় অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি রাজদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনার জন্য সাতটি কক্ষ সুসজ্জিত করিয়া সপ্ত গ্রহের নামানুসারে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই সকল কক্ষের গৃহসজ্জা, চিত্রাবলী ও ভৃত্যগণের পরিচ্ছদ অধিষ্ঠাতা গ্রহগণের চিহ্ন (emblem) দ্বারা বিশেষিত ছিল। যে দিন যে গ্রহের প্রভাব বিদ্যমান থাকিত, সেদিন সেই গ্রহের নামানুসারে কল্পিত কক্ষে হুমায়ুন দরবার করিতেন; এতদ্ব্যতীত রাজদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহার যে গুণের প্রাধান্য থাকিত, তাঁহাকে তদ্রূপগুণবিশিষ্ট গ্রহের নামে কথিত কক্ষে উপস্থিত হইতে হইত। কবি, পরিব্রাজক ও বিদেশীয় রাজদূত সোমকক্ষে, বিচারক, শাস্ত্রবেত্তা ও কার্য্যাধ্যক্ষ বুধকক্ষে, এবং সৈনিক পুরুষ বৃহস্পতিকক্ষে রাজদর্শন লাভ করিতেন। (১)

হুমায়ুন রাজকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য চতুর্ভূতের নামানুসারে চারিটি বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—আতসী, হাওয়াই, আবি ও খাকি। এই বিভাগচতুষ্টয়ের কার্য্যসম্পাদনের জন্য চারি জন মন্ত্রী নিযুক্ত ছিলেন। যে সকল দ্রব্য (যথা, নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র ও যন্ত্র প্রভৃতি) প্রস্তুত করিবার জন্য অগ্নির আবশ্যক হইত, তাহার নির্ম্মাণকার্য্য আতসী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিচ্ছদ-

---

* 1. Akbarnama, Translated into English by H. Beveridge. 2. Riaz-us-salatin. 3. Stewart's History of Bengal. 4. Elphinstone's History of India. 5. Oriantal Annuals. 6. Elliot's History of India, Vols. IV & V. 7. Malleson's Akbar. 8. Keen's The Turks in India. 9. Dow's History of Hindostan. Vol II. 10. শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের আর্য্য-কীর্ত্তি।

(১) বৃহস্পতি নামক গ্রহের পাশ্চাত্য নাম Mars. পাশ্চাত্য পুরাণশাস্ত্রে (mythology) mars রণ-দেবতা বলিয়া বর্ণিত।

গৃহ, পাকশালা ও আস্তাবল প্রভৃতি হাওয়াই বিভাগের অধীন ছিল। সরবতখানা, সুজিখানা ও খাল (canal) প্রভৃতির কার্য্য আবি বিভাগের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইত। কৃষি, পূর্ত্ত, খালসা ভূমি ও কোন কোন গৃহকার্য্যের জন্য খাকি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল।

অখণ্ড শান্তির সময়েই এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদের উপভোগ সম্ভবপর। হুমায়ূন দীর্ঘকাল এইরূপ নির্দ্দোষ খেয়ালে লইয়া অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। নানাবিধ গুরুতর রাজকার্য্যে বিব্রত হইয়া তাঁহাকে এ সব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

বাবরের আর তিন পুত্র ছিল; কামরান, হিন্দাল ও মিরজা আস্করী। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র হুমায়ূনকেই দিল্লীর সাম্রাজ্যভার প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং অপর রাজকুমারগণের রাজসিংহাসনে কোনও অধিকার ছিল না। কিন্তু কামরান রাজ্যলালসা দমন করিতে না পারিয়া পঞ্জাবের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি বীরপ্রসূ সুদৃঢ় আফগানভূমির শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে তথায় কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, হুমায়ূন নববিজিত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। সুতরাং সৈন্যসংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা কামরানের অধিক সুবিধা ছিল। হুমায়ূন এই সকল বিবেচনা করিয়া কাবুল ও পঞ্জাব প্রদেশ কামরানকে প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার উচ্চাশা চরিতার্থ করিলেন। কাবুল রাজ্যকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করা সমীচীন হয় নাই। অনুরক্ত কাবুলী সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত নববিজিত দেশরক্ষা দুঃসাধ্য ছিল। হুমায়ূনের রাজত্বের প্রারম্ভকালে হিন্দুস্থানের মোগল সৈন্য অনুরক্ত কাবুলী যোদ্ধাদের দ্বারাই গঠিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে এই সকল যোদ্ধার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে কাবুলকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করার কুফল পরিস্ফুট হইয়া উঠে, এবং বাদশাহ অনুরক্ত সৈন্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হন। কামরানকে পরিতৃপ্ত করিয়া বাদশাহ অন্তর্বিদ্রোহের আশঙ্কায় হিন্দালকে সম্বলের ও মিরজা আস্করীকে মেওয়াতের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন।

কিন্তু হুমায়ূন অন্তর্বিপ্লবনিবারণের জন্য এত করিয়াও নিরাপদ হইতে পারিলেন না। সিংহাসনারোহণের অল্প দিন পরেই বাদশাহের জনৈক অন্তরঙ্গ তাঁহার প্রাণবিনাশ ও সাম্রাজ্য অপহরণ করিবার কল্পনায় ষড়যন্ত্রে

লিপ্ত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই দুরাকাঙ্ক্ষের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল, এবং তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া গুজরাটের স্বাধীন মোসলমান অধিপতি বাহাদুর শাহের শরণাপন্ন হইলেন। হুমায়ূন তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বাহাদুর শাহকে অনুরোধ করিলেন। বাহাদুর শাহ আশ্রিত ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে উভয়ের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল।

ইহার পর দিল্লীর আফগানবংশীয় শেষ নরপতি ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলাউদ্দীন বাহাদুর শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাহাদুর শাহের পূর্ব্বপুরুষগণ লোদীবংশের রাজত্বকালেই উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং বাহাদুর শাহ নিজেও ইব্রাহিম লোদীর নিকট উপকৃত ছিলেন। এই সকল কারণে তিনি আলাউদ্দীনের উত্তেজনায় হুমায়ূনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। আলাউদ্দীন তাঁহার অর্থসাহায্যে বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া স্বীয় পুত্র তাতার খাঁকে সৈনাপত্যে বরণ পূর্ব্বক হুমায়ূনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বাদশাহ শত্রুসৈন্য অনায়াসে পরাজিত করিলেন; সেনাপতি তাতার খাঁ শত্রুহস্তে নিহত হইলেন।

অতঃপর হুমায়ূন বাদশাহ এই শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার জন্য বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। (১) বাহাদুর শাহ মন্দিসুর নামক স্থানে গড়বন্দী শিবির সংস্থাপন করিয়া শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাদশাহ অর্দ্ধবৎসর কাল তাঁহার শিবির অবরোধ করিয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি শত্রুশিবিরে রসদপ্রেরণের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। এই উপায় অবলম্বনের পর অচিরে বাহাদুর শাহের সৈন্যমধ্যে খাদ্যাভাব উপস্থিত হইল। বাহাদুর শাহ বীরপুরুষের ন্যায় আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া, ভয়ব্যাকুল ও নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ এত দূর শোচনীয় হইয়া পড়িল যে, তিনি একদা রাত্রিযোগে পাঁচ জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সমভিব্যাহারে পলায়ন করিলেন। বাহাদুর শাহের পলায়নবার্ত্তা প্রচারিত হইয়া পড়িবামাত্র আপামর সাধারণ সকলেই প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

(১) গুজরাটযাত্রার পূর্ব্বে তিনি জৌনপুরাধিপতি সুলতান মামুদকে সমূলে উচ্ছিন্ন এবং চুনারদুর্গাধিপতি শেরকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করেন; তদ্বিবরণ পরে বিবৃত হইবে।

হুমায়ূন বাদশাহ প্রাতঃকালে এই সংবাদ অবগত হইয়া বাহাদুর শাহের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধৃত করিতে পারিলেন না। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গুজরাট রাজ্য অধিকার করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। হুমায়ূন অচিরে সমতলভূমি অধিকার করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ হস্তগত করিবার কল্পনায় চাম্পানর দুর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি একদা রাত্রিকালে দুর্গদ্বার আক্রমণ করিবার জন্য অল্পসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সম্প্রদায় দুর্গদ্বার আক্রমণ করিলে দুর্গরক্ষক সসৈন্যে তথায় উপনীত হইলেন। অন্য দিকে বাদশাহ কেবলমাত্র তিন শত সৈন্য লইয়া লৌহকীলকের সাহায্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াও সহজে দুর্গজয় করিতে পারিলেন না। দুর্গরক্ষক শত্রুকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য প্রাণ-পণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আত্মসমর্পণকালেও শত্রুকে সুবিধাজনক সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া লইলেন। ফলতঃ, হুমায়ূন তুমুল যুদ্ধের পর বহুকষ্টে দুর্গজয় করিতে সমর্থ হইলেন। চাম্পানর দুর্গের দুর্ভেদ্য অবস্থান, শত্রুসৈন্যের সংখ্যাধিক্য ও বাদশাহের অসমসাহসিকতার বিষয় চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে, তিনি এই দুর্গ-বিজয় সম্পন্ন করিয়া তদানীন্তন বীরেন্দ্রসমাজে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

দুর্গাভ্যন্তরে প্রচুর ধনরত্ন প্রোথিত ছিল। কোন স্থানে এই প্রচুর ধনরাশি নিহিত ছিল, তাহা কেবল বাহাদুর শাহের এক জন কর্ম্মচারী অবগত ছিলেন। মোগল রাজপুরুষগণ ধনরাশি কোথায় লুক্কায়িত আছে তাহা অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে যন্ত্রণা দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু বাদশাহ তাঁহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে সদ্ব্যবহারে বশীভূত করি-বার আদেশ দিলেন। তিনি মোগলের সদ্ব্যবহারে একান্ত প্রীত হই-লেন, এবং রাত্রিকালে তাঁহাদের কৌশলে সুরাপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া গুপ্ত ধনের তথ্য প্রকাশ করিলেন। হুমায়ূন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অসংখ্য ধন রত্ন প্রাপ্ত হইলেন, এবং প্রত্যেক সৈনিকপুরুষকে এক এক ঢাল পরিমিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিলেন।

হুমায়ূন গুজরাট বিজয় সম্পন্ন করিয়া তথায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে

মিরজা আস্করীর হস্তে গুজরাটের শাসনভার অর্পণ করিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি গুজরাট পরিত্যাগ করিলে মোগল রাজপুরুষগণ আত্মকলহ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ইহাতে তাঁহারা ক্রমশঃ এত দূর হীনবল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন যে, বাহাদুর শাহ অচিরে বিনা যুদ্ধে পুনর্ব্বার গুজরাট রাজ্য অধিকার করিলেন।

হুমায়ূন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন,—বিহারের শাসনকর্ত্তা আফগানবংশোদ্ভব শের খাঁ নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় ক্রমশঃ সমুজ্জ্বল হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

২

শের অধ্যবসায়ের অবতার। তাঁহার প্রকৃত নাম ফরিদ। তিনি একটি ব্যাঘ্র স্বহস্তে বধ করিয়া শের উপাধি প্রাপ্ত হন। শেরের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাস আফগানভূমির অন্তর্গত রো নামক পার্ব্বত্য প্রদেশ। তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ শূরবংশোদ্ভব বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট একান্ত গৌরবভাজন ছিলেন। শেরের পিতামহ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যপরীক্ষার জন্য দিল্লীতে আগমন করেন। শের খাঁর পিতা হোসেন স্বীয় ক্ষমতাবলে সাসেরাম ও তাণ্ডার জায়গীর প্রাপ্ত হন।

বীর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই সিংহশাবকের সহিত বল পরীক্ষা করিয়া থাকে। কর্ম্মী শেরও শৈশবকালেই আপনার কর্ম্মোজ্জ্বল জীবনের পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শিশু শের একদা পিতার প্রভুর অধীনে কর্ম্মপ্রার্থী হইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তাদৃশ অল্পবয়স্ক বালক কখনও রাজকার্য্যের উপযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া হোসেন তাঁহাকে এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিতে বলেন। শের খাঁ পিতার নিষেধবাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া মাতার নিকট মনোভিলাষ প্রকাশ করেন। এবং তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে হোসেন পুত্রকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিবার জন্য স্বীয় প্রভুর নিকট লইয়া যান। তদীয় প্রভু শিশুর এই ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে একখানি গ্রাম পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন, এবং ভবিষ্যতে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহাতে শিশু শেরের আনন্দের পরিসীমা ছিল না।

হোসেন একাধিক রমণীতে অনুরক্ত ছিলেন; সুতরাং একমাত্র বিবাহিতা পত্নী শেরের মাতার সঙ্গে তাঁহার তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না। এ জন্য তিনি

তাঁহার গর্ত্তজ সন্তানদিগকে সযত্নে লালনপালন করিতেন না। শের পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া অভিমানভরে সাসেরাম পরিত্যাগ করিয়া জোনপুরে গমন করেন। পিতা পুত্রকে পুনর্ব্বার গৃহে আনয়ন করিবার জন্য জোনপুরের শাসনকর্ত্তার নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তদনুসারে শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন, "যদি আমার জ্ঞানতৃষ্ণানিবারণের জন্যই পিতা আমাকে আহ্বান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি এখানেই বিদ্যাশিক্ষা করিব। জোনপুর বিদ্বজ্জনপূর্ণ।" এই সময় জোনপুরে জামাল খাঁ শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এক জন উদারহৃদয় বিদ্যোৎসাহী শাসনকর্ত্তা বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শের খাঁ অচিরে তাঁহার প্রসাদভাজন হইয়া সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশলাভ করেন। এই স্থানে তিনি প্রবল উৎসাহে জ্ঞানোপার্জ্জনে নিরত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাকরণ ও কাব্য প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। (১) দানশীল জামালের আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি অধিকাংশ সময়ই কাব্য, ইতিহাস ও মহৎ জীবনের আখ্যায়িকার আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। (২)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

---

(১) "He also studied thoroughly the Kafia (a work on grammar) * * *. He had got by heart the Sikandarnama, the Gulistan, and Bostan, &c. and was also reading the works of Philosophers. Tarikh-i SherShahi."

(২) উত্তরকালে শের খাঁ একদা বাল্যকাহিনী বর্ণনা করিবার সময় বলিতেছিলেন যে, তিনি যৌবনের প্রারম্ভে আত্মোন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতেন; শিকার উপলক্ষে প্রত্যহ পনের ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ তাঁহার অভ্যস্ত ছিল। একদা এইরূপ ভ্রমণকালে তিনি দস্যুহস্তে পতিত হইয়া সংসর্গদোষে লুণ্ঠন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। তিনি এক দিন সদলে নৌকায় উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া জলগর্ভে পতিত হন, এবং তিন ক্রোশ সন্তরণ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ইহার পর তিনি দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করেন। তারিখ-ই-দাউদী নামক গ্রন্থে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীযুক্ত ডসন এই বর্ণনায় আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন যে, মোগলের আশ্রিত প্রত্যেক ইতিহাসবেত্তাই শেরের বাল্যজীবন লুণ্ঠনানুরক্ত ছিল বলিয়া বর্ণনা করিতে আনন্দ অনুভব করিয়াছেন।



মাতৃমূর্ত্তি ।

KUNTALINE PRESS.

চিত্রশালা।

মাতৃমূর্ত্তি ।

অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, ধর্ম্মের কমককিরণে শিল্প বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কারণা-নুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ধর্ম্মের মত হৃদয়গ্রাসী আর কিছুই নাই। বাস্তবিক ধর্ম্ম ক্ষুধাতৃষ্ণাদিরই মত প্রবল হইতে পারে। ধর্ম্মের জন্য মানুষ সব করিতে পারে; তাই ধর্ম্মের নামে জগতে যত অধর্ম্ম আচরিত হইয়াছে, তত আর কোন রূপে হয় নাই। দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। তাই যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মভাব প্রবল হয়, তখন সে ধর্ম্মভাব সহস্র পথে আপনাকে প্রকাশিত করে। সাহিত্যে ও শিল্পে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। হিন্দুর শিল্পচাতুরী দেবমন্দিরে। মুসলমানের মসজেদে কি শিল্পনৈপুণ্য! প্রাচীন গ্রীস আপনার দেবমূর্ত্তিতে ও দেবমন্দিরে কি শিল্পই অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে!

খৃষ্টীয় শতাব্দীতেও য়ুরোপে ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রের বাহুল্য বিস্ময়কর। খৃষ্টের জীবনের নানা অবস্থার নানা চিত্র সকল চিত্রশালাতেই দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু বহু চিত্রকর খৃষ্টের জননীর চিত্রাঙ্কন জীবনসাধনা করিয়াছেন। এক র‍্যাফেলই বিংশতির অধিক মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার "সিস্‌টাইন ম্যাডোনা" ড্রেসডেনের চিত্রশালায় একটি স্বতন্ত্র কক্ষে রক্ষিত। সেই চিত্রখানির দর্শনলালসায় দেশ বিদেশ হইতে বহু যাত্রী সেই স্থানে গমন করে। কথিত আছে, খৃষ্টীয় শতাব্দীতে অঙ্কিত সর্ব্বপ্রথম প্রতিকৃতি খৃষ্ট-জননীর; সে চিত্র লুকের অঙ্কিত।

মানব তাহার কল্পনায় আপনাকে একেবারে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। তাহার স্বর্গ জগতের সুখসমষ্টিমাত্র; তাহার দেবতা মানবের গুণসমষ্টিমাত্র। মিল্টনের ঈশ্বরও মানব; শিল্পীর মাতৃমূর্ত্তি মানবীর মূর্ত্তি। সে অধরে কি করুণা, সে নয়নে কি স্নেহ, সে অনিন্দ্যসুন্দর আননে কি পবিত্র ভাব! অঙ্কে নিষ্পাপতার চিত্র নধর শিশু। মানবের গৃহে গৃহেও শিশু-ক্রোড়ে মাতার এই সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি বিদ্যমান।

অধুনা জর্ম্মান শিল্পী হার ভন বোডেনলুসেন মাতৃমূর্ত্তিচিত্রণে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার চিত্রিত মাতৃমূর্ত্তি দিব্যপুণ্যসমুজ্জ্বল, স্নিগ্ধস্নেহার্দ্র, অনিন্দ্যসুন্দর। আমরা "সাহিত্যে"র পাঠকবর্গকে সেই চিত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলাম।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। চৈত্র। এই সংখ্যায় 'ভারতী'র চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হইল। 'তত্ত্ববোধিনী' ভিন্ন এত পুরাতন মাসিকপত্র বাঙ্গালায় আর দ্বিতীয় নাই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৮৪ সালে 'ভারতী'র প্রতিষ্ঠা করেন। সাত বৎসর পরে, ১২৯১ সালে শ্রীমতী স্বর্ণ-কুমারী দেবী 'ভারতী'র লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন। তাহার দুই বৎসর পরে 'বালক' ভারতীর সহিত মিলিত হয়। ১৩০২ সালে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর নিকট হইতে ভারতীর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী কিছু দিন একযোগে সম্পাদন

করেন। ১৩০৫ সালে কবিবর রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র সম্পাদক হন। অবশেষে ১৩০৬ সাল হইতে বর্ত্তমান সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবী বি. এ. ভারতীর সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। শ্রীমতী সরলা দেবীর অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ও অসীম যত্নে 'ভারতী' নবজীবন লাভ করিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে মহিলার প্রভাব অল্প নহে। আমাদের সাময়িক সাহিত্যও সেই পুণ্য-প্রভাবপূত, ইহা স্মরণ করিলে সৌভাগ্যগর্ব্বের উদয় হয়। শ্রীমতী সরলা দেবী অসময়ে মৃতপ্রায় 'ভারতী'র ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াই নিরস্ত হন নাই; নিরন্তর শুশ্রূষায় তাহাকে সুস্থ সবল করিয়া তুলিয়াছেন। 'ভারতী'র উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, প্রসাধন তাঁহার জীবনব্রত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই মাসের 'সাহিত্যে' 'ভারতী'র বর্ত্তমান সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবীর একখানি প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল।

চৈত্রের ভারতীর সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর "স্বপ্নভঙ্গ" নামক একটি ক্ষুদ্র কবিতা। আরম্ভ মন্দ নয়; কিন্তু উপসংহার বুঝিলাম না। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "পল্লীগ্রামে দোলযাত্রা" একটি সুখপাঠ্য রচনা। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নারীজাতির অধিকার" আলোচনার যোগ্য। "পাঠান সাম্রাজ্যে প্রজা" শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের রচনা;—বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। এই প্রবন্ধটিই এবারকার 'ভারতীর' সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কার। লেখক নূতন ব্রতী; কামনা করি, তাঁহার সাধনা সফল হউক।

স্বাস্থ্য। ফাল্গুন, চৈত্র। এই সংখ্যায় 'স্বাস্থ্যে'র চতুর্থ বৎসর পূর্ণ হইল। 'স্বাস্থ্যে'র পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। "স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ" বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। "রোগের কারণ বা রোগপ্রবণতা", "মসূরিকা বা বসন্ত", "প্লেগ" প্রভৃতি প্রবন্ধ সুলিখিত ও শিক্ষাপ্রদ। "পিত্তবিকার" প্রবন্ধটি অত্যন্ত আবশ্যক ও সময়োপযোগী। যকৃতের দোষ বোধ করি অধুনাতন সভ্যতার চিরসহচর—অপরিহার্য্য দোসর। লেখক এই প্রবন্ধে যকৃত দূষিত হইবার কারণ ও যকৃতরোগীর পালনীয় নিয়মাবলীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্থানাভাবে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। "স্বাস্থ্য"-সম্পাদক দ্রব্যগুণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এবার, তুতিয়া, অনন্তমূল, মধু, চিরেতা, ও লবঙ্গের গুণ লিপিবদ্ধ দেখিলাম। 'স্বাস্থ্যে'র উপযোগিতা ও উপাদেয়তা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে।

নবপ্রভা। প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা; ফাল্গুন। নবপ্রকাশিত 'নবপ্রভা' দেখিয়া নিরাশ হইয়াছি। প্রথম সংখ্যায় ষোলটি বিষয়;—কোনও কোনও রচনা দুই এক পৃষ্ঠা-মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কতক আবার ক্রমশঃপ্রকাশ্য। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের একান্ত অভাব। আর দুই এক সংখ্যা না দেখিয়া কিছু বলিব না। "হাসির গান" আবার প্রকাশিত হইল কেন? ইতিপূর্ব্বে "ভদ্রগণ! প্রস্তাব করিতে আমি চাই" একবার যে ভারতীর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে! শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "বনলীলা" নামক মধুর কবিতাটি উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্তু অঙ্গহীন বলিয়া মনে হয়। ইতিপূর্ব্বে 'এডুকেশন গেজেটে' ইহার সমগ্র রূপ দেখিয়াছিলাম। কবিই অঙ্গহীন করিয়াছেন, না সম্পাদক মহাশয় 'সুরুচি'র কাঁচি দিয়া কবিতা-বিহগীর পাখা দুটি ছাঁটিয়া দিয়াছেন?

সখী। প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা; মাঘ। মাঘ-সংখ্যার পর আর আমাদের হস্তগত হয় নাই। প্রথম সংখ্যায় সর্ব্বপ্রথমে "সখী" নামক একটি পদ্য—

"আসিয়াছি আমি শিশির প্রভাতে—
স্নেহের অঞ্চল দিয়া ঢাকিও আমায়।"

কবিতা হয় নাই। যাহা গদ্যে বলা যায়, তাহার জন্য কবিতার শ্রাদ্ধ কেন? কিছু দিন পরে 'ডাল ও ভাত' গীতিকাব্য বা 'সুপাচ্য সুরুয়া' মহাকাব্য দেখিলে বিশেষ বিস্মিত হইব না। ছন্দে গাঁথিলেই কবিতা হয় না,—পৃথিবীর প্রত্যেক বক্তব্য কবিতার বিষয় হইতে পারে না,—ইহা বাঙ্গালী কবি কবে বুঝিবেন, বলিতে পারি না। সাহিত্যে ছন্দের বিড়ম্বনা ও অপব্যবহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বক্ষ্যমাণ কবিতাটি তাহার অন্যতর প্রমাণ। "সঙ্কল্পে" প্রকাশ, "নারীচিত্তের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুশীলন লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া 'সখী' অতি সন্তর্পণে বঙ্গ-গৃহে পদক্ষেপ করিল।" ভাষাটুকু ফিরিঙ্গী-গন্ধি,—পড়িয়া মনে হয়, যেন জেনানা-মিশনের মাষ্টারনী অপরূপ বাঙ্গলার বেসাতি লইয়া হিঁদুর মেয়েকে বাঙ্গলা শিখাইতে বা ভুলাইতে আসিতেছেন। তা সে কথা যাক,—আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সখীর উচ্চ লক্ষ্যের সাফল্য কামনা করি। "শ্রীমতী আনন্দীবাঈ জোশীর" জীবনচরিত সখীর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। আরম্ভে লেখক একটু অধিক ফেনাইয়াছেন; আশা করি, ভবিষ্যতে সংযত হইবেন। "ন-বসন্ত" ও "রাজকুমারী মাইচাম্পা" চলনসই রচনা। "বালুকেশ্বর," "কমলা লেবু" প্রভৃতি 'চ-বা-তু-হি' র ন্যায় নিতান্তই 'পাদপূরণার্থ'।

উদ্বোধন। চৈত্র;—পঞ্চম ও ষষ্ঠ-সংখ্যা। এই চৈত্রে 'উদ্বোধনে'র' তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হইল। পঞ্চম সংখ্যার "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" প্রবন্ধ উপাদেয়। লেখক স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া এই সন্দর্ভে বিবিধ রত্ন ঢালিয়া দিতেছেন। আমরা স্থানাভাবে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। যিনি না পড়িবেন, তিনি বঞ্চিত হইবেন। স্বামীজী ইচ্ছা করিয়া রচনাটিকে গ্রাম্যভাষার পরিচ্ছদ দিয়াছেন। চলিত গ্রাম্য ভাষা নহিলে যে সাধারণ বাঙ্গালী বুঝিত না, এমন মনে হয় না। যে সকল পাঠক বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন, প্রাঞ্জল সাধু ভাষা তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারিত না। 'রাখাল বেশে' এই জ্ঞানগর্ভ রচনাটির সৌন্দর্য্যহানি হইতেছে।

প্রদীপ। চৈত্র। প্রথমেই শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "প্যারীচাঁদ মিত্র।" লেখক প্যারীচাঁদের মিত্রের সাহিত্যরচনারই আলোচনা করিয়াছেন। প্যারীচাঁদের অধ্যাত্মরচনার আলোচনা তাঁহার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু দুই দিক না দেখিলে টেকচাঁদকে চেনা যায় না। লেখক বলেন,—"টেকচাঁদের ভাষা নিতান্ত তরল," কিন্তু লেখক যে ভাষায় টেক-চাঁদের ভাষাকে 'তরল' বলিতেছেন, সে ভাষা দেখিয়া মনে হয়, চালুনি ছুঁচের ছিদ্র দেখিতে-ছেন। সন্ধিযুগের কর্ম্মবীর বামনের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন। প্রশংসায় আর কেহ কুটিতে পারিত, কিন্তু কেবল প্রশংসায় টেকচাঁদ-চরিত্র বিকশিত হইবার নহে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের "অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর" নামক উৎকৃষ্ট জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভটি এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। ইহাই এবারকার প্রদীপের প্রাণ। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর "সৃষ্টির বিশালত্ব" আর একটি উল্লেখযোগ্য সন্দর্ভ;—এই সবে সূত্রপাত হইতেছে। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "সাজাহান বাদশাহের দৈনিক জীবন" দ্বিতীয় প্রবন্ধ সুপাঠ্য। যাঁহাদের 'এলিয়ট্' পড়িবার উপায় নাই, তাঁহারা উপকৃত হইবেন। "অভিনয়" গল্পটি মন্দ নয়।

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা। সপ্তম ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা; ফাল্গুন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পাদকতায় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা উত্তরোত্তর অধিকতর উন্নত ও গৌরবকিরণে মণ্ডিত হইতেছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছি। সুধী সম্পাদক মহাশয় নূতন পথের পথিক হইয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যে বিশেষত্বের আরোপ করিয়াছেন, তাহাতেই পরিষদের ন্যায় সুধীসমাজের মুখপত্র গৌরবান্বিত হইতে

কাল, রচনাভঙ্গী প্রভৃতির আলোচনা, বাঙ্গলা ভাষার শব্দতত্ত্ব, বিবিধবিষয়িণী পরিভাষা, পুরাতন পুঁথির বিবরণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সমাবেশে পরিষৎ-পত্রিকা এক্ষণে সাহিত্য-সেবীর একমাত্র উপজীব্যে পরিণত হইয়াছে। বক্ষ্যমাণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের "রাঙ্গামাটী বা কর্ণসুবর্ণ" নামক প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধটি যেমন সুলিখিত, তেমনই সারগর্ভ। অল্প পরিসরের মধ্যে এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের সারসংগ্রহ অসম্ভব। প্রবন্ধশেষে পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক বলিতেছেন,—"রাঙ্গামাটীই যে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী, সে বিষয়ে সন্দিহান হইবার সম্যক্ কারণ নাই। এই সম্বন্ধে প্রমাণপরম্পরা একত্র স্থাপিত করিয়া প্রবন্ধলেখক মহাশয় কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।" এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হইবে না। তাহার পর, "কিন্তু লেখককৃত কালনির্ণয় ঐতিহাসিকসম্মত হইবে কি না সন্দেহ।" ত্রিবেদী মহাশয় যে সংশয়ের উত্থাপন করিয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পারিষদেই আমরা তাহার মীমাংসা দেখিবার আশা করি। নিখিলবাবু অতি শ্রমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু যে পরিষদের সভ্য, তথায় এরূপ গুরুতর বিষয়ের আলোচনা না হয় কেন? শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু "জগন্নাথবিজয় ও কবি মুকুন্দ" প্রবন্ধে এক জন অজ্ঞাত প্রাচীন কবি ও তদীয় পুরাতন কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি মুকুন্দ চৈতন্যের বন্দনা করেন নাই, অতএব তিনি চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, এরূপ অনুমান প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুও প্রবন্ধশেষে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে লেখকের আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে, "চণ্ডীদাসকে বঙ্গের আদি কবি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে। কিন্তু তাঁহার রচিত মাত্রাক্ষরপরিমিত কবিতাগুলি পাঠ করিলে স্বতই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, প্রথমেই কোন ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা রচিত হইতে পারে না। মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয়ের কবিতার সহিত চণ্ডীদাসের কবিতার তুলনা করিলে মুকুন্দকে চণ্ডীদাসের শতাধিক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল ১৩২৫ শক ধরিয়া মুকুন্দের আবির্ভাবকাল ১২২৫ শক বা ১৩০৩ খৃষ্টাব্দ নিশ্চয় করিতেছি, সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কবি মুকুন্দ জগন্নাথবিজয় রচনা করিয়াছিলেন।" এই সিদ্ধান্তও নিতান্তই অনুমানমূলক। ঋগ্বেদের অনেক ঋক্ পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যের অনেক রচনা অপেক্ষা সুরচিত ও সুললিত; এই কারণে ঋগ্বেদকে উপনিষদের পরবর্ত্তী বলা যায় না। সুতরাং কেবলমাত্র ভাষার বিচার করিয়া অনুমানবলে চণ্ডীদাসকে সিংহাসনচ্যুত করিতে আমরা সম্মত নহি। শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্যতীর্থের "কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাস" প্রবন্ধে আর এক অজ্ঞাত কবির পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি সুপ্রথিত মহাভারতকার কাশী-রাম দাসের জ্যেষ্ঠ;—নাম কৃষ্ণদাস। কবি কৃষ্ণদাস 'কৃষ্ণবিলাস' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। কাশীদাসের কনিষ্ঠও কবি; তিনি জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থের রচনা করেন। জগন্নাথ-মঙ্গলেই ইহাঁদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একটি রীতিমত কবির পরিবার! চট্টগ্রামনিবাসী সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম এই সংখ্যায় অনেকগুলি "প্রাচীন পুঁথির বিবরণ" লিপিবদ্ধ করিয়া সাহিত্যসমাজকে আনন্দিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বাঙ্গলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ" আর একটি উপাদেয় সন্দর্ভ।

হিমারণ্য।

অদ্য ৩১ এ জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই 'মল্‌হারী' আসিয়া উপস্থিত হই। তিন দিনের পর লোকালয় পাইয়া মনে বড় আনন্দ হইল। গ্রামবাসীরা আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। কেহ ধর্ম্মশালা পরিষ্কার করিতে লাগিল, কেহ কাষ্ঠ কেহ অগ্নি আনয়ন করিয়া অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া দিল। আমি ধর্ম্মশালার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বিশ্রাম করিতে করিতে গ্রামবাসীদিগের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। কোন আহার্য্য বস্তর গন্ধ পাইলে মুহূর্ত্তমধ্যে পিপিলীকার দল যেমন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ গ্রামবাসী বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী সকলে আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া বসিল। অদ্য আমি তাহাদের নিকট একটি আমোদের বস্তু হইয়া পড়িলাম। আমি বলিলাম, "তোমাদের এ দেশে বড় শীত। এই দেখ, আজ যদি তোমরা আমাকে ধুনি (অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ড) জ্বালাইয়া না দিতে, তাহা হইলে আমি মারা যাইতাম। এই ত গ্রীষ্মকাল, শীতে তোমরা কি করিয়া থাক?" গ্রামবাসীদের মধ্যে একটি বৃদ্ধ বলিল, "এখানে শীতকালে টেকা যায় না। এই যে চারি দিকে পর্ব্বত ও সমতলভূমি দেখিতেছেন, আর যত নদী নালা আছে, শীতের প্রারম্ভে এ সমস্তই বরফে ডুবিয়া যাইবে। আমাদের বাড়ী ঘর সকলই বরফে আবৃত হইয়া যাইবে। এখানে জন প্রাণী কেহই থাকিবে না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শীতকালে তোমরা কোথায় থাক?"

গ্রামবাসী। যশীমঠের ১৮ মাইল নীচে লালসাঙ্গা নামক স্থানে।

আমি। তবে ত বড় কষ্ট!

গ্রামবাসী। মহাশয় কষ্টের কথা কি বলিব? ছেলে পিলে, গরু, বাছুর, ভেড়া, বকরি লইয়া প্রতিবৎসর যাওয়া আসা বড়ই কষ্ট।

আমি। তবে নীচে যাইয়া থাক না কেন?

গ্রামবাসী। গ্রীষ্মের সময় নীচে থাকিলে আমরাও প্রাণে মরিব, ভেড়া বকরি, গরু, বাছুরের চিহ্নও থাকিবে না।

আমি। সেই স্থানেও কি তোমাদের ঘর বাড়ী প্রস্তুত আছে?

গ্রামবাসী। আজ্ঞে না; এই গ্রামে আমাদের সমস্ত গৃহসম্পত্তি, সেই স্থানে যাইয়া আমরা সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকি; কেহ কেহ তাম্বুতেও বাস করেন। আর আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদের বাড়ীও আছে। তবে তাহার সংখ্যা অতি অল্প।

আমি। যখন তোমরা লালসাঙ্গায় যাও, তখন তোমাদের গৃহসামগ্রী ও শস্যাদি কি সঙ্গে লইয়া যাও, না এইখানেই পড়িয়া থাকে? নীচে যাইবার সময় কখন?

গ্রামবাসী। প্রায় আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি; যখন বরফ পড়িবার পূর্ব্বাভাস পাই, তখনই মালপত্র, গৃহসামগ্রী, ধান চাউল, আটা ও গোধূম প্রভৃতি গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখি, এবং ব্যবহারের উপযোগী তৈজসপত্র ও আহারোপযোগী খাদ্য লইয়া নীচে প্রস্থান করি। তখন পালিত পশু ও পরিবারবর্গ সহ আমরা লালসাঙ্গায় যাত্রা করি।

আমি। তখন ত চোরের উৎপাত হয় না?

গ্রামবাসী। আজ্ঞে না; তখন এই সকল গ্রাম ও রাস্তায় গমনাগমন অসাধ্য; কারণ, বরফ পড়িয়া সমস্ত রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়। চোরের কথা দূরে থাক, গ্রাম্য পশুও এখানে থাকিতে পারে না। এই যে সম্মুখে উচ্চ পর্ব্বত দেখিতেছেন, সেই সকল পর্ব্বতে এখন নানাজাতীয় মৃগ, কস্তূরীমৃগ, ও মুনাল প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বিহঙ্গমকুল বাস করিতেছে; যখন তুষারপাতে গ্রাম অগম্য হইয়া যাইবে, তখন ঐ সব মৃগ পক্ষী আসিয়া আমাদের গ্রামে বাস করিবে, এবং শীতের কয় মাস তাহারা এখানেই থাকিবে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে আমরা যখন এখানে আসিব, সেই সময় তাহারা আমাদের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ শিখরে চলিয়া যাইবে। এমন কি, এখন যে সব সুন্দর সুন্দর বিহঙ্গমকুল এখানে দেখিতেছেন, শীতারম্ভে তাহার একটিও এখানে থাকিবে না। শীত আসিবার পূর্ব্বেই তাহারা নীচে চলিয়া যায়। তাহারা নীচে যাইবার পরই আমরা নীচে যাইবার ব্যবস্থা করি। কোন কোন বৎসর আশ্বিনের প্রথমেও বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়। কখন বরফ পড়িবে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পর্ব্বতের পাখীরা তাহা বুঝে। অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, বরফ পড়িবার ১৫ দিন পূর্ব্বে তাহারা এই স্থান পরিত্যাগ করে; এবং আমরাও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া থাকি।"

এই সমস্ত ও অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর এক জন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কি তিব্বত যাইবার দিন স্থির করিয়াছ?" সে উত্তর করিল, "১০ই আষাঢ় আমাদের গ্রামবাসীরা তিব্বত যাত্রা করিবে।" এখন পাঠকবর্গের জানা আবশ্যক যে, প্রতি বৎসরই নিতি ঘাটার দশবার থানি গ্রামের লোক বাণিজ্যার্থ তিব্বত যাত্রা করিয়া থাকে। তাহাদিগের যাত্রার সময় আষাঢ়ের ৮।১০ হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে আর কেহই ঘরে থাকিবে না। বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রী ভিন্ন সকলেই তিব্বত চলিয়া যাইবে; আবার আশ্বিন মাসের প্রথম পক্ষেই গ্রামে ফিরিয়া আসিবে। তার পর আশ্বিনের পূজা সমাপন করিয়া যশীমঠের নীচে আপন আপন নির্ণীত স্থানে চলিয়া যাইবে। যশী-মঠের নীচে লালসাঙ্গা হইতে নন্দপ্রয়াগ পর্য্যন্ত ইহাদের শীতবাসস্থান। ইহারা নিতির পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, এবং কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদের বাণিজ্যক্ষেত্র তিব্বত, এবং বাণিজ্যদ্রব্য তণ্ডুল, গোধূম, গুড়, মিছরী ও নানাবিধ রঙ্গিন বস্ত্র। ইহারা এই সমস্ত বস্তু মেষ ও ছাগলের উপর বোঝাই করিয়া বাণিজ্যযাত্রা করে। এক একটি ছাগল বা মেষ ১০ সের হইতে ১৫ সের পর্য্যন্ত ভার লইয়া অতি উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত লঙ্ঘনপূর্ব্বক তিব্বতে যাইয়া উপস্থিত হয়। আসিবার সময় পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের বিনিময়ে লবণ সোহাগা উল্ লইয়া আসে। এই সব ছাগ ও মেষ গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যে ৪।৫ বার নিতি সীমা হইতে তিব্বতে যাতায়াত করে। বস্ত্রাদি নগদ মূল্যে বিক্রয় করে, উল্ নগদ মূল্যে ক্রয় করে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, দুইটা ছাগল বা মেষের রোম ১৲ টাকায় বিক্রীত হইয়া থাকে। এই সব উল্ নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতবাসীরা ক্রয় করিয়া শীতবস্ত্র প্রস্তুত করে, এবং কাণপুর ও লাহোর প্রভৃতি স্থানে চালান দিয়া থাকে। তিব্বতীয় ছাগল ও মেষের রোমে শাল, বনাত ও ধোসা প্রস্তুত হয়। কমায়ুনের যোহার, বৃটিশ গাড়োয়ালের নিতি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রাম, বদরীনারায়ণের উপরবর্ত্তী মানা গ্রাম, গাড়োয়ালের গঙ্গোত্রীর নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রাম, বেসোয়ার ও নেপালসীমান্তবাসী লোকদিগেরই তিব্বতে গিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার আছে। অন্যস্থানীয় লোকেরা বহুকালাবধি এ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। বৃটিশ প্রজাদিগের মধ্যে কমায়ুনের যোহারীরা মিলং পাস দিয়া, নিতি পাসের লোকেরা নিতি ও হোতির পথে, এবং টিরি

গাড়োয়ালের লোক ও বেসোয়ারীরা নিলং পাস দিয়া তিব্বত যাইবে। অন্য পাস দিয়া ইহারা কখনও তিব্বত যাইতে পারিবে না। ইহাদিগের বাণিজ্যের জন্য নিম্নলিখিত স্থানে বাজার বসিয়া থাকে। সিব্‌চিলুম্‌, দ্বাপা, জ্ঞানিমা, খুলিং, ছক্‌রা এবং থুলিং। বাজারকে এই দেশীয় লোকেরা 'মণ্ডি' কহে। 'নিতি' পাসের লোকেরা সিব্‌চিলুম্‌ ও দ্বাপার মণ্ডিতে আসে। মানা পাসের লোকদের মণ্ডি খুলিং। 'মিলিং' পাসের লোকদিগের মণ্ডি থুলিং; এতদ্ভিন্ন তক্‌লাখারে এক মণ্ডি হয়। এই সকল মণ্ডি বা বাজারের যথাযথ বৃত্তান্ত পরে লিখিব। এখন যে গ্রামে বসিয়া এই সব বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, সেই গ্রামের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

ইতিপূর্ব্বে গ্রামবাসী লোকদিগের সহিত আমার যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। এখন সমস্ত লোক আমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে, তিন চারিটি বৃদ্ধ আমার নিকট বসিয়া আছেন। আমি এ দিক ও দিক দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, আমার আহারের জন্য যথেষ্ট খাদ্য বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে। একটি বৃদ্ধ বলিলেন, "আপনি এই সব আহার্য্য গ্রহণ করুন।" আমি সাদরে তৎসমুদয় গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধকে বলিলাম, "আমি এক জন তীর্থযাত্রী; আমার গন্তব্য তীর্থ মানসসরোবর ও কৈলাস। তিব্বতের অন্যান্য তীর্থে যাইবারও ইচ্ছা আছে। তুমি বৃদ্ধ ও তিব্বতে অনেকবার গিয়াছ, আমাকে পথের বিষয় কিছু উপদেশ দাও। কোন্‌ পথে গেলে মানসসরোবরে শীঘ্র শীঘ্র পঁহুছিতে পারিব, সেই বিষয় তোমার কাছে জানিতে ইচ্ছা করি।" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "স্বামীজী, এখন মানসসরোবরে যাওয়া বড় কঠিন ও প্রাণপণ না করিলে তথায় যাওয়া যায় না। কেবল প্রাণপণ চেষ্টাতেও কুলাইবে না, রাজভয় ও বিলক্ষণ দস্যুভয় আছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজভয়টা কি?" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "পূর্ব্বে এই পথে অথবা অন্য পথে সাধুরা অনায়াসে যাইতে পারিতেন; কিন্তু কিছু দিন হইল দুই চারি জন ইংরাজ রাজার লোক সাধুবেশে তিব্বতে প্রবেশ করিয়া তিব্বতের নক্‌সা লইয়াছে ও অন্যান্য ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে, এই সংবাদ রাজধানী 'লাসায়' প্রকাশ হওয়াতে 'লাসা' হইতে এই হুকুম আসিয়াছে যে, সন্ন্যাসীরাও বিনা জামিনে তিব্বতের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না, মানসসরোবর ত দূরের কথা।" আমি বিস্ময়ের সহিত বলিলাম, "তবে কি আমার যাওয়া হইবে না?" সে বলিল,

"কেন হইবে না?" আমি উত্তর করিলাম, "আমার জামিন কে হইবে?" বৃদ্ধ উত্তর করিল, "আপনি সাধু, যে গ্রামে যাইবেন, সেই গ্রামের প্রধানেরাই আপনার জামিন হইতে পারে। এই গ্রামের প্রধানও আপনার জামিন হইতে পারে। তবে কথা এই যে, এই গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের লোকেরা নিতি পাস হইয়া দ্বাপা যাইবে; কারণ, আমাদের বাণিজ্য-স্থান দ্বাপা। আর 'মরগাঁওয়ে'র লোকেরা 'চোরহুতি' হইয়া 'সিবচিলুম' যাইবে; তাহাদের বাণিজ্যস্থান 'সিব্‌চিলুম্।' আপনার পক্ষে 'চোরহুতির' রাস্তাই সুগম। আপনি এখানে ২।৪ দিবস অবস্থিতি করিয়া 'মরগাঁও' যান। এখান হইতে 'মরগাঁও' দুই মাইল। সেই গ্রামের প্রধানের নাম কেদার সিংহ। কেদার সিংহ অতি ভাল লোক; সে আপনাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে ও জামিন হইবে; আর 'মরগাঁও' পর্য্যন্ত আমি আমার পুত্রকে আপনার সঙ্গে দিব, সে আপনাকে তথায় পঁহুছাইয়া আসিবে।" আমিও মনে মনে স্থির করিলাম, কল্যই এই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া 'মরগাঁও' যাইব। এই সব কথা ও অন্যান্য কথাতে রাত্রি অধিক হইয়া পড়িল। বৃদ্ধেরা গৃহে চলিয়া গেল। আমি আহারান্তে নিদ্রা গেলাম।

পরদিবস প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামদর্শনে বাহির হইলাম। এই অঞ্চলের একটি বিশেষত্ব এই যে, যেখানে স্বভাবের বিচিত্রতা, যেখানে দেবদারু, চীর প্রভৃতি বৃক্ষের ঘন সন্নিবেশ, যে স্থানের অদূরে তুষার-মণ্ডিত উচ্চ হিমালয়, যে স্থানের নিম্নে কলনাদিনী স্রোতস্বতী, যে স্থানের নিম্নে ও উর্দ্ধে কৃষির উপযুক্ত উপত্যকা ও অধিত্যকা, সেই স্থানে এক একখানি গ্রাম। আমি যে গ্রামে আছি, সেই গ্রামের নাম 'মল্‌হারী'। 'মল্‌হারী' প্রকৃতির ধনভাণ্ডার, শোভার অঙ্কে প্রতিষ্ঠিত; পশ্চিমে 'ধোলী' নদী ভীষণ গর্জ্জনে গ্রাম কম্পিত করিয়া বিষ্ণুপ্রয়াগের দিকে চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণে দোনাগিরি বা 'গন্ধমাদন'। দোনাগিরির উচ্চতম চূড়া ২৩১৮১ ফিট উচ্চ। দোনাগিরির উচ্চ শিখর চিরতুষারাবৃত। দোনাগিরি হইতে একটি নদী উত্থিত হইয়া এই গ্রামের দক্ষিণ দিক আলিঙ্গন পূর্ব্বক ধোলীতে মিশিয়াছে। গ্রামের পূর্ব্বদিকেও অভ্রভেদী পর্ব্বতরাজি। গ্রামের প্রায় চতুর্দ্দিকে শস্যক্ষেত্র। শস্যক্ষেত্রের মধ্যে গ্রাম প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রাম ১০২০০ ফিট উচ্চ। যশীমঠ হইতে যে পথ ধোলী উপত্যকা ভেদ করিয়া 'নিতি' পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেই পথের উভয় পার্শ্বে এই গ্রামের সন্নিবেশ।

এই গ্রামে শতাধিক গৃহস্থের বাস। গ্রামবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষত্রিয়; দু'চারি ঘর ডোম ও দর্জ্জি আছে। ক্ষত্রিয়েরা বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম করে, ডোমেরা দেবালয়ে বাদ্য বাজায়, দর্জ্জিরা বস্ত্র প্রস্তুত করে। ইহাদের গৃহগুলি প্রায়ই দ্বিতল, মধ্যে দু'চারি খানি একতলা গৃহও দেখিতে পাইলাম। তবে তাহার সংখ্যা অতি অল্প। প্রস্তর ও মৃত্তিকার দ্বারা একতলা প্রস্তুত করে, এই একতলার উপরে কাষ্ঠ দ্বারা দ্বিতীয় স্তর নির্ম্মিত হয়। প্রত্যেক গৃহে দুইখানি করিয়া চাল; চালগুলি খড় বা খোলার চালের অনুরূপ; কিন্তু এই দেশীয় লোকেরা কাষ্ঠ বা প্রস্তর দ্বারা গৃহের চাল প্রস্তুত করে। অধিকাংশ পর্ব্বতে শ্লেট প্রস্তরের ন্যায় এক প্রকার প্রস্তর হইয়া থাকে। এই প্রস্তরের দ্বারাই ইহারা গৃহের চাল ছায়। যেখানে এই প্রস্তর সুলভ নহে, সেখানে কাষ্ঠ দ্বারাই চাল হইয়া থাকে। এই পল্লীবাসীদিগের গৃহগুলি শ্রেণীবদ্ধ, মধ্যস্থলে ছোট খাট রাস্তা; রাস্তার উভয় পার্শ্বে গৃহ। প্রত্যেক গৃহে দুটির অধিক গবাক্ষ নাই। গবাক্ষগুলি গবাক্ষ নামের উপযুক্ত; কেবল শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ না করিলে চলে না, তাহার জন্যই পর্ব্বতীয় গৃহস্থের গৃহে গবাক্ষের সৃষ্টি। গবাক্ষ দিয়া অল্লাধিকপরিমাণে আলো ও বায়ুর সমাগম হইতে পারে। এই স্থানের বায়ু এত শীতল যে, গৃহের মধ্যে একটুমাত্র বায়ু প্রবেশ করিলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। দ্বিতল গৃহগুলির নিম্নতলে গো, মেষ, ছাগল প্রভৃতি পালিত পশুদের স্থান। দ্বিতলটি গৃহস্থের আবাসস্থান। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে ধর্ম্মশালা ও দেবালয়। কোন কোন গ্রামে একাধিক ধর্ম্ম-শালাও দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্য আমি যে গ্রামে আছি, এই গ্রামে তিন-খানি ধর্ম্মশালা ও দু'টি দেবমন্দির। নিম্ন হিমালয়ে পঞ্চপাণ্ডবের বড় আদর। উক্ত স্থানের অধিবাসীদিগকে পঞ্চ পাণ্ডবের উপাসক বলিলেও চলে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চ পাণ্ডবের মন্দির আছে; মন্দিরে রীতিমত পূজাও হইয়া থাকে। এই গ্রামে দুইটি দেবমন্দির, একটি পঞ্চ পাণ্ডবের, অপরটি কুল-দেবতার। ইহাদের কুলদেবতা নন্দাদেবী। সপ্তশতী চণ্ডীতে নন্দাদেবীর উল্লেখ আছে। ইহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীতে ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কিন্তু আচার ব্যবহার অহিন্দু ভুটিয়াদের অনুরূপ। অপরাপর পর্ব্বতবাসীরা যেমন সরল ও সত্যবাদী, প্রবঞ্চনার নামও জানে না, ইহারা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাদের গুণের মধ্যে প্রধান গুণ ইহারা অতিথিসেবায় তৎপর; দেবতা ও সাধুর ভক্ত।

ইহাদের পুরুষদিগের প্রধান কার্য্য বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের মধ্যে ভূমিকর্ষণ। অন্যান্য যাবতীয় কার্য্যই স্ত্রীলোকেরা করিয়া থাকে।

গ্রামবাসীদের বিশেষ অনুরোধে আমি এই গ্রামে একদিবস ও একরাত্রি বাস করিয়া ৩১শে জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণে 'মরগাঁও' আসিয়া উপস্থিত হইলাম। 'মরগাঁও' একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ১৫।১৬ ঘর গৃহস্থের বাস। এই গ্রামে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতি নাই। গ্রামবাসীরা সকলেই দরিদ্র। ইহার মধ্যে কেদার সিংহ অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন। আমি গ্রামে প্রবেশ করিয়াই কেদার সিংহের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। কেদার সিংহ আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার ভৃত্যদিগকে আদেশ করিল, "স্বামীজীর অবস্থিতির জন্য স্থান প্রস্তুত কর।" অনুমান অর্দ্ধ ঘণ্টার পর ভৃত্যেরা আসিয়া বলিল, "স্থান প্রস্তুত হইয়াছে।" কেদার সিংহ আমাকে লইয়া সেই স্থান দেখাইয়া দিল। স্থানটি প্রস্তরের প্রাচীরে বেষ্টিত, ঊর্দ্ধে বস্ত্রাবৃত। চারি দিকে অপ্রশস্ত মাঠ, পূর্ব্ব দিকে পার্ব্বতীয় নদী। স্থানটি আমার খুব মনোনীত হইল। আমি আমার নূতন গৃহে যাইয়া আসন করিয়া বসিলাম। অবিলম্বে একটি ভৃত্য চা, ছাতু ও অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস আনিয়া হাজির করিল। আমি চা পান করিয়া দুরন্ত শীতের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত হইলাম। ছাতু ও মাংস স্পর্শ করিলাম না। ইহা দর্শন করিয়া কেদার সিংহ বলিল, "ও কি করিলেন! আপনি তিব্বতযাত্রী, ছাতু ও মাংস না খাইলে বাঁচিবেন কি করিয়া? তিব্বতের পথে চা, মাংস, ছাতু ভিন্ন অন্য বস্তু দুর্ল্লভ। আপনাকে ছাতু ও মাংস খাইতেই হইবে।" কিন্তু ভবি ভুলিবার নয়। আমি সেই দিবস ছাতু ও মাংস খাইলাম না। কেদার সিংহের স্ত্রী ও ভৃত্যেরা আমার আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিল, কেদার সিংহ আমার নিকটে আসিয়া বসিল। আমি একটু বিশ্রাম করিয়া কেদার সিংহকে বলিলাম, "আমি এখন তোমার অতিথি; তুমি অতিথিসেবার যথেষ্ট উদ্যোগ করিতেছ। তোমার যত্ন ও উদ্যোগ দেখিয়া বড়ই তৃপ্ত হইয়াছি। কিন্তু তোমাকে আমার একটি বাসনা পূর্ণ করিতে হইবে। আমি তিব্বতের মানসসরোবর ও কৈলাস প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিতে বাহির হইয়াছি, তুমি আমার সহায়তা না করিলে আমার তীর্থদর্শন হইবে না।" সে বলিল, "আমার যত দূর সাধ্য, তাহাতে কোনপ্রকার ক্রটী হইবে না, কিন্তু এখানে আপনাকে আরও দশ দিবস অপেক্ষা করিতে হইবে। দাপা হইতে পুলিশের লোক আসিয়াছে, পথে আর তত বরফ নাই। ৯ই আষাঢ় 'ফুলিয়া' যাইবে।

১১ই আষাঢ় আমরা যাত্রা করিব।” বহু দিবস হইতে ‘নিতি’ ঘাটাতে এই-রূপ প্রথা আছে যে ‘গমশালী’ গ্রামের প্রধান, কাঠা অর্থাৎ উচ্চ শৃঙ্গ লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতসীমায় প্রবেশ করিবে, পরে সেই রাস্তায় অপর সাধারণের গমনাগমনের অধিকার হইবে। ‘গমশালী’র প্রধানকে ফুলিয়া কহে। ফুলিয়া কাঠা লঙ্ঘন করিলেই নিতি পাস খোলা হইবে। আরও একটি সুন্দর নিয়মের কথা শুনিতে পাইলাম। আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহের প্রথম ভাগে ভোট হইতে এক জন রাজকর্ম্মচারী আসিয়া সংবাদ দিবে যে, “ভোটে কোন প্রকার সংক্রামক ব্যাধি বা পশুপীড়া নাই। তোমরা ভোটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও।” সেই রাজকর্ম্মচারী সীমান্তদেশে কোনও প্রকার সংক্রামক ব্যাধি বা পশুপীড়া আছে কি না, ইহা অনুসন্ধান করিয়া দ্বাপার রাজাকে সংবাদ দিবে। দ্বাপার রাজা এই সংবাদ পাইয়া তিব্বতের প্রবেশ-দ্বারে পুলিশ পাঠাইয়া দিবেন, এবং সীমান্তবাসী লোকদিগকে বাণিজ্যের জন্য তিব্বত-প্রবেশের অনুমতি দিবেন। কেদার সিংহ বলিল, ‘দ্বাপা’ হইতে ‘সড়জী’ অর্থাৎ পুলিশ আসিয়াছে। পুলিশের থানাও বসিয়াছে। ৯ই আষাঢ় ফুলিয়া যাইবে। ১১ই আষাঢ় আমরা যাইব।” সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাকে দশ দিন এই খানে অবস্থিতি করিতে হইবে। আমাকে একাকী এই দশ দিবস কাল কাটাইতে হইবে। অন্য লোক হইলে ভাবিয়াই অস্থির হইত, আমার অভ্যাস আছে, শিক্ষাও আছে, আমি বাতাসের গলায় দড়ি দিয়া নিকটে বসাই, এবং তাহার সঙ্গে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকি; এই আমার প্রকৃতি। কিন্তু এখানে আসিয়া আমাকে সে প্রকৃতি পরিত্যাগ করিতে হইল। দূর দূর গ্রাম হইতে গ্রামবাসীরা দলে দলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিল। আর পূর্ণানন্দ গিরি নামক জনৈক সন্ন্যাসী তিব্বত যাইবার জন্য আমার আস্তানায় আসিয়া জুটিলেন। লোকটি বড়ই ভক্ত। প্রথমতঃ ইহাকে ভক্তবিটল বলিয়া বোধ হইয়াছিল, পরে কথাবার্ত্তায় ও আচার ব্যবহারে আমার সে ভ্রম দূর হইল। পূর্ণানন্দ আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল, এবং প্রাণমনে তিব্বত-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। পূর্ণা-নন্দের বয়স ২৬।২৭, শ্যামবর্ণ, মস্তকে জটাজূট, ও কৌপীনধারী। পূর্ণা-নন্দের জন্মস্থান কূমায়ুন; এতদ্দেশীয় ভাষাও সুন্দর জানে, সুতরাং পূর্ণানন্দের দ্বারা আমার সঙ্গীর অভাব দূর হইল, এবং নানাপ্রকার কথা-বার্ত্তায় সময় কাটাইতে লাগিলাম। পূর্ণানন্দের পর আর এক জন শিখ

সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সঙ্গী হন। কিন্তু এই শিখ মহাশয় বড়ই উগ্র, তাঁহার সঙ্গে আমার তত মিশ খাইল না। তথাপি পূর্ণানন্দের অনুরোধে তাঁহাকেও সঙ্গী করিয়া লইলাম। এ দিকে পূর্ণানন্দ ও শিখ সন্ন্যাসী গ্রামান্তরে ভিক্ষার জন্য যাইত, আমি বাসায় বসিয়া স্থানীয় লোকদিগের সঙ্গে নানাপ্রকার কথা-বার্ত্তায় দিন কাটাইতাম। এই দশ দিবসের মধ্যে এখানকার রীতি নীতি চালচলন যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

এই সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা নীতির ধার ধারে না। তাহার পর—ধর্ম্ম—ইহারা বাহ্যিক ভাবে দেব-উপাসক, কিন্তু তাহা কেবল ভয়ের খাতিরে, ভক্তির সঙ্গে ইহাদের বিশেষ বিবাদ। এই পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে অধিকাংশই বিষ্ণুমন্ত্রী। কিন্তু ইহারা অতিরিক্ত মদ্যপায়ী। মদ্য ইহারা ঘরেই প্রস্তুত করিয়া থাকে, এই স্থান ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও স্থানীয় প্রজাদিগের মদ্য প্রস্তুত করিবার অধিকার আছে। ইহারা গ্রাম্যদেবতা, কুলদেবতা ও উপদেবতার কাছে ছাগ মেষ বলি দেয়। এই বলির উদ্দেশ্য এই যে, এই সব দেবতারা বলিতে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাদের পালিত পশু ও পরিবারবর্গকে রক্ষা করিবেন। ইহাদের কুলদেবতার নাম নন্দা, কুলদেবী শক্তি। উপাস্য দেবতা বিষ্ণু। ইহার ভাব বুঝিতে পারিলাম না। তবে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শাক্ত ছিলেন, ইহারা বিষ্ণুমন্ত্র পাইয়াছে। কিন্তু আচরণ ঘোর শাক্তের। ইহারা অতিশয় লোভী। টাকার খাতিরে স্ত্রী কন্যা প্রভৃতি কুলস্ত্রীদিগকে শিকারী সাহেবদিগের সঙ্গিনী করিয়া দেয়। প্রতি বর্ষের আষাঢ় হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত কতকগুলি সাহেব এই সীমান্ত প্রদেশের কস্তূরীমৃগ, নানাজাতীয় হরিণ ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু শিকার করিবার জন্য তিব্বতসীমান্তে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই মহাশয়েরা বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী যুবতী কুলী নিযুক্ত করে। এইরূপ একটি সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইহারা স্ত্রী পুরুষে মদ্যপান করিয়া থাকে। এ জাতির মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ আছে, বিবাহাদি কার্য্য হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? পতিসত্বেও এতজ্জাতীয় স্ত্রীলোকেরা অন্যপুরুষ গ্রহণ করিতে লজ্জিত হয় না। সমাজে ইহাদের কোনপ্রকার শাসন নাই। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ আছে। এই দেশের স্ত্রীজাতি বড়ই প্রবলা। স্ত্রীজাতির পরিধান ঘাগরা, অঙ্গাবরণ জ্যাকেটের অনুরূপ, ইহার উপর সর্ব্বাঙ্গ আবরণ করিয়া

একখানি কম্বল পরিধান করে, এবং মাথায় পাগড়ীর অনুরূপ বস্ত্র বাঁধে। ইহারা বৎসরান্তে একবার বস্ত্রপরিবর্ত্তন করে। এই জাতীয় পুরুষদিগের পরিচ্ছদ পাজামা, লম্বা চাপকান, পাগ্‌ড়ী বা টুপি, কেহ্ কেহ চাপকানের পরিবর্ত্তে লম্বা কোট ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের মুখ মিষ্ট, হৃদয় হলাহল-পূর্ণ। ইহারা তিব্বতীয়দিগের অন্ন গ্রহণ করে বলিয়া ব্রাহ্মণ ও অপরাপর স্থানের ক্ষত্রিয় পর্য্যন্ত ইহাদের জলস্পর্শ করে না। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে এক দল ব্রাহ্মণ বাস করে। এই ব্রাহ্মণেরা পর্য্যায়ক্রমে ইহাদের পৌরোহিত্য ও চিকিৎসা করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের জলবিন্দুও স্পর্শ করে না। এই সব ব্রাহ্মণেরা ভিন্নদেশীয়। এই সীমান্তপ্রদেশে ক্ষত্রিয় ও ডোম ভিন্ন অপর জাতির বাস নাই। ইহারা মেষ ও ছাগলের লোম দ্বারা কম্বল প্রস্তুত করে। এই কম্বলেই ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে। পুরুষেরা সুতা প্রস্তুত করে, স্ত্রীলোকে তাঁতে কম্বল বোনে। এ দেশে ধোপা বা নাপিত নাই, মেয়েরা ধোপার কার্য্য করে, পুরুষেরা পরস্পর পরস্পরের ক্ষৌর কার্য্য করিয়া থাকে।

আজ কাল প্রান্তবাসীরা কাজে উন্মত্ত। দিন রাত্রি ভেদ নাই। দর্জ্জি শীতবস্ত্র শেলাই করিতেছে; গৃহস্থেরা তাম্বু ও পাল রিপু করিতেছে; স্ত্রীলোকেরা ছাতু প্রস্তুত করিতেছে। অপরাপর পর্ব্বত হইতে ভারবাহী মেষ ও ছাগল আসিয়া গৃহস্থের গৃহাঙ্গন পূর্ণ করিতেছে। গৃহস্থেরা এই সব পশুদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেছে, নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে ঘোড়া, "ঝব্বু" চামর প্রভৃতি পশুগণ আসিয়া হাজির হইয়াছে। সকলেই প্রফুল্লচিত্তে আপন আপন ঘোড়া, চামর, ও ঝব্বু বাছিয়া লইয়া আপন আপন গৃহপ্রাঙ্গনে বাঁধিতেছে। অপর দিক হইতে ভারবাহী মেষ ও ছাগ গোধূম, তণ্ডুল ও অপরাপর বাণিজ্যদ্রব্য পৃষ্ঠে বহন করিয়া প্রভুর বাটীতে উপস্থিত হইয়াছে। পুরোহিতেরা চণ্ডীপাঠ করিতেছেন, আর ছাগ ও মেষ বলিদান করিয়া যজমানের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছেন। গ্রাম্যদেবতা ও কুলদেবতার নিকট অসংখ্য বলিদান হইতেছে। ডোমেরা বড় বড় জয়ঢাক স্কন্ধে করিয়া বেতালা বাজনা বাজাইয়া কান ঝালাপালা করিতেছে। ছেলেরা তাহাদের সঙ্গে বিকট নৃত্যে হিমালয়কে মাথায় করিয়া তুলিতেছে। গ্রামখানি উৎসব-ময়ী নগরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্ত্রী পুরুষ বালক সকলেই মদের নেশায় বিভোর, কিন্তু কেহই নিজের কার্য্য ছাড়িতেছে না। আমি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইলাম।

ইহারা ছোট ছোট দুইখানি থলিয়া শেলাই করিয়া তাহাতে পণ্যদ্রব্য বোঝাই করে, এবং এই দুইখানি থলে ছাগ ও মেষের দুই পার্শ্বে ঝুলিতে থাকে। এই সব পশুই পর্ব্বতীয় জাতিদিগের বাণিজ্যের প্রধান সহায়। যে সকল পর্ব্বতে বহুপরিমাণে ঘাস থাকে, সেই স্থানেই মেষ ও ছাগলের আড্ডা। মেষ ও ছাগ রক্ষার জন্য দুই চারিটি কুকুরও থাকে, এবং দুই চারি জন ভৃত্যও নিযুক্ত হয়। কুকুরগুলিই প্রকৃত প্রহরী, ভৃত্যগুলি উপলক্ষ্য-মাত্র। কুকুরের প্রতাপে সে অঞ্চলে কোনও প্রকার হিংস্র জন্তু বা অপর লোকের যাইবার উপায় নাই। দুই একটি পশু বা পশুশাবক দলভ্রষ্ট হইলে কুকুর তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে দলে মিশাইয়া দেয়। হিংস্রজন্তুর গন্ধ পাইলে কুকুর বিকট শব্দে সকলকে সতর্ক করিয়া তুলে। পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, "ঝব্বু"টা কি পদার্থ? যেমন ঘোড়া ও গাধা হইতে খচ্চরের, সেইরূপ তিব্বতীয় চামর ও দেশীয় গাই হইতে ঝব্বুর উৎপত্তি। ঝব্বু পরিশ্রমক্লান্তি-রহিত ও তুষারময় উচ্চ শৃঙ্গ লঙ্ঘনে সুপটু। এই শ্রেণীর গো জাতি ও চামর এখানকার প্রধান বাহন। ইহারা আরোহী লইয়া নীহারময় উচ্চ পর্ব্বত লঙ্ঘন করে ও পার্ব্বতীয় নদী অতিক্রম করে। ইহারা ২।৪ দিন আহার না করিয়াও বরফের মধ্যে চলিতে পারে। ইহাদের আর এক অপূর্ব্ব শক্তি আছে। যখন বরফ পড়িয়া পথ ঘাট পর্ব্বত নদী ডুবিয়া সমতল হয়, তখন ইহারা অনায়াসে পথ চিনিয়া আরোহীকে নিরাপদ স্থানে উপস্থিত করিতে পারে।

সকলেই তিব্বতযাত্রার বন্দোবস্ত করিতেছে। আমিও আমার দ্রব্যাদি ও আহার্য্য বস্তু লইবার জন্য দুইটি ঝব্বু ভাড়া করিলাম। একটি আমার দ্রব্যাদি ও অপরটি আমাকে বহন করিবে। প্রত্যেক ঝব্বুর দৈনিক ভাড়া ছয় আনা। এই সব ঠিক করিয়া ১১ই আষাঢ়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এখানে অধিক দিন অবস্থিতির জন্য কেদার সিংহের সহিত আমার বেশ সদ্ভাব হইল। সেই আমার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিল। এবং এক দিন নির্জ্জনে বলিল, "একা বিষ্ণু সিংহের সহিত আপনাকে ছাড়িয়া দিব না; সে লোক তত ভাল নহে। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র খড়্গসিংহকে আপনার সঙ্গে দিব। সে আপনার সঙ্গে সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিবে, এবং মানসসরোবরে পিতৃপিণ্ড দিবে।" প্রান্তবাসী লোকেরা মানসসরোবরে যাইয়া পিতৃকৃত্য করিয়া থাকে। আমি কেদার সিংহের বাক্যে সম্মত

হইলাম। এখন আমার সঙ্গে দুই জন ভৃত্য হইল,—বিষ্ণুসিং ও খড়্গসিং। বিষ্ণু সিং বুদ্ধিমান্, চতুর, লোভী ও কার্য্যক্ষম; খড়্গ সিং সরল, মূর্খ ও পরিশ্রমী।

শ্রীরামানন্দ ভারতী।

আমার শিকার।

সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। আমি সেবার মেদিনীপুর হইতে কার্ত্তিক মাসে আবার উড়িষ্যার বন্দোবস্ত কার্য্যে বদলী হইলাম। মিঃ— খোড়দা মহকুমায় একরাজাত মহালের বন্দোবস্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি পুরীর কালেক্টর হইয়া গেলেন। সেই বন্দোবস্ত কার্য্যের ভার পড়িল আমার উপর।

একরাজাত মহালটি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সম্পত্তি। খোড়দা মহকুমাটির সমস্ত গবর্মেণ্টের খাস মহাল—তাহার মধ্যে জগন্নাথ মহাপ্রভুর এই সম্পত্তিটুকু বিশাল সমুদ্রবক্ষে কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় ভাসমান। এই খোড়দা খাস মহাল ও একরাজাত মহালের ছোট খাট একটি ইতিহাস আছে। যদি পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি না জন্মে, তবে একনিশ্বাসে তাহা এখানে বলিয়া ফেলিতে পারি।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরেজ মান্দ্রাজ হইতে চিল্‌কা হ্রদের উপকূল দিয়া উড়িষ্যায় প্রবেশ করেন, তখন উড়িষ্যা দেশ মারাঠা শাসনকর্ত্তাদিগের এলাকা ছিল। তাঁহাদের অধীনে আবার উড়িষ্যায় অনেকগুলি ছোট বড় রাজা ছিলেন। ইংরেজের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই ভয়ে জড়সড় হইয়া ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কেবল করিলেন না খোড়দার মহারাজা (বা পুরীর মহারাজা)। তাঁহার যে তত দূর সৈন্যবল ছিল বা তিনি যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার মন্ত্রীরা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাঁহার তীরধনুকধারী বন্য অসভ্য সৈন্যগণ দেখিয়া ইংরেজ ভয়ে পলাইয়া যাইবে। তিনি সেই সুবুদ্ধি মন্ত্রিবর্গের কথায় বিশ্বাস করিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। তাহার ফল এই হইল যে, ছেলের হাতের মোয়ার ন্যায় ইংরেজ তাঁহার রাজ্যটুকু কাড়িয়া

লইলেন। আর অন্যান্য যে সকল রাজা বিনা যুদ্ধে ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে বৎসর বৎসর কয়েক হাজার কড়ি করস্বরূপ গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়া, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ রাজ্যে বহাল রাখিলেন। ইঁহারাই হইলেন উড়িষ্যার Tributary Chief বা গড়জাতের রাজা।

খোড়দার মহারাজার রাজ্য গ্রাস করিয়া গবর্মেণ্ট তাহা একটি মহ-কুমায় পরিণত করিলেন। মহারাজা পুরীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই রাজা আবার জগন্নাথ দেবের সেবাইত। সেই সূত্রে উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ ও অন্যান্য দেশের রাজগণ এক সময়ে ইঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেন। এই জন্য পুরীর মহারাজার উপাধিটি বিলক্ষণ লম্বা, যথা,—"বীরশ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাটোৎকলবর্গেশ্বর বীরাধিবীরবরপ্রতাপ শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী অমুক মহা-রাজা।" এখনও পুরীর মহারাজা উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের রাজাদিগকে গবর্মেণ্টের ন্যায় উপাধি প্রদান করেন। গবর্মেণ্টের দরবারে ও উড়িষ্যার রাজাদিগের মধ্যে ইঁহার প্রথম আসন। যাহা হউক, রাজার ত রাজ্য গেল, এখন জগন্নাথ দেবের সেবা পূজা করে কে? কাজেই গবর্মেণ্ট বাধ্য হইয়া তাঁহার সেবা পূজা চালাইবার জন্য বৎসর বৎসর পুরীর রাজার হস্তে ৬০ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। গবর্মেণ্টও আবার পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথা অনুসারে পুরীর যাত্রীদিগের নিকট হইতে একটা ট্যাক্স (pilgrim tax) গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ১৮০৮ সনে এই রকম বন্দোবস্ত হইল, এবং কতক বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ কাজ চলিতে লাগিল। পরে এক গোল বাধিল। ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুদয়ে যে সকল খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক এ দেশে আলোক বিতরণ ও ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশে ফিরিয়া গিয়া এক আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। "কি সর্ব্বনাশ! আমরা যে পৌত্তলিকতার দমন করিতে চেষ্টা করি, ইংরেজ গবর্মেণ্ট নিজেই টাকা দিয়া তাহার পোষকতা করিতেছেন! আমাদের চেষ্টা বৃথা!" এই কথা শুনিয়া ইংরেজ জাতি খেপিয়া উঠিল। তখন গবর্মেণ্ট সাপও মরে, আর-লাঠি-ও-না-ভাঙ্গে রকমের এক ফিকির করিলেন। জগন্নাথদেবের সেবাপূজার জন্য প্রথমতঃ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে তাহা কমিতে কমিতে ২৩ হাজারে নামিয়াছিল, আর যাত্রীর উপর করও উঠিয়া গিয়াছিল। গবর্মেণ্ট খোড়দা খাসমহাল হইতে সেই বার্ষিক ২৩ হাজার টাকা আয়ের উপযুক্ত কতকগুলি মৌজা জগন্নাথের

সেবা পূজার জন্য রাজার হাতে দিয়া পৌত্তলিকতার অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিলেন। এইরূপে ১৮৪০ সনে একরাজাত মহালের সৃষ্টি হইল।

যাক সে সব পুরাতন কথা। আমি মেদিনীপুর হইতে কটকে পঁহুছিয়া এই একরাজাত মহালের বন্দোবস্ত কার্য্যের ভার পাইলাম। কিছু দিন পরে কাগজপত্র তাঁবু প্রভৃতি লইয়া খোড়দা আসিলাম। মিঃ— যেখানে শেষ কাজ করিয়া গিয়াছিলেন, আমি সেই গ্রামে গিয়া "ডেরা পাকাইলাম।" (১) সে গ্রামটির নাম হাড়পদা। তাহার নিকটে এখন মান্দ্রাজ কটক রেলওয়ের একটি বড় ষ্টেশন হইয়াছে, নাম নারায়ণগড়। আমরা যখন সেখানে যাই, তখন রেলের রাস্তা কেবল প্রস্তুত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে Ballast train চলিতেছে; আর গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে রাস্তার ধারে আসিয়া হাঁ করিয়া তাহা দেখিতেছে, কেহ বা সভয়ে দণ্ডবৎ করিতেছে।

খোড়দা পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দুই একটি ছোট ছোট পাহাড় আছে, সেগুলিকে "মুণ্ডিয়া" বলে। তাহার কোনটার উপরে গাছপালা আছে, কোনটা টাকপড়া মাথার ন্যায় একেবারে খালি। এই পাহাড়গুলি প্রস্তরময়, ইহার একটিও চট্টগ্রামের পাহাড়ের ন্যায় কেবল মাটীর ঢিপি নহে। তবে কোন পাহাড়ের প্রস্তর খুব শক্ত কাল, তাহাকে "অকর্ম্মশিলা" বলে; আর কোন পাহাড়ের প্রস্তর লালবর্ণ, (গৈরিক) বেশী কঠিন নহে। খোড়দা অঞ্চলে প্রায়ই কাল মাটি দেখিতে পাওয়া যায় না— অনেক গ্রামের মধ্যে কেবল লালমাটি ও পাথর। শাকসবজীর বাগান করিতে হইলে অন্য স্থান হইতে কাল মাটি আনিয়া ফেলিতে হয়, তাহার উপর গাছ লাগান হয়। হাড়পদা গ্রামে আমাদের তাঁবুর খোঁটা গাড়া কঠিন হইয়া উঠিল। অনেক খোঁটা ভাঙ্গিয়া গেল, মাটিতে বসিল না। অবশেষে এক জন "বঢ়ই"-(সূত্রধর)-এর শরণাপন্ন হওয়া গেল। তাঁহার সহায়তায় কোনক্রমে সেই কাপড়ের ঘর প্রস্তুত করিয়া আমরা তাহার মধ্যে বাস করিতে লাগিলাম।

মেদিনীপুরে এক জন বন্ধুর নিকট হইতে একটি বন্দুক কিনিয়াছিলাম। বন জঙ্গলের কাছে কাপড়ের ঘরে বাস করিতে হইবে, স্থানে স্থানে বাঘ ভালুকের ভয়ও আছে, এই জন্য সেই বন্দুকটা সঙ্গে আনিয়াছিলাম। কিন্তু

(১) তাঁবু ফেলিলাম। "পকা" কথাটা উড়িয়া ভাষায় অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কেবল বন্দুক সঙ্গে থাকিলেই ত বাঘ ভালুক আমাকে ভয় করিবে না? একটু শিকার শিখিবার সখ হইল। কিন্তু শিকার করিব কি? কোন পশু কিংবা পক্ষী? তাহাদের অপরাধ? সখের শিকার করিব আমি, আর মরিবে তাহারা, এটা বড় ভাল কথা নয়। সেই জন্য দিন কতক আমগাছের উপর চাঁদমারি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতে বিপদ আছে। গুলি যদি আমগাছে না লাগিয়া কোন লোকের গায় লাগে, তবে উপায়? একদিন প্রাতঃকালে বন্দুক লইয়া হাড়পদা গ্রামের একটি "মুণ্ডিয়ার" দিকে চলিলাম। মতলব এই যে, সেই পাহাড়টির গায় চাঁদমারী করিব, তাহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই; আর আমগাছে বন্দুক মারিলে সব গুলি কিছু গাছে লাগে না (আমার হাত এমনি ঠিক!) কিন্তু পাহাড়ের গায়ে গুলি ছাড়িলে তাহা না লাগিয়া যায় কোথায়?

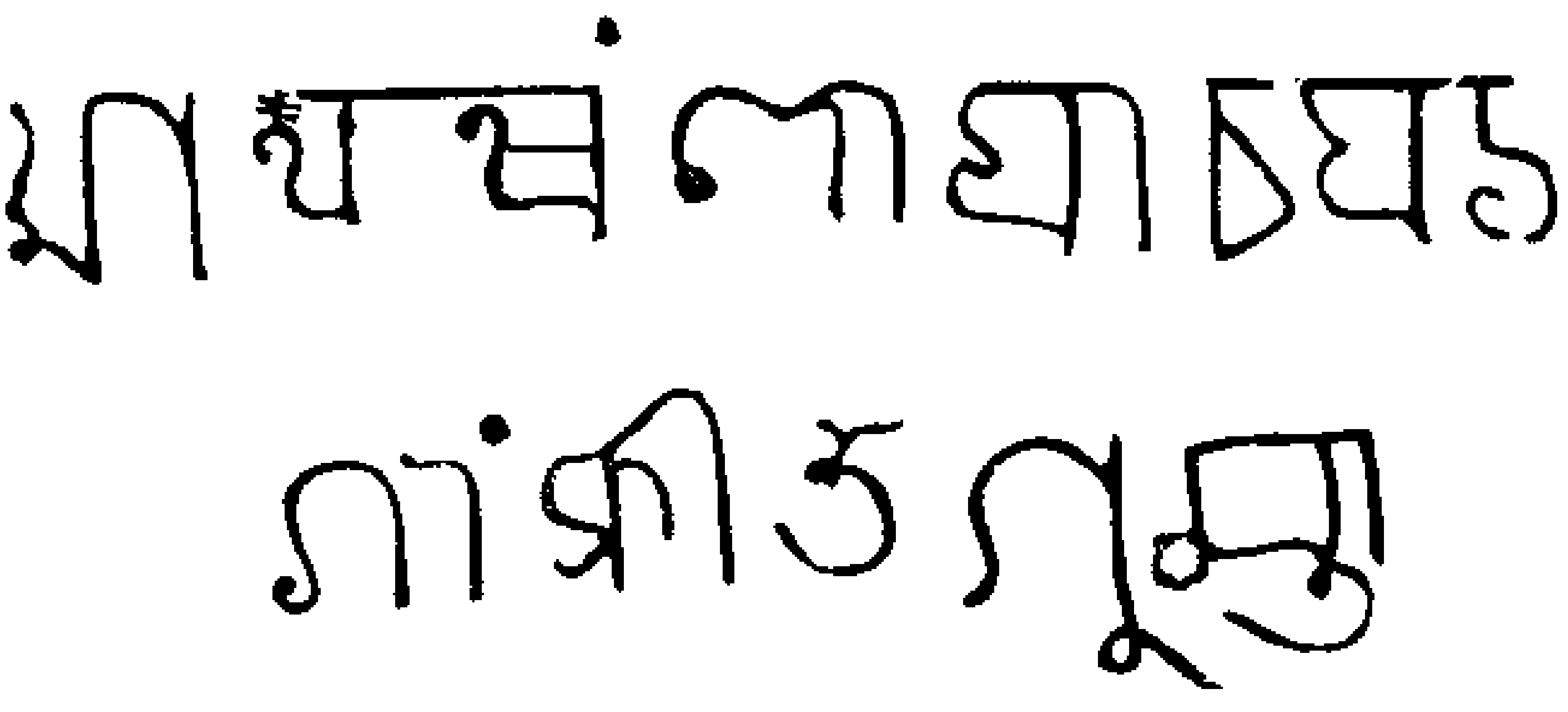
আমার সঙ্গে এক জন বন্ধু ছিলেন। আমরা দুই জনে সকালে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে (খোড়দা অঞ্চলে বড় শীত পড়ে), আমার কোটের পকেটে কতকগুলি টোটা পুরিয়া নিয়া সেই "মুণ্ডিতমুণ্ড" "মুণ্ডিয়ার" দিকে চলিলাম। তবে মুণ্ডিয়াটি একেবারে মাথা-কামান নহে, তাহার শিরোভাগে একটি তেঁতুল গাছ বিরাজ করিতেছিল। আমরা সেই পাহাড়ের নিকট গিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দুই একটি গুলি চালাইলাম। আমি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, আমার একটি গুলিও ব্যর্থ হইল না, অর্থাৎ পাহাড়ের কোন না কোন স্থানে লাগিয়াছিল। আমার সঙ্গের বন্ধুটি এক জন ভাল শিকারী ছিলেন। তিনি পাহাড়ের পাদদেশ হইতে সেই তেঁতুল গাছটিকে লক্ষ্য করিয়া একটি গুলি ছুড়িলেন। সেটা সেই গাছে লাগিল কি না, তাহা দেখিবার জন্য আমরা পাহাড়ে উঠিলাম। পাহাড়টি বেশী উচ্চ নহে, প্রায় ১০০।১৫০ হাত হইবে। উঠিবার বেশ একটি পথ আছে,—সে পথটা খুব ঢালু, এমন কি, গরু বাছুর সেই পথ দিয়া পাহাড়ের উপরে উঠিতে পারে। আমরাও ক্রমে ক্রমে উঠিলাম।

পাহাড়টির চারি দিকে যে ঢালু জায়গা আছে, কৃষকগণ তাহার উপর বাগান করিবার জন্য আম কাঁঠালের চারা গাছ রোপণ করিয়াছে দেখিলাম। আর গরু বাছুরে সেগুলি খাইয়া না ফেলে, এই জন্য পাথরের উপর পাথর বসাইয়া চারি দিকে প্রাচীরের মত বেড়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা সেই

য়াছে। দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। কিন্তু আরও আনন্দ হইল সেই তেঁতুল গাছের পাদদেশে একটি “গুম্ফা” দেখিয়া।

গুম্ফাটি সেই পাহাড়ের মধ্যে কাটা একটি ছোট ঘর (room)। তাহার একটিমাত্র দ্বার, তাহা এক সময়ে একখান কাষ্ঠের কপাট দিয়া বন্ধ করা যাইত, তাহার চিহ্ন দেখিলাম। ঘরের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিলাম। উহা চতুষ্কোণাকৃতি। মধ্যস্থল ৭॥০ হাত দীর্ঘ, ৭ হাত প্রস্থ ও ২।০ হাত উচ্চ। দরজাটি পূর্ব্বমুখ। ভিতরে দেওয়ালের গায় দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে; তাহার উপরে দুই পংক্তি অক্ষর খোদিত, তাহার বাম দিকে একটি চক্র আঁকা। বাম পার্শ্বে মেজের উপরে একটি ছোট চতুষ্কোণের মধ্যে যুগল চরণ সুস্পষ্ট খোদা রহিয়াছে। তাহার ½ হাত পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র অগ্নিকুণ্ড; উহার ব্যাস ½ হাত হইবে। দক্ষিণ পার্শ্বের পশ্চিম কোণে দেওয়ালে প্রদীপ রাখিবার জন্য একটি ছোট গর্ত্ত কাটা। দেওয়ালের স্থানে স্থানে দুই একটি অক্ষর লেখা আছে ও মূর্ত্তি কাটা আছে। প্রবেশের দ্বারটি দুই হাত উচ্চ, ও দুই হাত প্রস্থ।

আমি গুম্ফার মধ্যে বসিয়া পকেট-বুক খুলিয়া এই সকল বিবরণ লিখিয়া লইলাম। বুদ্ধমূর্ত্তির উপরে যে দুই পংক্তি লেখা আছে, tracing paper তাহার উপরে ফেলিয়া, তাহার অবিকল প্রতিলিপি আঁকিয়া লইলাম। সেই অক্ষর গুলি এই—



এই অক্ষরগুলি দেবনাগর অক্ষরের ন্যায়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে দেবনাগর নহে। আবার উড়িয়া অক্ষরের সহিত ইহার কোনটার সাদৃশ্য থাকিলেও উহা উড়িয়া নহে। বোধ হয়, পালি অক্ষর হইতে পারে। শেষের দুইটি অক্ষর গুম্ফা, ইহা স্পষ্ট চেনা যায়, কিন্তু অন্য অক্ষরগুলি পড়া আমার বিদ্যায় কুলায় না। বিজ্ঞ পাঠক পড়িয়া দেখিতে পারেন।

গুম্ফার মধ্যে যাহা দেখিলাম, তাহাতে অনুমান হয়, এক জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু এই গুহাতে বাস করিতেন। যদি হণ্টার সাহেবের (W. W. Hunter) অনুমান ঠিক হয়, তবে এই গুম্ফাটি যীশুখ্রীষ্ট জন্মিবার প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। (১)

আমরা গুম্ফার বাহিরে আসিয়া তাহার উপরের দৃশ্য দেখিলাম। গুম্ফার উপরিভাগ সমতল, তাহার স্থানে স্থানে কতকগুলি গর্ত্ত কাটা। বোধ হয়, এই গর্ত্তগুলিতে গুহাবাসী ভিক্ষু তাঁহার ব্যবহারের জন্য বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিতেন। আমি সেখানে তেঁতুল গাছের ছায়ায় পা ঝুলাইয়া দিয়া বসিয়া চারি দিক দেখিতে লাগিলাম, আর মনে কত কল্পনা করিতে লাগিলাম। তখন সূর্য্যের কিরণ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। যে দিকে চাই, প্রকৃতির মুখচ্ছবি উজ্জ্বলবর্ণে আলোকিত। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র সকল সুপক্ক ধান্যের সুবর্ণ রাগে রঞ্জিত হইয়াছে। আকাশের এক প্রান্তে নীলশৈলমালা উজ্জ্বল নীলাকাশের সহিত মিলিয়া গিয়াছে, অপর প্রান্তে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ বনরাজি ও স্থানে স্থানে বিস্তৃত আম্রকানন। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি সেই শস্যক্ষেত্রের মধ্য হইতে যেন মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির এই হাস্যমধুর মুখশ্রী দেখিয়া আমি মোহিত হইলাম। আর সুদূর অতীতকালের সাক্ষী সেই বৌদ্ধযোগীর আবাসগৃহ গুম্ফার কথা ভাবিতে ভাবিতে ডেরায় ফিরিয়া আসিলাম। আমার সেদিনকার এই শিকারে যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল, এক জন প্রকৃত শিকারীর একটা প্রকাণ্ড বাঘ শিকারেও সেরূপ আনন্দ জন্মে কি না সন্দেহ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

---

(১) হণ্টার সাহেব এই সকল গুম্ফাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহাদের সময়-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১ম, সন্ন্যাসী যুগের গুম্ফা ("ascetic age")—কেবল একটিমাত্র ছোট গুহা, তাহাতে কষ্টে প্রবেশ করা যায়। ২য়, ceremonial ageএর গুম্ফা, খুব বড় প্রকোষ্ঠ, তাহাতে সভা সমিতির জন্য অনেক লোক সমবেত হইতে পারিত। ৩য়, fashionable ageএর গুম্ফা—দ্বিতল প্রাসাদের ন্যায়। এই সকল গুম্ফা ৫০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। "Their sculptured galleries belong to a more recent date, but even the most elaborate, and probably the most recent of them, cannot be placed after the first Century A. D."—*Hunter's Orissa Vol I. p.* 178.

সেন্সস্ ও সমাজ।

মুসলমানসমাজে জাতিভেদ।

বর্ত্তমান বৎসরের সরকারী লোকগণনা বা সেন্সস বাঙ্গলার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেন্সস দ্বারা এক দিকে যেরূপ জনসাধারণের সংখ্যার সহিত তাহাদিগের ধর্ম্ম, সমাজ, ভাষা, আচারব্যবহার, রীতিনীতি ও ব্যবসায় প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর অবশ্যজ্ঞাতব্য বিবরণ সঙ্কলিত হইয়া প্রকৃত ইতিহাসরচনার উপকরণসংগ্রহ সহজসাধ্য করিবে, অপর দিকে সেইরূপ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ সমাজের উপর বর্ত্তমান যুগ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাও নির্ণীত হইবে। বর্ত্তমান সেন্সস উপলক্ষে বঙ্গীয় সমাজে যে বিপ্লবের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, ঐতিহাসিক আলোচনার সৌকর্য্যার্থ এই প্রবন্ধে তাহা আলোচিত হইতেছে।

অন্য দেশ বা প্রদেশের কথা বলিতে পারি না, তবে এই বঙ্গদেশে জাতিভেদপ্রথার প্রবল আধিপত্য দৃষ্টিগোচর হয়। বৈদিক ও বৌদ্ধ কালের কথা জানি না, পৌরাণিক কালে বঙ্গীয় সমাজ বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রভাবফলে বৈষ্ণবগণের মধ্যে জাতিভেদের স্মার্ত্তদত্ত বন্ধন শিথিল হইলেও, বর্ত্তমান কালের "বৈরাগী" সমাজে যে "পঙ্গৎ" বিভাগ প্রবেশ করিয়া নূতনতর জাতির সৃষ্টি করিতেছে, তাহার শক্তি ও প্রভাব হিন্দুসমাজের পুরাতন জাতিবিভাগের শক্তি ও প্রভাব অপেক্ষা ন্যূন নহে। মুসলমানগণ তাঁহাদের সাম্যমূলক মহম্মদীয় ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া অষ্ট শত বৎসর এ দেশে বর্ত্তমান থাকিয়া বলে ও প্রলোভনে সহস্র সহস্র উচ্চ ও নিম্নজাতীয় হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম্মের ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া সাম্যনীতির ঘোষণা করিলেও, মুসলমানসমাজ ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুসংখ্যক উচ্চ ও নীচ জাতিতে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত নীচজাতীয় হিন্দুগণ আশানুরূপ সামাজিক সম্মানলাভ করিতে না পারিয়া মুসলমান সমাজেও হেয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সেন্সসে হিন্দু ও মুসলমানসমাজভুক্ত সামাজিকসম্মানহীন নীচজাতীয় ব্যক্তিগণ উচ্চ সামাজিক মর্য্যাদালাভের ভরসায় জাতিনামপরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছে।

জাতিভেদের ফলে হিন্দুসমাজে যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, বর্ত্তমান সেন্সসে মুসলমানসমাজেও সেইরূপ অনৈক্য ও অসদ্ভাবের বীজ উপ্ত হইয়াছে।

ব্যবসায়বৈষম্যে হিন্দুসমাজে জাতিভেদের সৃষ্টি হয়। সেন্সসের ফলে জানা গিয়াছে, মুসলমানসমাজেও সেইরূপ ব্যবসায়গত জাতিভেদের প্রভাব বিদ্যমান। গত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনাকালে কোন কোন বিচক্ষণ সূক্ষ্মদর্শী রাজপুরুষ লক্ষ্য করেন, মুসলমানগণের মধ্যে হিন্দুগণের ন্যায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব আছে। ঢাকার মাজিষ্ট্রেট সেন্সস-বিজ্ঞাপনীতে লিখিয়াছিলেন, "The lower classes of Mahammadans are divided into communities according to the occupations they follow and some of these are quite as exclusive as the Hindu castes in regard to marrying and eating with each other" অর্থাৎ, "ব্যবসায় অনুসারে নিম্নশ্রেণীস্থ মুসলমানগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ভোজন ও বিবাহ ব্যাপারে ইহারা ঠিক হিন্দুর জাতিসমূহের মত আপন সম্প্রদায়ের বাহিরে যাইতে পারে না।" ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন, "The Mahammadans of Bengal have followed in many respects the system of caste as prescribed by the Hindus, although the principle that a son must carry on the trade or occupation of his father, has never been reduced to a formula. Still, they have placed many honest and useful handicrafts under a bar, while others of a more objectionable nature have been rendered honorable". অর্থাৎ, "বাঙ্গলার মুসলমানগণ হিন্দুগণের মত অনেকটা জাতিভেদপ্রথার অনুসরণ করে। তবে পুত্রকে যে পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিতেই হইবে, তদ্বিষয়ে হিন্দুগণের মত ইহাদিগের মধ্যে ততটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। তবুও অনেকগুলি সৎ ও প্রয়োজনীয় বৃত্তিকে ইহারা নিন্দনীয় ও অপর কতিপয় কুৎসিত ব্যবসায়কে প্রশংসনীয় করিয়া তুলিয়াছে।" শ্রীযুক্ত নেসফিল্ড উল্লেখ করিয়াছেন, উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশেও মুসলমানগণের মধ্যে ব্যবসায়গত জাতিভেদ দৃষ্ট হয়। বাস্তবিকই কেবল বাঙ্গলায় নহে, সমগ্র ভারতবর্ষেরই মৃত্তিকা জাতিভেদ-পাদপের উৎপাদন-

পক্ষে বিশেষ উর্ব্বর। হিন্দু ও মুসলমান সমাজ ব্যতীত অন্য সমাজেও এই প্রথার অঙ্কুরোদ্গম না হইতেছে, এমন নহে।

হিন্দুগণ যেরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি শ্রেণীতে নামতঃ বিভক্ত, মুসলমানগণও সেইরূপ শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান, এই শ্রেণী-চতুষ্টয়ে নামতঃ বিভক্ত। বঙ্গীয় মুসলমানগণের সংখ্যা ১৮৯১ অব্দের লোকগণনায় ২,৩৪,৩৭,৫৯১ নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং তন্মধ্যে ২,০৬,৪৪,২৯৪ জন শেখ বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়াছিল। এই সংখ্যা হইতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে, মুসলমানগণের মধ্যে উক্ত শ্রেণীবিভাগ সঙ্গত বা সমীচীন নহে। মুসলমানগণকে উক্ত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত বলিলে সত্যের অপলাপ ঘটে, এবং ভাবী ইতিহাসরচনায় অলীকতা প্রশ্রয় পাইবার আশঙ্কা থাকে।

মুসলমানগণের মধ্যে জাতিভেদপ্রথার অস্তিত্বের পরিচয় পাইয়া বর্ত্তমান বর্ষের সেন্সস বিভাগের বিচক্ষণ সত্যানুরাগী রাজপুরুষগণ মুসলমানসমাজের সামাজিক অবস্থার সম্যক পরিজ্ঞানমানসে উপযুক্ত কর্ম্মকুশল কর্ম্মচারিগণের সহায়তায় নানারূপ অনুসন্ধান করিয়াছেন ও করিতেছেন। উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধানসৌকর্য্যার্থ সেন্সসের কর্ত্তৃপক্ষ কতকগুলি প্রশ্নপ্রণয়ন ও তাহা অধীন কর্ম্মচারিগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ সকল প্রশ্নের মধ্যে কয়েকটি প্রশ্ন এ স্থলে গৃহীত হইল ঃ—

১। জাতির নাম কি ?

২। জাতির উৎপত্তি ও সামাজিক মর্য্যাদা কি ? কিরূপ ?

৩। জাতির ব্যবসায় কি ? তাহা কত দূর বংশগত ?

৪। জাতিব্যবসায় ত্যাগ করিলে জাতি-নাম পরিত্যক্ত হয় কি না ?

৫। জাতি-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া শেখ বলিয়া পরিচিত হওয়া যায় কি না ?

৬। মুসলমানসমাজভুক্ত অন্য জাতির সহিত এই জাতির (অনুসন্ধেয় জাতির) ভোজন ও বিবাহাদি হয় কি না ?

৭। অনুসন্ধেয়জাতিভুক্ত লোক অন্যজাতীয় মুসলমানগণের মসজিদে যাইতে পারে কি না ?

সেন্সস কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রদত্ত এই সকল প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করিবার জন্য মফস্বলের সেন্সসবিভাগীয় অফিসরগণ অনুসন্ধান আরম্ভ করায়

মফস্বলের মুসলমানসমাজে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীস্থ মুসলমানগণ তাহাদিগের ভাবী সামাজিক মর্য্যাদার হানি ও প্রতিবন্ধকতা উপস্থিতির আশঙ্কায় জাতি-নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেন্সসের কাগজপত্রে আপনাদিগকে শেখ বলিয়া অভিহিত করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতেছে (ও তজ্জন্য উকীলের সর্ব্বভুক উদরেরও পূর্ত্তি হইতেছে !)

নিম্নশ্রেণীস্থ মুসলমানগণের অবলম্বিত ব্যবসায় সংখ্যায় অল্প নহে। এই সকল ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকার ফলে ভিন্নভিন্নব্যবসায়ভুক্ত মুসলমানগণ এক এক স্বতন্ত্রজাতিভুক্ত বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। জাতিপরিচয়ে হিন্দু বলিলে যেরূপ যথেষ্ট হয় না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য আদি জাতি-নামে পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হয়, মুসলমানগণের পক্ষেও কেবল সেইরূপ মুসলমান জাতি পরিচয় যথেষ্ট নহে; তাহারা শেখ কি সৈয়দ, কি জোলা, কি পাজরা, তাহা বলা আবশ্যক হয়। ফলতঃ দেখা যাইতেছে, হিন্দু ও মুসলমান আখ্যা ধর্ম্মজ্ঞাপক-মাত্র, তাহা জাতিপরিচায়ক নহে।

বাঙ্গলার অন্যান্য অঞ্চলের কথা বলিতে পারি না, মালদহ প্রদেশে প্রকৃত শেখ, সৈয়দ, মোগল বা পাঠান জাতীয় মুসলমানের সংখ্যা অতীব বিরল। অধিকাংশ মুসলমানই অতীত কালের মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত নিম্নজাতীয় হিন্দুগণের বংশধর। এ অঞ্চলে পাজরা, কুঞ্জড়া, মোমীন, জোলা প্রভৃতি নামে পরিচিত যে সকল মুসলমান দৃষ্ট হয়, তাহারা কেহই শেখ উপাধি কখনও ব্যবহার করে নাই, বা এখনও করে না। এই সকল মুসলমানজাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই, ইহারা হাট বাজারে গমনাগমন ও জিনিসপত্র ক্রয়বিক্রয় করে। ইহারা পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে জাতিব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছে। কুঞ্জড়াকে সবজিফরস এবং পাজরাকে মাহিফরসও বলে, এবং যথাক্রমে সব্‌জী ও মৎস্যবিক্রয়ই ইহাদিগের ব্যবসায়। ইহা-দিগের আপন আপন জাতির মধ্যেই কন্যার আদান প্রদান ও ভোজ প্রভৃতি নির্ব্বাহিত হয়। ইহারা স্ব স্ব জাতির নির্দ্দিষ্ট মসজিদেই উপাসনা করে। বিবাদনিষ্পত্তির জন্য ইহারা আপন আপন জাতিপঞ্চায়তেরই আশ্রয় লইয়া থাকে। বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ব্রাহ্মণকায়স্থাদি হিন্দু জাতিসমূহের ন্যায় ইহারা মুসলমানসমাজের অন্তর্গত এক একটি স্বতন্ত্র জাতি। বর্ত্তমান সেন্সস উপলক্ষে ইহারা জাতি-নাম ত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছে।

সকল ব্যবসায় সমাজে সমান সম্মানিত নহে। ব্যবসায় অনুসারে ব্যবসায়গত জাতি সকল সমাজে হীন বা উন্নত বলিয়া পরিগণিত হয়। সামাজিক সম্মান বিবেচনা করিলে পাজরা ও কুঞ্জড়াগণের সহিত হিন্দুজাতীয় মালো ও চাষাগণের সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত মালোগণই পাজরা ও চাষাগণ কুঞ্জড়া নামে পরিচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের সেন্সসে "শেখ" হইবার জন্য ইহারা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া দিল্লী প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান স্থান হইতে মৌলবীগণের ফতোয়া সংগ্রহ করিবার জন্যও অল্প চেষ্টা করিতেছে না। এদিকে অপর মুসলমানগণ বিধিমতে ইহাদিগের শেখ-উপাধিগ্রহণে বাধা দিতেছে। ইহার ফলে মুসলমানসমাজে বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া দ্বেষাদ্বেষি রেষারেষির সৃষ্টি করিয়াছে। একতাপ্রাণ মুসলমানগণ ইহার ফলে বহু দলে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে; সুতরাং বিষম অনর্থের সূত্রপাত হইতেছে। শিক্ষা ও জ্ঞানপ্রচারের যুগে মুসলমানগণের স্বাভাবিক ঐক্য ও সাম্যভাব দূরীভূত হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ বৈষম্যের বিষময় বীজ উপ্ত হইতেছে। এই বীজ কালে বিশাল বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া মুসলমানসমাজের যে কি অনিষ্ট করিবে, তাহা এক্ষণে বলা যায় না।

এক দিকে মুসলমানসমাজ উক্তরূপে সেন্সস দ্বারা আন্দোলিত, অপর দিকে হিন্দুসমাজেও এই আন্দোলন অল্প প্রবল নহে। হিন্দুসমাজভুক্ত নিম্নশ্রেণীস্থ কতকগুলি জাতি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছে এবং তজ্জন্য গবর্মেণ্টের সেন্সস বিভাগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই হিন্দুসমাজভুক্ত জাতিগণের এই নামপরিবর্ত্তনমূলক আন্দোলন এক স্থানে বা এক জেলায় আবদ্ধ নহে। মেদিনীপুর, ঢাকা, যশোহর, পাবনা, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার নানাজাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে এই আন্দোলন প্রসারিত হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজ শাসন এই আন্দোলনস্রোতের মূল উৎস হইলেও, বর্ত্তমান সেন্সসে তাহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলার ইতিহাসরচনা বা আলোচনা যাঁহাদিগের লক্ষ্য, তাঁহাদিগের পক্ষে বর্ত্তমান বর্ষের সেন্সস অবশ্য অধীতব্য।

সেন্সসে হিন্দুসমাজ কত দূর আন্দোলিত হইয়াছে ও তাহার ভাবী ফল কিরূপ, বারান্তরে তদ্বিষয়ের আলোচনা করিব।

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

সতী ।

১

"হে পুত্র, মাতার তব জীবনে মরণে
আছে শুধু এক স্থান—পতির চরণে ।
বহুদিন—পিতৃগৃহে আশীর্ব্বাদ লয়ে
এসেছিনু নববধূ পতির আলয়ে ।
সেই দিন হ'তে নিত্য পূজিনু যাঁহায়
সখারূপে, পতিরূপে,—দেবতার প্রায়,
তাঁহার চরণ ছাড়া গতি নাই আর ।
চিতাশয্যা রচ, পুত্র, মুছ আঁখি ধার ।"

বিকল পড়িলা পুত্র চরণযুগলে ;
সস্নেহে তুলিলা মাতা ; মুছিলা অঞ্চলে
অবিরল অশ্রুধারা । "লভিয়াছ জ্ঞান,
শাস্ত্রের আদেশ জান, পুণ্যের বিধান ;
তোমারে কি বুঝাইব ? বাঁধি অশ্রুডোরে,
শেষধর্ম্মচ্যুত, পুত্র, করিও না মোরে ।
পুত্র তুমি, শেষ কর্ম্ম করাও মাতার ।
আমার সকল শেষ ; সংসার তোমার ।"

শিরে করাঘাত করি কাঁদিলা দুহিতা,
কোমলা কনকলতা ধূলায় লুণ্ঠিতা ।
পুত্রবধূ—অশ্রুআঁখি—কাঁদিলা চরণে—
"অসহায় আমি, মাতা, তোমার বিহনে ।"
জননী তুলিলা বক্ষে, স্নেহে শির চুমি'—
"লক্ষ্মীস্বরূপিণী, বৎসে, এ সংসারে তুমি,
থাক সুখে পুণ্যরূপে সংসার উজলি'
পতিপ্রেম-গর্ব্বে সর্ব্ব অমঙ্গল দলি' ।"

২

আসিল আত্মীয়গণ—বিশদবসনে—
স্কন্ধে লয়েছে শবদেহ শ্মশান-শয়নে ।
নগ্নপদ সবাকার—বিষণ্ণ আনন,
ক্ষিতিতলবিনিহিত কাতর নয়ন ।
পুণ্য রক্তাম্বর পরি—পূত উষা প্রায়
জননী আসিলা—শব শায়িত যেথায় ।
আবরিল সব দৃষ্টি নয়নের জল ।
জননী প্রফুল্লমুখ—নীরব—নিশ্চল ।

ধীরে ধীরে শব বহি' শববাহিগণ
অতিক্রম করি' গেল গৃহের প্রাঙ্গন ।
জননী চলিলা সাথে । রহে রোধি দ্বার
স্নুষা, কন্যা । কর রাখি'—শিরে দু'জনার
সস্নেহে কহিলা মাতা আশীষবচন—
"চিরসুখে রহ ; যাপো পবিত্র জীবন ;
সহিতে না হয় যেন বৈধব্য-অনল ।"
কাঁদিয়া উঠিলা দোঁহে । জননী নিশ্চল ।

শিশুপৌত্র জানুযুগ জড়াইল আসি' ।
জননী চুম্বিলা স্নেহে । ধীরে উঠে ভাসি'
আঁখিতটে অশ্রুরেখা ; বুঝি শেষবার
বন্ধনে বাঁধিতে চাহে পার্থিব সংসার ।
সংসার ডাকিল বৃথা ; পতির জীবন
ছিল শুধু সংসারের সুদৃঢ় বন্ধন ।
শবের পশ্চাতে মাতা গেলা চলি' ধীরে—
উঠিল ক্রন্দন গৃহে—চাহিল না ফিরে ।

৩

শ্মশানের পথ'পরে পুরনারীগণ
ভক্তিভরে লাজাঞ্জলি করিলা বর্ষণ ;
কেহ বিছাইল পথ রক্তপুষ্পভারে,
কেহ বা মঙ্গলঘট স্থাপে গৃহদ্বারে ।

পুরপথে ভক্তিভরে প্রণমিলা পায়
পুরনারী, পুরবালা—দেবতার প্রায়।
আশীষিলা মাতা সবে। শোভিছে আননে
কি দিব্য পবিত্র প্রভা স্বর্গীয় কিরণে!

শ্মশানে আসিলা সবে। শুনি' এ বারতা
বিস্মিত—স্তম্ভিত—আসে উদ্‌গ্রীব জনতা;
রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিবা। যেন দুঃখভরে
কাঁদিল শ্মশান-তরু কাতর মর্ম্মরে।
হেরি' পুণ্য আত্মদান যেন তরঙ্গিণী
নিবারিল কলধ্বনি শ্মশানবাহিনী।
নীরব বিহগরব—জনতা নীরব;
একদৃষ্টে চাহি' যেন চরাচর সব।

সজ্জিত হইল চিতা। পতির চরণে
বসিলেন, সতী, যেন গহন কাননে
সাবিত্রী পতিরে লয়ে। শোভে ভাল'পরে
উজ্জ্বল সিন্দূররেখা—প্রভাত-অম্বরে
উষারক্তরাগসম। আঁখিযুগ ভায়
বিচ্ছুরিত-রবিকর জলধর প্রায়—
স্নিগ্ধ স্নেহরসে আর্দ্র, পুণ্যসমুজ্জ্বল।
পতিপদ-অঙ্কে সতী বসিলা নিশ্চল।

৪

সপ্তবার পরিক্রমি' অগ্নিসংযোজন
করিলা চিতায় পুত্র—সজলনয়ন।
জ্বলে অগ্নি—রক্তশিখা পবনে চঞ্চল!
উচ্চারিলা স্বস্তিবাণী ব্রাহ্মণ সকল।
শতকণ্ঠ উচ্চারিল দেবতার নাম;
জনতা জুড়িল পাণি করিল প্রণাম।
লেলিহান অগ্নিশিখা ধরে পরস্পরে।
জননী নিশ্চল; হাসি শোভিছে অধরে!

ধূমপুষ্ট অগ্নি মাঝে শোভিতেছে সতী
অনলহৃদয়গতা স্বাহা মূর্ত্তিমতী।
ক্রীড়ামত্ত অগ্নিশিখা যেন আচম্বিতে
মুহূর্ত্ত রহিল স্থির সে দেহ স্পর্শিতে;
ধীরে ধীরে অগ্রসরি' যেন সসম্ভ্রমে,—
পরশিল পদতল—ভক্তিভরে নমে।
নিষ্কম্প কোমল তনু অনলদহনে,
গিয়াছে জীবন যেন পতির জীবনে!

সর্ব্বশুচি আপনার পুণ্য আবরণে
আবরিলা পুণ্য চিতা। সতীর নয়নে
স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি। চাহি পতিমুখে
একত্র অনন্তযাত্রা অপার্থিব সুখে।
জীবনের প্রেমরাশি মরণ সম্বল।
মর্ত্ত্যপ্রেম মর্ত্ত্যাতীতে স্থির অচঞ্চল।
ভস্মসাৎ নরদেহ;—চিতা নির্ব্বাপণ।
ধূলায় মিশিল ধূলা;—জীবনে জীবন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সহধর্ম্মিণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"শ্রীভগবানুবাচ।—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।—হে পার্থ, আত্মনি এব, কিনা পরমানন্দরূপে, আত্মনা কিনা স্বয়মেব—"

"তোমার ব্যাখ্যা ট্যাখ্যা রেখে দাও। তুমি একটু মিষ্টি সুর করে পড়,—আমি শুনি।"

"দেখ শৈল, তোমাকে এত ক'রে বোঝালুম, তবু তোমার একটুও চৈতন্য হ'ল না। তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, কোথায় আমার ধর্ম্মকর্ম্মে সহায়তা করবে, আমার পরকালের সদ্গতির জন্য চেষ্টা করবে, তা না, তোমার কেবল-চেষ্টা আমাকে মায়াজালে জড়িত করে রাখবে। সাধে শাস্ত্রে বলে—কামিনী কাঞ্চন বিষবৎ পরিত্যজ্য।"

"পরিত্যাগ কর্‌তে হয় সকাল বেলা কোরো; এখন রাত বারোটা, একটু ঘুমুতে দাও।" এই বলিয়া শৈল তাম্বূলগন্ধমোদিত অধরপ্রান্তের একটি ফূৎকারে আলো নিবাইয়া দিয়া খাটে গিয়া শুইয়া পড়িল।

"গুরুদেব, অবলাকে সুমতি দাও," বলিয়া উপেন আলো জ্বালাইয়া পুনরায় পড়িতে বসিলেন।

কালীঘাটে উপেনের গুরু বাস করেন। নাম বিমল। গুরুই বল আর বয়স্যই বল, উপেনের ইনি সবই। প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন এক সঙ্গে পড়িতেন, তখন হইতেই দুই জনে খুব মাখামাখি সৌহার্দ্দ্য ছিল। তখন বিমল সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের এক জন খুব গোঁড়া ভক্ত বলিয়া পরিচিত ছিল; এমন কি, এক সময়ে কলেজের কোন ছাত্র সুরেন্দ্র বাবুর নিন্দা করাতে বিমল তাহাকে ঘুষি মারিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু পলিটিক্স শেষে গীতা ও বেদান্তদর্শনে পর্য্যবসিত হইল। কলেজ ছাড়িয়া উপেন কণ্ট্রোলার আফিসে ঢুকিল, বিমল সংসারের অসারত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভগবচ্চিন্তা ও শাস্ত্রালোচনায় মনোনিবেশ করিল।

বিমলের পিতা বড়মানুষ। ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইয়া ও নানারূপ চেষ্টা করিয়াও তিনি পুত্রকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলেন না। বিমল সমস্ত ত্যাগ করিয়া কালীঘাটে গঙ্গার ধারে একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিল। অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীর ন্যায় বিমলের কোন বাহ্যিক ভড়ং ছিল না। গৈরিক বসন, কমণ্ডলু, ছাইভস্মের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। সংসারী ভদ্রলোক যেরূপ ধুতি জামা পিরাণ পরে, বিমলও তাহাই পরিত। এই জন্য উপেন তাহাকে আরও শ্রদ্ধা করিত। উপেনকে বিমল যে কি যাদুমন্ত্রে বশীভূত করিয়াছিল, লোকে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। বিমল উঠিতে বলিলে উপেন ওঠে, বিমল বসিতে বলিলে উপেন বসে। বিপদ আপদে সমস্ত কাজে বিমলের পরামর্শ না লইয়া উপেন এক পাও চলে না। বিবাহের প্রতি বিমলের জাতক্রোধ ছিল, এবং উপেনকে বিবাহ করিতে অহর্নিশ নিষেধ করিত। কিন্তু ভবিতব্য কে রোধ করিবে? বৎসরের পূর্ব্বে বিমল যখন পশ্চিমে তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, উপেনের পিতা জোর করিয়া উপেনের বিবাহ দেন। বিমল তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন বিবাহের কথা শুনিল, আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল, "উপেন, ভাই হে, সাধ ক'রে পাঁকে ডুব্‌লে!" উপেনও সেই অবধি কেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ম্রিয়মাণ।

ভোর হইতে না হইতে উপেন বিমলের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "ভাই, বিয়ে করে কি ঝক্‌মারিই করেচি। আমার ধর্ম্মজীবনটা একেবারে মাটী হ'ল! আমি যত দূরে দূরে থাক্‌তে চাই, আমার স্ত্রীর ততই আমাকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা। আমার গীতা বেদান্তদর্শন লণ্ডভণ্ড করে কোথায় যে ফেলে দেয়, তার ঠিক নেই। আজকাল আরও সাজসজ্জার দিকে বেশী মনোনিবেশ হয়েছে দেখ্‌চি। বিকেল হ'লেই লাল নীল কত রঙ বেরঙের ফিতে দিয়ে চুলটি বাঁধা আছে, ভিনোলিয়া সাবান নইলে মুখ ধোওয়া হয় না, এসেন্স্‌ মাসে তিন চার শিশি খরচ কর্‌চে। এ ছাড়া খোঁপায় বেলফুলের মালা, হাতে মেদিপাতার রঙ—আমি ত ভাই আর পেরে উঠ্‌চিনে, এখন উপায় কি!"

বিমল গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "উপেন, সাবধান, সাবধান, মায়াকুহকে পড়িয়া যেন ধর্ম্মভ্রষ্ট হইও না। স্ত্রীলোক হইতে শত হস্ত দূরে থাকিবে। ইহাতে যদি একান্ত নিষ্ঠুর হইতেও হয়, তাহাও হইবে, তবু যেন পদস্খলন

না হয়। তোমার স্ত্রীর বিলাসিতানিবারণের উপায় সে ত তোমারি হাতে। তুমিই ত সংসারের কর্ত্তা, তোমার স্ত্রীর সমস্ত খরচপত্র বন্ধ করিয়া দাও। ধর্ম্মজীবনের সমস্ত কণ্টক নির্ম্মূল কর। যোগবাশিষ্ঠে রামচন্দ্র বলিয়াছেন,—

ত্বঙ্মাংসরক্তবাষ্পাম্বু পৃথক্ কৃত্বা বিলোচনং।
সমালোকয় রম্যং চেৎ কিং মুধা পরিমুহ্যসি॥

"যুবতীর চর্ম্ম মাংস রক্ত বাষ্প বারি পৃথক করিয়া যদি কোন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও, তবে দেখিতে থাক, নচেৎ মিথ্যা মুগ্ধ হইও না।"

উপেন কহিল, "বিমল, তুমি ঠিক্ বলিয়াছ।" উপেন বাড়ী ফিরিয়া মাকে বলিল, "মা, আমার যা' ইচ্ছা ক'রব, তোমরা আমাকে বাধা দিতে পারবে না। যদি বাধা দাও, আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব। আমি মাছমাংস খাব না, সমস্ত রাত ধরে যোগ অভ্যাস করব, তোমরা মাথা খুঁড়লেও তোমাদের কথা শুন্‌চিনে।"

বৃদ্ধা মাতা মুখখানি ভার করিয়া বলিলেন, "বাছা, তুমি যা' ভাল বোঝো কোরো, আমরা আর কিছু বল্‌ব না।"

উপরে গিয়া উপেন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ শৈল, আমার সঙ্গে এ রকম ফচ্‌কিমি আর চল্‌বে না। এবারে যদি বই টই লুকিয়ে রাখ, হয় আমি বেরিয়ে যাব, নয় তোমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেব। এবার থেকে সাবান এসেন্স্ বাজে খরচের জন্য আর এক পয়সাও দিচ্চিনে।"

শৈল শান্তভাবে দৃঢ়স্বরে "আচ্ছা" বলিয়া নীচে নামিয়া গেল।

স্বামী আফিসে্ চলিয়া গেলে শৈল উপরে গিয়া আলমারী খুলিল। এসেন্স্ সাবান ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য বাহির করিয়া ছোট ননদটিকে দিল। ধূলা ঝাড়িয়া উপনিষদ শঙ্করভাষ্য বেদান্তদর্শন প্রভৃতি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিল। গীতার যে কয় পাতা আল্‌গা ছিল, আটা দিয়া জুড়িয়া ঠিক করিয়া রাখিল। এই সকল কাজের মধ্যে দুই ফোঁটা চোখের জলও ফেলিল।

আফিস হইতে আসিয়া উপেন যখন দেখিল শৈলের আর বেশপারিপাট্য নাই, এবং নিজে শাস্ত্রগ্রন্থগুলি পরিষ্কৃত হইয়া যথাস্থানে বিরাজ করিতেছে, তখন তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সন্ধ্যার সময় যখন সাধু সন্ন্যাসীরা উপেনের বাড়ীটিকে মঠ করিয়া তুলিল, তখন উপেনকে অন্যান্য দিনের ন্যায় আর চায়ের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতে হইল না; না বলিতে বলিতে যত পেয়ালা চা আবশ্যক অযাচিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কাহারও

চায়ে চিনির বদলে নুন কিংবা দুধের অভাব লক্ষিত হইল না। শৈলর মতি ফিরিয়াছে, এই স্থির করিয়া, উপেন মনে মনে ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ দিল।

উপেন যখন এইরূপ সাধুসঙ্গ ধর্ম্মালাপে মগ্ন, শৈল শয়নগৃহে ধূনা জ্বালাইল। তাহার পর স্বামীর বসিবার মৃগচর্ম্মখানি পাতিয়া সম্মুখে জলচৌকির উপর বইগুলা ঠিক করিয়া রাখিল। উপেন উপরে আসিয়া ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া যখন গীতাদিপাঠ আরম্ভ করিলেন, শৈল ঘরের চৌকাটে বসিয়া একমনে শুনিতে লাগিল। মাঝে একবার দক্ষিণে বাতাসের দমকা লাগিয়া আলো নিবিয়া যায়, শৈল তাড়াতাড়ি দেশলাই খুঁজিয়া জ্বালাইয়া দেয়। রাত্রি দুইটার পর উপেন নীচের বিছানায় বিশ্রাম করিলে তবে শৈল স্বামীর পদপ্রান্তে মাদুর পাতিয়া শয়ন করিল।

অতি প্রত্যুষেই উপেন বিমলের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, "ভাই! ওষুধ ধরিয়াছে। তোমার কথা মত কাজ করিয়া এক দিনেই শৈলের মতি গতির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখ্‌চি। তাহার সমস্ত চপলতা ধীর গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়াছে। আমার সাধন পক্ষে আর কোনই ব্যাঘাত নাই।"—শুনিয়া বিমল খুব আনন্দিত হইল।

শৈল দাসীর ন্যায় সেবা করে, উপেন শাস্ত্রালোচনা করেন। এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিমল এক্ষণে আর কালীঘাটে নাই। গয়ায় গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে দরিদ্র অনাথা বিধবা যাহারা তীর্থদর্শনে আসে, তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কেহ রোগে কাতর, রাস্তায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, মুখে এক ফোঁটা জল দিবারও লোক নাই। এরূপ অবস্থায় পাষণ্ড দুর্ব্বৃত্তেরা আবার অনেক সময়ে ইহাদের পুঁজিপাটা যাহা থাকে কাড়িয়া লয়। বিমল সহরের ধনীদের দ্বারে দ্বারে গিয়া বুঝাইয়া তাঁহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে সকলের সাহায্যে ও নিজের যত্নে একটি আশ্রম ও দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিল। পিতার নিকট চিঠি লিখিয়া মাসিক অর্থসাহায্যেরও বন্দোবস্ত করিল। স্কুলের ছাত্রেরা এই কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিল— তাহারা পথে পথে ঘুরিয়া বিপন্ন রোগী দেখিলেই কোলে করিয়া আশ্রমে লইয়া আসে।

একদিন সকাল বেলায় রোগিপরিদর্শন কার্য্যে বাহির হইয়া বিমল দেখিল, পথের ধারে গাছতলায় একটি সুন্দরী বালিকা মৃতপ্রায় পড়িয়া আছে। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় বলিলে ঠিক হইবে না,—নবোদ্ভিন্ন বৃন্তচ্যুত কুসুম ব্যতীত ইহার সৌন্দর্য্যের আর তুলনা সম্ভবে না।

বিমল ইহাকে বাড়ী আনিল। তাহার অশ্রান্ত সেবা শুশ্রূষার গুণে বালিকা বাঁচিল। সুস্থ হইয়া গায়ে একটু বল পাইলে বালিকা বিমলকে বলিল, "দেখুন, আপনি আমার প্রাণদান করিয়াছেন, দয়া ক'রে আপনার সেবাব্রতে আমাকে দাসী নিযুক্ত করুন, আমি আর অন্যত্র যাইব না।" বিমল জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, বালিকা অনাথা ব্রাহ্মণকন্যা এবং অবিবাহিতা।

বিমল এখন প্রায়ই কেমন অন্যমনস্ক হইয়া থাকে। পূজা আহ্নিকের তিন ঘণ্টা কাল এক্ষণে সংক্ষিপ্ত হইয়া পনের মিনিটে দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রগ্রন্থ প্রায় আর কুলুঙ্গি হইতে নীচে নামে না। বিমল বড় একটা বাড়ীর বাহিরও হয় না। বালিকাকে রোগমুক্ত করিতে গিয়া বিমল স্বয়ং উৎকট মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

আকাশের মেঘ যতক্ষণ পারে, বারিকণা বক্ষে ধরিয়া রাখে, কিন্তু শীতল বাতাস বহিলে জলভার ধারণ করিবার তাহার আর সামর্থ্য থাকে না। যত দিন পারিল, বিমল মনের আবেগ চাপিয়া রাখিল; কিন্তু অবশেষে যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, একদিন বালিকাকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, আমাদের আর এরূপ ভাবে থাকা শোভা পায় না। আমি তোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি, কি বল?" বালিকা দুই গণ্ডে রক্ত ছুটাইয়া অধোবদনে মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বিমল সমস্ত খুলিয়া পিতাকে একখানা চিঠি লিখিল। পিতা চিঠি পাইয়া আনন্দে আটখানা হইয়া সেইদিনই গয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। গয়ায় পঁহুছিয়া দু' একদিনের মধ্যে পুত্রের বিবাহ দিলেন, এবং ক্রমে সংসারের ভারও তাহার উপর ন্যস্ত করিলেন।

উপেন বিমলের বিবাহের কথা কিছুই জানিত না। সেদিন সকালে নীচের ঘরে তক্তার উপর বসিয়া উপেন জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিল, একাগ্রমনে গ্রহ নক্ষত্রের সহিত মানবজীবনের রহস্যময় সম্বন্ধের নির্ণয়ে নিযুক্ত ছিল, এমন সময় গাড়ী করিয়া বিমল ও তাহার স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। উপেনকে দেখিয়া বিমল বলিল, "ভাই! তোমাকে সর্‌প্রাইজ্‌ কর্‌বার

ইচ্ছা ছিল। তাই তোমাকে কিছু লিখিনি, আমি বিবাহ করিয়াছি, ইনি আমার স্ত্রী। সে সব অনেক কথা আছে, কাল আমাদের বাড়ী যেও, সব বল্‌ব। আমরা এখন ভবানীপুরে থাকি।"

বিমলের সমক্ষে উপেনের বাড়ীর মেয়েরা সকলেই বাহির হইতেন। বিমল ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া উপেন উপরে গেল। শৈল খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের বসাইল, এবং আলাপ পরিচয় কথাবার্ত্তার পর বাজার হইতে ভালো জলখাবার আনাইয়া খাইতে দিল। উপেন সমস্ত ক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া ঘরের এক পার্শ্বে অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। এক দিকে সালঙ্কারা সুবাসস্নাতা বিলাসিনী বিমলের স্ত্রী, অন্য দিকে বিরসবদনা দীননয়না তৈলহীনরুক্ষকেশী শৈল—দুঃখ লজ্জা অনুতাপ ধিক্কারে উপেনের বক্ষের বাঁধন খসিয়া যাইতে লাগিল। বিমল জিজ্ঞাসা করিল, "উপেন যে এত চুপ্‌চাপ্‌?" উপেন বলিল, "আমার শরীরটা ভাল নেই।"

বিমল ও তাহার স্ত্রী চলিয়া গেলে, উপেন, কি ভুলই করিয়াছি বলিয়া, দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া আবেগকম্পিতবক্ষে শৈলকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে গেল। শৈল ঘাড় ফিরাইয়া দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া বলিল, "আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, কুহকিনী বা মায়াবিনী নহি।" কোন মতেই চুম্বন করিতে দিল না।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আবহবিদ্যা।

আবহ শব্দে বায়ুমণ্ডল বুঝায়, যাহাকে ইংরাজীতে atmosphere বলে। বিজ্ঞানের যে শাখা বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি ও তত্ত্বের অনুশীলন করে, তাহাকেই meteorology বলে; এবং এখানে তাহাই আবহবিদ্যা নামে অভিহিত হইল।

আবহ সম্বন্ধে আমাদের কত কি জানিবার আছে। ইহাতে প্রকৃতির জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনধারণোপযোগী প্রয়োজনও যথেষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। কোনও স্থানে বৎসরে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন উত্তাপ কত হয়, সেখানকার বায়ুতে জলীয় বাষ্প কি পরিমাণ থাকে, বায়ুর বেগ কত,

কোন্ দিক হইতে সাধারণতঃ বায়ু বহিয়া থাকে, দিবসের কোন্ সময়ে বায়ু গুরু বা লঘু হইয়া থাকে, বৎসরে কত ইঞ্চ বৃষ্টি হয়, ইত্যাদি বিষয় জানা সকল লোকের আবশ্যক না হইতে পারে, কিন্তু এই সকল তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা হয় ত আমরা প্রকৃতির এমন তত্ত্ব, এমন নিয়মের আবিষ্কার করিতে পারি, যাহাতে মানবজাতির সুখের বৃদ্ধি ও দুঃখের হ্রাস হইতে পারে।

সমস্ত সভ্যদেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও বাঙ্গলা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের অধীনে এক এক জন meteorological reporter বা আবহসংবাদজ্ঞাপক কর্ম্মচারী আছেন। এবং সমুদয়ের উপরে ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্টের অধীনে এক জন আবহবিজ্ঞানবিদ্ পরামর্শদাতা আছেন। প্রাচীনকালে যেরূপ রাজাদের সভায় এক এক জন জ্যোতিষী থাকিতেন, এবং নূতন বৎসরে রাজার শারীরিক ও রাজ্যসম্বন্ধীয় ইষ্টানিষ্টের ও ফলাফলের বিষয় রাজাকে শুনাইতেন, সেইরূপ আবহসংবাদজ্ঞাপক কর্ম্মচারী মহাশয়ও আগামী বৎসরের ফলাফল কয়েক মাস পূর্ব্বেই ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্টকে শুনাইয়া থাকেন। ইঁহারা কেবল বৃষ্টি সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কোন্ দেশে অতিবৃষ্টি, কোন্ দেশে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা, কোন্ দেশে উপযুক্ত বৃষ্টি হইয়া কৃষকের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে, ইত্যাদি বিষয়েই অনুমানের সাহায্যে যৎকিঞ্চিৎ বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন; কিন্তু আবহবিদ্যা এখনও অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় সম্যক উন্নত হয় নাই বলিয়া অনেক সময়েই এই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইয়া থাকে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রায় সমুদায় শাখারই উদ্দেশ্য এক—এবং তাহা এই যে,—প্রকৃতির অতীত ও বর্ত্তমান কার্য্যাবলীর পর্য্যালোচনা করিয়া প্রকৃতিসম্বন্ধীয় ভবিষ্যৎ জ্ঞান লাভ করা। এবং সেই ভবিষ্যৎ জানিবার চেষ্টাও সম্ভবপর হইয়াছে অন্য একটি সত্যের উপর অটল বিশ্বাস থাকায়। সেই সত্যটি কি? বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে কারণ সমান থাকিলে কার্য্যও সমান হইয়া থাকে; দেশকালভেদে কার্য্যের ভিন্নতা হয় না। মনে কর, আমি বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা দেখিলাম, যে কোন প্রকার বাসনে কোনরূপ উত্তাপে দুধ রাখিয়া দিলে ৬ ঘণ্টায় জমিয়া দই হইয়া যায়। বিজ্ঞানবিদ্দের বিশ্বাস এই যে, এইরূপ অবস্থায় সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র ৬ ঘণ্টায় দুধ জমিয়া দই হইয়া যাইবে; কিন্তু যদি অবস্থা সমান থাকিয়াও আমার বাড়ীতে দই

জমিল, তোমার বাড়ীতে জমিল না, গোয়ালার বাড়ীতে জমিল, ব্রাহ্মণের বাড়ীতে জমিল না, আজ জমিল, কাল জমিল না, শুক্রবারে জমিল, রবিবারে জমিল না, এরূপ হইত, প্রকৃতির এরূপ খামখেয়ালি রকমের কার্য্য দেখিতে পাইলে প্রকৃতিচর্চ্চা বৃথা ও প্রকৃতিতত্ত্বানুশীলন নিষ্ফল হইত। সুতরাং বৃথা চেষ্টা কেহ করিতও না।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি পরিজ্ঞাত থাকায় ১০ বৎসর পরে শুক্র কি বৃহস্পতি রাশিচক্রের কোন্ স্থানে অবস্থিত থাকিবে, জ্যোতির্ব্বিদ্যা তাহা বলিয়া দিতে সমর্থ। অন্যান্য বিদ্যা এখন থাকুক—এক আবহবিদ্যা যদি কখনও পূর্ণ বিজ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে মানবজাতির যে কত সুখ সুবিধার বৃদ্ধি হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যদি আমরা কয়েক মাস পূর্ব্বেই জানিতে পারি, কোন্ দিন কত বৃষ্টি হইবে, এবং সেই অনুসারে ক্ষেত্রকর্ষণাদি, ধান্যবপনাদি সম্পন্ন করি, তাহা হইলে আর আমাদের পেটের জ্বালায় মরিতে হয় না। মাড়োয়ারীদের বৃষ্টিসম্বন্ধীয় জুয়া খেলায় দশ হাজার টাকা জিতিবার আশা বিজ্ঞানসম্মত নয় বলিয়া ছাড়িয়া দিলেও, বৃষ্টিতত্ত্ব জানিতে পারিলে কৃষিপ্রধান ভারতের যে কত কল্যাণ হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভারতবর্ষের যে যে স্থানে আবহমানাগার (meteorological observatory) আছে, সেই সেই স্থানে সাধারণতঃ দিনে তিনবার মাত্র আবহের অবস্থা দেখা হয়। প্রাতে ৮ টার সময় একবার যন্ত্রাদি পড়িয়া সিমলাতে টেলিগ্রাম করিতে হয়। সেখানে Indian daily weather report নামক দৈনিক গবর্মেণ্ট কাগজে ভারতবর্ষের প্রায় ১৫০ স্থানের বায়ুর চাপ, পূর্ব্ববর্ত্তী দিনের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন তাপ, বায়ুর বেগ ও বৃষ্টিসম্বন্ধীয় বিবরণ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। তৎপর ১০ টার সময় একবার ও অপরাহ্ণ ৪ টার সময় আর একবার যন্ত্রাদির তত্তৎ সময়ের পাঠ লিখিয়া রাখা হয়। আজকাল যন্ত্রাদিনির্ম্মাণপ্রণালীর এত দূর পরাকাষ্ঠা হইয়াছে যে, প্রায় সমুদয় যন্ত্রই এরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে এবং করা গিয়াছে, যাহা সংলগ্ন কাগজে একাদিক্রমে ২৪ ঘণ্টা আবহের অবস্থা লিখিয়া রাখিতে সমর্থ। কিন্তু এরূপ যন্ত্র বহুব্যয়সাধ্য, সুতরাং সকল আবহমানাগারে তাহা থাকে না। সাধারণতঃ এই কয়টি মাত্র থাকে ;—(১) বায়ুমান যন্ত্র (Barometer) যাহা দ্বারা বায়ুর গুরুত্ব লঘুত্ব জানা যায়। (২) বায়ুবেগমান যন্ত্র (Anemometer) যাহা বায়ু ঘণ্টায় কয় মাইল চলিতেছে, কোন দিক হইতে বহিতেছে, তাহার

নির্দ্দেশ করে। (৩) ছয়টি তাপমান যন্ত্র (Thermometer) একটি বায়ুমান যন্ত্রে সংলগ্ন থাকে; একটি দিবসের সর্ব্বোচ্চ তাপ, একটি রজনীর সর্ব্ব-নিম্ন তাপের নির্দ্দেশ করে। অন্য তিনটির মধ্যে একটি সাধারণ তাপমান যন্ত্র;— যখন পড়া যায়, কেবল সেই সময়ের তাপ নির্দ্দেশ করে। অন্য দুইটির পারদ-স্থলী সিক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবৃত থাকে, এবং সেই অবস্থায় আবহের উত্তাপ দেখায়। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক আবহমানাগারে, এমন কি, ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশনেও এক একটি বৃষ্টিপরিমাপক যন্ত্র থাকে।

সাধারণতঃ লোকে মনে করিয়া থাকে, বায়ুর বুঝি কোন ওজন নাই; কিন্তু তাহা নহে। ভূপৃষ্ঠ হইতে শত শত মাইল ব্যাপী বায়ুর ওজন আছে,এবং তাহাই মাপিবার যন্ত্রের নাম বায়ুমান যন্ত্র। পারা কি জল অপেক্ষা বায়ু অবশ্যই খুব লঘু তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও সমস্ত বায়ুর ওজন অল্প নহে; যে বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে, তাহা মাপিলে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বতমালার যত ওজন প্রায় তত ওজন হইবে। পাঠক যদি কখনও পাহাড়ে গিয়া থাকেন, এবং এক হাজার নয়, এক লক্ষ নয়, এক কোটী মণ ওজনের একটা ছোট খাট পাহাড় দেখিয়া থাকেন, তবে বায়ুমণ্ডলের ওজন কতকটা ধারণা করিতে পারিবেন। সমস্ত বায়ুমণ্ডলের ওজন এক কোটি নয়, ১০ কোটি নয়, চৌদ্দ শত কোটি এইরূপ ছোট খাট পাহাড়ের ওজনের সমান হইবে। "১৪" এই সংখ্যার পৃষ্ঠে ষোলটা শূন্য বসাইলে যত মণ হয়, বায়ুমণ্ডলের ওজন তত মণ। বায়ুমণ্ডল আমাদের মস্তকোপরি কত ভার চাপাইয়া রহিয়াছে, তাহার একটা মোটামুটি ভাব দিতে হইলে এই বলা যায় যে, ২॥ ফিট উচ্চ পারা কি ৩৪ ফিট উচ্চ জল যত ভার, আমরা সর্ব্বদা ততটা ভার মাথায় করিয়া চলিতেছি। বায়ু-মণ্ডল পৃথিবীর উপরে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চ স্থানে প্রায় সাত সের ভার চাপাইয়া থাকে। তুলা ধুনিয়া রাখিলে মনে হয়, যেন বায়ুর মত পাত্‌লা, কিন্তু তাহা দ্বারাই লেপ প্রস্তুত করিয়া গায়ে দিলে ভারী বোধ হয়। যদি উপরে চাপ দিয়া বায়ুকে ঘন করিয়া লওয়া যাইত, তাহা হইলে ২।১ মাইলের মধ্যেই রাখা যাইত। এবং আমরা যেরূপ জলের মধ্যে চলা ফেরা করা কঠিন বোধ করিয়া থাকি, কতকটা সেরূপ হইত। নীচের বায়ু যেরূপ ঘন, উপরকার বায়ু সেরূপ নহে; ক্রমেই পাত্‌লা ও লঘু হইয়া গিয়াছে। বায়ুমান যন্ত্রের দ্বারা বায়ুর গুরুত্ব মাপা হয়। সমুদ্রের উপরে বায়ুমান যন্ত্রের ভিতরে পারা

৩০ ইঞ্চ বা ২॥ ফিট উপরে উঠে। কলিকাতায় কিছু কম; ক্রমে হিমালয়ের দিকে লইয়া আসিলে কমিতে কমিতে দার্জ্জিলিংএ কেবল ২৩ ইঞ্চ; যদি এভারেষ্ট শৃঙ্গের উপরে লওয়া যাইত (যাহার উচ্চতা ২৯ হাজার ফিট) তাহা হইলে দেখা যাইত যে, কেবল কয়েক ইঞ্চ মাত্র উচ্চ। ক্রমেই সমুদ্র হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকিলে বায়ুমান যন্ত্রের পারাও নামিতে থাকে। প্রায় এক হাজার ফিটে এক ইঞ্চ নামে। দার্জ্জিলিং পাহাড় ৭০০০ হাজার ফিট উচ্চ বলিয়া সেখানে ৩০—৭=২৩ ইঞ্চ উচ্চ। এইরূপে কত উচ্চতায় কত ইঞ্চ পারা নামিয়া থাকে, তাহার একটা পরিমাণ আছে। সুতরাং বায়ুমান-যন্ত্রস্থিত পারার উচ্চতা দ্বারা সহজেই সেই স্থানের উচ্চতার নির্ণয় করা যায়। জলে ডুব দিয়া থাকিলে যেমন সব দিকে সমান চাপ পড়ে বলিয়া বিশেষ অসুবিধা বোধ হয় না, সেইরূপ বায়ুমণ্ডলের চাপও আমাদের শরীরের সব-দিকে সমানভাবে পতিত হয় বলিয়া চাপ টের পাওয়া যায় না। দার্জ্জিলিং কি হিমালয়ে গেলে কলিকাতা অপেক্ষা বায়ুর অল্প চাপ সহিতে হয়, এবং তাহাতে শরীরেরও খুব উপকার হয়। বিশেষতঃ ফুসফুসের উপর কম চাপ পড়ে বলিয়া যাহাদের ফুসফুসসম্বন্ধীয় কোন রোগ আছে, তাহাদের পক্ষে খুবই ভাল।

সমুদ্রে যেমন দিবসে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাঁটা হইয়া থাকে, বায়ুমণ্ডলেও সে রূপ জোয়ার ভাঁটা লক্ষিত হয়। সামুদ্রিক জলের জোয়ার ভাঁটা প্রতিদিন এক সময়ে হয় না, কিন্তু আবহের জোয়ার ভাঁটা প্রত্যহই প্রায় এক সময়ে হইয়া থাকে। পূর্ব্বাহ্নে ১০টা ও রাত্রিতে ১০ টার সময় বায়ুমণ্ডলের জোয়ার আসিয়া থাকে; অর্থাৎ, বায়ুমণ্ডলের চাপ সর্ব্বোচ্চ হয়। এবং অপরাহ্ন ৪টা ও শেষরাত্রি ৪ টার সময় সর্ব্বনিম্ন চাপ হইয়া থাকে।

আবহ সম্বন্ধে জানিতে গেলেই ঝড় ও বৃষ্টির বিষয় সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে পড়ে। ঝড় জলে স্থলে আমাদের কত না অনিষ্ট করে। কত বাড়ী ঘর ফেলিয়া দেয়, কত জাহাজ ডুবাইয়া শত সহস্র লোকের প্রাণনাশ করে। যদি আমরা পূর্ব্বে ঝড়ের আগমন জানিতে পারি, তাহা হইলে সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক ধন প্রাণ রক্ষা করিতে পারি। এই সেদিন টর্ণেডো হইয়া ঢাকায় কত না ধন ও জন বিনষ্ট হইল। বায়ুমান যন্ত্র দ্বারা কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে ঝড়ের আগমন টের পাওয়া যায়। যে সকল সমুদ্রোপকূলস্থ বাণিজ্যপ্রধান স্থানে বাষ্পীয় পোত নিরাপদে নঙ্গর করিয়া রাখিবার স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে

সেই সেই স্থানে বায়ুমান যন্ত্র দ্বারা ঝড় প্রভৃতি সূচনা প্রকাশ করিবার জন্য লোকও নিযুক্ত আছে। যদি ঝড়ের আশঙ্কা বুঝা যায়, তাহা হইলে পতাকাবিশেষের উত্থান দ্বারা জাহাজের কাপ্তেনদিগকে জাহাজ ছাড়িতে নিষেধ করা হয়। সমুদ্রোপকূলে কোন প্রবল ঝড় উত্থিত হইলে তাহার গতি ও দিক নির্ণয় করিয়া কবে কোন্ সময়ে সে ঝড় অন্য অন্য স্থানে পঁহুছিবে, তাহা গণনা দ্বারা স্থির করা যায়। তদনুসারে অন্যান্য স্থানে পূর্ব্বেই সংবাদ প্রেরিত হয়। আমরা যখন মুসুরি পাহাড়ে ছিলাম, তখন একবার গবর্মেণ্টের আবহ-বিজ্ঞাপক কর্ম্মচারী এক দিন পূর্ব্বে আমাদিগকে এক প্রবল ঝড় আসিতেছে বলিয়া টেলিগ্রাফে সংবাদ দিয়াছিলেন।

বৃষ্টিতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। কোথায় কখন কত ইঞ্চ বৃষ্টি হইবে, ইহা জানা অত্যন্ত আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ের ভবিষ্যৎ জ্ঞান এখনও আয়ত্ত হয় নাই। পাশ্চাত্য আবহবিদ্যার সাহায্যে এইমাত্র জানা যায় যে, মন্সুন (monsoon) নামক একটা সাময়িক প্রভঞ্জন দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে আসিয়া বোম্বাইয়ের দিক দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। বর্ষাকালের কয় মাস এই প্রভঞ্জন বহিয়া থাকে, এবং আসিবার সময় সমুদ্র হইতে যে সকল জলীয় বাষ্প পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া আসে, তাহাই পাহাড় পর্ব্বতে ঢালিয়া থাকে। সেই মনসুন্ প্রথমতঃ পশ্চিমউপকূলস্থ পশ্চিম ঘাটগিরিমালায় বাধা প্রাপ্ত হইয়া কিছু বর্ষণ করে ; তৎপরে চলিতে চলিতে হিমালয়,আসাম ও বর্ম্মার পাহাড়গুলির মস্তকেও যথাক্রমে বর্ষণ করিয়া থাকে। সেই প্রভঞ্জন বোম্বাইয়ে আসিলে পর আমরা জানিতে পারি। সাধারণতঃ জুন মাসের মধ্য-ভাগেই মনসুন্ বহিতে আরম্ভ হয়। এবং তখনই বর্ষারম্ভ হইল বলা যায়। কিন্তু এই মনসুনের আগমনবার্ত্তা মাস দু মাস কি সপ্তাহ দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে জানিবার, কি কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষণ করিবে তাহা জানিবার মত আমাদের কোন যন্ত্রও নাই, বা সেরূপ কোন জ্ঞানলাভও হয় নাই। সম্প্রতি সূর্য্যমধ্যস্থিত দাগের সহিত ভারতীয় বৃষ্টি অনাবৃষ্টির সম্বন্ধ স্থির করিবার চেষ্টা হইতেছে।

প্রাচীন ভারতে বৈদিক সময় হইতে যে কেবল ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতার স্তুতি আরাধনা হইয়া আসিতেছিল,তাহা নহে। আবহবিদ্যা কতকটা উন্নতও হইয়াছিল। বৃহৎসংহিতায় বরাহমিহির অনেক আবহতত্ত্ববিদ্ ঋষির নাম করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে একবিংশ হইতে অষ্টাবিংশ

অধ্যায় পর্য্যন্ত বৃষ্টিসম্বন্ধীয় ভবিষ্যৎ জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। যে সকল গ্রন্থ হইতে বরাহমিহির আপন গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সকল গ্রন্থ আজ কাল দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য। আবার বরাহমিহির যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত। বৃহৎসংহিতার একবিংশ অধ্যায়ে যে নিয়ম উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা অন্ততঃ ছয় মাস পূর্ব্বে কোন বিশেষ স্থানে বিশেষ দিনে বৃষ্টি হইবে কি না, এবং হইলে কয় ইঞ্চ হইবে, তাহা বলা যায়। নিয়মটি এই ঃ—মনে কর, ১৯০০ সনের ৮ই ডিসেম্বর আর্দ্রানক্ষত্রে তোমার বাসস্থানের শীর্ষস্থানে কতকগুলি মেঘ দেখিলে। বরাহমিহির বলিতেছেন, যদি সেই মেঘগুলি কোন বিশেষলক্ষণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ইহারা গর্ভধারণ করিবে, আর প্রায় ১৯৫ দিন পরে সেই নক্ষত্রে ১৯০১ সনের ১৭ই জুন তারিখে বৃষ্টিরূপ সন্তান প্রসব করিবে; কত সন্তান প্রসব করিবে বা কয় ইঞ্চ বৃষ্টি হইবে, তাহাও বলা যায়। এই নিয়মটির সত্যাসত্য পরীক্ষা সম্বন্ধে আমি গত দ্বাদশ বৎসর যাবৎ কিছু না কিছু করিয়া আসিতেছি। বুঝিতে পারিয়াছি, ইহাতে এক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে উহা অসম্পূর্ণাবস্থায় পড়িয়া আছে। এই তত্ত্বটিকে পূর্ণাবস্থায় আনিয়া বৈজ্ঞানিক জগতের সম্মুখে ধরিতে হইলে অনেক সহিষ্ণুতা চাই, অনেক অর্থ ও সময়ব্যয়ের আবশ্যক। ভবিষ্যতে এই তত্ত্বের সম্যক বিবরণ পাঠকবর্গকে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

এ স্থলে উল্লেখ না করিলে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে ত্রুটি হয়, বরোদা রাজ্যের বড় আদালতের জজ রায়বাহাদুর জনার্দ্দন সুখারাম গেডগিল মহাশয়ই প্রথমে এই বিষয়ে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। পেন্‌সন লইয়া দেশপর্য্যটনের পর দাক্ষিণাত্যের ওয়াই নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার অভিজ্ঞতাপূর্ণ যে সকল চিঠি ও কাগজপত্র আমার নিকট আছে, তাহা অতি মূল্যবান। প্রকৃতির বৃষ্টিতত্ত্ব যদি কখনও কথঞ্চিৎ উদ্‌ঘাটিত হয়, তবে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারই চেষ্টা ও উদ্যমের ফল বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

শ্রীঈশানচন্দ্র দেব।

কবিতা-কুঞ্জ।

বিলাপ।

তোমার জগতে দেব ! কত ফোটে ফুল,
তোমার আকাশ-কোলে কত হাসে তারা,
নিদারুণ পাষাণের বক্ষ ভাসাইয়া
তোমার সাগরে কত ছোটে প্রেমধারা।—
আমারে কি তারি মাঝে পাঠায়ে দিয়েছ
আজীবন বর্ষিবারে শুধু অশ্রুজল ?—
সংসারের সুধাভরা সমুদ্রের মাঝে
আমারে কি এক ফোঁটা ফেলেছ গরল ?
আঁধার বনের হৃদে ফুটে যে কুসুম,
সেও গো ঝরিবে প্রাতে হাসিতে হাসিতে,
স্বাধীনতা-অভিমানী শ্রেষ্ঠ নর আমি,
আমি শুধু যাব কি গো কাঁদিতে কাঁদিতে ?
এ চির-বসন্তে আমি—হায় দুরদশা।—
আমি কি পুষিব প্রাণে অনন্ত বরষা ?

নিত্যকৃষ্ণ বসু।

আসিও তখন।

সায়াহ্ণ-সিন্দুরলিপ্ত যবনিকা যবে
ঢাকিবে রবির দীপ্তি বিশ্বদাহকর,
অলসলুলিত স্নিগ্ধ সমীরণ রবে
লুটায়ে শিশিরসিক্ত তৃণের উপর,—
হৃদয়ে পরিয়া প্রিয়ে বাসনা-বসন
মৃদুপদে একাকিনী আসিও তখন।

দলিতঅঞ্জনদ্যুতি গগনের তলে
নিস্তব্ধ শ্যামল বনে, বিহগকূজন
রহিবে নীরবে যবে ; স্তব্ধ সর-জলে
নিঃশব্দে কৌমুদী যবে করিবে শয়ন—
দূরে ফেলি লাজ-বাস আমরা দু' জন
মিলিব বিজনে আসি ;—আসিও তখন।

নিদ্রায় মুদিবে নর বিদ্বেষ-নয়ন,
ভাসিবে জ্যোছনা শুধু, হাসিবে অম্বর ;
কোমলকরুণ-প্রেমে তারকা যখন
বিকাশিবে প্রেমদিঠি বিশ্বমোহকর,—
লভিয়ে পরাণে প্রিয়ে প্রেমজাগরণ
দু' জনা জাগিয়া রব,—আসিও তখন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আবাহন।

গাহ তুমি—জগতে ঝরিবে সুধাধারা ;
চাহ তুমি—নিখিল হইবে আত্মহারা ;
হাস তুমি—হাসিবে অযুত পুষ্পরাশি,
তোমারি সৌন্দর্য্য শোভা বিশ্বে পরকাশি।
কোকিল কুহরি মরে তোমার আহ্বান ;
ভ্রমর গুঞ্জরে ফিরে তব স্তবগান ;
তোমার সুরভিশ্বাস চুরি করে লয়ে'
ছড়াইছে সর্ব্ব বিশ্বে মধুর মলয়ে ;
রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে ভাগ করি
ধরণী বিলায় সে যে তোমারি মাধুরী।
অভাবে তোমার আজি সকলি বৃথায় ;—
স্বপ্নসম, ছায়াসম, চিত্রসম ভায়।
বিশ্বশোভা তাই আজি তোমারে ডাকিছে,
—"তুমি" না আসিলে সখি বসন্ত ত মিছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

আবেদন।

১

হায়, প্রেয়সী, উপাসকের
এই কি পুরস্কার?
কাব্য-কলা সকল গেল
তোমার ধ্যানে তা'র?
তোমার কবি তোমার প্রেমে
গাহিতে চাহে গীত,
ভাষার রঙে লিখ্‌তে নারে
হৃদয়-সঙ্গীত!
ভাবের রাশি হৃদয়-তটে
বন্যা সম বয়,
সকল ভুলে' আকুল আঁখি
তোমায় চেয়ে রয়!
হৃদয় ভরা ভাবের রাশি
ভাষার বন্ধ টুটে;
কেবল বুঝি ঐ অধরে
চুম্বনেতে ফুটে!

২

রাত্রি দিবা শ্রান্তি নাহি,
তোমায় শুধু হেরে;
বিশ্ব খোঁজা শোভার রাশি
সেথায় সে কি হেরে?
চিত্তে তুমি প্রেম-প্রভাতে
প্রথম দেখা বধূ;
প্রণয় আঁকে তোমার মুখে
নিত্য নব মধু!
তোমায় হেরে আশ মিটে না
দেখেই তবু সুখ;
তিলেক হ'লে নয়ন-ছাড়া—
জীবন শুধু দুখ!
দীর্ঘ দিবা ক্ষুদ্র অতি
তোমায় পেলে পাশে;
তোমার আঁখি- কিরণ পেলে
বিশ্ব-শোভা হাসে!

৩

বাতুল সে কি? প্রেম-প্রবাহে
লভ্‌তে চাহে কূল?
অকূলের ত কূল মিলে না;
বিষম সে যে ভুল!
জীবন-ভরা কেবল তুমি;
ক্ষুদ্র হৃদে তা'র
তোমায় তবু রাখ্‌তে চাহে?
এ কি অহঙ্কার!
তাইতে বুঝি মায়ালোকের
মরীচিকার ছলে,
নিত্য নব শোভায় ফুটি'
আস্‌ছ হৃদিতলে?
বিশ্ব শোভা- তৃপ্ত নহে
ভক্ত সে তোমার;
নূতন শোভা তাই কি তা'রে
দিচ্ছ অনিবার?

৪

তোমায় লয়ে হৃদয় মাঝে
বিশ্ব-শোভা খুঁজে;
আপন হৃদি উজল কত
আপনি নাহি বুঝে।
বিশ্ব-শোভা চক্ষে দেখে
চক্ষে নাহি ধরে,
হাস্য প্রভা ফুটিয়া উঠে
তোমার আঁখি'পরে।
তোমার তরে বিদায় দেছে
কাব্য—চিরসাথী;
তোমার তরে আসন করে'
হৃদয় দেছে পাতি'।
তোমার আশে বিদায় দেছে
সকল সাথী আর;
তোমার প্রেমে পূর্ণ রেখ'
শূন্য হৃদি তা'র।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আত্মবিস্মৃতি।

যে পথে পথিক যায় সজলনয়নে
মধুর প্রিয়ার নাম জপিয়া বদনে,
সেই পথে—মর্ত্ত্যলোকে—আমার নিবাস,
সে কাতর-মর্ম্ম-মাঝে আমি সপ্রকাশ।

যে পথে অধীরে ধায় অমৃতের তরে
নিরখি চকোরবধূ পূর্ণ সুধাকরে,
সেই পথে—স্বর্গলোকে—আমার নিবাস,
সে সুষমা-সুখ-তীরে লভি গো বিকাশ।

যে পথে কল্পনা আসে ফুল্লভাবময়ী
স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত করি' দিব্যালোকময়ী,
সেই পথে—স্বপ্নলোকে—আমার নিবাস,
সে সুন্দর ভাবরাজ্যে আমার প্রকাশ।

অবসর মত জ্বালি বিস্মৃতির বাতি,
বিরহে, মিলনে, স্বপ্নে অনুত্তাপভাতি।

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

সম্ভাষণ।

বলি বলি করি যেন পারে না বলিতে,
মুহূর্ত্তে সরমে বেধে মরমে লুকায়।—
কত আশা কত হর্ষ;—আকুলিত চিতে
মুখরিত করিতেছে মূক বাসনায়।
ধীরে ধীরে, পায় পায়, সরমে শঙ্কায়—
ভরিয়া হৃদয়-থালা প্রীতি-বিল্বদলে—
এসেছে পূজিতে, আহা, ধ্যেয় দেবতায়;—
সনীর নীরজ-নেত্র মুছিয়া অঞ্চলে।
গৌরী রোহিণীর সেই সঙ্গমপ্রয়াগে—
নিমেষের তরে দেখা,—দৃষ্টিবিনিময়!—
নবীন জীবনে আজ নব অনুরাগে
বাসনা-বাঞ্ছিত-করে সঁপিতে হৃদয়।
পুরোভাগে পিপাসিত ক্ষুদ্র হিয়াখানি
পশ্চাতে লাবণ্যময়ী পূর্ণাঙ্গী কল্যাণী।

শ্রীনলিনীভূষণ গুহ।

সহযোগী সাহিত্য।

বিবিধ।

রেলপথ ও দুর্ভিক্ষ।

ভারতে রেলপথের জটিল জাল ইংরাজের সৃষ্টি,—অতি অল্পকালের। বলিতে গেলে বিগত পঞ্চাশ বৎসরেই এই রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। করিপৃষ্ঠে, নরবাহ্য যানে, বা অশ্বারোহণে পথাতিক্রম এখনও ইতিহাসের পৃষ্ঠাগতমাত্র নহে। এখনও স্থানে স্থানে হস্তী কেবল ঐশ্বর্য্যচিহ্নমাত্র নহে; এখনও অনেক স্থানে সুদীর্ঘপথ নরবাহ্য যানে অতিক্রম করাই সুবিধাজনক; এখনও অনেক স্থানে গ্রাম্যপথে অশ্বারোহণে বা ধীরগতি গোযানেই পথ অতিক্রান্ত হইয়া থাকে।

কর্ম্মবাহুল্যই লর্ড ড্যালহৌসীর ভারতশাসনের বিশেষত্ব। ইংরাজ রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ীকরণ হইতে পাদপহীন স্থানে বৃক্ষরোপণ, জ্ঞানবিস্তারের উপায়নির্দ্ধারণ, কারাগারের

নিয়মসংশোধন, রেলপথ ও টেলিগ্রাফের প্রবর্ত্তন তাঁহার কার্য্য। তিনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বিস্তৃত মন্তব্যে এ দেশে রেলপথপ্রবর্ত্তনের প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেন। ১৮৬২খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ১৩৬০ মাইল মাত্র রেলপথ নির্ম্মিত হয়। সিপাহীবিদ্রোহে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াই বন্ধ ছিল; পরে কার্য্য অগ্রসর হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের শেষ দিন ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলপথ গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এখন রেলপথ প্রায় ২৫০০০ মাইলেরও উপর বিস্তৃত; পনের কোটীরও অধিক যাত্রী রেলপথে গমনাগমন করে। দুরন্ত তিরোহিত—কবির "অশ্বমনোরথের" কল্পনা এখন লৌহ ও বাষ্পসংযোগে বাস্তব রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী। এখন আর কৃষক ক্ষেত্রপার্শ্বগামী ট্রেণের দিকে চাহিয়াও দেখে না; নিঃশব্দে রোমন্থনরত গাভীও আর ট্রেণের শব্দে মুখ তুলে না। ট্রেণ এখন পরিচিত—নিত্যব্যবহৃত—একান্ত আবশ্যক।

রেলপথে সুবিধা সহস্র। রেলপথপ্রসারণ মতের পোষকগণ ইহাও বলেন যে, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে শস্যাদি লইয়া যাইবার সুবিধাবশতঃ রেলপথের সাহায্যেই ভারতের দুর্ভিক্ষদমন সম্ভব হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভারত গভর্মেণ্টের ভূতপূর্ব্ব রেলপথের Consulting Engineer মিষ্টার হোরেস বেলের মত অভিজ্ঞ ব্যক্তিও এই অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, রেলপথের সহিত এ দেশের দুর্ভিক্ষের সম্বন্ধ অতি নিকট—প্রকৃতপক্ষে এ দেশে রেলপথবিস্তারের ফলেই দুর্ভিক্ষ বর্দ্ধিত হইতেছে। নিম্নে তাঁহার প্রবন্ধ আলোচিত হইল।

অনেকে বলেন, রেলপথ দুর্ভিক্ষদমনের প্রকৃষ্টতম উপায়; কথাটা কতকটা সত্য হইলেও সর্ব্বত্র নহে। দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষে রেলপথের বিস্তারসত্বেও বর্ষে বর্ষে দুর্ভিক্ষপ্রকোপে বহুলোক প্রাণ হারাইতেছে; বহু পশুর কঙ্কালসার দেহ হইতে জীবন বাহির হইয়া যাইতেছে।

কারণানুসন্ধান।

এখন দুর্ভিক্ষকালে পীড়িতের সাহায্যমাত্র না করিয়া দুর্ভিক্ষনিবারণের উপায়বিধানই শ্রেয়ঃ। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের সর্ব্বপ্রধান কারণ,—অনাবৃষ্টি। স্বল্পপরিসর স্থানে অনাবৃষ্টিসঞ্জাত দুর্ভিক্ষ সহজেই দূর করা যায়; কিন্তু যখন বিস্তৃত স্থানে উপযুক্ত বারিবর্ষণের অভাব হয়, তখনই ধ্বংসকেতন দুর্ভিক্ষের বিকট চমূ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন, জমীর উপর সংস্থাপিত করের আতিশয্যই ইহার কারণ; অর্থাৎ, খাজনা এতই অধিক যে,সুজন্মার সময়েও কৃষক সঞ্চয় করিতে পারে না। বিচার করিয়া দেখিলে ভারতের খাজনা অল্প; দেশীয় শাসনে ও বৃটিশ শাসনে প্রজার অবস্থার তুলনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। প্রবন্ধলেখকের এই কথার সহিত মূল প্রস্তাবের সম্বন্ধ নাই বলিয়া আমরা এ স্থলে প্রতিবাদ হইতে বিরত হইলাম।

তাহার পর কেহ কেহ বলেন, পূর্ত্তবিভাগের আরব্ধ কার্য্যের বিস্তারই দুর্ভিক্ষনিবারণের একমাত্র উপায়। সার আর্থার কটন এই মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে গভর্মেণ্টের মত এই যে, খাল কাটিয়া জলসেচনের ব্যবস্থা করিলেও কেবল ৪০০০০০০০ একার ভূমির উপকার হইতে পারে। তাহাতে এই বিশাল সাম্রাজ্যের কি উপকার হইবে—কতটুকু উপকার দর্শিবে?

প্রবন্ধলেখকের মতে ভারতবর্ষ হইতে আহার্য্য শস্যের অতিরিক্ত রপ্তানীই এই নিত্য দুর্ভিক্ষের কারণ। ইহার জন্য রেলপথই দায়ী; রক্ষকই ভক্ষক। রেলপথ ভারতে অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে; তাহার বিস্তার প্রার্থনীয়; কিন্তু দেশের অবস্থা—অন্যত্র হইতে শস্যসাহায্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রভৃতি বিচার করিলে বোধ হয় যে, সুজন্মার সময় রেলপথবাহিত রপ্তানীর জন্যই কৃষক শস্য সঞ্চয় করিতে পারে না। সুতরাং খাদ্য শস্যের রপ্তানীসঙ্কোচের উপায়-

বিধান আবশ্যক। ১৮৭৯—৮০ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষকমিশন এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, আর ১০০০০ মাইল রেলপথ নির্ম্মিত হইলেই ভারতে দুর্ভিক্ষদমন সহজ-

রেলপথ।

সাধ্য হইবে। সার হেনরী কনিংহাম স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ভারতে দুর্ভিক্ষনিবারণ কেবল রেলপথবিস্তারের উপর নির্ভর করিবে। সে ১০০০০ মাইল রেলপথ বিস্তার সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ দুর্দ্দশার অন্ত নাই। আসল কথা, কোনরূপ বাধাবিহীন রপ্তানী বিপজ্জনক। এখন রেলপথের কৃপায় দুর্ভিক্ষকালেও শস্য পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা অগ্নিমূল্য।

রেলপথবিস্তারের ফলে শস্যোৎপাদনের জন্য কর্ষিত ক্ষেত্রের বিস্তার সংসাধিত হইয়াছে। সহজেই মনে হয়, ইহাতে সুজন্মার সময় অজন্মার জন্য সঞ্চয়ের সুবিধা হইবে; সঙ্গে সঙ্গে রেলে দুর্ভিক্ষহীন দেশ হইতে শস্য আনিবার ও লোকের পক্ষে দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ ত্যাগ করিবার সুবিধা হইবে। কিন্তু সুয়েজ খালের সুবিধায় এখন অনেক

রপ্তানী।

শস্য বিদেশে রপ্তানী হয়। বিদেশের ক্রেতা দরিদ্র নহে—সে অধিক মূল্য দিতে সক্ষম। আবার অনেক জমিতে খাদ্যশস্য ব্যতীত তিসি পাট প্রভৃতিরও চাষ হইতেছে। এ সকল রপ্তানী হয়। অর্থনীতিবিদ বলিবেন, সে ত ভালই—কৃষকের ধনবৃদ্ধি হইতেছে, সে টাকা দিয়া খাদ্য ক্রয় করিবে। দুঃখের বিষয়, দুর্ভিক্ষকালে ভারতে শস্য অপ্রাপ্য বা দুর্ম্মূল্য। কৃষকের দারিদ্র্য আছেই। রপ্তানীতে কৃষকের লাভ অল্প—ব্যবসাদারেরই অধিক। আবার—দুর্ভিক্ষকালে আবাদ না হওয়ায় যাহারা দিন আনে দিন খায়—এমন শ্রমজীবীরা কাজ পায় না, তাই খাইতেও পায় না।

ভারতবর্ষে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে শস্য আনয়ন দূরত্বহেতু সহজসাধ্য নহে। তাহাতে ব্যয় যথেষ্ট। আবার ভারতে বৃহৎ জাহাজের উপযোগী বন্দরের সংখ্যা অতি অল্প। এক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দেশ হইতে খাদ্যশস্যসংগ্রহ দুষ্কর। গত দুর্ভিক্ষের সময় মধ্যপ্রদেশে ৪০০ বা ৫০০ মাইল দূর হইতে শস্য আনিতে হইয়াছিল। সেও বড় চড়া

আমদানীর সম্ভাবনা।

দরে। তখন খাদ্য শস্য পাঁচ টাকা মণে বিকাইয়াছিল। ভারতে সাধারণতঃ গৃহকর্ত্তার মাসিক আয় ৭॥০ টাকা। সুতরাং এ দর তাহাদের পক্ষে সামান্য নহে। এইরূপ লোকই শতকরা নব্বই জন। সুজন্মায় শস্য মণ করা ১।০ বিকায়। ভারতে সাধারণ লোকের অভাব অল্প; তাই ঐ সামান্য আয়েই সুজন্মায় চলে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সামান্য তাড়নেই তাহারা নিরন্ন হইয়া মরিতে বসে।

যাহাদের সংস্থান সামান্য, তাহাদের পক্ষে বিদেশে রপ্তানীকারের নিকট মালবিক্রয়ের প্রলোভন প্রবল। ইহাতে জমিদার, ব্যবসাদার ও রেলকোম্পানীর লাভ; কিন্তু কৃষকের গোলায় আর শস্য সঞ্চিত হয় না। গোলা শূন্য—তাই অজন্মা হইলেই অন্নাভাব হয়। লোকে পরবর্ত্তী ফসলের সময় পর্য্যন্ত আহারের উপযোগী শস্য রাখিয়া আর সকলই বিক্রয় করে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে খাদ্যশস্য আমদানী হয়—সে সকল দেশে ইহাই স্বাভাবিক। ভারতে অবস্থা স্বতন্ত্র। ভারতে দুর্ভিক্ষে শস্য আমদানী করিয়া দুর্ভিক্ষনিবারণ সহজ নহে। কাযেই ভারতে দুর্ভিক্ষকষ্টনিবারণের পক্ষে লোকের এই সঞ্চয়বিতৃষ্ণার নিবারণই একান্ত আবশ্যক। আবশ্যক সময়ে খাদ্য শস্যের রপ্তানী সঙ্কোচচেষ্টায় প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা, সন্দেহ নাই। কথাটা একটু বিশদভাবে বুঝাইতে হইবে। অবাধ বাণিজ্যে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি; বাণিজ্যের স্রোত শত বন্দরে প্রবাহিত—দূরদূরান্তর হইতেও খাদ্য শস্য আসি-

রপ্তানীর নিবারণ।

তেছে,—ইংলণ্ডবাসীরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করিতে শিখিয়াছে—তাহারা মিতব্যয়ী। তাহাদের কথা আর ভারতবাসীর কথা স্বতন্ত্র। আশঙ্কা আছে যে,

রপ্তানীর সঙ্কোচচেষ্টায় খাদ্যশস্য উৎপাদিকা ভূমিরও আয়তনসঙ্কোচ হইবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ-সম্ভাবনাকালে রপ্তানীর সঙ্কোচচেষ্টায় তাহা হইবে না; কারণ, তখন দেশেই দেশজের বিক্রয় হইবে। এ প্রথা একান্ত নূতনও নহে। ভিন্ন দেশে ভিন্ন প্রণালী অবলম্বনীয়। প্রমাণ স্বরূপ সম্প্রতিবিধিবদ্ধ পঞ্জাবের জমিসংক্রান্ত আইনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে ব্যবস্থা অমিতব্যয়ী ভারতবাসীরই জন্য। ভারতে খাদ্যশস্যসমস্যাও বিশেষত্বব্যঞ্জক; কাযেই বিশেষ বিধির আবশ্যক। দুর্ভিক্ষকমিশন ইহার বিচার করেন নাই। কিন্তু রেলপথের সাহায্যে দুর্ভিক্ষকালেও ভারতবর্ষে খাদ্য শস্য সুপ্রাপ্য হইয়াছে, ইহা প্রমাণিত না হইলেই বুঝিতে হইবে যে, রেলপথে বিপরীত ফল ফলিয়াছে ও ফলিতেছে। ভারতে সেকালেও দুর্ভিক্ষ ছিল সত্য, কিন্তু দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ ছিল—অন্য স্থান হইতে শস্য আমদানীর অসুবিধা। এখন সে অসুবিধা নাই। আর সেই অসুবিধানিবারণের সঙ্গে সঙ্গেই রপ্তানীও বর্দ্ধিত হইয়াছে। য়ুরোপের ব্যবস্থা ভারতে চলিবে না; বিদেশ হইতে খাদ্য শস্যের আমদানী সম্ভব নহে। এক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য স্থান হইতে শস্য আনয়ন চলে না। আবার ব্রহ্ম হইতে শস্যের আনয়নও ব্যয়সাধ্য, কাযেই সে শস্য অগ্নিমূল্য।

দুর্ভিক্ষকমিশনের মতে, রেলপথে যদি দুর্ভিক্ষদুঃস্থানের প্রসার হইয়া থাকে, তবে এ কথাও অবশ্যস্বীকার্য্য, দুর্ভিক্ষের তীব্রতা কমিয়াছে। কমিশনের মতে শস্য রপ্তানী বিবেচনার বিষয় বটে; কিন্তু দুর্ভিক্ষসম্ভাবনায় শস্যের দর চড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানী রহিত হয়। আর রপ্তানী কেবল দেশে উদ্বৃত্ত খাদ্য শস্যের পরিমাণের উপরই নির্ভর করে না। তাঁহারা ভারতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ, আহার জন্য আবশ্যকের পরিমাণ, এবং উদ্বৃত্তের পরিমাণের বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, দুর্ভিক্ষকালের জন্য সাধারণতঃ উদ্বৃত্ত শস্যই যথেষ্ট। যত দিন জনসংখ্যার বৃদ্ধি হেতু এই উদ্বৃত্ত নিঃশেষ না হয়, ততদিন—"মাভৈঃ।" কিন্তু গত ভীষণ দুর্ভিক্ষে এই আশ্বাসবাণী নিষ্ফল হইয়াছে; দেখা গিয়াছে, এই উদ্বৃত্ত একান্তই অদৃশ্য। সুতরাং ভরসার লেশমাত্র নাই।

সাধারণতঃ বোধ হয়, ১৮৮০ খৃঅব্দে নির্দ্দিষ্ট উদ্বৃত্তই বর্ত্তমানেও প্রাপ্তব্য। সুজন্মায় উদ্বৃত্ত বার্ষিক ৫১৬৫০০০০ টন। ইহারই কতকাংশ রপ্তানী হয়। এক বর্ষের উদ্বৃত্ত এই; কিন্তু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উৎপন্ন শস্য ১৯০০০০০০ টন কম হইয়াছিল। পরবর্ত্তী দুই বৎসরে বোধ হয় আরও কম হইয়াছিল। অথচ তখনও রপ্তানী বাড়িতেছে ভিন্ন কমিতেছে না। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৫০০০০০ টন গোধূমই রপ্তানী হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৎসরে সর্ব্ববিধ রপ্তানী শস্যের ওজন ১০৫০০০০০ টন। সুতরাং সুজন্মায় উদ্বৃত্ত প্রায় ৫০০০০০০ টন; অজন্মায় কম প্রায় ১৯০০০০০০ টন। আবার অজন্মায় রপ্তানী বাড়িয়াছে বই কমে নাই। ভরসা কোথায়?

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশনের সাক্ষ্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে সুজন্মার সঞ্চয় করার প্রথা এখন মাল স্থানান্তরিত করার সুবিধায় ও রপ্তানীর প্রাবল্যে কমিয়া গিয়াছে।

কমিশনের কথা।

আবার দেখা যায়, গত কয় বৎসরে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে পারিশ্রমিক বাড়ে নাই। কাযেই খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইলে তাহাদের আর উপায় থাকে না। প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষকালে পারিশ্রমিকের হার বর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং কমিয়া যায়—তাহার কারণ কর্ম্মের অভাব। সাধারণ লোকের অবস্থা এই। আবার পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আবশ্যক কালে চেষ্টা করিয়া কেবল ব্রহ্ম হইতে খাদ্য শস্য আনিয়া ক্ষুধাতুর ভারতবাসীর ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যাইতে পারে। সুতরাং এ কথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে, ভারতে সাধারণতঃ যে খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হয়, তাহা অজন্মায় কুলায় না। অর্থাৎ—(১) অতিরিক্ত সুজন্মা ব্যতীত ভারত হইতে খাদ্য শস্যের রপ্তানী হওয়া অকর্ত্তব্য; (২) এখন যে,

বিস্তৃত ভূমিতে রপ্তানীর জন্য শস্য উৎপন্ন করা হয়, তাহাতে দেশের লোকের খাদ্য শস্যের
উৎপাদন করা কর্ত্তব্য।

দুর্ভিক্ষদমনদক্ষ সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন যে, মাল
স্থানান্তর করিবার সুবিধায় যেমন দুর্ভিক্ষদমনের সুবিধা হইয়াছে, তেমনই দুর্ভিক্ষনিবারণের
উপায় শস্যসঞ্চয়ের প্রথাও বিলুপ্ত হইতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে
কঙ্কালসার জনগণ মরিবার দেড় মাস পূর্ব্বেও শস্য রপ্তানী হইয়াছে। মহাজনেরা ভুল করিয়া-
ছিল। বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষকালে এক দিকে গভমের্ণ্ট খাদ্যশস্যের আমদানী করিয়াছেন, আর
এক দিকে মহাজনেরা রপ্তানী করিয়াছে। অর্থনীতির বিচারে সুজন্মায় উদ্বৃত্ত শস্য
অন্যত্র দরে বিক্রীত হওয়াই ভাল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে অজন্মার সময় লোকের
কিনিবার সামর্থ্য থাকে না। ইহাই ভারতে দুর্ভিক্ষ বিষয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতা। যে স্থানে সঞ্চিত
শস্য থাকে না, সে স্থানে গভমের্ণ্টকে বিপুল ব্যয়ে শস্য দিতে হয়, বা অর্থ দিতে হয়।
এ ব্যয় ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

এই বক্তব্যে দুর্ভিক্ষকালে অন্য দেশ হইতে খাদ্য শস্য আনয়নের অসুবিধার কথা
ও রপ্তানী সঙ্কোচ করার কর্ত্তব্যের কথা নাই।

এবার নূতন কমিশনও দুর্ভিক্ষনিবারণের উপায়বিচার অপেক্ষা দুর্ভিক্ষকালে লোকের
কষ্টনিবারণের উপায়নির্দ্ধারণেই অধিক মনোযোগ দান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, দুর্ভিক্ষ
উপস্থিত হইলে সাহায্যদানপ্রথা সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সুসম্পন্ন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু দুর্ভিক্ষনিবারণের
উপায় করিলে বড়ই ভাল হয়। অবাধ রপ্তানীর বিষম টানে ভারতবর্ষের ভীষণ দুর্দ্দশা অদূর-
বর্ত্তিনী বলিয়া সন্দেহ হয়।

এ কথা নিশ্চয় যে, রেলপথবিস্তারে ভারতে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয় নাই। তবে কি ভারতের
ভাগ্যবিধাতৃবর্গ দারুণ দুর্ভিক্ষের পুনরাগমনকাল পর্য্যন্ত কেবল দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানপ্রণালী
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবারই প্রয়াস পাইবেন? তাঁহারা কি দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করিয়া
তাহার নিবারণচেষ্টা করিবেন না? এখন সভ্যজগতে ব্যাধির কারণ দূর করিয়া মৃত্যুর হার
কমাইবার জন্য স্বাস্থ্যোন্নতিচেষ্টায় বহু অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। ভারতে লক্ষ লক্ষ মানবজীবন-
নাশক এই ভীষণ রাক্ষসের বধের কি কোন চেষ্টাই হইবে না? লেখকের মতে দুর্ভিক্ষের
আশঙ্কা দেখিলে খাদ্য শস্যের রপ্তানীসঙ্কোচই এই দুর্ভিক্ষনিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়।

লেখকের মতে রপ্তানীর উপর সর্ব্বকালের জন্য—অন্ততঃ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কার সময় কর-
স্থাপন বিধেয়। ইহাতে প্রথমে কিছু অসুবিধা ঘটিবে, কিন্তু ফলের তুলনায় সে অসুবিধা
অকিঞ্চিৎকর।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে মিষ্টার বেল যে গুরুতর বিষয়ের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা
করিতেছেন, সে জন্য তিনি ভারতবাসীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন—সন্দেহ নাই। এই বিপদ-
তূর্য্য পূর্ব্বেও ধ্বনিত হইয়াছে, কিন্তু গভমের্ণ্ট এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট। প্রবন্ধকার মহাশয়কে
ধন্যবাদ দিয়া আমরা সসম্ভ্রমে এক স্থলে মতান্তর প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি। আমরা
দুর্ভিক্ষসম্ভাবনায় খাদ্যশস্যের রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য করস্থাপনের সমর্থন করি, কিন্তু অন্য সময়
তাহার সমর্থন করি না। কারণ, তাহাতে যে উদ্দেশ্যে প্রবন্ধকার সে করস্থাপনের ব্যবস্থা করিতে
বলেন, সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। যদি সকল সময়েই খাদ্যশস্যে রপ্তানীকর দিতে হয়,
তবে তাহার মূল্য কমিবে,—এবং ভারতে কৃষক আর তাহার উৎপাদনে তেমন উৎসাহী
হইবেনা। কাজেই তাহাতে যে ভূমিতে এখন খাদ্য শস্য উৎপন্ন হইতেছে, সেই জমিতে
তৈলবীজ, পাট ইত্যাদির চাষ হইবে। ফলে ঐ সকল দ্রব্যের উৎপত্তি না কমিয়া বরং
বাড়িয়া যাইবে। লাভ না থাকিলে কৃষক আর খাদ্য শস্যের চাষ করিবে কেন? এই জন্য
আমরা কেবল দুর্ভিক্ষসম্ভাবনায় খাদ্যশস্যের উপর রপ্তানীকরসংস্থাপনের প্রস্তাব করি।

হুমায়ুন ও শেরশাহ।

২

এই ভাবে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে শেরের যশঃপ্রভা বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। জোনপুর হইতে প্রত্যাগত আত্মীয় স্বজনের মুখে পুত্রের অনন্য-সাধারণ গুণরাশির বিষয় অবগত হইয়া হোসেন তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠেন। তিন বৎসর অতিবাহিত হইবার পর পিতা পুত্রে পুনর্ম্মিলন হইয়াছিল।

শের খাঁ গৃহে প্রত্যাগত হইলে হোসেন তাঁহার হস্তে জায়গীরের শাসন-ভার অর্পণ করেন। তিনি শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া বলেন, "ন্যায়বিচারই রাজ্যরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়; নির্দ্দোষ দুর্ব্বলের পীড়ন ও অত্যাচারী সবলের সমর্থন করিয়া আমি কখনও ন্যায়পথভ্রষ্ট হইব না।" এখানেই তাঁহার অসাধারণ শাসনশক্তি ও কার্য্যতৎপরতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তিনি পৈতৃক জায়গীরের শাসনসংরক্ষণের অভিনব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার এই কঙ্কালসদৃশ বন্দোবস্তের আদর্শেই আকবরের তাদৃশ সুফলপ্রদ রাজস্বনীতি গঠিত হইয়াছিল। শেরখাঁ তহশীলদার, পাটওয়ার (accountant) ও সীকদারবর্গকে আহ্বান করিয়া ভূমির যথার্থ পরিমাপ দ্বারা রাজস্বনির্দ্ধারণ পূর্ব্বক প্রজার অভিপ্রায়মত নগদ অর্থ অথবা শস্য গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আমি রাজস্বনির্দ্ধারণ করিবার সময় প্রজার হিতপক্ষে যত্নশীল হইব, কিন্তু তাহার পর কঠোর হস্তে রাজস্ব সংগ্রহ করিব। তোমরা রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিলে আমি তোমাদের নালিশ গ্রহণ করিব। কেহ তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না। কৃষককুলের সন্তোষবিধান করিতে পারিলেই কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া দেশ উন্নতির পথে ধাবিত হইয়া থাকে।" বস্তুতঃ শের কার্য্য-ভার গ্রহণ পূর্ব্বক ন্যায়ানুগত হইয়াই শাসনসংরক্ষণ কার্য্যে নিরত ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে অত্যাচারী জমিদারবর্গের বিষদন্ত ভগ্ন হইয়াছিল; দুর্ব্বল কৃষকশ্রেণী নিরুপদ্রবে বাস করিত। তরুণবয়স্ক শের অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রমে কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষসাধন এবং নিয়মিতরূপে রাজস্বসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রত্যেক বিষয়েই কার্য্যপটুতা ও প্রতিভার

পরিচয় প্রদান করেন; তাঁহার যশঃপ্রভা অচিরে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু শেরের সৌভাগ্যোদয়ে হোসেনের প্রিয়তমা উপপত্নীর হৃদয়ে ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হয়। তদীয় গর্ভজাত পুত্রগণের হস্তে শাসনভার প্রদান করিবার জন্য হোসেন খাঁ নানারূপে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত হন। অবশেষে তিনি তদীয় বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া শেরখাঁকে শাসনকার্য্য হইতে অপসৃত করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি পিতৃসঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া বিনা আপত্তিতে শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া আগ্রাতে গমন করেন।

শের খাঁ আগ্রাতে গমন করিবার কিয়দ্দিবস পরেই পিতার মৃত্যুসংবাদ বিদিত হন, এবং তদানীন্তন সম্রাটের নিকট হইতে পৈতৃক সম্পত্তির ফারমাণ গ্রহণ করিয়া শেশারামে প্রত্যাগমন করেন। এখানে উপনীত হইলে হোসেনের প্রিয়তমা উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণের সঙ্গে তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হয়।

ভ্রাতৃবিরোধ মীমাংসিত হইবার পূর্ব্বেই সমগ্র হিন্দুস্থান রাজবিপ্লবে আলোড়িত হইয়াছিল। মোগলকুলতিলক বাবর সসৈন্যে ভারতবর্ষে উপনীত হন। পাণিপথের বিশাল ক্ষেত্রে মোগল আফগানের তুমুল সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। সুলতান ইব্রাহিম লোদী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণপরিত্যাগ করেন, এবং দিল্লীর দুর্গে মোগলের রাজপতাকা উড্ডীন হয়। এই রাজবিপ্লবের সুযোগে শের একবার ভাগ্যপরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি আপন ভাগ্যপরীক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত ক্ষেত্রের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া বিহারাধিপতির অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময় সুলতান মামুদ স্বাধীনভাবে বিহারের শাসনকার্য্যে নিরত ছিলেন। শের অসাধারণ কার্য্যপটুতা ও প্রতিভার বলে ক্রমশঃ তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন; এমন কি, তিনি রাজকুমার জালালকে শিক্ষাপ্রদান করিবার জন্য নিযুক্ত হন। কিন্তু সুলতানের শুভদৃষ্টি দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। তিনি কোন কারণে শেরের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন।

বিপদ কখনও একাকী আইসে না। এই সময় শেরের গৃহকলহও প্রবলাকার ধারণ করে। তাঁহার জ্ঞাতিশত্রু মহম্মদ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহাকে পৈতৃক জায়গীর হইতে দূরীভূত করিবার জন্য যত্নশীল হন। কিন্তু শের বাহুবলে গৃহকলহ প্রশমিত করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন। গৃহকলহ প্রশমিত হইলে তিনি আত্মো-

প্রতিসাধনের জন্ম আগ্রায় গমন করেন, এবং অচিরে বাদশাহ বাবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন।

ইহার কিয়দ্দিবস পরে পাদশাহ চিন্দির বিরুদ্ধে অভিযান করিলে শেরও তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করেন। এই সুযোগে তিনি সাম্রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণসম্বন্ধীয় যাবতীয় রহস্য অবগত হন, এবং রাজ্যলালসা তাঁহার হৃদয় অধিকার করে। এক দিন তিনি তদীয় জনৈক অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট মনোভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলেন, "মোগলদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সহজসাধ্য। পাদশাহ নিজে এক জন রাজনীতিবিশারদ বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা; কিন্তু তিনি নবাগত বলিয়া ভারতবর্ষের শাসননীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। প্রধান মন্ত্রীই প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন; তিনি নিজের স্বার্থসংসাধনার্থ রাজ্যের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। অতএব আমরা গৃহকলহ বিস্মৃত হইয়া ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিলেই রাজলক্ষ্মী মোগলকে পরিত্যাগ করিয়া আফগানেরঅঙ্কশায়িনী হইবেন। এ কার্য্য এক্ষণে যতই স্বপ্নবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলে আমি সফলকাম হইতে পারিব।" কোন ঘটনাসূত্রে বাবর তাঁহার মনোভিলাষ অবগত হওয়াতে তিনি পলায়ন করিয়া পৈতৃক জায়গীরে উপনীত হন। (১)

শের খাঁ মোগল-শিবির পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বিহারে উপনীত হইলে সুলতান মামুদ তাঁহাকে আবার সাদরে গ্রহণ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হন, এবং তদীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র জানাল খাঁ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজমাতা সুলতানা দাদু

(১) যে সূত্রে শের খাঁ জানিতে পারেন যে, বাবর তাঁহার মনোভিলাষ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাহা কৌতুকাবহ। একদা বাদশাহের সঙ্গে একত্র আহারকালে শেরখাঁকে মাংস প্রভৃতি কঠিন ভোজ্য দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নিকট কেবল চামচ ছিল। এ জন্য তিনি ভৃত্যদিগকে ছুরি দিতে আদেশ করিলে তাহারা বাবরের ইঙ্গিতে ছুরি দিলনা। শেরখাঁ ইহাতে অপ্রতিভ না হইয়া নিজের ছোরা কোষোন্মুক্ত করিয়া মাংস কর্ত্তন করিয়াছিলেন। পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহার এই বিসদৃশ ব্যবহারে বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তাঁহার আহার শেষ হইলে বাবর বলিয়াছিলেন,—"এই যুবক কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না, এবং কালে এক জন বড় লোক হইবে।"

প্রতিনিধি-পদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া শেরকে অধিকাংশ কার্য্যভার সমর্পণ করেন। সুলতানা দাদু ইহার অত্যল্প কাল পরেই প্রাণপরিত্যাগ করেন, এবং শের খাঁ বিহার রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন।

এই সময় সুলতান মহম্মদ বঙ্গ সিংহাসনের অধিপতি ছিলেন। বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হাজিপুরের শাসনকর্ত্তা মকতুম আলম বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিয়া শের খাঁর সঙ্গে সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। এ জন্য সুলতান মহম্মদ বিহার জয় ও মকতুম আলমকে বিনাশ করিতে সেনাপতি কুতুবকে নিযুক্ত করেন। বঙ্গসৈন্যের সঙ্গে তুলনায় শের খাঁর সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল বলিয়া তিনি সন্ধিসংস্থাপন করিবার জন্য যত্নশীল হন; কিন্তু তাহাতে সফলকাম হইতে পারিলেন না। শের সন্ধিসংস্থাপন করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া আপন নগণ্য সৈন্যের সাহায্যেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে মনন করেন। সমরক্ষেত্রে তাঁহার অপূর্ব্ব রণকৌশল ও বীরত্ব পুরস্কৃত হয়; তিনি জয়মাল্যে বিভূষিত হন; এবং সেনাপতি কুতুব শত্রুহস্তে প্রাণপরিত্যাগ করেন। লোহানী-বংশজাত কতিপয় সেনানায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে শেরের সহগামী ছিলেন। কিন্তু তিনি লুণ্ঠিত ধনরাশির অংশ তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া নিজেই সমস্ত গ্রহণপূর্ব্বক ধনশালী হইয়া উঠেন।

বিহারাধিপতি জালাল খাঁর লোহানী আত্মীয়স্বজনগণ শের খাঁর সৌভাগ্য-সন্দর্শনে পূর্ব্ব হইতেই ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন; এ জন্য লুণ্ঠিত ধনরাশির অংশলাভ করিতে না পারিয়া ঈর্ষ্যাবিষে আকণ্ঠ পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার অনিষ্ট-সাধনের জন্য যত্নশীল হন। প্রথমতঃ তাঁহারা শের খাঁর প্রাণসংহার করিবার অভিপ্রায়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ঘটনাক্রমে তাঁহাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহাতে শের খাঁ বুঝিতে পারেন যে, আপন ক্ষমতা অপ্রতিহত না রাখিলে অন্য কোন উপায়ে নিরাপদ হইতে পারিবেন না। এ জন্য তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আপন ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া বিপক্ষকে সঙ্কুচিত করিয়া তুলেন। জালাল খাঁ পূর্ব্ব হইতেই গোপনে শের খাঁর বিপক্ষ দলের সঙ্গে সম্মিলিত ছিলেন। সুতরাং তিনি শেরের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে বঙ্গ দেশে গমনপূর্ব্বক সুলতান মহম্মদের শরণাপন্ন হন। শের অনায়াসে বিহার রাজ্য গ্রাস করেন।

জালাল খাঁর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুলতান মহম্মদ শেরকে বিনাশ

করিবার জন্য বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। শের খাঁ দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হন। শত্রুসৈন্য দুর্গাবরোধ করিলে শের খাঁ সাহস ও কৌশলের একশেষ প্রদর্শন করেন। তাঁহার কৌশলে ও বীরত্বে বঙ্গসৈন্য পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ইহার পর তিনি চুণার দুর্গ স্বাধিকারভুক্ত করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠেন, এবং সমগ্র বিহারে তাঁহার একচ্ছত্র আধিপত্য সংস্থাপিত হয়।

এই সময় জৌনপুরাধিপতি সুলতান মামুদ বাবরের পুত্র হুমায়ুন বাদশাহের হস্তে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া নানা স্থানে পরিভ্রমণ পুর্ব্বক বিপুল সৈন্য সহ বিহারে উপনীত হন। শের খাঁর জৌনপুরী সৈন্যপ্রবাহের গতি রুদ্ধ করিবার সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে সসৈন্যে মিলিত হন। সুলতান মামুদ শের খাঁর ব্যবহারে প্রীতিলাভ করিয়া জৌনপুর পুনর্ব্বার অধিকৃত হইবার পর বিহার প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে ফারমান প্রদান করেন। সুলতান সসৈন্যে জৌনপুরে উপনীত হইলে মোগল সৈন্য তথা হইতে পলায়ন করে। মামুদ জৌনপুরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মোগলাধিকৃত লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র দেশ বিধ্বস্ত ও স্বাধিকারভুক্ত করেন। হুমায়ুন এই সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। শের খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় মামুদ পরাভূত হন; তাঁহার সমস্ত শক্তি পর্য্যুদস্ত হইয়া যায়, পুনরুত্থানের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া পড়ে।

অতঃপর শের শাহ পুনর্ব্বার বিহারে আধিপত্যসংস্থাপন করেন। হুমায়ুন চুণার দুর্গ অধিকার করিবার কল্পনায় বিহার প্রদেশে উপনীত হন। শের খাঁ তাঁহার অধীনে দুর্গশাসন করিতে স্বীকৃত হওয়াতে এবং গুজরাট যুদ্ধের জন্যই সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করা আবশ্যক হইয়া পড়াতে, বাদশাহ চুণার পরিত্যাগ করেন। (১)

এই অবসরে শের খাঁ শক্তিসঞ্চয়ে নিবিষ্টচিত্ত হন। মোগলের শাসনে যে সকল আফগান যোদ্ধা ফকিরী গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা শেরের আহ্বানে নবোৎসাহে পুনর্ব্বার অসিধারণ করে। কোন আফগান সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইতে অস্বীকৃত হইলে তিনি তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করিবেন বলিয়া ঘোষণা প্রচার করেন। আফগান যোদ্ধা যাহাতে অনর্থক নিহত না হয়, তৎপক্ষে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। এইরূপ

(১) গুজরাট যুদ্ধের বিবরণ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি সম্মিলিত আফগান শক্তি সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি আফগান সেনার সাহায্যার্থ মুক্তহস্ত ছিলেন। এই সংবাদ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে দলে দলে আফগান সৈন্য চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার পতাকামূলে সমবেত হয়। সম্মিলিত আফগান শক্তির গঠন করিয়া তিনি বঙ্গদেশ স্বাধিকারভুক্ত করিবার মনন করেন।

এদিকে হুমায়ূন বাদশাহ গুজরাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শেরকে প্রতাপশালী ও সাম্রাজ্যলোলুপ দেখিয়া তাঁহাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে শের খাঁর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। শের খাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া সাতিশয় বিজ্ঞতাসহকারে হুমায়ূনকে পরাস্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। শের খাঁ দেখিলেন যে, বঙ্গবিজয় সম্পন্ন করিতে পারিলে তাঁহার সামরিক বল শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তখন সহজেই তিনি মোগলকে বিধ্বস্ত করিতে পারিবেন। এ জন্য তিনি প্রথমতঃ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া শক্তিসঞ্চয় করাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। বঙ্গবিজয়ে ব্যাপৃত থাকা কালে মোগল সৈন্যকে বিহারের প্রান্তভাগে আটক রাখিবার জন্য শের খাঁ চুণার দুর্গে পরাক্রমশালী সৈন্য সন্নিবিষ্ট করিলেন।

অতঃপর শেরশাহ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। আফগান সৈন্য বঙ্গদেশে উপনীত হইলে মহম্মদ শাহ রাজ্যরক্ষার জন্য প্রবলপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই পরাক্রান্ত শত্রুর গতিরোধ করিতে পারিলেন না; তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে শের খাঁ গৌড় নগরের অবরোধ করিলেন। কিন্তু গৌড় নগর অধিকৃত হইবার পূর্ব্বেই বিহারের জনৈক জমিদার বিদ্রোহ অবলম্বন করাতে তিনি স্বীয় পুত্র জালাল খাঁকে বঙ্গদেশে রাখিয়া বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহম্মদ শাহ জালাল খাঁর হস্তে বারংবার পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর শের খাঁ বিহারে শৃঙ্খলাস্থাপন করিয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইলেন, এবং অতি সহজে রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন।

শের খাঁ বঙ্গদেশ অধিকার ও বিহারের বিদ্রোহদমনে ব্যাপৃত ছিলেন। এই অবসরে হুমায়ূন বাদশাহ বিহারের প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া চুণার দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গরক্ষক রুমি বিপুলবিক্রমে দুর্গরক্ষা করিয়াছিলেন। অর্দ্ধবৎসরব্যাপী অবরোধের পর রুমি খাঁ শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করেন।

হুমায়ূন চূণার দুর্গ হস্তগত করিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বঙ্গাধিপতি মহম্মদ শাহ শের খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পাটনার নিকটবর্ত্তী স্থানে হুমায়ূন বাদশাহের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তিনি বাদশাহের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া স্বীয় দুর্দ্দশার কাহিনী বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন। বাদশাহ তাঁহার করুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া একান্ত ব্যথিত হইলেন ও ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শের খাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া জালাল খাঁকে বাদশাহের গতিরোধের জন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার গতিরোধ করিতে না পারিয়া সসৈন্যে পলায়ন করিলেন। হুমায়ূন শনৈঃ-শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহম্মদশাহও মোগল সেনার সহযাত্রী ছিলেন। মোগল সেনা কাহালগাঁও নামক স্থানে উপনীত হইলে, তিনি শত্রুহস্তে স্বীয় পুত্রদ্বয়ের নিহত হইবার সংবাদ অবগত হইলেন। গৌড়দুর্গের অবরোধ কালে জালাল খাঁ এই পুত্রদ্বয়কে বন্দী করিয়াছিলেন। মহম্মদ শাহ পুত্রশোকে ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিলেন।

শের স্বীয় সৈন্যের পরাজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিগণ কর্ত্তৃক সঞ্চিত ধনরাশি সহ গৌড়নগর পরিত্যাগ করিয়া পৈতৃক জায়গীর শেশারামে প্রস্থান করিলেন। হুমায়ূন বাদশাহ অনায়াসে গৌড়নগর অধিকার করিয়া স্বনামে খোতক ও শিক্কা প্রচলিত করিলেন।

হুমায়ূন বাদশাহ বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়া বিলাসে রত হইলেন। কিন্তু অপর পক্ষে শের খাঁ পিতৃজায়গীরে উপনীত হইয়া হুমায়ূনকে বিনাশ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ রোটাস দুর্গ হস্তগত করিয়া পরিবারবর্গের নিরাপদ অবস্থানের উপায়বিধান করিবার মনন করিলেন। এই সময় রাজা বীরকেশ স্বাধীনভাবে রোটাস দুর্গে আধিপত্য করিতেছিলেন। শের খাঁ বীরকেশের সঙ্গে সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। শের খাঁ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি পুনর্ব্বার বঙ্গদেশ অধিকার করিবার জন্য গমন করিতেছি। আমার পরিবারবর্গ ধনরাশি সহ আপনার দুর্ভেদ্য দুর্গে স্থানপ্রাপ্ত হইলে আমি নিশ্চিন্তচিত্তে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রবৃত্ত হইতে পারি।" রাজা বীরকেশ বন্ধুর অগাধ ধনরাশি হস্তগত করিবার অভিপ্রায়েই হউক, অথবা তাঁহার উপকারসাধন করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। শের খাঁ পরিবারস্থ মহিলাদিগকে ডুলির দ্বারা ও ধনরাশি ভারসংযোগে দুর্গে লইয়া যাইবার ব্যপদেশে তথায়

সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণের সমাবেশ করিয়া অকস্মাৎ দুর্গ আক্রমণ করিলেন।(১) দুর্গবাসিগণ এই আকস্মিক আক্রমণে বিভ্রান্ত হইয়া যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। অতি সহজে পৃথিবীর একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ শের খাঁর হস্তগত হইল। দুর্গমধ্যে বহুকালসঞ্চিত ধনরাশি প্রোথিত ছিল; শের খাঁ তৎসমুদয় লাভ করিলেন। এই প্রতারণামূলক কৌশল শের খাঁর নিজের উদ্ভাবিত নহে; ইহার পূর্ব্বেও খান্দেশের শাসনকর্ত্তা আসের দুর্গ এই ভাবে হস্তগত করিয়াছিলেন। রোটাস দুর্গবিজয় সম্পন্ন করিয়া শের খাঁ পরিবারবর্গের জন্য নিরাপদ স্থানের সংস্থান করিতে সমর্থ হইলেন। এই ঘটনায় তাঁহার বন্ধুগণও প্রোৎসাহিত হইয়া একে একে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিলেন। এই ভাবে তিনি পুনর্ব্বার সামরিকবলের সঞ্চয় করিয়া হুমায়ুনকে আক্রমণ করিবার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

হাজারা।

হাবড়া হইতে রেলপথে "পাঞ্জাসাহেব" (হোসেনআবদাল) ১৪৭৩ মাইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও নর্থওয়েষ্ট রেলপথ হইয়া যাইতে হয়। হোসেনআবদাল রাওলপিণ্ডী ও আটকের মধ্যগত। তথা হইতে উত্তর প্রান্তের যে ভূভাগ উত্তরে হিমালয়ের পাদপ্রান্তে বিস্তৃত, পূর্ব্বভাগে রাওলপিণ্ডী ও শেয়ালকোট জেলা, পশ্চিমে পুরুলের মহাবল ও আম্বরাজ্য, উত্তরে পাঙ্গী ও ইয়ারকন্দ ও কাশ্মীর রাজ্য, দক্ষিণে কোহাট ও সীমাপ্রদেশ—যাহা নূতন রাজ্যে পরিণত করিবার জন্য গবর্মেণ্ট সংকল্প করিতেছেন, এই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের নাম "হাজারা"। বর্ত্তমান জনসংখ্যা ৭১০,৬৬৪, (১৯০১ সালের জনসংখ্যা)—

(১) তারিখ-ই-শেরশাহীর রচয়িতা এই বিশ্বাসঘাতকতার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ডুলির বিবরণ অমূলক বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তারিখ-ই খানজাহান, আকবরনামা ও ফিরিস্তাতে ডুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তারিখ-ই-শেরশাহী গ্রন্থে হুমায়ুন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে শের খাঁ রোটাস দুর্গ অধিকার করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আমরা আকবরনামা ও ফেরিস্তার অনুসরণ করিলাম।

হাজারা পাঁচটি তহশীলে বিভক্ত,—আটক, হরিপুর, আবটাবাদ, মানসেরা ও গড়ীহাবিবুল্লা। জেলাস্থান আবটাবাদ, তথায় ডেপুটি কমিশনর ও পুলিশ বিভাগের হেড কোয়াটার অবস্থিত। সীমাপ্রদেশে শান্তিরক্ষার জন্য কয়েক পল্টন দেশীয় সেনা স্থায়িভাবে অবস্থিতি করিতেছে; তদ্ব্যতীত জঙ্গলবিভাগ, পূর্ত্তবিভাগ ও প্রান্তসীমার সামরিক হেড কোয়াটার (Deputy quarter master General Punjab Froniter forces) বর্ত্তমান। আবটাবাদে এই সকল কর্ম্মচারীদিগের আফিস আদালত থাকায় স্থানটি সর্ব্বক্ষণ গুলজার থাকে। তাহার পর কাশ্মীরভ্রমণকারীরা প্রায় এই পথ দিয়া গমনাগমন করেন বলিয়া, স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর পান্থনিবাস আছে। খাস আবটাবাদে অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত সামান্য হইলেও, গবর্মেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের আবাস ও বিস্তর দোকান পসারীর সমাবেশে, স্থানটি নগরের ন্যায় জনপূর্ণ। এখানে জেলাস্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যালিটি আছে; তাহার সভ্যগণের অধিকাংশ নিরক্ষর দোকানদার। জেলার রাজকর্ম্মচারিগণ তাহার প্রাণস্বরূপ হইয়া সকল কার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পাদন করিতেছেন। সমস্ত সীমাপ্রদেশ বন্দোবস্তের বহির্ভূত (non-regulated provinces) বলিয়া এ প্রদেশের রাজকার্য্য অতি অপূর্ব্বভাবে সম্পন্ন হয়। তাহার বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

এ প্রদেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বাস অধিক। হিন্দুরা সকলেই প্রায় দোকানদার। মুসলমানেরা ক্ষেত্রকর্ষণ ও পশুপালন করিয়া জীবনযাপন করে। ইহাদিগের মধ্যে শিক্ষার নিতান্ত অভাব দেখিয়া আমাদের ন্যায়পর গবর্মেণ্ট অনেকগুলি গ্রাম্যবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন; তাহাতে পারশী, উর্দ্দু ও সামান্য ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তাহার পর গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইলে,জেলাস্কুলে আসিয়া মিডিল্ (মধ্যছাত্রবৃত্তি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে শিক্ষা একপ্রকার সমাপ্ত হয়। ইহাতেই যে শিক্ষালাভ হয়, তাহাই অবলম্বন করিয়া বালকগণ কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করে। ইহাদিগের মধ্যে আমার পরিচিত কয়েকটি বালক ক্রমে কলেক্টরীর, কমিশনরের ও প্রধান হাসপাতাল আফিসের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে উন্নীত হইয়াছে। কয়েক জন রূড়কী ইঞ্জীনীয়ারিং কালেজে শিক্ষালাভ করিয়া ওভরশীয়ার ও সবওভরশীয়র হইয়াছে। আর একটি বালক আজকাল তহশীলদারী (ডেপুটি কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য) করিয়া প্রশংসালাভ করিয়া এখন

একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের কার্য্যে মনোনীত হইয়াছে। আর কয়েকটি বালক সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিয়া এক্ষণে চীন দেশের সমরে বিরাজ করিতেছে। ইহাতেই অনুমিত হইবে যে, প্রকৃত শিক্ষা পাইলে হাজারা-বাসিগণ শীঘ্রই সকল সমাজে বরণীয় হইয়া দাঁড়াইবে।

হাজারায় তিনটি ঋতু প্রধান—হেমন্ত, বসন্ত ও বর্ষা। সেপ্টেম্বর হইতে মার্চ পর্য্যন্ত এই সাত মাস হেমন্ত; এপ্রেল, মে, বসন্ত; এবং জুনের কয়েক দিন (প্রায় ১৩ তারিখ পর্য্যন্ত) একটু গ্রীষ্মের আভাস দিলে বর্ষা আরম্ভ হয়; তাহার প্রকোপ অগষ্ট পর্য্যন্ত থাকে; সমস্ত হাজারা প্রদেশের খালবিল নদী পূর্ণ হইয়া উঠে। তখন দূরদূরান্তরে গমনাগমন দুষ্কর হইয়া পড়ে। আটকের সিন্ধু ঘোরগর্জ্জনে প্রবাহিত হয়। পুরাকালে এই সময়ে আটক পার হওয়া অসাধ্য ছিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহ সেই সময়ে অশ্বারোহণে সসৈন্যে এই আটক পার হইয়া ইতিহাসে অমানুষিক অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, এই সেই ভয়াবহ সিন্ধু রোয়র সেতুর পদতলে পড়িয়া ভীমগর্জ্জন করিতে করিতে সাগরে মিলিয়া শান্তিলাভ করিতেছে। বাষ্পরথ নির্ভয়ে তাহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া সীমান্তে প্রবেশ করিতেছে। হেমন্তের প্রখর প্রকোপ নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত থাকে। তখন হাজারা তুষারে আচ্ছন্ন হয়। সে শোভা অতীব রমণীয়! হাজারা সমতল ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৫০০০ ফুট উচ্চ। ইহার চতুর্দ্দিক পর্ব্বতমালায় সমাকীর্ণ। পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম সীমায় গগন-ভেদী উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত সকল অক্টোবর হইতে তুষারপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া হাজারা প্রদেশকে আলিঙ্গন করিতে আইসে। সে সূচনা অপূর্ব্ব,—প্রথমে শিখরাগ্রে শুভ্রবর্ণ মেঘ ঘনীভূত হইতে থাকে; তাহার পর ক্রমে স্ফীত হইয়া আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; তাহার পর বায়ু গতিশূন্য হইলে একটা ভয়ানক গুমট হয়; এই গুমটের পরেই মেঘরাশি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া তুষার-রূপ ধারণপূর্ব্বক উৎক্ষিপ্ত তুলারাশির ন্যায় অনবরত বর্ষিত হইতে থাকে। দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ সকল শ্বেতবর্ণে সজ্জিত হয়। ঘর, ঘাট, পথ, মাঠ শুভ্রা-কারে পরিণত হয়। নদী সকল মজিয়া যায়। তখন শীতের প্রকোপ অত্যন্ত কমিয়া যায়। তাহার পর পথ ঘাট জমিয়া প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া উঠে। তুষার-বর্ষণের প্রশমন হইলে আকাশ নির্ম্মল হয়। তখন মার্ত্তণ্ড প্রখরকিরণ বিকীরণ করিয়া যেন তুষারধবলিত জনপদকে ভৎর্সনা করিতে থাকে; তাহাতেই জনপদ জাগিয়া উঠে। কিন্তু জাগিলে কি হইবে, প্রবল রৌদ্রতাপে

তখন বরফ গলিতে আরম্ভ হয়, সুতরাং বর্ষার বৃষ্টির ন্যায় ধারাসারে সেই বরফগলা জল বৃক্ষশাখা হইতে ও গৃহের ছাদ হইতে টস্ টস্ করিয়া পড়িতে আরম্ভ হয়,—পথ, ঘাট দ্রবতুষারে বজ্ বজ্ করিতে থাকে। অনেকক্ষণ এই অবস্থায় কেহই ঘরের বাহির হইতে পারে না। তাহার পর শীত শতধা বিভক্ত হইয়া জীব জন্তুকে আক্রমণ করে। তখন গৃহস্থ চিমনী জ্বালিয়া শীতনিবারণের উপায় উদ্ভাবন করে। এই জন্য পূর্ব্ব হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। জঙ্গলবিভাগের কর্ম্মচারীরা প্রচুর জ্বালানী কাষ্ঠ ও কয়লার গুদাম খুলিয়া বিক্রয় করিতে থাকেন; তাহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়। পর্ব্বতে বর্ষার জল দাঁড়াইতে পারে না বলিয়া সে জল কৃষিকার্য্যের তত উপকারে আসে না। কিন্তু এই সাত মাস বরফের জলে ভূমি সিক্ত থাকে বলিয়া কৃষিকার্য্যের বড়ই সুবিধা হয়। কৃষকেরা অল্লায়াসে একবার হলচালন করিয়া বীজ ছড়াইয়া দেয়, তাহাতেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ দেশের প্রধান শস্য যব, মকাই, (জনার) বাজরা। ধান্য ও গোধূম অল্পই জন্মিয়া থাকে। কিন্তু প্রচুর আলু উৎপন্ন হয়। জঙ্গল আবাদ করিয়া আজকাল ইউরোপীয় সওদাগরেরা স্থানে স্থানে চা-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন। এ দেশে কাবুলের মেওয়া যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে,—তন্মধ্যে, বটঙ্গা, বেদানা, (কিস্‌মিস্) ও আলুবোথরা উত্তম; সর্দা যথেষ্ট জন্মে বলিয়া কাঁচায় তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। পার্ব্বতীয় নানাজাতীয় বৃক্ষের মধ্যে দেওদার বিশেষ প্রয়োজনীয়; তাহার কড়ী, বরগা, দ্বার জানালার জন্য তক্তা বহু মূল্যে বিক্রীত হয়। বর্ত্তমান কালে রেলবিভাগ শ্লীপারের জন্য দেওদার প্রায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। চিল বৃক্ষও এ প্রদেশে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়; তাহার কাঠ বড়ই পক্কা, এবং অগ্নিসংস্পর্শে অচিরাৎ জ্বলিয়া উঠে; পাহাড়ীরা ইহারই শাখা জ্বালাইয়া মশালের কার্য্য সম্পন্ন করে; ইহার আটাই গন্ধবিরজা, ফল চিলগোজা, পাতাগুলি ঝাঁটার শলাকার মত সরু বলিয়া, ভোরভূজীরা (যাহারা ভাজা ভাজে) তাহা সংগ্রহ করিয়া ভাঁটী জ্বালায়। সুতরাং এমন পরোপকারী বৃক্ষ এ দেশে দ্বিতীয় নাই। বুরাস নামক একপ্রকার বৃক্ষে স্থলপদ্মের মত বৃহৎ বৃহৎ ফুল হয়। এক একটি বৃক্ষে সহস্রাধিক ফুল যখন ফুটিয়া উঠে, তখনকার শোভা অপূর্ব্ব। যে সকল বৃক্ষ জলের ধারে, তাহার রক্তিমাভ ফুলের প্রতিবিম্ব জলের উপর পড়িয়া যে অনুপম শোভার সৃষ্টি করে, তাহা দেখিলে বিমোহিতপ্রায় হইতে হয়। এইরূপ শত শত সহস্র সহস্র ফুলে যে বন আলোকিত, তাহার সৌন্দর্য্য চিত্রা

ঙ্কিত করিতে কবিকল্পনাও পরাভূত হয়! এই ফরাশ বৃক্ষের কাষ্ঠ কি পত্র ভাল জ্বলে না, জ্বালাইলে শোলপোড়া হইয়া কেবল ধূম নির্গত হইতে থাকে, কিন্তু এই কাষ্ঠের উপর উৎকৃষ্টরূপে ছবি খোদাই (woodcut) হইতে পারে। আর্টস্কুলে ও ছাঁচের কার্য্যের জন্য বিদেশ হইতে 'বক্স উড্' আসে। কিন্তু যদি এই কাষ্ঠ একবার ব্যবহার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আর কাহারও ভবিষ্যতে পরদেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না।

বসন্তের সমাগমে এপ্রেল ও মে, এই দুই মাস কাল নানাজাতীয় বৃক্ষ পুষ্পিত হইতে থাকে। তাহার সৌন্দর্য্য ও সৌরভে বনভূমি আমোদিত হয়। প্রকৃতিদেবী সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করেন। মধুমক্ষিকাগণ গুণ গুণ রবে গান করিতে আরম্ভ করে। পুষ্প সকল যেন সেই রবেই উৎফুল্ল হইয়া বিকশিত হয়। তখন মন্ত্রণাকারী মক্ষিকাগণ দল বাঁধিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু সে আক্রমণে তাহারা ভীত বা চমকিত হয় না, প্রত্যুত আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া তাহাদের হৃদয়ধন "মধু" বিতরণ করে। পরের ঘরে অপরিমিত মধু পাইয়া প্রাণপণে মধু আহরণ করিতে থাকে, তাহার পর চলিয়া যায়। তখন ফুলগুলি কিয়ৎক্ষণ আড়ষ্ট থাকিয়া যেন বিরহে বিশীর্ণ হইতে থাকে। তাহার পর প্রচণ্ড বর্ষা আসিয়া তাহাদের শ্রী সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত করিয়া দেয়। পুষ্পগুলি শুষ্ক হইলেই তন্মধ্যে ফলের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহার পর একটি ফল তেমনই শত শত ফুল উৎপন্ন করিবার জন্য বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া বন গহন করিয়া তুলে। তখন আবার পুষ্প, আবার মধু, আবার ফল, এই চক্রেই প্রকৃতির অনুপম শোভা, মধুমক্ষিকার জীবনসাধন ও জীবের মধুসেবন অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

হাজারা প্রদেশের বনে এই জন্য মধুচক্র বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। মধুও প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। সচরাচর চাকের মধু-২॥ বা ⁄৩ সের টাকায় কিনিতে পাওয়া যায়। আমরা একবার অনেক মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিছু দিন পরে তাহা সুন্দর মিছিরীরূপে পরিণত হইয়াছিল। দুগ্ধে মিশাইয়া পান করিবার সময় কেমন একটু সুগন্ধ ও সুমিষ্ট বোধ হইত, সেরূপ আমাদের দেশের মধুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কাশ্মীরের কেশর (জাফরান) ক্ষেত্রে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, সে স্থানের তৃণ ভক্ষণ করিয়া গাভীগণ যে দুগ্ধ প্রদান করে, তাহাতে ইহা অপেক্ষাও একটু মধুময় আস্বাদ পাওয়া

যায়; এমন কি, সেই প্রদেশের মেষ ও ছাগের মাংসে এমন একটু মধুর তার আছে যে, তাহা যিনি একবার আস্বাদ করিয়াছেন, তিনি কখনই তাহা ভুলিতে পারেন না।

বসন্তের পরেই বর্ষা আরম্ভ হইয়া অগষ্টের শেষ পর্য্যন্ত থাকে। অনবরত মুষলধারে বর্ষিতে থাকে। তৎকালে দেশের খাল, বিল, নদ নদী প্লাবিত হইয়া যায়; পার্ব্বতীয় ঝরণা সকল প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া পথ, ঘাট বিচূর্ণ করিয়া দেয়। তখন পথিকদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইবার সম্ভাবনা;—এমন কি, সময়ে সময়ে প্রাণের হানিও হইয়া থাকে। এক একটি শুষ্ক নদীর চরভূমি স্থানে স্থানে অর্দ্ধ মাইলেরও অধিক হয়। সেই নদী পার হইবার সময় যদি আকাশে ঘন মেঘের উদয় হইল, তখনই দেখিবে, পর্ব্বত-শিখর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন; মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে, তাহার কিয়ৎ-ক্ষণ পরে সেই বর্ষাজল ঝর ঝর শব্দে নিঃসৃত হইয়া, নদীকূল ভাসাইয়া তুলে; তাহার অগ্রে অগ্রে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, খণ্ডবিখণ্ড হইয়া দৌড়িতে থাকে। তখন যে জীব তাহার সম্মুখে পড়িবে, তাহার আর নিস্তার নাই। কয়েক বৎসর গত হইল, এই অবস্থায় পতিত হইয়া এক ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ অশ্ব সহ প্রাণ হারাইয়াছিলেন, এই জন্যই বর্ষাকালে এইরূপ পার্ব্বতীয় প্রদেশে গতায়াত এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ শত শত পার্ব্বতীয় নদী প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে পঞ্চনদী প্লাবিত করিয়া ফেলে। তখন নিম্নভূমি উচ্চভূমি সমান ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। পূর্ব্বকালে পঞ্জাবের এই পঞ্চনদী পার হইতে পাঁচ দিন লাগিত, এবং তাহাতে আশঙ্কার শেষ ছিল না। বড় বড় বহুরী বেড়ী (এক তলা সমান উচ্চ বৃহৎ বৃহৎ নৌকা) নদীতীরে উপস্থিত থাকিত। মানুষ, গরু, মহিষ, ঘোড়া, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র একত্র হইয়া পার হইতে হইত। প্রাতে আরম্ভ করিয়া বোঝাই শেষ করিতে প্রায় দেড় প্রহর কাল অতীত হইত। তাহার পর প্রায় দেড় মাইল দুই মাইল উজান টানিয়া, নাবাল দরীয়ায় লইয়া যাইতে হইত। এই দুরূহ কার্য্যে প্রায় তিন প্রহর কাল অতীত হইত। তাহার পর স্রোতের মুখে বেড়ী (নৌকা) ছাড়িয়া মাল্লারা (নাবিকগণ) নৌকায় চড়িয়া বসিত। এইরূপ স্রোতের মুখে পড়িয়া তীর-বেগে নৌকা যখন চলিতে থাকিত, সেই সময়ে স্রোতের গতি ফিরিয়া দাঁড়া-ইলে আর রক্ষা থাকিত না, দেখিতে দেখিতে ভরা ঘুরিতে আরম্ভ করিত, তাহার

বের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য ডাইরেক্টর কর্ণেল হলরয়েড প্রায় ৩০।৩২ বৎসর অতীত হইল, প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এখন আর কোথাও সেরূপ আশঙ্কা নাই। বৃহৎ ক্ষুদ্র সকল নদীর উপর লৌহসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। ধন্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ, ধন্য বৃটিশ গবর্মেণ্ট, যাঁহাদের কৃপায় আজি আমরা নিঃসঙ্গ হইয়া, পঞ্জাবের এই পঞ্চ নদী কয়েক মিনিটে পার হইয়া প্রায় ১৫০০ শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া হাজারার ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়াছি।

আবটাবাদ।

হোসেন আবদাল হইতে ৪২ মাইল উত্তরে আবটাবাদ নগরী সংস্থাপিত। সমতল সমুদ্রকূল হইতে স্থানের উচ্চতা প্রায় চার হাজার ফুট হইবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আবটাবাদ জনশূন্য অরণ্য ছিল। সীমান্তপ্রদেশ বৃটিশের করায়ত্ত হইলে কাপ্তেন আবট সেনানিবাসের জন্য প্রথমে এই স্থান নির্ণয় করেন। পর্ব্বতাকীর্ণ অতিবিস্তীর্ণ এই ভূমিখণ্ডের শোভা অপূর্ব্ব বলিয়া, সিবিল বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তারাও এই স্থানটি মনোনীত করিয়া লইয়াছেন; আর আবট সাহেব সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানের আবিষ্কার করেন বলিয়া তাঁহার নামেই স্থানটি নামিত হইয়াছে। কালে আবটাবাদ হাজারার রাজধানী হইয়া পড়িয়াছে। এই আবটাবাদের উত্তর সীমা মানামরা তহশীল, দক্ষিণ হরিপুর (পুরাতন হাজারা) নগরী, পশ্চিমে অম্বরাজ্য এবং পূর্ব্ব সীমা মরী পাহাড়। একখান সরাবের ন্যায় ভূমিখণ্ডের চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত এক অপূর্ব্ব ভাবে বিস্তারিত। কাশ্মীরের মহানগরী শ্রীনগর যে ভাবে হরিপর্ব্বত ও শুক্রচার্য্যের পাদদেশে বিলুণ্ঠিত, আবটাবাদ ঠিক সেই ভাবে না হউক, তাহারই অনুকরণে যেন গঠিত হইয়াছে। নিকটস্থ বটঙ্গীর শিখরোপরি দণ্ডায়মান হইলে এইরূপ অনুমান হয়। সৈনিকনিবাস সকল যথাক্রমে উপত্যকা ভূমি হইতে নামিতে নামিতে সমতল ভূমিতে আসিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। এক পল্টন গুরখা, এক পল্টন শিখ ও এক পল্টন গোলন্দাজ (mountian Battery) সমাবেশিত। তাহার সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড প্যারেড গ্রাউণ্ড নামে পরিচিত, সেই প্যারেডের চতুঃসীমায় সুন্দর সুন্দর উদ্যানমণ্ডিত অফিসারদিগের আবাসস্থান, বারুদখানা, তোপখানা, কোয়াটার গার্ড, মেস্‌কোর্ট (Mess court) এবং শস্ত্রাগার। ইহাকেই সৈনিকনিবাস বা ক্যাণ্টনমেণ্ট কহে। এই নিবাসের দক্ষিণাংশে সিবিল লাইন সংস্থাপিত। তথায় সকল প্রকার আফিস আদালত, ডাকঘর, ডাকবা-

ঙ্গলা, ও জেলার অফিসারদিগের আবাসস্থান। মধ্যে বাজার, স্কুল, মস্‌জীদ, হাঁসপাতাল ও মন্দির। তাহার চতুষ্পার্শে দেশীয় কর্ম্মচারী ও দোকানী পশারীদিগের বাসস্থান। সমস্ত স্থানের আয়তন দুই আড়াই মাইল হইবে। জনসংখ্যা ৮০০০ আট হাজারের অধিক নহে।

ইতঃপূর্ব্বে কাবুলের অনেক সর্দ্দার এই স্থানে নজরবন্দী ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা স্থানান্তরিত হইয়াছেন। এখন কেবল ভুখারার রাজকুমার আলি আহেদ আবদুল মালিক সাহেব অবস্থিতি করিতেছেন; রাজকুমার আবদুল মালিকের জীবনপ্রসঙ্গ অপূর্ব্ব বলিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কথাই লিখিতেছি।

রাজকুমার আবদুল মালিক।

ভুখারার আমীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকুমার আবদুল মালিক ভুখারায় "কাটিতুরা" নামে পরিচিত। ভুখারার উত্তরাধিকারী রাজকুমারকে "কাটিতুরা" কহে। বর্ত্তমান কাটিতুরা পিতৃরাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইনি যৎকালে ভুখারার সীমাপ্রদেশ রক্ষা করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার সহিত রুস গবর্মেণ্টের বিবাদ হয়। রুস সম্রাট তাহাতে বিরক্ত হইয়া আমীর সাহেবকে পত্র লিখিয়া কাটিতুরাকে সীমান্তপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। তৎকালে মধ্য এসিয়ায় রুসের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ। আমীর সাহেব নিজ পুত্রকে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে বলেন, কিন্তু কাটিতুরা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। রুসসম্রাট আবার ভুখারায় পত্র লিখিলেন। আমীর তখন ভীত হইয়া কুমারকে আদেশ করিলেন যে, রুসের প্রচণ্ড প্রতাপ, তাহার সহিত বিবাদ করিও না। কাটিতুরা পিতার কথায় কর্ণপাত না করিয়া রুসের সহিত সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া দিলেন। "চারজুই" নামক স্থানে যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার ফলে রুস জেলায় আতঙ্ক জন্মিয়াছিল। রুস আবার আমীর সাহেবকে সতর্ক হইবার জন্য পত্র লিখিলেন। সে পত্র পড়িয়া আমীরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, তিনি রুসভয়ে নিতান্ত ভীত ও চকিত হইয়া কুমারকে দেশে ফিরিয়া আসিতে বারংবার আদেশ করিলেন। কাটিতুরা কহেন, ঘরের মটকা যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন জলের সন্ধান বৃথা, কাজেই পিতার আদেশ পালন করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত প্রজ্বলিত অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় সমরানল প্রধূমিত করিয়া তুলিলেন। অগত্যা আমীর পুত্রকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন, এবং পুত্রের বিরুদ্ধে সসজ্জ হইয়া রুসের সহিত

পলায়ন করিলেন। প্রথমে তুরস্কের সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে স্থানে রুসের তাড়না সমধিক দেখিয়া আমাদের স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শরণাগত হন। দয়াময়ী ভারতেশ্বরী তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে যে আশ্রয় দান করিয়াছেন, তাহাতেই কাটিতুরা নিরাপদ। ভারত গবর্মেণ্টের আদেশে কুমার আবদুল মালিক এখন আবটাবাদে অধিষ্ঠিত। আবদুল মালিক সৈয়দ, মহামতি আলির বংশাবতংস বলিয়া মুসলমানসমাজে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান, সেই জন্য তাঁহার হস্তে অনেক ভদ্র মুসলমান কন্যারত্ন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে কুমারের সংসার বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কুমার শিকারে, অশ্বচালনে ও রণকৌশলে বিশেষ নিপুণ। তাই সময়ে সময়ে আশ্রয়দাতা গবর্মেণ্টের সেবা করিতে চাহেন। কয়েক বৎসর গত হইল, আমাদের বিখ্যাত সেনাপতি লর্ড রবার্টসের সহিত একত্র হইয়া আটক সেনাবিহারে (Camp of Exercise at Attock) নিজে শৌর্য্য বীর্য্যর কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিলেন। ভুখারা এখন রুসরাজের করায়ত্ত প্রায়, আমীর দ্বিতীয় পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন, সুতরাং কাটিতুরা নিরাশ। তাই ভবিষ্যতে তাঁহাকে আমরা রাজকুমার আবদুল মালিক বলিয়া উল্লেখ করিব। আবদুল মালিক পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়াও অণুমাত্র ভগ্নোদ্যম নহেন। চারজুই সিংহের ন্যায় ভুখারার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

যে সকল সম্ভ্রান্ত বংশে আবদুল মালিক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের ধনধান্যের অভাব নাই। ভগবানের কৃপায় আবদুল মালিকের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কুমার তৈমূর কাটিতুরা, আবদুল মালিকের হৃদয়াকাশে যে ভুখারা রাজ্য অঙ্কিত, তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে বলিয়া তিনি নিজে কাটিতুরা নাম পুত্রের প্রতি আরোপ করিয়া যে মহান উদ্যোগ আরম্ভ করিয়াছেন, ভগবান তাহা কিরূপে সম্পন্ন করিবেন, কে বলিতে পারে? কুমার তৈমূর বয়োবৃদ্ধির সহিত স্বীয় পিতৃদেবের পদমর্য্যাদা বুঝিতে পারিতেছেন, এবং সেই জন্যই কায়মনোযত্নে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। তিনি মন্সুরীর ইংরাজী স্কুলে ইংরাজ বালকগণের সমপাঠী থাকিয়া শিক্ষা করিয়াছেন, সম্প্রতি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংলণ্ডে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। তথায় তিনি শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রণকৌশল শিক্ষা করিবেন,

তাহার পর অবশ্যই কোনও বিশিষ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্রাট তৃতীয় এডওয়ার্ডের সেবা করিয়া পিতৃঋণ পরিশোধ করিবেন; তাহার পর বৃটিশ সিংহের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করিতে সচেষ্ট হইবেন। কুমার আবদুল মালিক এখন বৃদ্ধ, এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার শরীর অবসন্ন হয় নাই, স্থির ও ধীর ভাবে ভগবানের প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া নিজ পুত্রদিগকে প্রস্তুত করিতেছেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

চিত্রশালা।

প্রেমের প্রলোভন।

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়
সলিল বহে যায় নয়নে!"

মকর-কেতন বিশ্বজয়ী। তাহার কুসুমশর অব্যর্থসন্ধান; তাহার "ভ্রমরের ছিলা কুসুমচাপ" সকল অস্ত্রের অপেক্ষা ভীষণ।

"কুরূপা প্রেমিকা, তবু প্রেমিকের কাছে—
তা'র মত সুন্দরী কি ধরাতলে আছে?"

আষাঢ়ের প্রথম দিনে রামগিরির বিরহাশ্রমে ক্রীড়ামত্ত গজের ন্যায় মেঘকে দেখিয়া শাপাস্তগমিতমহিমা অবলাবিরহদুঃখকাতর যক্ষের চিত্ত সেই দূর অলকার শিশিরমথিতা পদ্মিনীর মত—

তন্বী শ্যামা, সুদশনা, ওষ্ঠাধরে বিম্ব রহে ফুটি,
ক্ষীণমধ্যা, নিম্ননাভি চকিত-হরিণী আঁখি দু'টি,
শ্রোণীভারমন্দগতি, স্তনভারে ঈষৎ আনতা"

পত্নীর বিরহে একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সে "ধূম, জ্যোতি, জল, বায়ুর সন্নিপাতে" লব্ধজন্ম মেঘকে দূতপদে বরণ করিয়া পত্নীর নিকট সংবাদ পাঠাইতে ব্যগ্র হইয়াছিল।

হায়—

"বিচ্ছেদ-উন্মাদে প্রেমিকসকাশে
সজীব নির্জীব বিচার কোথা?"

প্রেমের এমনই মহিমা।



প্রেমের প্রলোভন।

KUNTALINE PRESS.

কিন্তু "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"। নহিলে—সকলেই যদি একই রূপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইত, তাহা হইলে বৈচিত্র্য সম্ভব হইত না; একের কাছে যাহার রূপ নাই—সকলের চক্ষেই সে কুরূপা থাকিত। একের কাছে যাহার কোন আকর্ষণ নাই—সে কাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিত? লোকের রুচি ভিন্ন; তাই রুচিভেদে প্রেমের প্রলোভনও স্বতন্ত্র। সে বিষয়ে কুসুমেষু সিদ্ধহস্ত।

সংপ্রতি ফরাসী চিত্রকর লুই প্রিউ প্রেমের প্রলোভনের একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। চিত্রখানি চমৎকার রূপক। লাবণ্যশ্রীমধুর সৌন্দর্য্য সংসারসমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া ছিপ ফেলিতেছেন; পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বালক মদন আপনি বাছিয়া টোপ পরাইতেছেন। সংসারবারিধি বিহারীর সাধ্য কি যে, সে প্রলোভন সংবরণ করে? মদনের পক্ষে ইহা একান্তই ক্রীড়া—তাই তাহার বালসুলভ আননে স্মিত যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য্যের পক্ষে ইহা ক্রীড়ামাত্র নহে—তাই সে আননে আশঙ্কা ও ঔৎসুক্যসঞ্জাত গাম্ভীর্য্য চিত্রিত। তবে স্বয়ং মদন যখন সহায়—তখন এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সে আননের গাম্ভীর্য্যচ্ছায়া শীঘ্রই অপনীত হইবে, এবং বিজয়গর্ব্বের প্রফুল্লতায় সে সুন্দর মুখ মেঘান্তে শশীর মত দ্বিগুণ সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠিবে।

আমরা "সাহিত্যের" পাঠকদিগকে ফরাসী চিত্রকরের চিত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলাম।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। বৈশাখ; প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা। 'দাসী' ও 'প্রদীপে'র ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম. এ. মহাশয় এলাহাবাদ হইতে এই নূতন সচিত্র মাসিক-পত্রখানি প্রচারিত করিতেছেন। 'প্রবাসী'-সম্পাদক চিত্রের বাহুল্যে ও বৈচিত্র্যে স্বপ্রবর্ত্তিত 'প্রদীপে'র চিত্রগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন। প্রথম সংখ্যার সমস্ত চিত্র উৎকৃষ্ট নয় সত্য, কিন্তু অধিকাংশই মনোজ্ঞ। আশা করি, রামানন্দ বাবুর এই প্রযত্ন সফল হইবে। সংক্ষিপ্ত সূচনায় দেখিলাম,—"প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কার্য্যের বিচার হওয়া ভাল।" এই জন্য আমরা আপাততঃ আমাদের আশা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব রহিলাম। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের "আবাহন" কবিতাটি মন্দ নহে। মধ্যে মধ্যে দুই একটি 'চরণ' উজ্জ্বল হীরকের ন্যায় সমুজ্জ্বল। কিন্তু বক্তব্য বিষয়ের তুলনায় একটু বিস্তৃত, তাই রসহানি হইয়াছে। "প্রয়াগধামে কমলাকান্ত" কি রসিকতা না রসের কথা? আমরা এই ব্যর্থ রচনাটির রসগ্রহ করিতে পারিলাম না। এত কাল পরে চিরপ্রিয় মৌতাতী বুড়া কমলাকান্ত শর্ম্মার প্রতি এরূপ অত্যাচার দেখিলে কাহার না দুঃখ হয়? মানিলাম, প্রয়াগতীর্থে কমলাকান্তের মস্তকমুণ্ডন অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তাহাতে যে হাস্যরসের পরিবর্ত্তে করুণরসের প্রবাহই উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। যিনি কমলাকান্তের মুখোস পরিয়াছেন, সেই ছদ্মবেশীই ত এই সংখ্যায় "আদর্শ কবি" নামক একটি রোম্যান্টিক গল্পের সূত্রপাত করিয়াছেন? গল্পের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী মনোরম। আখ্যানবস্তুর পরিণতি না দেখিয়া আর কিছু বলা যায় না। এবারকার 'প্রবাসীর' একমাত্র প্রবন্ধ "অজণ্টা গুহা-চিত্রাবলী।" উচ্চারণ কি—অজন্তা না অজণ্টা?— সার জর্জ্জ বার্ডউড

সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ Journal of Indian Art পত্রের ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অতিরিক্ত অধিক কিছু নাই। জর্ণালে মুদ্রিত চিত্রাবলীর অনেক চিত্র প্রবাসী পত্রে পুনর্মুদ্রিত দেখিতেছি। সে যাহা হউক, লেখকের লিপিকৌশল প্রশংসনীয়। অজন্তা গুহার ইতিহাস ও চিত্রাবলীর বিবরণ যেমন রমণীয়, তেমনই সুখপাঠ্য। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে অজণ্টাচিত্রগুলির কতকগুলি বিশেষত্ব (peculiarity) আছে। আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে আকর্ণবিস্তৃত অর্থাৎ পটোলচেরা বা টানা চোখের বড় আদর। বাস্তবিকই যে আয়তলোচনাদিগের চক্ষু কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা নয়। কিন্তু অজণ্টাগুহাচিত্রাবলীতে চিত্রকরগণ অনেক স্থলে ললনাদিগের চক্ষু বড়ই দীর্ঘ করিয়াছেন। টানা চোখের মত আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে পীনপয়োধর ও গুরু নিতম্বেরও প্রশংসা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া কিছুতেই স্বভাবকে অতিক্রম করা উচিত নয়। অজণ্টা-গুহার ছবিগুলিতে নারীগণের স্তন ও নিতম্ব স্বাভাবিক অপেক্ষা পীনতর ও পৃথুতর করিয়া আঁকা হইয়াছে। কিন্তু নরনারীদেহচিত্রণে অপরাপর বিষয়ে এই প্রাচীন চিত্রকরগণ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অঙ্গুলিভঙ্গী যে কত প্রকারের আছে, বলা যায় না। মিনতি, রোষপ্রদর্শন, আদর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভঙ্গী। কিন্তু এই প্রাচীন শিল্পিগণ ভাল করিয়া পা আঁকিতে পারেন নাই। নারীগণকে প্রায়ই বিবসনা বা অর্দ্ধনগ্না আঁকা হইয়াছে, কিম্বা এরূপ বস্ত্র পরান হইয়াছে, যাহাতে দেহের গঠন বুঝিতে পারা যায়। দাসীদের পরিহিত বস্ত্র চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু রাণী ও সম্ভ্রান্তা মহিলাগণ অতিশয় সূক্ষ্মবস্ত্র পরিতেন বলিয়া তাহা অনেক চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। নগ্না রমণীমূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে অজণ্টাচিত্রগুলি অশ্লীল। বস্তুতঃ চিত্রগুলিতে অশ্লীলতার কোন গন্ধ নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরুষমাত্রেরই মালকোঁচা মারিয়া ধুতি পরা। নারীগণের পরিচ্ছদও অধিকাংশ স্থলে তাহাই। কেহ কেহ সাড়ীপরিহিতা। ধুতি ও সাড়ী প্রায়ই ডুরিয়া। স্ত্রী পুরুষ যাহারা কাছা দিয়া কাপড় পরিয়াছে, তাহাদের ধুতি উরুর নীচে নামে নাই। রাজা প্রজা সকলেরই এই বেশ। মহারাষ্ট্রদেশে এখনও স্ত্রীলোকেরা কাছা দিয়া কাপড় পরে। কেশবিন্যাসের রীতি যে কতপ্রকার ও কি বিচিত্র, বর্ণনা করা যায় না। আমাদের দেশে ফিরিঙ্গী খোঁপা চলিয়াছে। যাঁহারা প্রাচীন জিনিষ ভালবাসেন, তাঁহারা একবার অজণ্টা খোঁপা চালাইবার চেষ্টা করুন না। জঙ্গলী মেয়েদের চিত্রে চুলে নানাপ্রকার ফিতা ও ময়ূরপালক দেখা যায়।" * * * এই চিত্রগুলিতে বুদ্ধদেবের জীবনের অধিকাংশ ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। বুদ্ধের সমুদয় ছবিতে কাণের নিম্নভাগ লম্বা দেখা যায়। কেহ বলেন বুদ্ধের কাণ স্বভাবতঃ কতকটা এই প্রকার ছিল। কেহ কেহ বলেন তৎকালে কাণের ঐ অংশে ভারী অলঙ্কার পরিবার রীতি থাকায় কাণ ঐরূপ হইয়া যাইত। এই রীতি এখনও আছে। অজণ্টার একটি চিত্রে এক জন পুরুষ দুই কাণে দুইটি ইন্দুরাকৃতি গহনা পরিয়াছে, দেখা যায়। জঙ্গলী লোকদের মুখাবয়ব, অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদ অজণ্টায় সুচিত্রিত হইয়াছে। এই সকলের সহিত বর্ত্তমান গোণ্ড ও ভীলদিগের চেহারা ও পরিচ্ছদাদির অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। সাসানীয় বা প্রাচীন পারসীকদিগের যে সকল চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শিল্পীদিগের মানবচরিত্রজ্ঞান বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। গৃহী ও শ্রমণদিগের চেহারা ও পরিচ্ছদের পার্থক্য চিত্রগুলি দেখিয়া বেশ বুঝা যায়। সৈন্য ও ব্যাধগণের মুখ খর্ব্বাকৃতি ও কর্কশ, উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের মুখ দীর্ঘতর, ডিম্বাকৃতি ও অধিকতর কোমল। গৌর, শ্যাম, নানাবর্ণের নরনারী অঙ্কিত হইয়াছে।

"নাগদিগের আকৃতি মানুষেরই মত। প্রভেদ এই যে তাঁহাদের ঘাড় হইতে সাধারণতঃ ৫টি কি ৭টি সাপ উঠিয়া মাথার উপর ফণা ধরিয়া আছে। কোন কোন নাগের মাথার উপর কেবল একটি ফণা আছে। নাগিনীদের মাথায় কেবল একটি ফণা। স্থলে নাগনাগিনীদের চিত্র এইরূপ আঁকা হইয়াছে। জলে কিন্তু তাহাদের সাপের মত লেজ দেখা যায়। এক এক জনের মুখের ভাব বড়ই সুন্দর। কেহ বা করযোড়ে উপাসনা করিতেছে, কেহ বা প্রেমাস্পদের পদতলে বসিয়া যেন কি গভীর বিষাদমিশ্রিত হৃদয়নিহিত কথা সুন্দর অঙ্গুলিভঙ্গি সহকারে ঈষৎ উর্দ্ধনেত্রে নিবেদন করিতেছে ইত্যাদি। রাক্ষস রাক্ষসীর ছবিও অনেক আছে। তাহারা শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে সমর্থ। মুখে বরাহের মত দু দিকে দুটা বড় বড় দাঁত। গন্ধর্ব কিন্নরের ছবিও অনেক আছে। গন্ধর্বগণের মুখ মানুষের মত, হাত মানুষের মত, কিন্তু শরীরের নিম্নদেশ পাখীর মত। কিন্নরগণ মনুষ্যাকৃতি, কিন্তু মুখ ঘোড়ার মত।"

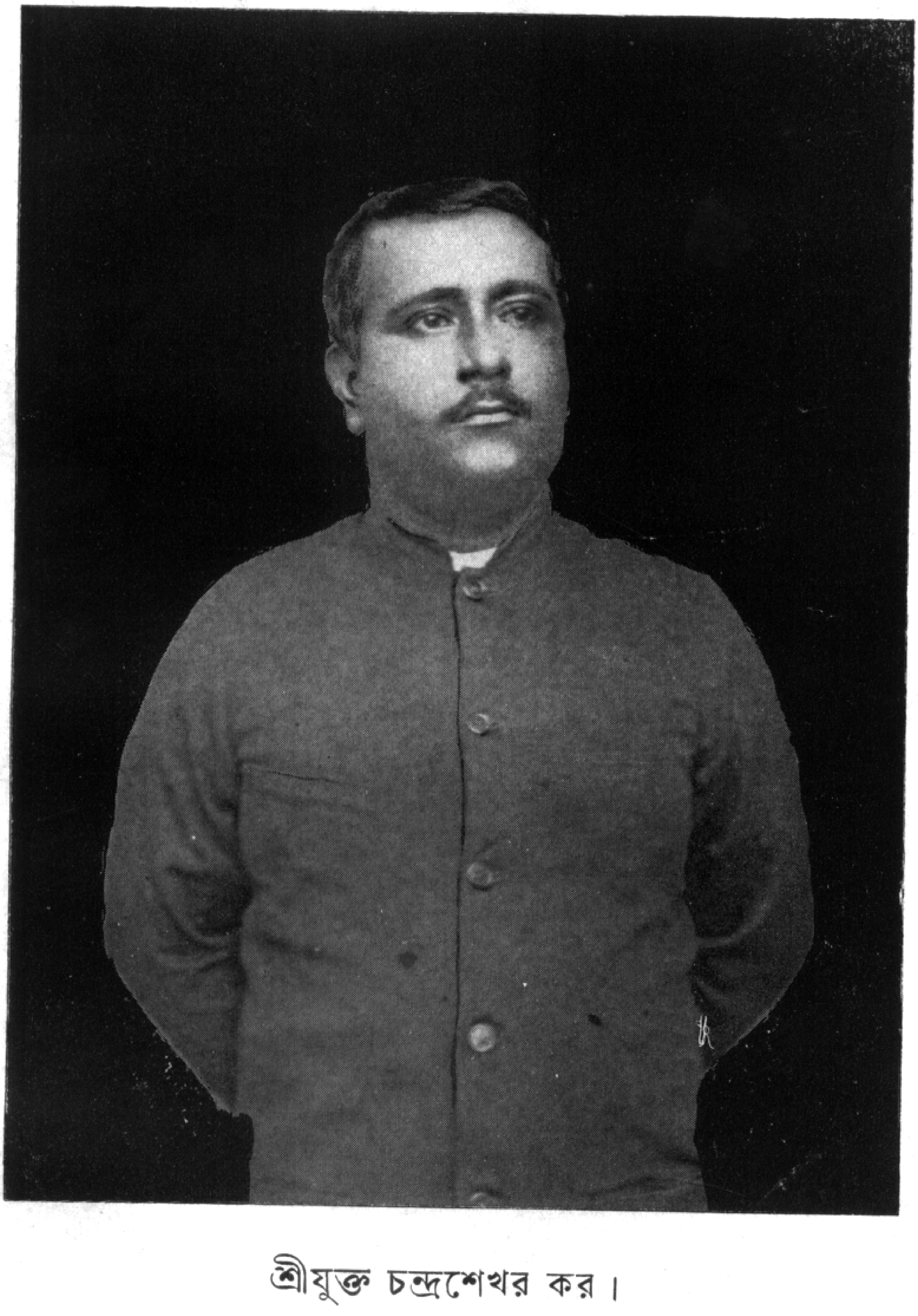
অজন্তার চিত্রাবলী হইতে প্রাচীন ভারতের এইরূপ বিবিধ ছবি সংগৃহীত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "প্রবাসী" কবিতাটি কষ্টকল্পনার কলঙ্কে অত্যন্ত মলিন। কৃত্রিম ভূষণের ভারে কবি আপনার 'মানসী'কে নিতান্ত পীড়িত করিয়াছেন।—স্বচ্ছন্দলীলা ও সুষমার অভাবে কবিতাটি ব্যর্থ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "জীববিদ্যা" একটি উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক রচনা।

ভারতী। বৈশাখ; ২৫ ভাগ, প্রথম সংখ্যা। প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সাগরসঙ্গমে" নামক কবিতা। বোধ করি, কবিবরের নবকল্পিত গীতিকাব্য 'নৈবেদ্যে'র দেবোদ্দিষ্ট উপকরণের অন্যতর,—আধ্যাত্মিক। নিতান্ত 'চিনির পুলি' নয়। রবীন্দ্রবাবু আজকাল ভাবের মায়া কাটাইয়া নিপুণ শিল্পীর মত কবিতার প্রত্যেক চরণ অনবরত 'পালিশ' করিতেছেন। তাহার ফলে কবিতাগুলি 'চক্চকে' 'ঝক্ঝকে' হইতেছে বটে, কিন্তু ভাব বেচারীর চক্ষে জল দেখিয়াও কি তাঁহার কবিহৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয় না?" "কাশীবাসিনী" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনা। গল্পের আখ্যানবস্তু মন্দ নয়, কিন্তু লেখক শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীর "নূতন বন্দনা" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ও ঝঙ্কারের অদ্ভুত অনুকরণ। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের "হিন্দু-দর্শন" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রণীত প্রথম খণ্ড 'বেদান্তদর্শনের' তথাকথিত সমালোচনা। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ "উড়িষ্যার মঠে" মঠের ও মোহন্তের যে ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সুন্দর। ভাষার প্রতি লেখক ক্রমে উদাসীন হইতেছেন কেন? "বিষ্ণুমূর্ত্তি"ই যথেষ্ট, তাহার উপর আবার "বিগ্রহ" কেন? "দাতাগণ"অপেক্ষা দাতারা লিখিলে ক্ষতি কি ছিল? "মহারাণীর অন্ত্যেষ্টিসমারোহ" প্রবন্ধটির প্রথম অংশ—"বিলাতে" শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও দ্বিতীয় অংশ "ভারতে" শ্রীমতী সরলা দেবীর রচিত। সংবাদপত্রে শোভা পাইত। যুগ্ম-রচনার বৈচিত্র্য ব্যতীত আর কিছু উল্লেখযোগ্য নহে। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের "ঐতিহাসিক পত্রাবলী" পাঠযোগ্য। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ছটপরব ও চকচন্দা" উপাদেয়। "রুবায়াৎ" ওমার খইয়ামের অনুবাদ—গদ্য অনুবাদ শ্রীমতী সরলা দেবীর;—অদ্ভুত বাঙ্গলা। পদ্য শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিতের।—

"জীবনের প্রতি দিন কত শত শঙ্কা,
তার কাছে কোথা লাগে মরণের ডঙ্কা।
ঈশ্বর যে ক'টি দিন দিয়েছেন কর্জ্জ,
সহাস্যে শুধিব যবে পূর্ণ হবে সংখ্যা।"

তা সত্য; কিন্তু এমনতর পদ্য পড়িতে হইলে ঈশ্বরদত্ত দিনগুলিও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিবার সম্ভাবনা। "নষ্টনীড়" রবীন্দ্র বাবুর একখানি নূতন উপন্যাস। এই সবে আরম্ভ।

প্রদীপ। বৈশাখ। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের "কতদিন" কবির পুরাতন রচনা। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের "রাজবিদ্যা" বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর "সৃষ্টির বিশালত্ব" নামক উপাদেয় বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভটি এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "বেদে বালিকা" নামক রচনার শীর্ষে লিখিত আছে, "গল্প।" অতএব ইহা একটি গল্প। এমন অগাধ অসীম দুরবগাহ সর্ব্ববিধ মালমশলাপূর্ণ রচনা সর্ব্বদা দেখা যায় না, এই যা দুঃখ। লেখক 'গল্প' বলিয়া 'লেবল্' মারিয়া না দিলে 'বেদে বালিকা' উপন্যাস, নবন্যাস, রহোন্যাস প্রভৃতি যে কোনও 'ন্যাসে'র অন্যতর বলিয়া অনায়াসে পরিচিত হইতে পারিত। আবার গল্পটি 'সত্যঘটনামূলক!' উপন্যাস-জাতীয় রচনায় যে যে উপাদানের অস্তিত্ব সম্ভব, লেখক তাহা একত্র নিবদ্ধ করিয়া নৈষধকার শ্রীহর্ষের ন্যায় বাঙ্গলা ভাষার ভবিষ্যৎ মম্মটের বিলক্ষণ উপকার করিয়াছেন। "মহীশূরে রাজোদ্বাহ" শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেব বর্ম্মার রচনা। 'মিলিটারী' দেখিয়া পাঠকের পলায়নপর হইবার প্রয়োজন নাই। কর্ণেল মহিমচন্দ্রের বর্ণিত রাজোদ্বাহের বিবরণ বিলক্ষণ কৌতুকাবহ—সুখপাঠ্য রচনা। লেখকের ভাষা গ্রাম্যতাদুষ্ট, এবং ব্যাকরণ বোধ করি সঙ্গীনের ভয়ে তাঁহার কাছে ঘেঁষিতে পারে না। 'প্রদীপে'র আলোয় আনিবার পূর্ব্বে একবার ভাষাটির অঙ্গরাগ কর্ত্তব্য ছিল। এ বিষয়ে 'প্রদীপে'র অত্যন্ত ঔদাসীন্য;—রচনার সংস্কার দূরে থাক, বরং সময়ে সময়ে তাহাতে প্রদীপের কালী লাগিয়া যায়। কর্ণেলের ন্যায় পদস্থ ব্যক্তি বাঙ্গলা লিখিতে আরম্ভ করিলে অনেক আশা করা যায়, এবং বক্ষ্যমাণ রচনাটিও আশাপ্রদ, তাই ভাষার বিষয়ে লেখকের অবধান প্রার্থনা করিলাম। "কবি-সম্ভাষণ" কবিতাটি ব্যক্তিগত, সাধারণের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? অন্ততঃ তাহা আমাদের সমালোচনার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। প্রেম ভক্তি ও ছাপাখানার মধ্যে প্রাচীর বা 'মারহাট্টা ডিচে'র, ব্যবধান নাই বটে, তবু মনে হয়, একটু অন্তরাল নিতান্ত অনাবশ্যক নয়। কোনও ভাবের বাহুল্যেই সেই সূক্ষ্ম সীমার অতিক্রম শোভন বা সঙ্গত নয়। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "প্রবাসে এক রাত্রি" বিবিধ বক্তৃতার বিরাট নির্ঝর;—কেবল প্রবন্ধের বিষয়ীভূত হিমালয়ের কথাই অল্প। 'হিমালয়ে'র লেখককে আর একবার হিমালয়ের বনে নির্ব্বাসিত না করিলে আমাদের ক্ষুধা মিটিতেছে না। "প্রবাসে এক রাত্রি"র শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য জলধর বাবুর ছবিখানি! এই চিত্রে জলধর বাবুর ভগবদ্দত্ত মূর্ত্তি অনেকটা অন্যরূপ দেখিলাম;—তাহার কারণ হয় হিমালয়, নয় চিত্রকর। বোধ করি, শেষোক্তই এই অসাধ্যসাধন করিয়াছেন; কেন না, হিমালয় অচেতন, তাহার হাতে তুলিও নাই, 'বুলি'ও নাই। উপবিষ্ট জলধর বাবুর গায়ে কোট, পায়ে বিলাতী জুতা, পাশে ছাতাটি (বোধ করি সিল্কের!) পড়িয়া আছে। সম্মুখে সুবসনা ধৃতাভরণা গোপাঙ্গনা ভাণ্ড হইতে দুগ্ধ ঢালিয়া দিতেছে,—আর শ্রমক্লান্ত জলধর বাবু কৃতাঞ্জলিপুটে সেই দুগ্ধধারা পান করিতেছেন! হায়! হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গে কুম্ভের উপর কঙ্কণনিক্কণ শুনিবার লোভে 'কোন্ বীর হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে' হিমালয়ে? বিশেষতঃ এইরূপ একখানি অমরচিত্রে চিত্রিত হইয়া থাকিবার প্রলোভন বড় অল্প নয়! বৈকুণ্ঠ বাবু বিজ্ঞানবলে না যাদু-বলে না মন্ত্রবলে জলধর বাবুর এই ছবিখানি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে?



শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর।

KUNTALINE PRESS.

হিমারণ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেখিতে দেখিতে আষাঢ়ের একাদশ দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। উৎসাহে রাত্রিতে আর নিদ্রা হইল না। কখন প্রভাত হইবে, কখন মানস-সরোবর ও কৈলাসের অভিমুখে যাত্রা করিব, ইত্যাদি নানাপ্রকার চিন্তায় রাত্রি শেষ হইল। চারি দিকে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল; ভাটেরা দেবস্তুতি পাঠ করিতে লাগিল; পল্লীবাসীরা জয়ধ্বনিতে গ্রাম মাতাইয়া তুলিল। আমিও শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমার ভৃত্য বিষ্ণু সিং চা লইয়া হাজির হইল; আমি গরম চা পান করিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিলাম। উঠিয়া দেখি, পল্লী উৎসবে আনন্দময়। তিব্বতযাত্রীরা গরম পোষাক পরিধান করিয়া সুসজ্জিত হইতেছে; তলোয়ার ও বন্দুক পরিষ্কার করিয়া যথাস্থানে রাখিতেছে; কেহ কটিবন্ধ কসিতেছে; কেহ পাগড়ী বাঁধিতেছে; কেহ টুপি পরিষ্কার করিতেছে; কেহ কেহ গলবস্ত্র হইয়া দেবমন্দিরের অভিমুখে সোৎসাহে ছুটিতেছে; কেহ সন্তান সন্ততিকে কোলে করিয়া ভালবাসা জানাইতেছে; জননীরা সন্তানের ভাবী বিরহে কাঁদিতেছে; যুবতীরা বিরসবদনে স্বামীর তিব্বতযাত্রার উদ্যোগ করিতেছে; বর্ষীয়সীরা নববস্ত্র পরিধান করিয়া দেবালয়ে গমনপূর্ব্বক মেষ, ছাগ, গো, অশ্ব ও আত্মীয়দিগের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছে; পুরোহিতেরা বাণিজ্যে যজমানের লাভের জন্য দেবালয়ে বলি দিতেছে, এবং যজমানের মঙ্গলের জন্য হস্তে রক্ষা বন্ধন করিতেছে। ও দিকে ভৃত্যেরা আপন আপন মেষ ও ছাগের পৃষ্ঠে পণ্য বোঝাই করিয়া তিব্বতাভিমুখে যাত্রা করিতেছে, আর পল্লীবাসীরা এই সব দৃশ্য সানন্দচিত্তে দেখিতেছে।

দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইল, আর আমার বাসস্থানের নিকট দুইটি 'ঝব্বু' আসিয়া উপস্থিত হইল। বিষ্ণুসিং 'ঝব্বু'তে জিনিসপত্র বোঝাই করিতে লাগিল। আমার দ্বিতীয় ভৃত্য খড়্গ সিং আহারীয় প্রস্তুত করিতে গেল। আমি বসিয়া আছি, এমন সময় কেদার সিং আসিয়া বলিল, "আমরা প্রস্তুত হইতেছি, আপনি নয়টার মধ্যে আহার করিয়া প্রস্তুত হউন; বেলা এগারটার সময় আমরা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া তিব্বত

যাত্রা করিব।" আমি কেদার সিংহের কথা অনুসারে প্রস্তুত হইয়া যাত্রার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে তুমুলরবে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। পুরোহিতেরা উচ্চরবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। এক জন লোক আসিয়া বলিল, "আমরা প্রস্তুত হইয়াছি; আপনি চলুন।" আমি বাহিরে আসিয়া দেখি, বাদ্যকরেরা কেদার সিংহকে ঘেরিয়া বাদ্য করিতেছে। আমি আর আমার সঙ্গী সাধুরা কেদার সিংহের নিকটস্থ হইলাম। কেদার সিংহের ইঙ্গিতে বাদ্যকরেরা নৃত্য করিতে করিতে আমাদের অগ্রে অগ্রে চলিল; তাহার পর পুরোহিতেরা স্তুতি পাঠ করিতে করিতে চলিলেন। আমাদের পশ্চাতে গ্রামের প্রধান, প্রধানের পশ্চাতে অপরাপর গ্রামবাসীরা চলিল; গ্রামবাসীদের পশ্চাতে গ্রাম্য বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীলোকেরা অনুসরণ করিতে লাগিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে কেহ ঝব্বুতে, কেহ ঘোড়াতে, কেহ চামরে সোয়ার হইয়া, আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বাদ্যকরেরা ও পুরোহিতেরা গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিল; বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকেরাও গৃহে ফিরিল। আমরা গন্তব্যপথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখন দেখা গেল, দুই জন বৃদ্ধ ও বালক ও স্ত্রীলোক ভিন্ন গ্রামবাসীরা সকলেই তিব্বত যাত্রা করিয়াছে।

আমি কেদার সিংহের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে একখানি গ্রাম অতিক্রম করিয়া 'গম্‌শালি' গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামবাসী বাদ্যকরেরা দূর হইতে কেদার সিংহ ও 'মারগাঁও'-বাসীদিগকে দেখিয়া বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে আমাদের গতিরোধ করিল। ইহাদের বাদ্য শ্রবণ করিয়া আমাদের সঙ্গী ও সোয়ারেরা যান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক বিকট নৃত্য আরম্ভ করিল। বাদ্যকরেরাও তদনুরূপ বাদ্য বাজাইতে ত্রুটি করিল না। ইহা বলা বাহুল্য যে, একমাত্র কেদার সিং ভিন্ন অন্য সকলেই মদ্যপানে উন্মত্ত। ইহাদের মধ্যে এক জন আসিয়া আমার নিকট বলিল,"স্বামীজী, আজ আমাদিগকে ক্ষমা করুন; আজ আমাদের আনন্দের দিন; আমরা আনন্দ করিয়া লই।" এই আনন্দ প্রায় এক ঘণ্টা কাল চলিল। তার পর আমরা 'গমশালী'র অদূরে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িলাম। ইতঃপূর্ব্বে যে 'ফুনিয়া'র কথা বলা হইয়াছে, এই গ্রামে তাহার বাস। ৯ই আষাঢ় 'ফুনিয়া' ও গ্রামবাসীরা চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম শূন্য; কেবলমাত্র বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও বাদ্যকরেরা গ্রামের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। 'মরগাঁও'

বাসীরা গ্রামের পার্শ্বে উপস্থিত হইলে গ্রামবাসী একটি বৃদ্ধা মদ, দধি, ফাঁপ-রার আটা (একপ্রকার ঘাসের দানার আটা) উপহার দিয়া 'মরগাঁও'-বাসীদিগের অভ্যর্থনা করিল। 'মরগাঁও'-বাসীরাও অতি আদরের সহিত বৃদ্ধার উপহার গ্রহণ করিল। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে চারি পাঁচ জন লোক এত মাতাল হইয়াছিল যে, অদ্য তাহাদের এই গ্রামে থাকিতে হইল।

আমরা টিমরসিং নামক আড্ডায় চলিয়া গেলাম। টিমরসিংএর বাম দিকে 'নিতি' গ্রাম ও 'নিতি' পাস। 'নিতি' গ্রাম হইয়া 'নিতি' পাসের পথ 'দ্বাপা'তে চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দিকে 'হোতি' বা 'চোরহোতি'র রাস্তা। আমরা 'হোতি'র রাস্তা দিয়া যাইব বলিয়া টিমর-সিংএ বিশ্রাম করিলাম। এই স্থানে যথেষ্ট কাষ্ঠ ও নিকটে জল পাওয়া যায়। এখানেই ব্রিটিশ রাজ্যের শেষ সীমা। আর পথও নাই; পথিক-দিগের কোনওপ্রকার সুবিধাও নাই। এমন কি, নিকটে কোন গুহাও নাই। পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, "এমন স্থলে আড্ডা হইল কেন?" এ হিমালয়ের পথ। এ পথে যাইতে হইলে প্রায়ই মাঠে পড়িয়া থাকিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে গুহা আছে সত্য, কিন্তু তাহার সংখ্যা অল্প। যেখানে জল ও কাষ্ঠ ও কতকটা সমভূমি আছে, এবং সেই সমভূমিতে প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়, সেই-খানে হিমালয়যাত্রীদের আড্ডা হইয়া থাকে। আড্ডাতে উপস্থিত হইবামাত্র সঙ্গীরা কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিলেন; ঐ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা সমতল-ভূমির তিন দিকে তিনটি অনতিবৃহৎ প্রাচীর উঠাইলেন। সেই প্রাচীরের উপর একটি পাল খাটাইয়া আমাদের থাকিবার স্থান প্রস্তুত হইল। সম্মুখে যাতায়াতের স্থান রহিল; সেই স্থানও কম্বলে আবৃত হইল। এইরূপ আড্ডা প্রস্তুত হইলে পর কেহ কাষ্ঠ আহরণ করিতে গেল; কেহ জল আনিতে গেল। আমি অল্প বিশ্রাম করিয়া এ দিক ও দিক ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে দেখি, আমাদের ন্যায় বহু-সংখ্যক যাত্রী এই স্থানে সমবেত হইয়া আছে। সকলেই 'হোতি'র পথে তিব্বত যাইবে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভুটিয়া; দু' চারিটি অন্যদেশীয় লোক আছে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছা হইলেও আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল না; কারণ, তাহারা সক-লেই আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত। কেহ জল আনিতে যাইতেছে; কেহ বা

কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য ছুটিতেছে; কেহ বা তাম্বু খাটাইতেছে; কেহ কেহ বা বাহনদিগকে উন্মুক্ত করিয়া সম্মুখস্থ প্রান্তরের দিকে যাইবার ইঙ্গিত করিতেছে। আমি এই সব দেখিয়া আশ্রয়স্থানে ফিরিয়া আসিলাম; আসিয়া দেখি, আমাদের আশ্রয়স্থানের সম্মুখে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইয়াছে; অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে ১০।১২ জন লোক বসিয়া অগ্নির উত্তাপ লইতেছে, আর চা প্রস্তুত করিতেছে। আমি আসিয়া তাহাদের পার্শ্বে বসিলাম। কিছুক্ষণ নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর চা পান করিয়া সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল। আমি বাসস্থানে চলিয়া আসিলাম। এই স্থান সমুদ্রতল হইতে ১৪২৫০ ফিট উচ্চ। অতিরিক্ত শীতের জন্য রাত্রিতে নিদ্রা আসিল না; সকলেই অগ্নির সাহায্যে জীবিত রহিলাম মাত্র। আষাঢ়ের একাদশ দিবস এই প্রকারে চলিয়া গেল।

প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই আমাদের যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। অদ্যকার পথ বড় কষ্টের। কাষ্ঠ নাই, জল নাই, বিশ্রামের স্থানটুকুও নাই; আড্ডায় না গেলে বসিয়া হাঁপ ছাড়িবারও উপায় নাই। এত চড়াই যে, দু' পা চলিতে না চলিতেই হাঁপ ধরিয়া যাইবে, আর দুই চার হাত চলিলেই দাঁড়াইয়া দু' চার মিনিট বিশ্রাম করিতে হইবে।—এই সব কথা বলিয়া কেদার সিং আমাকে ঝব্বুতে সোয়ার হইতে অনুরোধ করিল। আমি বলিলাম, "একে আমি হিন্দুর ছেলে, তাহাতে গরু সোয়ার, মনে কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতেছে; যত দূর পারি, চলিতে থাকি; অবশেষে অচল হইলেই গোযানে চলিতে আরম্ভ করিব।" সুতরাং আমি বাহনে আরোহণ না করিয়া পদব্রজেই চলিতে লাগিলাম।

সকলেই ধীরে ধীরে চলিতেছি; সকলেই লাঠি ভর করিয়া বিশ্রাম করিতেছি; ক্লান্তিবশতঃ কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। এইরূপ ভাবে অনুমান বেলা ১১টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত চলিয়া একান্ত ক্লান্ত ও অধীর হইয়া পড়িলাম। অবশেষে 'কালাজাবর' নামক আড্ডাতে উপস্থিত হইলাম। আমার এত পিপাসা পাইয়াছে যে, সেইখানে যাইয়াই প্রস্রবণের দিকে চলিলাম। কেদার সিংহ বলিল, "কোথায় যাইতেছেন ?" আমি বলিলাম, "জল খাইতে যাইতেছি।" সে বলিল, "এখন জল খাইবেন না; এত ঠাণ্ডা জল খাইলে এখনই জ্বর হইবে; আমরা শীঘ্রই চা' প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।" সেখানে কাঠ নাই। পূর্ব্বদিবসের আড্ডা টিমরসিং হইতে কাঠ আনিতে

হইবে। সে এখান হইতে ৩।৪ মাইলের কম হইবে না। এখন কাষ্ঠ পাই কোথায়? এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় সঙ্গীয় লোকেরা অপরের পরিত্যক্ত কাষ্ঠ ঘুঁটে সংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিল ও চাএর জল বসাইয়া দিল। অনুমান এক ঘণ্টার পর চা প্রস্তুত হইল; চার সঙ্গে কিছু ছাতুও পাইলাম। গরম চা দিয়া ছাতু ভিজাইয়া তদ্দ্বারা ক্ষুধার নিবারণ করিলাম। এখন আর ক্ষুধার তত উদ্রেক নাই। পূর্ব্বদিবসের ন্যায় আমার সঙ্গীরা আশ্রয় প্রস্তুত করিয়া দিল। আমি আমার আশ্রয়স্থানে যাইয়া শুইয়া পড়িলাম। ইহা বলা বাহুল্য, শয়ন করিবামাত্র নিদ্রা আসিল, এবং সুদে আসলে কল্যকার রাত্রিজাগরণ শোধ করিলাম। অনুমান পাঁচটার সময় আমার সঙ্গীরা আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিল। আমি উঠিয়া আহার করিলাম। এখন আর শরীরে কোনও ক্লান্তি নাই; শরীর খুব সচ্ছন্দ বোধ হইতে লাগিল।

এখন আমার প্রধান পানীয় চা, প্রধান আহার্য্য ছাতু; চাকেও প্রধান আহার্য্যের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। এই দারুণ শীতে হস্ত পদ অসাড় হইয়া যায়, শ্বাস প্রশ্বাস একান্ত কষ্টকর হইয়া উঠে; এমন সময় উষ্ণ ও তরল পদার্থ অতি উপাদেয় বলিয়া বোধ হয়; ছাতু বা অন্য বস্তু খাইবার ইচ্ছাও হয় না। আবার এই দেশে অন্যরূপে চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাঁচা জলে চা দেয়। সেই চা খুব সিদ্ধ হইলে, তাহার মধ্যে অল্পপরিমাণ লবণ ও মাখন দিয়া মন্থন করে; মন্থন করিয়া আবার গরম করে। এই চাই এ দেশে সুখাদ্য ও সুপেয়। নিম্নদেশীয় চার এখানে।আদর নাই। এদেশীয়েরা ভূটিয়া চাই খাইয়া থাকে। ভূটিয়া চা খুব গরম ও পুষ্টিকর। সে যাহা হউক, অদ্য আমরা ৩।৪ মাইল চলিয়াই 'হোতি' পাসের নীচে বিশ্রাম করিলাম। কল্য 'হোতি' পাস অতিক্রম করিতে হইবে। রাত্রে 'হোতি' পাসের যে বর্ণনা শুনিলাম, তাহাতে মনে ভয়ের উদয় হইল; এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, জীবন যদি যায়, তথাপি ভীত হইব না; কৈলাসপতির দর্শন ও মানসসরোবরে অবগাহন করিবার জন্য যদি প্রাণ যায়, তাহা হইলেও শঙ্কিত ও ভীত হইব না। আর হিমালয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও মুক্ত হইব। আমার ভয় নাই, ভাবনা নাই। আনন্দের সহিত নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। এইরূপে ১২ই আষাঢ় চলিয়া গেল।

ইহার অর্দ্ধ মাইল উর্দ্ধে 'হোতি' নামক এক আড্ডা আছে। এই আড্ডা 'হোতি' পাসের অব্যবহিত নিম্নে। আমরা 'কালাজাবরে' রহিলাম;

আমাদের অনেকগুলি সঙ্গী 'হোতি'তেই আড্ডা করিল। ঐ আড্ডাকে 'হোতি' বা 'চোরহোতি' কহে। 'হোতি' সমুদ্রসমতল হইতে ১৫০০০ ফিট উচ্চ।

অদ্য ১৩ই আষাঢ়। অদ্য আমাদিগকে 'হোতি' পাস অতিক্রম করিতে হইবে। এই পাস জীবনমরণের সন্ধিস্থল। পথ অতি দুর্গম ও তুষারাকীর্ণ। এই পাসের উচ্চ শৃঙ্গ সমুদ্রসমভূমি হইতে ১৮৩০০ ফিট উচ্চ। এই দেশীয় লোকেরা উচ্চ শৃঙ্গকে 'কাঠা' বলে। এই 'কাঠা' অতিক্রম করিবার সময় যদি বাতাস উঠে, তাহা হইলে আরোহীদিগকে উড়াইয়া লইয়া যাইবে। যদি মেঘ হয়, তবে বরফপাতে আরোহীরা চাপা পড়িবে, বাহন ও মেষ ও ছাগের চিহ্ন থাকিবে না। আবার অতিরিক্ত শীতেও বিশেষ ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা। মনুষ্য বা পশু যাহারই পদস্খলন হইবে, তাহারই শরীরের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। রাস্তার ত এই নমুনা, আর অদ্য নয় মাইল না চলিলে বিশ্রামেরও স্থান মিলিবে না। সুতরাং রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতেই সকলকেই উঠিতে হইল। আমাদের দলপতি মহাশয় কেদার সিং চীৎকার করিয়া সকলের নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিল; বলিল, "উঠ, আজ 'কাঠা' পার হইতে হইবে।" সকলেই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। শীঘ্র শীঘ্র আপন আপন প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল। আমার আরোহণের জন্য 'ঝব্বু' প্রস্তুত হইল। আমার ভৃত্যদ্বয় আসিয়া বলিল, "অদ্য আপনাকে পাজামা ও 'লাম' পরিতে হইবে।" তিব্বতদেশীয় জুতার নাম 'লাম'। এই 'লাম' পশমে নির্ম্মিত, হাণ্টিং বুটের অনুরূপ। ইহাতে জুতা ও মোজা উভয়ের কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আমি 'লাম' পরিলাম, পাজামা পরিলাম, এবং অপরাপর গরম পরিচ্ছদ পরিতে ত্রুটি করিলাম না। গরম টুপি দ্বারা মস্তক ও কর্ণ আবৃত করিলাম, খুব কসিয়া পাগড়ী বাঁধিলাম। এইরূপ অদ্ভুত সাজে সাজিয়া 'ঝব্বু'তে আরোহণ করিলাম। আমার ভৃত্য আমার হাতে গোলমরিচ ও মিছ্‌রি দিল, এবং বলিয়া দিল, "যদি ঠাণ্ডা বোধ হয়, এই গোলমরিচ ও মিছ্‌রি মুখে দিবেন।" আমি 'তথাস্তু' বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

অন্যান্য দিন যাত্রার সময় সকলেরই মুখে প্রফুল্লতা থাকে, এবং সকলেই উৎসাহের সহিত চলিতে থাকে। আজ সকলেরই মুখ শুষ্ক, গতি নিরুৎসাহব্যঞ্জক। এই ভাবে আমরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে

লাগিলাম। আমার ঝব্বুর লাগাম খড়্গ সিংহের হাতে রহিল; সে অগ্রে অগ্রে লাগাম ধরিয়া চলিল। পশ্চাতে বিষ্ণুসিং ঝব্বুকে প্রহার করিতে করিতে চলিল। তার পরে কতকগুলি ঝব্বু, পাঁচ ছয়টি চামর, চার পাঁচটি ঘোড়া চলিল। এই সব পশুদের উপর এক এক জন করিয়া সোয়ার ছিল। ইহার পশ্চাতে অনেকগুলি লোক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। আমার অগ্রে কেদারসিং ও আর পাঁচ ছয় জন লোক ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। এই পথটি এমন সঙ্কীর্ণ যে, এক সঙ্গে পাশাপাশি হইয়া দুইটি লোক বা দুইটি পশু যাইতে পারে না; সুতরাং একের অনুসরণ অপরকে করিতে হইল। এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আমরা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। কাহারও মুখে কথাটি নাই, সকলেই সতর্ক ভাবে চলিতে লাগিল। সূর্য্যের উদয় হইল, হিমালয়ের অপূর্ব্ব দৃশ্য সম্মুখে উপস্থিত; কিন্তু তাহা দেখে কে? সকলেই ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ করিতেছে; আর মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছে। এত ক্ষণ আমি বেশ ছিলাম। অতঃপর আমার হস্ত পদ হিম হইতে লাগিল; শ্বাস প্রশ্বাসের গতি অতি মন্দ হইয়া পড়িল। ঝব্বুর পিঠে আর টেঁকা যায় না; কিন্তু কি করি, উপায় নাই। ঝব্বু হইতে অবরোহণ করিবার স্থান নাই; এমন সময় বৃষভরাজের গতিরোধ হইল। বেগতিক দেখিয়া আমার ভৃত্যদ্বয় আমাকে বৃষের পৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া এক পার্শ্বে রাখিল; আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সম্মুখে যাহা দেখিলাম, তাহা বড় ভয়াবহ! যে পথটি ছিল, তাহা বরফপাতে ধ্বসিয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়াই আমার বাহন নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন আমার ভার হইতে মুক্ত হইয়া বাহনবর সোজাসুজি পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিল; অপরাপর যান বাহনও সেই দিকে চলিতে লাগিল। যাত্রীদেরও গতি সেই দিকে। আমি অবশের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার ভৃত্যদ্বয় আমার দুই হস্ত ধরিয়া বলিল, "করেন কি? চলুন, এই স্থান বিশ্রামযোগ্য নহে; বেলা হইলেই বিপদ; এখন বাতাস বা মেঘ উঠিলে আমাদের মধ্যে এক-টিরও জীবনরক্ষা হইবে না।" এই বলিয়া তাহারা আমার দুই বাহু ধরিয়া ঊর্দ্ধে উঠাইতে লাগিল। শাখামৃগ যেমন দুই হস্ত দ্বারা বৃক্ষে আরোহণ করে, আমিও সেইরূপ আমার দুই সঙ্গীর সহায়তায় চলিতে লাগিলাম, এবং পর্ব্বত আরোহণে সক্ষম হইলাম। প্রায় এক ঘণ্টা কাল এইরূপ অবস্থাতে চলিয়া অপেক্ষাকৃত ভাল পথ পাইলাম; অর্থাৎ, এখন অন্যের সাহায্য ভিন্ন চলিতে

সমর্থ হইলাম। এইরূপ ভাবে কিছু ক্ষণ চলিয়া দেখি,—সম্মুখে পর্ব্বতশৃঙ্গ, শৃঙ্গের নিম্নে নীহাররাশি। আমাদিগকে এই তুষারময় স্থান অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গের উপরে উঠিতে হইবে। এই তুষার অতিক্রম করা বড় কঠিন ও মারাত্মক।

এখন আমরা সকলেই অগ্র পশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছি। কেহই যানারোহণে নাই। সকলকেই স্ব স্ব যান পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে চলিতে হইতেছে; যানবাহনেরাও আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। এইরূপে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমরা তুষারের নিকটবর্ত্তী হইলাম। এখানে পথের কোনও চিহ্ন নাই; তুষারপাতে সমস্ত ভূমি অদৃশ্য হইয়াছে; আবার স্থানটি বড়ই পিচ্ছল। এই বরফময় স্থান ভেদ করিয়া এক মাইল না গেলে আবার রাস্তার চিহ্ন পাইব না। এমন সময় কেদার সিং আসিয়া বলিল, "আমাদের অগ্রে ঝব্বু ও চামর যাইবে, পরে আমরা যাইব; আমাদের পরে ভেড়া ও ছাগল যাইবে; কারণ, ঝব্বু ও চামর রাস্তা চেনে, তাহারা নিরাপদ রাস্তা বাছিয়া লইতে পারে। অগ্রে ঝব্বু ও চামর গেলে তাদের পদচিহ্ন পড়িবে; সেই পদচিহ্নে পদনিক্ষেপ করিয়া আমরা নিরাপদে এই দুর্গম স্থান অতিক্রম করিব।" কার্য্যতঃ তাহাই হইল। আমরা নিরাপদে এই স্থান অতিক্রম করিয়া পথে আসিয়া পড়িলাম। এখন আর তত ভয় নাই। নির্ভয়ে কথা-বার্ত্তা কহিতে কহিতে অনুমান বেলা ১১টার সময় আমরা পর্ব্বতশিখরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এই শিখরপ্রদেশ সমুদ্রসমতল হইতে ১৮৩০০ ফিট উচ্চ। এখন সকলেরই মুখে হাসি দেখা গেল। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে স্ব স্ব ইষ্টদেবতার নাম স্মরণপূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "আর ভয় নাই 'কাঠা' পার হইয়াছি।"

এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য কবিকল্পনার অতীত। চারি দিকে হিমালয়ের অত্যুচ্চ তুষার-ধবল শৃঙ্গমালা স্তম্ভস্বরূপে বিরাজমান; উপরে নীল আকাশের নীল চন্দ্রাতপ, যেন পরিশ্রান্ত পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। নির্ম্মল ও প্রশস্ত প্রস্তরগুলি যেন মণ্ডপমধ্যস্থ আসনরূপে কল্পিত হইয়াছে; অদূরে গিরিনদী স্নিগ্ধ মধুর ধ্বনিতে পরিশ্রান্ত পথিকদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছে; নানাজাতীয় পার্ব্বতীয় বিহঙ্গকুল অমিয়মধুর কূজনে ক্লান্ত পথিকদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছে। আমি এক জন পরিশ্রান্ত পথিক। প্রকৃতির সাদর অভ্যর্থনা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সেই স্থানে বসিয়া

পড়িলাম। আমার সঙ্গীরাও সেই স্থানে বিশ্রামার্থ বসিল। এখন সমুদিত সূর্য্যের উত্তাপে শীত উপশমিত হইয়াছে ; আকাশে মেঘের রেখামাত্র নাই ; চারি দিকে তুষারময় পর্ব্বতগুলি সূর্য্যের কিরণস্পর্শে সুবর্ণপর্ব্বত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে ; নির্ম্মল ও নীল আকাশ যেন সুবর্ণবৎ হিমশৃঙ্গগুলিকে গাঢ় আলিঙ্গনের জন্য মেঘাবরণ হইতে বিশাল বক্ষঃস্থল উন্মুক্ত করিয়া পর্ব্বতাঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়াছে। আমি এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে হিমালয়ের অসীম শোভার মধ্যে আত্মহারা হইয়া গেলাম। আমার সঙ্গীরা আর থাকিতে পারিল না। এক জন আমার হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়া বলিল, "এখানে আর বসিলে চলিবে না ; এই পর্ব্বতে কাষ্ঠ তৃণ জল কিছুই নাই ; আর চার মাইল না গেলে কাষ্ঠ মিলিবে না, চা'ও প্রস্তুত হইবে না। চা পান ও আহার না করিলে প্রাণ যাবে যে ! চলুন, এখন হইতে 'ওতরাই' ; অদ্যকার 'ওতরাই' চড়াই'অপেক্ষা কষ্টকর।" আমি তাহাদের তাড়নায় উঠিয়া পড়িলাম। তাহারা অগ্রে অগ্রে চলিল। আমি তাহাদের অনুসরণ করিলাম। কিছু দূর যাইয়া দেখি, আমাকে আকাশ হইতে পাতালে নামিতে হইবে। গো অশ্ব মেষ ছাগের দল অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। অনেক যাত্রীও অগ্রে গিয়াছে। তাহারা পিপীলিকার দলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। আমি ধীরে ধীরে নিম্নে অবরোহণ করিতে লাগিলাম। মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ। সে পথও গো ও মনুষ্যাদির পদচিহ্নেই পথ বলিয়া জানা যাইতেছে। দক্ষিণে অভ্রভেদী পর্ব্বত, বামে বরফাবৃত অসম স্থান ; এই স্থান এত ঢালু ও পিচ্ছল যে, অন্যের সাহায্য ভিন্ন চলা যায় না। আমার বাম হস্তে দীর্ঘ যষ্টি। এই দীর্ঘ যষ্টি বরফের মধ্যে চালাইয়া দিতেছি, আর তাহার উপর নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছি। কিছু ক্ষণ যাইয়া দেখি, বরফের মধ্যে আমার পা বসিয়া যাইতেছে। যেমন দেশে কাদার মধ্যে পা বসিয়া গেলে চলা ফেরা কষ্টকর, এখানেও ততোধিক কষ্ট হইতেছে। বরফের মধ্যে চলিতে চলিতে শীতে পা অসাড় হইয়া গেল, আর বরফের ভিতর হইতে পা উঠাইতে পারিতেছি না। এমন সময় দেখি, আমার সম্মুখ হইতে একটি অশ্ব পদস্খলিত হইয়া নিম্নে গড়াইয়া যাইতেছে। তাহার পালকও তাহার সঙ্গে যাইতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে পালক ও অশ্ব অদৃশ্য হইয়া গেল ! ইহার পর তাহাদের কোনও সংবাদ পাইলাম না। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে

হইবে, তথাপি জীবনের আশা ছাড়িতে পারিলাম না; ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। এমন সময়ে আমার পদ স্খলিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক জন সহযাত্রী আমার হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইল। আমার বাহনেরও পদস্খলন হইয়াছিল, সেও এ যাত্রা প্রাণে রক্ষা পাইল। অনুমান বেলা ১২ টার সময় আমরা সকলে বরফময় স্থান অতিক্রম করিয়া নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখন জীবনের আশা হইল। কিন্তু ক্ষুধা ও পিপাসায় এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, এক পদ চলিবার শক্তি নাই। সম্মুখে যথেষ্ট জল, কিন্তু বরফের মত শীতল, পান করিবার সাধ্য নাই। এই পর্ব্বতে কাষ্ঠের লেশমাত্র নাই যে, চা প্রস্তুত করিয়া পিপাসানিবারণ করিব। আর দুই মাইল না গেলে কাষ্ঠ পাইব না, সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া 'ঝব্বু'তে আরোহণ করিতে হইল। হিন্দুর পক্ষে গোপৃষ্ঠে আরোহণ কত দূর কষ্টকর ও হৃদয়বিদারক, তাহা হিন্দুমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। তবে কি না, "যস্মিন্ দেশে যদাচারং পারং পার্য্যং বিধীয়তে।" শাস্ত্রীয় এই বাক্যের অনুসরণ করিয়া পুনর্ব্বার গো-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম।

এইরূপে এক মাইল পথ অতিক্রম করিলাম। এই এক মাইল কতক চড়াই কতক নাবাই, তার পর একেবারেই নাবাই, সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাকে যান পরিত্যাগ করিতে হইল। অতিরিক্ত পরিশ্রম, ক্ষুধা ও পিপাসায় এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আর পা উঠে না। কাঠের প্রাণ যায়ও না। প্রাণের দায়ে অতিকষ্টে চলিতে লাগিলাম। কিছু দূরে যাইয়া দেখি, পথিপার্শ্বে কতকগুলি বণিক বসিয়া আছে। আমি তাহাদের কাছে বসিয়া পড়িলাম। তাহাদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ অতি যত্নের সহিত আমাকে বসিবার আসন দিল ও অবিলম্বে গরম চা পান করিতে দিল; পরে আহারার্থ ছাতু ও গুড় দিল। পান ও ভোজন পাইয়া আমার দেহে জীবন আসিল। বিশ্রামান্তে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইহারাও তিব্বতযাত্রী। ইহারা এক দিন পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছে। অদ্য এইখানে বিশ্রাম করিবে; কল্য প্রত্যূষে 'হোতি'র পথে 'দ্বাপা' যাইবে। এই স্থান হইতে আমাদের আজিকার আড্ডা 'ঝংথিং' অর্দ্ধ মাইল। আমার সহযাত্রীরা আমার অগ্রে চলিয়া গিয়াছে। আমার জিনিসপত্র লইয়া এক জন ভৃত্য অগ্রে গিয়াছে। অপর এক জন আমার সঙ্গে আছে। আমি ভৃত্যের সাহায্যে অতিকষ্টে অনুমান বেলা দুইটার সময় আমাদের অদ্যকার আড্ডা

'ঝংখিং'এ উপস্থিত হইলাম। অদ্য এখানে আমাদিগকে থাকিতে হইবে। আমাদের আড্ডা একটি ছোটখাট পর্ব্বতগহ্বরের মধ্যে। এই গহ্বরের প্রায় এক মাইল দূরে একটি নদী। সেই নদীর উভয় পার্শ্বে ঘাস ও যথেষ্ট কাষ্ঠ পাওয়া যায়। আমি আড্ডায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমার ভৃত্য আমার জন্য খাদ্য ও চা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং ভারবাহী পশুদিগকে আহারার্থ ছাড়িয়া দিয়াছিল। আমি আড্ডায় আসিয়াই আহারান্তে শয়ন করিলাম। আর উঠিবার শক্তি রহিল না। এখানে ৮।১০টি তাম্বু পড়িয়াছে,— ইহার মধ্যে প্রায় এক শত লোক। তাম্বুর বাহিরেও লোক ছিল। এই সকল লোকের সঙ্গে দুই সহস্রেরও অধিক ভারবাহী ছাগ ও মেষ এবং অনেকগুলি চামর, 'ঝব্বু' ও অশ্ব ছিল।

অদ্য আমাদিগকে আর অধিক যাইতে হইবে না। তিন মাইল যাইয়াই আড্ডা পাইব। সুতরাং তাড়াতাড়ির কোনও প্রয়োজন হইল না। ধীরে ধীরে সমস্ত আয়োজন করিয়া সূর্য্যোদয়ের পর যাত্রা করিলাম। কিছু দূর যাইয়াই 'হোতি' পুলিস ষ্টেশনের বাম দিক দিয়া অধিকাংশ যাত্রী 'দ্বাপা' অভিমুখে চলিয়া গেল। আমরা অল্পসংখ্যক যাত্রী 'হোতি' পুলিস ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকের নদী পার হইয়া 'হোতি'তে আড্ডা করিলাম। অদ্য আমাদের আড্ডায় ৫।৬টি তাম্বু পড়িল। আমি কেদার সিংহের তাম্বুতে আশ্রয় লইলাম। এই যাত্রীদিগের মধ্যে অধিকাংশই বণিক ও সীমান্তবাসী, এবং ইংরাজরাজের প্রজা। আমরা যে পথ দিয়া যাইতেছি, সেই পথ দিয়া যাহারা তিব্বতে যায়, তাহাদের বাণিজ্যস্থান বা 'মণ্ডি' 'দ্বাপা' ও 'শিবচিলুম'। 'হোতি' হইতে 'দ্বাপা' যাইবার যে পথ আছে, তাহাতে দুই তিন দিবসের মধ্যে 'দ্বাপায়' যাওয়া যায়। আমরা যতগুলি লোক প্রান্তসীমায় মিলিত হইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই 'দ্বাপা'র পথে চলিয়া গেল। এখন আমরা অল্পসংখ্যক লোকই রহিলাম। ইহার মধ্যে 'মরগাঁও'এর ব্যাপারীগণই প্রধান। 'মরগাঁও'এর ব্যাপারীগণ 'শিবচিলুম' যাইবে। 'শিবচিলুম' মণ্ডির প্রধান আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কেদার সিং। কেদারসিংহের দল, আমার দুই জন দোভাষী ভৃত্য, এক জন সাধু ও আমি, আমরা 'হোতি'তে রহিলাম। 'হোতি'তে একটি পুলিশের আড্ডা আছে। আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত এই পথ খোলা থাকে। পুলিসও আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক

পুলিসের প্রধান কর্ত্তার নাম 'সড়জি'। এই 'সড়জির' আদেশ ভিন্ন এই পথ দিয়া কোনও ব্যবসায়ী তিব্বতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আবার যাহারা 'নিতি' পাসের লোক,তাহারাই এই ঘাটাতে তিব্বতে প্রবেশ করিতে পারিবে, অপরদেশীয় লোকদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ। পূর্ব্বে সাধুরা অনায়াসে সকল ঘাটা দিয়াই তিব্বতের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিতে পারিতেন, এখন আর তাহার উপায় নাই। সাধুদিগকে জামিন দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিতে হইবে। অপরের পক্ষে তিব্বত যাইবার আদেশ নাই। যদি ইংরাজরাজের কোনও অনুচর সাধুর ছদ্মবেশে তিব্বতে প্রবেশ করে, তাহা নিবারণের জন্যই এই জামিনের সৃষ্টি এবং সাধুদের প্রতি 'হোতি' পুলিসের বিশেষ দৃষ্টি। আমি 'হোতি'তে আসিবার পূর্ব্বেই, পুলিসের লোকদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল ;—"এই রাস্তা দিয়া এক জন সাধু আসিতেছেন।" আমরা যেখানে আড্ডা করিয়াছি, এ স্থান হইতে পুলিসের আড্ডা প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে। আমাদের আড্ডা ঠিক হইতে না হইতেই 'হোতি'র পুলিস আসিয়া হাজির! কেদার সিং আর অন্যান্য লোক তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ ভোজন দিয়া বিদায় করিয়া দিল, এবং বলিয়া দিল, "আমরা অদ্য এখানে থাকিব ; আহারান্তে আমরা পুলিসে যাইতেছি ; তথায় যাইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিব।" এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল। তখনই কেদার সিংকে বলিলাম, "এই পুলিসের নিকট হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি ?" সে বলিল, "বাবা ভয় কি ? যেমন করিয়াই হউক, আমি আপনাকে পুলিসের নিকট হইতে তিব্বত-ভ্রমণের অনুমতি লইয়া দিব।" অনুমান বেলা ১১ টার সময় কেদার সিং পুলিস ষ্টেশনে চলিয়া গেল, এবং অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিল। আমি এতক্ষণ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভাবিতেছিলাম। তাহাকে দেখিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "খবর কি ?" সে বলিল, "খবর ভাল ; আমি আপনার জামিন হইয়াছি ; পুলিস আপনাকে তিব্বতে যাইবার অনুমতি দিয়াছে ; এখন আপনি অবাধে মানসসরোবর ও কৈলাস প্রভৃতি তীর্থে যাইতে পারিবেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি সর্ত্তে জামিন হইয়াছ, এবং জামিনের প্রণালীই বা কি ?" কেদার সিং উত্তর করিল,"আড়াই সের ওজনের এক খণ্ড প্রস্তর সমভাগে ভাগ করিয়া উভয় ভাগ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করা হইয়াছে ; তাহাতে শীলমোহর করিয়া সেই সেই প্রস্তরখণ্ডে এইরূপ

লিখিয়া দিয়াছি যে, যদি এই সাধু ইংরাজের ছদ্মবেশী চর বা কম্পাসওয়ালা বলিয়া তিব্বতের কোনও স্থানে ধৃত হন, তাহা হইলে ঐ প্রস্তরের ওজনের অর্দ্ধপরিমাণ স্বর্ণ দিব; অথবা রাজা ইচ্ছা করিলে জীবনও লইতে পারেন। আর আপনাকে ফিরিবার সময় 'ধাপা' হইয়া যাইতে হইবে। আমি এই মর্ম্মে চুক্তিপত্র লিখিয়া আপনার জামিন হইয়াছি।" আমি কেদার সিংকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলাম, "তুমি আমাকে মানস সরোবর ও কৈলাস প্রভৃতি দর্শন করাইলে! কেবল তোমার জন্যই আমি তিব্বতপ্রবেশের অধিকার পাইলাম। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছুই ইহার প্রতিদান নাই।" এই দিবস আমরা তিন মাইল মাত্র পথ চলিয়াছি; কোনও ক্লেশ পাই নাই; মহানন্দে দিন কাটাইলাম।

'হোতি' সমুদ্রসমতল হইতে ১৫০০০ ফিট উচ্চ। এখানে অত্যধিক শীত। অগ্নির সাহায্য ভিন্ন থাকা যায় না। অগ্নির সাহায্যে কোনও প্রকারে রাত্রি কাটাইলাম। এই প্রকারে আষাঢ়ের চতুর্দ্দশ দিবস অতিবাহিত করিলাম।

শ্রীরামানন্দ ভারতী।

হুমায়ূন ও শেরশাহ।

৩

বর্ষাকাল সমাগত হইলে মোগলসৈন্য বঙ্গদেশের জলবায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। তদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক অশ্ব ও উষ্ট্র মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই দুর্দ্দশার সময় বাদশাহ অবগত হইলেন যে, শাহজাদা হিন্দাল কলহপ্রিয় অমাত্যগণের পরামর্শে বিদ্রোহী হইয়া প্রভুভক্ত রাজপুরুষগণকে হত্যা করিয়া স্বনামে খোতবা প্রচারিত করিয়াছেন, এবং কামরান সসৈন্যে আগ্রার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ভ্রাতৃগণের বিদ্রোহের সংবাদ শ্রবণ করিয়া চিন্তাকুল হইলেন, এবং জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাঙ্গলার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শের খাঁ দেখিতে পাইলেন যে, মোগলসৈন্য অনবরত রোগভোগ করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, এবং বাদশাহ নিজেও হিন্দালের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য রাজধানীতে প্রতিগমন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। ইহাই উপযুক্ত সুযোগ মনে করিয়া তিনি হুমায়ুনের গতিরোধ করিবার জন্য রোটাস দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন।

শের চৌসা নামক স্থানে উপনীত হইয়া মোগলসৈন্যের গতিরোধ করিলেন। তাহারা তথায় তিন মাস কাল প্রতীক্ষা করিল। অবশেষে শের সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। হুমায়ুন আগ্রা-গমনের জন্য ব্যগ্র ছিলেন বলিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। শের কোরাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সম্রাটের নামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত রাখিয়া কেবলমাত্র বঙ্গদেশ ও বিহার শাসন করিবেন, কোনও মোগলের অধিকৃত স্থান স্বাধিকারভুক্ত করিবেন না। মোগলসৈন্য শেরের অঙ্গীকারবাক্যে আস্থাস্থাপন করিয়া অসতর্ক হইলে তিনি তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। (১) তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবারও অবকাশ পাইল না। হুমায়ুন গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য যে সকল নৌকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আফগান

---

(১) এই বিশ্বাসঘাতকতা-ব্যাপারে আত্মদোষক্ষালনের জন্য শের খাঁ যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা এখানে তাহা তারিখ-ই-শেরশাহী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি বাদশাহের নিকট শান্তিসংস্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি তাঁহার যত উপকার করিয়াছি, তাহাতে কিছুমাত্রও ফলোদয় হয় নাই। আমার সাহায্যেই তিনি জৌনপুরাধিপতি সুলতান মামুদকে সমূলে উচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি আমাকে চূণার দুর্গ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন। গুজরাট যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতেই তিনি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। তিনি গুজরাটে গমন করিলে আমি মোগল অধিকারে হস্তক্ষেপ করি নাই। কিন্তু তিনি গুজরাট হইতে প্রত্যাগত হইয়াই আমার অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি বঙ্গদেশে আধিপত্যস্থাপন করিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে সদ্ভাবে অবস্থান করিবার আশা নাই দেখিয়াই আমি তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতেছি। যদি আমি এখন তাঁহার সহিত শান্তিস্থাপন করি, তবে তাহা কত কাল অব্যাহত থাকিবে? তদীয় ভ্রাতৃগণ আগ্রাতে বিদ্রোহ উপস্থিত করাতে এবং মোগলসৈন্য রোগাক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বল হওয়াতেই তিনি আমার সহিত সন্ধিস্থাপনের অভিলাষী হইয়াছেন। কিন্তু আগ্রার বিদ্রোহ দমিত ও উপযুক্তসংখ্যক সৈন্য সংগৃহীত হইলেই তিনি আমাকে সমূলে বিনষ্ট করিতে নিশ্চিতই যত্ন করিবেন।"

সেনা তাহার অধিকাংশ হস্তগত করিল। বাদশাহ পাত্রমিত্র সহ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইলেন। বিংশ সহস্র সৈন্য নদীগর্ব্ভে নিমজ্জিত হইল। বাদশাহ স্বয়ং নদীগর্ব্ভে নিমজ্জিত হইয়াও জনৈক ভিস্তিওয়ালার সাহায্যে জীবনরক্ষা করিলেন। (১) অতঃপর হুমায়ূন হতাবশিষ্ট সৈন্য সহ ভগ্নহৃদয়ে আগ্রার অভিমুখে গমন করিলেন। (২)

৪

শের খাঁ মোগলসৈন্য পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপনীত হইয়া জাহাঙ্গীর কুলি বেগকে শিবিরে আহ্বান করিয়া পাত্র-মিত্রসহ বধ করিলেন। তদনন্তর তিনি স্বনামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত করিয়া বাঙ্গলা ও বিহার শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শাহ উপাধি ধারণ করিলেন।

শাহজাদা কামরান মোগলসৈন্যের পরাজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া আল-ওয়ার হইতে অগৌণে আগ্রাতে উপনীত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, আফগান ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করিয়া মোগলসাম্রাজ্য গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। তিনি হুমায়ূনের সঙ্গে যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া আফগানশক্তির বিলোপসাধনের জন্য সাধ্যানুসারে

---

(১) স্কাইন বলেন যে, এই ভিস্তিওয়ালা পুরস্কারপ্রার্থী হইয়া দিল্লীতে উপনীত হইলে হুমায়ুন তাহাকে বার ঘণ্টার (কাহার কাহার মতে দুই ঘণ্টা) জন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া পুরস্কৃত করেন। ভিস্তিওয়ালা এই অল্প সময়ের জন্য সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া নিজের ও আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণের সুবন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল।

(২) এই যুদ্ধোপলক্ষে শের খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন; কিন্তু পক্ষান্তরে তিনি মহানুভবতার পরিচয়ও প্রদান করেন। মোগলসৈন্য বিধ্বস্ত হইলে এবং বাদশাহ পলায়ন করিলে মোগলমহিষী ও বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্তমহিলা পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বহির্গত হন। শের খাঁ তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া যথোচিত সম্মানপ্রদর্শন ও সান্ত্বনাপ্রদান করেন। তাহার পর তিনি মোগলরমণী, শিশু অথবা ক্রীতদাসকে এক রাত্রির জন্যও অবরুদ্ধ না রাখিয়া মোগল মহিষীর পটাবাসে প্রেরণ করিতে আদেশ দেন। সেনানায়কগণ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া প্রত্যেককে আহার্য্য প্রদান করেন। ইহার পর কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে হুমায়ুনের মহিষী হোসেন খাঁ নিরাকরের তত্ত্বাবধানে রোটাস দুর্গে প্রেরিত হন, এবং অন্যান্য মোগলমহিলা শের খাঁর অর্থসাহায্যে আগ্রাতে গমন করেন। মোগলমহিষী কি জন্য রোটাস দুর্গে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই।

যত্ন করিতে মনন করিলেন। যে সকল মোগল ওমরাহ বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারাও আফগানহস্তে মোগলসৈন্যের পরাভবসংবাদ শ্রুত হইয়া, শত্রুনাশ করিয়া মোগলসাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, নানা স্থান হইতে রাজধানীতে সমবেত হইতে লাগিলেন। ভ্রাতৃত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া আফগানশক্তিবিনাশের উপায় উদ্ভাবনের জন্য প্রত্যহ পরামর্শ করিতেছিলেন। কিন্তু পরস্পর মিলিত হইবার জন্য কামরানের তাদৃশ আগ্রহ ছিল না বলিয়া তাহাতে কোনও ফললাভ হইল না। এই ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে কামরান লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। অনর্থক বাকবিতণ্ডায় অর্দ্ধ বৎসর কাল অতিবাহিত হইবার পর কামরান সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন, এবং বিষপ্রয়োগে রোগগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া হুমায়ুনের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি দুর্ভাগ্য ভ্রাতার সাহায্যব্যপদেশে এক সহস্র সৈন্য আগ্রাতে রাখিয়া লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই ঘটনায় নগরবাসিগণ যুদ্ধফল প্রতিকূল হইবে আশঙ্কা করিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল, এবং কামরানের প্ররোচনায় অনেকে তাঁহার সহযাত্রী হইল। বস্তুতঃ কামরানের আগ্রা-পরিত্যাগ শের-শাহের হস্তে মোগলশক্তিবিনাশের একটি প্রধান কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

হুমায়ুন শত্রুর বিনাশের জন্য ভ্রাতৃগণ সহ অনর্থক বাকবিতণ্ডায় কালযাপন করিতেছিলেন। অপর পক্ষে শের শাহ বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-প্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মোগলসাম্রাজ্য অধিকার করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিলেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে শের শাহ বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং গঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিলেন। বাদশাহ এই সংবাদ অবগত হইয়া শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য সেনাপতি হোসেনকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। কাল্পীর নিকট উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইল। আফগান সৈন্যের কিয়দংশ পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল, এবং শের শাহের পুত্র কুতুব যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। মোগল সেনানায়কগণ শেরের বিষদন্ত ভগ্ন করিয়া গৌরবভাজন হইবার জন্য হুমায়ুনকে আহ্বান করিলেন।

তদনুসারে হুমায়ুন এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে আগ্রা

পরিত্যাগ করিলেন, এবং কনোজের নিকটে গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া আফগান সৈন্যের সমীপবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু উভয় পক্ষই প্রথমে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এই ভাবে এক মাস অতিবাহিত হইলে বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন সেনাপতি সুলতান মীরজা মহম্মদ সসৈন্যে শত্রুর সহিত মিলিত হইল। তাহার অনুসরণ করিয়া আর কতিপয় সেনানায়ক শত্রুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। বাদশাহের বিপদের অবধি রহিল না। ইহাতেও দুর্দ্দশার একশেষ হয় নাই বলিয়াই যেন বর্ষাকাল সমাগত হইল। তাঁহার শিবির জলমগ্ন হইয়া গেল। এই সকল কারণে তিনি আর বিলম্ব না করিয়া শের শাহের সৈন্য আক্রমণ করিলেন। মোগল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গঙ্গাগর্ভে বিতাড়িত হইল। হুমায়ূনের অশ্ব আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল ; যদি তিনি সৌভাগ্যক্রমে একটি হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শত্রুহস্তে পতিত হইতেন। বাদশাহ বহু কষ্টে অপর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদ হইলেন।

এই সময় হিন্দাল ও মিরজা আস্করী আসিয়া বাদশাহের সঙ্গে মিলিত হইলেন। হুমায়ূন পূর্ব্ববর্ত্তী মোসলমান অধিপতিগণের পথানুসরণ করিয়াই শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, কোন অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়া প্রজাসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। তিনি নিজে এক জন কোমলহৃদয় প্রজাহিতৈষী শাসনকর্ত্তা ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার শাসন-পদ্ধতি উৎকৃষ্ট ছিল না ; তাঁহার ক্ষমতা দর্শন করিয়াও প্রজাসাধারণ মুগ্ধ হয় নাই। এ জন্য তিনি কাহারও অনুরাগ অথবা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। আফগান রাজ্য হিন্দুস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাতে বিদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিবারও সুবিধা ছিল না। সুতরাং হুমায়ূন শত্রু কর্তৃক পরাজিত হইয়া আগ্রাতে গমন পূর্ব্বক শের শাহের গতিরোধের কোন উপায়বিধান করিতে পারিলেন না। তিনি নিরুপায় হইয়া আগ্রা পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে কামরান আপন অবিমৃষ্যকারিতার ফল বুঝিতে পারিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সৌভাগ্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতেই মোগল সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া গেল। সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কামরান এই নীতি অবলম্বন করিয়া কাবুল ও কান্দাহার রক্ষার জন্য পঞ্জাব প্রদেশ শের শাহকে অর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিলেন। ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

৫

হুমায়ূন শের শাহের বিনাশসাধন করিবার উপযোগী বল সংগ্রহ করিতে না পারিয়া আগ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে হুমায়ূনের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। সে করুণকাহিনী পাঠ করিতে করিতে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া পৃথিবীর অনেক নরপতিই পথের ভিখারী হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন; কিন্তু ঈদৃশ মর্ম্মান্তিক বৃত্তান্ত সমগ্র ইতিহাসেও দুর্ল্লভ। অন্তরঙ্গ ও আশ্রিত ব্যক্তিগণ পূর্ব্ব ঋণ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে অনাদরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তিনি যে সকল ক্ষুদ্র রাজার শরণাপন্ন হন, তাঁহারা তাঁহাকে অপমানিত করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কেবলমাত্র কতিপয় অনুরক্ত অনুচর ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার সহিত দুর্ব্যবহার করিল। (১)

হুমায়ূন অকূল সমুদ্রে তৃণের ন্যায় ভাসমান হইতেছিলেন; এমন সময় যোধপুরের রাণা মালবদেব তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে হুমায়ূন তদীয় রাজ্যের প্রান্তদেশে উপনীত হইয়া দূত প্রেরণ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। বিপন্ন নরপতির উদ্ধারসাধনের জন্য অতি অল্প লোকই অঙ্গীকারবাক্য প্রতিপালন করিয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। মালবদেব বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, হুমায়ূনকে প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি সে অবমাননার প্রতিশোধ লইতে পারিবেন না; পক্ষান্তরে তাঁহাকে বন্দী করিয়া শের শাহের হস্তে সমর্পণ করিলে রাজদরবারে প্রতিষ্ঠালাভ হইবে। এই সব কারণে রাজা তাঁহাকে বন্দী করাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। হুমায়ূন দৈবাৎ এই দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে অমরকোট অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

পথিমধ্যে হুমায়ূনকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অশ্ব শ্রান্ত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিলে তিনি তারদি বেগ নামক জনৈক

---

(১) হুমায়ূন বাদশাহ শের শাহ কর্তৃক পরাজিত হইলে মীরজা আস্করী ও হিন্দাল তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সামন্তের নিকট একটি অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণচিত্ত ছিল, বাদশাহের প্রভাবও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল; এ জন্য রাজার অনুরোধ উপেক্ষিত হইল। হুমায়ুন অগত্যা উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে এক ব্যক্তি আপন মাতাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করাইয়া সেই অশ্ব বাদশাহকে প্রদান করিল।

হুমায়ুন অনুচরগণ সহ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইতেছিলেন। অচিরে প্রবল জলকষ্ট উপস্থিত হইল। কেহ বা জলের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল, কেহ বা জলতৃষ্ণা সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল; তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিগণের চীৎকার ও কাতরোক্তিতে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইতে লাগিল। এমন সময় শত্রুসৈন্যের আগমনসংবাদ প্রচারিত হইল; বাদশাহ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শত্রুসৈন্য তখনও দূরে ছিল বলিয়া মোগলগণ রক্ষা পাইল। অবশেষে বাদশাহ একটি জলপূর্ণ কূপের পার্শ্বে উপনীত হইলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তাহার পর তিনি সমস্ত চর্ম্মপাত্র জলপূর্ণ করিয়া যে সকল তৃষ্ণাতুর অনুচর পশ্চাতে আসিতেছিল, তাহাদের প্রবল তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। (১)

পরদিবস প্রাতঃকালে মোগলগণ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। আবার জলকষ্ট উপস্থিত হইল। এবার তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক কাতর হইয়া পড়িল। দুই দিন পর্য্যন্ত একবিন্দু জলও কেহ পান করিতে পাইল না। (২) চতুর্থ দিবসে তাহারা একটি জলপূর্ণ

(১) হুমায়ুনের অনুচরগণের মধ্যে এক জন ধনাঢ্য বণিক ছিলেন। তিনি তৃষ্ণায় একান্ত কাতর হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহার উত্থানশক্তি ছিল না। তদীয় পুত্র পিতার জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া ব্যথিতচিত্তে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। বাদশাহ স্বয়ং জলপানে পরিতৃপ্ত হইয়া অনুচরগণকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য পশ্চাৎগামী হইয়া পথিপার্শ্বে বণিককে ভূলুণ্ঠিত দেখিতে পান। বাদশাহ তাঁহার নিকট অনেক টাকা ঋণ লইয়াছিলেন। বাদশাহ এই সুযোগে ঋণমুক্ত হইবার আশায় বলেন, "যদি তুমি আমাকে ঋণমুক্ত কর, তবে তোমার যত জলের প্রয়োজন, তাহা তোমাকে দিতে পারি।" বণিক প্রত্যুত্তরে বলেন, "বর্ত্তমান অবস্থায় এক গ্রাস জল পৃথিবীর সমস্ত ধনরাশি অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। অতএব আমি জাঁহাপনার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।"

(২) এই সময় একদা রাত্রিকালে হুমায়ুন অনুচরদিগকে পটগৃহ ও অশ্বগুলির চারিদিকে উষ্ট্র দ্বারা চক্র স্থাপন করিয়া সতর্কভাবে রাত্রিযাপন করিবার আদেশ দেন। তিনি

কূপের নিকট উপনীত হইল। কূপ অত্যন্ত গভীর; জল তুলিবার ভাণ্ডও তাহাদের একটির অধিক ছিল না। এ জন্য জল তুলিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছিল। সকলেই সর্ব্বাগ্রে জলপান করিবার জন্য ব্যগ্র। এ জন্য হুমায়ূন কূপপার্শ্বে জনতার নিরারণ করিবার কল্পনায় তাহাদিগকে দূরে অবস্থান করিতে আদেশ করিয়া নির্দ্দেশ করিলেন যে, জল উত্তোলিত হইলে ঢক্কা নিনাদিত হইবে, এবং তদনুসারে মোগলগণ পালাক্রমে কূপের নিকট উপনীত হইয়া জলপান করিবে। কিন্তু তাহারা তৃষ্ণায় এত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল যে, জল উত্তোলিত হইতে না হইতেই একবারে ১০।১২ জন কূপপার্শ্বে দলবদ্ধ হইল, এবং তাহাদের আগ্রহাতিশয্যে দড়ি ছিঁড়িয়া ভাণ্ড কূপগর্ত্তে পড়িয়া গেল, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন তৃষ্ণাতুরও কূপসাৎ হইল। এই দুর্ঘটনায় মোগলের আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক শব্দায়মান হইয়া উঠিল। কেহ কেহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া উত্তপ্ত বালুকার উপরে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। আর যাহারা কূপগর্ত্তে পতিত হইয়াছিল, মৃত্যু আসিয়া তাহাদের সকল যন্ত্রণার অবসান করিল। দুর্ভাগা হুমায়ূন আপনার বিশ্বস্ত অনুচরদিগকে এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া একান্ত ব্যথিত হইলেন। পরদিন তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে উপনীত হইলেন। কিন্তু এখানেও তাঁহাদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। ভারবাহী উষ্ট্রগুলি উপর্য্যুপরি কয়েক দিন জলপান করিতে না পাইয়া একান্ত তৃষ্ণাতুর হইয়াছিল; তাহাদের অধিকাংশই অতিরিক্তমাত্রায় জলপান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মোগলগণও জলপান করিয়া বক্ষে যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল, এবং তাহাতেই অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে অনেকের মৃত্যু হইল। এই অভাবনীয় দুর্ঘটনার পর কেবলমাত্র সাত জন অনুচর সহ বাদশাহ অমরকোটে উপনীত হইলেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

নিজেও সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া চক্রের চারি দিকে পাহারা দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; কিন্তু প্রভুভক্ত শেখ আলী সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহার অনুরোধে তিনি পটগৃহে বিশ্রামার্থ শয়ন করেন। তিনি নিদ্রাভিভূত, এমন সময় এক জন তস্কর তথায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হয়। এ জন্য নরাধম বাদশাহের উপাধানের নিম্ন হইতে তরবারি বাহির করিয়া কোষ হইতে অর্দ্ধেক উন্মুক্ত করিয়াছিল; হঠাৎ ভয় পাইয়া সে আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন না করিয়াই প্রস্থান করে।

ভ্রান্তি।

১

কমল পতির গৃহে আসিবে যখন,
সখীগণ কর্ণমূলে করিল গুঞ্জন—
সহস্র আশার কথা;—নূতন জীবনে
রমণী কি লাভ করে, বিকাশে কেমনে
পতির আদরে আর পতির সোহাগে
নারী-হৃদি-রক্তোৎপল অরুণের রাগে।
আপনার অভিজ্ঞতা অলঙ্কৃত করি'
কহিল সখীর কর্ণে যত সহচরী।
সহস্র অভুক্ত-আশা-চঞ্চল হৃদয়ে—
যুবতী আসিল তা'র পতির আলয়ে।

আসিয়া পতির গৃহে দেখিল কমল,
সহস্র আশার আশা একান্ত নিষ্ফল;
প্রফুল্ল কুসুমবনে ভ্রমরের মত
জীবনদেবতা তা'র নিমগ্ন নিয়ত
সহস্র গ্রন্থের মাঝে,—দীর্ঘ দিন যায়
গ্রন্থের রহস্যভেদে,—সুদীর্ঘ নিশায়
প্রদীপসম্মুখে বসি' একান্ত তন্ময়
জটিলে সরল করি করিতে সঞ্চয়
জ্ঞানকল্পতরু-ফল; রত অধ্যয়নে;
দুর্ব্বোধ সুবোধ হ'লে সুখ শুধু মনে!

সহস্র অলক্ত তা'র লভিবার আশে
অজ্ঞাতে কমল আসি' দাঁড়াইলে পাশে
গ্রন্থ ছাড়ি' করিত না তাহারে দর্শন—
প্রেমক্ষুধাদীপ্ত—মুগ্ধ দু'খানি নয়ন।
কাঁদিত সে। দেখা হ'লে দু'খানি অঙ্গুলে
দোলাইলে আভরণ শ্রবণের মূলে
মানিনী ফিরা'ত মুখ। দিত না উত্তর
সস্নেহ কুশলপ্রশ্নে। মিলিলে অধর
অধরে—ভাবিত মনে নহে এ চুম্বন
প্রেমসুরভিত। হায়, দুর্ব্বহ জীবন!

২

পতিগৃহ হ'তে যবে ফিরিল কমল,
কুতূহলে সখীগণ—কৌতুকচঞ্চল—
বসিল তাহারে ঘিরি'। শত প্রশ্ন ঝরে
শতমুখে, বরষার আঁধার অম্বরে
অজস্র ধারার মত। হেরি' নিরুত্তর
সখীরে ফুটিয়া উঠে যত আঁখি 'পর
রোষদীপ্তি; যেতে চাহে যে যাহার ঘরে—
অভিমানে। কোনরূপে নিবারি' অন্তরে
চঞ্চলতা, আঁখি পরে অশ্রুপ্রবাহিণী—
কমল কহিল তা'র দুখের কাহিনী।

শুনি তার দুঃখকথা যত সখীগণ
চাহিল বিস্মিতনেত্রে। করিল বর্ষণ
সুতীক্ষ্ণ ঘৃণার বাণ লক্ষ্য করি' সবে
পতিরে তাহার; "বল কে শুনেছে কবে—
যুবক পত্নীরে ছাড়ি' গ্রন্থে দেয় মন?
বিশুষ্ক জ্ঞানের তৃষ্ণা! আপনি যে জন
যাচিয়া চরণতলে না দেয় হৃদয়—
ঔষধে করিতে হবে তার চিত্তজয়।"
বুঝিল না মূঢ়াগণ কত মূর্ত্তি ধরে
কামরূপী বিশ্বজয়ী বিশ্ব চরাচরে।

পল্লীপ্রান্তে জীর্ণ গৃহে বৃদ্ধা করে বাস;
মন্ত্রে ও ঔষধে তার গুণের প্রকাশ
নারীদলে। সখীদের শুনি কুমন্ত্রণ
কমল লইল শেষে তাহার শরণ
পতিপ্রেমলাভ তরে। অতৃপ্ত হৃদয়
লভিয়া স্বেচ্ছায়দত্ত গভীর প্রণয়
চাঞ্চল্যবিহীন—স্থির জলধি যেমন।
কমল কহিল তারে দুঃখবিবরণ।
অর্থলোভে আশ্বাসিল বৃদ্ধা বারংবার,—
ঔষধে ফিরিবে পতি আলিঙ্গনে তা'র।

৩

সযত্নে গুল্মের মূল করিয়া চয়ন—
বহুবিধ, করি' বহু মন্ত্র উচ্চারণ
রচিল ঔষধ বৃদ্ধা। উদ্ভ্রান্ত—চঞ্চল
প্রণয় ফিরায়ে আনে, হেন তা'র বল।
একান্ত বিশ্বস্তচিত্তে করিল গ্রহণ
কমল ঔষধ তা'র। আশ্বাসবচন
উচ্চারিল বৃদ্ধা; শুনি' আনন্দে আশায়
কমল চঞ্চলচিত্ত। বৃদ্ধা ঘরে যায়,—
শীর্ণ আঁখি 'পরে তা'র হর্ষদীপ্তি জ্বলে
স্বর্ণমুদ্রা লাভ করি' শীর্ণ করতলে।

সখীগণ বার বার করে সাবধান,—
কোন ত্রুটি নাহি ঘটে; প্রয়োগবিধান
যতনে পালিলে ফলে অভীপ্সিত ফল,
নহে ত সকল শ্রম নিতান্ত নিষ্ফল
ঊষরে বপন সম। যাপিয়া রজনী
শুদ্ধাচারে—উপবাসে, মিশাবে আপনি
আহার্য্যে ঔষধ। যেন হৃদয়ে তাহার
কোন মতে নাহি হয় শঙ্কার সঞ্চার!
কৌশলে ঔষধ তা'রে করাইলে পান,—
—আপনি হৃদয় তার করিবে সে দান।

কমল পতির গৃহে ফিরিল তাহার;
আশায় প্রফুল্ল চিত্ত; সুধার ভাণ্ডার
করতলগত যেন। প্রয়োগবিধান
সযত্নে পালন করি' করিল প্রদান
ঔষধ আহার্য্য সাথে। ক্ষণেকের তরে
জানিল না, কি বিষম বিষগুণ ধরে
সে ঔষধ—ক্রমক্ষয়কারী ভয়ঙ্কর।
আশার ইন্ধনে তা'র চঞ্চল অন্তর
অভিমান-বহ্নিশিখা দীপ্ত করি তুলে,—
সাধি পতি প্রাণ আনি দিবে পদমূলে।

৪

আরব্ধ বিষের ক্রিয়া স্বামীর শরীরে।
কমল করিল লক্ষ্য, লুপ্ত ধীরে ধীরে
স্মৃতিশক্তি; কোন মতে নাহি পড়ে মনে
চিরপরিচিত শ্লোক, অজস্র যতনে
অধীত গ্রন্থের মর্ম্ম। নিষ্ফল আক্রোশে
দু'খানি আঁখির 'পরে অশ্রুধারা আসে;
রসনায় ফুটে শুধু সহস্র ধিক্কার
আপন শক্তির পরে। ঝরে অশ্রুধার
না পারি সমাপ্তপ্রায় রচনা সকল
সমাপ্তির তুলিপাতে করিতে উজ্জ্বল।

দুরন্ত বর্ষার রাত্রি—মেঘে অন্ধকার,
চমকে চপলা,—বজ্র ডাকে বারবার।
বিনিদ্র উঠিলা পতি; জ্বালিলা ত্বরিতে
দীপখানি, রচনায় চাহিলা ধরিতে
রবিকর-পান-ফুল্ল প্রজাপতি প্রায়
ভাবখানি। বৃথা আশা! আকাশের গায়
দীপ্তিসম—নির্ব্বাপিত! চিহ্ন নাহি তার!
আপনারে প্রদানিয়া সহস্র ধিক্কার
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা লয়ে—চাপি দৃঢ় বলে
আমূল বসায়ে দিলা নিজ হৃদিতলে।

কমল আসিল ছুটি'; চাপি' বক্ষ'পরে
তপ্তরক্তময় দেহ, অশ্রুবদ্ধস্বরে
কহিল, "জিনিব বলি' হৃদয় তোমার
না জানি দিয়াছি বিষ; পিশাচী আমার
ক্ষম পাপ। প্রিয়তম, দুরাশা-তাড়নে
হারাইনু অভাগিনী রমণীজীবনে
সকল সুখের আশা—" অশ্রুর উচ্ছ্বাসে
রুদ্ধ কণ্ঠ, কাঁপে হৃদি তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে।
মৃত্যুমুখে ওষ্ঠাধরে স্ফুরিল কেবল,—
"পাপ! ক্ষমা! মিথ্যা,ভ্রান্তি! মুছ আঁখিজল।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মোহ।

১

"পিসীমা, আমি তোমার কাছে আর শোব না।"

"কেন বাবা, কি হয়েছে? আমার অপরাধ?"

"তুমি মাথা ন্যাড়া কোল্লে কেন, গয়না খুলে ফেল্লে কেন, ঝির মত কাপড় পরলে কেন? তোমার কাছে আমি শোব না।"

চারি বৎসরের ছেলে পটলার অভিমান হইয়াছে! সে ত জন্মাবধি আমার এ বেশ দেখে নাই। কিন্তু সে যদি বুঝিত, পৃথিবীর লোকে যদি বুঝিত, কত দুঃখে, কত কষ্টে, কি আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হ'য়ে আমি আজ এ সব ছেড়েছি। মা বাবা কাঁদিতেছেন, দাদা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে অনাহারে আফিসে গেলেন; বউদিদির অমন হাসিমুখ মলিন।

সাত বৎসর বয়সের সময় বিবাহ হয়, সে দিনের কথা ভাল করিয়া মনেও পড়ে না। ছয় মাস যাইতে না যাইতেই সংবাদ আসিল, আমি বিধবা হইয়াছি। কুমারী ছিলাম, হঠাৎ একদিন বাদ্যভাণ্ড করিয়া আমাকে যাহারা সধবা সাজাইয়াছিল, আবার ছয় মাস পরে তাহারাই ঘোর কান্নাকাটি করিয়া আমার সিঁতির সিন্দূর মুছিয়া দিল—বলিল, আমি বিধবা। নিজের ইচ্ছায় সধবা সাজি নাই, নিজের ইচ্ছায় বিধবাও সাজি নাই।

সাত বৎসর বয়সে বিধবা। কলিকাতা সহরে বাড়ী; বাবা হিন্দুসমাজভুক্ত হইলেও উদারমতাবলম্বী; দাদা তখন কলেজে পড়েন; বাড়ীতে হিন্দু চা'ল চলন ঠিক রক্ষা হয় না। সুতরাং আমি বিধবা হইলেও বেশভূষা পরিত্যাগ করি নাই; বরঞ্চ আমার বৈধব্যের বাহ্যবিকাশ ঢাকিয়া রাখিবার জন্য মা আমাকে সর্ব্বদাই সুন্দর বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিত করিতেন। আমাকে পড়াইবার জন্য মাষ্টার নিযুক্ত ছিল; বিধবা হইবার পর আমার শিক্ষার ভার বাবা ও দাদা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। আমি ইংরাজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এখন আমার বয়স ১৯ বৎসর। এতদিন একই ভাবে দিন যাইতেছিল,—পিতামাতার আদর, দাদার স্নেহ, বউদিদির যত্ন, পটলার আবদার—আমি এই সব লইয়াই ছিলাম। আজ হঠাৎ আমার

বেশপরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। কেন এমন কাজ করিলাম, তাহাই বলিতেছি।

২

আমার দাদা,—পৃথিবীতে এত গুণ কার? আমার দাদা শাপভ্রষ্ট দেবতা। দাদা আমার জন্য প্রাণ দিতে পারেন, দাদা আমার জন্য নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

আমার বয়স যখন পনর বৎসর, তখনও আমি বালিকার ন্যায় সরলা ছিলাম; আমার মনে কোন অভাবই ছিল না। দিন রাত্রি আমোদ আনন্দ ও পড়াশুনা করিয়াই কাটাইতাম। পড়াতেই আমার সুখ। আমি সংস্কৃত মহাকাব্যে বিভোর হইয়া থাকিতাম; দাদার কৃপায় ভাল ভাল ইংরাজী পুস্তকও অনেক পড়িতে পাইতাম। আমার মনে হইত, পৃথিবীতে জ্ঞানানুশীলনই সুখের চরম উৎস; আমি দেশ বিদেশের মনীষিগণের অতুল জ্ঞানসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া সংসারের শোকতাপ কিছুই অনুভব করিতে পারিতাম না।

তবে একটা অশান্তি মধ্যে মধ্যে আমাকে বড়ই কাতর করিত। সে দাদার বিবাহে অনিচ্ছা। দাদা এম্. এ. পাশ করিলেন, দাদা ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন; ছোট আদালতে বাহির হইলেন। তখন দাদার বয়স ২৭ বৎসর। কিন্তু দাদাকে কেহ বিবাহে সম্মত করিতে পারিল না। কেহ বিবাহের প্রস্তাব করিলেই দাদা বলিতেন, "এতদিন ত বাপের পয়সাই ব্যয় করিতেছি; নিজে দশ টাকা আনিতে শিখি, তখন বিবাহ করিবার কথা ভাবিয়া দেখা যাইবে।" আমাদের অবস্থা এমন নয় যে, দাদা দশ টাকা না আনিতে পারিলে সংসার অচল হয়। বাবা স্মিথ কোম্পানীর বাড়ীর হেড কেশিয়ার; তিনি যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাতে আমাদের সংসার চলিয়া যায়, বরঞ্চ কিছু কিছু সঞ্চিত হয়। তাহা ছাড়া আমার পিতামহের আমলের কিছু কোম্পানীর কাগজ আছে; বাড়ীখানি আমাদের নিজের। চোরবাগানে আরও একখানি বাড়ী আছে, তাহার ভাড়াও নিতান্ত কম নহে। সুতরাং সাংসারিক অস্বচ্ছলতা আমাদের মোটেই ছিল না; কিন্তু দাদার সেই এক কথা,—"দশটাকা আনিতে না শিখিলে বিবাহের কথা ভাবিবার সময় হইবে না।" এই জন্য মধ্যে মধ্যে আমার একটু কষ্ট হইত। আমার ইচ্ছা, দাদার একটি

বেশ সুন্দর বউ আসিবে, সে আমার সঙ্গিনী হইবে, আমি তাহাকে কত সুন্দর পুস্তক পড়াইব।—যখন একেলা বসিয়া থাকিব, তখন সে আমার সঙ্গে গল্প করিতে আসিবে। দাদা এ সব কথা মোটেই বুঝিতে চান না।

শেষে এ আপত্তিও আর টেঁকে না। দাদার বেশ পশার হইয়াছে,—মাসে যেমন করিয়া হউক দাদা দুই শত টাকা রোজগার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি একদিন বলিলাম, "দাদা! মাসে দুই শত টাকা ত বড় কম টাকা নহে; দুই শত টাকায় কি একটা বউয়ের ভরণপোষণ চলে না?" দাদা আমার কথার কোন উত্তর করিলেন না, তাঁহার মুখ যেন মলিন হইয়া গেল। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিষণ্ণভাবে সেখান হইতে উঠিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলাম।

সন্ধ্যার সময়ে ছাতে বেড়ান আমার কেমন একটা অভ্যাস। আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছাতে উঠি, আর দুই এক ঘণ্টা রাত্রি না হইলে আর ছাত হইতে নামি না। নীল আকাশ দূরবিস্তৃত, আকাশের কোলে দুই এক-খণ্ড শুভ্র মেঘ, মেঘের পাশে পাশে পথহারা দুই একটা পাখী, এই সকলে মিলিয়া আমার জন্য একটা স্বপ্নরাজ্য প্রস্তুত করিয়া দিত; আমি সেই নীলাকাশতলে বসিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতাম।

একদিন সন্ধ্যার পরে ছাত হইতে নামিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে বাবার ঘরে কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলাম। অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তবুও বাবার ঘরে আলো দেয় নাই,—অন্ধকারেই কথাবার্ত্তা হইতেছে। স্বরে বুঝিলাম, ঘরের মধ্যে মা, বাবা, দাদা, তিন জনেই আছেন। অন্ধকারের মধ্যে তিন জনে এমন কি গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ করিতেছেন জানিবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা হইল। আমি দ্বারের পার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম।

দাদা বলিতেছেন, "আমি বিবাহ করিতে পারিব না। এ বাড়ীতে আবার বিবাহের আমোদ! কমল চিরজীবন বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিবে, আর আমি বিবাহ করিয়া সুখে ঘর করিব, তাহা হইতেই পারে না। কমলের জীবন যে ভাবে যাইবে, আমার জীবনও সেই ভাবে কাটাইব।" বাবা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "নলিন, তোমার মনের কথা আমি বুঝিয়াছি। ইহার উপর আমার মতামত প্রকাশ করা বড়ই কঠিন।" মা বলিলেন, "তবে কি আমার অদৃষ্টে সুখ নাই? সোনার মেয়ে

কমল, তার এই অদৃষ্ট; তার পর তোমার এই পণ। আমার কি আর সাধ আহ্লাদ করিতে ইচ্ছা হয় না? না বাবা, এমন প্রতিজ্ঞা করিও না। বিবাহ কর, বৌ আসুক; আমার কমলও তাতে সুখী হইবে। কমল আমার কোথাও যায় না, কাহারও সঙ্গে মেশে না। যদি একটা বউ আসে, তবে তার সঙ্গে গল্প আমোদ আহ্লাদ করে তার জীবনটা বেশ কেটে যেতে পারে।"

এমন সময়ে তামাক লইয়া হরিদাসকে আসিতে দেখিয়া আমি নিঃশব্দে ছাতে চলিয়া গেলাম। সেখানে সেই অন্ধকার রাত্রে একাকিনী বসিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। আমার দাদা সত্য সত্যই দেবতা—এমন করিয়া কে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিতে পারে? আমার দুঃখ কি? আমি ত বেশ আছি। কিন্তু ইহাতেও দাদার মন উঠে না। কেন? দাদা বিবাহ করিয়া সুখী হইলে আমার ত আনন্দই বাড়িবে। বউদিদিকে কত আদর যত্ন করিব;—শেষ যখন দাদার ছেলে কি মেয়ে হইবে, তখন তাহাদের লালনপালন করিয়া আমার দিন সুখে কাটিয়া যাইবে। দাদার বুঝিতে ভুল হইয়াছে। আজ দাদার সঙ্গে মহা তর্ক করিব।

৩

দাদা বলিলেন, "তুই আজ যে ভাবে বস্‌লি, তাতে দেখ্‌ছি বিপুল আয়োজন! মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি দুই একখানি অমোঘ অস্ত্র বাহির করিবি নাকি?"

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "না দাদা, সে সব অস্ত্রে চলিবে না। বঙ্কিম বাবুর 'দাম্পত্য দণ্ডবিধি'র ধারা লইয়া তর্ক।"

দাদার মুখ মলিন হইয়া গেল, তিনি গম্ভীর হইয়া বসিলেন। আমি বলিলাম, "দেখ দাদা, তোমরা এই একটু আগে যে সব কথা বলাবলি করিতেছিলে, আমি সে সব শুনেছি—সব না শুন্‌লেও তোমার শেষ বক্তৃতা আমি শুনে ফেলেছি।"

দাদা আমার মুখের দিকে কাতরদৃষ্টিতে চাহিলেন; আমিও থামিয়া গেলাম। কথাটা পাড়িয়াছি, কিন্তু এখন কেমন করিয়া অগ্রসর হইব, তাহার যো পাইতেছি না। শেষে হঠাৎ বলিয়া বসিলাম, "দাদা, তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।" কথাটা বেশ দৃঢ়তার সহিতই বলিলাম। স্থির করিলাম, যুক্তি তর্ক করিব না, বিচার বিতণ্ডা মোটেই করিব না; আমি জোর

করিয়া দাদাকে বিবাহ করাইব। আমি দাদার অতুল স্নেহের অধিকারিণী; সেই স্নেহের খাতিরে দাদা আমার কথা ঠেলিয়া ফেলিতে পারিবেন না। দাদা চুপ করিয়া রহিলেন, কোনও জবাবই দিলেন না। আমি আবার অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, "তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে।"

এইবার দাদা উত্তর করিলেন, "কাজটা কি বড় সহজ মনে করলে কমল!"

আমি। সহজ?—এমন কঠিন কাজ কেউ কখন করে নাই; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়োদের মধ্যে তুমিই এ ব্যাপারের প্রথম দৃষ্টান্ত দেখাচ্চ। বাপ রে, বিয়ে করা কি সহজ কাজ!

দাদা। কমল, তুমি কথাগুলি মোটেই তলিয়ে বুঝলে না।

আমি। তা আমার না হয় বুঝিবার শক্তি নাই, অবুঝ ছোট বোনের অনুরোধ,—না দাদা তোমার পায়ে পড়ি, তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে। তুমি যদি এই মাসের মধ্যে বিবাহ না কর, তাহা হইলে ভাল হইবে না। যে জন্য তুমি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, তাহা আমি শুনিয়াছি। এখন আমার কথা শোন, এই বৈশাখ মাসের মধ্যে যদি তুমি বিবাহ না কর, তাহা হইলে ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে যেমন করিয়া হয় আমি মরিব। আমার প্রতিজ্ঞা!

আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না; ধীরে ধীরে গৃহান্তরে চলিয়া গেলাম। কিছু ক্ষণ পরে আসিয়া দেখি, দাদা টেবিলের উপর মাথা দিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন। আমি দাদার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম, অতি মৃদুস্বরে ডাকিলাম, "দাদা!"

দাদা মুখ তুলিয়া চাহিলেন; তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল। আমি বলিলাম, "দাদা, ভালর জন্যই আমি তোমাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি; আমার জন্য তুমি তোমার জীবনের সুখ নষ্ট করিবে? তোমার কাছে আমার কিছুই গোপনীয় নাই; তুমি শুধু আমার দাদা নহ, আমার খেলার সাথী, আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। দাদা, তোমাকে সত্য বলিতেছি, আমার ত কোন দুঃখ নাই। তোমার মত দাদা যার আছে, তার দুঃখ কি? দাদা, আমার কথা শোন, বিবাহ কর। আমার মরণ যদি দেখিতে না চাও, তবে বিবাহ কর।"

দাদা বুঝিলেন, আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; তিনি বলিলেন, "কমল, তোমার

ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছু করিব না। কিন্তু এখনও ভাবিয়া দেখ, কাজটা ভাল করিলে না।”

“আমি বেশ ভাবিয়া দেখিয়াছি; আমার জন্য তুমি এমন কাজ করিতে পারিবে না।”

দাদা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “কমল, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। তোমার কথা উড়াইবার সাধ্য আমার নাই।”

৪

বৈশাখ মাসেই দাদার বিবাহ হইয়া গেল। বউদিদি সকলেরই মনের মত হইলেন। আমার যে কত আনন্দ হইল, তাহা আর বলিবার নহে। এক বৎসর পরেই দাদার খোকা হইল—আমার কাজ বাড়িল। এখন আর পড়াশুনায় তেমন আগ্রহ রহিল না; দিন রাত্রি শুধু খোকাকে লইয়া থাকি। আমিই আদর করিয়া তাহার নাম পটলা দিলাম।

এই সময়ে এক দিন আমার যেন কি হইল। কেন হইল, তাহা জানি না; তবে কিসে কি হইল, তাহা বলিতে পারি। একদিন অপরাহ্নে আমি দাদার ঘরের সম্মুখ দিয়া ছাতে যাইতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ চাহিয়া দেখি, ঘরের মধ্যে দাদা আর বউদিদি। দাদা আদর করিয়া বউদিদির চিবুক ধরিয়া মুখচুম্বন করিতেছেন। এ দৃশ্য আমি কখনও দেখি নাই, আমার চক্ষে ইহা কখনও পড়ে নাই। হতভাগিনী আমি, এই দৃশ্য দেখিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল, আমার প্রাণের ভিতর দিয়া কি যেন একটা বহিয়া গেল। আমার সমস্ত হৃদয়ের নির্ব্বাপিতপ্রায় ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন জাগিয়া উঠিল। আমি তাড়াতাড়ি ছাতে গেলাম। পূর্ব্বের মত চারি দিকে চাহিয়া আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া সেই দৃশ্য ভুলিতে চাহিলাম; কিন্তু আমি যতই চেষ্টা করি, ততই যেন সেই দৃশ্য আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমার প্রাণের অতৃপ্ত বাসনা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। আমার এই ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে একদিনও যে ভাব আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই, আজ সেই বাসনা আমাকে আচ্ছন্ন করিল। আমি এক মুহূর্ত্তে যৌবনের সাধ-বাসনার দাস হইয়া পড়িলাম। মনে হইল, কি পাপে আমার এ শাস্তি? এমন করিয়া আদর করিবার আমার যে কেহ নাই! জীবন যেন বৃথা বোধ হইতে লাগিল; দারুণ পিপাসায় আমার ছাতি ফাটিতে লাগিল। সাত বৎসরের সময় বিধবা হইয়াছি, জীবনের কোন সুখেরই

যেন আস্বাদ পাই নাই ; আজ আমার লালসাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আকাশে—সেই অনন্ত নীলিমার দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাহাতেও যেন আমার অতৃপ্ত বাসনা আমার যৌবনকামনার স্রোত বহিয়া যাইতেছে ; সান্ধ্যপবনহিল্লোল যেন কোথা হইতে যৌবনের অতৃপ্তি আনিয়া আমার গায়ে ঢালিয়া দিতে লাগিল। শুধু মনে হইতে লাগিল, আমায় সোহাগ করিবার কেহ নাই। মায়ের স্নেহ, পিতার আদর, দাদার অপরিমেয় ভালবাসা, সব যেন সামান্য বোধ হইতে লাগিল। রমণীর যাহা সর্ব্বস্ব, যৌবনের যাহা কামনা, সেই আদর সেই ভালবাসার জন্য আমার তৃষিত হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল—আমার সকল বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। আজ আঠার বৎসর যে চিন্তা কোন দিন আমার মনে উদিত হয় নাই, আজ নূতন করিয়া—তাহা মনে হইল ;—বোধ হইল, জীবন বৃথায় গেল, কোন সাধ কোন বাসনাই পূর্ণ হইল না। আমি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।

৫

আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়াই একটা গলি গিয়াছে। গলির অপর পার্শ্বে সরকারদিগের বাড়ী। এত দিন তাহারা এই বাড়ীতেই বাস করিত, কিন্তু এই সময়ে তাহাদের অবস্থা মন্দ হওয়ায় তাহারা শ্যামবাজারে একটা ছোট ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উঠিয়া গেল। তাহাদের বাড়ী স্কুল কলেজের ছেলেরা ভাড়া লইয়া মেস্ করিল। আমাদের ছাতে উঠা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল ; কিন্তু আমার এতকালের-অভ্যাস, আমি সন্ধ্যার পরে ছাতে না উঠিয়া থাকিতে পারিতাম না। সন্ধ্যার পরেও মেসের ছেলেরা ছাতে বসিয়া নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিত, কিন্তু তাহাতে আমার কোনপ্রকার লজ্জা বোধ হইত না।—আমি ছাতের এক পাশে বসিয়া কখনও বা তাহাদের তর্ক বিতর্ক শুনিতাম, কখনও বা আপন মনে বসিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতাম। সরকারদের তেতলায় সবে একটি ঘর। ঘরটি খুব ছোট। সেই ঘরে সোনার চশমা পরা দিব্য ফুটফুটে গৌরবর্ণ একটি ছাত্র থাকিতেন। তাঁহার সেই ঘরের পশ্চিম দিকের জানালা খুলিলে আমাদের ছাত বেশ দেখা যাইত।

ছাত্র মহাশয়েরা পৃথিবীর সমস্ত বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করিয়া ক্লান্ত হইয়া যখন নীচে নামিয়া যাইতেন, তখন ঐ ছাত্রটি ধীরে ধীরে সেই তেতালার ঘরে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম দিকের জানালা খুলিয়া দিতেন ; তাহার

পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিতেন; পড়িতে পড়িতে যখন ক্লান্তি বোধ হইত, তখন কখনও বা বই-হাতে ছাতে আসিয়া পাইচারী করিতেন, কখনও বা পশ্চিম দিকের সেই জানালায় গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। জ্যোৎস্নারাত্রে আমি খুব কমই ছাতে বসিয়া থাকিতাম, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে আমি ছাতে বসিয়া সেই ছাত্রটির সুন্দর মুখখানি দেখিতাম; তিনি যখন পাঠে নিবিষ্টচিত্ত হইতেন, আমি তখন হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম। কেমন শিষ্ট শান্ত, কেমন নম্রপ্রকৃতি! ছাতে যখন ছাত্রগণের পার্লিয়ামেট বসিত, এবং তাহাতে বার্ডসায়ের মূল্য হইতে আরম্ভ করিয়া থিয়েটার, কংগ্রেস, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট, টেনিসন, সেক্ষপীয়র, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, ভারতী প্রভৃতি হরেক রকমের আলোচনা হইত, তখন ঐ তেতালার ছাত্রটি কিন্তু তাহাতে যোগ দিতেন না। আমি দেখিতাম, তিনি এক পার্শ্বে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি চিন্তা করিতেন। তাঁহার ঐ ভাবটি আমার বড়ই ভাল লাগিত। আমার মনে হইত, এই ছাত্রটি ঠিক আমার মত মানুষ; আমি যেমন এখন দিনরাত্রি বসিয়া ভাবি, ইঁহারও তাহাই। কিন্তু তিনি কি ভাবেন, কে জানে?

এমন করিয়া কত দিন যাইবে? শেষে তেতালার ছাত্রটি আমাকে দেখিয়া ফেলিলেন। একদিন হঠাৎ আমাদের চারি চক্ষুর মিলন হইল; তিনি অমনি মুখ নত করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। আমি ছাতেই বসিয়া রহিলাম। আমার হৃদয়ের মধ্যে কি যেন একটা বহিয়া গেল। ইহার পর হইতে যখন ছাতে অন্য ছাত্রেরা থাকিত, তখন আমি মোটেই উপরে যাইতাম-না; সকলে চলিয়া গেলে আমি চোরের মত ছাতে যাইয়া বসিতাম। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে তিনি আমাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেন না, আমি তাঁকে বেশ দেখিতে পাইতাম।

শেষে আমি যেন অধীরা হইয়া উঠিলাম। দিনের বেলায় দ্বিপ্রহরে পথের দিকে চাহিয়া থাকিতাম, কখন তিনি কলেজ হইতে ফিরিবেন। যখন দেখিতাম, তিনি সেই রৌদ্রতপ্ত রাজপথ বহিয়া মেসে আসিতেছেন, তখন আমার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। আমি চুপে চুপে সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে ছাতে উঠিতাম, এবং তাঁহাকে দেখিতাম। প্রথম প্রথম তিনি যেন কেমন অপ্রতিভ ও মলিন হইয়া যাইতেন; তাহার পর ক্রমে তাঁহার সে সঙ্কোচ চলিয়া গেল। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা চলিতে লাগিল,—

৬

এমন করিয়া আর কত দিন চলে ? শেষে দুই জনে দুই ছাতে বসিয়া পরামর্শ আঁটিলাম, পলায়ন করিব। আমার তখন মনে হইত, এমন করিয়া স্বর্গের দ্বারে তৃষিত অবস্থায় বসিয়া থাকি কেন ? একটু সাহস করিলেই ত নরেন্দ্রনাথ চিরজীবনের মত আমার হইয়া যায়—আমার সব সাধ বাসনা পূর্ণ হয়।

পলায়ন স্থির হইল। আমি কিছুই লইয়া যাইব না ; টাকাকড়ি গহনাপত্র কিছুই লইব না। দরকার কি ? যে স্বর্গসুখের অধীশ্বরী হইব, তাহার নিকট টাকাকড়ি কি ছার !

গতকল্য রাত্রি ৯টার সময়ে একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী আসিয়া আমাদের গলির মোড়ে দাঁড়াইল ; আমি অন্যের অজ্ঞাতসারে খিড়কীর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিলাম—গাড়ীর মধ্যে নরেন্দ্রনাথ।

আমি নরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলাম। নরেন্দ্রনাথ গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, এবং গাড়োয়ানকে হাবড়া ষ্টেশনে যাইতে হুকুম দিল। তাহার পর—তাহার পর—সে পাপ কথা বলিতে প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে—তাহার পর নরেন্দ্রনাথ আমার মুখচুম্বন করিল। সেই মুহূর্ত্তে আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, আমার মাথার মধ্যে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, আমার শরীরের প্রত্যেক শিরায় যেন বিষের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, আমার মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি সজোরে তাহার মুখ সরাইয়া দিলাম, হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একীভূত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। গাড়োয়ান ভীত হইয়া হঠাৎ গাড়ী থামাইয়া ফেলিল। আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া লাফাইয়া পড়িলাম। একেবারে রাস্তার উপরে পড়িয়া গেলাম। "কি কর, কি কর !" বলিয়া নরেন্দ্র—সেই পিশাচ—গাড়ী হইতে নামিতে গেল ; আমি এক ধাক্কায় তাহাকে পথের উপর ফেলিয়া দিয়া যে দিক হইতে গাড়ী আসিয়াছিল, সেই দিকে ছুটিতে লাগিলাম। পথে তখন লোক ছিল না ; একটু যাইতেই পথ চিনিলাম, আমাদের বাড়ী হইতে বেশী দূরে যাই নাই। সম্মুখে দেখি, কে যেন আসিতেছে ; তখন মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া জড়সড় ভাবে পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। লোকটি আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত

আমাদের গলির মোড় পাইলাম। তখন এক দৌড়ে আমাদের খিড়কীতে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। কেহই কিছু জানিতে পারিল না।

৭

সমস্ত রাত্রি যে আমার কি যন্ত্রণায় কাটিল, তাহা বলিতে পারি না। আমার মনে হইল, কে যেন আমার ওষ্ঠে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে; আমার মুখ যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল। হায়! ইহারই নাম সুখ, ইহারই নাম প্রেম! কে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা আমার ওষ্ঠে মাথাইয়া দিল! একবার মনে হইল, গলায় দড়ি দিয়া এ জীবন শেষ করি। কিন্তু পারিলাম না; কেন পারিলাম না? তাহা হইলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল কৈ? যত দিন বাঁচিব, তত দিন আমার এমনই করিয়া সমস্ত মুখ অদৃশ্য অগ্নিতে পুড়িতে থাকিবে—চিরজীবন আমি অন্যের অগোচরে ধিকিধিকি করিয়া তুষানলে দগ্ধ হইব, তবে ত আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত! আমি সেই প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিলাম। মরা হইল না।

আর আমার এই রূপ—ইহাই আমার কাল। কা'ল রাত্রে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, বিলাস ত্যাগ করিব, রূপের বাসায় আগুন লাগাইয়া দিব। তাই আজ প্রাতেই আমার সেই নরকের সঙ্গী কেশপাশ কাটিয়া ফেলিয়াছি, অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছি, সাদা কাপড় পড়িয়াছি। ছয় মাস অন্ন গ্রহণ করিব না; সামান্য ফল মূল খাইয়া জীবনধারণ করিব।

মা বাবা কাঁদিতেছেন, দাদা কাঁদিতেছেন, বউদিদি বিষণ্ণ, পটলা আমার এ পরিবর্ত্তনে কাতর, কিন্তু আমার যে কি যন্ত্রণা—সমস্ত মুখটা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। হা ভগবান!

শ্রীজলধর সেন।

স্মৃতিস্তম্ভ।

নাহি বটে সম্রাটের ধন রত্ন স্তূপীকৃত,
যাহে রচি' মমতাজ—ভূমিস্বর্গ অতুলিত,
যতনে স্থাপিত করি ক্ষুদ্র বরতনুখানি,
মৃত্যুরও মাঝারে তুমি রবে হয়ে রাজরাণী।
নেহারিয়া মর্ত্ত্য জনে ভাবিবে বিস্মিত হয়ে,—
কোন বিশ্ববিমোহিনী শিল্প পারিজাতে শুয়ে!
তবু যাহা আছে মোর হ'লেও তা সামান্য ত
বালিকা লীলার ক্রীড়াগৃহ হবে মনোমত।
নব অশ্রুমুক্তাহারে বেঁধে দিব কেশভার
থাক মোর অন্তঃপুরে লীলাবতী মা আমার!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

বিজ্ঞান ও বেদ।

১। বিজ্ঞানশাস্ত্র ও বেদশাস্ত্র।

যে শাস্ত্রের সকল কথাই প্রমাণের নিকষে কষিয়া লওয়া যায়, তাহার নাম বিজ্ঞানশাস্ত্র। আমাদের জ্ঞান দুই ভাগে বিভাজ্য ;— সত্য ও মিথ্যা। পণ্ডিতেরা সত্য জ্ঞানকে 'প্রমা', এবং মিথ্যা জ্ঞানকে 'ভ্রম' বলেন। কেন না, সত্য জ্ঞান প্রমাণমূলক, এবং ভ্রম জ্ঞান প্রমাণবিরুদ্ধ। সত্য জ্ঞানই উৎকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া ইহাকে বিজ্ঞান বলা যায়। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যতই উৎকর্ষলাভ করিতে থাকে, ততই তাহার নিকট বিজ্ঞানের আদর বাড়িতে থাকে। আর কেবল অসার গল্প উপন্যাসে তত শ্রদ্ধা জন্মে না। স্বাধীন চিন্তা দ্বারা অন্যের মতামত পরীক্ষা করিয়া লইতে ততই স্পৃহা জন্মে। যুক্তি ও ন্যায়ের একাধিপত্য ততই হৃদয়ে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যুক্তি ও ন্যায়ের বিরুদ্ধ হইলে বেদবাক্যও তখন নিষ্প্রভ ও মলিন ভাব ধারণ করে। অতএব বলা বাহুল্য যে, বিজ্ঞানশাস্ত্রই সকল শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয়।—ফলতঃ, বেদ ও বিজ্ঞান একই কথা। কিন্তু একদা যাহা বেদ বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহার মধ্যে এতই অসার কথা প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, এক্ষণে বেদ অপেক্ষা বিজ্ঞানেরই মর্য্যাদা অধিক। বেদের মধ্যে যাহা প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, যাহার স্বপক্ষে প্রচুরপরিমাণ অনুকূল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহাকে বেদবিজ্ঞান বলা যায়। সাধারণ বিজ্ঞান-শাস্ত্রের চরমসীমায় উপস্থিত হইলে আমরা কতকগুলি অপ্রমেয় সত্যের সম্মুখীন হই। ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে, পরলোক আছে, ধর্ম্ম আছে ;— এই সকল সিদ্ধান্ত, এই সকল সত্য, বিজ্ঞানশাস্ত্রের চরমসীমায় অবস্থিত। যুক্তি ও ন্যায় সে সীমা লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ। যখন আমরা সেই সীমায় উপস্থিত হই, তখন আমাদের হৃদয়ের কবাট উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়, এবং তথা হইতে নানাবিধ অপূর্ব্ব ভাবের লহরী প্রবাহিত হইতে থাকে। বিস্ময়, প্রেম, আশা, আনন্দ ও ভয় যুগপৎ আপন আপন আধিপত্য হৃদয়ে স্থাপন করিয়া আমাদিগকে ভক্তিরসে নিমগ্ন করিয়া দেয়।—এই ভক্তিই বেদ-বিজ্ঞানের প্রাণস্বরূপ। ইহা একটি জটিল ও মিশ্র ভাব ; নানা বর্ণে বিচিত্র হইয়া ইহা অনন্তকাল ব্যাপিয়া মানব-মনকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে। যেমন যুক্তিপ্রাণ বিজ্ঞানশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয়, তেমনি ভক্তিপ্রাণ বেদ-

শাস্ত্র বিজ্ঞানশাস্ত্রকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মনুষ্যের মনে এই দুই শাস্ত্রের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইলে তাহা আত্মার শান্তিনিকেতনে পরিণত হয়, আর বিসংবাদ থাকিয়া গেলে তাহার বড়ই দুর্দ্দশা ঘটে। যুক্তি তখন মরুভূমি এবং ভক্তি তখন মরীচিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ, বেদ-শাস্ত্রকে বিজ্ঞানের অবিরোধী এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রকে বেদের অনুকূল দেখিতে পাইলেই চিত্তে স্থৈর্য্য জন্মিবার সম্ভাবনা ;—ইহার অন্যথায় শীল বা চরিত্রের বিকাশ অসম্ভব। যাহার বিজ্ঞানে বেদ নাই, অথবা যাহার বেদকে যুক্তি দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা যায়, সে অন্ধবিশ্বাসে ক্ষণমাত্র অটল-চরিত্রসম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, সংসারে দৈনন্দিন প্রলোভন হইতে কোন মতেই চিরদিন আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতে পারে না। কঠ উপনিষদের ভাষায় তাহারা

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দংদ্রম্যমানাঃ পরি যন্তিমূঢ়াঃ
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

২। বিজ্ঞানশাস্ত্রের চরমসীমা।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের চরম সীমায় পঁহুছিতে যে বিপুল পাণ্ডিত্যের আবশ্যকতা আছে, তাহা নহে। সহজ মনুষ্য বাল্য হইতে বার্দ্ধক্যে পঁহুছিলে সহজেই একপ্রকারে বিজ্ঞানের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়, দেখা যায়। প্রকৃতির বিদ্যালয়ে আমরা কেবল উন্মুক্ত চক্ষুকর্ণাদির দ্বারা গুরূপদেশ ব্যতিরেকে যে বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া লই, তাহারই সীমান্তে পঁহুছিলে আমাদের মানসিক অবস্থা কীদৃশ ভাব ধারণ করে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখ।

ভূমিষ্ঠ হইয়াই আমরা নানাবিধ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ অনুভব করিতে থাকি। বাহ্য জগতের আকার অবয়ব আমাদের ইন্দ্রিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। বাহ্য জগতের ক্রিয়াতে আমাদের নিজ শরীরে বিবিধ বৈলক্ষণ্য সংসাধিত হইতে আরম্ভ হয়। জীবন যেমন এক দিকে একটি অপূর্ব্ব মধুময় অবস্থা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অন্য দিকে সঙ্গে সঙ্গে তেমনই শীত গ্রীষ্ম ক্ষুৎপিপাসা অনুভব করিয়া সেই জীবনের রক্ষার্থ আমরা বিবিধ কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হই। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহে কিয়ৎকাল নানাবিধ শক্তির বিকাশ হইতে থাকে। আবার ক্রমে ক্রমে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল শক্তির

নির্ব্বাণ হইয়া যায়। অবশেষে মৃত্যু নামক ঘোর ভাবান্তর আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা সেই ভাবান্তর আমাদের সদৃশ অন্য জীবে দেখি, এবং আমাদের ঘটিবে, ইহা নিশ্চিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করি; কিন্তু সেই ভাবান্তরের মর্ম্ম কি, তাহা পরিগ্রহ করিতে পারি না। প্রাণের তরঙ্গ কিরূপে আমাদের দেহে প্রবিষ্ট হইল, তাহারও যেমন অবধারণ করিতে পারি না, কিরূপে তাহা বাহির হইয়া যাইবে, তাহারও অবধারণ করিতে পারি না। জীবনের আদি অন্ত ঘোর কুজ্ঝটিকায় আবৃত;—সেই নীহারের আবরণ ভেদ করিয়া দৃষ্টি চলে না। ঘোর পণ্ডিতেরও এই দশা, ঘোর মূর্খেরও এই দশা।

আমার হস্ত, আমার পদ ইত্যাদি ভাষাতেই প্রকাশ যে, মনুষ্যের আদিম বিশ্বাস অনুসারে 'আমি' ও 'দেহ' স্বতন্ত্র। কিরূপে এই বিশ্বাসে আমরা সর্ব্বতোভাবে আদিম অবস্থাতেই উপনীত হই, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অধিক প্রয়াসের আবশ্যকতা নাই। বাল্যাবস্থার 'আমি' ও বৃদ্ধাবস্থার 'আমি'তে অণুমাত্র ভেদ নাই, কিন্তু উভয় অবস্থার দেহে আকাশ পাতাল ভেদ। একটি নিত্য পরিবর্ত্তনশীল—অপরটির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন নাই। এমন দুই পদার্থ কি এক হইতে পারে? কদাচ নহে। জন্ম মৃত্যু ত দেহেরই; তাহার আদি অন্ত প্রত্যক্ষ। কিন্তু আত্মার ত আদিও প্রত্যক্ষ নহে, অন্তও প্রত্যক্ষ নহে? ঘোর পণ্ডিতেরও এই দশা, ঘোর মূর্খেরও এই দশা।

৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

রবার্ট বুকানন।

সম্প্রতি ইংরাজী সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রবার্ট বুকাননের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর অতি অল্প দিন পূর্ব্বে মিষ্টার ওয়াকার "নূতন বিদ্রোহের কবি রবার্ট বুকানন" নামক গ্রন্থে বুকাননের কবিতার আলোচনা করেন। বুকাননের কৃতিত্ব সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, তিনি যে ক্ষমতাশালী লেখক, সে কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তাঁহার পিতা "সোসিয়ালিষ্ট" বক্তা ও সম্পাদক। বুকানন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত। যৌবনে যশের অন্বেষণে বন্ধু গ্রে ও বুকানন লণ্ডনে আসেন। সে কথা পরে বলিব। গ্রে অসুস্থ হইয়া

স্কটলণ্ডে প্রতিগমন করেন। সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। বুকাননের প্রথম পুস্তক Undertones ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তক সুহৃদ গ্রের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট। London Poems বুকাননের সাফল্যের প্রথম সোপান। ইহাতে কর্ম্মময় নগরের দরিদ্রদিগের চিত্র যথাযথভাবে, অতি করুণ রসে ও হাস্যোদ্দীপকরূপে চিত্রিত। ইহার পর লেখক বহু কবিতা, উপন্যাস ও নাটক প্রকাশিত করেন। সাময়িক পত্রে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁহার তীব্র আক্রমণের বেগবতী ভাষা স্বতঃই মনোযোগ আকৃষ্ট করে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি The Fleshy School of Poetry বলিয়া রসেটিকে আক্রমণ করেন। সে প্রবন্ধ এখনও অনেকে পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। তিনি কিপলিংকে লইয়া Hooligan in Literature নামক যে প্রবন্ধ অল্পকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত করেন, তাহাতেও তাঁহার সাহিত্যদ্বন্দ্বে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার তীব্র আক্রমণ কঠোর কশাঘাতের মত কষ্টাবহ। তাঁহার বহু উপন্যাস পাঠকসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। সেগুলিতে চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার ও নাটকরচনাশক্তির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কতকগুলি নাটকও বিশেষ আদৃত।

বুকানন মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্ব হইতেই রোগকাতর ছিলেন।

কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি "আমার প্রথম পুস্তক" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, তাহা হইতে তাঁহার সাহিত্যজীবনের আরম্ভ ও মতামত অনেকটা অবগত হওয়া যায়।

বুকানন এককালে দুইখানি পুস্তকের রচনায় প্রবৃত্ত হন। ঘটনাক্রমে Undertones অগ্রে প্রকাশিত হইলেও, Idyls and Legends of Inverburn তাহার সমসাময়িক,—যমজ। এই দুইখানি পুস্তকের প্রকাশকালে তিনি সাহিত্যসংসারে পরিচিত হয়েন। যত দূর মনে পড়ে—গ্রন্থকার হইয়া যশোলাভের বাসনা শৈশব হইতেই তাঁহার সহচর। গ্লাসগোয় বাল্যকালে তাঁহার সহিত ডেভিড গ্রের পরিচয় হয়। গ্রে তখন যশের সন্ধানে কর্ম্মকেন্দ্র লণ্ডনে যাইতে প্রস্তুত। লণ্ডনের "অবহেলা মৃত্যু ; তা'র হাস্যে যশ ফুটে।" গ্রের বিশ্বাস ছিল, তিনি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সমাধিক্ষেত্র ওয়েষ্টমিনষ্টার অ্যাবিতে সমাহিত হইবেন। বুকাননের বিশ্বাস ছিল, টেনিসনের পর তিনিই রাজকবির পদ পাইবেন। সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ উচ্চাশাদীপ্ত বালকের স্বপ্ন এইরূপই বটে! হায়!

আরম্ভ; বন্ধু গ্রে।

"কত যুবা যৌবনেতে চড়ি' আশা-বিমানেতে
ভাবে ছড়াইবে ভবে যশঃপ্রভা আভা রে।
তুলিবে কীর্ত্তির মঠ, স্থাপিবে মঙ্গল-ঘট,
প্রণত ধরণীতল দিবে নিত্য পূজা রে!"

দুই বন্ধু লণ্ডনে আসিলেন ; কিন্তু ভ্রমক্রমে দুই জনে দুই ষ্টেশনে ট্রেণ ধরেন, তাই কেহ কাহারও সন্ধান পান নাই। কয় সপ্তাহ পরে উভয়ে সাক্ষাৎ হয়। ইতিমধ্যে বুকানন অনেক কষ্ট পাইয়া একটি বাড়ীর সর্ব্বোচ্চ তলায় একটি কক্ষ ভাড়া করেন। ভাড়া সপ্তাহে সাত শিলিং। বুকানন তখন প্রায় নিরন্ন। গ্রেও এই বাসায় আসিলেন। তখনই তিনি মরণাহত—এক দিন হাইডপার্কে নিশাযাপনের কুফল। তিনি দেশে ফিরিয়া সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বুকাননের দীন কক্ষ আবার জনসমাগমহীন হইল। তিনি স্বভাবতঃ চাপা ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ; এরূপ লোকের বন্ধুলাভ দুর্ঘট। তিনি সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে লিখিয়া যাহা পাইতেন, তাহাতে কোনওরূপে অন্নসংস্থান হইত। তবু তখন সুখের অভাব ছিল না। কবিযশঃপ্রার্থী যুবকের পক্ষে কবিতার সঙ্গই যথেষ্ট সুখদ—বহুসাধনার ফল। কাব্য

সাহচর্য্যেই তখন তিনি লব্ধকাম। এ দিকে কষ্টের অন্ত ছিল না। সময়ে সময়ে সুদীর্ঘ পঞ্চদশ দিন একবার পূর্ণাহার জুটিত না; সস্তা হোটেলে আহার করিয়া দগ্ধোদর পূর্ণ করিতে হইত।

"এথিনিয়ম" পত্রে সমালোচনা লিখিয়া 'কলম' পিছু সাড়ে দশ শিলিং উপার্জ্জন। ওয়েলিংটন আফিসে যাইয়া বুকানন কলম মাপিয়া প্রাপ্য অর্থ আনিতেন। জন মর্লে তখন "লিটারেরি গেজেটের" সম্পাদক। তিনি একটি বৃহৎ কুক্কুর লইয়া আফিসে আসিতেন। গেজেটে লিখিয়া বুকানন কলম পিছু সাড়ে সাত শিলিং পাইতেন; মাপের সময় উদ্ধৃত অংশগুলি বাদ দেওয়া হইত। তখন লণ্ডনে ডিকেন্সের অপ্রতিহত প্রতাপ ও অসামান্য প্রভাব; তাঁহার বিশুদ্ধ হাস্যের কিরণে লণ্ডনে সমাজের সকল শ্রেণীর লোক আনন্দিত; তাঁহার রচনায় অতি নিম্নস্তরচারীরও অশ্রুর উৎস মুক্ত। সপ্তাহে দুই তিন দিন তিনি ব্যাগ হস্তে লইয়া চেরিংক্রশ ষ্টেশন হইতে "অল্ দি ইয়ার রাউণ্ড" পত্রের আফিসে (ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট) আসিতেন। তাঁহার স্নেহমধুর সাহায্যে বুকানন বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছিলেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে।

প্রথম হইতেই বুকাননের সঙ্কল্প ছিল, কেবল খ্যাতি শুনিয়া কাহাকেও দেবত্বে অভিষিক্ত করিবেন না। আপনি দেখিয়া যাহাকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা হইবে, তাহাকেই ভক্তি করিবেন; অপরকে নহে। তখন ওয়েস্‌ল্যাণ্ড মার্ষ্টনে সারস্বতসম্মিলন হইত। তথায় বুকানন "জন হালিফাক্স" গ্রন্থের রচয়িত্রীর স্নেহলাভ করেন। তিনি বুকাননকে গৃহে লইয়া গিয়া আপনার পুস্তক পাঠ করিতে দিতেন। কিন্তু কবিতারচনার জন্য বুকাননের অন্য পরিচিতের অভাব ছিল না। পথে কত লোক যাইত—যুবক তাহা দেখিতেন। সেতুর উপর কৃত্রিমবর্ণের সাহায্যে রূপ উজ্জ্বল করিয়া রূপজীবিনীরা দাঁড়াইয়া থাকিত—যুবক তাহাদের সহিত কথা কহিতেন। তিনি রঙ্গালয়ের অভিনেতা ও রঙ্গালয়দ্বারে সমাগত জনগণকে লক্ষ্য করিতেন। লণ্ডন তখন তাঁহার চক্ষে মায়াকানন।

পরিচয়।

এই সময় বুকানন টেমস-তীরে চাটসীতে গমন করেন। শেলীর সুহৃদ, গ্রীক সাহিত্যে সুপণ্ডিত পিকক তখন সেই স্থানে বাস করিতেছেন। তিনি প্রাচীনপন্থী; এমন কি, প্রাচীনপথপরিত্যাগী বলিয়া কীট্‌স ও শেলীকেও তিরস্কার করিতেন। বলা বাহুল্য, বুকানন তাঁহার নিকট বহুবার তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।

তখন বুকানন মাসিকপত্রে কবিতা ও সমালোচনা প্রকাশিত করিতেন। বহুদিন পূর্ব্বে তিনি জর্জ্জ হেনরী লুইসকে কতকগুলি কবিতা পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমি কবি কি না?" উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, "ইহাতে প্রকৃত কবিত্ব আছে; হয় ত আপনি ভবিষ্যতে কবি হইবেন। 'হয় ত' বলিলাম, কারণ আমি আপনার বয়স কত তাহা জানি না, এবং অনেক কবিতা-মুকুল বিকশিত হয় না।" তিনি বুকাননকে লিখিতে বলেন; কিন্তু অন্ততঃ দুই বৎসর কাল প্রকাশ করিতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন। তিন বৎসর পরে বুকানন লিখিলেন, তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া তিনি গ্রন্থপ্রকাশে উদ্যত। লুইসের আহ্বানে তিনি তাঁহার নিকট গমন করেন। ফলে জর্জ্জ ইলিয়টের সহিত বুকাননের পরিচয় হয়।

ইতিমধ্যে পিতৃগৃহে বুকাননের বাল্যবন্ধু গ্রের মৃত্যু হয়। একখানি কবিতাগ্রন্থমাত্র প্রকাশ করিয়া—বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। নিশীথে নিদ্রাভঙ্গে বুকাননের মনে হইল, গ্রে আর নাই। তিনি এক জন বন্ধুকে আশঙ্কার কথা বলিলেন। সত্য সত্যই তখন গ্রের মৃত্যু হইয়াছে। বুকানন লুইস

গ্রন্থপ্রকাশ।

ও জর্জ্জ ইলিয়টকে মৃতবন্ধুর জীবনের ইতিহাস বলিলে লুইস সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশিত করিবার পরামর্শ দেন। তদনুসারে বুকানন সেই করুণকাহিনী "কর্ণ্‌হিল্‌" পত্রে প্রকাশিত করেন। এই সময় বুকাননের Undertones প্রকাশের বন্দোবস্ত হয়। অপর পুস্তকখানির প্রকাশের ব্যবস্থা তখনও হয় নাই। স্কচ ভাষায় অমিত্রাক্ষরে লিখিত কবিতা তখন নূতন। পড়িয়া লুইস অত্যন্ত প্রশংসা করেন ও প্রকাশক স্থির করিয়া দেন। শেষে অন্য প্রকাশকের সহিত বন্দোবস্ত স্থির হয়।

"কর্ণ্‌হিল্‌" পত্রে সুহৃদ গ্রের বিবরণ প্রকাশিত হইবার অত্যল্পকাল পরেই জর্জ্জ ইলিয়টের গৃহে বুকানন উপাসিত ব্রাউনিংকে দেখেন। প্রথম দর্শনে দূরদৃষ্ট উপাসিতকে আদর্শের মত বোধ হয় নাই, ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে সে ভাব কাটিয়া যায়।

সে সময়ের পরিচিতদিগের অনেকেই এখন মৃত—তাঁহার স্মৃতিমাত্র এখন বর্ত্তমান; অনেকের যশঃসৌরভে সাহিত্য-মন্দির আমোদিত। বুকানন শেষজীবনে যে গৃহে বাস করিতেন, তখনও সে গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই। সেই শষ্পাস্তৃত ভূমিতে জর্জ্জ ইলিয়ট ও হার্বার্ট স্পেন্সর বেড়াইতে যাইতেন। সেই গতযুগের অমরবৃন্দমধ্যে এখনও স্পেন্সর বর্ত্তমান।

সাময়িক পত্রে বুকাননের পুস্তকদ্বয় প্রশংসিত হইয়াছিল। "এথিনিয়ম" "ফর্টনাইটলিতে" পুস্তকদ্বয় বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সে প্রশংসায় তরুণ কবির চিত্ত একান্ত প্রফুল্ল হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইত, যেন জগতে তাঁহার প্রশংসা আর ধরে না। লোকে তাঁহাকে গর্ব্বিত বিবেচনা করিত। একবার নিমন্ত্রণসভায় তিনি হরেসের কবিত্বে সন্দিহান হওয়ায় আণ্টনি ট্রলপ তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া একটা ডিকাণ্টার ছুঁড়িতে চাহিয়াছিলেন। এক জন প্রকাশক তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পর বলিয়াছিলেন, "যুবকটির ভাব, যেন তিনি ঈশ্বর বা লর্ড বায়রণ।" প্রকৃতপক্ষে তিনি গর্ব্বিত ছিলেন না, কেবল অল্প কথা কহিতেন ও সহজেই সাহিত্যসমাজের কৃত্রিমতা ও আন্তরিকতার অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সাহিত্যব্যবসায়ে সহানুভূতি ও মানসিক শক্তি উভয়ই ক্ষুণ্ণ হয়। প্রসিদ্ধ লেখক লেখিকারা অতি তুচ্ছ সমালোচনা কিরূপ মূল্যবান মনে করেন; প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা যশঃসংরক্ষণ ও আত্মগোপন-কল্পে কিরূপ চেষ্টা করেন, তাহা দেখিয়া সহজেই বুকাননের যৌবনের ভ্রান্তিকুহেলিকা অপসৃত হইয়া গিয়াছিল।

সাহিত্যে।

সেই সময় হইতে বাল্যে দুরদৃষ্টের প্ররোচনায় অবলম্বিত সাহিত্যব্যবসায়েই বুকানন কখনও স্বচ্ছন্দে, কখনও কষ্টে, জীবন কাটাইয়াছেন।

তাঁহার মতে, সাহিত্যসেবায় অর্থলাভ সামান্য—মানসিক ক্ষতি প্রচুর। তাঁহার সহযোগীদিগের পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিতেন, সাহিত্যসেবায় প্রায় সকলেরই অবনতি হইয়াছে। সমসাময়িক খ্যাতি লাভ করিতে হইলে লেখককে স্রোত বুঝিয়া বাহিতে হইবে; আপনার মতামত পরিত্যাগ বা গোপন করিয়া পাঠকসমাজের ইচ্ছানুরূপ মতামত ব্যক্ত করিতে হইবে। তিনি যাহার বিরুদ্ধবাদী, তাঁহাকে তাহারও বিরুদ্ধবাদ হইতে বিরত হইতে হইবে। তাঁহাকে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, জগতে প্রশংসালাভ করিলে তাহার মূল্য-স্বরূপ আপনার আত্মা দান করিতে হইবে।—স্বাতন্ত্র্য বলি দিতে হইবে। সাহিত্যসেবক সফল হইতে পারেন; যশের মুকুট লাভ করিয়া পূজ্য হইতে পারেন; সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হইতে পারেন; লোকে বলিতে পারে, তিনি নিপুণ শিল্পী, সমসাময়িক মতের অবতার ইত্যাদি;—কিন্তু তিনি আপনি জানেন যে, যশের জন্য তিনি কি ত্যাগ করিয়াছেন।

যে লেখক রচনালব্ধ অর্থে জীবনধারণ ও সংসারপালন করিতে চাহেন, তাঁহাকে সহজে-

বোধ্য ভাবে আপনার কথা প্রকাশ করিতে হইবে। কষ্ট করিয়া কে তাঁহার কথা বুঝিবে? পাঠকসাধারণ অলস শয়নে তন্দ্রাতুর; তাহারা চিত্তবিনোদনের জন্য, অবকাশরঞ্জনের আশায়, শ্রান্তিদূরীকরণমানসে পুস্তক পাঠ করে। তাহারা পুস্তকে বিপ্লবের তূর্য্যধ্বনি শুনিতে চাহে না।

টেনিসনের সাফল্যের প্রধান কারণ এই যে, তিনি তাঁহার কবিতায় কোথাও ইংলণ্ডের সাধারণ পাঠকের মত অতিক্রম করেন নাই। এই গুণের অভাবেই হুইট্‌ম্যান অনাদৃত; জর্জ্জ ইলিয়ট প্রশংসিত; কিন্তু রীড অবজ্ঞাত। আবার রচনা যেন respectable হয়। ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি,—কোনও বিষয়েই স্পষ্টবাদ সমীচীন নহে। 'ইংলণ্ডের মত দেশ আর নাই,' 'যুদ্ধে জাতীয় মহত্ত্ব বর্দ্ধিত হয়,' 'প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম অত্যন্ত উদার'—প্রভৃতি কতকগুলি বুলি নিতান্ত respectable.

সামাজিক মতের বিরুদ্ধবাদ যে যশের পক্ষে হানিজনক, গ্রাণ্ট আলেনের The Woman who did গ্রন্থেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

বুকাননের মত যদি একদেশদর্শিতাদুষ্ট না হয়, তবে সাহিত্যসমাজের অবস্থা একান্তই শোচনীয়। ইহার প্রতীকার কি অসম্ভব?

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

ভ্রমণাবদান।

আমরা বাঙ্গালী বহু অপবাদ বহু কষ্টভার স্কন্ধে বহন করিয়া বিচিত্র বিশাল ধরণীর এক প্রান্তে অবস্থান করিয়া কূপমণ্ডূকের মত সুদুর্লভ মানবজীবন কাটাইয়া দি। বাঙ্গালী আমরা যতক্ষণ অবরুদ্ধ গৃহে বসিয়া ক্ষুদ্র কলহ সংশয়ে বিব্রত, আর ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভের কল্পনায় নিমগ্ন থাকি, ততক্ষণে মনুষ্যপদবাচ্য জাতি মুক্ত বিরাট আকাশতলে বিচরণ করিয়া বিচিত্র জগৎকে দেখিয়া লয়; দুরন্ত ছেলের মত সহাস্যমুখে জোর করিয়া প্রকৃতিজননীর স্তন্য-সুধা পান করিয়া অমরতা লাভ করে। আমাদের এই হিমাদ্রিকিরীটিনী ফলপুষ্পশোভিতা পুণ্যসুমধুরা ভারতভূমির কনকরত্নোজ্জ্বল খনি-অন্তঃপুরে, বনস্পতি-সুরক্ষিত অরণ্য-দুর্গে, বিহঙ্গ-বিরাজিত স্রোতস্বিনীর কূলে কূলে ভ্রমণ করিয়া, পরবাসী জন আমাদেরই পূর্ব্বতন মঠ মন্দির প্রাসাদের ভগ্ন অবশেষ হইতে উপেক্ষিত ইতিহাসের উদ্ধার-সাধন করে, মণিরত্নমালা সংগ্রহ করিয়া লয়, জীবন্ত উল্লাসের সহিত আমাদেরই পুরাতন কীর্ত্তি সৌন্দর্য্যের সঙ্গে নূতন পরিচয় করাইয়া দিয়া যায়—কাহারা? হায়! বহুদূরাগত পরদেশবাসী—স্বদেশী নহে! ধিক্কার আসিয়া আমাদের মস্তকে পদাঘাত করিয়া যায়; তাহা আমরা জানিতেও পারি না—আমরা যে পরলোকচিন্তায় একান্ত নিমগ্ন!

কিন্তু পরিতাপ করিয়া লাভ কি? তত ক্ষণে যদি এক জন অসামান্য অধ্যবসায়ী নিঃশঙ্ক কর্ম্মযোগীর ভ্রমণকাহিনী শুনিয়া লই, তাহাতে পুণ্য আছে। আমাদের দেশে বেলেঘাটা-যাত্রীর পত্রও প্রকাশিত ও পঠিত হয়। এ অবস্থায় ডাক্তার হেডিনের পর্য্যটনকথা পাঠকেরা আনন্দবিধান করিতে পারিবে বলিয়া আশা করি।

সম্প্রতি রয়াল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটীর একটি অধিবেশনে প্রসঙ্গক্রমে প্রসিদ্ধ পর্য্যটক। ডাক্তার হেডিনের সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কোনও ইংরাজ সহযোগীর প্রবন্ধ হইতে আমরা তাঁহার ভ্রমণাবদানের সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

ডাক্তার হেডিন ইতঃপূর্ব্বে আর একবার মধ্য আসিয়ায় আসিয়া বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তথাকার বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (১) প্রথম অবদানসমাপনান্তে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ ভৌগোলিক সমাজই তাঁহাকে উচ্চতম প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন; রয়াল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটী তাঁহাকে সুবর্ণপদক পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করেন।

অষ্টাদশ মাস হইল, এই অসাধারণ কর্ম্মবীর দ্বিতীয়বার মধ্য আসিয়ায় আসিয়াছেন। ইচ্ছা, প্রাথমিক অনুসন্ধানের সাফল্যবিধান; যাহা অসম্পূর্ণ আছে, তাহার সমাপনসাধন। এবার তিনি তিব্বত অতিক্রম করিয়া সিন্ধুনদের জন্মস্থান পরিদর্শনান্তর ভারতবর্ষ হইয়া ইউরোপে ফিরিবেন। তাঁহার এই দ্বিতীয় অভিযানের সাফল্যসম্ভাবনায় বিশ্বাস করিয়া, সকলেই আশান্বিতহৃদয়ে তাঁহার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন।

সদাশয় নৃপতি অস্কার প্রথমবার তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন; এবারও ডাক্তার তাঁহারই অর্থে এসিয়ার আগমন করিয়াছেন। রুশিয়ার জার হেডিনের অধ্যবসায় ও সাফল্যে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার সহিত চার জন কসাক সেনা পাঠাইয়াছেন।

গতপূর্ব্ব বৎসরের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ডাক্তার হেডিন খাশগড়ে পঁহুছিয়া কর্ত্তব্য-ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি অধিকাংশ অনুচরকে উত্তর পথ অবলম্বনে অকসু ও কর্‌লা অতিক্রম করিয়া লবনর অভিমুখে যাইতে আদেশ দিলেন। তাহাদের সহিত পরে লবনরে সম্মিলিত হইব, এই স্থির করিয়া, তিনি নিজে স্বল্পমাত্র অনুচরের সহিত লইলিক উদ্দেশে অগ্রসর হইলেন। খাশগড় হইতে তথায় যাইতে পাঁচ দিন লাগিল। সেখানে তিনি একখানি নৌকা ক্রয় করিয়া ইয়ারকন্দ পার হইলেন। তিন মাস তাঁহাকে নৌকায় অতিবাহিত করিতে হয়। চার জন মাঝি নৌকা ধীরে ধীরে চালাইতে লাগিল, আর হেডিন নৌকার উপর একটি ছোট তাঁবু খাটাইয়া চারি দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে চলিলেন। ফটোগ্রাফ্ তুলিবার জন্যও তিনি নৌকায় একটি অন্ধকার কক্ষ করিয়া লইয়াছিলেন। জলপথে একবারমাত্র তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। এক স্থানে চড়ায় নৌকা আটকাইয়া গেল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি তৎস্থানীয় এক শত জন লোক নিযুক্ত করিলেন; তাহারা চরের উপর দিয়া নৌকা তুলিয়া লইয়া গেল। আর কোন বিপদ ঘটে নাই। তিনি নিরাপদে ইয়াঙ্গিকুলে পঁহুছিলেন। ডাক্তার বলেন, ইয়ার্‌কণ্ডেরিয়া ও তারিম নদীদ্বয়ের উপর দিয়া যাত্রা বড়ই আনন্দকর হইয়াছিল। লীলান্বিত তরঙ্গিণী আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কত দিক দিয়া চলিয়াছে; আর, আলেখ্যসুন্দর কি চমৎকার দৃশ্যরাজি! সমস্ত নদীপথ তিনি ৬০খানি বড় বড় কাগজে আঁকিয়া লইয়াছেন—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত অঙ্কিত করিয়াছেন। ইউরোপেও এমন অনেক নদী আছে, যার গতিপথ এত বিস্তৃতভাবে জানা নাই। বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি ৬০ বার জলের গভীরত্ব মাপিয়াছেন। স্থানে স্থানে তীরভূমিতে অবতরণ করিয়া বহুসংখ্যক ফটো তুলিয়াছেন। কত না ভূভাগ রেখাচিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন। ইয়াঙ্গি-কুলে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, প্রাক্ প্রেরিত সহচরবর্গ তথায় পূর্ব্বেই পঁহুছিয়াছে।

সেখানে তিনি ১০দিন মাত্র অবস্থান করিয়া কেবল চার জন অনুগামী ও সাতটি উষ্ট্র লইয়া মরুপারস্থিত চর্‌চেন্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কুড়ি দিন ধরিয়া অনন্ত বালুকা-

(১) সে বৃত্তান্ত ১৩০৪ সালের মাঘ মাসের "সাহিত্যে" সহযোগী সাহিত্যে দ্রষ্টব্য।—সাহিত্য-সম্পাদক।

পাথার অতিক্রম করিয়া তিনি উক্ত স্থানে পঁহুছিলেন। সেখানে বিশ্রাম করিলেন না। মরুপথে একটি উষ্ট্র মারা গিয়াছিল; তিনি বাকী ছয়টি উষ্ট্র ও অনুচর লইয়া নৈঋতকোণস্থ আনড্রিয়ার অভিমুখে চলিলেন। এবং আড়াই মাস যাবৎ ভ্রমণ করিয়া, গত বৎসরের ২৪এ ফেব্রুয়ারী দিবসে প্রধান শিবিরে ফিরিলেন।

মার্চ মাসের পঞ্চম দিবসে তিনি পুনর্ব্বার বহির্গত হইলেন। এবং কুরুক্‌তাজ পর্ব্বত-শ্রেণীর দক্ষিণ প্রদেশ অনুসরণ করিয়া ও কুম্‌ডেরিয়া বা 'মরু-নদীর'—পরিশুষ্ক গর্ভ অতিক্রম করিয়া, তিনি একটি প্রাচীন হ্রদগর্ভে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, স্তূপীকৃত লবণ আর বহুসংখ্যক মৃত বনস্পতি ও শুষ্ক তৃণপুঞ্জ। সেই পুরাতন হ্রদগর্ভের তটভাগে একটি নগরীর ধ্বংসাবশেষ এবং ভাস্করকার্য্যসুন্দর দারুখণ্ড ও একটি পুরাতন পুরপথ দৃষ্ট হইল। ডাক্তার হেডিন ইতঃপূর্ব্বেই "Through Asia" নামক স্বরচিত গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন, আধুনিক লব্‌নর হইতে পৃথক আর একটি লব্‌নর আছে। তাই, এই অভিনব হ্রদগর্ভ দেখিতে পাইয়া তিনি আনন্দে অভিভূত হইলেন। এই হ্রদগর্ভের নিকটেই আরও একটি নূতন হ্রদ দেখা গেল। সেটি তারিম নদীর একটি শাখা দ্বারা পরিপুষ্ট।

ইহার পর, মে মাসে একটি স্বতন্ত্র পথ দিয়া তিনি ইয়াঙ্গিকুলে ফিরিলেন। তথা হইতে শিবির উঠাইয়া, তিনি বহুতর অনুযাত্রীকে আবদল নামক স্থানে পাঠাইলেন, এবং স্বয়ং পূর্ব্ব-ক্রীত নৌকা যোগে তথায় যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। এ জলযাত্রাও বিফল হইল না। তিনি পথে তারিমনদীপুষ্ট পশ্চিমস্থ সমস্ত হ্রদগুলির আবিষ্কার করিয়া গেলেন। সেখানে কিছু দিন থাকিয়া, মন্দরলিক নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে তাঁবু ফেলিলেন।

২০শে জুলাই তারিখে তিনি উত্তর তিব্বত পরিভ্রমণ করিবার জন্য, ছয় জন পরিচারক, ৭টি উট ও ১২টি অশ্ব লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রায় সম্পূর্ণ নূতন পথ দিয়া, ৯৬৫ মাইল ভ্রমণ করিয়া, তিনি তিন মাস পরে শিবিরে ফিরিলেন। এক জন আফগান শিকারী পরিচারক এবং বহু পশু বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি অগ্নিকোণে এত দূর গিয়াছিলেন যে, ৮৪ দিন যাবৎ জনমানব দৃষ্টিগোচর হয় নাই! কি ভয়ঙ্কর বসতিহীন পরিত্যক্ত স্থান! শুধু তাই নয়। শীত অতিশয় প্রখর, তুষার-পাতে ভূমি সমাচ্ছন্ন, ঝড়ে সে স্থান ভয়ঙ্কর। তথাপি ডাক্তার হেডিন দিনে তিন বার করিয়া যন্ত্রসাহায্যে বায়বিক অবস্থার পরীক্ষা করিয়াছিলেন; তদ্দেশজাত উদ্ভিদের ও পশু প্রভৃতির অনুসন্ধান লইয়াছিলেন; এবং পর্ব্বতের উচ্চতা মাপিয়াছিলেন। সেখানকার মানচিত্র অঙ্কিত করিতেই ১৯৪ খানা বড় কাগজ লাগিয়াছে। ফটো ত অসংখ্য। ডাক্তার হেডিন শেষ পত্রে আনন্দোৎফুল্ল-চিত্তে লিখিয়াছেন, "আমার প্রাথমিক পরিশ্রমের অপেক্ষা এবারকার শ্রম বহুগুণে সফল।"

গত বৎসরের অক্টোবরের পত্রই তাঁহার শেষ পত্র। তিনি তাহাতে লিখিয়াছেন, এবারকার ভ্রমণ সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে, তিনি আর একবার তেমিরলিকের পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বতপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিবেন; এবং তথা হইতে ফিরিয়া পুনরায় লবনর প্রদেশে যাইয়া পূর্ব্বকৃত অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করিবেন—সংশয়ের আর কোনও কারণ রাখিবেন না। পূর্ব্বোক্ত ভগ্নাবশেষ দেখিয়া তিনি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন, উহা চৈনিক বুদ্ধমন্দির। আর একবার যাইয়া তাহা ভাল করিয়া দেখিবেন।

ডাক্তার হেডিন জারের এক জন সেনাকে বায়বিক ও অন্যান্য পরীক্ষা করিতে শিখাইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে সে প্রধান শিবিরে থাকিয়া, যাবতীয় পরীক্ষা সম্পাদিত করে।

গোবিন্দ দাসের করচা।

আমরা গোবিন্দ দাসের করচাখানিকে চৈতন্যচরিত-সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি পুস্তক চৈতন্যপ্রভুর তিরোধানের অনেক পরে লিখিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে মহাজনগণের জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে অলৌকিক গল্পসমূহ শীঘ্র শীঘ্র অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করে; সুতরাং লোকমুখে আখ্যানগুনিয়া তাহা গ্রন্থান্তর্গত করিতে হইলে, সত্য ও কল্পনার সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া পুস্তকখানির ঐতিহাসিক প্রামাণ্য অক্ষুণ্ণ রাখা সহজ কার্য্য হয় না। গোবিন্দ দাস মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে দুই বৎসর ভ্রমণ করিয়াছিলেন; এই দুই বৎসরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, সমস্তই তাঁহার চাক্ষুষ ঘটনা,—তদ্বর্ণিত কাহিনীতে অলৌকিক অংশ অত্যল্প। এই সকল কারণে আমাদের এই পুস্তকখানির উপর বিশেষ আস্থা জন্মিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল স্থানে চৈতন্যপ্রভু কর্ত্তৃক কোনও ব্যক্তিবিশেষের উদ্ধারসাধনের বৃত্তান্ত উল্লিখিত আছে,প্রায় তাহার সকল স্থানেই কোনও দৈব ও অলৌকিক ব্যাপারের অবতারণা করা হইয়াছে। আমাদের মতে, উহা দ্বারা বর্ণিত আখ্যানগুলির অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে। চৈতন্যপ্রভুর ভগবৎপ্রেমের আবেশ, তাঁহার বদনপদ্মপ্লাবী নয়নাশ্রু যেন পাপীর উদ্ধারের পক্ষে যথেষ্ট নহে, এই জন্য লেখকগণ কোথাও সুদর্শনচক্রের আবির্ভাব, কোথাও ষড়্ভুজপ্রকাশ প্রভৃতি ব্যাপারের শরণাপন্ন হইয়াছেন। আমরা সাধুজীবন দেখি নাই, সুতরাং সাধু মহাজনগণ জীবনে যে ঐশ্বর্য্যলীলা প্রকটিত করেন, তৎসম্বন্ধীয় আখ্যানগুলিতে সম্যক্‌রূপে আস্থাবান হইতে পারি নাই। গোবিন্দ দাসের বর্ণিত দুইটি বৎসরের বৃত্তান্তসংবলিত এই ইতিহাসখানিতেও অনেক পাপী

করচার প্রামাণিকতা।

ঐশ্বর্য্য ও প্রেম।

তাপীর উদ্ধারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু সেই সকল স্থানের প্রায় কোনও অংশেই অলৌকিক ব্যাপারের অবতারণা নাই। চৈতন্য প্রভুর অত্যাশ্চর্য্য ভগবৎপ্রেমই সেই সকল স্থানে পাপীর উদ্ধারে সমর্থ দেখিতে পাই। তিনি বটেশ্বরে তীর্থরামকে উদ্ধার করেন, মাধবীবনে ভীলপন্থী নামক তস্করকে, গীরণার পাহাড়ের নিকট মুরলী বেশ্যাদিগকে, চোরপন্থী নামক স্থানে নরোজী নামক দস্যুকে, ঘোগাগ্রামে বারমুখী নামক বেশ্যাকে ভক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানে তাঁহার সুদর্শনচক্র কিংবা ষড়ভুজপ্রদর্শনের কোনও আবশ্যক হয় নাই।

ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে এই বলিতে হইবে, সেই সময়ে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রেমলীলা সেকালেও যেরূপ সত্য বলিয়া গৃহীত ছিল, সর্ব্বকালেই তাহা থাকিবে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধের কোনও আশঙ্কা নাই।

তাহার পর চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তিনি যখন মহাভাবগ্রস্ত হইয়াছেন, তখন আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়া বৃদ্ধাচার্য্যগণের মস্তকে চরণ প্রদান করিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই,—গোবিন্দ দাসের করচায়ও ত তাঁহার মহাভাবের বৃত্তান্ত অনেক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে স্পর্দ্ধাসহকারে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিতে দেখা যায় না। এই পুস্তকখানিতে দেখা যায়, যে কেহ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্তুতি করিতে গিয়াছে, তিনি অমনই সবিনয়ে ও লজ্জাসহকারে তাহাকে ভৎর্সনা করিয়াছেন; মুদ্রিত গোবিন্দ দাসের করচার ৯২, ৯৬, ১২১, ১২৫ ১৪২, ১৯৪, ২২১ পৃষ্ঠা দেখুন। এরূপ হইতে পারে, আমরা মহাপুরুষগণের জীবনের আশ্চর্য্য শক্তি ধারণা করিতে অসমর্থ, এবং স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন অনেক ব্যাপার ঘটিতে পারে যে, আমাদের মানবীয় দর্শনশাস্ত্রানুসারে তাহার একটা ব্যাখ্যা হয় না—কিন্তু অসম্ভব ঘটনা সম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হইলেও আমাদের চিরকালই এই ধারণা বদ্ধমূল থাকিবে যে, ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা প্রেম ও ভক্তির লীলাই পৃথিবীর শুভসাধনের পক্ষে অধিক উপযোগী, এবং কোন স্বর্গের দেবতাকেও যদি মনুষ্যসমাজে আসিয়া কাজ করিতে হয়, তবে তাঁহাকে সুদর্শনচক্র বা শঙ্খ পদ্ম প্রভৃতি স্বর্গীয় হাতিয়ার না আনিয়া এই পৃথিবীর জন্য কিছু করুণা ও প্রীতি লইয়া আসিলেই ভাল হইবে; মানুষীয় গুণের দ্বারাই মানুষকে সহজে পরাভূত করা যায়।

মহাভাব।

গোবিন্দের করচার আর এক গুণ, ইহাতে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মালিন্য নাই। এই অনাবিল রচনা সর্ব্বত্র সুরুচিসঙ্গত ও সুস্বাদু। পরবর্ত্তী লেখকগণের বৈষ্ণবী বিনয়ও স্থলে স্থলে সাম্প্রদায়িকতার মিশ্রণে দুষ্ট হইয়াছে; কিন্তু যাঁহার নাম করিয়া সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি নিজে অসংশ্লিষ্ট ও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তাঁহার প্রিয় অনুচরের রচনাতে অসাম্প্রদায়িক উদারতার প্রীতিফুল্লভাব শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সকলের মনোরঞ্জন করিবে। চৈতন্যপ্রভু যেখানে যে দেবতা দেখিয়াছেন, সেই দেবতাই তাঁহার চিরারাধ্য ভগবানের স্মৃতি উদ্রিক্ত করিয়া দিয়াছেন। পরবর্ত্তী সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ তাঁহার এই জগৎপূজ্য পবিত্র চরিত্রকে একদেশদর্শিনী সংকীর্ণতায় সংক্ষুব্ধ করিয়া শাক্ত বৈষ্ণবের কোলাহলময় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিদ্বেষপ্রণোদিত সাম্প্রদায়িক ভাবের অণুমাত্রও তাঁহার অনুমোদিত ছিল না; নারায়ণগড়ে তিনি "ধলেশ্বর" শিবদর্শনে—

চৈতন্যপ্রভুর অসাম্প্রদায়িক ভাব।

"হর হর বলি প্রভু উচ্চরব করি। আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি॥"

জলেশ্বরের বিলেশ্বর শিবের দর্শনেও তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাস হইয়াছিল; বেঙ্কেট-নগরের নিকট "গিরীশ্বর" শিবের দর্শনের কামনায় তিনি দীর্ঘ পথ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; পাটস গ্রামের নিকট ভোলেশ্বর শিবদর্শনে

"প্রভুর প্রেম উপজিল। অজ্ঞান হইয়া গোরা পড়িয়া ধরায়।
জোড়হস্তে স্তব স্তুতি বহুত করিল। উলটি পালটি কত গড়াগড়ি যায়॥"

এবং সোমনাথদর্শনে তাঁহার যে ব্যাকুলতা হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ত্রিমুকের নিকট রামের চরণচিহ্ন দেখিয়া পঞ্চবটী বনে

"চরণের চিহ্ন প্রভু করিয়া পরশ। অবশেষে মোর কণ্ঠ আঁকড়ি ধরিয়া।
গাঢ়তর প্রেমভরে হইলা অবশ। কোথা মোর রাম বলি উঠিল কান্দিয়া॥"

যাইয়া তিনি 'গণেশ' বিগ্রহ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। পদ্মকোট তীর্থে দেবী অষ্টভুজা ভগবতী দেখিবার জন্য গমন করেন, এবং "সেখানেই প্রভু গিয়া করিল প্রণতি।" দমননগরের নিকট সুরথপ্রতিষ্ঠিত অষ্টভুজা শক্তিমূর্ত্তি "দেখি প্রভু ধরণী লুটায়", এবং সেই মূর্ত্তি

"দেখিয়া নয়নে। তিন দিন বাস করে প্রভু সেই স্থানে।"

এইরূপ, বহু স্থলেই তাঁহার উদারভক্তিমূলক ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। "না করিব অন্য দেব নিন্দন বন্দন" এই কথায় চৈতন্যদেবের স্বাক্ষর

কোথায় ? তিনি ত শ্রীকৃষ্ণের সেবক, শিবের সেবক, রামের সেবক, অষ্টভুজার সেবক, গণেশের সেবক,—কিংবা এ সকলের কাহারও সেবক নহেন। এই সমস্ত বিগ্রহ চিহ্নস্বরূপ যাঁহার কথা আভাষে জ্ঞাপন করিতেছে, তিনি তাঁহারই প্রকৃত সেবক ; যে কথা তাঁহার বিরহমথিত হৃদয়ে অশ্রুর অক্ষরে চিরলিখিত ছিল, সেই অন্তঃপ্রবাহিত চিরনির্ম্মল ঈশ্বরকথা—যে স্থানে লোকভক্তির চিহ্নিত স্থান,—তীর্থভূমি, সেই স্থানে কিংবা সর্ব্বত্রই উদ্রিক্ত হইয়াছে। এবং ইহা নিশ্চিত যে, শ্রেণীবিশেষকে বিশেষরূপে আপ্যায়িত করিবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই।

গোবিন্দের সরলতা ও আড়ম্বরশূন্যতা করচার সর্ব্বত্রই বিশেষরূপ দ্রষ্টব্য। সামান্য ঘটনাগুলি নিপুণ কবির স্পষ্ট ও সংযত বর্ণনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার নিজসম্বন্ধীয় বর্ণনাগুলি এত দূর অকৃত্রিম ও অভিমানশূন্য যে, সময় সময় তাঁহার চরিত্রকে তিনি অনাহূতভাবে নিজেই উপহাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন ; কোথাও একটা 'পরেটা ফল', একটা 'লাড্ডু' ও গুড়সংযুক্ত 'চুক্রাম্ল' দেখিয়া খাইবার প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তিকে তিনি নৈতিক চক্ষে দেখিয়া অতিরঞ্জিত অপরাধের শ্রেণীতে গণ্য করিয়াছেন। নিজে অবশ্য স্বচরিত্রকে একটু সভ্যভব্য ও সুমার্জ্জিত করিয়া বর্ণনা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি আদৌ করেন নাই। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের সময় গোবিন্দও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তিনি যতই কেন ক্ষুদ্র হউন না, এই বিষম সংসার-কারাগৃহের শৃঙ্খল তাঁহার পক্ষেও প্রভূতশক্তিশালী ছিল, সন্দেহ নাই।

গোবিন্দের চরিত্র।

"সোনার শৃঙ্খল মায়া লৌহের শৃঙ্খল। স্বর্ণমত মনোরম লৌহ মত দৃঢ়।"

ইহা ছেদন করা তাঁহার পক্ষে সহজ কার্য্য ছিল না ; কিন্তু তিনি তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বলা আবশ্যক মনে করেন নাই। অনেক কবিই এতদুপলক্ষে বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের ছদ্মবেশে আত্মবিজৃম্ভণ করিতে ছাড়িতেন না। গোবিন্দের মুখে এই সন্ন্যাসের কথা বহুদিন পরে অপর এক প্রসঙ্গে অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হইয়াছিল,—কাঞ্চন-নগরে পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তনের কথা শুনিয়া তিনি এই বলিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন,

"প্রভুর সন্ন্যাসকালে ধরেছি কৌপীন। অহঙ্কার ত্যজিয়া হয়েছি অতি দীন।
আর ত বাসনা নাই সংসার করিতে।"

তাঁহার স্ত্রী যখন মর্ম্মভেদী দুঃখের কথা বলিয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরাইতে

চাহিয়াছিলেন, তখন সংসার আবার সুন্দর ও করুণ আহ্বানে তাঁহাকে শৃঙ্খল পরাইতে আসিয়াছে, এই ভয়ে ভীত হইয়া গোবিন্দ ঈশ্বরের শরণ লইয়াছিলেন,—

"শুনিয়া তাহার কথা মাথা হেট করি। হরি-শরণেতে কাটি যতেক বন্ধন।
মনে মনে বলিতে লাগিনু হরি হরি। তে-কারণে মনে করি হরির চরণ।"

তাঁহার প্রভুভক্তি।

মিষ্টান্নব্যবসায়ী মিষ্টের স্বাদ ভুলিয়া যায়, কিন্তু তথাপি মিষ্টদ্রব্য লইয়া নাড়াচাড়া না করিয়া থাকিতে পারে না, উহা তাহার জীবিকা ও মুখ্যচিন্তা; চৈতন্যদেবের ভক্তির উচ্ছ্বাস, যাহা দেখিয়া সমস্ত লোক অশ্রুসিক্ত হইয়াছে, যে ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া গোবিন্দ প্রথম দিন বলিয়াছিলেন—"ইচ্ছা অশ্রুজলে মুঞি পাখালি চরণ", সর্ব্বদা সাহচর্য্যহেতু সেই ভক্তিবিহ্বলতায় গোবিন্দ একান্তরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে ধরিত্রী প্রবল ভক্তিবন্যায় টলমল করিতেছিল,কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সে দৃশ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন, এ কথা বলেন নাই। কিন্তু কোনও কোনও মুহূর্ত্তে স্বর্গীয় ভাবে তাঁহার হৃদয় অভিভূত উদ্দাম হয় নাই, এমন নহে। অগস্ত্যকুণ্ডতীরে একদিন চৈতন্যপ্রভুর ভক্তি-দর্শনে গোবিন্দ এই দুইটি ছত্র লিখিয়াছেন,—

"প্রভুর মুখেতে নাম শুনিয়াছি কত। আজি কিন্তু দেহ মোর হৈল পুলকিত॥"

নিত্য দেবলীলা দেখিতে দেখিতে তিনি লীলারসের নিত্য নূতন আস্বাদ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রকৃত ভক্তির হ্রাস হয় নাই; যেমন গঙ্গাতীরবাসী লোক মফঃস্বলের লোকের ন্যায় গঙ্গাদর্শনে হঠাৎ আনন্দ বোধ করে না, অথচ গঙ্গাতীর ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে পারে না। দুই দিনের জন্য প্রভুসঙ্গবিচ্যুত হইয়া মনের দুঃখে গোবিন্দ "মোর চক্ষে শত ধারা বহিতে লাগিল" বলিয়া কাতরতা দেখাইয়াছেন।

তাঁহার নৈতিক জীবন।

গোবিন্দের নৈতিক জীবন বড় নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ ছিল। তাহা বাক্যপল্লব-পরম্পরায় তিনি নিজে কীর্ত্তন করেন নাই, কিন্তু সহসা দুই একটি বাক্য তাঁহার সমগ্র চরিত্রের উপর এক পবিত্র মধুর আলোকপাত করিয়া দিয়াছে। চৈতন্য-দেব দস্যু, তস্কর প্রভৃতির নিকট গিয়াছেন, গোবিন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার পশ্চাৎগামী হইয়াছেন। চৈতন্যপ্রভুর কোনও অভিপ্রায়ে তিনি ইঙ্গিতেও বাধা দেন নাই, কিন্তু যেদিন প্রভু মবলী বেশ্যাদিগের নিকট যাইতে উদ্যত

সেদিন গোবিন্দ একটু আপত্তি করিয়াছিলেন। এই একমাত্র আপত্তি,—

"সে স্থানেতে গিয়া কাজ নাই। না শুনিল মোর বাণী চৈতন্য গোঁসাই॥"

তাঁহার নৈতিক সাবধানতার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

গোবিন্দ যে স্থলে চৈতন্যদেবের রূপের বর্ণনা করিতে গিয়াছেন, সে স্থলে তাঁহার হৃদয়ের গাঢ়ভক্তিপ্রণোদিত কবিত্ব উদ্রিক্ত হইয়াছে:—

তাঁহার সত্যপ্রিয়তা।

"যদ্যপি দাঁড়ায় প্রভু অন্ধকার ঘরে। শরীরের প্রভায় আঁধার নাশ করে॥"

এ সব কথায় একটু কল্পনা না আছে এমন নহে, ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু দৈনন্দিন ঘটনা তিনি কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত করেন নাই। সেরূপ অতিরঞ্জন সত্যনিষ্ঠ, বিষয়নিঃস্পৃহ ভক্তির অবতার চৈতন্যদেবের অনুচরের অনুপযুক্ত হইত। মহারাষ্ট্র ও তন্নিকটবর্ত্তী অপরাপর দেশের লোকের কথা গোবিন্দ বুঝিতে পারেন নাই। বগুলাবনে

"একজন লোক আসি কাঁই মাই করি। তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমঝিয়া।
কি বলিল আমি সব বুঝিতে না পারি। কাঁইমাই বলি তারে দিলেন বুঝায়ে॥"

এ স্থলে পাঠকের মনে হইতে পারে, চৈতন্যপ্রভু স্বর্গীয় শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু গোবিন্দ সেরূপ অলৌকিক কল্পনা করিবার আদৌ সুবিধা দেন নাই। কিছু পরেই লিখিয়াছেন:—

"এই দেশে ভ্রমি দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বুঝে শচীর দুলাল॥"

চৈতন্যপ্রভুর স্বর্গীয় ভক্তিপ্রভাবের আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তিতে দস্যু-তস্কর, বেশ্যা উদ্ধার পাইয়াছে; যেখানে সে ভক্তির বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে, সে স্থান তীর্থধামের তুল্য পবিত্র হইয়াছে; পাষণ্ড নাস্তিকের মন ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু দুই এক স্থলে বিষয়বুদ্ধিদুষ্ট, অর্থযৌবনস্পর্দ্ধিত ব্যক্তি সে প্রভাবে প্রভাবিত হয় নাই, নরসমাজে এমন দুই এক জন আছে, সম্যক অভিব্যক্ত সাধুজীবনের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ যাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। ভগবান পশুকে পুষ্পশোভা ও পুষ্পগন্ধ উপভোগ করিবার শক্তি দেন নাই। হাজিপুরে কেশব সামন্ত চৈতন্যপ্রভুকে কটূক্তি করিয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যপ্রভু তাহাকে ভক্তি দিতে পারেন নাই, তাঁহার চেষ্টা সে স্থলে বিফল হইয়াছিল, গোবিন্দ তাহা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। কেশব সামন্তের ব্যবহার দেখিয়া চৈতন্যপ্রভু হাজিপুর ত্যাগ করিলেন:—

"নারায়ণগড় পানে চল মোরা যাই। সেখানে গেলে যদি কোন সুখ পাই॥"

এইরূপ ভাবের কথা চৈতন্যপ্রভু সম্বন্ধে অন্য কোন পুস্তকে আছে বলিয়া আমরা জানি না, কিন্তু ইহা সত্বেও আমরা পুনরায় বলিতেছি, এই সত্য-ভাষী সেবকের লেখনীতে চৈতন্যদেবের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে, অন্যত্র তাহা বিরল।

পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন।

বহুদিনের কৃচ্ছ্র সাধনে কৃশশরীর, সমস্ত দাক্ষিণাত্য পর্য্যটনে উপবাসে ও ভক্তিবিহ্বলতায় ব্যাকুল চৈতন্যদেবের পরিম্লদিতকমল-নিভ সুক্ষীণ অথচ মনোহর দেহযষ্টিতে ছিন্ন বহির্বাস ও পরিক্ষিপ্ত ধূলিরেণু বিরাজ করিতেছিল, এবং তাহা যুগপৎ কারুণ্য ও ভাল-বাসার পরিক্লিষ্ট লাবণ্যে হেমন্তের পদ্মের শ্রী ধারণ করিয়াছিল,—

"ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ। সদা উন্মত্ত প্রভু কৃষ্ণেতে আবেশ॥
সব অঙ্গে ধূলি মাখা মুদিত নয়ন।"

এই শ্রীমূর্ত্তির দর্শনলোলুপ সমস্ত বঙ্গদেশ, নবদ্বীপ ও উড়িষ্যার পণ্ডিত ভক্তমণ্ডলী—চিরবিরহক্লিষ্ট হইয়া ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল, প্রভু ত তাহাদিগকে স্মরণ করেন নাই,—কিন্তু তাহারা প্রভুদর্শন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে জীবনধারণ করে নাই। এই সুদীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যে চৈতন্য দেব একদিনমাত্র প্রলাপে নরহরির নাম করিয়াছিলেন,—

"কখন বলে এস প্রাণ হরি। কৃষ্ণনাম শুনে তোরে আলিঙ্গন করি॥

তাহারা ত দিবারাত্র গৌর-নাম লইয়া কাঁদিতেছিল, সঙ্গে যাইবার অনুমতি পায় নাই; কিন্তু সেই স্বর্গীয় সঙ্গের স্মৃতিসুখে তাহারা পার্থিব কষ্ট ভুলিয়াছিল। তিনি দুই বৎসর পরে আসিতেছেন, এই সংবাদ চকিতে বঙ্গদেশময় পরি-ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেই অসম্ভব সুখাস্বাদনের প্রত্যাশায় প্রত্যেক ভক্তের হৃদয় বিহ্বল হইল। চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণাগমনতৃষিতা রাধিকার এই অবস্থার বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

"চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে, পুলক যৌবন ভার
বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে দুলিছে হিয়ার হার॥"

দুই বৎসর পরে ভক্তগণের জীবনে এই শুভ মুহূর্ত্ত ফিরিয়া আসিল। তাহারা যে সমারোহপূর্ণ আনন্দোৎসবের সহিত প্রভুর অভ্যর্থনা করিল, তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব সুখের চিত্রপটের ন্যায় গোবিন্দ দাস আঁকিয়া দেখাই-য়াছেন। আমরা সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম :—

আলালনাথের কাছে প্রভু যবে আসে। খঞ্জন আচার্য্য আসে গাঢ় অনুরাগে।
গদাধর মুরারি ছুটিয়া আইল পাশে॥ খোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে॥

সার্ব্বভৌম আসে দুই ডঙ্কা বাজাইয়া।
নরহরি দেখা দেয় নিশান লইয়া॥
হরিদাস রামদাস আর কৃষ্ণদাস।
ব্যগ্র হইয়া আসে সবে ঘন বহে শ্বাস॥
জগন্নাথ দাস আর দেবকীনন্দন।
ছোট হরিদাস আর গায়ক লক্ষ্মণ॥
বিষ্ণুদাস পুরীদাস আর দামোদর।
নারায়ণ তীর্থ আর দাস গিরিধর॥
গিরিপুরী সরস্বতী অসংখ্য ব্রাহ্মণ।
প্রভুরে দেখিতে সবে করে আগমন॥
রামশিঙ্গা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত।
বলরামদাস আসে হয়ে পুলকিত॥
শত শত পণ্ডিত গোঁসাই দেখা দিল।
আনন্দে আমার চিত্ত নাচিতে লাগিল॥
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গান গায়।
এক মুখে সে আনন্দ কহনে না যায়॥
হাজার হাজার লোক প্রভুকে ঘেরিয়া।
নাম আরম্ভিলা সব আনন্দে মাতিয়া॥
মুরারি মুকুন্দে প্রভু কোল দিতে গেলা।
হাঁটুর নিকটে গুপ্ত ঢলিয়া পড়িলা॥
সিদ্ধ কৃষ্ণদাস আসি প্রণাম করিল।
হাত ধরি তুলি তাঁরে প্রভু আলিঙ্গিল॥
একত্রে মিলিয়া আর আর ভক্তগণে।
প্রভুকে লইতে সবে করে আগমনে॥
মাদল বাজায় যত বৈষ্ণবের দল।
আনন্দে করয়ে প্রভুর আঁখি ছল ছল॥
কীর্ত্তন করয়ে যত বৈষ্ণব মিলিয়া।
মাথা তুলাইয়া নাচে গোরা বিনোদিয়া॥
খঞ্জনে দেখিয়া প্রভু দিয়া হরিবোল।
দুই বাহু পসারিয়া দিলা তারে কোল॥
নাচিতে লাগিলা গোরা বাহু পসারিয়া।
সার্ব্বভৌম পদতলে পড়িল লুটিয়া॥
হাত জোড়ি সার্ব্বভৌম কহিতে লাগিল।
তোমার বিরহ-বাণ হৃদয়ে বিন্ধিল॥
বড় মূঢ় বলি তব বিরহ সহিয়া।
এত দিন আছি মুহি পরাণ ধরিয়া॥
শ্বেত নীল বিচিত্র পতাকা শত শত।
গুড়ু গুড়ু শব্দ করি ডাকে বাজে কত॥
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দে মাতিয়া।
একদৃষ্টে কত লোক রহিল চাহিয়া॥
হেলিতে দুলিতে যায় শচীর দুলাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
হস্ত তুলি নাচিতে লাগিল গদাধর।
রঘুনাথ দাস নাচে আর দামোদর॥
প্রভু পুছে রঘুনাথে আদর করিয়া।
বড়ই আনন্দ পাই তোমারে দেখিয়া॥
রঘুনাথে কোল দিতে যান গোরা রায়।
রঘুনাথ পদতলে পড়িয়া লুটায়॥
মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পৌঁছায়॥
অপরাহ্নে মহাপ্রভু পুরীতে পৌঁছিলা।
কোটি কোটি লোক তথা আসি ঝাঁকি দিলা।
ধুলাপায় প্রভু বহু লোক করি সাথ।
হেরিলেন মন্দিরে প্রবেশি জগন্নাথ॥
একদৃষ্টে মহাবিষ্ণু দেখিতে দেখিতে।
দর দর প্রেমঅশ্রু লাগিল বহিতে॥
একবারে জ্ঞানশূন্য হয়ে গোরা রায়।
অমনি আছাড় খেয়ে পড়িল ধরায়॥
ধন্য হইলাম আজি এই কথা বলি।
আনন্দে সকলে নাচে দিয়ে করতালি॥
বড় পটু রামদাস ভেরী বাজাইতে।
এই জন্য নিত্য আসে কীর্ত্তনের ভিতে॥
বড় ভক্ত রামদাস প্রেম অনুরাগে।
ভেরী বাজাইয়া চলে কীর্ত্তনের আগে॥
আনন্দে প্রতাপ রুদ্র ছাড়ি রাজাপাট।
মিশ্রের ভবনে আসি নিত্য দেখে নাট॥

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ভারতবর্ষ।

পুরাণপাঠকালে কখনও কখনও বোধ হয়, পুরাণলিখিত দেশ ও নদী প্রভৃতির নাম বুঝি কাল্পনিক; কিন্তু বৈদেশিক ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে আমাদের সে ভ্রম বিদূরিত হয়। অদ্য আমরা গ্রীক ভৌগোলিক টলেমির গ্রন্থ অবলম্বনে ভারতবর্ষের ভূগোল ও ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিব। টলেমি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নগরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

ষ্ট্রাবো সিন্ধুনদীকে ভারতের পশ্চিমসীমা ধরিয়াছেন, কিন্তু টলেমি আফ্‌-গানিস্থান ও বেলুচিস্থানের কিয়দংশকে ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিবেচনা করিয়াছেন। টলেমির বর্ণনা অসঙ্গত নয়; কারণ, ঐ সকল স্থানের নাম সংস্কৃতভাষামূলক, এবং মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ সকল স্থানে হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিতেন। প্রাচীনকালে আফগানিস্থানে গান্ধার, কপিশা ও কুভা প্রভৃতি হিন্দু রাজ্য ছিল। বাল্‌খের প্রাচীন নাম বাহ্লীক। মহাভারতে দেখিতে পাই, বাহ্লীক রাজ্যে কুরুবংশের এক শাখা রাজত্ব করিতেন। পেশোয়ারের প্রাচীন নাম পৌষ্যপুর ও পুরুষপুর। গজনীরাজ সবক্তগিণের সময়ে এই রাজ্য মুসলমানদের অধিকৃত হয়। টলেমি ইমায়ুস্ পর্ব্বতকে ভারতের উত্তরসীমা ধরিয়াছেন। ইমায়ুস্ হিম শব্দের আকার-বিশেষ। বোখারা ও সমরখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের নাম সগ্‌দিয়ানা। সগ্‌দিয়ানার আধুনিক নাম পামীর মালভূমি। পামীর অধিত্যকার অন্য নাম ব্রহ্মডাঙ্গা। সগ্‌দিয়ানার পূর্ব্বভাগে শকেইদের দেশ। এই রাজ্যের কিরাতাই জাতি যাযাবর আশ্রমী। পৌরাণিক গ্রন্থে এই জাতির কিরাত নাম লিখিত আছে। শকেই ও কামোদেই জাতি যে শক ও কাম্বোজ জাতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও হিন্দুকুশ পর্ব্বতে কাম্বোজ জাতি বাস করিতেছে।

টলেমি সৌরাষ্ট্র রাজ্যের উর্ব্বরা ভূমি, সৌন্দর্য্যপূর্ণ অধিবাসিবর্গ ও কার্পাসবস্ত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। গুজরাটের প্রাচীন নাম সৌরাষ্ট্র; সুরাষ্ট্র নগর, সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত। সুরাষ্ট্রের স্থানে এখন জুনাগড়

গীর্ণার পাহাড়। এই পাহাড়ে অশোক, স্কন্দগুপ্ত ও রুদ্রদাসের অনুশাসন ক্ষোদিত আছে। ভবনগরের নিকট, প্রাচীন বল্লভীনগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

লারিক রাজ্যের সংস্কৃত নাম রাষ্ট্রিক। ইহা গুর্জ্জর দেশের এক অংশ। গুজরাটের এক নাম লাটলেন। এ দেশের সংস্কৃত রচনার রীতিকে লাটী রীতি বলে। লাটদেশের নাগর ব্রাহ্মণেরা নাগরী অক্ষরের সৃষ্টিকর্ত্তা। টলেমির বারিগাজার সংস্কৃত নাম ভৃগুকচ্ছ। ভৃগুকচ্ছের আধুনিক নাম বরোচ। মগধ সাম্রাজ্যের উন্নতির সময় পূর্ব্ব ও অপরান্ত সমুদ্রকূলে তাম্রলিপ্ত ও ভৃগুকচ্ছ দুইটি প্রধান পোততীর্থ (বন্দর) ছিল। রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে এই দুই নগর পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম বিসারিত ছিল।

টলেমির আরিযাকি বা আর্য্যকী, মহারাষ্ট্র দেশ। দক্ষিণাপথের অনার্য্যদেশের মধ্যে আর্য্য রাজ্য মহারাষ্ট্র দেশের আরিয়াকি নাম হইয়াছিল। এই রাজ্য অংশত্রয়ে বিভক্ত ছিল। উপকূলাংশ একটি বণিক্‌সমিতি কর্ত্তৃক শাসিত হইত। অন্যান্য অংশ অন্ধ্রারাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। কল্যাণ নগর তখন মহারাষ্ট্রের প্রধান নগর ছিল।

সুপার নামক বাণিজ্যস্থানের অবস্থাননির্ণয়ে পণ্ডিতগণের বিস্তর মতবৈষম্য দৃষ্ট হয়। সৌবীরের রাজনৈতিক অংশ, তখন সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুপার, সৌবীর শব্দের, এবং অফির আভীর শব্দ হইতে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। অপরান্ত সমুদ্র (আরব সাগর) তৎকালে জলদস্যুগণের উপদ্রবে বিভীষিকাময়ী ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, অসুরগণ সমুদ্র হইতে জনপদে আপতিত হইয়া তাহার সর্ব্বনাশসাধন করিত। জলদস্যুগণকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে। দেবগণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অসুরেরা সমুদ্রে পলায়ন করিয়াছিল, ইহার এইরূপ অর্থ হওয়া সম্ভব যে, আর্য্যগণ কর্ত্তৃক ভ্রষ্টাধিকার ও নির্ব্বাসিত অনার্য্যগণ সমুদ্র আশ্রয়ে আর্য্যগণকে উৎপীড়িত করিত। মঙ্গলুরের প্রাচীন নাম নিত্রাবন্দর, ইহা জলদস্যুগণের একটি প্রধান আড্ডা ছিল।

মলবার উপকূলে ব্রহ্মাগার নামক স্থানের নাম লিখিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ, আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দক্ষিণাপথে উপনিবিষ্ট হইতেন। প্রবাদ আছে, পরশুরাম আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া এই প্রদেশের

৬১টি গ্রামে উপনিবেশিত করান। তাঁহাদের আগমনে অনার্য্যদিগের মধ্যে সভ্যতার বিস্তার হয়। অগস্ত্য ঋষির নিকট সমুদায় অনার্য্যগণ ঋণী। ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের নাম অগ্রহার। ব্রাহ্মণেরা অনার্য্যগণের সঙ্গে না মিশিয়াও তাহাদের উপকারসাধন করিতেন। অগ্রহারগুলি সাধারণতন্ত্র প্রণালী অনুসারে শাসিত হইত।

টলেমির কুমারিয়া বর্ত্তমান কুমারিকা। দুর্গার এক নাম কুমারী। কুমারীদেবীর মূর্ত্তি থাকাতে এই প্রদেশের কুমারিকা নাম হইয়াছিল। "সসিকোরেই"র বর্ত্তমান নাম তুতিকোরিণ। তুতিকোরিণ একটি প্রধান বন্দর। তৎকালে মুক্তা উত্তোলনের জন্য এই নগরের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রভাগ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইহার তামিল নাম কল্‌কি। এই নগরে পাণ্ড্যরাজগণের প্রাথমিক রাজধানী ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য পাণ্ড্যরাজ্য শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। টলেমির গ্রন্থে তাম্রপর্ণীকে সোলেন বলা হইয়াছে। পালিভাষায় তাম্রপর্ণীর নাম তাম্বাপাণি। কি জন্য তাম্রপর্ণী নাম হইয়াছে, জানা যায় না। তাম্রপর্ণী সমুদ্রসঙ্গমে পূর্ব্বকালে মুক্তা উত্তোলিত হইত। রঘুবংশে লিখিত আছে,—এদেশীয় রাজগণ তাম্রপর্ণী সঙ্গমের মুক্তাফল দিয়া দিগ্‌বিজয়ী রঘুরাজের সন্তোষসাধন করিয়াছিল। টলেমির পাণ্ডিয়ন্ রাজ্য, পাণ্ড্যরাজ্যের নাম। এই রাজ্য তিনিভেলি জেলার অধিকাংশ লইয়া কোইম্বাটুরের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সময়ে সময়ে এই রাজ্য অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতিলাভ করিত। মদুরা নগরে এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। তামিল ভাষার রীত্যনুসারে মথুরার উচ্চারণ মদুরা। আর্য্যগণ গুর্জ্জর হইতে আসিয়া এই রাজ্যের স্থাপন করেন। কোরি অন্তরীপের আধুনিক নাম কালিমিয়র। মান্নার উপসাগরে, লঙ্কা ও ভারতের মধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দ্বীপসমূহ রামধনু নামে উক্ত হইত। ধনুকের প্রান্তদ্বয়কে কোটি বলে। এই কোটি হইতে কোরি-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কোড়ি, গুড়ি প্রভৃতি শব্দের মূল সংস্কৃত কোটি শব্দ। টলেমির গ্রন্থে ত্রিবাঙ্কোড়ের নাম প্যারালিয়া। ত্রিবাঙ্কোড়ের এক প্রাচীন নাম পুরালী, তত্রত্য রাজার উপাধি পুরালীশান ছিল। দ্রাবিড়রাজ্যের উত্তরাংশ সে সময়ে চোল জাতির অধিকৃত ছিল। কাবেরীর নাম খাবারম্ লিখিত হইয়াছে। কাবেরীর অপর নাম অর্দ্ধগঙ্গা। অনুমান হয়, গঙ্গাতীর হইতে

কণ্টকস্থল। নানিগেইলার আধুনিক নাম পুরী। টলেমি উড়িষ্যার যে চারিটি নদীর নাম লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে মানদা, মহানদী, ব্রাহ্মণী, বৈতরিণী ও সুবর্ণরেখার নামের সহ তাঁহার প্রদত্ত নামের কোনরূপ বর্ণ-সাম্য নাই। সুবর্ণরেখা নদীর মোহনায় কুশাম্ব নামক যে নগর ছিল, এখন তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। পূর্ব্বকালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যমুনাতীরে কৌশাম্বী নাম্নী একটি বিখ্যাত নগরী ছিল। হস্তিনা গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিলে এই নগরে কৌরব সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়। রামায়ণ, মহাবংশ ও কালিদাসের মেঘদূতে কৌশাম্বীর নাম আছে। কৌশাম্বী, বৌদ্ধদিগের একটি পবিত্র স্থান। বোধ হয়, এই কৌশাম্বীর কেহ সুবর্ণরেখা তীরে কোশাম্বনগর স্থাপন করিয়াছিল।

টলেমি, গঙ্গার যে পাঁচটি শাখার নাম লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বপশ্চিম শাখা বোধ হয় হুগলী নদী। ইহা তাম্রলিপ্তির নিকট সাগর স্পর্শ করিয়াছিল। সর্ব্ব পূর্ব্বশাখা বোধ হয় ঢাকার নিকটবর্ত্তী বুড়িগঙ্গা। টলেমির প্রদত্ত নামের সঙ্গে গঙ্গার কোন শাখার বর্ণ-সাম্য বা ধ্বনি-সাম্য নাই।

হিন্দু ভৌগোলিকেরা ভারতবর্ষের মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, পারিযাত্র ও বিন্ধ্য,—এই সাতটি কুলপর্ব্বতের নাম করিয়াছেন। টলেমির গ্রন্থে কেবল উইন্দিয়নের অর্থাৎ বিন্ধ্যের নাম পাওয়া যায়। অপকোপ আর্ব্বলি শৃঙ্গ অর্ব্বুদ অর্থাৎ আবুগিরি। কোন সময়ে ভূমিকম্পে এই পর্ব্বতে একটি প্রকাণ্ড ছিদ্র উৎপন্ন হয়। তখনকার লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, দেবতাদের কোপে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। টলেমির গ্রন্থে পঞ্জাবের বিস্তর নদীর নাম আছে। ঋগ্বেদে পঞ্জাবের সিন্ধু, সরস্বতী, শুতুদ্রি, পরুষ্ণি, মরুদ্বৃধা, অসিক্নী, আর্জিকীয়া, সুসোমা, তৃস্তোমা, সসর্ত্তু, রসা, শ্বেতী, গোমতী, কুর্ম্মু, কুভা, মেহেত্নু নদীর নাম আছে। টলেমির গ্রন্থে কুভার নাম কুয়া লিখিত হইয়াছে। মহাভারতে শ্বেতীর নাম সুবাস্তু, ইহার আধুনিক নাম সোয়াট্। পূর্ব্বে পঞ্জাবকে সপ্তসিন্ধু বলিত। সিন্ধু, সিন্ধুর পঞ্চ উপনদী ও সরস্বতী, এই সপ্তনদী যে প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহারই নাম সপ্তসিন্ধু। কেহ কেহ বলেন, অক্সস্ নদীর সপ্তপ্রধান স্রোতের নাম সপ্তসিন্ধু। তাহা হইলে, সপ্তসিন্ধু আদিম আর্য্যস্থানে গিয়া পড়ে। বাইডাস্পেস্ সিন্ধুর সর্ব্বপশ্চিম উপনদী। এখন ইহাকে

বলিত। কাশ্মীরে ইহার নাম বিদস্তা, ইহা বিতস্তা শব্দ হইতে উৎপন্ন। বিতস্তা শব্দের অর্থ বিস্তীর্ণা। চান্দাবল, চন্দ্রভাগার নাম। ইহার বৈদিক নাম অসিক্নী। কৃষ্ণবর্ণজলের জন্য অসিক্না (অসিতা-অসিক্নী) নাম হইয়াছিল। আলেক্‌জেণ্ডারের সঙ্গিগণ ইহার তুমুল জলকল্লোল শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। বিপাশা, ইরাবতী ও শতদ্রুর আধুনিক নাম বিয়াস্, রাবি ও শতলেজ্। শতদ্রু কোনও সময়ে স্বতন্ত্রভাবে শতমুখে সমুদ্রে পড়িয়াছিল। শতদ্রু ও বিপাশায় বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের স্মৃতি জড়িত আছে। টলেমির জায়ামোনা, সারাবস্ ও শোয়া, যমুনা, সরযূ ও শোণের নাম। ভাগীরথী গঙ্গার মূল শাখা না হইলে হিন্দুর নিকট ইহা পদ্মা অপেক্ষা পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত না। ভাগীরথী তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। পশ্চিম শাখা সরস্বতী জলেশ্বরের নিকট সমুদ্রে পড়িয়াছে। টলেমি এই মোহনাকে কাম্বিসন্ বলিয়াছেন। জলেশ্বর নদীর সংস্কৃত নাম শক্তিমতী। উহার অন্য নাম কম্বুজা। শঙ্খোৎপত্তির জন্য উহার কম্বুজা নাম হইয়াছিল। কাম্বিসন্ এই কম্বুজা-শব্দজ। সরস্বতী ও ভাগীরথীর নিম্নভাগ পূর্ব্বে রূপনারায়ণ নামক প্রবাহ দ্বারা সংযুক্ত ছিল। টলেমিও গঙ্গার প্রকাণ্ড পূর্ব্বগামিনী শাখা পদ্মা বা পদ্মগঙ্গার নাম লিখিয়াছেন। এই শাখা হরিণঘণ্টা মোহনার দ্বীপসমাকীর্ণ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল।

টলেমি আফ্‌গানিস্থান ও পঞ্চনদ সীমান্তে যে সকল দেশের নাম লিখিয়াছেন, তৎসমুদয়ের অধিকাংশের নাম মহাভারতে ও পুরাণে পাওয়া যায়। তাঁহার সময়ে মেঘবাহন কাশ্মীরের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। তাঁহার রাজ্য গঙ্গা ও যমুনানদী স্পর্শ করিয়াছিল। গঙ্গা ও শতদ্রুর উদ্ভবস্থানের মধ্যবর্ত্তী দেশের নাম কিলিণ্ড্রিনি। ইহার সংস্কৃত নাম কুলিন্দ। কুলিন্দ জাতি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সুবর্ণ উপহার দিয়াছিল। বিপাশার প্রথমাংশ যে দেশ দিয়া প্রবাহিত, বরাহসংহিতায় তাহার কুলূত নাম দৃষ্ট হয়। জোলামাবাদের নিকটবর্ত্তী ময়দান পূর্ব্বে নগরহার নামে কথিত হইত। এই প্রদেশে বৌদ্ধকীর্ত্তির প্রচুর ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। গান্ধার রাজ্য সিন্ধুর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল। গান্ধার অতি প্রাচীন রাজ্য। গান্ধার রাজ্য বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রধান

ভরতের পুত্র পুষ্কর সিন্ধুতীরে পুষ্করাবতী স্থাপন করেন। আলেক্জেণ্ডারের সময় এখানে হস্তিনামক সামন্তরাজার রাজধানী ছিল। ইনি আলেক-জেণ্ডারের অবরোধ হইতে ত্রিশ দিন নগররক্ষা করিয়া নিহত হন। অনন্তর বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক তৎপুত্র সঞ্জয় রাজ্যে অভিষিক্ত হন। আলেক-জাণ্ডারের দিগ্‌বিজয় মুসলমান বিজয়ের ন্যায় নিষ্ঠুরতাপূর্ণ নয়। গ্রীক জাতিও মুসলমানদের ন্যায় হিংস্র ছিল না। গ্রীক্‌দের বিজয়ব্যাপারে পৃথিবীর উপকার ভিন্ন অপকার সাধিত হয় নাই। কনিষ্ক, পুরুষপুরে (পেশোয়ারে) রাজত্ব করিতেন। গান্ধারের বহু স্থানে রাজেন্দ্র অশোকের কীর্ত্তিকলাপ বিদ্যমান ছিল। সিন্ধু ও বিতস্তার মধ্যপ্রদেশে তক্ষশিলার ন্যায় প্রকাণ্ড নগর ছিল না। তক্ষশিলা একটি পার্ব্বত্য নগরী। বহু প্রাচীন গ্রন্থে এই নগরের নাম পাওয়া যায়। কোন কোন বিদেশীয় পর্য্যটক ইহাকে নিনেভার সঙ্গে তুলিত করিয়াছেন। রামায়ণ বলেন, ভরতপুত্র তক্ষ কর্ত্তৃক তক্ষশিলা স্থাপিত হয়। এখানকার রাজা আলেক্-জাণ্ডারের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। ৮০ বৎসর পরে অশোক কর্ত্তৃক গ্রীকদের হস্ত হইতে এই নগর আচ্ছিন্ন হয়। এই নগর দীর্ঘকাল শকদের অধিকৃত ছিল। বৌদ্ধেরা তক্ষশিলাকে পবিত্র নগর মনে করিত। বৌদ্ধ পুরাণে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব এই নগরে আপনার মস্তক দান করিয়া-ছিলেন। ফাহিয়ান্ ও হিউএনসিয়াং এই নগর দর্শন করিয়াছিলেন। মুসল-মানদের কোন গ্রন্থে তক্ষশিলার নাম নাই। ইহাতে বোধ হয়, ভারতভূমিতে মুসলমানদের প্রবেশের পূর্ব্বেই তক্ষশিলা বিনষ্ট হয়।

টলেমির পাণ্ডই রাজ্য পাণ্ডব রাজ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এই বিষয়ের কিছু আলোচনা করিয়া দেখি। ললিতবিস্তরে আছে, যখন শাক্য মুনি জন্মগ্রহণ করেন, তখন হস্তিনায় পাণ্ডবেরা রাজত্ব করিতেন। পৌরাণিক মতে রাজা জনমেজয়ের পুত্র কি পৌত্রের সময় হস্তিনা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে। সে ঘটনা বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে হয়। তবে ললিতবিস্তরের বর্ণনা খাটে কই? টলেমির সময়েই বা পাণ্ডবদের রাজধানী কোথায় ছিল? পাণ্ডবদের মূলশাখা নন্দবংশের রাজত্বকালে বিনষ্ট হয়, টলেমির সময় পাণ্ডবেরা কোথা হইতে আসিল? আমাদের বোধ হয়, ইক্ষ্বাকুবংশ ও কুরুবংশ, নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রাজত্ব করিত। টলেমি তাহারই

টলেমির সাগল নগর শাকল নগরের নাম। মহাভারতের অনেক স্থানে শাকল নগরের নাম আছে। ইহা মদ্র দেশের রাজধানী ছিল। লাহোরের ৬০ মাইল পশ্চিমে এখন সাঙ্গলওয়ালা। টবা নামক যে স্থান দৃষ্ট হয়, শাকল নগর সে স্থানে ছিল। আলেকজেণ্ডার কর্ত্তৃক শাকল বিধ্বস্ত হয়, কিন্তু দ্যামিত্র (ডেমিট্রিয়ম্) কর্ত্তৃক উহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। টলেমির লবোক্লা লাহোর নগরের নাম। লাহোরের প্রাচীন নাম লবলোক বা লবকোট। রাম তনয় লব এই নগর স্থাপিত করেন। মদোরা মথুরার বিকৃত নাম। মথুরা চিরসুন্দরী। পাঞ্চালরাজ্য হিমালয় হইতে চম্বল নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। টলেমির গ্রন্থে পঞ্চালের অধিবাসিবর্গ পাঞ্চাল নামে উক্ত হইয়াছে। এখনকার রোহিলখণ্ড পঞ্চালের অন্তর্গত ছিল। সম্ভলগ্রামের নাম পাওয়া যায়। হিন্দুদের বিশ্বাস, এখানে কল্কি অবতারের জন্ম হইবে। টলেমির আদিস্দারা, পঞ্চালের অন্যতম নগরী অহিচ্ছত্র। কান্যকুব্জ কানাগোরা নামে উক্ত হইয়াছে। কান্যকুব্জের প্রাচীন নাম রাজা কুশনাভের এক শত কুব্জা কন্যার নামানুসারে কান্যকুব্জ নাম হইয়াছে। টলেমির সময় সিন্ধু-কাবুলসঙ্গম হইতে সিন্ধুসাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ হিন্দু সিথীয় অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী শক জাতির অধীন ছিল। আভীর জাতি এই প্রদেশের দক্ষিণভাগে বাস করিতেন।

সিন্ধুনদী সদা পরিবর্ত্তনশীল। অনেক প্রাচীন নগর জলপ্লাবনে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শক জাতি দীর্ঘকাল সিন্ধু নদের উভয় পার্শ্বে রাজত্ব করিয়াছিল। বাক্‌ট্রিয়ার গ্রীকেরাও অল্প দিন রাজত্ব করে নাই। পরে ইউচি নামক তুরাণী জাতি তাঁহাদের স্থান অধিকার করে। মহাভারতে যুক নামক যে জাতির উল্লেখ আছে, তাহারাই ইউচি জাতি। টলেমির গ্রন্থে উত্তর সিন্ধুর মূষিক রাজ্যের নাম আছে। সিন্ধু দুই প্রধান ভাগে সমুদ্রে পড়িয়াছিল। সিন্ধু বদ্বীপে পাতালপুর অবস্থিত। কেহ আধুনিক ঠঠা, কেহ বা হায়দরাবাদকে পাতালপুর মনে করেন। টলেমির উজিনির সংস্কৃত নাম উজ্জয়িনী। এই নগরের প্রাচীন নাম অবন্তী। হিন্দুদিগের সাতটি পবিত্র নগরীর মধ্যে অবন্তী একটি। এই নগরে যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। উজ্জয়িনী কালিদাস ও বরাহমিহিরের লীলা-নিকেতন। ভারত-বর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ এখান হইতে দ্রাঘিমার গণনা করিতেন।

কোনও সময়ে মালব অনার্য্যদের অধিকৃত ছিল। ভোজবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ মালবে আর্য্যরাজ্যের বিস্তার করেন। কথিত আছে, বাণ নামক অনার্য্যরাজা মহাকাল শিবের স্থাপন করেন। বাণের সহ যদুবংশীয়দের বিবাদের অর্থ আর্য্য ও অনার্য্যদের বিবাদ।

টলেমির নাসিক নগরের নাম পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এই প্রদেশে কোন সময়ে বৌদ্ধ ও জৈনগণ প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল। রামায়ণের সময় ইহা পঞ্চবটী অরণ্যের অন্তর্গত ছিল। কচ্ছের উত্তরপূর্ব্বে পুলিন্দেই জাতি বাস করিত। পুলিন্দেই জাতির সংস্কৃত নাম পুলিন্দ। এই জাতি ভারতবর্ষের নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালার পোদ জাতি, পুলিন্দ জাতির বংশজাত। টলেমির ফিলিটেই জাতি ভীল জাতির পূর্ব্বপুরুষ। ভীলেরা পূর্ব্বে এখন অপেক্ষা বিস্তীর্ণ স্থানে বাস করিত। ভীল জাতির সংস্কৃত নাম ভিল্ল। ভিল্ল শব্দের অর্থ ধনুক। এই মৃগয়াপ্রিয় ধনুর্দ্ধর জাতির তজ্জন্য ভিল্ল বা ভীল নাম হইয়াছে। কাণ্ডালই বোধ হয় গণ্ডদের দেশ। রামায়ণের সময় এই দেশের নাম দণ্ডকারণ্য ছিল। রামায়ণের উপাখ্যান বিশেষ বিশ্লেষ করিলে জানিতে পারা যায় যে, এখানে প্রথমে যে আর্য্যরাজ্য স্থাপিত হয়, অন্তর্বিপ্লবে এবং কোন আকস্মিক দৈবঘটনায় তাহা নষ্ট হইয়া যায়। পুরাণে কুন্তল নামক যে রাজ্যের নাম দৃষ্ট হয়, পরবর্ত্তী সময়ে এই স্থানে সেই রাজ্য স্থাপিত হয়।

আম্বাষ্টেই অম্বষ্ঠ জাতির নাম। এই জাতি গদাযুদ্ধে নিপুণ ছিল। মনুসংহিতায় অম্বষ্ঠ নামক যে মিশ্রজাতির নাম দৃষ্ট হয়, তাহারা মহানদীর উদ্ভবস্থানের দক্ষিণে বাস করিত। বাঙ্গালার বৈদ্য জাতি কি এই অম্বষ্ঠ জাতি? সেনবংশের পূর্ব্বপুরুষেরা দক্ষিণাপথ হইতে বাঙ্গলায় আগমন করেন। * * * টলেমির সময়ে আরাবলী ও সিন্ধুর মধ্যে ভাইওলিঙ্গেই জাতি বাস করিত। পাণিনির গ্রন্থে এই জাতি ভূলিঙ্গী নামে উক্ত হইয়াছে। ভূলিঙ্গী জাতি শাল্বজাতির এক শাখা। শাল্বদের সহ যদুবংশীয়দের বিবাদ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। টলেমির পালিম্বোথরা বা পালিবোথ্রা পাটলীপুত্রের নাম। মহারাজ অজাতশত্রু কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। পাটলীপুত্র এক প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। সমুদয় উত্তর ভারত, সিন্ধুনদীর পশ্চিমপার্শ্বস্থ বহু স্থান ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থান লইয়া এই সাম্রাজ্য

বাণিজ্যপোত এখান হইতে যব, সুমাত্রা, বালি প্রভৃতি দ্বীপে গমন করিত। টলেমির কার্টিনাগ ও কার্টসিনা, বঙ্গদেশের কর্ণগড় ও কর্ণসুবর্ণগড় হইবার সম্ভাবনা। শবরেই জাতির সংস্কৃত নাম শবর জাতি। এই জাতি মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের আরণ্য প্রদেশে পুলিন্দ জাতির প্রতিবেশিরূপে বাস করিত, এই জন্য প্রাচীন গ্রন্থে পুলিন্দ ও শবরের নাম পাশাপাশি লিখিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। টলেমির গঙ্গারাঢ় বোধ হয় রাঢ়ভূমি। রাঢ়ের লোক আলেক্‌জেণ্ডারের সময় বিলক্ষণ সমরকুশল ছিল। বর্দ্ধমান গঙ্গারাঢ়ের একটি প্রধান নগর ছিল। গঙ্গারাঢ়ের রাজধানী গঞ্জি। বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানকে গঙ্গারাঢ়ের অন্তর্গত ধরিয়া কেহ কেহ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হস্তিমালা নগরীকে গঞ্জিনগর বিবেচনা করিয়াছেন। মেয়েলি ছড়ায় হস্তিমালার দেশের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কিরাদিয়া কিরাত জাতির নাম। কিরাতেরা লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রনদতীরে বাস করিত। কিরাতেরা এখন ভোট ও নেপালে বাস করিতেছে। কোন সময়ে তাহারা বাঙ্গালা দেশের সমুদ্রোপকূলে বাস করিত। আসামের দক্ষিণ-অংশকে পূর্ব্বে নরক দেশ বলিত। পুরাণে বর্ণিত আছে, নরকাসুরের রাজ্য সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ত্রিপুরার প্রাচীন নাম কিরাত রাজ্য। কমলাঙ্ক, চট্টল ও রক্ষিয়াং, এই তিন দেশ অসুরদিগের তিন পুরী।

পেগুর সংস্কৃত নাম সুবর্ণভূমি। ব্রহ্মদেশের সরকারী কাগজপত্রে ব্রহ্মদেশকে সুবর্ণপ্রান্ত বলা হইত। রেঙ্গুণ ইরাবতীর যে মুখে অবস্থিত, প্রাচীনকালে তাহাকে সুবর্ণ নদী বলিত। টলেমির গ্রন্থে খ্রাইসোলা নাম দৃষ্ট হয়।

বিদেশীয় প্রাচীন পর্য্যাটকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, গঙ্গার পূর্ব্বতীর হইতে সিনেই অর্থাৎ চীন পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ, নগর ও নদীর নাম সংস্কৃত ভাষার শব্দানুসারে রচিত হইয়াছিল। ভারতীয় ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার ঐ সকল দেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ঐ সকল স্থানের পশুপ্রকৃতি মানবগণের মধ্যে সভ্যতা সঞ্চারিত করিয়াছিল। শ্যাম ও কোচীন চীনে পরাক্রমশালী বৌদ্ধরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোচীন চীনের দক্ষিণ দিকে চম্পা ও কাম্বোজ নামক দুইটি পরাক্রান্ত বৌদ্ধরাজ্যের নাম পাওয়া যায়।

হিমালয়ের পূর্ব্বাংশের নাম দামন পর্ব্বত। ইহার সংস্কৃত নাম তামস গিরি। হিমালয়ের পূর্ব্বাংশের প্রকৃতি সাধারণের অজ্ঞাত ছিল বলিয়া

তদংশের তামস নাম হইয়াছিল। দোয়ানস, দিহং নামে প্রথিত ব্রহ্মপুত্রের অংশবিশেষের নাম। রামায়ণে ব্রহ্মপুত্রের নাম দৃষ্ট হয় না। বোধ হয়, রামায়ণের নলিনী নদী ব্রহ্মপুত্র হইতে পারে।

পূর্ব্বকালে গঙ্গা বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াই সমুদ্রে মিলিত হইয়াছিল। সমুদ্র হইতে দ্বীপাকার ভূমিখণ্ড মস্তকোত্তোলন করিলে দুই দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রভাগ সুবৃহৎ নদী হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে গঙ্গা শতমুখে সমুদ্রগামিনী হইয়াছিলেন। শতশব্দ এখানে বহুসংখ্যার দ্যোতকমাত্র। বাঙ্গলার অধিকাংশ নদনদী, গঙ্গার শাখা প্রশাখা। গঙ্গার পূর্ব্বশাখা চট্টগ্রামের ও পশ্চিম শাখা তমলুকের নিকট সমুদ্রে পড়িয়াছিল বলিলে বোধ হয়, ভুল হয় না।

গঙ্গার প্রথমাংশের পূর্ব্ব দিকে পূর্ব্বে গঙ্গানাই বা তাঙ্গানই নামক জাতি বাস করিত। তাঙ্গানই তঙ্গণ শব্দের গ্রীক সংস্করণ। এই পার্ব্বত্য মোগল জাতি আর্য্যদিগের আগমনে স্থানভ্রষ্ট হইয়া উত্তর ভারতের নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বাঙ্গালার ধাঙ্গড় জাতি এই জাতির শাখামাত্র। মালদহের নাগর ও ধানুক জাতিও এই জাতির অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়।

গঙ্গানদী, মালদহ জেলার কালিন্দী নদী দিয়া টলেমির সময় প্রবাহিত হইত। গঙ্গা ও মহানন্দার সঙ্গমস্থলে তৎকালে কোলদ্না নামক নগর অবস্থিত ছিল। এখন সে স্থানে পুরাতন মালদহ নগর বিদ্যমান। পাঠান রাজত্বকালে পাণ্ডুয়া নগরে কিয়ৎকালের জন্য রাজধানী স্থাপিত হয়; সেই সময় মালদহ নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। মালদহ শব্দটিকে মলদ শব্দের রূপান্তর মনে হইতে পারে। রামায়ণে মলদ নামক স্থানেরও নাম আছে, কিন্তু মলদ রাজ্য শাহাবাদ জেলার কোন স্থানে ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। মেগাস্থিনিসের মলিন্দেই মালদহ নহে, উহা অন্য নগর। গঙ্গারেজিয়া, পালরাজধানী গৌড়ের নিকটবর্ত্তী কোন নগর। পুরাতন মালদহ নগরের অবস্থান ও ব্যাপ্তি দেখিলে, উহা যে কোন সময়ে একটি প্রকাণ্ড নগর ছিল, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। যেখানে সেখানে গঙ্গি নগর খুঁজিয়া না বেড়াইয়া মালদহ নগরকে সেই নগর বিবেচনা করিলে ক্ষতি কি? টলেমির গ্রন্থে গৌড়নগরের নাম পাওয়া যায় না। গঙ্গা ও মহানন্দার সঙ্গমস্থানের নাম আছে, তৎকালে গৌড়নগর থাকিলে তাহারও নাম থাকিত। টলেমির গ্রন্থ পাঠ করিলে আমরা অনেক পৌরাণিক দেশ, নগর ও নদীর অবস্থান জানিতে পারি। পৌরাণিক নামগুলি যে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক নয়, তাহাও জানিতে পারি। ইহাও নিতান্ত অল্প লাভ নহে।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

চিত্রশালা।

গৃহদেবতা।

ভগবদ্ভক্তগণ বলিয়া থাকেন, স্রষ্টার করুণা সাগরের মত সীমাহীন। এই বিশাল বিশ্বে আপনার বুদ্ধিগর্ব্বিত মানব হইতে সামান্য কীট পর্য্যন্ত তাঁহার অপরিসীম স্নেহের ও করুণার পরিচায়ক। যাঁহার সস্নেহ যত্নে সুপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হইবে বলিয়া সুদৃঢ় আবরণে আপনার জীবনীশক্তি অব্যাহত রাখে; যাঁহার কৃপায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই মাতৃবক্ষে সুধা সঞ্চিত হয়—তাঁহার করুণার তুলনা নাই। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা কল্পনা করেন, দেবদূতগণ সময় সময় স্বর্গ ত্যাগ করিয়া ধরায় অবতীর্ণ হয়েন, এবং শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান করেন, বিপন্নের উদ্ধারসাধন করেন, শিশুদিগকে রক্ষা করেন। তাঁহাদেরই বাণী বিবেকরূপে কুপথগামীদিগকে সুপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে।

জর্ম্মান চিত্রকর প্লকহর্ষ্ট (Plockhorst) গৃহদেবতার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি 'সাহিত্যে'র পাঠকদিগকে উপহার প্রদত্ত হইল।

দুইটি চঞ্চল বালক ফুলবনে খেলা করিতেছে। যেন কুসুমরাশির মধ্যে মধুরতম কুসুম-যুগল! কিন্তু কুসুমের পার্শ্বে কণ্টক আছে, শ্যামশষ্পাস্তৃত ভূমিতেও কঙ্কর থাকিতে পারে। শিশুযুগলের কমলকর কণ্টকাঘাতে ক্লিষ্ট হইতে পারে,—তাহাদের কোমল পদপল্লবতল কঙ্কর কণ্টকে ব্যথিত হইতে পারে। তাহা হইলে তাহাদের হাস্যপ্রভাসমুজ্জ্বল নয়নে প্রভাত কুসুমে শিশিরবিন্দুর মত অশ্রু দেখা দিবে। তাই গৃহদেবতা তাহাদের রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার প্রসারিত পক্ষপুটে রবিকর সযত্নে অপসৃত; তাঁহার বাহুযুগল শিশুদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রস্তুত। তাঁহার আননে আশঙ্কা; নয়নে করুণা।

এই দেবীমূর্ত্তির দেবত্বের সাক্ষী পক্ষদ্বয়ের বর্জ্জন করিলে আর চিনিতে বিলম্ব হয় না। সংসারে যাঁহার স্নেহ জগতে স্বর্গের আভাষ, যাঁহার নিঃস্বার্থ স্নেহ অন্যে একান্ত দুষ্প্রাপ্য অথচ অনায়াসলব্ধ বলিয়া সন্তান একান্তই প্রাপ্য বলিয়া বিবেচনা করে, সেই জননীর মূর্ত্তি দেখা দেয়। যে জননী সন্তানের সামান্য সুখের জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত; সংসারের কঙ্করকণ্টকিত পথে তাহার পদতল অক্ষত রাখিবার জন্য বক্ষ পাতিয়া দিতে ইচ্ছুক; যে জননীর হৃদয় স্নেহের আগার—

"ফুলকুল যথা সৌরভ আগার
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি"

সেই জননীর দিব্যদীপ্তিসমুজ্জ্বল মূর্ত্তি নয়নসমক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তখন সেই পুণ্যময়ীর পদপ্রান্তে অবনতজানু হইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়,—

"মম অপরাধ যদি কর, মা, গ্রহণ,
আমি তবে বাঁচি কতক্ষণ?
মম বুদ্ধি, বল যাহা সব তুমি জান তাহা;—
অবোধের দোষ পায় পায়!
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননী, আমায়!



গৃহ-দেবতা।

KUNTALINE PRESS.

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী।—জ্যৈষ্ঠ। প্রথমেই "নূতন অতিথি" নামক একটি কবিতা। "সন্ন্যাসী" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের রচনা। গল্পের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু গল্প নয়। বাইবেলের ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, 'আলো হোক'; আর অমনই there was light; আর এখনকার লেখকগণ কলম ধরিয়াই মনে মনে সঙ্কল্প করেন, 'গল্প হোক'; আর অমনই কলম চলে, সঙ্গে সঙ্গে অধ্যায়ে অধ্যায়ে গল্প গজাইয়া উঠে! কিন্তু তাহার মধ্যে অতি অল্পই গল্প-নামের যোগ্য! নগেন বাবুও শেষে সেই গড্ডলিকাপ্রবাহের অনুসারী হইলেন দেখিয়া 'অশ্রুজলৈর্ধরাতলমভিষিঞ্চন্' বলিতে হয়, 'তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!' ['প্রবাসীর' 'আদর্শ কবি' নামক কোটেশন-কণ্টকিত গল্পটির আদর্শে আমরাও ভাষা সংস্কৃতখচিত করিয়া দিলাম,—লোভসংবরণ করিতে পারিলাম না,—পাঠক ক্ষমা করিবেন।] "বিংশ শতাব্দীর কেলুয়া" অমিত্রাক্ষরে রচিত একটি ব্যর্থ রচনা। চৈত্রসংক্রান্তিদিবসে কলিকাতায় আর কাঁসারীপাড়ার 'সং' দেখিতে পাই না;—মনে করিতাম, কেলুয়া ভুলুয়া দুই ভাই রাজপথ ও বারোয়ারীতলা পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। এত কাল পরে এলাহাবাদে কেলুয়ার সন্ধান পাওয়া গেল, বিস্ময়ের বিষয় বটে! কিন্তু কেলুয়ার রঙ্গ উপভোগ করিতে পারিলাম না;—বোধ করি, সে বয়স নাই, সে কালও নাই।—কেলুয়ার অপরাধ কি? সেদিন একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। ভূদেব বাবু বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়া একটি সুবেশবাসা বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তোমার নাম কি?' বালিকা বলিল, 'ম্রন্দাকিনী।' ভূদেব বাবু বিস্মিত হইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মেয়েটি কি পড়ে?' পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন; 'দ্বিতীয় ভাগ।' ভূদেব বাবু সানন্দে বলিলেন, 'ব্রেশ!' ভূদেব বাবু বালিকার ও গুরুর পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া র-ফলা সংযোগ করিয়াছিলেন; আমরাও সেই মহাজনের অনুসরণ করিয়া 'কেলুয়া'র ভাষায় কেলুয়ার প্রশংসা করিলে, আশা করি, প্রবাসী কবি রাগ করিবেন না। যথা,—

> "অদ্ভুত, আজগবি, ন ভূতং (?) ন ভবিষ্যতি,
> বিংশ শতাব্দীর আহা অপূর্ব্ব কেলুয়া!"

আমরা ভুলুয়ার আশাপথ চাহিয়া রহিলাম। বাঙ্গালায় হাস্যরস বড় বিরল,—যেমন করিয়াই হোক—একটু হাসিতে পাইলেই আমরা কৃতার্থ। "বাঙ্গালী" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের চর্ব্বিতচর্ব্বণ। রোমন্থন সকলের সাধ্যাতীত,—সুতরাং আমরা অগ্রসর হইতে পারিলাম না। "অনেকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জা বোধ করে," তাহা সত্য। কিন্তু লজ্জা বোধ করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান, আশা করি, স্বয়ং অক্ষয়বাবুও তাহা অস্বীকার করিবেন না। অক্ষয় বাবুর বাসভূমি রাজসাহী হইতেই দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই যে পরান্নপুষ্ট 'সবে ধন নীলমণি' ঐতিহাসিক চিত্রখানি ভাঁড়ারে চাল থাকিতেও অন্নাভাবে মরিয়া গেল, ইহাও ত বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-বৈজয়ন্তী! বাঙ্গালীর এইরূপ বিবিধ কীর্ত্তি দেখিয়া যদি 'বাঙ্গালী' বলিয়া পরিচয় দিতে কেহ লজ্জিত হন, তাঁহাকে একঘরে করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার মনুষ্যত্বে সংশয় করিব না। স্বজাতিপ্রেমের আতিশয্যে প্রবন্ধ ও আসর জমে বটে, কিন্তু জাতীয় দোষে অন্ধ হইলে উত্তরোত্তর অধিকতর অধঃপাত অবধারিত। কৃষিবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এবার "শর্করা-বিজ্ঞানে" বীজ হইতে ইক্ষু উৎপাদনের

প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। এরূপ প্রসঙ্গ 'প্রবাসীর' অন্যান্য প্রবন্ধের সহিত 'খাপ' খাইবে কি? শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহের "হিন্দু, গ্রীক ও রোমান্" প্রবন্ধটির নামের আড়ম্বরে যতটা আশার সঞ্চার হয়, পড়িয়া তাহা পূর্ণ হয় না। "আদর্শ কবি" চলিতেছে। এবারকার 'প্রবাসী'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ "শিক্ষার উন্নতি ও তন্নিমিত্ত দান।" লেখকের অনুসন্ধান প্রশংসনীয়। শিক্ষাবিজ্ঞানে তাঁহার অভিজ্ঞতাও যে অতুলনীয়, পদে পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালা মাসিকে এরূপ রচনা নিতান্ত বিরল। প্রবন্ধটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য লেখক চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করেন নাই। তাহার ফলে প্রবন্ধটি শিক্ষাপ্রদ অথচ রমণীয় হইয়াছে। অসঙ্কোচে বলা যায়, "শিক্ষার উন্নতি ও তন্নিমিত্ত দান" যে কোনও পত্রের গৌরববর্দ্ধন করিত। "গ্রন্থকার-মাহাত্ম্য" মন্দ নয়, কিন্তু বঙ্কিম-পদাঙ্কের অনুসরণ বোধ করি অসাধ্য। "প্রবাসী" কবিতাটির—

"অনাদি অশেষ আত্মা, আত্মার জগৎ"

প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ব্যাপার আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

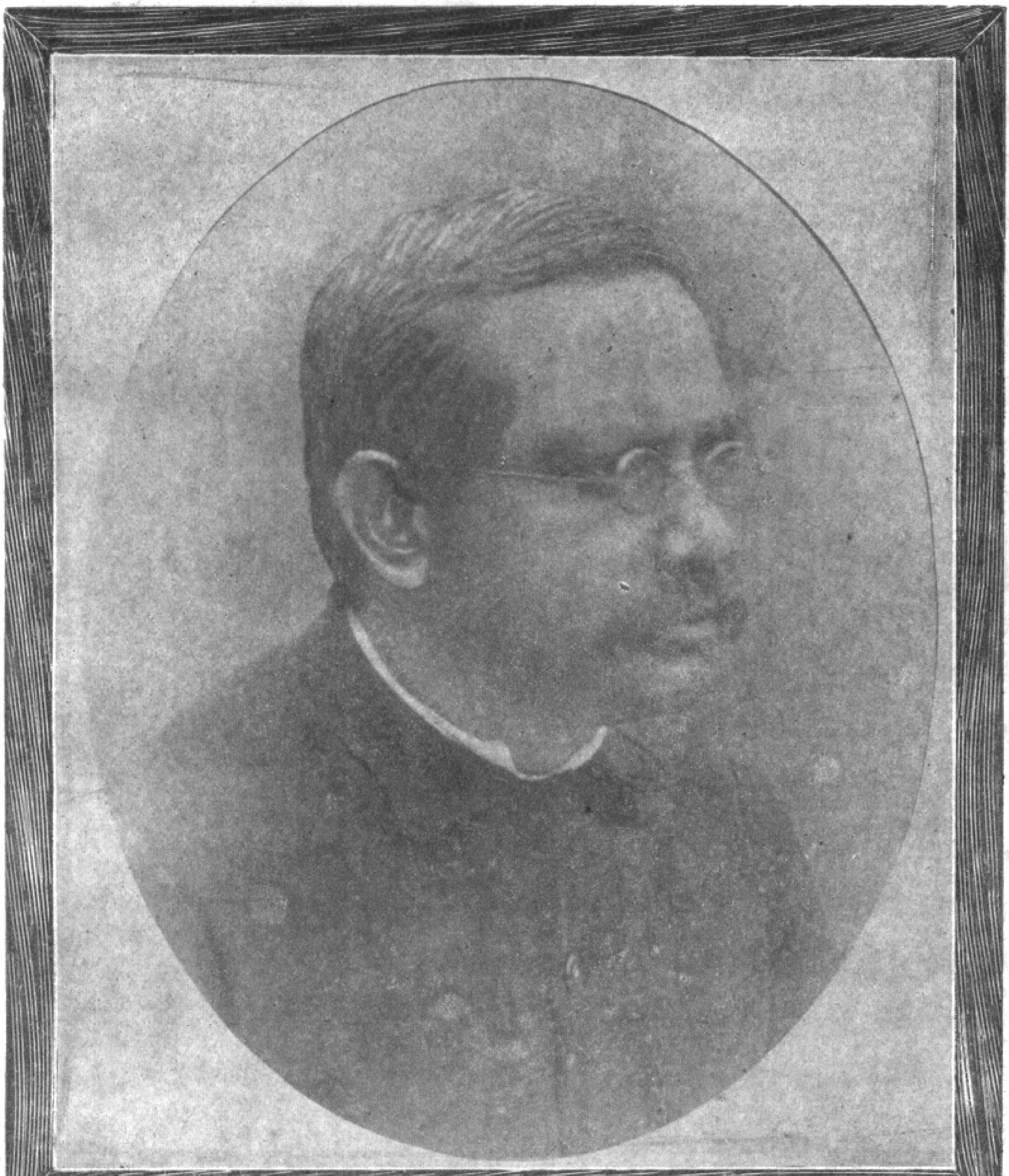
ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পিপাসী" নামক একটি কবিতা। কৃত্রিমতার আতিশয্যে আহত হইয়া কবির 'মানসী'র দ্বার হইতে ফিরিলাম—এত বাধা বৃতি অতিক্রম করিয়া কবিতায় গুপ্ত সুরক্ষিত স্বর্গীয় অমৃত পান করিতে পারিলাম না। দুর্ভাগ্য আমরা অসমর্থ! গরুড়ের সামর্থ্য নহিলে অমৃত-আহরণ সহজ নহে! শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দেখিতেছি, প্রহেলিকা-রচনায় সিদ্ধহস্ত না হইয়া নিরস্ত হইবেন না। প্রবাসীর 'সন্ন্যাসী'র জটা হিমালয়কন্দরে অদৃশ্য হইতে না হইতেই তিনি 'সোনার কাঠি ও রূপার কাঠি' বাজাইয়া নূতনতর ও জটিলতর রাজনৈতিক হেঁয়ালির সৃষ্টি করিয়াছেন। 'ভারতী' এই সমস্যাসমাধানের জন্য পুরস্কারঘোষণা করেন নাই, সুতরাং অনর্থক আমরা এই গ্রীষ্মে গলদ্ঘর্ম্ম হইতে প্রস্তুত নহি। 'যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোঽত্র দোষঃ?' আমরা ত চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। কথায় বলে, 'দু কাঠি বাজাইলে ঝগড়া হয়'; নগেন বাবু ত আগেই দু'কাঠি বাজাইয়া রাখিয়াছেন। নতুবা জিজ্ঞাসা করিতাম, এমনতর দুরূহ গল্প লিখিয়া নিরীহ পাঠককে জব্দ করিবার উদ্দেশ্য কি? শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের "ক্ষ-কার" পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ। কিন্তু সত্যের অনুরোধে স্বীকার্য্য, সতীশ বাবুর এই বনিয়াদী 'ক্ষ-কার' নগেনবাবুর 'সোনার কাঠি ও রূপার কাঠি'র নিকট পাণ্ডিত্যে পরাস্ত! 'ক্ষ-কারে'র মত রচনা কত কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য হইতে পারিত! কিন্তু প্রত্নতত্ত্বমগ্ন সংস্কৃতনবীশ সতীশ বাবু 'আর্টের' অভাবে তাহাকে জলের মত সহজ করিয়া ফেলিয়াছেন! এ দুঃখ আমরা সহজে ভুলিতে পারিব না। ক্ষ-কার আজিকার নহে, দুই সহস্র বৎসর বর্ণমালার সভায় বিরাজমান। তাই উপসংহারে সতীশ বাবু বলিতেছেন,—"যখন দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে 'ক্ষ' সংস্কৃত ভাষায় স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত, তখন এক্ষণে উহাকে বাঙ্গালা ব্যঞ্জন-বর্ণমালা হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা অনর্থক।" সতীশ বাবু বড় বিলম্বে সাহিত্যের দরবারে ক্ষ-কারের আরজী উপস্থিত করিয়াছেন। বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর তাহার উচ্ছেদ করিয়াছেন। তাহার দাবী এখন তামাদী হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনতার খ্যাতি ছিল না,—কেবল এই কারণেই তাঁহারা ক্ষ কারকে ব্যঞ্জনবর্ণমালা হইতে খারিজ করেন নাই। বোধ করি, অনাবশ্যক ও অসঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। ক্ষকার যুক্ত বর্ণ, তাহাকে ব্যঞ্জনবর্ণের পরিবারে স্থান না দিলে এমন কি বিশেষ ক্ষতি? শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "চিরকুমারসভা" নামক গল্পটি ক্রমে নাটকে

হইয়াছে। আবার শুনিতেছি, লেখক ইতিমধ্যেই কাঁচী ও কলম লইয়া 'চিরকুমার-সভা'র শ্রীসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তবে, রচনাটি 'চিরকুমারসভা'র বর্ত্তমান গুটী ভেদ করিয়া আগে প্রজাপতির রূপ পরিগ্রহ হউক, তখন তাহার লাবণ্য উপভোগ করিব। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বারাণসী হিন্দু কলেজ" সাময়িক প্রবন্ধ। পাঠযোগ্য। জ্ঞানবাবু মধ্যে মধ্যে 'ভারতী'কে সাময়িক অলঙ্কারে ভূষিত করিতেছেন,—অনেকটা বিলাতী পিরিয়ডিক্যালের মত। বেশ। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের "হিন্দুদর্শনের" আলোচনা সাহিত্য-পত্রের সীমার—শক্তিরও বটে—বহির্ভূত। বিশেষতঃ যে সাহসের কল্যাণে রমেশ বাবু চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার রাং কি সোনা পরীক্ষা করিতেছেন, ভারতবর্ষে সচরাচর সেরূপ সাহস কিনিতে পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "জ্যোতিষিক (?) সমস্যা" গুরু গম্ভীর গবেষণা,—'মূর্খেতে বুঝিতে নারে'—ইত্যাদি। রবীন্দ্র বাবুর "নষ্টনীড়" ও "চোখের বালি" অনেকটা এক খাতে চলিতেছে। উভয়ের স্বাতন্ত্র্য বড় সূক্ষ্ম।—যাক্,—সমাপ্তির পূর্ব্বে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইবার কাহারও অধিকার নাই। "বাঙ্গলা শব্দের দ্বিরুক্তি" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী "শব্দদ্বৈত" সম্বন্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি নানাপত্রে মুদ্রিত না হইয়া পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইলে ভাল হইত। মূল প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকার। তাহাতে আলোচনার সুবিধা হইত।

প্রদীপ। জ্যৈষ্ঠ। "স্বাধীনত্রিপুরাধিপতি ৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর" প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য বটে। লেখক পরম যত্নে অতি সাবধানে স্বর্গীয় মহারাজের চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। চিরসহচর বসন্তক যদি বৎসরাজ উদয়নের চরিতকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেন, তিনিও এত সন্ধান দিতে পারিতেন না। প্রারম্ভে লেখক বলেন,—"একটি সাধারণ লোকের জীবন এবং একটি স্বাধীন রাজার জীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে ও বিভিন্ন আদর্শে গঠিত।" কিন্তু লেখকের চিত্রপটে স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্যের যে চরিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা ত রাজ-জীবনের উপাদানে গঠিত বলিয়া মনে হয় না। রাজ-জীবনের আদর্শ কি কেবল উদারতা, বিলাসিতা, কলাপ্রিয়তা ও সৌখীনতা? ত্রিপুররাজের বিলাসবৈভব ও জীবনযাপনপ্রণালী পড়িতে পড়িতে সংস্কৃত নাটিকার 'ধীরললিত' নায়কের কাহিনী মনে পড়ে! মনে হয়, এখনই 'মদনিকা'ও 'চূতলতিকা' বসন্তমহোৎসবের সূচনা করিবে! এইবার বুঝি রাজেন্দ্র বসন্তকের আহ্বানে "নিরন্তরোদ্ভিন্ন-কুসুমগুচ্ছ-শোভিতবিটপা" উদ্যানলতা নবমালিকা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন। আর একটু পরে কদলীবনে রত্নাবলীর বিরহশয়ন দেখিতে পাইব!—কিন্তু এ সকল ত নাটিকার নায়কের চিত্র। লেখক কি পরে অনন্যসাধারণ রাজ-চিত্র রাজ-চরিত্র বর্ণরাগে সমুজ্জ্বল করিয়া পাঠকের উদ্রিক্ত কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন? এক স্থলে লেখক বলিতেছেন, "তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলি সাধারণ লোকের রুচির হিসাবে অশ্লীলতা-পূর্ণ। সুতরাং সেগুলি লোকের চোখের সামনে ধরিলে অনেকের হয় ত 'হিষ্টিরিয়া' হইতে পারে।" সম্ভব। 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।' এ বিষয়ে লেখকের সহিত তর্ক অনাবশ্যক,—বিশেষতঃ যখন চিত্রগুলি সমাজ-আদালতের নথিভুক্ত নয়। কিন্তু লেখক যে উপকথাটির উদাহরণ দিয়া এখনকার লোকের রুচির নিন্দা করিয়াছেন, সে গল্পটি শিষ্টসমাজে উল্লেখ-যোগ্য নয়। 'প্রদীপে' যদি এমন জঘন্য গল্পের উল্লেখ চলে, তাহা হইলে গৃহলক্ষ্মীরা লজ্জায় 'প্রদীপ' নিভাইয়া দিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লজ্জারাগরক্ত মুখের ফুৎকারে প্রদীপ-জন্মের নির্ব্বাণ সুখাবহ হইলেও, এই শৈশবেই অবসান বোধ করি প্রার্থনীয় নয়। লেখক বলিতেছেন,—"উদার আকাশের ক্রোড়ে শুভ্র সূর্য্যালোকে রূপ-যৌবন-স্বাস্থ্য শোভনা

এখনো শিখিবার বিষয়।" এ কথা কে অস্বীকার করিবে?' যতদিন সে শিক্ষা সম্পূর্ণ না হয়, ততদিন নগ্ন সৌন্দর্য্য কাঁদিয়া মরিলেও কেহ তাহাকে আদর করিও না। কিন্তু সে শিক্ষার বোধ করি বহু বিলম্ব। কেন না, এখনও 'প্রদীপে' রাজ-চিত্রের সরঞ্জামে কেবল গাড়ু গামছা ও আলবোলার নল দেখিতেছি। লেখক যে উপকথাটি অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের পক্ষে অন্যতর প্রমাণ। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "পুরাণ-তত্ত্ব" সাহিত্য-পরিষদের গত পৌষমাসের অধিবেশনে পঠিত ও তাহার পর বিশ্বকোষের পাণ্ডিত্যপূর্ণ "পুরাণ" শব্দের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেই 'আদত' 'থানে'র কিয়দংশ আবার 'প্রদীপের' পলিতায় পরিণত হইল কেন? "সুখ" ফরাসী সাহিত্যসম্রাট মোপাসাঁর রচিত একটি উৎকৃষ্ট গল্পের সুন্দর অনুবাদ। শ্রীমান মন্মথনাথ সেন এই গল্পটির অনুবাদক। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই নবীন লেখকের সাহিত্য-সাধনায় সাফল্য কামনা করি। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর "সৃষ্টির বিশালত্ব" এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। লেখক আরম্ভে যে আশা উদ্রিক্ত করিয়াছিলেন, উপসংহারে তাহা চরিতার্থ করিয়াছেন। "ছাতির কথা,"ও "বিরহিণী" নামক কবিতা উল্লেখযোগ্য নয়। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর "শব্দদ্বৈতে"র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—সুখের বিষয়। "উপহার" একটি ব্যক্তিগত কবিতা।—এ সম্বন্ধে আমাদের মত গতবারে "রবীন্দ্রনাথ" নামক কবিতার প্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছি;—সুতরাং পুনরুক্তি অনাবশ্যক। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের একত্রচিত্রিত চিত্রখানি মনোজ্ঞ। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "চীন যুদ্ধে বিদেশীয় সেনা" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, সর্ব্বগ্রাসী সংবাদপত্র ইতঃপূর্ব্বেই তাহার বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর এতকাল পরে "গ্রীক জাতির স্বাধীনতালাভ" লিখিতে বসিলেন! বিস্ময়ের বিষয় বটে! 'হাটের কলায়' নৈবেদ্যের কল্পনা করিয়া চতুর ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথকে তুষ্ট করিতে পারেন; বৈকুণ্ঠ-পতি 'ভাল খাব' বলিয়া আবদার না করুন, কিন্তু ভক্তের ক্ষতি যে অনিবার্য্য! সখারাম-বাবুর পূজায় এমনতর নৈবেদ্য দেখিয়া মা সরস্বতী কি মনে করিবেন? আজকাল লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ 'পাকা গুটি কাঁচাইবার' জন্য এত উৎসুক কেন, বলিতে পারি না!

স্থানভাবে অন্যান্য পত্রের সমালোচনা এবার প্রকাশিত হইল না।



শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়।

KUNTALINE PRESS.

হিমারণ্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

আমি ভারতেশ্বরীর প্রজা, পুণ্যময়ী মহারাণীর রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র দর্শন করিয়াছি। ভারতরাজ্যে পথ, ঘাট, পান্থশালা, দাতব্যশালা, চিকিৎসালয়ের অভাব নাই। এত দিন ইংরাজরাজ্যে থাকিয়া ইংরাজের প্রতাপ বুঝিতে পারি নাই। ইংরাজ প্রজার সুখ সৌভাগ্য অনুভবও করিতে পারি নাই। অদ্য পররাজ্যে আসিয়া দু হাত তুলিয়া মহারাণীকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। অদ্য যেখানে আসিয়াছি, সেখানে পথ নাই, ঘাট নাই, মাথা গুঁজিবার স্থান নাই; কিন্তু আছে দস্যুভয়, রাজভয়, আবার বরফপাতের মহাভয়। ইংরাজরাজ্যে ইহার কিছুই নাই। আমি চিরপথিক, চিরদিনই পথে পথে বেড়াইলাম; ইংরাজ রাজের বিচার আচার বুঝি না, তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধও নাই। চিনি পথ, ঘাট, দাতব্যশালা, ধর্ম্মশালা, চিকিৎসাশালা। ইংরাজ রাজ্যের সর্ব্বত্রই এই সকলের সুব্যবস্থা। তাই আজ ইংরাজ রাজ্যের প্রশংসা করিয়া আপনাকে ইংরাজ প্রজা বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

এখানে আর ইংরাজের প্রবেশাধিকার নাই। ভুটিয়ারাই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। এখন চার পাঁচ মাস এই রাজ্যেই থাকিতে হইবে। সূর্য্যোদয় হইয়াছে, রৌদ্রও খুব উঠিয়াছে, তথাপি শীত যায় নাই। অতিকষ্টে শয্যা পরিত্যাগ করিলাম ও যথাবিহিত প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিলাম। হিমালয় পর্য্যটকগণকে শৌচ ও আচার বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। স্নান নাই, বস্ত্রপরিত্যাগ নাই, প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই ক্ষুধায় প্রাণ জ্বলিয়া উঠে; আর কিছু আহার না করিয়া চলাও যায় না। আহারের মধ্যে প্রধান চা, ছাতু, মাংস। এখানে অল্পমূল্যে ছাগ ও মেষ পাওয়া যায়, কিন্তু কাঠের অভাবে মাংস সিদ্ধ করা যায় না, অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস খাইতে হয়। অদ্য উঠিবার পূর্ব্বেই খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কারণ, আট মাইল না গেলে আড্ডা পাইব না। এই আট মাইল চলিতে আট ঘণ্টা লাগিবে। এক ঘণ্টার কম এক মাইল চলা অতীব দুষ্কর। সুতরাং সকলকেই আহার করিতে হইল।

এখানে জলের ও কাষ্ঠের অভাববশতঃ সকলেই প্রাতঃকালে একবার আহার করিয়া লন। তাহার পর যখনই জল ও কাষ্ঠ পাওয়া যায়, তখনই আহার করিতে হয়। ঘন ঘন আহার না করিলে হিমালয়ভ্রমণকারীদের প্রাণ বাঁচে না। আহারাদিসমাধান ও যাত্রার আয়োজন করিতে অনেক বেলা হইয়া পড়িল। অনুমান নয়টার সময় আমরা 'হোতি' পরিত্যাগ করিলাম।

একটা কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। 'মরগাঁও' আসিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম, ইংরাজরাজ্যের কোনও বস্তু সঙ্গে লইয়া গেলে তিব্বতীয়েরা ইংরাজের অনুচর বলিয়া সন্দেহ করিয়া থাকে। সেই জন্য কম্বল ভিন্ন আমার সঙ্গের জিনিসপত্র, যথা বাসন বর্ত্তন, ইংরাজী শীতবস্ত্র, দেশীয় বিনামা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম; এক কমণ্ডলু ও একমাত্র কাষ্ঠের বাটি সঙ্গে ছিল। তিব্বতযাত্রীদিগকে এই সব বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। পরন্তু আমার সঙ্গীরা আমাকে এ কথাও বলিয়াছিল, আপনি তিব্বতীয় লামার সাজে সজ্জিত হউন; কেশ ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করুন। আমি বলিলাম, তাহা হইবে না; আমি হিন্দু সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর বেশেই যাইব, অন্য বেশ গ্রহণ করিবার আমার অধিকার নাই।

অদ্য ১৫ই আষাঢ় বেলা নয়টার সময় আমরা হোতি ছাড়িলাম। পথিমধ্যে নানাপ্রকার দুরারোহ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ন দুইটার পর 'সাক্' নামক আড্ডায় উপস্থিত হইলাম। 'সাক' একটি পার্ব্বতীয় নদীর পরপারে। আমরা নদী অতিক্রম করিয়া 'সাকে' পঁহুছিলাম। এখানে দেশীয় আড্ডা বা চটীর ন্যায় কিছুই নাই; গৃহের চিহ্নমাত্রও নাই; লোকালয়ের নাম গন্ধ নাই; অধিক লোকের সমাগমও নাই। কেবল আমরা যে ১০।১২ জন যাত্রী আসিয়াছি, তাহারাই পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এবং একে অপরের তত্ত্ব লইতেছি। অদ্য কেদার সিংহের একমাত্র তাম্বু আমাদের সকলের আশ্রয়স্থান। কেহ বা তাম্বুর মধ্যে রহিল, কেহ বা বাহিরে পড়িয়া রহিল। এই স্থান সমভূমি; নিকটে জল; গবাদিপশুচারণের স্থান বলিয়া যথেষ্ট ঘুঁটে পাওয়া যায়। আর অদূরে কণ্টকবৃক্ষ আছে, তাহাতে জ্বালানি কাষ্ঠের কার্য্য চলে। সুতরাং তিব্বতযাত্রীরা এই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করে। অপরাপর আড্ডার ন্যায় এখানে প্রস্তরের ঘেরও নাই। আবার এই নদীতীর হইতে দুরারোহ পর্ব্বত আরোহণ

করিতে হইবে। সমস্ত রাত্রি এখানে বিশ্রাম করিয়া অতি প্রত্যুষে পর্ব্বতারোহণ করিলে তত ক্লেশ হইবে না। আমরা এখানে আসিয়া দেখি যে, আরও কতকগুলি যাত্রী এখানে অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা আমাদিগকে কতকগুলি ঘুঁটিয়া ও কাষ্ঠ দিল; তাহাতেই আমাদের চা প্রস্তুত হইল। আমরা সকলেই চা পান করিয়া পিপাসানিবারণ করিলাম। কিছু ক্ষণ বিশ্রামের পর দু তিন জন লোক নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ ও ময়দান হইতে ঘুঁটিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিল।

অদ্যকার বিশ্রামস্থান বড়ই সুন্দর! একে হিমালয়ের উপত্যকা, তাহাতে আবার নদীতীর, চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী প্রাচীরের ন্যায় স্থানটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রায় দুই মাইল যাইয়াই নদী পর্ব্বতাঙ্কে গাঢাকা দিয়াছে, কেবল কুলুকুলুরবে নদী আপনার অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া পিপাসাতুর পথিককে আশ্বস্ত করিয়া সেই দিকে আসিতে ইঙ্গিত করিতেছে। এই নদীতীরে নানাজাতীয় হরিণ, বন্য অশ্ব, হরিৎ পীত রক্ত ও কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা বর্ণের বিহঙ্গকুল সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকে। আমরা বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটি বন্য অশ্ব দেখিতে পাইলাম। বন্য অশ্ব গর্দ্দভবৎ খর্ব্ব, শ্বেত ও রক্তবর্ণে সুরঞ্জিত, দেখিতে নয়নানন্দকর। সে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছে, আর এ দিকে ও দিকে ছুটিতেছে। এইরূপ প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ক্রীড়ার পর হঠাৎ আমাদের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। আমাদের উপর দৃষ্টি পড়াতে সে ভীত হইয়া ক্ষণকাল চিত্রার্পিতের মত চাহিয়া রহিল, পরে তীরবেগে পর্ব্বতের মধ্যে লুকাইল; আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। এখানে দুইটি কাকও দেখিতে পাইলাম। এদেশীয় কাক দেশীয় দাঁড়কাক অপেক্ষা প্রায় চতুর্গুণ বৃহৎ, শব্দও তদনুরূপ গুরুগম্ভীর ও আরামপ্রদ, বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণ। এখানে মুনাল প্রভৃতি অসংখ্য পার্ব্বতীয় বিহঙ্গ ও কস্তুরী মৃগ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল জন্তু ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমরা অগ্নি জ্বালিয়া অগ্নিকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে, শীতের ভয়ে আপন আপন শীতবস্ত্রের ভিতর লুকাইলাম। রাত্রে কাহারও নিদ্রা আসিল না; শীতাধিক্যই নিদ্রা না আসিবার কারণ। প্রাতঃকাল হইবার পূর্ব্বেই শয্যা পরিত্যাগ করিলাম ও প্রাতঃকৃত্যসমাপন করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

অদ্য 'চড়াই' তিন মাইল, তার পর বরফময় সমতলভূমি, পরে 'উৎরাই'।

এই আরোহণ ও অবরোহণ সমেত আমাদিগকে নয় মাইল পথ চলিতে হইবে। এখন আমরা 'চড়াই'এর নীচে আছি। এই স্থান হইতে 'উৎরাই' আরম্ভ হইয়াছে। আমি 'ঝব্বু'তে আরোহণ করিলাম, আর আমার জিনিসপত্র আমার অপর 'ঝব্বু'তে বোঝাই করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ চলিয়াই সকলে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইল; আর এত ক্লান্ত হইয়া পড়িল যে, আর এক পদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা রহিল না। এই পর্ব্বত অত্যন্ত দুরারোহ। বসিয়া বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, সুতরাং "চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্"—শাস্ত্রীয় এই বচনানুসারে যান, বাহন, মেষ, ছাগ, মানুষ, গরু, সকলকেই বুদ্ধিমান হইয়া এক পদে অগ্রসর আর এক পদে স্থিতি করিয়া চলিতে হইল। নিম্নস্থ নদীতীর হইতে পর্ব্বতশৃঙ্গ পর্য্যন্ত একটি সূত্ররেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এই রেখাবৎ অপ্রশস্ত স্থানই আমাদের পথ। পথের উভয় পার্শ্বে শূন্য। এই শূন্য, দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া মহাশূন্যে মিশিয়াছে; সুতরাং বামে বা দক্ষিণে দৃষ্টি করিলে মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। কাজে কাজেই দৃষ্টিশক্তি অনন্যগতি হইয়া সম্মুখস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গে আবদ্ধ রহিল। যান বাহন ও মানব সকলেই আপনার শরীর ছাড়িয়া দিয়া চলিতে লাগিল। আরোহণে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পশুদিগের জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, আর ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে সকলেই হাঁপাইয়া পড়িল। শ্বাস প্রশ্বাসও ক্লেশকর হইয়া উঠিল, সুতরাং অল্প কিছু অগ্রসর হইতে হইতে হাঁপ ছাড়িবার জন্য মধ্যে মধ্যে সকলেই ৫।৬ মিনিট বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ৫।৬ ঘণ্টা চলিয়া আমরা 'সেলসেল' পাস অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতশিখরে উপস্থিত হইলাম। 'সেলসেল' পাস সমুদ্রসমতল হইতে ১৬৩৯০ ফিট উচ্চ। এই পাসের ঊর্দ্ধদেশের সমতলভূমিতে একটি স্তূপ আছে। এই স্তূপটি প্রস্তরখণ্ডে রচিত ও নানাবর্ণের লতা-বনমালায় সুসজ্জিত। যে এই পথ দিয়া যাইবে, সেই একখণ্ড প্রস্তর এই স্তূপে নিক্ষেপ করিবে ও একটি নিশান ঝুলাইয়া দিবে। আমরাও এই স্তূপে অনেকগুলি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলাম ও নিশান ঝুলাইয়া দিলাম। হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে এই স্তূপ অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। আমরা এই স্তূপের সমীপবর্ত্তী হইতে না হইতেই আমার এই সঙ্গীরা অতি উচ্চৈঃস্বরে তিব্বতীয় ভাষায় প্রার্থনা করিতে লাগিল। আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও

বুঝিলাম না। অবশেষে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তাহারা দূর হইতে কৈলাসশিখর দর্শন করিয়া কৈলাসপতির নিকট এই প্রার্থনা করিল, "হে কৈলাসপতি ! আমাদিগকে বরফপাত হইতে রক্ষা কর, ছাগ, মেষ ও অপরাপর পশুদিগকে সংক্রামক ব্যাধি হইতে রক্ষা কর; পশুদিগকে ঘাস দাও ও নিয়মিত বারি বর্ষণ কর।" তাহারা প্রার্থনান্তে আমাকে কৈলাসের উচ্চ শিখর দেখাইয়া দিল। আমি কৈলাসপতিকে ও কৈলাসকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া মঞ্চ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মঞ্চের নিম্নে বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গীরাও তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমি একান্ত পিপাসাতুর হইয়াছিলাম, কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও এখানে জল পাওয়া গেল না। কাজে কাজে জলাভাবে প্রাণ আই ঢাই করিতে লাগিল। আমার সঙ্গীদের পরামর্শে গোলমরিচ ও মিছরি মুখে দিয়া মুখশোষ নিবারণ করিলাম। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম।

এখন আমরা চড়াই চড়িতেছি। কিন্তু এ চড়াই তত কষ্টজনক নহে। এই প্রকারে প্রায় দুই ঘণ্টা চলিয়া 'মালচাক' নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান সমুদ্রসমতল হইতে ১৮১০০ ফিট উচ্চ। এই 'মালচাক' হইতে অনুমান অর্দ্ধ মাইল চলিয়াই দেখিতে পাইলাম, কতকগুলি বন্য অশ্ব বিচরণ করিতেছে। তাহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া প্রথমতঃ নিস্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল; জানি না, পরে কি মনে করিয়া তীরবৎগতিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমরাও কিছু দূর যাইয়া চড়াই ছাড়িয়া 'উৎরাই' ধরিলাম। এই 'উৎরাই' নদীতীরে যাইয়া শেষ হইয়াছে। এখানে আর পথের কোনও চিহ্ন নাই। সুতরাং নদীর তীরে তীরে চলিতে হইল। এই নদীর উভয় তটই বরফ দ্বারায় আবৃত। বরফের উপর দিয়াই চলিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে নদীর পর পারেও যাইতে হইল। বরফময় সেতুতে নদী পার হইলাম। এইরূপ কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ভাল পথ পাইলাম। এইটি হিমালয়ের উপত্যকা ভূমি। উপত্যকা ভূমিকে আলিঙ্গন করিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিতা; নদীর তীরভূমি অবলম্বন করিয়া আমরা চলিতেছি, এমন সময় আমার বাহন ভীত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে ছুটিল। আমি নিম্নে পড়িয়া গেলাম, কিন্তু ইহাতে আমার কোনও প্রকার আঘাত লাগে নাই; অতিরিক্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম মাত্র। আমার সঙ্গীরা আমার দশা দেখিয়া আমাকে বাহনে আরোহণ করাইল, আর অতি ধীরে ধীরে তাহাকে চালাইতে লাগিল। এই

প্রকারে চলিয়া প্রায় ২টার সময় আমরা 'ডাকর' নামক আড্ডায় উপস্থিত হইলাম।

'ডাকরে'র উভয় দিকে পর্ব্বত; মধ্যে সমভূমি; সমভূমিতে যথেষ্ট ঘুঁটিয়া পাওয়া যায়, ও নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে প্রচুরপরিমাণে কাষ্ঠ ও জল আছে। এই সমভূমিতে ৫।৬টি তাম্বু। এই তাম্বুতে তিব্বতীয়দিগের বাস। এই তাম্বুনিবাসী তিব্বতীয়েরা বাণিজ্যব্যবসায়ী গৃহস্থ। ইহাদের প্রত্যেকেরই ৫০০ হইতে ২০০০ পর্য্যন্ত মেষ ও ছাগল আছে, এবং চামর গাই, ঝব্বু ও ২।৪টি ঘোটক আছে। যেখানে ঘাস জল ও কাষ্ঠ আছে, সেখানেই ইহারা থাকে। ইহারা প্রায় বার মাসই তাম্বুতে বাস করে। গ্রীষ্মের সময় উপরে উঠে, শীতের সময় নিম্নে চলিয়া যায়। ইহাদের সম্পত্তি ছাগ, মেষ ও চামরী গাই। ছাগ ও মেষের রোম বিক্রয় করে। এবং চামরী গাই-এর রোম দিয়া তাম্বু প্রস্তত করিয়া থাকে। চামরী গাইএর রোমের তাম্বু বড় গরম। 'ডাকরে' আসিয়া আমরা একটি তাম্বুর নিকটে আড্ডা করিলাম। এখানে যে কয়টি তাম্বু আছে, সবগুলিই অতি প্রকাণ্ড। যেখানে এই প্রকার তাম্বু থাকে, তাহাকে এ দেশীয়েরা 'ডুং' বলে। 'ডুং' বণিক-দিগের আড়ত বই আর কিছুই নহে। প্রান্তসীমার ব্যবসায়ীরা আসিয়া এই সব তাম্বুতে থাকে, নিজের জিনিসপত্র তাম্বুতে রাখে, এবং এই দেশ হইতে যে সমস্ত বস্তু ক্রয় করে, তাহাও এই সব আড়তে জমা হয়। পরে মেষ, ছাগ, চামর ও ঝব্বুর পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া দেশে চালান দেয়। আমরা যে তাম্বুর নিকট আড্ডা করিয়াছিলাম,সেই তাম্বু কেদার সিংএর আড়ত। সুতরাং তাম্বুওয়ালার সঙ্গে তাহার বিলক্ষণ প্রীতি ছিল। এখানে আমরা পাল খাটাইয়া আড্ডা করিয়াছিলাম। কিছু ক্ষণ পরেই বাতাসে পাল উড়াইয়া লইল; ভয়ানক বাতাস উঠিয়া আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। শীতে বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিলাম। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আড়তদারের মনে দয়া হইল; সে আমাদিগকে আর একটি তাম্বু খাটাইয়া দিল; আমরা সেই তাম্বুর ভিতর গিয়া রক্ষা পাইলাম। তাম্বুটি চামরীগাইএর রোমে প্রস্তত, সুতরাং খুব গরম ও আরামপ্রদ। এখানে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে বিশেষ আয়াস পাইতে হইল না। নিকটেই যথেষ্ট ঘুঁটিয়া ও কাষ্ঠ পাইলাম, জলও নিকটে পাইলাম। এই রাস্তায় আরামের যত কিছু উপকরণ পাওয়া যায়, সকলই আমরা পাইলাম। আড়ত হইতে মাখন, দুধ, ঘোল ও ছাতু আসিল, আড়তদারের

যত দূর সাধ্য, আমাকে অভ্যর্থনা করিল। আহারের জন্য যথেষ্ট মেষমাংস দিল। আমরা অতি কষ্টে আসিয়াও আড়তদারের যত্নে সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। এখানে আড়তদার নিজে, তাঁহার স্ত্রী, স্ত্রীর পূর্ব্বপক্ষের একটি পুত্র, আড়তদারের ২।৪টি ভৃত্য আমাদের সেবায় নিযুক্ত রহিল। এখানে সকল বিষয়েরই সুবিধা, কেবল ভয় কুকুরের। আড়তের রক্ষার জন্য ৮।১০টি কুকুর আছে। তাহারা ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভীষণ। একাকী তাম্বুর বাহির হইতে সাহস হয় না। যাহাদের ভুটিয়া পরিচ্ছদ, অথবা প্রান্তবাসীর পরিচ্ছদ, তাহাদিগকে দেখিয়া কুকুর তত তাড়া করে না। কিন্তু আমার পরিচ্ছদ দেখিয়া কুকুর বড়ই তাড়া করিতে লাগিল। আমি ভয়ে আর তাম্বুর বাহির হইলাম না। আমার ভৃত্য বলিল, আহারান্তে আপনি স্বহস্তে কুকুরদিগকে আহার দিবেন, তাহা হইলেই কুকুরগুলি আর আপনাকে বিরক্ত করিবে না। বস্তুতঃ তাহাই হইল। বেলা ৪টার পর আহারাদি সমাপ্ত হইল। আহারান্তে বসিয়া আছি, এমন সময় কতকগুলি ভুটিয়া ও ভুটিয়ানী আমার তাম্বুর মধ্যে আসিয়া বসিল। আমার সঙ্গে দেবমূর্ত্তি ছিল; সেই দেবমূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা প্রণাম করিল, এবং ভোগের জন্য চা, ছাতু ও মাখন আনিয়া দিল, এবং 'থুথু' অর্থাৎ এক প্রকার মিষ্টান্ন উপহার দিল। এই মিষ্টান্নই এ দেশের উপাদেয় খাদ্য। ইহারা ঘোল, দুগ্ধ ও গুড় জ্বাল দিয়া এই মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে। ইহারা আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি ইহাদের ভাষা জানি না, কেবল অনুমানে উত্তর করিলাম, "আমি কাশীর সন্ন্যাসী; তীর্থভ্রমণের জন্য মানসসরোবর ও কৈলাস যাইতেছি।" আমার দোভাষী ভৃত্য তাহাদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দিল, এবং তাহাদের কথা আমাকে বুঝাইয়া দিল। অবশেষে জানিতে পারিলাম, আমি অনুমানে যাহা উত্তর করিয়াছি, ইহারা তাহাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আমার উপাস্য দেবমূর্ত্তির দর্শন করিয়া তাহারা 'মহাকালী' শব্দ মুখে উচ্চারণ করিল, এবং আমার ত্রিশূল দর্শন করিয়া তাহারা 'শক্তি' এই শব্দ উচ্চারণ করিল। এই দুইটি শব্দ আমি বুঝিয়াছিলাম। ইহাতে অনুমান করিলাম, ইহারা যে কেবল বৌদ্ধ, তাহা নহে;—আমাদের দেব দেবীও মানিয়া থাকে। আমার দীর্ঘ শ্মশ্রু দর্শন করিয়া এক জন বুদ্ধিমান তিব্বতীয় বলিয়াছিল, ইনি বোধ হয় ইংরাজ, ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছেন। ইহার উত্তরে আর এক জন সেই দেশীয় লোক এই কথা বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করে, "দাড়ি থাকিলে

যে ইংরাজ হইবে, তাহা নহে। ইংরাজের চক্ষু কটা, রং সাদা, তাহারা দেব দেবী মানে না। আর আমাদের কৈলাসের মঠে যে সব লামার প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাঁহাদের অনেকেরই দাড়ি আছে। ইনি কখনই ইংরাজ নহেন।” আমার দোভাষী ভৃত্য আমাকে এই কথা বুঝাইয়া দিয়াছিল। আমার যান বাহন এখান হইতেই বিদায় দিতে হইবে।

এখন হইতে আবার নূতন বন্দোবস্ত। এখন আমি সম্পূর্ণ নূতন দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া খাস তিব্বতে আসিয়াছি। এ দেশীয় কথাবার্ত্তা কিছুই বুঝি না, ভৃত্য যাহা বুঝাইবে; তাহাই বুঝিব; ভৃত্য যাহা করাইবে, তাহাই করিব; ভৃত্য যে পথে চালাইবে, সেই পথেই চলিব। কেদার সিং এখন এখানেই থাকিবে। এ দিক ও দিক হইতে উল খরিদ করিয়া এখানে জমা করিবে। পরে সিবচিলুম যাইবে। অপরাপর সঙ্গীরাও এখানে থাকিবে। আমি, আমার সহযাত্রী সাধু পুর্ণানন্দ গিরি ও দুইটি ভৃত্য, আমরা এই কয় জন তিব্বতের ভিতরে প্রবেশ করিব। এখানে আমাকে একদিন বিশ্রাম করিতে হইল। কারণ, এখান হইতে কিছু কিছু জিনিসপত্র কিনিয়া লইতে হইবে। ৫।৬ দিনের মধ্যে আর লোকালয় পাইব না। এখানে হাটবাজার কিছুই নাই; লোকালয় হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া লইতে হয়। আবার সকল লোকালয়ে জিনিসপত্র পাওয়া যায় না। যে গ্রামে দুই এক জন সচ্ছল লোক আছে, অথবা সীমান্তবাসী ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে কোনও স্থানে আড্ডা করিয়াছে, সেখানেই যৎসামান্য খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। আমি এখানে কিছু জিনিসপত্র রাখিলাম ও এখান হইতে কিছু কিছু কিনিয়া লইলাম। কিছু চাউল ছিল, তাহা এখানে রাখিয়া দিলাম। কারণ, উপরে আর চাউল সিদ্ধ হইবে না। নীচের চা ও আটা এখানে রাখিয়া দিলাম, এবং দেবালয়ে ও লামাদিগকে উপহার দিবার জন্য কিছু মিছরি কিনিলাম, এবং নিজের ব্যবহারের জন্য ভুটিয়া চা ও মাখন লইলাম। ছাতু ফুরাইয়াছিল, কিছু ছাতুও লইতে হইল।

এই সব বন্দোবস্ত করিতে এক দিন চলিয়া গেল। এখন আমরা হিমালয়ের শৃঙ্গ সকল অতিক্রম করিয়াছি। আর আরোহণ বা অবরোহণের কষ্ট পাইতে হইবে না, সমভূমিতে চলিতে পাইব। ভয় ও বিভীষিকা চলিয়া গিয়াছে; যাহা আছে, তাহা অল্প; যথা

ডাকাতের ভয়। শীতের ভয়ের ত কথাই নাই। শুনিলাম, পথে আর কোনও কষ্ট পাইতে হইবে না। বৃক্ষ লতাও দেখিতে পাইব না। কেবল শূন্য মাঠ, শূন্য পর্ব্বত, তুষারাবৃত উচ্চ শৃঙ্গ দেখিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে হইবে। এ দেশের ডাকাতেরা রাত্রে ডাকাতি করে না, আর ২।১ জনেও ডাকাতি করে না। ৮।১০ জন মিলিয়া একটি দল বাঁধে। প্রত্যেক ডাকাইত ঘোড়সোয়ার হইয়া বন্দুক বর্ষা ও তলোয়ার লইয়া ডাকাতি করে। যখন পথিকেরা প্রান্তর দিয়া চলিতে থাকে, তখন ডাকাতেরা তীর-বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া পথিকদের নিকট যায়। পথিকদের নিকট যাইয়া বলে, তোমাদের কোথায় কি আছে, দাও, বস্ত্র খুলিয়া দেখাও। ইহাতে যদি কেহ আপত্তি করে, তাহার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়; গাত্রের সামান্য বস্ত্র পর্য্যন্ত ছাড়ে না, আহার্য্য সামান্য বস্তুও লইতে ক্রটি করে না। ইহাতেও যদি পথিকেরা বলপ্রকাশ করে, তাহা হইলে পথিকদের প্রাণ পর্য্যন্ত যায়। সহজে এই সব ডাকাইত জীবন লয় না, ইহাদের দয়াও আছে। যদি প্রান্তরে কাহারও সর্ব্বস্বান্ত করে, তাহা হইলে তাহাকে কোনও গ্রামে পঁহুছিবার জন্য কিছু খাদ্য দিয়া লেংটি পরাইয়া ছাড়িয়া দেয়। আমার দোভাষী ভৃত্য আমাকে পথের এই সব বিপদ ও অন্যান্য বিপদের কথা বলিল। যদিও এখন সমতলভূমিতে চলিব, তথাপি যাওয়া একান্ত ক্লেশকর। বায়ু এত লঘু যে, বসিয়া শ্বাস প্রশ্বাস লওয়াই কষ্টকর। যাহাদিগের এই দেশে যাতায়াতের অভ্যাস আছে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যাহারা নূতন লোক, তাহাদের বড় বিপদ।

এখানে আসিয়া দেখিলাম, রাত্রে নিদ্রা যাওয়া বড়ই কষ্টকর। সময়ে সময়ে দম বন্ধ হইয়া নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, আর নিদ্রা আসে না। শীত ত আছেই। এখন দিনেও বিপদ, রাত্রেও বিপদ। বরফ কখন পড়িবে, তাহার ঠিকানা নাই। হাওয়া কখন উঠিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। একবার হাওয়া উঠিলে উড়া-ইয়া লইয়া যাইবে, বরফ পড়িলে বরফচাপা পড়িব। এত দিন রাত্রিতে নিদ্রা গিয়া আরাম লাভ করিতাম, এখন আর রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিব না। রাত্রিতে হাওয়া উঠে না বটে, কিন্তু বরফপাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এই সব চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম, যখন আসিয়াছি, মানসসরোবর ও কৈলাসদর্শনের সংকল্প করিয়াছি, তখন আর ভাবিবার প্রয়োজন নাই। যা হইবার, তাহাই হউক। জীবনের আশা ভরসা একেবারে পরিত্যাগ করি-

লাম। যখন প্রাতঃকালে এক আড্ডা হইতে অপর আড্ডায় যাত্রা করিতাম, তখন মনে হইত, হয় ত আড্ডায় যাইতে পারিব না। যখন আড্ডায় যাইয়া বিশ্রাম করিতাম, তখন মনে হইত, আজি বোধ হয় চিরবিশ্রাম হইবে। এখন পথ ত এইরূপ। এই পথে একে ত শরীর লইয়া চলাই কঠিন, তার উপর আবার বোঝা! আমার ভৃত্যদের সঙ্গে কথা ছিল, তাহারাই আমার সমস্ত বোঝা বহন করিবে; এখন দেখিলাম, এক জন ১০।১২ সেরের অধিক লইতে পারিবে না। সুতরাং আর একটি কুলি সংগ্রহ করিলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া আমার দুই ভৃত্য ও কুলিকে জিনিসপত্র ভাগ করিয়া দিয়া 'ডাকর' হইতে 'পাংটাং' যাত্রা করিলাম। অদ্যকার পথে বেশী 'চড়াই' ও 'উৎরাই' নাই, তথাপি দ্রুতপদে চলিতে পারিতেছি না, অতি ধীরে ধীরে চলিতে হইল। এইরূপ চলিয়া বেলা ১১টার সময় একটি নদীতীরে আসিলাম। সেখানে স্নান আহ্নিক ও আহারাদি করিয়া কিছু বিশ্রাম করিলাম। বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম; এক মাইল চলিয়াই আর চলিবার শক্তি রহিল না। সেই নদীর পর পারেই আড্ডা করিলাম।

আমাদের সম্মুখে পূর্ব্বোক্তরূপ একটি ডুং ছিল। ডুংএর কাছে আমার আড্ডা। এখানে আরও কিছু পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন হইল। ডুংএ লোক পাঠাইয়া দিলাম, সেখান হইতে একটি মেষ আনীত হইল। আমার সঙ্গীরা বিধিপূর্ব্বক বলির আয়োজন করিতেছে, এমন সময় এক জন ভুটিয়া আসিয়া বলিল, বাহিরে বলি দিবেন না। পশুর রক্ত দর্শন করিলেই মেঘ হইবে, এবং বরফপাত হইবে। এই অসময়ে বরফপাত হইলে আমাদের ভেড়া ও ছাগল সমস্ত মরিয়া যাইবে। আমি বলিলাম, তবে উপায় কি? সে বলিল, আপনি দেবতাকে বলি নিবেদন করিয়া দিন, আমরা আমাদের তাম্বুর মধ্যে লইয়া গিয়া ছেদন করিয়া দিব। আমি তাহাই করিলাম। তাহারা অল্পক্ষণের মধ্যেই পশুটিকে ছেদন করিয়া আনিয়া দিল। পশুবলির পর আমার সঙ্গীরা লবণ ও লঙ্কা দিয়া কাঁচা মাংসই খাইতে লাগিল! আমাকেও খাইতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু আমার তাহা খাইতে প্রবৃত্তি হইল না। আমরা আর অদ্য আড্ডাতে পঁহুছিতে পারিলাম না; পথিমধ্যেই বিশ্রাম করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া শতদ্রু নদীর একটি শাখা পার হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই দিবসেও পূর্ব্ব দিবসের মত দশা, সুতরাং 'পাংটাং' নামক আড্ডায় আসিয়া বিশ্রাম করিলাম। এই দুই দিনসে ছয়

মাইল পথ চলিয়া আসিয়াছি। 'পাংটাং' হইতে অদ্য 'গম্' নামক আড্ডায় যাইবার সংকল্প। কিন্তু পথিমধ্যে আর জল নাই, একটু ঘুরিয়া গেলে জল পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সেখানে ভাল পথ নাই। সুতরাং আড্ডাতেই যাইব, এইরূপ সংকল্প করিয়া চলিতে লাগিলাম। বেলা হইয়াছে, রৌদ্রের উত্তাপে আর চলিতে পারিতেছি না। সকলেই আড্ডার আশা পরিত্যাগ করিয়া জলের দিকে চলিল, এবং রাস্তা হইতে ঘুটিয়া সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইল। এক জন ভৃত্য দৌড়িয়া গেল। সে যাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, এখানে জল আছে, শীঘ্র আসুন। আমরাও খুব দ্রুতবেগে যাইয়া জল পাইলাম। সেখানেই বিশ্রাম করিলাম, এবং সকলের পরামর্শ অনুসারে স্থির হইল, অদ্য আর চলিব না, এই পর্ব্বতেই রাত্রিযাপন করিব। এইরূপে আষাঢ়ের অষ্টাদশ দিবস চলিয়া গেল।

শ্রীরামানন্দ ভারতী।

গৌড়ের অবস্থান।

একণে প্রাচীন গৌড় নগরের আয়তন ও বিস্তৃতি নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভ বা পূর্ব্ব হইতে এই অঞ্চলে রাজধানী না হউক, বাণিজ্যকেন্দ্রস্বরূপ যে একটি বৃহৎ নগর বর্ত্তমান ছিল, তাহা টলেমী ও ষ্ট্রাবোর গ্রন্থ হইতে নির্ণয় করা যাইতে পারে। খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতেই গৌড় এই প্রদেশের রাজধানী হইয়াছিল, কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এরূপও অনুমান করিয়াছেন। সেই অতি প্রাচীন কাল হইতে বহুসংখ্যক রাজবংশ গৌড়ের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া অবশেষে গৌড়ভূমিতেই সমাহিত হইয়াছেন। বিজয়লক্ষ্মীর বরদৃপ্ত নৃপতি কেশরিগণ সম্ভবতঃ পুরাতন বিজিত রাজবংশের অধ্যুষিত প্রাসাদে বসবাস আপনাদিগের গৌরব ও সম্ভ্রমোচিত মনে না করিয়া স্থানান্তরে নূতন রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেন। বল্লালসেনের পুত্র হইয়াও লক্ষ্মণসেন পিতার সহিত এক বাসে না থাকিয়া তিন ক্রোশ দূরে আপনার জন্ত স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এরূপ জনশ্রুতি বা প্রমাণের অভাব নাই। গৌড় নামের সহিত গোর কথার উচ্চারণসাম্য লক্ষ্য করিয়া ভাবী অকল্যাণের আশঙ্কায় মুসলমান শাসনকর্ত্তৃ-

বিশেষের গৌড় হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার উল্লেখও ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। এইরূপ প্রাচীন কাল হইতে পুনঃপুনঃ রাজবিপ্লবাদি বহুতর কারণে গৌড়রাজগণ এক স্থানে বসবাস করিতে পারেন নাই, এবং তাহার ফলে কোন দিকে গৌড়ের আয়তন সম্প্রসারিত, আবার কোন দিকে বা সঙ্কুচিত হইয়াছে। তাই এক্ষণে গৌড়ের প্রকৃত অবস্থাননির্ণয় সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীন গৌড়ের দর্শনীয় ভগ্নাবশেষসমূহ মালদহ জেলার সদর ষ্টেশন ইংরেজবাজার টাউনের আট মাইল দূরবর্ত্তী রামকেলী নামক গ্রামের অনতি-দূরে ও পার্শ্বে পরিদৃষ্ট হয়। সেই জন্য ভগ্নাবশেষপূর্ণ রামকেলী গ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানই এক্ষণে গৌড় নামে পরিচিত। কিন্তু উক্ত স্থানের বাহিরে ইংরেজবাজারের নিকট পর্য্যন্ত উন্নত গড় ও পরিখা বর্ত্তমান আছে। ইহাতেই কেহ কেহ উক্ত গড়বেষ্টিত সমুদায় ভূভাগকে প্রাচীন গৌড় নগর বলিয়া অনুমান করেন।

পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক ফরিয়াই সৌজা (১) নামক ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড়নগরে দ্বাদশ লক্ষেরও অধিক অধিবাসী ছিল। একটি ক্ষুদ্রায়তন নগরে এত অধিক লোক থাকিতে পারে না। উপনগর সহিত বর্ত্তমান কলিকাতা ও বোম্বাই সহরেও লোকসংখ্যা এত অধিক নহে।

গৌড়ের ভগ্নাবশেষ পরীক্ষা করিয়া মালদহের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার রাভেন্সা প্রাচীরবেষ্টিত নগর দৈর্ঘ্যে ১০ মাইল ও বিস্তারে এক কি দেড় মাইল এবং নগরোপকণ্ঠ দৈর্ঘ্যে ২০ মাইল ও বিস্তারে তিন কি চারি মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব সার্ভেয়র জেনেরল মেজর রেণেলের মতে, প্রাচীন গৌড় নগর বর্ত্তমান ভাগীরথীর পরিত্যক্ত খাদের তীরে দৈর্ঘ্যে ১৫ মাইল ও বিস্তারে ২।৩ মাইল পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল।

প্রাচীন গৌড়ের আয়তন ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অগ্রবর্ত্তী লেখকগণের মতামত আলোচনা করিয়া সার উইলিয়ম হণ্টার লিখিয়াছেন যে, প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত প্রাচীন গৌড়নগর উত্তর-দক্ষিণে ৭·½ মাইল ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে এক হইতে দুই মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার পূর্ব্ব সীমায়

---

(১) Fariay Souza.

মহানন্দা, পশ্চিমে ভাগীরথী গঙ্গা, এবং দক্ষিণে গঙ্গামহানন্দার সম্মিলনফলে, উক্ত দিকত্রয় স্বভাবতঃ সুরক্ষিত ছিল। কেবল উত্তর দিক হইতে শত্রু-সেনার আক্রমণপ্রতিষেধের জন্য উত্তরপশ্চিমকোণস্থ সোনাতলার নিকটবর্ত্তী ভাগীরথীগর্ভ হইতে পূর্ব্বোত্তরকোণবর্ত্তী মহানন্দানদীতীরস্থ ভোলাহাট পর্য্যন্ত পূর্ব্বপশ্চিমব্যাপী বক্রাকৃতি ইষ্টকনির্ম্মিত গড়বন্দী আবশ্যক হইয়াছিল। এই গড়বন্দী এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। এই গড়বন্দীই হণ্টার প্রভৃতির মতে গৌড়ের উত্তর সীমা।

মালদহের ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর মিঃ রাভেন্সা ও মিঃ পোর্চ্চ গৌড়ের ভগ্নাবশেষ ও পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিবিশেষ সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। মিষ্টার রাভেন্সা গড়শ্রেণীকে উত্তরসীমা বলিয়া গ্রহণ করিলেও, তিনি সেগুলিকে শত্রুসেনার আক্রমণরক্ষার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত বলিয়া মনে করেন নাই। ঐগুলি গঙ্গার প্লাবন হইতে গৌড়নগরের রক্ষার উদ্দেশ্যে বাঁধস্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, রাভেন্সা ও পোর্চ্চ সাহেবের এইরূপ মত। গঙ্গাপ্রবাহের গতিপরিবর্ত্তনের ইতিহাস ও গড়গুলির প্রকৃতি ও অবস্থানের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এই মতেরই পোষকতা হয়। আবুল ফজলের সুপ্রসিদ্ধ আইন-ই-আকবরী গ্রন্থেও এই গড়গুলি বাঁধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

গঙ্গার গতির অস্থিরতা চিরপ্রসিদ্ধ। এক্ষণে যে গঙ্গা ২০ মাইল দূরে রাজমহলের পার্শ্বে প্রবাহিত, তাহাই খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড় নগরের প্রাচীরপার্শ্বে প্রবাহিত ছিল। (১) সুলতান সুজার রাজত্বকালে গঙ্গা গৌড়কে ত্যাগ করিয়া রাজমহলের গিরিপার্শ্ব বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তবকতে-নাসিরী নামক পারসী ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতা মিনহাজউদ্দীন স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্ণৌতী সহর গঙ্গার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ছিল ও তাহার পশ্চিম পার্শ্বে দুর্গ বর্ত্তমান ছিল। লক্ষ্ণৌতী হইতে এক দিকে দেবকোট ও অপর দিকে নাগর পর্য্যন্ত তিন দিবসের পথব্যাপী একটি উচ্চ বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বাঁধ বর্ত্তমান না থাকিলে লক্ষ্ণৌতীর দর্শনযোগ্য মন্দিরাদি অট্টালিকা বর্ষাকালে নৌকার সাহায্য ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যাইত না।

---

(১) "———The course of the Ganges was along the northern bank, running under the walls of Gaur; but since that period, it pours its torrents against the rocks of Rajmehal"—*Stewart.*

মিষ্টার পোর্চ্চ গৌড়ের ভূভাগ ও জঙ্গলাদির পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অমৃতী হইতে প্রবাহিত বর্ত্তমান ক্ষুদ্র জলস্রোতের তীরবর্ত্তী সোনাতলা হইতে বাঘবাড়ীর পার্শ্ব দিয়া গন্দরআইল নামক স্থান ভেদ করিয়া সোনারায়ের গড়ের পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। মালদহের কলেক্টরীর সম্পৃক্ত পুস্তকালয়ে রক্ষিত রাভেন্সার গৌড় নামক পুস্তকের গৌড়ের মানচিত্রে মিষ্টার পোর্চ্চের স্বহস্তে পেন্সিলচিহ্ন দ্বারা প্রকটিত গঙ্গার প্রবাহচিত্র হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, বর্ত্তমান ভাতিয়া বিল এককালে গঙ্গারই গর্ভদেশের অন্তর্গত ছিল, এবং প্রকৃতপক্ষে গঙ্গার প্লাবন হইতে নগরীরক্ষার জন্যই পূর্ব্বোক্ত গড়বন্দীর নির্ম্মাণ আবশ্যক হইয়াছিল। যাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান কালের গৌড়ের অবস্থান জানিতে ইচ্ছুক, মিষ্টার পোর্চ্চের প্রদর্শিত গঙ্গাপ্রবাহের চিত্র তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

মিষ্টার পোর্চ্চের অনুমিত গঙ্গাপ্রবাহের দক্ষিণ দিকে গৌড়ের যাবতীয় দর্শনযোগ্য ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। এই সকল ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটিও হিন্দুকীর্ত্তির স্মারক নহে। মসজিদ বা অন্য কীর্ত্তিচিহ্নের ভগ্নাবশেষের মধ্যে দুই চারিখানি প্রস্তরে হিন্দু দেব দেবীর বা হিন্দুকীর্ত্তিজ্ঞাপক জীবজন্তু বা পদ্ম আদি পুষ্পের ক্ষোদিত চিত্র পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ঐ সকলের অবস্থান-অনুসারে, তাহাদিগকে মসজিদ আদি নির্ম্মাণের জন্য স্থানান্তর হইতে নীত বলিয়াই অধিক মনে হয়। স্থূলতঃ আপাততঃ বিলুপ্ত উক্ত গঙ্গাপ্রবাহ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গড়বন্দী বা বাঁধের দক্ষিণেই মুসলমানদিগের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহা স্বতঃই প্রতীত হয়।

ইংরাজবাজার টাউনের পশ্চিমে এক মাইল দূরে রাজমহল রোডের পার্শ্বে বাঘবাড়ী নামক একটি স্থান আছে। এই স্থানের নিকটে রাজা বল্লালসেনের প্রাসাদ ও দুর্গ থাকার জনশ্রুতি মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। এখনও উক্ত স্থানে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকপ্রস্তরাদি পতিত ও গড় পরিখাদি দুর্গচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে মিষ্টার বুকানন হামিল্টন ইহারই অনতিদূরে রাজা আদিশূরের প্রাসাদ থাকার কিম্বদন্তী লোকমুখে শ্রবণ ও তৎপরিচায়ক মূল্যবান ক্ষোদিত প্রস্তর ও ইষ্টকাদি তথায় পতিত ছিল, দর্শন করিয়াছিলেন। অর্দ্ধশতাব্দী পরে আদিশূরের রাজকীয় বাসভূমি বলীবর্দ্দের ক্ষুর ও কৃষকের হলাগ্রে প্রপিষ্ট ও বিলু

রিত হইয়া চাষ আবাদের উপযোগী হইয়াছিল। (১) এক্ষণে আবার তৎসময় হইতে শতাব্দপাদের মধ্যে আদিশূরের স্মৃতি কিম্বদন্তীর রসনাতেও আর স্থান পাইতেছে না। স্বনামধন্য বল্লালসেনের রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের স্মৃতিও আর কিম্বদন্তী অধিক কাল বহন করিবে, বোধ হইতেছে না। আদিশূর ও বল্লালের এই স্মৃতিক্ষেত্র গৌড়ের গড়বন্দীর বাহিরে প্রাচীন গঙ্গাপ্রবাহের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত।

মহানন্দা ও কালিন্দী নদীদ্বয়ের ঠিক সঙ্গমস্থলে নিমাসরাই নামক স্থানে একটি গৌড়ীয় ইষ্টকগঠিত স্তম্ভ আছে। ইহার সম্বন্ধে মুসলমান সময়ের কোনও কিম্বদন্তী প্রচলিত নাই। কেবল এইমাত্র জনশ্রুতি আছে যে, ইহা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত, এবং ইহার উপর প্রদত্ত দীপালোক গৌড়ের বাদশাহগণের অন্দরমহল পর্য্যন্ত পঁহুছিত বলিয়া গৌড়ের কোনও বাদশাহ ইহার উপরার্দ্ধ ভাঙ্গাইয়া দেন। ইহা হইতে নিমাসরাই স্তম্ভ যে গৌড়ের বর্ত্তমান ভগ্নাবশেষসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম ও মুসলমানগণের সময়ে নির্ম্মিত নহে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। গৌড়স্তম্ভকে পাঠান-কীর্ত্তি বলিয়া প্রাচীন স্থাপত্যকৌশলাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু নিমাসরাই স্তম্ভ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহ তদ্রূপ অনুমান করেন নাই।

স্থানীয় রাজমিস্ত্রীগণ ইষ্টকব্যবহারকালে গৌড়ীয় ইষ্টকগুলিকে, গৌড়ের ইষ্টক, পিছলি গঙ্গারামপুরের ইষ্টক ও পাণ্ডুয়ার ইষ্টক, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে। উক্ত ত্রিবিধ ইষ্টকের যে গণনার ক্রম পৃথক, তাহা নহে; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ওজন ও গঠনেরও কিছু বিশেষত্ব আছে। নিমাসরাই স্তম্ভের ইষ্টকের সহিত পিছলী গঙ্গারামপুরের ইষ্টকের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পিছলী গঙ্গারামপুরের কাঠালে প্রাচীন পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজগণের বাসস্থান ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। সুতরাং নিমাসরাই

---

(১) To the north of the rampart and therefore entirely apart from the city, are two isolated ruins, which are connected with the names of Adisur and Ballal Sen, early Hindu kings of Bengal. The first has been levelled with the ground, and the plough has passed over it; but Dr. B. Hamilton observed that a considerable field was covered with fragments of bricks and on the surface he found a block of carved granite which seemed to have formed part of an entablature. Close by are the palace where Ballal Sen, the successor of Adisur, is said to have resided.—*Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol vii, P. 55.*

স্তম্ভকে পালবংশীয় নরপতিগণের সাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই নিমাসরাই স্তম্ভ গৌড়ের উত্তরদিক্‌বর্ত্তী গড়ের বহু দূরে অবস্থিত। শত্রুর আগমনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার অভিপ্রায়ে প্রহরিগণের অবস্থিতির জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে অনুমান করিলেও, ইহা গড়ের নিকট থাকা আবশ্যক হইত। সেই জন্য আমার অনুমান যে, নিমাসরাই স্তম্ভ যদি প্রহরিগণের জন্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তবে নিশ্চিতই তাহার অনতিদূরেই রাজধানী ছিল। যদি এই অনুমান অসঙ্গত না হয়, তবে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগণের রাজধানী গৌড়নগর উত্তরে কালিন্দী ও পূর্ব্বে মহানন্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। নদীই শত্রুর আক্রমণ হইতে রাজধানীরক্ষার পক্ষে স্বভাবতঃ সম্যক্ উপযোগিনী। এমন অবস্থায় স্বভাবনির্দ্দিষ্ট সুগভীর প্রশস্ত কালিন্দী নদীকে ত্যাগ করিয়া হিন্দুরাজগণ কৃত্রিম গড় ও স্বল্পগভীর পরিখা দ্বারা রাজধানীরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

ইংরেজবাজারের উত্তরপশ্চিম কোণে চারি ক্রোশ দূরে গঙ্গারামপুর নামে একখানি প্রাচীন গ্রাম আছে। এই অঞ্চলে পুরাকালে বৃহৎ ইষ্টকালয়-পূর্ণ নগর বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রচুর চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। লোকেও রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী এই স্থলে ছিল বলিয়া উল্লেখ করে, এবং বাঙ্গলায় আগত প্রথম মুসলমান সাধু হজরৎ মকদুম সাহ জালালউদ্দীনের "তকিয়া"ও এখানে আছে। এই গঙ্গারামপুর কালিন্দী ও ভাগীরথী হইতে অধিক দূর নহে। জেনেরল কনিংহাম এই গঙ্গারামপুর গ্রামে ৬৪৭ হিজরী বা ১২৪৯ খৃষ্টীয় শকের একখানি প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১) ইহারই ন্যূনাধিক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানগণ গৌড় অধিকার করেন। ইহা হইতেও অনুমিত হয় যে, সেনরাজগণ এই অঞ্চলেই বাস করিতেন।

স্থানীয় অভিজ্ঞতা, ভগ্নাবশেষসমূহের পরীক্ষা, বিভিন্ন ভগ্নাবশেষ-পরীক্ষকগণের মন্তব্যের আলোচনা ও স্থানীয় কিম্বদন্তী বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে, গঙ্গার গতি পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তিত এবং তৎসহ গৌড়রাজধানীরও অবস্থান ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ আলোচনা দ্বারা গৌড়ের অবস্থান সম্বন্ধে আমরা এই কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইঃ—

(১ম) কালিন্দী, মহানন্দা ও গঙ্গায় বেষ্টিত ত্রিকোণ ভূখণ্ডে পাল ও সেন রাজগণের গৌড় রাজধানী ছিল।

(২য়) পাল-রাজগণের সময় পিছলী গঙ্গারামপুরের কাঠালে ও সেন রাজগণের সময় বাঘবাড়ীর নিকট রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ অবস্থিত ছিল। গঙ্গা এই সময়ে সোনাতলা হইতে বাঘবাড়ীর পার্শ্ব ও ভাতিয়া বিলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল।

(৩য়) মুসলমানগণ বর্ত্তমান সময়ে গৌড় নামে পরিচিত গড়বন্দীর দক্ষিণ, ভাতিয়া বিলের পশ্চিম ও ভাগীরথীর পূর্ব্ব, এই সীমান্তর্গত ভূখণ্ডে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

পাগলিনী।

১

তখন আমি দশ বৎসরমাত্র ডেপুটিগিরি করিয়াছি, অর্থাৎ সুদীর্ঘ দশ বৎসরকাল দুর্ব্বল স্বদেশীয়ের প্রতি চক্ষু রাঙাইয়াছি ও প্রবল বিদেশীয়কে দেখিলে তাহার পাদুকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত নমিয়া সেলাম করিয়া জান ও মান বাঁচাইয়াছি, দাসত্ব ও ডেপুটিত্ব অব্যাহত রাখিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে আমাকে গবর্মেণ্টের বাঙ্গলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নানা জেলার জল পান করিয়া পরিবার লইয়া বিব্রত হইতে হইয়াছে। ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া আমি কয় মাসের ছুটি লইয়াছিলাম। ছুটি ফুরাইবার সময় কলিকাতায় আসিয়া বড় কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলাম, আমাকে যশোহর জেলায় বাটোয়ারার কাযে যাইতে হইবে।

বাটোয়ারার কাযে যাইতেছি, সুতরাং অগত্যা একাই চলিলাম। গৃহিণী বলিলেন, "তোমার এই নূতন শরীর; একা বড় কষ্ট হইবে। কষ্ট সহিবে না।" কিন্তু চাকরের স্থানকালবিচার হইয়া উঠে না। অগত্যা গৃহিণী আমার বাক্স পেটরা গুছাইয়া দিলেন; শতবার শত প্রকারে সাবধান করিয়া বিদায় দিলেন। আমি জেলার সদরে রওনা হইলাম।

ট্রেণে বসিয়া এক জন সতীর্থকে মনে পড়িল। সহস্র সহপাঠীর মধ্যে তাহাকে মনে থাকিবার কারণ ছিল। তাহার বাড়ী যশোহর জেলায়,—মধুস্থদনের সেই মাতৃভূমিস্তনে দুগ্ধস্রোতঃস্বরূপা কপোতাক্ষীর তীরে। সে কথা লইয়া সে গর্ব্ব করিত। আমরা তাহার পূর্ব্ববঙ্গবাস লইয়া বিদ্রূপ করিলে সে ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিত, "কিন্তু অন্য কোন জেলায় মধুস্থদন জন্মে নাই।" তাহার সেই হাস্যে যেন আমাদের প্রতি কৃপা প্রকাশিত হইত।

জেলায় যাইয়া জানিলাম, আমাকে যে পরগণার বাটোয়ারা করিতে যাইতে হইবে, তাহার পূর্ব্বসীমা—কপোতাক্ষী। বন্ধুর সন্ধান লইলাম। তাঁহার গৃহ সেই পরগণার আড় পারে; তিনি সে দিকে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি—ভূস্বামী। আমি অশ্বারোহণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম; কিন্তু দেহের বিপুলতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই দুঃসাধ্যসাধনের আশা ত্যাগ করিয়া নরবাহ্য যানই অভ্যাস করিয়াছিলাম। পল্লীগ্রামে তাহাই বা কোথায় পাই? জেলার পাকা ডেপুটিরা পরামর্শ দিলেন, সে অঞ্চলে কিছু আবশ্যক হইলে আমার সেই বন্ধুই সরবরাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রথমে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়া পরে পরগণায় যাওয়াই স্থির করিলাম।

এক দিন প্রভাতে আসিয়া বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইলাম। আমি একে সতীর্থ, তাহাতে ডেপুটি, সুতরাং অকালপক্ক সুমিষ্ট আম্রফলের মত আমার আদর দ্বিগুণ। বন্ধুর গৃহে আহার ও আদর—উভয়েরই আতিশয্যে বিব্রত হইয়া উঠিলাম। অপরাহ্নে বন্ধু নৌকায় বেড়াইবার প্রস্তাব করিলেন। বুঝিলাম, উদ্দেশ্য—সেই কপোতাক্ষী দেখান। দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। কি স্বচ্ছ সলিল—নদীগর্ভে বালুকণা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়! নদী মন্থরগতি—এখন ক্রমে শৈবালদলজড়িতা হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু সেই স্বচ্ছ জল!—তাহা কবির মাতৃভূমির উপযুক্তই বটে।

সন্ধ্যায় সংবাদ আসিল, আমার বাসা আমার শুভাগমনপ্রতীক্ষায় প্রস্তুত। জানিলাম, আমাকে নীলকুঠীর ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকায় বাস করিতে হইবে।

বন্ধু বলিলেন, "এ প্রদেশে নীলকুঠীর অভাব ছিল না; গত কল্য তোমাকে আমার গ্রামেই দুইটা কুঠীর ভগ্নাবশেষ দেখাইয়াছি। যশোহর জেলা 'নীলকর বিষধরে'র লীলাভূমি ছিল; এই 'নীল-দর্পণের' আদিস্থান।

তুমি যে কুঠীতে যাইতেছ, সে কুঠী যিনি ক্রয় করিয়াছেন, তিনি বালাখানাটি ভাঙ্গিয়া ফেলেন নাই। সেই গ্রামে খাজনা আদায় করিতে আসিয়া তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাহাতেই বাস করে। স্থানটি মনোরম; গৃহটিও রম্য। নীলকরগণ ইংরাজের সব হারাইয়াছিল, হারায় নাই কেবল সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা—পরিচ্ছন্নতাসক্তি। তাহাদের কুঠীগুলি প্রায়ই জলের কূলে, উচ্চ স্থানে,—সুন্দর। তবে সে কুঠীতে তোমার বড় ফাঁকা বোধ হইবে।”

আমি বলিলাম, “উপায় নাই। চাকরীর জ্বালা বড় জ্বালা।”

যাইবার সময় বন্ধুকে বলিলাম, “নিঃসঙ্গ প্রবাসে অবকাশযাপনের জন্য খানকতক পুস্তক দাও।”

বন্ধু খানকতক ইংরাজী উপন্যাস দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একখানি ‘নীলদর্পণ’ দিয়া হাসিয়া বলিলেন, ‘নীলের যমের’ কুকীর্ত্তির শ্মশানে বসিয়া পাঠ করিও। ভাল লাগিবে।”

আমি বলিলাম, “আমার ‘বাড়া ভাতে ছাই’ পড়িবে না ত?”

২

আমি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সত্যই স্থানটি মনোরম। গৃহের দ্বার ও বাতায়ন বৃহদায়তন;—কক্ষগুলি বৃহৎ; চারি দিকে বারান্দা। দক্ষিণে বিস্তীর্ণ জলাশয়—কপোতাক্ষী তাহার জলবাহু প্রসারিত করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত দেশ স্নিগ্ধ ও উর্ব্বর করিতেছে। উত্তরে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে শ্যামশষ্পাস্তৃত প্রান্তর। প্রান্তরমধ্যে দুই একটি বৃক্ষলতা—পূর্ব্বতন সযত্ন-রক্ষিত উদ্যানের অবশেষ; রঙ্গন, চম্পক, কূটজ, পারুল প্রভৃতি বৃক্ষ; ক্বচিৎ বা কুঞ্জলতার অযত্নবর্দ্ধিত ঝোপ, কোথাও বা কাঁটালী চাঁপার ঝাড়। এখন বসন্তে প্রায় সকল ফুল গাছেই কুসুমসুষমা। রাস্তার দুই পার্শ্বে ঝাউ ও দেবদারু; পবন একটু বেগে বহিলেই ঝাউগুলি শোঁ শোঁ করে।

কুঠীটি যে জমিদারের, তিনি এক জন বৃদ্ধ কর্ম্মচারীকে, আমার তত্ত্বাবধান করিতে পাঠাইয়াছিলেন। সেই গ্রামেই তাঁহার বাড়ী। তাঁহার আদেশে জমীদারের লোকজন আমার জন্য ডিম্ব হইতে ডাব পর্য্যন্ত সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনিত; সে পক্ষে আমার বিশেষ কোনও অসুবিধা ছিল না। কেবল গৃহিণীর রন্ধিত ব্যঞ্জন—তা’ আর সেখানে কোথায় পাইব? বৃদ্ধ কর্ম্মচারী স্বয়ং নীলকরদিগের কষ্ট দেখিয়াছিলেন। তিনি আমাকে সে সকল গল্প শুনাইতেন। সে অমানুষিক অত্যাচারের বর্ণনা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

আমি লক্ষ্য করিতাম, এক জীর্ণচীরধারিণী বৃদ্ধা দিবাভাগে যে স্থানেই থাকুক, রাত্রিতে আসিয়া কুঠীর উত্তরের বারান্দায় শয়ন করিত। প্রথম প্রথম আমার চাপরাশীরা তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে কাঁদিত। আমি ভৃত্যদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম, তাহারা তাহাকে না তাড়ায়। সে তাহা শুনিয়া দুই হাত তুলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল।

আমি একদিন জমীদারের কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৃদ্ধা কে?"

বৃদ্ধ কর্ম্মচারী উত্তর করিলেন, "লোকে উহাকে পাগলিনী বলে; কিন্তু ও পাগলিনী নহে,—দুঃখিনী। এই নীলকুঠী আপনার সহস্র অত্যাচার-বন্ধনে উহাকে এমনই বদ্ধ করিয়াছে যে, ও জীবন থাকিতে সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবে না। উহার বৃত্তান্ত শুনিবেন?"

আমি সাগ্রহে বলিলাম, "শুনিব।"

৩

সেদিন সন্ধ্যায় আমি দক্ষিণের বারান্দায় স্বজনে উপেক্ষিত ও বিজনে আদৃত ডেকচেয়ারখানিতে বসিয়া পূর্ব্বদিক্‌চক্রবালে পূর্ণিমার চন্দ্রমণ্ডলের উদয় দেখিতেছিলাম। জলাশয় হইতে প্রস্ফুটিত পদ্মের মৃদু সৌরভ ও পশ্চাৎ হইতে বিকশিত বাতাবীফুলের মধুর গন্ধ সেই শান্ত সন্ধ্যায় যেন মায়ামাধুরীর সঞ্চার করিতেছিল। আর সেই সান্ধ্যবাতাসে ঝাউগাছগুলি যেন কি গভীর মর্ম্মব্যথায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। আমার কর্ম্মক্লান্ত জীবনে সেরূপ স্নিগ্ধ অনুভূতি দুষ্প্রাপ্য। চন্দ্র দিক্‌চক্রবাল হইতে মন্থরগমনে উত্থান করিয়া শতশাখ বৃহৎ বটবৃক্ষের চিক্কণ শ্যাম পত্রাবলীর মধ্যে কখনও দৃশ্য কখনও অদৃশ্য হইতেছিল। আমি মুগ্ধনয়নে তাহাই দেখিতেছিলাম। এমন সময় জমীদারের কর্ম্মচারী আসিয়া বলিলেন, "আপনি পাগলিনীর কথা শুনিতে চাহিয়াছিলেন। সে আসিয়াছে। এখন শুনিবেন কি?

আমি সাগ্রহে উঠিয়া উত্তরের বারান্দায় আসিলাম। পাগলিনী সেখানে বসিয়াছিল। ভৃত্য আমার ও কর্ম্মচারীর জন্য চেয়ার দিয়া গেল। তখন চন্দ্র বংশঝাড়ের সমুন্নত বঙ্কিমশিরের পশ্চাতে,—কে যেন চিত্রে সমুজ্জ্বল শ্বেত গোলকের উপর বঙ্কিম শ্যাম শাখা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

আমি উপবিষ্ট হইলাম। কর্ম্মচারীর অনুরোধে পাগলিনী বলিতে লাগিল—

সে আজ অনেক দিনের কথা। আপনি যে গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তখন এই গৃহেই নীলকর 'সাহেব' বাস করিত। চারি দিকে আজ মাঠ; তখন চারি দিকে কেবল ঘর ছিল। পাপের অগ্নিতে সে সব ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

সেবার অজন্মার বৎসর। চাউল অগ্নিমূল্য। কিন্তু অজন্মাই হউক আর সুজন্মাই হউক, যমের দ্বারও বন্ধ থাকে না। নীলকরের নীল করাও কামাই যায় না। আমীন সঙ্গে যাইয়া গ্রামে ঢেঁটরা দিয়া আসিল,—নিয়ম মত নীল করিতে হইবে। প্রজারা দল বাঁধিয়া দেওয়ানের কাছে গেল, পায়ে ধরিল। দেওয়ান বলিলেন, "নীল বুনিতেই হইবে। সাহেবের হুকুম।" প্রজারা সাহেবের কাছে গেল; বলিল, "এ বৎসর নীল করিলে আমরা না খাইয়া মরিব। দোহাই হুজুর,—এ বৎসর মাপ করুন; আগামী সনে আমরা নীলা বুনিব—এবার ছু' মুঠা ধান করিয়া লই।" সাহেব বলিল, "মার না খাইলে তোমরা দুরস্ত হইবে না। নীল বুনিতেই হইবে।" প্রজারা কাঁদাকাটি করিল, সাহেব তাহাদিগকে প্রহার করিল। প্রহৃত সারমেয়ের মত তাহারা গৃহে ফিরিল।

পরদিন প্রভাতে আমীন নীলের বীজ লইয়া গ্রামে আসিল। প্রজারা কুঠী হইতে নিরাশ হইয়া আসিয়া দল বাঁধিয়াছিল, আমার স্বামী তাহাদের মোড়ল। তাহারা লাঠিয়ালদিগকে মারিয়া তাড়াইল, আমীনকে গাছে বাঁধিয়া রাখিল, নীলের বীজ বাঁওড়ের জলে ফেলিয়া দিল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমি ও কয় জন প্রতিবেশিনী বাঁওড় হইতে জল লইয়া আসিতেছিলাম। কুঠীর কয় জন লাঠিয়াল লইয়া অশ্বারোহণে সাহেব সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা কলস ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলাম। সাহেবের আদেশে লাঠিয়ালরা আমাদের ঘিরিয়া ফেলিল। সাহেব অকথ্য কথা কহিল; শেষে বলিল, "শালারা এইবার জব্দ হইবে।"

আমরা কুঠীর গুদামে কয়েদ হইয়া রহিলাম।

পরদিন প্রভাতে গ্রামের অনেকে আসিয়া কাঁদাকাটা করিয়া নীল বুনিতে স্বীকৃত হইল। সাহেব তাহাদের প্রত্যেকের বিশ জুতার ব্যবস্থা করিল। তাহাদের স্ত্রীরা খালাস পাইয়া গ্রামে গেল। আমার স্বামী কুঠীতে আসেন নাই। আমি গুদামে কয়েদ রহিলাম।

কুঠীতেই জানিলাম, আমার স্বামীকে ধরিয়া আর এক কুঠীতে চালান দিয়াছে। আমাদের ঘর ভাঙ্গিয়া ভিটায় নীল বুনিয়াছে। আমার পিত্রালয় বহু দূরে; আমার স্বামীর আর কেহ ছিল না; আমি বন্ধ্যা। কেহ আমাকে খালাস করিতে আসিল না। আমি সেই গুদামে রহিলাম।

ক্রমে কয়েদের কঠোরতার হ্রাস হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রলোভনের আরম্ভ হইল। আমি আশ্রয়হীনা, জাতিচ্যুতা, ঘৃণিতা—আমার পক্ষে কত দিন সে প্রলোভনসংবরণ সম্ভব? আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই, আমাকে আশ্রয় দেয়, এমন কেহ নাই। আমি কাঁদিলাম। সে অবস্থায় আমার মধ্যে ও পতিতার মধ্যে প্রভেদ কতটুকু? আমি কুঠীতেই রহিয়া গেলাম। কল্মষকলুষিত বিলাসে আমার দিন কাটিতে লাগিল।

বর্ষাধিককাল পরে একদিন শুনিলাম, সাত কুঠী ঘুরাইয়া আমার স্বামীকে এই কুঠীতে আনিয়াছে। শুনিয়া আমার মনে কি হইল, প্রকাশ করিতে পারি না। আমি সাহেবকে অনুরোধ করিলাম, "যথেষ্ট হইয়াছে। এই-বার ছাড়িয়া দাও।" সাহেব শুনিল না। আমি কাঁদিলাম, সাহেব হাসিল—সে হাসির অর্থ,—তোমার যে খুব দরদ দেখিতেছি! সে আমাকে বলিল, "ও আমাকে বড় জ্বালাইয়াছে। আমি উহাকে সহজে ছাড়িব না; উহার মাথায় নীল বুনিব। আমার সঙ্গে বেয়াদবী!"

আমি যাইয়া দেওয়ানকে ধরিলাম। কুঠীর কর্ম্মচারীরা আমার খাতির রাখিত। তাহারা আমার হইয়া সাহেবকে অনুরোধ করিল। কাহারও অনুরোধে কোনও ফল হইল না। সাহেব চাবুক বাহির করিল; কর্ম্মচারীরা প্রস্থান করিল। সেই দিন সন্ধ্যায় সাহেব গুদামের চাবি চাহিয়া লইয়া আপনার কাছে রাখিল; সন্দেহ,—পাছে আমি জোগাড় করিয়া গুদাম খুলিয়া দিই।

সেদিন সমস্ত দিন আমার মনে শান্তি ছিল না। বক্ষে বিষধর লইয়া কে স্থির হইয়া থাকিতে পারে? দুঃখে, কষ্টে, ক্রোধে আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। আমি আমার সর্ব্বস্ব দিয়াছি, আর প্রতিদানে আমি কাঁদিয়াও আমার স্বামীকে মুক্তি দিতে পারিলাম না! হায়, আমার সর্ব্বস্ব কি এমনই সুলভ, এতই তুচ্ছ! আমি কি করিয়াছি! ক্রুদ্ধ সর্প যেমন আপ-নার দংশনে আপনি ছটফট করে, আমি তেমনই করিতে লাগিলাম। আমার যন্ত্রণার অবধি রহিল না। আমি বুকফাটা যাতনায় চঞ্চল হইয়া উঠিলাম।

শেষে আমি স্থির সঙ্কল্প করিলাম, যেমন করিয়াই হউক, স্বামীর উদ্ধার সাধন করিব। তাহাতে এ কলঙ্কলাঞ্ছিত জীবন যায়—সেও স্বীকার; তাহাতেও আমি কাতর হইব না। তখন সরল পথ ছাড়িয়া কুটিল পথ অবলম্বন করিলাম, উপরোধ অনুরোধ ত্যাগ করিয়া চাতুরীর আশ্রয় লই-লাম। সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পসাধনের উপায় স্থির করিয়া আমি আনন্দিত হই-লাম; কিন্তু হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর হইল না।

সেই দিন রাত্রিকালে আমি কৃত্রিম যত্নে অন্য দিনের অপেক্ষাও সাহে-বের শুশ্রূষা করিলাম; কৃত্রিম প্রফুল্লতা দেখাইলাম। তখন বুঝি নাই, তাহা-তেই পাপিষ্ঠের সন্দেহ উৎপাদিত হইয়াছিল। আমি নিদ্রার ভান করিয়া শয্যায় রহিলাম—অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছু ক্ষণ পরে বোধ হইল, সাহেব ঘুমাইয়াছে। আমি ধীরে ধীরে শয্যা-ত্যাগ করিলাম; সাহেবের পকেট হইতে গুদামের চাবি লইয়া বাহির হইলাম।

আমি শঙ্কাসঙ্কুচিতগমনে বেপমানহৃদয়ে ধীরে ধীরে গুদামের দ্বারে উপনীত হইলাম, যথাসম্ভব নিঃশব্দে—অতি সাবধানে দ্বার খুলিলাম। সেই অন্ধকার নরকের এক কোণে একটি অতি ক্ষুদ্র দীপ ক্ষীণ আলোক দিতেছে। প্রথমে সে অন্ধকারে আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না; পরে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে দেখিলাম, আলোকের নিকট শীর্ণ মনুষ্যমূর্ত্তি। মস্তক মুণ্ডিত, তাহাতে তখনও কর্দ্দম রহিয়াছে। বুঝিলাম সাহেব মস্তক মুড়াইয়া কর্দ্দম দিয়া তাহাতে নীলের বীজ বপন করিয়াছে। এইরূপে পাঁচ ছয় দিনে মস্ত-কের উপর নীলের বীজ অঙ্কুরিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যবিধ শারীরিক যন্ত্র-ণারও ব্যবস্থা থাকে। তত দিনে কাতর হইয়া কয়েদী সাহেবের আজ্ঞা পালন করিতে চাহে। দেখিলাম, স্বামীর সে বলিষ্ঠদেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; দেহ অস্থিসার। আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

আমি নিঃশব্দে কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমাকে দেখিতে পান নাই। আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, "পলাও!" তিনি চমকিয়া চাহিলেন। সেই অন্ধকারে তাঁহার নেত্রদ্বয় সর্পিণীর মস্তকস্থিত মণির মত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ছুটিয়া আমার দিকে আসিলেন। আমি নিশ্চল হইয়া দাঁড়া-ইয়া রহিলাম। "কলঙ্কিনী হইবার পূর্ব্বে কেন তোমার জীবনের অবসান হয় নাই?"—বলিয়া তিনি দক্ষিণ করে আমার গলদেশ আঁটিয়া ধরিলেন।

এখনও যেন আমি সেই কুলিশকঠোর স্পর্শের অনুভব করিতেছি। হায়, তখনও কেন এ জীবন যায় নাই!

আমি বারান্দার মেজেয় পড়িয়া গেলাম। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে পড়িলেন। ঠিক সেই সময় সাহেব আসিয়া পড়িল। সাহেব তাঁহাকে আক্রমণ করিল; তিনিও ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের মত তাহাকে ধরিলেন। ততক্ষণে আমার সংজ্ঞালোপ হইয়া আসিল।

যখন আমার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম, প্রাঙ্গণে—ঐ কিংশুক তরুর নিকটে অগ্নি জ্বলিতেছে। নিস্তব্ধ নিশীথিনী—নিশীথের সূচিভেদ্য অন্ধকারে সেই অগ্নির আলোক যেন প্রেতভূমির শ্মশানানলশিখার মত বোধ হইল। অন্ধকার আকাশের কতক অংশ সেই পৈশাচিক আলোকে রঞ্জিত। কুঠীর ভৃত্যগণ রাশি রাশি শুষ্ককাষ্ঠ ও বংশখণ্ড দিয়া সেই অনল-কুণ্ডের আহার যোগাইতেছে। বংশের গ্রন্থি সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া অনল ছড়াইয়া পড়িতেছে।

সেই অনলের শতশিখা শত রক্তনাগিনীর মত কম্পিতশিরে গগনের দিকে উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কুঠীর কয় জন বলিষ্ঠ লাটিয়াল ধরাধরি করিয়া একটি সিন্দুক অগ্নির নিকটে আনিল,—অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করিল। সেরূপ সিন্দুকে কি থাকে, তাহা কুঠীতে থাকিয়া আমি জানিয়াছিলাম। যে সকল প্রজা একান্ত অবাধ্য—কিছুতেই নরম হয় না—বরং অন্য প্রজা-দিগকে নীলকরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, তাহাদের ভাগ্যে ঐরূপ মৃত্যু—পৈশাচিক,—নারকীয়। আমি বুঝিলাম, আমার স্বামী হীন প্রাণীর মত সেই অনলে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। যিনি অজস্র অত্যাচারেও সাহেবের কাছে নত হন নাই, তিনি ঐ কাষ্ঠপ্রাচীরমধ্যে আবদ্ধ—অঙ্গসঞ্চালনেও অসমর্থ। আমি উন্মত্তের মত সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে ছুটিয়া চলিলাম।

সাহেব বারান্দার সোপানের উপর দাঁড়াইয়া চুরুট টানিতে টানিতে আপনার হুকুম তামিল হওয়া দেখিতেছিল। আমি ছুটিয়া যাইতে সেই সোপানশ্রেণীতে আসিবামাত্র সে আমাকে সবেগে পদাঘাত করিল। আমি আঘাতে ঘুরিয়া প্রাঙ্গণে পড়িলাম; প্রাঙ্গণের শষ্পোপরি রক্ত বমন করিতে লাগিলাম। দেহে এমন বল নাই যে উত্থিত হই; কিন্তু মানসিক শক্তি অব্যাহত। লূনপক্ষ বিহগ যেমন দূর হইতে দেখে, বিষধর তাহার নীড়ে

লাম, সেই অনলে কি সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। আমি দেখিতে লাগিলাম। যাতনার আতিশয্য আঘাতের আতিশয্যের মত একটা অবস্থার অতীত হইলে অনুভূতির সীমা অতিক্রম করে। তাই বুঝি সেদিন—সেই স্তব্ধ নিশীথে আমার প্রাণ বাহির হয় নাই।

আমি দেখিলাম, অনলশিখা যেন ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরকে ধরিতে লাগিল, তাহার পর আসিয়া সেই সিন্দুকটিকে বেষ্টিত করিল।

সেই সহস্রশিখা যেন এখনও দিবারাত্র আমাকে দগ্ধ করিতেছে। তাহার বিরাম নাই, নির্ব্বাণ নাই।

উঃ! কি যাতনা! কি—

* * * *

বলিতে বলিতে বৃদ্ধা জলাশয়ের দিকে ছুটিয়া গেল। আমরাও তাহার অনুসরণ করিলাম। আমরা নিবারণ করিবার পূর্ব্বেই সে জলাশয়ের কূল হইতে সেই বিকশিতবিসকুসুম জলাশয়ের জলে পড়িল।

আমার ভৃত্যগণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই জলে পড়িল। তাহারা যখন ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধাকে কূলে তুলিল, তখন তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত।

সেই রবিকরপ্লাবিত অম্বরতলে, মৃদুমন্দবায়ে অপ্সরার কেশদামের মত কুঞ্চিতসলিল জলাশয়ের কূলে—শ্যামশষ্পাস্তৃত ভূমিতে বৃদ্ধার দেহ শায়িত করিয়া আমরা তাহার চেতনাসঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। দেখিয়া বোধ হইল না, সে দেহে আর প্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

ধীরে ধীরে পূর্ব্বাশার গগনসরোবরে উষারাগের রক্তোৎপল বিকশিত হইয়া উঠিল। দধিয়াল দিবসের স্বাগতগীতি গাহিতে আরম্ভ করিল, বাতাবী ফুলের সৌরভ যেন আরও একটু ঘোরাল হইয়া আসিল। সেই উষানিল-বীজনে প্রকৃতির মত বৃদ্ধার দেহেও জীবন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলিত করিল।

জ্ঞানসঞ্চারের পর বোধ হইল, বৃদ্ধা যেন সুদীর্ঘকালব্যাপী প্রগাঢ় নিদ্রাভঙ্গে জাগরিতা হইল। তাহার পর আমরা তাহাকে যত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম—কিছুতেই উত্তর দিল না। শেষে একটু সুস্থ বোধ করিলে সে উঠিয়া প্রান্তর পার হইয়া গেল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

হুমায়ূন ও শের শাহ।

(৪)

অমরকোটের সহৃদয় রাজা হুমায়ূনকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার দুর্দ্দশার কাহিনী শ্রবণ করিয়া ব্যথিতচিত্তে তদীয় সমস্ত অভাব বিদূরিত করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন। তাঁহার সদয় ও উদার ব্যবহারে হুমায়ূন শান্তিলাভ করিলেন। তিনি বাদশাহকে রাজ্যোদ্ধারকল্পে দুই সহস্র সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। হুমায়ূন অমরকোটে সার্দ্ধ এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া পরিবারবর্গকে তথায় রাখিয়া রাজসৈন্য সমভিব্যাহারে সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করিতে গমন করিলেন। এই সময় তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী হামিদা গর্ভবতী ছিলেন। অভিযানের দ্বিতীয় দিবসে তিনি এক পুষ্করিণীর তীরে সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় আকবরের জন্মসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। এই আনন্দসংবাদ শ্রুত হইয়া ওমরাহবর্গ রাজদর্শনাকাঙ্ক্ষায় সমবেত হইলে, হুমায়ূন অনুগত ভৃত্য জহোরকে যে সকল দ্রব্য তাহার নিকট ছিল তাহা আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তদনুসারে জহোর দুই শত মুদ্রা, একখানি রৌপ্যালঙ্কার ও একটি মৃগনাভি কস্তুরী আনয়ন করিল। বাদশাহ মুদ্রা ও অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করিয়া কস্তুরীর দানা সমাগত সামন্তবর্গকে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার পুত্রের জন্মোপলক্ষে তোমাদিগকে উপহার দিবার জন্য কেবলমাত্র এই কস্তুরীটি অবশিষ্ট রহিয়াছে; কস্তুরীর সুগন্ধে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়াছে; আমি আশা করি, আমার পুত্রের যশঃসৌরভে এক দিন সমগ্র পৃথিবী পুলকিত হইবে।"

হুমায়ূন পুত্রের জন্মসংবাদ শ্রুত হইয়া সবিশেষ আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার দুরবস্থার অবসান হইতে তখনও বিলম্ব ছিল। ইহার পর অচিরে তাঁহার সৈন্যমধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, এবং অনেকেই তথা হইতে প্রস্থান করিল; এমন কি, মোগল ওমরাহবর্গও শিবির পরিত্যাগ করিলেন। শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে হুমায়ূন পরাজিত হইলেন, এবং তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর আলী যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনবিসর্জ্জন করিল। তিনি

নিরুপায় হইয়া কান্দাহারের অভিমুখে পলায়ন করিলেন। পথিমধ্যে বীর-শ্রেষ্ঠ বৈরাম খাঁ গুজরাট হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এই সময় কান্দাহার প্রদেশ মিরজা আস্করীর অধীন ছিল। তিনি কামরানের প্রতিনিধিভাবে এই দেশ শাসন করিতেছিলেন। তিনি হুমায়ূনকে আশ্রয় প্রদান করিলেন না; পক্ষান্তরে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিলেন।

হুমায়ূন আস্করীর হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করিয়া পারস্যরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য পারস্যে গমন করিবার মনন করিলেন। তিনি ফিস্তানের প্রান্তদেশে উপনীত হইলে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা পারস্যরাজের পক্ষ হইতে সসম্মানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; তাহার পর তাঁহাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়া সুলতানার পরিচর্য্যার জন্য ক্রীতদাসী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। হুমায়ূন তথা হইতে হিরাটে গমন করিলেন। তথায় পারস্যরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাদরে তাঁহার অভিনন্দন করিলেন। মহম্মদ অতিথির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য যত্নের ত্রুটি করিলেন না। তিনি হুমায়ূনকে পারস্য-দরবারে উপনীত হইবার উপযোগী উপকরণ প্রদান করিলেন। হুমায়ূন তথা হইতে পারস্যের রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ তাঁহার দর্শনকামনায় পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি কিজাধ নামক স্থানে উপনীত হইয়া পারস্যদরবারে বৈরাম খাঁকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং তথায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহার পর হুমায়ূন পারস্যদরবারে উপনীত হইলেন, এবং পারস্যরাজ তাঁহাকে যথোচিত সম্মানসহকারে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

৬

শের শাহ হুমায়ূনের হস্ত হইতে মোগল রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তিনি মোগলের অধিকৃত সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বিপুলবিক্রমে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। শের শাহ হুমায়ূনের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার সময় খিজির খাঁ নামক জনৈক সেনাপতির হস্তে বঙ্গদেশের শাসন-ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। শের শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অবগত হইলেন যে, খিজির খাঁ বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি মহম্মদ শাহের কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

এই সংবাদ অবগত হইয়া তিনি বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। শের শাহ গৌড়নগরের নিকটবর্ত্তী হইলে খিজির খাঁ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ তদীয় শিবিরে উপনীত হইলেন। এই সুযোগে তিনি খিজিরকে ধৃত করিয়া অবরুদ্ধ করিলেন। তাহার পর তিনি বঙ্গরাজ্যকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, এবং কাজি ফাজিলত নামক জনৈক সাধুপুরুষকে বিভাগীয় শাসনকর্ত্তৃগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার দিলেন।

অনন্তর শের শাহ দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া মালব দেশে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিলেন। এই সময় মালবের অন্তর্গত রাইসিন নামক দুর্গে এক-জন হিন্দু সামন্ত আধিপত্য করিতেছিলেন। শের শাহ এই দুর্গ অবরোধ করিলেন। দুর্গবাসিগণ প্রস্তাব করিল যে, শের শাহ তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলে তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে পারে। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দুর্গ অধিকার করিলেন; কিন্তু সন্ধির কথা বিস্মৃত হইয়া দুর্গবাসী সমস্ত হিন্দুকে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন।

অতঃপর শের শাহ রাজপুতানার অন্তর্গত মাড়োয়ার রাজ্য অধিকার করিবার জন্য অশীতি সহস্র সৈন্য লইয়া অভিযান করিলেন। মাড়োয়ার রাজ্য বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে স্থাপিত,—শস্যসমাকীর্ণ ও "প্রকৃতির কমনীয় শোভায় অলঙ্কৃত" নহে। মাড়োয়ারীর ন্যায় রণনিপুণ স্বদেশভক্ত বীর-দিগকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া শের শাহ কৌশলে শত্রুশিবিরে ভেদ জন্মাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার চাতুরীতে কতক-গুলি পত্র রাজার হস্তগত হইল। এই সকল পত্র পাঠ করিয়া তিনি আপন সামন্তবর্গের প্রতি সন্দিহান হইলেন। সামন্তগণের এক জনের নাম কুম্ভ। তিনি এই ব্যাপারে হৃদয়ে গুরুতর আঘাত পাইলেন, এবং আপন নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার জন্য দশ সহস্র সেনা লইয়া শেরকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া আফগান সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল; কিন্তু অবশেষে বহুকষ্টে শের শাহ জয়লাভ করিলেন। শত্রুসৈন্য পরাস্ত হইলে তিনি মাড়োয়ার রাজ্যের অনুর্ব্বরতা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এক মুষ্টি ভুট্টার জন্য ভারতসাম্রাজ্য হারাইতে বসিয়াছিলাম।" ইহার পর তিনি মাড়োয়ার রাজ্য অধিকার করিবার উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

পর বৎসর, অর্থাৎ ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে, শের শাহ বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই দুর্গের অবরোধকালে ভূগর্ভস্থ বারুদখানায় অগ্ন্যুৎপাত হইয়া শের শাহ দগ্ধীভূত হইলেন। কিন্তু যতক্ষণ দুর্গ অধিকৃত না হইল, ততক্ষণ তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। দুর্গ অধিকৃত হইবার সংবাদ শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!" – এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র তাঁহার বাক্‌শক্তি চিরকালের জন্য লুপ্ত হইল, তাঁহার প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া গেল। (১)

শের শাহের চরিত্রের একাংশ অত্যুজ্জ্বল; অপরাংশ কলঙ্ককালিমাচ্ছন্ন। তাঁহার রাজত্বকালে বিচারকগণ অপক্ষপাতে ন্যায়বিচার করিতেন। কেহই অন্যায় অনুষ্ঠান করিয়া অব্যাহতি পাইত না। কিন্তু তিনি নিজে পাপাচরণে দ্বিধাশূন্য ছিলেন; বিশ্বাসহনন করিয়া আপনাকে কলঙ্কিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার কার্য্যপরম্পরায় প্রতীত হয়, যেন বিশ্বাসহনন ব্যাপারে একমাত্র রাজাই অধিকারী! কেন না, প্রজাদের মধ্যে কেহ তাদৃশ

---

(১) শের শাহ পাঁচ বৎসর কাল দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কথিত আছে যে, এক জন পারিষদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "জাঁহাপনার কেশ শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছে।" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "হাঁ, সায়াহ্নকালে আমি সাম্রাজ্যলাভ করিয়াছি।" সিংহাসন অধিকার করিয়া তিনি চারিটি কার্য্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্কীর্ণতা-নিবন্ধন তাঁহার একটি কল্পনাও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এ জন্য শের শাহ মৃত্যুর পূর্ব্বে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কল্পনাচতুষ্টয়ে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতা ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। (১) পিতৃভূমি রো প্রদেশ জনশূন্য করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের দ্বারা লাহোর ও শিবালিকের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে উপনিবেশস্থাপন। মোগলের ভারতবর্ষে আগমনের পথাবরোধ এবং পার্ব্বত্য জমিদারগণের শাসনই ইহার উদ্দেশ্য। (২) লাহোর নগরের ধ্বংস। বহিঃশত্রু ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই পথিমধ্যস্থ লাহোর আক্রমণ করিত, এবং তাদৃশ বৃহৎ নগর অধিকার করিতে পারিলেই শত্রু-সৈন্যের আর রসদের অভাব থাকিত না, এবং অভিযানের শৃঙ্খলাবিধানও সহজসাধ্য হইত। এ জন্যই শের শাহ লাহোরের ধ্বংস করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। (৩) মক্কা-যাত্রীর গমনাগমনের সুবিধার জন্য সরাইয়ের ন্যায় পঞ্চাশখানি বৃহৎ অর্ণবপোতের নির্ম্মাণ। (৪) পাণিপথে ইব্রাহিম লোদির সমাধি-প্রতিষ্ঠা ও তাহার সম্মুখে যে সকল মোগল-বংশীয় শাসনকর্ত্তা শেরের হস্তে নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিমিত্ত আর একটি সমাধিভবনের নির্ম্মাণ। তিনি এই সমাধিমন্দিরদ্বয় পরম রমণীয়ভাবে নির্ম্মাণ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন।

কার্য্যে লিপ্ত হইলে তিনি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি পাপপ্রবণ ছিল না; প্রবল রাজ্যলালসা চরিতার্থ করিবার জন্যই তিনি অসদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন। শেরের অসাধারণ প্রতিভাই তাঁহাকে রাজ্যলোলুপ করিয়াছিল। তিনি যে পথে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিবার অবকাশ ছিল না। যদি তিনি কেবলমাত্র পৈত্রিক জায়গীরের শাসন সংরক্ষণ কার্য্যেই পরিতৃপ্ত থাকিতেন, তাহা হইলে কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার পদস্খলন হইত না; সিংহাসনে তাঁহার স্বাভাবিক অধিকার থাকিলে তিনি সম্ভবতঃ নিষ্পাপ নরপতি বলিয়াই জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন।

কোন মূল মন্ত্রের সাধনায় জায়গীরদার শের বাদশাহী সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? ঐক্যনীতিই তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের নিয়ামক ছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আফগানশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়িলে আফগানের এত দুর্দ্দশা হইত না। এ জন্য তিনি আফগানশক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়াই স্বীয় উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। আত্মকলহই আফগানশক্তির দৌর্ব্বল্যের কারণ ছিল। শের শাহ এই কারণ অপসারিত করিয়া সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার উপযোগী বল সঞ্চয় করেন, এবং তাহাতেই কৃতকার্য্য হন। এসলামধর্ম্মে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল; কিন্তু তিনি তজ্জন্য হিন্দুকে কখনও উৎপীড়িত করেন নাই। তদীয় অনুচরবর্গের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে তিনি তাহা নিবারণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য তিনি স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কখনও আলস্যের প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি কোন কার্য্যই নগণ্য বলিয়া উপেক্ষা এবং কার্য্যাধ্যক্ষগণকে কোনও বিষয়ে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিতেন না। তিনি বলিতেন, "আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর অমাত্যবর্গের পাপপ্রবণতাই আমার রাজ্যলাভের কারণ।" শের শাহ সময়কে সমান চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; সময়ের চারি ভাগ বিচারকার্য্য, সৈন্যের শৃঙ্খলাসংস্থাপন, ঈশ্বরোপাসনা এবং বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনে অতিবাহিত হইত।

শের শাহ সাম্রাজ্যকে ১১৬০০০ হাজার পরগণাতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পরগণার জন্য পাঁচ জন কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট ছিল। তন্মধ্যে অন্ততঃ এক জন বিচারক ও এক জন হিন্দু পাটওয়ারী থাকিতেন। রাজকর্ম্মচারী

ও প্রজামণ্ডলীর মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে বিচারক তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। এসলাম শাস্ত্রের অনুশাসনের পরিবর্ত্তে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কর্ষিত ভূমির পরিমাপ ও শস্তের অবস্থা অনুসারে এক বৎসরের জন্য রাজস্ব বন্দোবস্ত করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। কোনও রাজকর্ম্মচারীই দুই বৎসরের অধিক কাল এক স্থানে অবস্থান করিতে পারিতেন না। সাম্রাজ্যের অন্তঃপ্রদেশ নিরস্ত্র হইয়াছিল।

শের শাহ প্রজার হিতকামনায় বহু সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপি দেদীপ্যমান। তিনি বাঙ্গলা হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। ইহার দুই পার্শ্বে স্থানে স্থানে পান্থশালা ও কূপ ছিল। তদ্ব্যতীত তিনি রাজপথপার্শ্বে বহুসংখ্যক সৌষ্ঠবশালী মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় কোরাণ পাঠক ও মোল্লা নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ-অনুসারে প্রত্যেক বিশ্রাম-স্থানে পথিকগণ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিনা ব্যয়ে আহার্য্য পাইত। পথিক-দিগকে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষ সকল রোপিত হইয়াছিল। রাজকার্য্য ও বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থ ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে দস্যু ও তস্করের ভয় সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রবল প্রতাপে কেহই বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিতে সাহসী হয় নাই। তাঁহার শাসনগুণে কলহপ্রিয় আফগানগণও শান্তিতে বাস করিতেছিল। তিনি কেবল পাঁচ বৎসর কাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই অত্যল্পকালের মধ্যেই সুশৃঙ্খল শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (১)

---

(১) "From the day that Sher Shah was established on the throne no man dared to breathe in opposition to him, nor did any one raise the standard of contumacy or rebellion against him, * * * nor did any theft or robbery ever occur in his dominions. The travellers and way-farers were relieved from the trouble of keeping watch, nor did they fear to halt even in the midst of a desert. * * * A decrepit old woman might place a basket of gold ornaments on her head and go on a journey, and no thief or robber would come near her for fear of the punishment which Sher Shah inflicted. "Such a shadow spread over the world that a decrepit person feared not a Rustum". During his

শের শাহ জীবদ্দশাতেই স্বীয় জন্মভূমি শেশারামে নিজের জন্য সৌষ্ঠবশালী সমাধিগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; শোভাবর্দ্ধনের জন্য ইহার চতুষ্পার্শ্বে ঝিল খনিত হইয়াছিল। তথায় তাঁহার সমাধি হয়। (১)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

---

time all quarrelling, disputing, fighting, and turmoil, which is the nature of the Afghans was altogether quieted and put a stop to throughout the countries of Hindustan and Roh. * * * In a very short period he gained the dominion of the country and provided for the safety of the highways, the administration of the government and the happiness of soldiery and people."—*Tarikh-i-Sher Shahi.*

শের শাহ কি প্রণালীতে দস্যু তস্কর প্রভৃতির অনুসন্ধান করিতেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এ স্থলে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। শের শাহ যে সময়ে থানেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার শিবির হইতে একটা অশ্ব অপহৃত হইয়াছিল। ইহাতে তিনি শিবির হইতে বৃত্তাকার পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে যত জমিদার ছিলেন, তাঁহাদিগকে অপহৃত অশ্বের জন্য দায়ী করিয়া, চোরকে তিন দিনের মধ্যে হাজির করিতে না পারিলে তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রাণ দণ্ড হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। এটোয়ার নিকটবর্ত্তী ময়দানে একদা এক জন মনুষ্যের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল। এই ময়দানের স্বত্ব লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। কোন গ্রামের লোক হত্যা করিয়াছে, তাহার নির্ণয় করিতে না পারিয়া সম্রাট ঘটনাস্থলের নিকটবর্ত্তী একটা বৃক্ষ ছেদন করিতে আদেশ দেন। কোনও ব্যক্তি এই কার্য্যের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলে তাহাকে ধৃত করিয়া আনয়ন করিবার আদেশ ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের এক জন লোক বৃক্ষচ্ছেদন করিতে নিষেধ করিলে তাহাকে সম্রাটের নিকট আনয়ন করা হয়। তিনি ধৃত ব্যক্তিকে বলেন, "তুমি গ্রাম হইতে এত দূরে একটা বৃক্ষচ্ছেদনের বিষয় জানিতে পারিলে; অথচ সেই স্থানে সংঘটিত নরহত্যার ন্যায় একটি গুরুতর ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পার নাই। এ কিরূপ? তিন দিনের মধ্যে হত্যাকারী ধৃত না হইলে তোমাদের সমস্ত গ্রামবাসীর প্রাণদণ্ড হইবে।" এই উভয় অপরাধীই ধৃত হইয়াছিল।

(১) This fine monument of the magnificence of Sher still remains entire. The artificial lake, which surrounds it is not much less than a mile in length.—Dow's History of Hindostan.

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

সার ওয়াণ্টার বেসাণ্ট।

সেদিন পঁচাত্তর বৎসর বয়সে ইংরাজ লেখক সার ওয়াণ্টার বেসাণ্টের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করিয়া তিনি কিছু দিন মরিসাসে অধ্যাপকের কার্য্য করেন। কয় বৎসর Palestine Exploration Fundএর সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, এবং সংস্থাপনাবধি গ্রন্থকারসমিতির বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। লণ্ডন তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। লণ্ডনের ইতিহাস, লণ্ডনের অধিবাসী, লণ্ডনের সহস্র রহস্য—এ সকলের সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ দুর্লভ। সেই অসাধারণ অভিজ্ঞতা লণ্ডন সম্বন্ধে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে প্রকাশিত। সার ওয়াণ্টার ইতিহাস, জীবনচরিত, সমালোচনা, উপন্যাস, নাটক—প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে রচনা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ফরাসী সাহিত্যসম্বন্ধীয় কতিপয় সমালোচনা বিশেষ প্রশংসিত। কিন্তু পাঠকসমাজে উপন্যাসিক বলিয়াই তাঁহার খ্যাতি; কারণ, উপন্যাস সমাজের সকল স্তরে পঠিত হয়; উপন্যাসের আদর কেবল পণ্ডিতের কাছে নহে; উপন্যাস কর্ম্মক্লিষ্ট কেরাণী, শ্রমশীল শ্রমজীবী, পরিশ্রমী কৃষক—সকলেরই অবকাশরঞ্জন, চিত্তবিনোদন, ও শ্রান্তিনিবারণ করে। সত্য সত্যই বেসাণ্ট উদরান্নের জন্য বাধ্য হইয়া উপন্যাসরচনা করিতে আরম্ভ করেন; কেন না, অন্যবিধ রচনার পাঠক অল্প। তাঁহার বহু উপন্যাস পাঠকসমাজে সুপরিচিত। ইহার মধ্যে কতকগুলি জেম্স্ রাইসের সহিত একযোগে রচিত। ইতঃপূর্ব্বে বোমণ্ট ও ফ্লেচার, ডেকার ও মিড্ল্টন একযোগে রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ ঘটনা আজকাল দুর্লভ। বহুদিন পরে—এই স্বার্থসংঘাতসম্পীড়িত যুগে বেসাণ্ট ও রাইস্ সেইরূপে একযোগে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। এই সকল একযোগে রচিত উপন্যাসের কোন্ অংশ কাহার, তাহার নির্ণয় দুরূহ। কেহ বলেন, হাস্যরস রাইসের; কেহ বলেন, প্রেমচিত্রগুলি তাঁহার। প্রকৃতপক্ষে বেসাণ্টের রচিত উপন্যাস অপেক্ষা উভয়ের রচিত উপন্যাসগুলির প্রেমচিত্র উজ্জ্বলতর ও মধুরতর। তাঁহাদের উপন্যাসে নায়ক অসাধারণ অবস্থায় স্থাপিত হইত; তাহার পর তাহার পরিণতি বর্ণিত হইত। কেহ বা অসাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত; কেহ বা সহসা ঐশ্বর্য্যপ্রাচুর্য্যের অধিকারী। তাঁহার উপন্যাসে চরিত্রের পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। সার ওয়াণ্টার উপন্যাসে ডিকেন্সের ছাত্র; সেই ধরণের লেখকদিগের শেষ। ডিকেন্সের দোষ বিশেষত্বও তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। তাঁহারও বিদ্রূপবিকৃতচরিত্রাঙ্কনস্পৃহা প্রবল, তাঁহারও রচনাপ্রণালী অযত্নবর্দ্ধিত, তাঁহারও আখ্যানবস্তু যেন একই ছাঁচে ঢালা। একান্ত সুখের বিষয়, ডিকেন্সের কতকগুলি গুণও তাঁহাতে ছিল। তাঁহারও লণ্ডনের সমাজচরিত্রজ্ঞান ও সহানুভূতি ছিল। পারিসের মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্নদিগের চরিত্রচিত্রণে ডোডে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, লণ্ডনের মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্নদিগের চরিত্রচিত্রণে তিনিও সেই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার পুস্তকগুলি সুখপাঠ্য। শেষ বয়সে তিনি "সার" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। কয় বৎসর

পূর্ব্বে লিখিত তাঁহার প্রথম পুস্তকের বিবরণ হইতে পাঠক তদীয় সাহিত্যজীবনের আরম্ভ-কাহিনী ও রাইসের সহিত পরিচয়ের কথা জানিতে পারিবেন।

প্রথম রচনা ও প্রত্যাখ্যান।

বেসাণ্ট বলেন, প্রথম রচনায় পরিশ্রম প্রচুর, আশা অসীম, হতাশা বিষম। অনেক লেখক বলেন, প্রকাশক-দল অপরিচিত লেখকের রচনা দেখিলে পাঠও করেন না, প্রকাশ-যোগ্য কি না বিচার করা আবশ্যক মনে করেন না। কাযেই নবীন লেখকের রচনা ভাল হইলেও প্রায়ই প্রকাশক কর্তৃক গৃহীত হয় না। কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। তাঁহার প্রথম রচনায় নাম ছিল না; কোনও বন্ধু তাহা কোনও প্রকাশককে দেখান। পুস্তকখানি পঠিত হয়, এবং কেন তাহা প্রকাশের অযোগ্য, তাহাও জানান হয়। তাহাতে গৌণভাবে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা হইতেই লেখকের পক্ষে উপন্যাসরচনার প্রকৃত পথ মুক্ত হইয়া যায়। তিনি বলেন, অধিকাংশ লেখকের পক্ষেই প্রথম রচনার প্রত্যাখ্যান শুভফলপ্রদ। যাঁহাদের প্রথম রচনাই প্রকাশিত হয়, তাঁহারা অনেকে আবার পরিণত বয়সে সে রচনার জন্য লজ্জা রাখিবার স্থান পান না। বেসাণ্ট সেই প্রথম রচনা অনলে আহুতি দিয়া বৈশ্বানরকে তুষ্ট করেন। এই সময় ক্রমে ক্রমে তিনি বুঝিতে পারেন যে, চলনসই উপন্যাসের রচনা করিতে হইলেও অপরের অনুকরণের বর্জ্জন করিতে হইবে, আপনি সব দেখিতে হইবে, বাস্তব অধ্যয়ন করিতে হইবে; প্রচলিত প্রথার মোহপাশ ছিন্ন করিতে হইবে; মানবচরিত্রের কোনও স্থায়ী প্রবল ভাবের ভিত্তির উপর রচনা ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ও বাক্যবাহুল্য অপেক্ষা নাটকোচিত রচনায় লেখকের মনোযোগ আকৃষ্ট রাখিতে হইবে। এ শিক্ষা এক দিনে হয় নাই; কিন্তু এ শিক্ষার মূল্য বড় অধিক। দুঃখের বিষয়, বেসাণ্টের ভাগ্যে যাহা হইয়াছিল, সকলের ভাগ্যে তাহা হয় না। এমন কি, শ্রীমতী হেনরী উডের কীর্ত্তিস্তম্ভ East Lynne গ্রন্থও প্রকাশক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল! এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। অধিকন্তু সকলেরই প্রথম রচনা একান্ত অক্ষমতার পরিচায়ক হয় না; পরন্তু, সেই প্রথম রচনায় যে উৎসাহ, যে অভিজ্ঞতা, যে ঔজ্জ্বল্য লক্ষিত হয়, সংসারসংঘাততাড়িতের পরবর্ত্তী রচনায় তাহা দুর্ল্লভ। প্রথম পুস্তকে অনেক সময় অনেক নূতন কথা থাকে; প্রেমের চিত্র সমুজ্জ্বল-তম বর্ণে চিত্রিত হয়; জগতের বাস্তব কল্পনার মোহালোকে মধুর হইয়া উঠে; ইহাও অনেক সময় লক্ষিত হয়। আবার সকল লেখকই কিছু সর্ব্বপ্রথম রচনা প্রকাশ করিতে সাহসী হন না। যে রচনা লইয়া লেখক প্রকাশকের দ্বারে উপনীত হন, তাহা অনেক সময় বহু সংস্কারের ফল।

সাময়িকপত্রে পরিচয়।

পাঠক বেসাণ্টের মুখে প্রকাশকের প্রশংসা শুনিলেন। এখন তাঁহার মুখে সাময়িক-পত্র-সম্পাদকদিগের প্রশংসা শুনুন। লোকে বলে, সম্পাদকগণ অযাচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন না। বেসাণ্ট বলেন, সে কথা সত্য নহে। অবশ্য যে সম্পাদক প্রকাশ্য ভাবে প্রকাশ করেন,—তিনি কাহারও অযাচিত রচনা চাহেন না,—তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। আর সকলে সেরূপ রচনার আদর করেন। এইরূপ রচনা হইতেই রাইসের সহিত তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। অযাচিত রচনা পাঠাই-য়াই তিনি কোনও মাসিকের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন। অযাচিত রচনা পাঠানর ফলে তিনি বহুদিন লণ্ডনের কোনও অতি প্রসিদ্ধ দৈনিকের নিয়মিত লেখক হইয়া পড়েন। এখন কি সে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে?

তিনি একবার অযাচিতভাবে ...

সেটি পছন্দ করিয়া ছাপিতে দেন। এই সময়ে রাইস কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সদ্য আইন ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; তিনি ঐ পত্রখানি ক্রয় করিয়া স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হন। তিনি আসিয়া দেখেন, বেসাণ্টের প্রবন্ধ 'কম্পোজ' হইয়া রহিয়াছে;—তিনি তাহা ছাপিতে দেন। বেসাণ্ট দেখিলেন, তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা মুদ্রাকরকৃত প্রমাদে পূর্ণ। তিনি বিরক্ত হইয়া পত্র লিখিলে উত্তরে রাইস তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করেন। সাক্ষাতে তিনি প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া দেন। সেই হইতে বেসাণ্ট ঐ পত্রের নিয়মিত লেখক হইলেন। দুঃখের বিষয়, উক্ত পত্র লাভজনক হয় নাই। তিন বৎসর চেষ্টার পর রাইস ঐ পত্রের সংস্রব ত্যাগ করেন। তিনি কত লোকসান দিয়াছিলেন, তাহা বলিতেন না বটে, কিন্তু সাপ্তাহিকের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হইবার দুরাশা আর তিনি হৃদয়ে পোষণ করেন নাই।

রাইস।

এই সময় সংবাদপত্রের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া বেসাণ্ট যথেষ্ট অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করেন; বহুবিধ লোক-চরিত্র অধ্যয়ন করিবার সুবিধা পান। আফিসে এক জন বেতনভুক লেখক ছিলেন, তিনি ফরমাস মত প্রবন্ধ লিখিতেন—সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট কয় "কলম" পুরাইতে হইত। তিনি চতুর, লেখাপড়া-জানা ও কতকটা কবি। যে কোন বিষয়ে পাঠযোগ্য প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিতেন। বিষয় নির্ব্বাচিত করিয়া দিলেই প্রবন্ধ লিখিয়া আনিতেন; তাহাতে কোন আপত্তি করিতেন না। আপনি রচনা সম্বন্ধে কোনও কথা কহিতেন না। তিনি প্রায়ই পরের প্রবন্ধ আত্মসাৎ করিতেন; ধরা পড়িলে বলিতেন, উদ্ধারচিহ্ন দিতে ভুলিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত মদ্যপ ছিলেন; মদ্যপানের জন্য অর্থের প্রয়োজন—তাই ছিন্নবেশে থাকিতেন, দীনগৃহে বাস করিতেন। যে অর্থ বাঁচিত, তাহাতে মদ্যপান চলিত। কোন কারণে কর্ম্মচ্যুত হইয়া তিনি রঙ্গালয়ের সংস্রবে যান,—শেষে দাতব্যচিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি আপনার দোষে প্রতিভা নষ্ট করিয়াছিলেন।

সংবাদপত্রসংস্রবে।

এই আফিসেই তাঁহার সহিত জুলিয়ার পরিচয়। সে সমস্ত দিন দপ্তরীর হিসাব রাখিত, নিশায় রঙ্গালয়ে যাইত। তাহার সৌন্দর্য্যে অসাধারণ কিছুই ছিল না; তবে তাহার কোমল, বিষন্ন নয়নে যেন মৃত্যুর ছায়াপাত লক্ষিত হইত।

সম্পাদকের নিকট প্রতিদিন বহু দরিদ্র লেখকের সমাগম হইত। তখনও সংবাদপত্র-লেখকের দলে মহিলার আগমনদ্বার সম্যক মুক্ত হয় নাই; তাই পুরুষের সংখ্যাই অধিক ছিল। সকলেই কোনও বিষয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে চাহিতেন। সকলেই মনে করিতেন, তাঁহার কল্পনা একান্ত মৌলিক। এক জন হাঁসপাতাল দেখিয়া আসিয়া বিজ্ঞানের ডানা ধরিতে চাহিতেন। এক জন অর্থনীতি সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্ত সংস্কার দূর করিতে চাহিতেন। কেহ শিক্ষা সম্বন্ধে, কেহ অন্য কোনও বিষয়ে লিখিতে চাহিতেন। আসল কথা বিষয় লইয়া নহে, প্রবন্ধটি ধারাবাহিক হইবে। কাহাকেও ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে দেওয়া হইত না। অনেকে প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিতেন। বহু দরিদ্র রমণীর পক্ষে প্রবন্ধ প্রত্যাখ্যাত হইলে অন্নের অভাব অনিবার্য্য। যদি সম্পাদক সদয় হইয়া তাঁহাদের প্রবন্ধ গ্রহণ করেন, তবে তাঁহারা খাইতে পান। কি দারুণ দুর্দ্দশা! সকল সম্পাদকই অবগত আছেন—এখনও সাহিত্যসংসারে এইরূপ দুঃখিনীর সংখ্যা অল্প নহে।

সময় সময় বেসাণ্ট রচনা পরীক্ষা করিতেন। কোনও কোনও লেখক লেখিকা আসিয়া সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। রমণীরা রচনা প্রত্যাখ্যাত হইলে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিতেন। রাইস তাঁহাদের সহিত যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিতেন; কিন্তু হায়, তাঁহাদের রচনা প্রকাশের

কোনও কোনও রচনার এক পৃষ্ঠা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইত যে, তাহা প্রকাশের অযোগ্য। লেখক বলেন,—সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ত্রুটি দেখাইয়া দিলে তিনি সংশোধন করিবেন। কিন্তু হায়,—সম্পাদকের কি তত সময় আছে? প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধটি না পাইলে সম্পাদকের পক্ষে তাহা ত্যাগ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। রাইস যখন পত্রের সংস্রব ত্যাগ করেন, তখন স্তূপাকার রচনা আফিসে বর্ত্তমান ছিল। তাহার একটিও প্রকাশযোগ্য নহে।

উপন্যাস।

রাইস পূর্ব্বেই আপনার পত্রের জন্য একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। সেখানি Once a Week পত্রের পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে; স্বতন্ত্র মুদ্রিত হয় নাই। লেখকের ইচ্ছা ছিল, কয়টি অধ্যায় আবার নূতন করিয়া লিখিবেন; তাহা আর হইয়া উঠে নাই। এক দিন পত্রের জন্য তাড়াতাড়ি লিখিতে হইল বলিয়া আক্ষেপ করিয়া রাইস প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহার আর একখানি উপন্যাস লিখিবার কল্পনা আছে, সেখানি উভয়ে একত্র লিখিলে হয়।

উপন্যাসের কল্পনাটি পুরাতন; পূর্ব্বে যে কেহ লেখে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। প্রচলিত গল্পে আছে, অমিতব্যয়ী পুত্র পিতার নিকট আপনার অংশ বুঝিয়া লইয়া, লব্ধ অর্থের অপব্যয় করে, এবং নানা ক্লেশ পাইয়া শেষে অনুতাপবিদ্ধ হইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। উপন্যাসের কল্পনায় অপব্যয়ী পুত্রের অনুতাপ কৃত্রিম—বৃদ্ধ পিতাকে ভুলাইয়া আরও কিছু অর্থলাভের জন্য ছলমাত্র।

গল্পটি প্রথমে যত সহজ বোধ হইয়াছিল, লিখিবার সময় আর তত সহজ হইল না। পাপকলুষিত, পাপীর সহচর, বিবেকপীড়ক নায়কেরও অপূর্ব্ব মানবোচিত গুণ—দৌর্ব্বল্য বলিতে হয় বল—ছিল। তাহারই তাড়নে সে সৎপথে প্রত্যাবৃত্ত হয়। প্রথমাবধিই পুস্তকখানি পাঠকসমাজে আদৃত হইয়াছিল, এবং ইহারই গুণে নির্ব্বাণোন্মুখ পত্রখানি একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহার পর পুস্তকখানি প্রকাশের সময় আসিল। প্রকাশকগণ গ্রন্থকারের নামহীন—নূতন পুস্তক প্রকাশিত করিতে স্বভাবতঃই দ্বিধা বোধ করেন। এ দিকে সংবাদপত্রে উপন্যাসখানি প্রকাশের সময় তাহা যে পরিমাণ জনাদর লাভ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার সাফল্য সম্বন্ধে গ্রন্থকারদ্বয়ের সংশয়মাত্র ছিল না। তাঁহারা আপনাদের ব্যয়ে গ্রন্থখানি ছাপাইয়া বাঁধাইয়া বিক্রয়ার্থ দেন। প্রথম সংস্করণ (৬০০খানি) নিঃশেষিত হইলে গ্রন্থকারদিগের কিছু লাভ হয়। হেনরি এস. কিং কোম্পানী সুলভ সংস্করণটি বিক্রয় করেন। শেষে স্যাটো ও উইণ্ডস পুস্তকখানি ক্রয় করেন। এখনও তাঁহারাই সেখানি প্রকাশ করিতেছেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই উপন্যাসখানি প্রথমে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, এবং তদবধি পাঠকসমাজে সমাদৃত হইতেছে।

গ্রন্থপ্রকাশ।

বেসাণ্ট বলিয়াছেন, উপন্যাসের আখ্যানবস্তু তাঁহার নহে—রাইসের। সেই জন্য তিনি সেখানির সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিলে একান্ত অসঙ্গত হইবে না। অতীত পাপজীবনের গুরুভারপীড়িত নায়ক, তাহার হীনপ্রকৃতি পত্নী, সেই দ্যূতপ্রিয় সহচর, দস্যুবৃত্তি ও কারাগারের স্মৃতিসাহচর্য্য—এক দিকে এই সকল, অপর দিকে পূতচরিত্রা, সরলা বালিকা—নায়কের বাঞ্ছিতা; সেই শিশু;—নায়কের বিষাদপীড়িত পিতা। এরূপ চরিত্রসমাবেশ সচরাচর লক্ষিত হয় না। এই নায়কচরিত্র উপন্যাসে ও নাটকে অনুকৃত হইয়াছে।

সমালোচনা।

উভয়ে সেই ক্ষুদ্র আফিসঘরে বসিয়া নায়কের চরিত্রসমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। তাহার ক্রিয়াকলাপ,—অশিষ্টাচার গোপন করিয়া তবে তাহাকে ভদ্রসমাজে আনিবার উপযুক্ত করিয়া লইতে হইত। এই সময় কত লোক আসিয়া বিরক্ত করিত! কখন জুলিয়া দপ্তরীর হিসাব লইয়া আসিত; কখন পূর্ব্বপরিচিত লেখকগণ আসিয়া ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিবার প্রস্তাব করিতেন। সন্ধ্যায় উভয়ে একত্র আহার করিতেন, বা রঙ্গালয়ে যাইতেন, বা বেসাণ্টের কক্ষে বসিয়া তাস খেলিতেন, আর নায়কের চরিত্র লইয়া তর্ক চলিত। শেষ দিকে নায়ক শান্ত হইয়া আসিল। কিন্তু বেচারার অতীত পাপের শাস্তিভোগ অনিবার্য্য। প্রেম, সম্মান, পারিবারিক শান্তি—এ সকল তাহার ভাগ্যে ছিল না। তাহার মৃত্যুই অনিবার্য্য।

শেষ।

ইহাই বেসাণ্টের প্রথম উপন্যাসের ও সাহিত্যজীবনের আরম্ভের ইতিহাস।

বেসাণ্ট কোনও মাসিকপত্রে তাঁহার উপন্যাসরচনার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ইংলণ্ডের লেখকগণ আমাদের দেশের লেখকদিগের মত কেবল কল্পনাবলে রচনা করেন না। বেসাণ্ট একবার লণ্ডনের দরিদ্রদিগকে উপন্যাসে চিত্রিত করিবেন মনে করিয়া তাহাদিগের চরিত্রপর্য্যবেক্ষণে যে বিপুল শ্রম করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। য়ুরোপে লেখকগণ বাস্তবের সংস্রব ত্যাগ করিতে পারেন না; কারণ, পাঠকসম্প্রদায় সচেতন। জোলা এক একখানি উপন্যাসে সামান্য বিষয়ের বর্ণনাতেও অসাধারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন। আমাদের দেশে পাঠকসম্প্রদায় কূপমণ্ডূক; কাযেই লেখককেও শ্রম করিতে হয় না। অনুষ্ঠানে হিন্দুসমাজের বহির্ভূত লেখকলেখিকাগণ অনায়াসে হিন্দুর বিবাহে ঢাক বাজাইয়া শব্দাড়ম্বর করিয়াছেন! আমাদের উপন্যাসে হাবড়া পার হইলেই অভ্রানোজ্জ্বল রবিকরদীপ্ত অম্বরে মেঘের মত পর্ব্বতচূড়া দৃষ্ট হয়। যুবক বা প্রৌঢ় পুরুষ ছদ্মবেশে অনায়াসে নারীসমাজে নারী হইয়া মিশিয়া যায়; বর্ম্মাবৃত যোদ্ধার অসাধারণ তীক্ষ্ণধার তরবারীর আঘাতে নিমেষে ঝড়গতি অশ্বের গ্রীবা দ্বিখণ্ড হইয়া যায়! বৃদ্ধ নায়ক প্রেমের খাতিরে পুকুরঘাটে নাতিনীর বয়সী বালিকার মুখচুম্বন করিয়া—হিন্দুসমাজের নিন্দা ঘোষণা করে! আর আমরা 'বাহবা' প্রদান করি। বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্রই দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, এ দেশে 'শালা' না বলিলে রসিকতা হয় না। বাস্তবিক আমাদের সমাজে অদ্ভুত না দেখিলে কেহ হাসে না। এখনও সাহিত্যে "বিংশ শতাব্দীর অদ্ভুত কেলুয়া" নিঃসঙ্কোচে আসরে আসে! বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত সরু ল্যান্‌সেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজশাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্যসমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে;—দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং।" বঙ্কিমচন্দ্র লাঠিয়ালদের যে দুরবস্থার কথা বলিয়াছেন, ল্যান্‌সেটধারীদের দুরবস্থাও সেইরূপ। তাহাদেরও শিক্ষা নাই, তাহারা না শিখিয়া পণ্ডিত, অথচ 'নিগুর্ণ আদার তিন গুণ ঝালে'র মত তাহাদের গর্ব্বের ঝাঁঝ বড় অধিক। তাহারা 'হেলে' ধরিতে জানে না, 'কেউটে' ধরিতে চাহে। ল্যান্‌সেট লইয়া ক্ষতস্থানে বসাইতে সুস্থ অঙ্গে বসাইয়া দেয়। দুষ্টরক্ত বাহির হয় না, সুস্থ অঙ্গ দুষ্ট করা হয়। তাহাদের কৃতিত্বে লোক হাস্যসংবরণ

করিতে পারে না। আমরা ভিত্তি গঠিত না করিয়াই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে চাহি; আমাদের নিষ্ফল প্রয়াসে লোক হাসে। আমরা সোপানশ্রেণী অতিক্রম না করিয়াই মনুমেণ্টে উঠিতে চাহি; ফলে উন্মার্গগামী লক্ষে যাহার অনুকরণ করি, তাহার নাম কাব্যে প্রভুভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ—উচ্চাশার জন্য নহে। আমরা সাহিত্যের উন্নতি, শ্রী, লাবণ্য, বিস্তার প্রভৃতির সাধনকল্পে সভাসমিতি, সাময়িক পত্র—সবই করিয়াছি ও করিতেছি। আমাদের মৌলিকতার অন্ত নাই, গবেষণার গুরুত্বে দেশে আতঙ্কের সঞ্চার হইতেছে। আমরা সকলেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। যশের ধূলি লইয়া আমরা আবীর খেলা করি। ইনি আমাদের স্কট, উনি আমাদের শেলী, তিনি আমাদের মেকলে। আর বর্ষার প্রথম বারিপাতে যেমন দীর্ণ বিদীর্ণ শুষ্ক ভূমিতে সহসা শতভৃণ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, তেমনই সাময়িক পত্রসম্পাদকদিগের আহ্বানে নিত্য শত লেখক মুকুলিত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা 'খ্যাতনামা; তাঁহাদের চিত্র সাময়িক সুশোভিত করে। শীঘ্রই হয় ত কোনও সাহিত্যসভার কোনও বিশিষ্ট সভ্য সাহিত্যসেবকদিগের জন্য 'কইসার-ই-হিন্দ' পদক দিবার প্রস্তাব করিবেন ও সেই প্রস্তাব চটপট করতালি সহ সাদরে গৃহীত হইবে। তখন যদি স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাব হয়—অগত্যা পিতল ও তাম্রখণ্ডেই কায সারা হইবে। এ দেশে ইহাও অসম্ভব নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা। তাঁহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে তাঁহাদের লেখা সার্থক হয় তাহা জানা নাই। তাঁহারা অনেকেই দেশবৎসল, দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। কলিকাতার ভিতর স্বশ্রেণীর লোকে কি করে, ইহাই অনেকের স্বদেশসম্বন্ধীয় জ্ঞানের সীমা। কেহ বা অতিরিক্ত দুই চারিখানা পল্লীগ্রাম বা দুই একটা ক্ষুদ্র নগর দেখিয়াছেন, কিন্তু সে বুঝি কেবল পথ ঘাট, বাগান বাগিচা, হাট বাজার। লোকের সঙ্গে মিলেন নাই। দেশ সম্বন্ধীয় তাঁহাদের যে জ্ঞান, তাহা সচরাচর সংবাদপত্র হইতে প্রাপ্ত। সংবাদপত্র-লেখকেরা আবার সচরাচর (সকলে নহেন) ঐ শ্রেণীর লেখক—ইংরেজেরাও বটেনই।" এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

বাঙ্গালী গৃহস্থের দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম, অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তন, বাঙ্গালীর হাঁড়ির খবর—গ্রন্থকারের এই সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলিয়াই "স্বর্ণলতা" মর্ম্মস্পর্শী, "স্বর্ণলতার" করুণার উৎস সর্ব্বদাই উৎসারিত—উচ্ছ্বসিত—উদ্বেলিত। সেই জন্যই আমাদের অশ্রুবারিবর্ষণে নিষ্পন্নমঙ্গলস্নানা 'সরলা' বাঙ্গালীর হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে একান্ত আত্মীয়ার মত বিরাজিতা।

আমাদের মৌলিকতা যথেষ্ট হইয়াছে; আমাদের কল্পনা বহু সম্ভব ও অসম্ভবের রচনা করিয়াছে; আমরা সাহিত্যের উন্নতির একশেষ করিয়া তবে ছাড়িয়াছি। এখন যদি সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া আমরা বাস্তবের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করি, বড় ছাড়িয়া ছোটর দিকে দৃষ্টিপাত করি, অসম্ভবের আশা ত্যাগ করিয়া সম্ভবে মনোযোগ দান করি—তবে সে উন্নতি আপনি হইবে, তাহার ঘোষণা করিবার জন্য আমাদিগকে আর আপনার ঢাক আপনি বাজাইতে হইবে না।

যৌন-সম্মিলন।

এ পৃথিবীতে জীব একাই আসে, একাই যায়, কিন্তু একা থাকে না—থাকিতে পারে না, থাকিলে চলে না। জীব-প্রবাহরক্ষার জন্যই স্ত্রী-পুরুষের মিলন প্রয়োজনীয়। এই মিলনের স্থায়িত্ব জীবের প্রকৃতি ও অবস্থার উপর নির্ভর করে। মৎস্য ও অধিকাংশ সরীসৃপের মধ্যে যৌন-সম্মিলন, জনন-প্রক্রিয়াতেই পর্য্যবসিত হয়। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের মিলনের স্থায়িত্ব বোধ হয় প্রয়োজনীয়ও নহে; কেন না, পিতা বা মাতা কেহই অপত্যলালনের, অপত্যসংরক্ষণের ভার গ্রহণ করে না—জনন-প্রক্রিয়াতেই পিতার করণীয়ের, এবং প্রসব-প্রক্রিয়াতেই মাতার করণীয়ের, অবসান হয়। ডিম্বনিচয় দৈবাধীন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, দৈবাধীন রক্ষা পায়। তবে যে এই জীব-প্রবাহ রক্ষিত হয়, তাহার কারণ এই যে, এত অধিক ডিম্ব ইহারা প্রসব করে যে, প্রতিকূল কারণে যতই কেন ধ্বংস হউক না, জীব-প্রবাহরক্ষার ব্যাঘাত হয় না। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। 'কড্' নামক মৎস্য বৎসরে প্রায় দশ লক্ষ ডিম্ব প্রসব করে। প্রতিকূল কারণে কতই ধ্বংস হইবে? সহস্রাংশের এক অংশ রক্ষা পাইলেও যে জাতিপ্রবাহ অব্যাহত থাকিবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়।

বিহঙ্গমদিগের মধ্যে যৌন-সম্মিলন স্থায়িত্ব বিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। সাধারণ কুক্কুটজাতীয় কতকগুলি পক্ষী ব্যতীত আর প্রায় সকল শ্রেণীর পক্ষীর মধ্যেই এই মিলন জীবনান্তস্থায়ী—দম্পতির মধ্যে যত দিন একটির মৃত্যু না হয়, তত দিন এ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। ইহাদের একনিষ্ঠতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ডাক্তার ব্রেহ্ম্ এতই মুগ্ধ হইয়াছেন যে, তিনি লিখিয়াছেন—"প্রকৃত বিবাহ কেবল বিহঙ্গমদিগের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।"

মনুষ্যের অব্যবহিত নিম্ন-স্তরবর্ত্তী জীবে, অর্থাৎ মানবভাবাপন্ন বানর-দিগের মধ্যে দেখা যায় যে, যৌন-সম্মিলন জননপ্রক্রিয়াতেই পর্য্যবসিত হয় না। পক্ষীদিগের ন্যায় ইহাদের যৌন-সম্মিলন কোন স্থলে জীবনা-

যৌন সম্বন্ধ সূক্ষ্মভাবে ও দীর্ঘকাল ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা জীবতত্ত্বানুসন্ধায়ী কাহারও ভাগ্যে হয় নাই। তথাপি ইহা পরিলক্ষিত হইয়াছে যে, অনেক স্থলে ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে—কত দিনের জন্য, তাহা যে বলা যায় না, সে বিষয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে।

মনুষ্য ও মানবভাবাপন্ন বানর ব্যতীত অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবদিগের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের মিলন প্রায়শঃ এক বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হয় না।

মানবজাতির মধ্যে যৌন-সম্মিলনের স্থায়িত্ব বিষয়ে সার্ব্বজনীন কোন নির্দ্দিষ্ট অনুল্লঙ্ঘ্য নিয়ম নাই—দেশ, কাল, পাত্র ভেদে ইহার স্থায়িত্ব অতি অল্প কাল এবং অতি দীর্ঘ কাল, হইয়া থাকে। কিন্তু এমন কথা বলা যায় না যে, যে জাতি যত অসভ্য, তাহাদের পতি-পত্নীসম্বন্ধ তত অল্পকালস্থায়ী বরং এ কথা বলা যায় যে, মানুষ কতকটা সভ্যতা প্রাপ্ত না হইলে তাহার পত্নী-পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা এবং নূতনের স্পৃহা তেমন বলবতী হয় না। এমন অনেক নিতান্ত অসভ্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের মধ্যে পত্নীবর্জ্জন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আন্দামান দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে যৌন-সম্বন্ধ কোন কারণেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কেবল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া নহে, ভারতসাগরের অধিকাংশ দ্বীপের অনেক জাতির মধ্যে এবং নব-গিনির পাপুয়ানদিগের মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত। সিংহল দ্বীপের বেদ্দাদিগের মধ্যে একটি প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে যে, মৃত্যুই কেবল পতিপত্নীসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, এবং বেইলি সাহেব বলেন যে, এই নীতিপালনে তাহাদের মধ্যে কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, অধিকতর সভ্য অনেক জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, বিবাহবন্ধন সহজেই ছিন্ন হয়। মুসলমান জাতিদিগের মধ্যে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করা নিতান্তই সাধারণ। মহম্মদ স্বয়ং যদিও বলিয়াছেন যে—"সঙ্গত কারণ ব্যতীত স্ত্রী-বর্জ্জন করিলে ঈশ্বরের অভিশাপ তাহার উপর ন্যস্ত হয়"—তথাপি মুসলমানমাত্রই ইচ্ছাধীন স্ত্রী-ত্যাগ করিতে পারে। কোন কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল বলিলেই হইল—"তোমাকে আমি ত্যাগ করিলাম"—তাহা হইলেই বাধ্য হইয়া স্ত্রীটিকে আপন পিতা মাতা বা স্বজনের আশ্রয়ে ফিরিয়া যাইতে হয়। পারস্য দেশে একরূপ বিবাহ-প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার নাম 'সিঘে' বিবাহ। এই বিবাহ

পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই প্রথার সম্বন্ধে একটি অতি কৌতুকাবহ বিষয়ের উল্লেখ আমাদের বর্ত্তমান রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন তাঁহার 'পারস্য' নামক পুস্তকে করিয়াছেন। বৃত্তান্তটা পাঠকবর্গকে শুনাইবার লোভ আমরা সংবরণ করিতে পারিতেছি না। মেশেদ নগর মুসলমানদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান। সেই তীর্থে প্রতি বৎসর অনেক দূর হইতে বহু ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রী আসিয়া থাকে। তাহারা যে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আইসে, এত পথক্লেশ সহ্য করে, গৃহ এবং পরিবারবর্গ ছাড়িয়া এত দূরে থাকার অভাব এত সহিষ্ণুতার সহিত ভোগ করে, তাহার পুরস্কারস্বরূপ স্থানীয় দেবোপম পীর অথবা তাঁহার ধর্ম্মৈকশরণ পুরোহিতগণ একটি সুব্যবস্থা করিয়াছেন। যাত্রিগণ এখানে আসিয়া আপন ইচ্ছানুসারে এক দিনের জন্য, এক সপ্তাহের জন্য, এক পক্ষের জন্য, এক মাসের জন্য, অথবা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পত্নীগ্রহণ করিতে পারে, এবং এইরূপ বিবাহের উপযোগী স্ত্রীলোকও এখানে এত যথেষ্টপরিমাণে থাকে যে, কাহাকেও কখন অভাব বোধ করিতে হয় না। মোল্লা মুফ্‌তির সাহায্যেই এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। তার পর চুক্তির সময় বহিয়া গেলেই যাত্রী আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়; স্ত্রীটি নিয়মিত পনর দিনের দৃশ্যতঃ বৈধব্য রক্ষা করিয়া আবার অন্য যাত্রীর ধর্ম্ম-পত্নী হয়। * এই তীর্থক্ষেত্রে যাত্রিসমাগম খুব অধিক হয়; সেটা যে কেবল পীরের মাহাত্ম্য নহে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু লোকে ইহাকেও বিবাহ বলে। সুতরাং ইহাও যৌন-সম্মিলনের একটা মূর্ত্তি।

বিশেষ স্থলে যেমনই হউক, সাধারণতঃ এ কথা বলা যায় যে, অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে, অপেক্ষাকৃত সভ্যজাতিদিগের মধ্যে, এমন কি, সভ্যতম প্রাচীন জাতিদিগের অধিকাংশের মধ্যে বিবাহবন্ধন ছেদন করা এক সময়ে পুরুষের ইচ্ছাধীন ছিল। বলিতে কি, প্রাচীন হিব্রু, গ্রীক্, রোমক এবং জর্ম্মনদিগের মধ্যেও বিরক্তিমাত্র যৌনসম্বন্ধ-ছেদনের যথেষ্ট কারণ বলিয়া পরিগণিত হইত। চীনের প্রাচীন বিধি অনুসারে, বাড়ীতে অধিক ধোয়াঁ করিলে, অথবা শ্রুতিকঠোর শব্দের দ্বারা বাড়ীর পোষা কুকুরটিকে ভীত করিলে স্ত্রী পরিবর্জ্জনীয়া হয়। অথচ চীন দেশে পত্নী-বর্জ্জন নিতান্তই বিরল। জাপানেরও নিয়ম এই; কিন্তু সেখানেও স্ত্রী-বর্জ্জন অতি বিরল, এবং সন্তানাদি থাকিলে একরূপ অসম্ভব। মোটের

উপর বলিতে গেলে, সভ্যসমাজে পতি-পত্নীসম্বন্ধ কার্য্যতঃ জীবনান্তস্থায়ী। কিন্তু এই সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার বিধানও সকল সভ্য দেশেই আছে। ইউরোপের সভ্যসমাজে দুই কারণে এই সম্বন্ধ ছিন্ন হইতে পারে—এক, ব্যভিচার; দ্বিতীয়, নিষ্ঠুর ব্যবহার। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি স্ত্রীপরিত্যাগের কারণ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবান মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন,—

মদ্যপাঽসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥
বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥

ইহার অর্থ,—মদ্যপানাসক্তা, দুশ্চরিত্রা, পতিবিদ্বেষিণী বা অসাধ্যব্যাধিগ্রস্তা, অপকারসাধনক্ষমা ও ধনক্ষয়কারিণী অপব্যয়িনী স্ত্রী সত্বে অধিবেদন অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহ করিবে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতবৎসা হইলে দশম বর্ষে, কেবল কন্যাপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, কিন্তু অপ্রিয়বাদিনী হইলে তৎক্ষণাৎ দারান্তর গ্রহণ করিবে।

কি সূক্ষ্মদর্শী, কি সমীচীন, অথচ কি ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা! আজকালকার স্ত্রীশিক্ষা, বালিকা-বিদ্যালয় ও বেথুন কালেজের দিনে ও পাশ্চাত্যভাবের প্রভাবকালে অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীও ঘরে ঘরে বিরাজমানা। শাস্ত্র মানিয়া চলিলে ত নিত্যই স্ত্রীপরিত্যাগ চলিতে পারে। অথচ তাহা হয় না। ইহার অর্থ এই যে, শাস্ত্রবিধান অপেক্ষা মানবপ্রকৃতি মহত্তর—আজ বলিয়া নহে; চিরকালই। মানুষ যত দিন মানুষ, ততদিনই শাস্ত্রবিধান অপেক্ষা মানুষ বড়।

এই হিন্দু বিধানে একটি কথা পরিলক্ষণীয়। এখানে অধিবেদনের, অর্থাৎ দারান্তর-পরিগ্রহের ব্যবস্থাই আছে—পতি-পত্নীসম্বন্ধবিচ্ছেদের কোন কথা নাই। হিন্দুর দেশে সে ব্যবস্থা থাকিলে নিতান্তই অসঙ্গত হইত। বাস্তবিকও এ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। যে সকল স্থলে হয়, সেখানে উহা ইন্দ্রিয়লালসা বা নূতনপ্রিয়তার নামান্তরমাত্র।

হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মানুষের অপেক্ষা বড় ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনুদারতা বা সংকীর্ণতা ছিল না। যেমন পুরুষের জন্য দারান্তরপরিগ্রহের ব্যবস্থা আছে, তেমনই স্ত্রীলোকের জন্যও

অন্যপতিগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। পরাশর-সংহিতার বচনটি বহুবার উদ্ধৃত হইয়াছে; তথাপি আর এক বার উদ্ধৃত করিলে বোধ করি কোন অপরাধ হইবে না। বচনটি এই,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

ইহার অর্থ,—স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব হয়, পতিত হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোক অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে।

ইচ্ছাপূর্ব্বক যৌনসম্বন্ধসংস্থাপনে বিরতির দৃষ্টান্ত এক মনুষ্যজাতি ছাড়া অন্য কোন নিম্নতর জীবে দেখা যায় না। যৌবনোদ্গমে যৌনসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা জীবমাত্রেই অত্যন্ত প্রবল। সঙ্গমকাল সমাগত হইলে এই প্রবৃত্তির উত্তেজনায় প্রায় সকল শ্রেণীর জীবেরই পুরুষেরা অধীর, উচ্ছৃঙ্খল, উন্মত্ত, ভীষণ হইয়া উঠে। এতন্নিবন্ধন জীব-জগতে উন্মত্ত চেষ্টা, নিদারুণ প্রতিযোগিতা ও মরণান্তক যুদ্ধের লোহিত প্রবাহ নিয়ত প্রবহমান। যে দুর্ব্বল, যে রুগ্ন, যে অন্য কোন রূপে অক্ষম, বা জীবনসংগ্রামের অনুপযোগী, তাহার ভাগ্যে স্ত্রীলাভ কাজেই ঘটে না, বা বহু বিলম্বে ঘটে। কিন্তু সক্ষম জীব ইচ্ছাপূর্ব্বক যৌন-সম্মিলনে বিরত হইয়াছে, প্রাণিজগতে এরূপ দৃষ্টান্ত এক মনুষ্যজাতি ছাড়া আর কোথাও নাই।

মানবজাতির মধ্যে যৌন-সম্মিলন-বিরতি অধিকাংশ স্থলেই পারিপার্শ্বিক অবস্থাধীন, অর্থাৎ বাধ্য হইয়াই বিরত হইতে হয়। যে সকল সমাজে বহু-বিবাহ প্রচলিত আছে, সেখানে যে অনেক বা কতক লোককে পত্নীহীন থাকিতে হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। যেখানে মূল্য দিয়া স্ত্রী ক্রয় করিতে হয়, সেখানেও মূল্যসংস্থানের জন্য অনেককে প্রাপ্তযৌবন হইয়াও স্ত্রীলাভের জন্য অল্লাধিক কাল অপেক্ষা করিতে হয়। পক্ষান্তরে, যে সকল সমাজে একাধিকপত্নীগ্রহণ ধর্ম্মবিধানানুসারে নিষিদ্ধ, এবং সেই জন্যই সমাজ-বিধান কর্ত্তৃক অপরাধ বলিয়া পরিগণিত, সেখানে যে অনেক স্ত্রীলোক পতিলাভে বঞ্চিতা হইবে, ইহাও অবশ্যম্ভাবী; কেন না, অধিকাংশ সুগঠিত, সুশৃঙ্খল সমাজেই দেখা যায় যে, পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। এতদ্ব্যতীত, যাহারা অন্ধ, যাহারা মূক, যাহারা অচিকিৎস্য-রোগগ্রস্ত, যাহারা অঙ্গহীন, যাহারা বিকলেন্দ্রিয়, যাহারা ক্লীব, তাহারা বিবাহ করিতে প্রায়

না, বা করে না। কোন কোন স্থলে এরূপ নিয়মও দেখা যায় যে, প্রভুর অনুমতি ব্যতীত দাসেরা বিবাহ করিতে পারে না, এবং এরূপ অনুমতি কদাচিৎ প্রদত্ত হয়।

কতকগুলি স্থল আছে, যেখানে লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক যৌন-সম্বন্ধ-স্থাপনে বিরত হয়। অনেক স্থলে এইরূপ একটা সংস্কার বদ্ধমূল দেখা যায় যে, স্ত্রীপুরুষের শারীরিক মিলন, সুতরাং বিবাহ ব্যাপার, অপবিত্রতা ও কলুষতার আধার। এই সংস্কার যে সভ্য মানবের ভ্রান্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের ও ইন্দ্রিয়জয় সম্বন্ধে বিকৃত ধারণার ফল, এমন কথা বলা যায় না। ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতে এবং অতি অসভ্য সমাজেও প্রচলিত দেখা যায়। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারক জেলিংঘেয়স্ সাহেব ছোট নাগপুরের এক জন মুণ্ডা কোল্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'কুকুরে কি পাপ করিতে পারে?'—উত্তর পাইয়াছিলেন—'পাপই যদি করিতে না পারিবে, তবে তাহাদের সন্তান হয় কেমন করিয়া?' টাহিটিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই যদি কেহ স্ত্রী-সংসর্গ না করে, তাহা হইলে মৃত্যু হইবামাত্র সে স্বর্গারোহণ করে—তাহার জন্য কোন শোধন-প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। ফিজি-দ্বীপবাসীদিগের ধারণা অনুসারে স্ত্রী পুরুষের একত্র নিশাযাপন যারপর-নাই লজ্জাহীনতার পরিচায়ক। তাহাদের মধ্যে কেহ তাহা করেও না।

সভ্য মানব যে ধর্ম্ম বিষয়ে ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং শারীরিক পবিত্রতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংস্কার হইতে ধর্ম্ম বা দেবোদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিয়া দাম্পত্যসম্বন্ধ-সংস্থাপনে বিরত থাকিয়াছে ও থাকে, তাহাও বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন সংস্কার হইতেই উদ্ভূত। এখনও যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যাজকদিগের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, তাহাদের সম্বন্ধেও বলা যায় যে, এই অস্বাভাবিক নিষেধ এই প্রাচীন সংস্কারেরই ফল; কেন না, তত্তৎ ধর্ম্মের আদিগুরুগণ এমন কঠোর আজ্ঞা প্রদান করেন নাই। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়-সেবা দুঃখের কারণ, অতএব ইন্দ্রিয়জয় করা কর্ত্তব্য। তিনি এমন কথা বলেন নাই যে, ইন্দ্রিয়ধ্বংস করা আবশ্যক; অথচ তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা ধর্ম্মযাজক ও যাজিকাদিগের পক্ষে বিবাহ ব্যাপার একেবারেই নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধদিগের 'ধম্মিকসুত্ত' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে,—"জ্ঞানী ব্যক্তি বিবাহিত জীবনকে জলন্ত অঙ্গারকুণ্ড বিবেচনা করিয়া দূরে থাকিবে।" যিশুখৃষ্ট স্বয়ং বহু বিবাহ পর্য্যন্ত কোথাও নিষেধ করেন

নাই; কিন্তু তাঁহার শিষ্য সেণ্ট পল্ বিবাহকে 'অনিবার্য্য অমঙ্গল' বলিয়াছেন, এবং নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,—"যে আপনার কুমারী কন্যাকে স্বামিসংযুক্তা করে, সে ভালই করে; কিন্তু যে না করে, সে আরও ভাল করে।" প্রশিষ্যেরা ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছেন। ওরিজেন বলিলেন, "বিবাহ জিনিষটা নিতান্তই কলুষিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ।" টার্‌সিউলিয়ান বলিলেন, "সকলেরই অবিবাহিত থাকা কর্ত্তব্য; তজ্জন্য যদি মনুষ্যজাতির লোপ হয়, সেও ভাল।" সেণ্ট্ জেরোম্ বলিলেন, "বিবাহের দ্বারাই পৃথিবী জীবপূর্ণ হয় বটে; কিন্তু স্বর্গ পূর্ণ হয় অবিবাহিত লইয়া।" শেষে পোপ্ সপ্তম গ্রেগরি যাজকদিগের পক্ষে বিবাহটা একেবারেই নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। বিবাহ নিষিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু ব্যভিচারের স্রোত ভয়ঙ্কর বাড়িয়া উঠিল; কেন না, বিধি-নিষিদ্ধ উপভোগের আকর্ষণই এ পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। জবরদস্তি করিয়া প্রকৃতির গতিরোধ করিতে গেলে এইরূপ ফল ফলিবারই কথা। শেষে, ইউরোপের 'মধ্য যুগে'র ইতিহাসে সন্ন্যাসিনী-আশ্রমের (nunneries) ব্যাপার যাহা দাঁড়াইয়াছিল, তাহা বুঝি নরকেও ঘটে না। কিন্তু সে পাপকথায় আর কাজ নাই।

এই সকল মহাবুদ্ধি, মহাপ্রাণ, ধর্ম্ম-ধুরন্ধরদিগের ব্যবস্থা যদি মনুষ্যজাতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইত, তাহা হইলে যে মনুষ্যজাতির লোপ হইত, ইহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আত্মরক্ষা, নিসর্গের প্রথম ও প্রধান নিয়ম—ব্যক্তির পক্ষেও যেমন, সমাজের পক্ষেও তেমনই। সেই জন্য, পক্ষান্তরে, অনেক সমাজ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া, যৌন-সম্মিলনব্যবস্থা সকলের জন্যই অবশ্যপ্রতিপাল্য করিয়াছে—অসভ্য সমাজও করিয়াছে, সভ্য সমাজও করিয়াছে। সাধারণতঃ এ কথা বলা যায় যে, সকল সমাজেই প্রাপ্ত যৌবনে লোকে বিবাহের জন্য উৎসুক ও উদ্যোগী হয়। অতিসভ্য সমাজে অনেক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহার অনেক কারণ আছে। সে সকল নির্দ্দেশ করিবার এ স্থান নহে। এই ঔৎসুক্য ও স্বতঃ-প্রবৃত্তির যেথানে অভাব হয়, সেখানে সমাজ তাহার অব্যর্থ বেত্র হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। লাসকালা প্রদেশে অবিবাহিত জীবন এতই হেয় বলিয়া বিবেচিত যে, হীনতার পরিচয়স্বরূপ প্রাপ্তবয়স্ক অবিবাহিত পুরুষের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। আমেরিকার পেরু দেশে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে প্রতি

বৎসর, অথবা প্রতি দুই বৎসর, আপন শাসনাধীন প্রজাবর্গের মধ্যে সমস্ত চব্বিশ বৎসরের পুরুষ ও আঠার বৎসরের স্ত্রীলোকের বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইত। য়িহুদীদিগের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, "যে অবিবাহিত, সে মানুষ নহে।" তালমুদের বিধান অনুসারে রাজ-পুরুষেরা লোককে বিবাহ করিতে বাধ্য করিতে পারে। কোরিয়া রাজ্যে বিবাহিত তরুণ, অবিবাহিত প্রবীণকে প্রহার পর্য্যন্ত করিলেও, সেই অপ-মানিত, লাঞ্ছিত প্রবীণ বাক্যের দ্বারাও তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ নহে। প্রাচীন এথেন্স ও স্পার্টার নিয়মানুসারে অবিবাহিত পুরুষ অপ-রাধীর ন্যায় দণ্ডনীয় ছিল। প্রাচীন রোমে অবিবাহিত পুরুষের উপর একটা টেক্স নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখনও ইউরোপের কোন কোন দেশে বিবাহিত পুরুষ—বিশেষতঃ পুত্রবান পুরুষ—কতকগুলি সামাজিক অধিকার প্রাপ্ত হয়, যাহা অবিবাহিতের নাই। আমাদের মধ্যে বিবাহ একটা সংস্কার—সকলেরই পালনীয়। তবে আজকাল ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি সকলে মানিয়া চলে না।

এই যৌনসম্মিলন যে সহজেই ঘটে, এমন নহে। ইহার জন্য অনেক কাঠ খড় লাগে, অনেক সাধ্যসাধনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে অনেক কথা; সে এক বিচিত্র রহস্য। সে কথা বারান্তরে বলিব।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

চৈতন্যভাগবত।

বাল্মীকি, ব্যাস ও শঙ্করাচার্য্য, হিন্দুজাতির মনোবৃত্তির উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। ইহাঁদের প্রভাবে হিন্দুজাতি এত ধর্ম্মপরায়ণ ও পার্থিব সম্পদের উপর এত বিতৃষ্ণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষ ভারতমণ্ডলের খণ্ডবিশেষে আবির্ভূত হইয়া তত্তৎ প্রদেশের লোকদিগের উপর অল্পাধিকপরিমাণে আপনাদের ধর্ম্মভাব বিস্তার করিয়াছেন। মহাপুরুষের পদস্পর্শে পবিত্র হয় নাই, আসিয়া খণ্ডে এরূপ দেশ নিতান্ত বিরল। কিন্তু ভারতভূমি এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্য-

শালিনী। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ মহাপুরুষ চৈতন্যদেব ও তৎসঙ্গিগণের পবিত্র চরণস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে। চৈতন্যদেবের পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে অনেক মহাত্মার জন্ম হইয়াছিল।

বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণ প্রধানতঃ শাক্ত ও বৈষ্ণব নামক দুই ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত। বাঙ্গালায় কোনও সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানে ভারতের সর্ব্বত্র শৈব মতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যোগমগ্ন মহাদেবমূর্ত্তির প্রতি লোকে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিল। শৈবমতের প্রভাবেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিল। বঙ্গদেশ যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হয়, তখন এখানে শৈবধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে এদেশের কোন কোন অংশে বৈঁষ্ণবধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়। আচার্য্য হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে বাঙ্গালা দেশের হরিকেলীয় নাম লিখিত আছে। কিন্তু তাহার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালায় তন্ত্রশাস্ত্রের অত্যন্ত আলোচনা হইতে থাকে। বোধ হয়, বৌদ্ধেরা প্রথমতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবর্ত্তন করেন। সেনরাজগণের অধিকাংশ শাক্ত ছিলেন।

শাক্ত ও বৈষ্ণব, এই উভয় সম্প্রদায়ের নিকট বঙ্গভাষা ঋণী। শাক্ত হইতে বাঙ্গলা বর্ণমালা ও বাঙ্গলা পদ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বৈষ্ণব হইতে বাঙ্গলা পদ্য সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু শাক্তগণ বাঙ্গলা পদ্যে যে সরলতা দান করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবেরা তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণবগণ সৌন্দর্য্যের উপাসক। শাক্তেরা ভীমকান্তির উপাসক। পূর্ণচন্দ্রকরোদ্ভাসিত বাসন্তী রজনীতে বৈষ্ণবগণ অভীষ্টদেবের উৎসব করেন, শাক্তগণ ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন অমানিশীথে নৃমুণ্ডমালিনীর পূজা করিয়া আনন্দলাভ করেন। বাঙ্গলার শাক্তধর্ম্ম, বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ব্বতন। শাক্তগণ বৈষ্ণবদের নিকট হইতে কোনও মত গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু বৈষ্ণবগণ শাক্তদিগের তান্ত্রিক মত পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন। শাক্তগণের বঙ্গসাহিত্য অপেক্ষা বৈষ্ণবগণের বঙ্গসাহিত্য পরিমাণে প্রচুর। বৈষ্ণবধর্ম্মে সঙ্গীতের প্রাধান্য। বৈষ্ণবগণ বহুসংখ্যক পদাবলীর রচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎসমুদায়ের শব্দবিন্যাস এরূপ পরিপাটী যে, অর্থানুসন্ধানের পূর্ব্বেই শ্রবণমাত্র মন মোহিত হয়। শাক্তধর্ম্মে ধ্যানের প্রাধান্য। শাক্তদিগেরও ধর্ম্মসঙ্গীত আছে। যদিও তৎসমুদায় বৈষ্ণবপদাবলী

অপেক্ষা অল্পসংখ্যক, তথাপি—শ্যামাসঙ্গীত, শ্যামসঙ্গীত অপেক্ষা ভক্তিবৃত্তির উত্তেজক। বৈষ্ণবসাহিত্যপাঠে বঙ্গদেশের চারি শত বৎসর পূর্ব্বের সামাজিক অবস্থা উত্তমরূপে জানা যায়, কিন্তু শাক্তসাহিত্যপাঠে বাঙ্গলার কোন সময়ের অবস্থাই জানা যায় না। বৈষ্ণব মহাজনদিগের অনেক কথাই আমরা জানিতে পারি, কিন্তু শাক্ত সিদ্ধপুরুষ সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের ন্যায় ব্যক্তির বিষয়ও অল্পই জানা যায়। বৈষ্ণবেরা আপনাদের সম্প্রদায়স্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন, শাক্তেরা সেরূপ কিছুই করেন নাই। বাঙ্গলার বৈষ্ণবতীর্থগুলি এখনও সজীব আছে, কিন্তু বাঙ্গলার শাক্ততীর্থ মেহার, ক্ষীরগ্রাম, নলহাটী, চণ্ডীপুর ও পাতালচণ্ডীর নাম অল্প লোকেই জানে। ঐতিহাসিক ব্যক্তি বাঙ্গলার বৈষ্ণবদের সমাজ, সাহিত্য ও আচার ব্যবহারের আলোচনা করেন, কিন্তু শাক্তদের বিষয় পরিত্যাগ করিলে যে তাঁহার ইতিহাসের অর্দ্ধেক অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহা ভাবিয়া দেখেন না। তাঁহার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান প্রচারক্ষেত্র রাঢ়ভূমিতে এত শাক্ত পীঠস্থান কেন? বাঙ্গালার সমুদায় কালীস্থান, শিবমন্দির ও বিষ্ণুমন্দিরের ইতিহাস সঙ্কলিত না হইলে যে তাঁহার ইতিহাসসঙ্কলন সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না, ইহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

যখন চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন, তখন শাক্তগণ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী তখন ধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী, যোগিপাল ভোগিপাল ও মহীপালের গীত (১) ধর্ম্ম মনে করিত। সদ্যঃকৃত্ত নরমুণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া কালীর নিকট নৃত্য করাই পরম ধর্ম্ম মনে করিত। প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ অবজ্ঞাত ও উপহসিত হইয়া মনের দুঃখে কালযাপন করিতেন। চৈতন্যদেবের জন্মের পর বাঙ্গালীর মন সুপ্তোত্থিত হইয়া কিয়ৎকাল যে সজীবতা দেখাইয়াছিল, তাহাতে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগকেও বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে, চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত মত অল্প দিনের মধ্যেই বিকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, আমরা প্রাচীন বৈষ্ণবসাহিত্যপাঠে ইহা অবগত হইতে পারি। সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে চৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি অতি প্রাচীন।

চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধানের সময় চৈতন্য ভাগবত-প্রণেতা বৃন্দাবন দাস যুবা-পুরুষ। বৃন্দাবন দাসের মাতা নারায়ণী দেবী চৈতন্যের নৃত্যভবনাধিকারী শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী। নারায়ণী দেবী চৈতন্য দেবের নৃত্যলীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস, চৈতন্যের অভিন্নতনু নিত্যানন্দের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। বৃন্দাবন দাস মাতার নিকট, নিত্যানন্দের নিকট ও চৈতন্যের সহচরবৃন্দের নিকট শুনিয়া শ্রুত বিষয়গুলি গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। যাঁহাদের নিকট শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই চৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। সমসাময়িক দৃষ্ট ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। আবার বিশ্বাসী-দের মধ্যে অনেক বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। আমাদিগকে অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান না ভাবিলে আমরা তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিতে পারি না। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের প্রতি বৃন্দাবন দাসের ঈশ্বরবুদ্ধি হইয়াছিল। কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিলে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। বৈষ্ণবেরা মনে করিতেন, চৈতন্যদেব যখন ঈশ্বর, তখন তাঁহাতে সকলই সম্ভব, সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থে কোন কোন অলৌকিক ঘটনাও লিখিত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাসও তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে শ্রুত ঘটনাগুলির অবিকল বর্ণনা করিতে পারেন নাই, অথবা তিনি চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে অতিরঞ্জন হইয়াছিল। সরলচিত্ততাবশতঃ অবিশ্বাস করেন নাই। তথাপি সমুদায় বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে প্রকৃত ঘটনা বহুল-পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ চৈতন্যভাগবত অপেক্ষা পরিমাণে বৃহৎ। উহা বৈষ্ণবদিগের একখানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ। চৈতন্যচরিতামৃত বৃন্দাবনে প্রণীত হয়। উহাতে গোস্বামি-গণের মত বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যভাগবত পাঠ করিলে দেখিতে পাই, চৈতন্যদেব গোপীভাবে উন্মত্ত হন নাই, বিষ্ণু ও বিষ্ণুশক্তির ভাবে আবিষ্ট হইয়া নৃত্য গীত করিয়াছেন মাত্র। রাধা রাধা বলিয়া কখনও পাগলের ন্যায় হন নাই। চৈতন্যভাগবতে রাধা নাম নাই। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণের গায়ে রাধার অঙ্গকান্তি মাখাইয়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাব করাইয়া-ছেন। রূপ ও সনাতন ব্রজলীলার বিষয়ে বিস্তর গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। রূপ ও রঘুনাথদাস গোস্বামী ব্রজলীলার পরকীয় রসের রসিক ছিলেন। পরকীয়

ভজন বৃন্দাবনধামে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃতের বঙ্গদেশে আগমনের পূর্ব্বে বোধ হয় এ ভাব বঙ্গদেশে পুষ্টিলাভ করে নাই। চৈতন্য-দেবের প্রকৃত মত কি, এখন তাহা ঠিক জানা যায় না। এইমাত্র জানা যায় যে, চৈতন্যদেব আপনাকে দাস বলিয়া অভিমান করিতেন। কথনও কথনও আবিষ্ট হইয়া "মুঞি সেই মুঞি সেই" বলিয়া প্রকাশ করিতেন, কিন্তু অনাবেশের সময় আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিতেন না। যেদিন অদ্বৈতের অনুরোধে বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের নামে প্রথমে সঙ্কীর্ত্তন করেন, সেদিন চৈতন্যদেব অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন। চৈতন্যভাগবত পাঠ করিলে চৈতন্যদেবের মত কিছু কিছু জানিতে পারা যায়; কিন্তু পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগ্রন্থে জয় গোস্বামীর মতমাত্র জানা যায়।

যে গ্রন্থ চৈতন্যদেবের যত পরবর্ত্তী, তাহাতে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা তত অধিক; এই জন্য চৈতন্যভাগবত অপেক্ষা চৈতন্যচরিতামৃতে অলৌকিক বর্ণনা অধিক। চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, চৈতন্যদেব সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইলে নবদ্বীপের কাজি লোকসংঘট্ট দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। কবিরাজ গোস্বামী কাজি ও চৈতন্যের সাক্ষাৎ করাইয়া কত কথারই অবতারণা করিয়াছেন। কাজির স্বপ্নবৃত্তান্তের বর্ণনা করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসকে গৌরলীলার বেদব্যাস বলিয়াছেন; তিনি বৃন্দাবনের গ্রন্থও পাঠ করিয়াছিলেন; তথাপি অতিরিক্ত বর্ণনা করিলেন কেন? বোধ হয়, ওরূপ বর্ণনায় কোনও দোষ নাই বিবেচনা করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ও কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহ চৈতন্যদেবের সাক্ষাতের বৃত্তান্ত বৃন্দাবনদাস সরলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু চৈতন্য দেবের নিকট সার্ব্বভৌমের বেদান্তপাঠ ও প্রকাশানন্দের সহ বিচার, কৃষ্ণদাসের মানস সৃষ্টিমাত্র।

বৃন্দাবন দাসের জীবদ্দশাতেই বৈষ্ণবদিগের মধ্যে দলদলির সৃষ্টি হইয়াছিল। সে সময়ে কেহ অদ্বৈতকে, কেহ নিত্যানন্দকে ঈশ্বর বিবেচনা করিয়া, নিত্যানন্দ বা অদ্বৈতের নিন্দা করিত। নিত্যানন্দ ও স্বরূপ দামোদর প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। ইহাঁরা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও সন্ন্যাসের অভিমানমূলক দণ্ড কমণ্ডলু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য ইহাঁদের নামের সহ 'স্বরূপ' শব্দ সংযুক্ত হইয়া নিত্যানন্দ স্বরূপ ও স্বরূপ দামোদর হইয়াছে।

বতে মুসলমানদের দৌরাত্ম্য সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। আজ কাল এক দল লেখক মুসলমান রাজগণকে প্রশংসাপত্র দিবার জন্য বড়ই আগ্রহবান্ হইয়াছেন; তাঁহারা যেন সে সময়ের রচিত গ্রন্থগুলি পাঠ করেন। কথায় কথায় সামান্য সামান্য ঘটনায় হিন্দুর জাতি যায়। জাতি লইব বলিলে হিন্দু ভয়ে অস্থির হইত। মুসলমানেরা হিন্দুকে জব্দ করিবার এমন সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই; কিন্তু মুসলমানেরা নবদ্বীপের বড় বড় পণ্ডিতের সম্মান করিতেন। নবদ্বীপ তৎকালে প্রকাণ্ড নগর ছিল। বাঙ্গলার দূরবর্ত্তী অঞ্চলের বিষয়ী লোকদের অনেকের নবদ্বীপে এক একটি বাড়ী ছিল। নবদ্বীপ গৌড় রাজ্যের সরস্বতীপীঠ ছিল। নবদ্বীপ অধিকারে থাকায়, গৌড়পতিগণ আপনাদিগকে সম্মানিত মনে করিতেন। এমন নবদ্বীপের উপরও অত্যাচার হইত। অত্যাচরিত হিন্দুদিগের মধ্যে একটি জনপ্রবাদ ছিল যে, গৌড়নগর পুনরায় ব্রাহ্মণ নরপতির শাসনাধীন হইবে। তাহারা সর্ব্বদাই সেই রাজার আগমনপ্রতীক্ষা করিত। মুসলমানেরা সশঙ্কচিত্তে নবদ্বীপবাসিগণের ক্রিয়াকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিত।

চৈতন্যভাগবত পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, সে সময়ে নবশাখ ও সুবর্ণবণিগাদি জাতি হিন্দুসমাজে নিতান্ত হেয় ছিল। নবধর্ম্ম, প্রথমতঃ সমাজের নিম্নস্তরে প্রচারিত হয়; যাঁহারা সমাজের উচ্চচূড়ায় বসিয়া সমুদায় সুবিধা উপভোগ করেন, সে সকল সম্ভ্রান্ত লোক আপনাদের আধিপত্যের খর্ব্বতাভয়ে নবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চান না। চৈতন্যদেব নবদ্বীপের তন্তবায়, গন্ধবণিক্ ও মালাকারদের ভবনে গমন করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের প্রকৃতি এমন উদার ছিল যে, তিনি অসঙ্কোচে শূদ্রালয়ে আহার ও শূদ্রদিগের হাতের জলগ্রহণ করিতেন। সুবর্ণবণিক্গণ নিত্যানন্দের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সুবর্ণবণিক্জাতীয় উদ্ধরণ দত্ত নিত্যানন্দের নিত্যসহচর ছিলেন।

ভাষার হিসাবে চৈতন্যভাগবত একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যময়ী নিরাভরণা ভাষা পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয়। কাহাকেও সন্তুষ্ট করিবার জন্য এ গ্রন্থ রচিত হয় নাই। আত্মতৃপ্তি ও আত্মশোধনের উদ্দেশ্যেই ইহার রচনা। আমরা দেখিতে পাই, এক কালে বঙ্গীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি নবদ্বীপ অঞ্চলের ভাষা এখন বাঙ্গলার উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা কোনও সময়ে পশ্চিম বঙ্গেও প্রচলিত

ছিল। যদি বৃন্দাবনদাস পাণ্ডিত্যপ্রকাশের জন্য ব্যস্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা বাঙ্গলা ভাষার তদানীন্তন রূপের পরিচয় পাইতাম না।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে সুন্দর সুন্দর উপদেশ আছে। তৎ-সমুদায়ের কতকগুলি উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন কৃষ্ণ-শব্দে পরমেশ্বর বুঝেন।

বৈষ্ণব হিংসার কথা সে থাকুক দূরে।
সহজ জীবেরে যে অধম হিংসা করে॥
বিষ্ণু পূজিয়াও প্রজার দ্রোহ করে।
পূজাও নিষ্ফল হয় আরো দুঃখে মরে॥
এক সিদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈঞা বৈসে সভার হৃদয়॥
যে যে গুণে মত্ত হৈ করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥
অহঙ্কার দ্রোহ মাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত ফল তার না জানয়ে পাছে॥
দেখি মূর্খ দরিদ্রেরে সুজনে যে হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ কর্ম্মদোষে॥
জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে।
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পরচর্চ্চকের গতি কভু নহে ভালে॥
নিন্দায় না বাঢ়ে ধর্ম্ম সভে পাপলাভ।
এতেকে না করে নিন্দা কোন মহাভাগ॥
দেখি মূর্খ দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে।
তার পূজাবিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত সব মোর দাস।
এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ॥
বাহু তুলি জগতেরে বোলে গৌরধাম।
অনিন্দক হোয়ে সবে বোল কৃষ্ণনাম॥
চণ্ডালেহ মোহর শরণ যদি লয়।
সেহ মোর মুঞি তার জানিহ নিশ্চয়॥
কুলে রূপে ধনে বা বিদ্যায় কিছু নহে।
প্রেমযোগে ভাবিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে॥
শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥
সংযোগ বিয়োগ যত সেই করে নাথ।
তার ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিব সর্ব্বত্র।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

কবিতা-কুঞ্জ।

বর্ষাগমে।

বরষা এসেছে আজি লয়ে নব মেঘরাজি
গগন ঘিরে,
এস তুমি স্বপ্নময়ী অন্তরবাসিনী অয়ি
এস গো ফিরে'।
ঘন অন্ধকার দিন
তপন-কিরণ-হীন
সুদূর প্রান্তর লীন
নীরদ নীরে।
আজি তুমি এস অয়ি আমার স্বপনময়ি,
এস গো ফিরে'।

গুরু গুরু মেঘস্বর অবিরাম ঝর ঝর
বাদল ঝরে,
চপলা লুকায় মুখ চকিতে মেঘের বুক
উজল করে'।
তটিনী যৌবনাকুল,
পরিপূর্ণ দু'টি কূল,
বহে যায় কুলু কুল
আবেগভরে।
আজি ঘন মেঘস্বর অবিরাম ঝর ঝর
বাদল ঝরে।

বনে বনে শত শত কেতকী কদম্ব কত
উঠেছে ফুটি',
বহে বেগে সমীরণ কাঁপায়ে বকুল-বন
সুরভি লুটি'।
শূন্য পথ সিক্ত ম্লান,
বিহগ গাহে না গান,
খেলে শুধু ক্ষুব্ধ প্রাণ
চাতক দুটি।
বহে বেগে সমীরণ কাঁপায়ে বকুল-বন
সুরভি লুটি'।

আজি তুমি এস তবে এস ফিরে সগৌরবে
বরষা মম;
নিবিড় নীরদ কেশ অমল শ্যামল বেশ
সুচারুতম।
তপ্তবক্ষে অবিরল
ঢাল পুণ্য অশ্রুজল
ফুটাও কুসুমদল
হৃদয়ে মম।
আজি তুমি এস তবে নবরূপে সগৌরবে
বরষা মম।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

বর্ষা।

বর্ষ পরে ফিরে বর্ষা! এসেছ আবার,
এলাইয়া তরঙ্গিত জলদ-কুন্তলে;
ধরেছ অপূর্ব্বরূপ শোভার আধার,
কুটজ পুষ্পের হার দোলাইয়া গলে;
কোন্ স্বর্গ-স্বপ্ন তুমি বিরহি-নয়নে
বিকচ সৌন্দর্য্য রুচি ঢালি রাগভরে?
চিত্রকর হেরি তৃপ্ত, কি বর-বরণে
সমুজ্জ্বল ইন্দ্রধনু চিত্রিত অম্বরে!
তুমি ঋতুকুলেশ্বরী,—পরশে তোমার
সঘনে বিকশি উঠে ধরার যৌবন;
তাই অর্ঘ্যরূপে পদে দেয় উপহার
শ্যামল কুঞ্জের ডালি প্রকৃতি শোভন।
বক্ষে নীল বাস—কর্ণে কদম্বের ফুল,
শোভে কিবা অঙ্কে লয়ে মরাল অতুল!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

বঙ্গদর্শনের প্রতি।

[নব-পর্য্যায়ে।]

পূর্ব্বে, তোমার ললাটে ছিল যে মহিমা,—
নব-গৌরব-দীপ্তি;—
ফিরে কি আসিবে লইয়া আবার
সেই সে অতুল তৃপ্তি!
এবে নাহি সে চন্দ্র—রজনী অন্ধ,
এগো ক্ষুদ্র খদ্যোৎ-ব্যাপ্তি!
তবু হলে অন্ধকার—চির নৈরাশ
না হয় জগতবাসী।
সদা হৃদয় দুরাশ চাহে ফিরে ফিরে
পুন সে পূর্ণিমা-হাসি।
পুনঃ ছড়ায়ে বিমল ভাতি,
ফিরে আসে ত মাধবী রাতি!
আজি আকুল নয়ন সলিলভারে,
ভরিয়া আসিছে স্মরিতে তাঁরে;

তাই নবীন বর্ষে বিষাদে হর্ষে
বহিয়া অর্ঘ্য-ডালি,
—যিনি নূতন মন্ত্র পড়িয়া অঙ্গে
দিলা নবপ্রাণ মুমূর্ষু বঙ্গে—
দিনু তাঁহারই চরণে ঢালি!

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

প্রিয়ার প্রতি কবি।

আমাতে খুঁজি'ছ বুঝি কবিরে তোমার?
বৃথা অন্বেষণ।
তোমার যৌবন সম পুষ্পিত—কোমল,
শতছন্দে ক্রীড়াশীল ভাষা সমুজ্জ্বল
সে কি মোর রচনায় বিকশিয়া উঠে—
নিত্য যদি চিত্তে তব মূর্ত্তি নাহি ফুটে,
অয়ি ব্যর্থ জীবনের সার্থক সাধন?

তোমার আঁখির সম, অয়ি নিরুপমা,
নিত্য নব শোভাময় সহস্র উপমা
জাগে কি আমার মনে, তোমার শোভায়
বিশ্বের সৌন্দর্য্য যদি লাজ নাহি পায়—
দগ্ধমরু-হৃদে অয়ি সুধা-প্রস্রবণ?

তোমার প্রেমের মত অগাধ—অপার
ভাবরাশি বহে কি এ হৃদয়ে আমার,
উচ্ছ্বসি' না উঠে যদি এ হৃদয় মম
হেরি' তোমা—চন্দ্রোদয়ে সিন্ধুবারি সম
ব্যথিত হৃদয়ে অয়ি সুখের স্বপন?

তোমারি সহস্র শোভা, অয়ি সুলোচনা,
আমার হৃদয়ে করে আসন-রচনা;
তা'দেরি পরশ-রসে উঠে বিকশিয়া
কবিতার রক্তোৎপল উজলিয়া হিয়া।

তোমারি সে কবি, মুগ্ধা, তোমারি রচন;
আমাতে কোথায় পা'বে তা'র দরশন?

খাঁটী সত্য।

আমার প্রিয়ার নয়ন নহেক
হরিণীর চেয়ে ভালো;
আঁখিতারা তার কালো বটে,—নয়
ভ্রমরের চেয়ে কালো;
চঞ্চল আঁখি-ইঙ্গিতে কভু
খঞ্জন নাহি নাচে;
বেণীর তুলনা শুনিয়া-নাগিনী
লাজে না লুকায়ে বাঁচে;
মুখখানি দেখি চাঁদ বলি কারো
ভুলেও হয় না ভুল;
দন্তরুচির কান্তি লভিতে
ফোটে না কুন্দ ফুল;
মধুর অধরে মধু আছে, তবু
ভ্রমর নাহিক ভুলে;
কালো মেঘ ভেবে আকাশের তারা
ফুটিতে আসে না চুলে;
পাগল নহিলে বলিবে না কেহ
কথায় অমিয়া ঝরে,—
হাসির সহিত তুলনা হেরিয়া
জ্যোছনা হাসিয়া মরে;
চারুচরণের নূপুর-শিঞ্জিতে
হংসী চাহে না ফিরে;
চরণ ফেলিতে কোন বনফুল
ফোটে না চরণ ঘিরে।
সব মানি, তবু প্রিয়ার আমার
কি জানি কি শোভা আছে;
বিশ্বমথন সুষমা-রতন
ধূলিসম যার কাছে;
সারা দেহময় কি জানি কি রূপ
আছে সদা পরকাশি,
যাহার লাগিয়া নিখিলের আগে
তারে আমি ভালবাসি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

শ্রীক্ষেত্র।

ভারতের পুণ্যতীর্থ ধর্ম্মক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র দর্শন করিলাম। যখন এ দেশে রেলগাড়ী হয় নাই, যখন এই বিশাল সাম্রাজ্যের নানা প্রান্ত হইতে যাত্রীর দল পদব্রজে ঘোরবিপদসঙ্কুল অরণ্যপথ অতিক্রম করিয়া দেবদর্শনোদ্দেশে আগমন করিত, তখন শ্রীক্ষেত্রের নাম প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত পূজিত হইত। শ্রীক্ষেত্র তখন পরলোকের সুবর্ণময় দ্বার বলিয়া বিবেচিত হইত। বাস্তবিকই সে বহুক্লেশকর সাধনায় পারলৌকিক পুরস্কার স্বাভাবিক। এখন আমরা মুহূর্ত্তের সঙ্কল্পে শ্রীক্ষেত্রে আসিতে পারি! আফিসের ছুটি হইলেই শ্রীক্ষেত্রে যাইবার কথা মনে হয়। কিন্তু পরলোকের দ্বার বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। আর সে দুঃসহ পথক্লেশ সহ্য করিতে হয় না, পরলোকের নিশ্চয়তা আর মরণের অন্ধকারময় পথে আশার আলোক প্রদান করে না। সরলবিশ্বাসলব্ধ শান্তির পরিবর্ত্তে বিজ্ঞানের সন্দেহবহুল সিদ্ধান্ত লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট।

> "It was a childish ignorance
> But now it's little joy
> To know I'm further off from Heaven
> Than when I was a boy"—*T. Hood.*

এখন শ্রীক্ষেত্র নামটি পর্য্যন্ত antiquated বলিয়া মনে হয়। ছেলেবেলাকার 'শ্রীক্ষেত্র', 'পুরুষোত্তম', 'ঠাকুরবাড়ী' এখন 'পুরী'। নামগুলি চলিয়া যাইতেছে, তাহার সঙ্গে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু পবিত্র ছিল, তাহাও লইয়া যাইতেছে। শ্রীক্ষেত্র—পুরী একই স্থান; কিন্তু সংজ্ঞা (connotation) কত বিভিন্ন। শ্রীক্ষেত্র বলিতে পুণ্যতীর্থ, মানবের মুক্তির স্থল বুঝাইত; পুরী বলিতে জেলা, রেলওয়ে ষ্টেশন ও সমুদ্রানিলবীজিত স্বাস্থ্যকর স্থান বুঝায়। উভয়ে কত প্রভেদ।

শ্রীক্ষেত্রের দেবমন্দির ভারতের একটি বিরাট কীর্ত্তি। দুর্গপ্রাকারের ন্যায় অত্যুচ্চ প্রাচীরের দ্বারা মন্দির পরিবেষ্টিত। সুপ্রশস্ত রাজপথ মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়াছে, এবং চারি দিকে চারিটি প্রকাণ্ড প্রবেশদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিয়া যাত্রিগণকে আহ্বান করিতেছে। পূর্ব্বদ্বারটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, এবং সেইটিই সিংহদ্বার নামে অভিহিত। সিংহদ্বারের সম্মুখে

উড়িষ্যার মন্দিরগুলি পূর্ব্বাভিমুখী এবং পূর্ব্বদ্বারের পুরোভাগে এক একটি অরুণস্তম্ভ। বঙ্গদেশে এরূপ কোনও নিয়ম লক্ষিত হয় না। তবে সাধারণতঃ বঙ্গের দেবমন্দিরগুলি দক্ষিণমুখ ; বোধ করি, গ্রীসের দেবমন্দিরগুলি উড়িষ্যার ন্যায় কোন নিয়মের অধীন ছিল ; কারণ, গ্রীসের মন্দিরদ্বারও পশ্চিমদিকে অবস্থিত। উড়িষ্যার দেবমন্দির পূর্ব্বাভিমুখ হইবার উদ্দেশ্য এই যে, বালাতপের প্রথম কিরণলেখা মন্দিরাভ্যন্তরে নিপতিত হইতে পারে।

মন্দিরের উচ্চপ্রাঙ্গন প্রস্তরে মণ্ডিত। এই বিস্তৃত প্রাঙ্গণের উপর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি দেবদেবীর মন্দির আছে। বহুদূর হইতে তিনটি চূড়া দেখা যায় ;—তাহার ক্ষুদ্রটি সিংহদ্বারের চূড়া, দ্বিতীয়টি ভোগমন্দিরের, এবং তৃতীয় ও উচ্চতমটি শ্রীমন্দিরের চূড়া। পূর্ব্বে যেখান হইতে মন্দিরের ধ্বজা প্রথমে দেখা যাইত, সেইখানে পাণ্ডারা যাত্রীদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ আদায় করিয়া লইত। দূর হইতে দেউলের দৃশ্যটি অতি মনোরম। গগনগাত্রবিলম্বিত, অভ্রমালাচুম্বিত মন্দিরচূড়া যেন স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তীরূপে বিরাজমান। মেঘলোকের সে নির্জ্জন রাজ্যে লোহিত ধ্বজাটি অতি সুন্দর দেখায়। আর একাদশীর দিন যখন সন্ধ্যাদীপ দিবার জন্য পাণ্ডাগণ ঈশ্বরনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দেউলের অত্যুচ্চ চূড়ায় আরোহণ করে, তখন শত শত কণ্ঠে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইয়া স্থানটিকে অপূর্ব্ব মহিমায় পূর্ণ করিয়া ফেলে।

মন্দিরাভ্যন্তরে একটি 'গরুড়স্তম্ভ' আছে, সেই স্তম্ভটিকে আলিঙ্গন প্রণাম করিয়া পরে জগন্নাথ দর্শন করিতে হয়। চৈতন্যদেব এই গরুড়-স্তম্ভের নিকট হইতে দেবদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া আজিও স্তম্ভটির প্রতি এইরূপ সম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মন্দিরের অনেক স্থলে কৃষ্ণমর্ম্মরের কারুকার্য্য দেখিয়া এ দেশীয় প্রাচীন শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরের যে স্থানে 'ঠাকুর' অধিষ্ঠিত, তাহাকে 'রত্নবেদী' বলে, কথিত আছে। লক্ষ নারায়ণশিলা প্রোথিত না হইলে একটি রত্নবেদী প্রস্তুত হয় না। এই রত্নবেদীর উপর জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের দারুময়ী মূর্ত্তি। প্রবাদ আছে, এই দেবকল্পিত দারু এক শবরের গৃহ হইতে আনীত হইয়াছিল। সেই জন্য অদ্যাপি জগন্নাথ শবরপ্রদত্ত ভোগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবং ইহাই শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদরাহিত্যের হেতুস্বরূপ উল্লিখিত

আছে। যখন প্রথিতনামা মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এই বিশাল মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন করেন, তখন তিনি একমাত্র ব্রহ্মাকেই এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিবার যোগ্য মনে করিয়া তাঁহার সমীপে গমন করেন। ব্রহ্মা সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতে বলেন। ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত! কাজে কাজেই ইন্দ্রদ্যুম্নকে বিনা বাক্যব্যয়ে যুগ-যুগান্তর সেখানে অতিবাহিত করিতে হইল। বিধাতা যখন মন্দিরপ্রতি-ষ্ঠার জন্য আগমন করিলেন, তখন সে ক্ষেত্রে ইন্দ্রদ্যুম্নের এক জন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত। গালমাধব-নামক এক জন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্দির অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, এ মন্দির তাঁহারই, তিনিই ইহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। স্বয়ম্ভু বড়ই বিপদে পড়িলেন। মন্দিরের স্বত্ব সাব্যস্ত না হইলে প্রতিষ্ঠা করিবেন কিরূপে? সঙ্কল্পই বা কাহার নামে হইবে? ব্রহ্মা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সেখানে ভূষণ্ডী কাক আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা তাহার নিকট বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, ইন্দ্রদ্যুম্নই এই মন্দিরের নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তবে তিনি যে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে সমুদ্রের বালুকারাশি মন্দিরকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। এক দিন গালমাধব রাজা অশ্বারোহণে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন; সহসা মন্দিরের নীলচক্রে বাধিয়া তাঁহার অশ্ব ভূপতিত হয়। তাহার পর গালমাধব রাজা বহুপরিশ্রমে বালুকা হইতে এই মন্দিরের উদ্ধার করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের কীর্ত্তি পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন।" এই সাক্ষ্য দিবার ফলে কাকপ্রবর চতুর্ভুজ হইয়া মন্দিরের একপার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন। সে স্থানকে কাকতীর্থ বা রোহিণীকুণ্ড বলে। ইহার জল স্পর্শ করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

পুরী উড়িষ্যার মধ্যে ক্ষুদ্রতম জেলা, কিন্তু যাত্রা অর্থাৎ যোগের সময় ইহা জনাকীর্ণ মহানগরীর ন্যায় হইয়া উঠে। পুরীতে প্রস্তর-বাঁধান কয়েকটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। 'যাত্রার' সময়ে এগুলি অতি সুন্দর দেখায়। পুষ্করিণীগুলির মধ্যে 'নরেন্দ্র'ই সুন্দর ও বৃহত্তম। ইহার তীরস্থ উদ্যা-নের মধ্যে স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রম ও সমাধিস্থান বিদ্যমান আছে।

সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া শ্রীক্ষেত্রের গৌরব অন্যান্য তীর্থ অপেক্ষা অনেক অধিক। বস্তুতঃ শ্রীক্ষেত্রে যেমন দেবতা, জগন্নাথ; দেবী বিমলা; সেইরূপ তীর্থ মহোদধি। মন্দির হইতে সমুদ্র প্রায় অর্দ্ধ মাইল

যে পথে সমুদ্রে যাইতে হয়, তাহাকে স্বর্গদ্বার বলে। লোকে এই পথে গিয়া সমুদ্রদর্শন ও স্নান করিয়া বিগতপাপ হয়। পুরীর অধিবাসীরা সকল সময়েই জলরাশির জলদগম্ভীর মন্দ্রধ্বনি শুনিতে পায়—আর যখন ঘনকৃষ্ণ জলদজাল আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বিজলীচ্ছটায় ঘন ঘন গগনবক্ষ উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকে, এবং পবন দেব মত্ত বৃষভের মত উচ্ছ্বসিত সমুদ্রবক্ষে বপ্রক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন, তখন অসংখ্য কামান-গর্জ্জনের ন্যায় শব্দে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইতে থাকে, এবং বাতাসের শব্দে প্রকৃতির সকরুণ দীর্ঘশ্বাস বহিতে থাকে। পুরী যাইবার সময়ে সমুদ্র দেখিবার জন্য এত আগ্রহ হইয়াছিল যে, সমুদ্র দেখিয়া আমার সে আগ্রহ পরিতৃপ্ত হইবে কি না, সন্দেহ হইতেছিল। কারণ, বাস্তব অত্যন্ত সুন্দর হইলেও তাহা কল্পনালোকের সৌন্দর্য্যের তুলনায় দীন ও ম্লান। কিন্তু আমার সন্দেহ অধিকক্ষণস্থায়ী হইল না। সমুদ্রদর্শন করিয়া যে প্রভূত আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা কল্পনাতেও অনুভব করিতে সক্ষম হই নাই। আমরা যখন সমুদ্রতীরে উপনীত হইলাম, তখন সূর্য্যাস্তের অধিক বিলম্ব ছিল না, দিগন্তবিশ্রান্ত লবণাম্বুরাশি অনন্ত তরঙ্গভঙ্গে উদ্বেলিত হইতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের স্নিগ্ধ রশ্মি সমুদ্রনীরে নানাবর্ণের সৃষ্টি করিতেছিল। শুভ্র ফেনপুঞ্জে বেলাভূমি মণ্ডিত হইয়াছিল, আর ইতস্ততঃ আস্তীর্ণ পূজার ফুল সেই শুভ্র বেলাকে কচিৎ রঞ্জিত করিতেছিল। দূরে—অতিদূরে সমুদ্রের গাঢ় হরিত রেখা উজ্জ্বল নীল গগনপরিধিকে আলিঙ্গন করিতেছিল। অনন্তের কোলে অনন্তের অপূর্ব্ব সমাবেশ! যাহার সান্নিধ্যে সংসারের সমস্ত ভাবনা দূর হইয়া হৃদয়ে মহান ভাবের আবির্ভাব হয়, যাহার প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য উদ্দামপ্রবৃত্তিনিচয়কে মুহূর্ত্তে শুব্ধ করিয়া ফেলে, সেই মহোদধি বাস্তবিকই তীর্থনামের উপযুক্ত।

সমুদ্রতীরে অনেকগুলি মঠ আছে। সেখানে সাধু সন্ন্যাসীরা অবস্থান করেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের ভোগবর্দ্ধন মঠ ইহাদের মধ্যে প্রধান। এই মঠে অনেকগুলি পুরাতন পুঁথি আছে। এই সকল পুঁথি হইতে অনেক অমূল্য তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ স্বামী ইহার একটি মঠে বাস করিতেছিলেন। এইরূপ শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন স্থানই সাধনার সহায়। আমার এক জন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুর অনুগ্রহে আমি স্বামীজীর সহিত আলাপ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হই। আমরা সেদিন তাঁহার মঠে নিমন্ত্রিত

তাঁহার আলাপে ও হাসিতে এত সরলতা ও আন্তরিকতা পরিব্যক্ত যে, তাহা শিশুর স্থায় শান্ত ও মধুর বলিয়া বোধ হয়। স্বামীজীর ব্যবহার দেখিলে মনে হয় যে, যে প্রেম পরিবারের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ নহে, কেবল সেই প্রেমই শতধা উৎসারিত হইয়া বিশ্ব সংসারকে আলিঙ্গন করিতে পারে। আমরা সমস্ত দিনমান সেই মঠে অতিবাহিত করিলাম। সূর্য্যকিরণ-সম্পর্কে প্রতিক্ষণে সমুদ্রের বর্ণপরিবর্ত্তন আনন্দের সহিত উপভোগ করিতেছিলাম। বহু দূরে ধীবরদিগের মস্তক তরঙ্গভরে কচিত উন্নমিত হইয়া আবার অদৃশ্য হইতেছিল। কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ রজ্জু দ্বারা একত্র গ্রথিত হইয়া ইহাদের নৌকা কল্পিত হইয়া থাকে, এবং এই নৌকা বা ভেলায় করিয়া ইহারা দেড় মাইল দুই মাইল দূরে মৎস্য ধরিতে যায়। যখন ইহারা মৎস্য ধরিয়া তীরে আগমন করিল, তখন অনেকগুলি সামুদ্রিক পক্ষী তাহাদের অতিথিস্বরূপে অতি নিকটে আসিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। ইচ্ছা করিলে মৎস্যব্যবসায়ীরা এই পক্ষীগুলিকে অনায়াসে ধরিতে পারে। কিন্তু প্রভূত অর্থের প্রলোভনেও ইহারা এই সকল পক্ষী ধরিতে সম্মত হয় না। শ্রমলব্ধ মৎস্যের দ্বারা ইহারা এই সকল অতিথির সৎকারেও ত্রুটি করে না।

সমুদ্রস্নান সমুদ্রদর্শনের ন্যায়ই আনন্দদায়ক। সেদিন 'লহরী'র মধ্যে স্নান করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। সমুদ্রের শোভা বিলাসের একটি উপাদান। সুনন্দা পতিংবরা ইন্দুমতীকে কলিঙ্গনাথের পরিচয়ে এই বিলাসিতার প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন,—

যমাত্মনঃ সদ্মনি সন্নিকৃষ্টঃ মন্দ্রধ্বনিত্যাজিতযামতূর্য্যঃ।
প্রাসাদবাতায়নদৃশ্যবীচিঃ প্রবোধয়ত্যর্ণব এব সুপ্তম্॥

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। আষাঢ়। বর্ষায় প্রবাসী যেন 'কনক-বলয়-ভ্রংশ-রিক্তপ্রকোষ্ঠঃ';—স্ফূর্ত্তিহীন, ম্রিয়মাণ, নিতান্ত দীন। এবার সুখপাঠ্য সুপ্রবন্ধের অত্যন্ত অভাব। কদম্বকেতক-সুরভি মেঘমেদুর বর্ষায় কবিচিত্তে রসোচ্ছ্বাস সম্ভব ও স্বাভাবিক; কিন্তু 'প্রবাসী'র

কবিচিত্ত হইতে রচনার পেয়ালায় ঢালিতে ঢালিতেই সে রসের সৌরভ ও স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রসোদ্গার সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র সফল হইবে, এমন আশা করা যায় না। "বিংশ শতাব্দীর বর" পুরাতন সং; সুকবি নূতন সাজে সাজাইয়াও তাহাকে মনোজ্ঞ করিতে পারেন নাই। অমৃত-রচিত অমর প্রহসন 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র বর্ণরাগসমুজ্জ্বল চিত্রাবলী এখনও সাহিত্যে ও সমাজে জাজ্বল্যমান। তাহার পার্শ্বে "বিংশ শতাব্দীর বর" নিতান্ত নিষ্প্রভ ও প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। কবির অভীষ্ট বিদ্রূপ আড়ম্বরে সমাচ্ছন্ন ও নিতান্ত প্রচ্ছন্ন, উপভোগ করিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ, বঙ্কিম বাবুর ভাষায় তিনি লাঠিয়ালের মত রসিক;— নিতান্ত মরিয়া হইয়া মোটা বাঁশের লাঠী চালাইতেছেন, কাহার সাধ্য অগ্রসর হয়? আর রাঙ্গাদিদির জন্য উদ্বেগের সীমা থাকে না,— কবির ঝালে ঝোলে অম্বলে একমাত্র সম্বল ঐ রাঙ্গাদিদি।—এই লাঠীর সান্নিধ্যে তাঁহাকে হাস্যমুখে নিঃশঙ্কে বিচরণ করিতে দেখিয়া উদ্বেগের সীমা থাকে না। তিনিই ত কবির হাস্যরস-ফোয়ারার চাবি? লাঠীর আঘাতে চাবিটি চূর্ণ হইয়া না যায়,—এই আমাদের কামনা। রাঙ্গাদিদি গেলে একলা বিন্দি কি আসর রাখিতে পারিবে? 'বরে'র ছন্দে ও ভাষায় সুনিপুণ কবির কারু রচনার পরিচয় সুস্পষ্ট, এবং তাহা উপভোগযোগ্য। কিন্তু তাঁহার রুচির প্রশংসা করা যায় না। বিষয়নির্ব্বাচনের দোষে এমন উপাদান ব্যর্থ হইতে দেখিলে কাহার না দুঃখ হয়? "বিবিধ প্রসঙ্গ" পাঁচ ফুলের সাজি, এক রাশি,—অধিকাংশই ঘেঁটু। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "উপকথাতত্ত্ব" নামক উৎকৃষ্ট নিবন্ধটি এবার 'প্রবাসী'র গৌরবরক্ষা করিয়াছে। লেখক বলিতেছেন,—"আমাদের দেশে আজ এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও অনেকে এই বিজ্ঞানের অস্তিত্বের বিষয়ও সম্যক্ জ্ঞাত নহেন। উৎকৃষ্টতর নামের অভাবে ইহাকে উপকথাতত্ত্ব (Folklore) বলা যাইতে পারে। ইহা সাধারণ মানবতত্ত্বের একটি বিভাগ। * * * নভোমণ্ডলের উচ্চতম প্রদেশ হইতে ভূগর্ভের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিয়া, এত কাল পরে মানবের দৃষ্টি অনুশীলনের সেই নিকটতম অথচ যোগ্যতম বিষয় মানবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার ফল, এক নূতন বিজ্ঞানের উৎপত্তি যাহার নাম মানবতত্ত্ব (Anthropology) এই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মানুষ, মানুষের জীবন, মানুষের জাতিবিভাগ, মানুষের চিন্তা ও সভ্যতার অভিব্যক্তি, ইত্যাদি। এই বিদ্যার আলোচনা অতি চিত্তাকর্ষক। আমরা আজ যাহা হইয়াছি, তাহা কি করিয়া হইলাম, ভূমণ্ডলের অন্যান্য অংশের মানুষেরা কি প্রকার, তাহারা কি ভাবে, কি করে, অসভ্য জাতিরা কিরূপে সভ্যতায় নীত হয়, এই সকল ও এবম্বিধ অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর কে না জানিতে ইচ্ছা করে?" পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে একই উপকথার বিভিন্ন রূপ প্রচলিত আছে। লেখক তাহার উদাহরণ দিয়াছেন। তাহার পর,—"কিন্তু উপকথা ও পুরাণেই এই নূতন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় শেষ হয় নাই। মানবাচারসমূহ ইহার অনুশীলনের এক মহান্ উপযোগী বিষয়। কত রকমের চলিত প্রথা ও অনুষ্ঠান আছে, আমরা রোজ হয় ত সে সব করিতেছি, রোজ হয় ত দেখিতেছি; কিন্তু কয় জন লোক এই বিচারে প্রবৃত্ত হয় যে, এ সকল অনুষ্ঠানের অর্থ বা কারণ কি? * * * এই প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার উপকথাতত্ত্ববিদ্যার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য।" এইরূপ কতকগুলি লোকাচারের বিবরণ ও তাহার কারণ এই প্রবন্ধে নিবিষ্ট হইয়াছে। অনাবৃষ্টিকালে বৃষ্টি ডাকিবার জন্য নানা দেশে নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচলিত। "একটি অনুষ্ঠান বিশেষ অদ্ভুত, এবং সেটি য়ুরোপেও পাওয়া যায়, ভারতবর্ষেও দেখা যায়। * * * "বৃষ্টি না পড়িলে সার্ভিয়া দেশে একটি মেয়েকে বিবস্ত্রা করিয়া পুষ্পে ভূষিতা করা হয়। সেই মেয়েটি কতকগুলি সখীর সহিত বাড়ী বাড়ী যায়, এবং প্রত্যেক বাড়ীতে নৃত্য করে। গৃহস্বামিনী

বাহিরে আসিয়া সেই মেয়েটির মাথায় একঘটি জল ঢালিয়া দেন, এবং তাহার সখীরা বৃষ্টিসঙ্গীত গাহিতে থাকে। রুশিয়া দেশেও বৃষ্টি না পড়িলে গ্রামের চতুর্দ্দিক দিয়া নগ্না স্ত্রীলোকে লাঙ্গল লইয়া যায়, এবং সন্ধিস্থানে একটি মুর্গী, একটি কুকুর এবং একটি বিড়াল পুতিয়া রাখে। * * এই নগ্নীভবনরীতির সদৃশ অনুষ্ঠানের কতকগুলি দৃষ্টান্ত ক্রুক সাহেব ভারতবর্ষে সংগৃহীত করিয়াছেন।" লেখক বলেন, ভারতবর্ষে উত্তর-পশ্চিমের গোরক্ষপুর, মির্জাপুর ও ছতরপুরে এইরূপ প্রথার অস্তিত্ব আছে। আমাদের এক জন বন্ধু লিখিয়াছেন, বঙ্গের দিনাজপুরেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। উপসংহারে লেখক বলেন,—"এই উপকথা প্রভৃতির অনুশীলন করিলে * * * জগজ্জীবনের বাল্যাবস্থার ইতিহাস গড়া যাইতে পারে। আফ্রিকা বা গ্রীন্‌ল্যাণ্ডবাসীদের আচার ব্যবহার দেখিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মনোভাব ও চিন্তার ইতিবৃত্ত আমরা খানিকটা উদ্ধার করিতে পারি, শুনিয়া হয় ত কেহ কেহ চমৎকৃত হইবেন, কিন্তু কথাটি সত্য।" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "কাশ্মীর-দর্শন" অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মনোরম। দুঃখের বিষয় এই যে, লেখকের কবিত্বপূর্ণ ভাষায়, উজ্জ্বল বর্ণনায় পাঠকের মনে যে আগ্রহের সঞ্চার হয়, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা চরিতার্থ হয় না।

প্রদীপ। আষাঢ়। শ্রীমতী বিনয়কুমারী ধরের "বর্ষা-আবাহন" একটি মামুলি কবিতা। বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত "কদম্ব" কবিতায় বলিতেছেন,—

"তোমার পল্লবপত্রে, পড়ি আমি শতছত্রে,
অতীতের ইতিহাস—অতি অনর্গল!"

বিস্ময়সূচক চিহ্নটি কবির, আমাদের নহে।—অতি উত্তম ছাত্র!—আর দিন কতক ভাল করিয়া পড়িলে ইতিহাসে পণ্ডিত হইবেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। কিন্তু 'অতি অনর্গল' কি? বাঙ্গলা সাহিত্যের সিংহদ্বার, না প্রদীপের রঙ্গভূমি? কবি কি 'কদম্বে'র শত ছত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এ দেশে 'অতীতের ইতিহাস—অতি অনর্গল'? হরিপ্রসন্ন বাবু সুপ্রসন্ন না হইলে আর কে এ সমস্যার সমাধান করিবে? নিপুণ মালী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "পাতা ও ফুলে"র ডালি উদ্ভিদজীবনের পরিপাটী কাহিনী। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এমার্সনের পরিচয় দিয়াছেন। এমার্সনের জীবন ও রচনা, উভয়েরই কিঞ্চিৎ সারসংগ্রহ। মাত্রা যখন হোমীওপ্যাথীর মত বিন্দুমাত্র, তখন অ্যালোপ্যাথীর মত 'মিক্‌শ্চার' করিলেন কেন? শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরের "মহীশূরে রাজোদ্বাহ" সুখপাঠ্য। "রাস্তাঘাটে কেবলই স্ত্রীলোক—অসংখ্য স্ত্রীলোক, স্ত্রীস্বাধীন প্রদেশে যেন যুঁই, চামেলি, বেলি গোলাপের ছড়াছড়ি; দাক্ষিণাত্যসুলভ শৃঙ্গারে সজ্জিত নারীমূর্ত্তি—রবি বর্ম্মার চিত্রের আদর্শ দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলাম। তাহাদের শারীরিক গঠন অতীব সুঠাম—বেণীবন্ধে পুষ্পগুচ্ছ অত্যন্ত সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক; কেবল গণ্ড-প্রদেশে জাফ্রাণের রঙ্গীন রেখাটি যেন চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় সৌন্দর্য্যনাশ করিয়াছিল।" তবে দেখিতেছি, "একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ" সর্ব্বত্র সত্য নয়! শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী "আবুল ফজলে"র কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া দেশের প্রায় অর্দ্ধেক 'তাঁহার' একচেটিয়া করিয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক পদের প্রারম্ভেই 'তাঁহার' মধ্যে 'তাঁহার' ও অন্তে 'তাঁহার'। 'তাঁহারে'র কি বাহার! যিনি বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা ভাষা বেওয়ারিশ ময়দা তিনি ধন্য! খাশা ময়দার নমুনা দেখুন,—"কেনই বা সম্প্রদায়বিশেষ শ্রেষ্ঠতার ভাণ করে,—যখন কোথা হইতে সে শ্রেষ্ঠতা তাহাকে দেওয়া হয় নাই।" আজ-

ভাবের আতিশয্যে এতই বিভোর যে, ভাষার প্রতি একবার করুণনয়নে চাহিবারও অবকাশ পান না। কিন্তু ইংরাজ মহাজনের দোকানে 'উঠ্‌না' বন্ধ হইলেই, বোধ করি, ইহাঁদের অনেককে উপবাস করিতে হয়! 'আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব'—স্থতরাং গ্রহণ করিয়া দান কর, ক্ষতি নাই। গ্রহণ করিবার শ্রমটুকু সহ্য হয়, কিন্তু দানের পূর্ব্বে একটু পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তি হয় না কেন? সব ভার বহন করিতে পারেন, কেবল ভাষার পারিপাট্যবিধানের প্রয়াসটুকুই কি এত দুর্ব্বহ? "লক্ষ্মী" শ্রীযুক্ত মুরলীধর রায় চৌধুরীর রচিত একটি তথাকথিত গল্প। ছোট গল্প কাহাকে বলে, লেখক বোধ করি লিখিবার পূর্ব্বে তাহা কখনও চিন্তা করেন নাই। লক্ষ্মী ও দাশো সাঁওতাল পরগণায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের রকম দেখিয়া মনে হয়, কলিকাতায় তাহাদের হাতে-খড়ি হইয়াছিল। গল্পটিতে রোমান্সের যে উপাদান ছিল, লেখক তাহা নষ্ট করিয়াছেন। উপসংহার নিতান্ত উদ্ভট, এবং তাহা একটি স্বতন্ত্র গল্পের উপাদান। স্থানে স্থানে লেখকের বর্ণনা ও ভাষার সৌষ্ঠব প্রশংসনীয়। সাঁওতালী গানগুলিও রমণীয়। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "জামাইষষ্ঠী" একটি পল্লীচিত্র। বুড়া বয়সে জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণরক্ষা,—সে আগ্রহ, সে কবিত্ব, সে আবেগ নাই! "রাঙা পিসিমা বিধবা, তাঁহার স্বর্গীয় স্বামী বনমালী বাবু ভোজনবিলাসী ছিলেন, পিসিমার 'রসমাধুরী'তে তিনি সদা পরিতৃপ্ত থাকিতেন।" বনমালী বাবু 'স্বর্গীয়' না হইলে দীনেন্দ্র বাবুকে যথোচিত শাস্তি দিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকলের রসমাধুরী সাধারণের গোচর করিতে নাই।

ভারতী। আষাঢ়। "পূর্ব্ব মেঘ" মেঘদূতের অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামীর ছন্দে অধিকার আছে, তাহা স্বীকার্য্য; কিন্তু অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ নাই। 'বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়' পদে যে ধ্বনি শুনিতে পাই, যে চিত্র নয়নপটে প্রতিবিম্বিত হয়, 'খনন-ক্রীড়াপর করিবর সমতুল' তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। 'খননক্রীড়া' শব্দে বপ্রক্রীড়া বুঝায় কি? শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচিত "ধর্ম্মের কল" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি পড়িয়া তৃপ্তি হয়। লেখকের রচনাভঙ্গী ও গল্প বলিবার প্রণালী মনোরম। বারো বৎসরের ছেলেকে দশ বৎসর পরে বাইশ বৎসর বয়সে চিনিতে পারা সহজ বা সম্ভব বা স্বভাবসঙ্গত মনে হয় না। লেখক পুনর্মুদ্রণকালে গল্পটির এই অংশ স্বভাবসঙ্গত ও সংশয়প্রশ্নের অতীত করিলে গল্পটি আরও উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু হারাধন চট্টোপাধ্যায় ও ব্রজহরি মুখোপাধ্যায় 'জ্ঞাতি' হইলেন কিরূপে? সগোত্র নহিলে জ্ঞাতি হয় না, এবং হিন্দুমতে সগোত্রে বিবাহ—বিধবা-বিবাহও—হইতে পারে না। লেখক লিখিয়াছেন,—"কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বর ও কনেকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।" পাঠক মনে করিতে পারেন, সগোত্রে বিবাহ বিদ্যাসাগরের অনুমোদিত ছিল, অথবা বিধবাবিবাহে তিনি গোত্রবিচার আবশ্যক মনে করিতেন না। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, এরূপ মনে করিবার অণুমাত্র কারণ নাই। বিবাহ বিষয়ে তিনি শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন। প্রভাত বাবুর গল্পের সহিত শাস্ত্রের কোনও সম্বন্ধ না থাকুক, বিদ্যাসাগরের মতামত সম্বন্ধে পাঠকের মনে ভ্রান্ত সংস্কার বদ্ধমূল না হয়, এই অভিপ্রায়ে এ কথার উল্লেখ করিলাম। প্রভাত বাবু গল্পটির সৌন্দর্য্য ও 'বস্তু' অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও এই অসামঞ্জস্যের পরিহার করিতে পারেন। "বিচার ও শাসনবিভাগের পার্থক্যসাধন" প্রস্তাবের নামেই বিষয় সূচিত হইতেছে। প্রবন্ধটি 'ভারতী'র বত্রিশ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়া 'পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য' পৃথিবীর মানদণ্ডের মত বিস্তৃত হইয়া আছে। সে যাহা হউক, ইংরাজী কং-



নিয়তি-চিত্র।

KUNTALINE PRESS.

বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে সুলভ করিয়াছেন। কিন্তু সারসংগ্রহ করিলে তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইত। এত অগাধ অপার রাজনীতি দেখিলে স্বয়ং সুরেন্দ্র বাবু ভীত হইবেন,—'অন্যে পরে কা কথা!' শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের "বীরভদ্রের উইল" সুখপাঠ্য। বত্রিশ পৃষ্ঠা 'বিচার ও শাসনবিভাগের পার্থক্যসাধনে'র পর আবার বিশালকলেবর "ভারতীয় দুর্ভিক্ষ" দেখিয়া পাঠকের মনে হইতে পারে,—সুকুমার সাহিত্যেও বুঝি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত! দুইটি প্রকাণ্ড ও গুরুপাক রাজনৈতিক প্রবন্ধ পরিপাক করিতে পারে, বাঙ্গালী পাঠক এখনও ততটা চিন্তাশীল হয় নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "কবিচন্দ্র" নামক এক জন অজ্ঞাত কবির পরিচয় দিয়া পাঠকসমাজকে আনন্দিত ও কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ "প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মপ্রচারকগণ" প্রবন্ধে নিরাশ করিয়াছেন। "বিশ্বরূপ" একটি কবিতা। কবি সখীকে বলিতেছেন,—"তীরে সেই ফুল হাসিয়া ফুটিত মনোরম অতি সুন্দর," বাহিনী তাহার প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিয়া বহিয়া যাইত, মলয় তাহার গন্ধ বিলাইত, ইত্যাদি; এমন কি, "হিংসা করিয়া হাসিত গগনে ইন্দু কত কি ভঙ্গীতে।" কবি তাহার 'সুধার হাসিতে' 'সত্য সদাই' বিশ্বরূপ ভাসিতে দেখিতেন,—এবং পরিশেষে এই কবিতায় সেই 'বিশ্বরূপ' পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু "তাহারই অঙ্গে লীন হয় সখি, তাহারই কল্পা কল্পনা!"—তাই কবিতাটি বিকশিত হয় নাই। আয়ত্ত না করিলে কল্পনা চিরকালই 'তাহারই অঙ্গে লীন' হইয়া থাকিবে। ভাষা ও ভাবুকতাই কবির পক্ষে যথেষ্ট নয়, ভাব ও কল্পনার উপর আধিপত্যও অত্যন্ত আবশ্যক। "বিলাতে অধ্যাপক বসু" প্রবন্ধে কিছু জানিতে পারিলাম না। মনে হইল, যেন লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের কীর্ত্তিকলাপ লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। যেন কেহ ভারতবর্ষের ভাঙ্গা কুঁড়ে হইতে সে কীর্ত্তি হরণ করিতে আসিতেছে, সুরেন্দ্র বাবু তাই দেশের লোককে জাগাইয়া সাবধান করিয়া দিতেছেন। এতটা শঙ্কার কারণ আছে কি? আর যদি তাহা সত্য হয়, এবং আমরা ধনুর্ব্বাণ লইয়া জগদীশবাবুর ত্রাণকল্পে অগ্রসর হই, তাহা হইলে বিলাতী শত্রুর ম্যাক্সিম্ কামানের কাছে দাঁড়াইতে পারিব কি? সমগ্র প্রবন্ধটি আশঙ্কা ও ব্যগ্রতার ভাবে পরিপূর্ণ,—প্রকাশের অযোগ্য হউক,—কিন্তু তাহা অকৃত্রিম ভক্তির নিদর্শন, লেখকের সহৃদয়তার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্নেহের ন্যায় ভক্তিও পদে পদে উপাসিতের অনিষ্টশঙ্কা করে।

চিত্রশালা।

নিয়তি-চিত্র।

প্রাচীন গ্রীসের পুরাণাদিতে নরভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী যে নিয়তি দেবীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাঁহার একাধিক মুর্ত্তি কল্পিত হয় নাই। কিন্তু রোমকগণ এই দেবীর তিনটি বিভিন্ন মুর্ত্তির কল্পনা করিয়াছিলেন। এই দেবীত্রয়ের সাধারণ নাম 'প্যারসী';—তাঁহাদের পৃথক নাম ক্লোথো, ল্যাকিসিস্ এবং এট্রপোস্। রূপক ছাড়িয়া দিলে বলিতে হয়, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ। হিন্দুস্থানে বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু অধিবাসিগণ ভাগ্যলক্ষ্মীর অস্তিত্বে চিরদিনই বিশ্বাসবান্। আমাদের বঙ্গদেশে স্বয়ং বিধাতা পুরুষ ষষ্ঠীর রাত্রে সূতিকাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক নবপ্রসূত বালক বালিকার ললাটে অদৃষ্টলিপি লিখিয়া যান, এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

বিধি-লিপি অমোঘ, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু য়ুরোপে নিয়তিদেবীর রূপ-কল্পনা কবিত্বের স্নিগ্ধতায় ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অরুণরাগে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীন রোমক পৌরাণিকগণ নিয়তি দেবীর যে তিনটি বিভিন্ন মূর্ত্তির কল্পনা করেন, বহুপূর্ব্বে এক জন প্রাচীন চিত্রকর তাহা চিত্রপটে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। চিত্রখানি অতি সুন্দর। প্রবাদ, মাইকেল এঞ্জিলো সেই চিত্রের স্রষ্টা। মাইকেল এঞ্জিলোর বহুবর্ষ পরে সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান চিত্রকর পল থুম্যান্ আর একখানি অতি সুন্দর নিয়তি-চিত্র অঙ্কিত করেন। থুম্যানের চিত্রবস্তুর কল্পনা সম্পূর্ণ অভিনব—মৌলিক ;—প্রাচীন নিয়তি-চিত্রের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সুন্দর অভিব্যক্তি। নিয়তি দেবী ক্লোথো, ল্যাকিসিস্ এবং এট্রপোস্—এই তিন মূর্ত্তিতে একত্র বিরাজ করিতেছেন। কালভেদে একেরই তিন মূর্ত্তি। মূর্ত্তিত্রয়ের স্বাভাবিকত্ব ও প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে। পল থুম্যানের সেই সুবিখ্যাত চিত্রের প্রতিকৃতি আজ প্রকাশিত হইল।

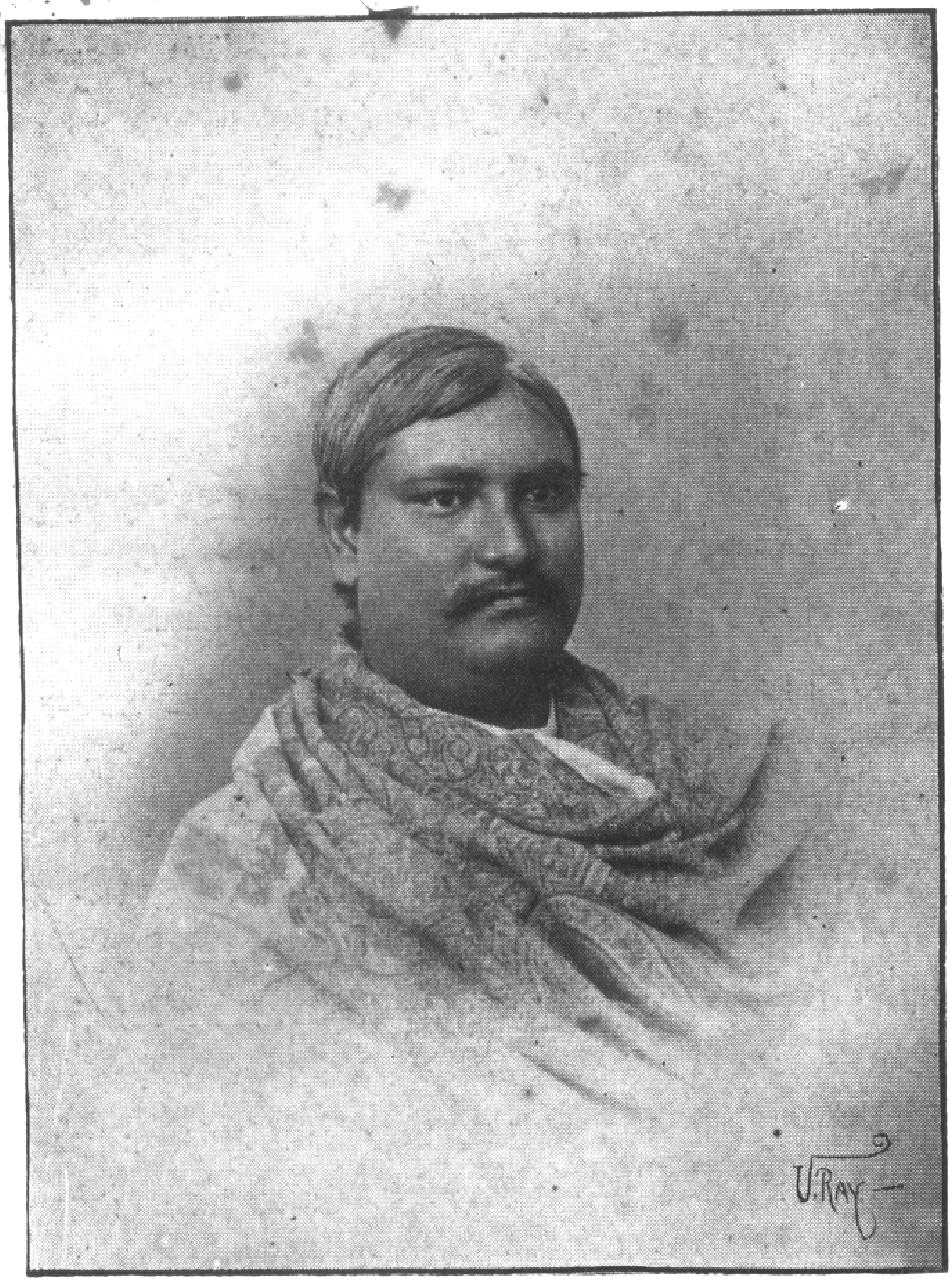
চিত্রের মধ্যস্থলে যে দেবী সূত্রহস্তে দণ্ডায়মানা, তিনিই কুমারী ক্লোথো। সুকঠোর সংসার-চিন্তা—জীবনের গুরুভার তাঁহার ললাটে একটিমাত্র রেখাপাত করিবারও অবসর পায় নাই। এই কুমারীমূর্ত্তিই চিত্রপটের সার সৌন্দর্য্য, প্রতিভার পরম ও চরম বিকাশ, কল্পনার অপার্থিব সৃষ্টি। বাহিরের নগ্নতা পার্থিবসম্পর্কশূন্য অপাপবিদ্ধ হৃদয়ের অনাবিল শুচিতা,—এই পবিত্রতার সান্নিধ্যে লজ্জা সহজেই পরাজিতা। বোধ করি, মানবজীবনের কৌমার-পবিত্রতা প্রকৃতিদুহিতা উষার ন্যায় এই কৌমার্য্যকল্পনায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। যখন থুম্যানের নিয়তি-চিত্র জর্ম্মানীর প্রদর্শনীসমূহে প্রথম প্রদর্শিত হয়, তখন চিত্রপটের সারস্বরূপ এই কুমারীমূর্ত্তি দেখিবার জন্য নানা স্থান হইতে দর্শকবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল।

ক্রোড়দেশে কুসুমদামশোভিত যে দিব্যাঙ্গনার মূর্ত্তি চিত্রের বাম অংশ অধিকার করিয়াছে, তাহা ল্যাকিসিসের চিত্র—যুবতীমূর্ত্তি। হিমালয়বক্ষোবাসিনী নির্ঝরিণী এখানে ধনধান্য-প্রদায়িনী সুখসম্পদবিধায়িনী কল্লোলময়ী তরঙ্গিণী গঙ্গা। চক্ষে প্রসন্নহাস্য, মুখে করুণা, হৃদয়ে প্রেম। এই মূর্ত্তিতেই বুঝি নারায়ণ বিশ্বমনোরমা মোহিনীমূর্ত্তিতে সৃষ্টির কোনও সুন্দর প্রভাতে দ্বন্দ্বনিরত দেবাসুরগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। পাপ ইঁহার কটাক্ষপাতে ভস্ম হইয়া যায়। কিন্তু ভাগীরথী কেবল জলদা, ফলদা, শস্যদা নহেন, কত নগর গ্রাম ইঁনি চূর্ণ করিয়াছেন, কে বলিবে? নিয়তির বিচিত্র গতি, তাই তাঁহার নলিননয়নের অদৃশ্য পাবকে স্বর্ণলঙ্কার বিপুল গৌরব, ট্রয়ের অনন্ত ঐশ্বর্য্য, কুরুপাণ্ডবের সিংহাসন চূর্ণ হইয়া যায়। প্রসন্নদৃষ্টিপাতে মানবের হৃদয়ে পুণ্য, প্রেম, পবিত্রতা ও শান্তি বিকশিত হইয়া উঠে, প্রতিগৃহে সুখের উৎস উৎসারিত হয়।

দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তিনী লোলচর্ম্মা কুঞ্চিতদেহা বৃদ্ধা এট্রপোস্। বার্দ্ধক্যের অন্ধকারে নয়নদ্বয় আচ্ছন্ন। তমোময় ভবিষ্যৎ, তথাপি ইঁহাকে ত্যাগ করিবার শক্তি কাহারও নাই। দেহে বল নাই, হৃদয়ে আশা নাই, বুঝি মনে সুখও নাই, তথাপি ভাগ্যসূত্র স্পর্শ করিয়া কর্ম্মহীন অবসন্ন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিতে হইতেছে।

নিয়তিদেবী এই কুমারী, যুবতী ও বৃদ্ধার ত্রয়ী-মূর্ত্তিতে নিয়ত ধরাতলে রাজত্ব করিতেছেন, মানবগণকে ভাগ্যসূত্রে বাঁধিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মপথে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সেই অদৃশ্য সূত্রের প্রবল আকর্ষণ যাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে, তাহারাই বুঝিতে পারে,

"কারও ভাগ্যে সুধা উঠে, কারও ভাগ্যে হলাহল।"



শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

KUNTALINE PRESS.

হিমারণ্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

আমি যোশীমঠ হইতে যাত্রা করিয়া বরাবর উত্তর দিকে আসিয়াছি। কখনও কখনও উত্তরপূর্ব্ব কোণেও যাইতে হইয়াছে। এই প্রদেশে পথের কোনও ঠিক নাই। পর্ব্বত ও নদীর গতি বুঝিয়া পথ হইয়াছে। এই সকল পথ নামমাত্র পথ; অনেক সময় পথের চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় না। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। যোশীমঠ হইতে নিতি পর্য্যন্ত বিটিশ গবর্মেণ্টের অধিকার; সেই পর্য্যন্ত পথও আছে। তার পর পদচিহ্ন অনুসারে চলিতে হয়। যেখানে পদচিহ্ন নাই, সেখানে নদী ও পর্ব্বতের গতি অনুসারে চলিতে হয়। এইরূপ চলিতে চলিতে আমি হিমালয় অতিক্রম করিয়া এখন তিব্বতে আসিয়াছি। এখানকার পথ আরও জটিল। দিক-নির্ণয় করিয়া আমরা চলিতেছি। যেখানে মেষ, ছাগ ও চামর প্রভৃতি মলত্যাগ করিতে করিতে গিয়াছে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এখন চলিতে হইতেছে। এখন দেখিলাম, দোভাষী ভৃত্যদিগের পথ সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নাই; তবে মোটামুটি তাহারা কোন্ আড্ডা হইতে কোন্ দিকে চলিতে হইবে, ইহা জানে; এবং কোথায় জল আছে, ইহাও তাহারা বুঝিতে পারে। তবে মাঝে মাঝে কোনও ঝরণা একেবারে শুখাইয়া যায়, কোনও নদীতে আদৌ জল থাকে না। এই সব পরিবর্ত্তনের জন্য দোভাষী পথপ্রদর্শকের উপরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কল্য আমাদিগের 'গম্' নামক আড্ডায় যাইবার সঙ্কল্প ছিল, তাহা পারি নাই। গম্ এখান হইতে অনুমান ৩।৪ মাইল। প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা নির্ণীত আড্ডার দিকে চলিতে লাগিলাম। অনুমান প্রায় বেলা ১১টার সময় গম্-এ পঁহুছিলাম। গম্ শতদ্রু নদীর উপকূলে একটি গুহা। অদ্য এখানে বাস করিতে হইল।

আষাঢ়ের উনবিংশ দিবস চলিয়া গেল; আমার মনে মনে সঙ্কল্প ছিল, সংক্রান্তির দিবসে মানস সরোবরে স্নান করিব। কিন্তু যেরূপ ধীরে ধীরে চলিতেছি, তাহাতে সংক্রান্তির দিনে তথায় যাওয়া অসম্ভব। আমরা এখন দুই দিনে ৬ মাইল চলিতেছি। এক দিনে ৬ মাইল না চলিলে আর

সঙ্কল্পরক্ষা হয় না। সুতরাং সঙ্গীদিগকে বলিলাম, যেমন করিয়া হউক অদ্য ৬ মাইল চলিতে হইবে। এ দেশে চলিবার আর একটি অসুবিধা আছে। বেলা ৯টা ভিন্ন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাওয়া যায় না; কারণ, রাত্রিতে যে বরফপাত হয়, তাহা ৯টার পূর্ব্বে গলে না, এবং অপরাহ্ণ ৪টা হইতে বিন্দু বিন্দু বরফপাত হইতে আরম্ভ হয়। তাহার পূর্ব্বেই আড্ডা লইতেই হইবে। সুতরাং খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রাম বাদে ৪।৫ ঘণ্টার বেশী চলিবার সময় পাওয়া যায় না। আমরা ঘণ্টায় এক মাইল চলিতে পারি; ঊর্দ্ধসংখ্যা দেড় মাইলের অধিক চলা যায় না; সুতরাং অতিকষ্টে ৬ মাইল চলিতে পারিব, এইরূপ ঠিক করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই একটি পথ পাইলাম। এই পথটি 'থেংলুং' হইয়া 'গর্‌টক্' গিয়াছে; পরে তিব্বতের রাজধানী 'লাসা' পর্য্যন্ত গিয়াছে। 'গর্‌টক' একটি ছোটখাট রাজধানী। আমাদের দেশে যেমন 'চীফ্ কমিশনর' বা 'লেফ্‌টেনেণ্ট্ গভর্ণরের' অধীন কতকগুলি জেলা থাকে, সেইরূপ 'গরটকে'র রাজার অধীনে ১৪।১৫ টি জেলা আছে। গর্‌টকে আমি যাই নাই, সুতরাং তাহার কোনও বিবরণ লিখিতে পারিলাম না। তবে এ পথটি মন্দ নয়, যদিও আমাদের দেশের পথের মত নহে। দেশে অজ পল্লীগ্রামে যেমন রাস্তা থাকে, এই রাস্তাটি সেইরূপ। এই রাস্তা দেখিয়া আমার সঙ্গীরা বলিল, অদ্য খুব ভাল রাস্তা পাইয়াছি। আমি মনে মনে হাসিয়া বলিলাম, ইহাকে রাজকীয় রাস্তা না বলিয়া গ্রাম্য পথ বলিলেই চলে। পথটি শতদ্রু নদীর তীরে তীরে গিয়াছে, অতএব আমরাও পুণ্যসলিলা শতদ্রুর তীরে তীরে চলিতে লাগিলাম। শতদ্রুকে এদেশীয় লোকেরা শতরুদ্রা বলে। ইংরাজেরা Sutty বলে। আমি এই শতদ্রুর তীরে তীরে চলিয়া 'থেংলুং' আসিলাম। থেংলুং স্থানটি বড়ই সুন্দর! শতদ্রুর পশ্চিম ও পূর্ব্ব এই উভয় তীরেই 'থেংলুং'-এর অবস্থান। পশ্চিম তীরে সুবৃহৎ পর্ব্বত। এই পর্ব্বতাঙ্গ খোদিত করিয়া একতল দ্বিতল ত্রিতল গৃহ হইয়াছে। দূর হইতে গৃহগুলি দেখিলেই মনে স্বভাবতঃ আনন্দের উদয় হয়। গৃহগুলি গৈরিক রাগে চিত্রিত; তাহাদের উভয় পার্শ্বে শত শত গুহা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এই সব গুহাতে সাধারণ 'থেংলুং'-বাসীরা বাস করে; আর বড় বড় অট্টালিকাতে দেবমন্দির। সে স্থানে দেবসেবকেরা ভিন্ন গৃহস্থের বাসের অধিকার নাই। এই স্থানের নিম্নে ছোট বড় স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলি শিবমন্দিরের

অনুরূপ। এই স্তম্ভ বা মন্দিরের ভিতরে কোন প্রকার দেবমূর্ত্তি নাই। এ দেশীয়েরা ঐ শূন্য স্তম্ভকেই শিবলিঙ্গ ভাবিয়া পূজাদি করে। এই স্তম্ভ-শ্রেণীর নিম্নেই শতদ্রু। এই ত গেল পশ্চিম পারের কথা। আমি পূর্ব্ব পারে অবস্থিতি করিলাম। দূর হইতে পূর্ব্ব পারে থাকিবার মত স্থান আছে, এরূপ অনুমান করা যায় না; কেবল কতকগুলি প্রস্তরপুঞ্জের সমাবেশ বুলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমার সঙ্গীরা বলিল, এই স্থানে গ্রাম আছে। আমি কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিলাম না, তবে তাহারা যে দিকে চলিতেছে, সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। অবশেষে তথায় যাইয়া দেখি, সে স্থানে শতাধিক কৃত্রিম গুহা রহিয়াছে। ঐ সকল গুহার মধ্যেই এখানকার লোকে-দের বাস। গুহাগুলি খুব বৃহৎ; এক একটি গুহার মধ্যে ৩০।৪০ জন লোক বাস করিতে পারে। এক একটি গুহার উভয় পার্শ্বে আবার ছোট ছোট গুহা থাকে; সেই গুহাদ্বয়ের মধ্যে একটিতে রাশীকৃত ঘুঁটিয়া জমা থাকে, অপরটিতে পালিত পশু থাকে। আর অধিবাসীরা যে গুহাতে বাস করে, সেই গুহাতেই রন্ধনের কার্য্য হয়। ইহাদের গৃহের চুল্লী কখনও নির্ব্বাপিত হয় না; প্রায় দিনরাত্রই চা প্রস্তুত হইতে থাকে; যখন একটু ক্ষুধা বা পিপাসা হয়, তখনই এক এক পেয়ালা চা খায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছাতুও খাইয়া থাকে। ইহাদের গৃহসজ্জার মধ্যে কম্বলের গদী, গদীর সম্মুখে অতি ছোট টুলের ন্যায় কাষ্ঠাসন, কাষ্ঠাসনের সম্মুখে শাক্যমুনির মূর্ত্তি, এবং কাষ্ঠা-সন চা-এর পেয়ালা ও ছাতু দ্বারা সুসজ্জিত। ছোট ছোট থলে ও বড় বড় রঙ্গীন কৌটাতে চা ও ছাতু থাকে, এবং ঝোট কৌটাতে মাখন থাকে। সেই সুসজ্জিত টুলের বাম বা দক্ষিণ ভাগে চুলা জ্বলিতেছে; চুলার উপর দিন রাত্রই ২।১টা কেটুলিতে বা তামার ডেক্‌চীতে জল গরম হইতেছে। এই গরম জলেই চা প্রস্তুত হয়। আবার চুলাতে অগ্নিকুণ্ডের কাজও হয়। অগ্নিকুণ্ড ভিন্ন গুহাতে বাস করা যায় না।

অদ্য আমি যে গুহাতে আশ্রয় লইলাম, সেই গুহাটিও বৃহৎ; মেজের উপর টুলের ন্যায় বেদী, বেদীর সম্মুখে ছোট একখানি শূন্য টুল। টুলের সম্মুখে তিন মুখো চুলা, এবং কিছু উপরে একটি বেদী। আমি গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বেদীর উপরে দেবতা বসাইলাম, পার্ব্বতীয় বনফুলে দেবপূজা করিলাম, ভুটীয়াদের নিয়ম অনুসারে গরম চা ও ছাতুর ভোগ লাগাইলাম। আমার সঙ্গে শঙ্খ ও ঘণ্টা ছিল। সাথীরা শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজাইয়া স্থানটিকে পরম পবিত্র

করিয়া তুলিল। শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া পর পার হইতে দুইটি লামা আসিলেন, আর এখানকার গৃহস্থেরা আমাকে ঘেরিয়া বসিল। এখানকার গৃহস্থেরা বলিল, "বাবা! আমরা বড় গরীব, তোমাকে আহারের জন্য কিছুই দিতে পারিব না, তবে যথেষ্ট ঘুঁটিয়া ও কাষ্ঠ দিব; আর চামরী গাই আছে, তার দুগ্ধ, মাখন ও ঘোল দিব।" আমি বলিলাম,"তোমরা যাহা দিবে, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব।" প্রধান লামা বলিলেন, "বাবা! এখানে বড় শীত; থেংলুংএর অধিকাংশ লোক এই শীতে মরিয়া গিয়াছে; ও পারে যত গুহা ও গৃহ দেখিতেছেন, প্রায়ই শূন্য। গুহা ও গৃহে প্রায় তিন শত পরিবারের স্থান আছে। ইহার মধ্যে ছয়টি পরিবার ওখানে আছে, আর আমরা ৫।৭ জন লামা আছি; আর সকলেই মরিয়া গিয়াছে। আপনি যেখানে আছেন, সেখানে এই কয়টি লোকই আছে। আর সমস্ত মরিয়া গিয়াছে।" আমি গণনা করিয়া দেখিলাম, আমার সম্মুখে দুইটি স্ত্রীলোক, তিন জন পুরুষ আর একটি বালক বসিয়া আছে; ইহাদের পরিচ্ছদ,—গ্রীবা হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত ঝুলের ন্যায় পশমের জামা, মাথায় টুপী, কোমরে কটিবন্ধ ও একখানা ছোরা ঝুলান, মস্তকে দীর্ঘকেশ বেণী বাঁধিয়া পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া দিয়াছে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে হস্তিদন্তের অঙ্গুরী, এবং কেশেও হস্তিদন্তের অঙ্গুরী। পায়ে লম্ নামক জুতা। স্ত্রীলোকদিগের পোষাকও এইরূপ, তবে তাহাদের জ্যাকেটের ন্যায় একটি অঙ্গাবরণ থাকে ও তাহারা নানাবিধ প্রস্তর ও হাড়ের মালা পরিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের কটিবন্ধ ও মস্তকাভরণ নাই। স্ত্রী ও পুরুষের পরিচ্ছদের এইমাত্র পার্থক্য। আর স্ত্রীলোকেরা চুল বাঁধে না, পিঠের উপর দিয়া চুল ঝুলিতে থাকে। ইহারা বস্ত্র পীত বা রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া পরিধান করে, এবং পশমনির্ম্মিত বসন ভিন্ন অন্য বস্ত্র পছন্দ করে না। আমি যে গুহাতে আছি, সেই গুহার উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি গুহা আছে; তাহার একটিতে ঘুঁটিয়া বোঝাই, অপরটি শূন্য। সেই শূন্য ঘরেই আমার পাকশালা হইল। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, আমি যে গৃহে আছি, তাহা সরকারী পান্থশালা বা "ডাকবাঙ্গলা"। এখানে যে সে স্থান পায় না; লামা, রাজকর্ম্মচারী ও বণিক্, ইহারাই আসিয়া এখানে বিশ্রাম করে। থেংলুংএ এক জন তহশীলদার আছে। এই তহশীলদারকে রাজা বলে। রাজা এখন বাণিজ্যে গিয়াছেন। ২।৪ মাস পরে ফিরিয়া আসি-

খনি আছে; তাহা হইতে অনবরত ধূম নির্গত হইতেছে; কখনও কখনও অগ্নিশিখাও দেখা যায়। শতদ্রু নদী বেশ প্রশস্ত, হাঁটিয়া পার হওয়া যায় না। বহুবর্ষ অতীত হইল, যোহার-নিবাসী এক জন ব্যবসায়ীর পুত্র এখানে বরফ-পাতে মারা যায়। তাহার পিতা, পুত্রের স্মরণার্থ, শতদ্রু নদীর উপর একটি সেতুনির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই সেতুই শতদ্রু-লঙ্ঘনের প্রধান সেতু। আমি এই দিবস এখানে অবস্থিতি করিলাম।

অদ্য ২০এ আষাঢ়। মনে করিলাম, অদ্যই 'ত্রেতাপুরী' যাইব। কিন্তু কার্য্যে তাহা হইল না। পথেই থাকিলাম। কারণ পরে লিখিতেছি। এই স্থানটি অতি সুন্দর; শতদ্রুর উপরেই গুহা। এই গুহাকে পলিকার গুহা বলে, এবং এইটি একটি আড্ডা। এই গুহার উপরে একটি পর্ব্বত আছে। পর্ব্বতাঙ্গে শত শত গুহা খোদিত, কিন্তু সেই সব গুহা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। এই সব শূন্য গুহা দেখিয়া মনে হইল, যদিও আজ চন্দ্রগ্রহণের দিন ত্রেতা-পুরীতে পঁহুছিতে পারিলাম না, তথাপি ইহা সাধু মহাত্মাদিগের স্থান, এখানে বসিয়া চন্দ্রগ্রহণ দেখিব ও শতদ্রুতে স্নান করিব। এইরূপ সঙ্কল্প হওয়াতে অদ্য এখানেই বিশ্রাম করিলাম। মহানন্দে দিন রাত্রি অতিবাহিত হইল।

প্রভাতে উঠিয়াই ত্রেতাপুরীর দিকে ছুটিলাম। অদ্যও শতদ্রুর তীরে তীরে যাইতেছি। এখান হইতে ত্রেতাপুরী ৪।৫ মাইল। তিন মাইল যাইয়া একটি ডুং দেখিতে পাইলাম। এখানে অনেকগুলি ভুটীয়া তাম্বু করিয়া রহিয়াছে। আমি ডুংএর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র ভুটীয়ারা তাম্বু হইতে বাহির হইল, এবং আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কেহ মাখন, কেহ চা, কেহ 'থুথু' নামক মিঠাই লইয়া হাজির হইল। ইহারা কাশীর সন্ন্যাসীদিগকে কাশীলামা কহে। কাশীলামাদিগের উপর ইহাদের বড়ই ভক্তি। আমাকে কাশীলামা মনে করিয়া ভুটীয়ারা বলিল, "অদ্য আমাদের এক তাম্বুতে থাকুন, কল্য ত্রেতাপুরীতে যাইবেন।" আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না; নিকটে ত্রেতাপুরী দেখিয়া সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখি, একটি শ্বেতবর্ণ পর্ব্বত হইতে অনবরত ধূম নির্গত হইতেছে। আমি আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই শ্বেতবর্ণ পর্ব্বতটি কি, এবং তাহা হইতে অনবরত ধূম নির্গত হইবার কারণই বা কি?" আমার সঙ্গী উত্তর করিল, "এই পর্ব্বতের নাম ভস্মাচল; এখানে ভস্মাসুর ভস্ম হইয়াছিল। ভগবান শঙ্কর পূর্ব্বে এখানে ছিলেন, তার পর বিষ্ণুর চক্রান্তে ভস্মাসুর ভস্ম

হইলে পর ভগবান কৈলাসে চলিয়া যান। ঐ স্থান কৈলাসের ন্যায় পূজ্য ও মহাতীর্থ। ঐ ভস্মাচলের পরই ত্রেতাপুরী। ত্রেতাযুগে ভগবান শঙ্কর উমার সহিত এখানে বাস করিতেন। তাহার জন্য এ স্থানের নাম ত্রেতাপুরী হইয়াছে।” অতি সত্বরই আমরা ভস্মাচলে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি, পর্ব্বত কর্পূরের ন্যায় গৌরাঙ্গ ও অতি উষ্ণ, এবং পর্ব্বত হইতে উষ্ণ প্রস্রবণ ফোয়ারার ন্যায় সজোরে উর্দ্ধে উঠিতেছে। উর্দ্ধে উঠিয়াই আবার শতদ্রুতে চলিয়া যাইতেছে। আমরা সকলেই উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করিলাম, এবং সেই পর্ব্বত হইতে ভস্মাসুরের দেহভস্ম সংগ্রহ করিয়া ত্রেতা-পুরীর দিকে চলিতে লাগিলাম। এই ভস্মাচলের নিম্নেই শতদ্রু। উষ্ণ-প্রস্রবণে স্নান করিয়া শরীর বড় গরম হইয়াছিল, তাই আবার শতদ্রুতে স্নান করিলাম। স্নানের পর বাম ভাগে একটি মন্দির দেখিতে পাইলাম। সেই মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, তথায় কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূর্ত্তির আকার দেশীয় কালীমূর্ত্তির ন্যায় বিকটকরালবদনা ও ভয়ঙ্করী। দর্শন করিলে মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। মন্দির হইতে বাহির হইয়া কিঞ্চিৎ উর্দ্ধদিকে চলিতে হইল। কারণ, সমভূমি হইতে এখন পর্ব্বতশিখরে উঠিতেছি। উভয় দিকে দেবমন্দির ও লামাদিগের বাসভবন, মধ্য দিয়া পথ। এই পথ দিয়া আমরা একেবারে ত্রেতাপুরীর প্রধান মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। প্রধান লামা তখন উপস্থিত ছিলেন না; তিনি তাঁহার বাস-ভবনে গিয়াছিলেন। আমি মন্দিরে যাইয়াই তাঁহার নিকট লোক পাঠাইলাম। ত্বরায় তিনি মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি লামা দর্শন করিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিলাম; তিনিও আমাকে অতিশয় স্নেহের সহিত গ্রহণ করিলেন। দেবমন্দিরের সম্মুখেই একটি সুন্দর গৃহে আমাকে থাকিবার স্থান দিলেন; রন্ধন করিবার জন্য তাঁহার নিজের রন্ধনশালা ছাড়িয়া দিলেন; জল ও কাষ্ঠের আয়োজন করিয়া দিলেন; এবং আমার আহারের জন্য চা ও ছাতু উপহার দিলেন। আমি কিছু বিশ্রান্ত হইলে আমাকে সঙ্গে করিয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, সম্মুখে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে হর গৌরীর মূর্ত্তি এবং মন্দিরের চতুর্দ্দিকের ‘গ্যালারী’তে নানাবিধ দেব দেবীর মূর্ত্তি সুসজ্জিত রহিয়াছে; এবং অনেকগুলি গ্রন্থ রক্ষিত আছে। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেব দেবীর সম্মুখে কতকগুলি আসন আছে। লামার আদেশে আমি তাহার এক পার্শ্বে

বসিলাম ও নানাবিধ স্তব ও মন্ত্রপাঠের পর লামা মহাশয় আমাকে বলিলেন, "আপনি যাইয়া আহার করুন, আমিও মধ্যাহ্নকৃত্য শেষ করি; অপরাহ্নে দেখা হইবে।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন; আমিও বাসায় আসিলাম। (১)

আসিবার সময় মনে হইল, তীর্থে আসিলেই ব্রাহ্মণভোজন ও দেবসেবা করান উচিত; এখানে ব্রাহ্মণ লামা ও ডাবা। লামা আমাদের দেশীয় সন্ন্যাসী, ডাবা আমাদের দেশীয় ব্রহ্মচারীর অনুরূপ। বাসায় যাইবার সময় লামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,"আমি আপনাদের সেবা করিতে ইচ্ছা করি; আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া সেবা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি কৃতকৃতার্থ হইব।" লামা সানন্দে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "সে কি! আপনি যাহা দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিব।" তার পর আবার বলিলেন, "আপনি দুইটি টাকা দিন, তাহাতেই ত্রেতাপুরীতে যতগুলি লামা ও ডাবা আছে, তাহাদের মাখন ও ছাতু খাওয়ান যাইবে। আর একটি মেষের মূল্য দিন, তাহা হইলে আপনার নামে একটি মেষ ক্রয় করিয়া রাখিব; সেই মেষের দুগ্ধে মাখন প্রস্তুত হইবে, মাখন হইতে ঘী হইবে, সেই ঘৃতে মন্দিরে ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,"মেষের মূল্য কত?" তিনি উত্তর দিলেন,"১৷৷০ টাকা।" আমি তাঁহার নিকট লামা ও ডাবাদিগের ভোজনের জন্য দুই টাকা ও মেষের মূল্যস্বরূপ দেড় টাকা দিলাম। এই টাকা তৎক্ষণাৎ মঠের খাতায় জমা হইল। লামা তাঁহার বাসস্থানে চলিয়া গেলেন; আমিও বাসায় আসিলাম।

অনুমান বেলা দুইটার সময় লামা আমার নিকট আসিয়া সংবাদ দিলেন, "সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে; দেবালয়ে চলুন; এখন ভোগ হইবে।" আমি ও আমার সঙ্গীরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সেখানে যাইবামাত্র এক রকম বংশীধ্বনি হইল। এইরূপ বংশী আমাদের দেশে নাই। বংশীটি ৪।৫ হাত দীর্ঘ; পিত্তলে নির্ম্মিত; শব্দ খুব গম্ভীর ও মধুর। বংশীধ্বনি হইবার পরই ৩০।৪০ জন লামা ও ডাবা উপস্থিত হইলেন। সকলেরই মূর্ত্তি সৌম্য

---

(১) এই প্রদেশের দেবালয়সমূহ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত; ইষ্টকের চিহ্নমাত্র নাই।—দূরতর প্রদেশ হইতে কাষ্ঠ আনিয়া ইহারা মন্দিরের কড়ি ও বরগা প্রস্তুত করে—এই কাষ্ঠ আনয়ন কার্য্য বহুব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। মাটী ও প্রস্তর চূর্ণ করিয়া সুরকির কার্য্য হইয়া থাকে। এই সুরকি প্রস্তর অপেক্ষাও শক্ত।

ও ধীরতাব্যঞ্জক। দেবালয়টির চতুর্দ্দিক প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টিত; সম্মুখে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের পরই দেবালয়ের বারান্দা। দেবালয়ের বাম পার্শ্বে বংশীধ্বনি করিবার স্তম্ভ। দক্ষিণ পার্শ্বে রন্ধনশালা। লামা তাঁহার উচ্চাসনে বসিলেন, অপরাপর লামা ও ডাবারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ আসনে বসিলেন। আবার বংশীধ্বনি হইল। এক জন ডাবা চা ও ছাতু লইয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার প্রত্যেক লোকেরই সঙ্গে এক একটি চা খাইবার পেয়ালা ছিল। চা আসিবার পূর্ব্বেই সম্মুখস্থ কাষ্ঠাসনে সেই পেয়ালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ডাবা প্রত্যেকের পেয়ালাতে এক এক পেয়ালা চা ঢালিয়া দিলেন। তার পর লামা গ্রন্থপাঠ আরম্ভ করিলেন। (১) একবার গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, এক এক বার ডম্বরু বাজাইতেছেন! এই ডম্বরুটি অতি বৃহৎ। ডম্বরুর সঙ্গে করতালের ন্যায় এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র সংযুক্ত থাকে। ডম্বরু বাজাইতে গেলে সেই যন্ত্রও বাজিয়া উঠে। এই বাদ্যধ্বনি এত গম্ভীর যে, মন প্রাণ মুগ্ধ করিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি করে। আমার মনে হইল, যেন আমার সম্মুখেই কৈলাসপতি বিরাজমান রহিয়াছেন। এইরূপ কতক্ষণ পাঠ হইল। এই সুমধুর পাঠান্তে সুমধুর বাদ্য বাজিতে লাগিল। পরে লামা এক পেয়ালা চা খাইলেন। আমরাও এক এক পেয়ালা চা খাইলাম। তার পর আবার চা আসিল, পাঠ আরম্ভ হইল, বাদ্য বাজিতে লাগিল। তার পর আবার চা পান করা হইল। এই প্রকার ৫।৬ পেয়ালা চা খাইবার পর ছাতু আসিল। সকলে ছাতু খাইলেন। এই দেবগৃহটি প্রকাণ্ড একটি 'হল্'। দেবতার সম্মুখে 'গ্যালারি'। সেই সব 'গ্যালারি'তে অসংখ্য প্রদীপ সাজান আছে। দেবতার সম্মুখে তিনটি প্রদীপ দিনরাত্রি জ্বলিতে থাকে। এখানকার সমস্ত প্রদীপই ঘৃতপ্রদীপ। প্রদীপগুলি আবার পিত্তলনির্ম্মিত। আজ এখানে পঞ্চাশতের অধিক প্রদীপ জ্বলিতেছে। দেবালয়ের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। আমরা সকলে দেবালয়ে প্রবেশ করিলাম।

(১) এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত; ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবগণের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে মহাকালী, তারা ও শিবের স্তুতি দ্বারায় ভজন শেষ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ বৈদিক দেবগণের স্তুতি, দ্বিতীয়তঃ পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবগণের আরাধনা, তৃতীয়তঃ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের স্তুতি দ্বার এই সকল দেবমন্দিরে নিত্য উপাসনা হয়। আমি এদেশীয় ভাষা না জানিলেও এই মঠের এক জন বৃদ্ধ 'লামা' হিন্দী ভাষাতে আমাকে এই সকল স্তুতির অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

ছাতু খাইবার পর আমার পাঠ হইল। পাঠান্তে লামা সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। অপরাপর লামা ও ডাবারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন; মন্দির বন্ধ হইল; আমরাও বাসায় চলিয়া আসিলাম। কিছু ক্ষণ পরে আর এক জন লামা আসিয়া আমাকে বলিলেন, "আপনি চলুন, অপরাপর তীর্থস্থান দেখিবেন।" আমি তাঁহার সঙ্গে দর্শনে বাহির হইলাম। তিনি কতকগুলি দেবস্থান দেখাইলেন, সকল স্থানেই শক্তিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা। একটি কালীমুর্ত্তির সম্মুখে তিনটি নরকপাল ছিল। লামা বলিলেন, "এই তিনটি নরকপাল সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের।" এই বলিয়া তিনি একটি কপালের মস্তিষ্কের ছিদ্র দেখাইয়া বলিলেন, "এই ছিদ্র দ্বারা ইঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। ইহাকেই বলে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জীবন বাহির হওয়া।" আমি বলিলাম, "এই কপালটি আমাকে দিন।" তিনি বলিলেন, "লও, ইহার দ্বারা যদি তোমার কোনও উপকার হয়, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।" এই বলিয়া তিনি আমাকে সেই নরকপালটি দিলেন। আমি মাথায় করিয়া তাহা বাসায় লইয়া আসিলাম। এই ত্রেতাপুরীর মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে মাঠের মধ্যে অসংখ্য স্তম্ভ আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই স্তম্ভগুলি কি?" লামা উত্তর করিলেন, "যাহারা এই তীর্থে আসে, তাহারা এইরূপ স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া যায়; ইহা আমাদের দেশীয় প্রথা। ভিন্নদেশীয় লোকেরা এ প্রথার অনুসরণ করে না। এই দেশে আর একটি অপূর্ব্ব প্রথা প্রচলিত আছে;—পুত্রবান গৃহস্থেরা একটি বা ততোধিক পুত্রকে মঠের সেবার জন্য দান করিয়া থাকে। পুত্রের জন্ম হইলেই তাহারা সঙ্কল্প করিয়া পুত্রটিকে মঠের নামে উৎসর্গ করে। তার পর পুত্রটি যখন সাবালক হয়, তখন মঠে পাঠাইয়া দেয়। তখন আর পিতা মাতার সহিত তাহাদের কোন সংস্রব থাকে না। এই সকল লোকদিগকে 'ডাবা' অর্থাৎ ব্রহ্মচারী বলে। ইহারা লামার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন, মঠের সেবা, দেবসেবা ও বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া থাকে। এতদ্দেশীয় লামাদের পক্ষে বাণিজ্য ব্যবসায় দোষাবহ নহে। লামা ও ডাবাদিগকে চিরকৌমারব্রত ধারণ করিতে হয়। লামা বা ডাবা যদি বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহারা মঠ হইতে বহিষ্কৃত হইবে, আর কিছু অর্থদণ্ড দিতে হইবে। লামা ও ডাবারা মুণ্ডিতমস্তক ও রক্তবসনপরিধায়ী। ইহারা বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা যাহা কিছু অর্থোপার্জ্জন করে, তাহা মঠের সম্পত্তি হইয়া থাকে। এই সম্পত্তিতে লামা ও

ডাবাদিগের দান ও বিক্রয়ের অধিকার থাকে না। ডাবারা যদি জিতেন্দ্রিয় ও পণ্ডিত হইতে পারে, তাহা হইলে পরে তাহারাই লামা হয়। বাল্যকাল হইতে কৌমারব্রত অবলম্বন করিয়া যিনি আজীবন মঠের সেবাতে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই এই দেশের লোকদিগের নিকট সম্মানার্হ ও পূজনীয়। লামা বা ডাবা যদি কিছু দিন কৌমারব্রত ধারণ করিয়া অবশেষে ব্রতভঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ মঠ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, এবং অবস্থানুযায়ী অর্থদণ্ড করে। ইহারা কোনও পল্লীতে স্থান পাইবে না ও চিরকাল সামাজিক সম্মান হইতে বঞ্চিত থাকিবে, এবং দেবালয়প্রবেশের অধিকারচ্যুত হইবে।

আজ কাল অনেকেই ধর্ম্মজগতে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর আবশ্যকতা অনুভব করেন। এখানে অনেক দিন হইতে মঠে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত আছে। তিব্বতীয় সমস্ত মঠই লাসার প্রধান লামার অধীন; প্রধান প্রধান মঠে লাসা হইতে লামা নিযুক্ত হইয়া আসে; অথবা অধীন মঠে যদি উপযুক্ত লামা বা ডাবা থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্য হইতে মঠের লামা নিযুক্ত হয়েন। এখানে কয়েকটি প্রধান মঠ আছে;—থুলিং, দারচিন্, শিবলিঙ্গ, জু, খুজ্রুনাথ, দঙ্কু ও থেংলুং। এই সব মঠে যদি লামার পদ শূন্য হয়, তাহা হইলে নূতন লামার নির্ব্বাচন হওয়া বড়ই কঠিন। ইহারা পূর্ব্বজন্ম ও পর-জন্মে দৃঢ় বিশ্বাসী। এক লামার আসন অন্য লামা গ্রহণ করিতে পারে না। প্রধান লামার দেহান্তরের পর যত দিন সেই লামার পুনরাবর্ত্তন না হইবে, তত দিন লামার আসন শূন্য থাকিবে। যখন সেই লামার পুনরাবর্ত্তন হইল, তখন তিনি পিতা মাতাকে বলিলেন, "আমি অমুক মঠের লামা ছিলাম।" পিতা মাতা প্রধান মঠে সংবাদ দিবেন। সেই মঠ হইতে লোক আসিবে, আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, "মঠে কি কি সম্পত্তি আছে? কোন্ সিন্দুকে কি কি জিনিষ আছে? তোমার সময় তোমার মঠে লামা ও ডাবার সংখ্যা কত ছিল? আর কত মেষ ছাগ চামরী ঘোড়া ছিল?" তিনি যদি সেই সব প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সেই মঠের প্রধান লামা হইবেন, এবং লামার আসনে বসিতে পারিবেন। নতুবা লামার আসন শূন্য থাকিবে। এইরূপ তিনটি লামার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়া-ছিল। তাঁহাদের বিষয় যথাস্থানে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহারা ঐ সব গুণযুক্ত লামা হইবেন, তাঁহারা

৩।৪ বৎসর বয়সে আপনার আপনার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিবেন, অধিক বয়সে পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিলে তাহা গৃহীত হইবে না। লামারা কিংবা ডাবারা যদি কোনও অপরাধ করেন, তাহা হইলে স্থানীয় মঠের প্রধান লামাই তাঁহাদের বিচার করিবেন। রাজাদিগের নিকট তাঁহাদের বিচার হইবে না। মঠসমূহে যত টাকা ও পশু জমা হইবে, এবং যাহা খরচ হইবে, তাহার হিসাব সেই সেই মঠের প্রধানকে লাসার প্রধান লামার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। মঠের সমস্ত কর্ম্মই লামা ও ডাবাদিগকে করিতে হয়। গৃহস্থাশ্রমের লোকেরা মঠের কার্য্য করিবে না; মঠে বেশী দিন থাকিতেও পারিবে না। তবে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে মঠের ধর্ম্মশালায় স্থান পাইবে মাত্র। এই দেশের লোকেরা যেমন পুত্রদিগকে মঠে দান করে, সেইরূপ প্রথমা কন্যাকেও মঠে দান করিয়া থাকে। কন্যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর সাধন ভজন ও মঠের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হয়। ইহাদিগেরও বিবাহ নিষিদ্ধ। মঠ হইতে আহার পায়, এবং ভিক্ষা করিয়া বস্ত্রাদির সংগ্রহ করে। স্ত্রীলোকেরা মঠের লামা ও ডাবাদিগের সেবা করে; কিন্তু কখনই লামার আসনে আসীন হইতে পারে না; এবং মঠের উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত হয় না। অধিকাংশ মঠেই দেখা যায় যে, এই সন্ন্যাসিনীরা রন্ধন ও সেবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কাষ্ঠসংগ্রহ, জলবহন, অতিথিসেবা, ইহা ডাবা ও স্ত্রী সন্ন্যাসিনীদিগের প্রধান কার্য্য। লামাদের বিষয় অনেক লিখিবার আছে; তাহা পরে লিখিব।

আমি প্রধান লামার নিকট এই সব বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া ২২ শে আষাঢ় ত্রেতাপুরী পরিত্যাগ করিলাম। এই ত্রেতাপুরী মঠে আর একটি লামা আছেন, তিনি যোগী। সর্ব্বদাই স্বস্তিকাসন করিয়া প্রাণায়ামে নিযুক্ত। তাঁহার সঙ্গে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গ যোগের বিষয় অনেক প্রকার কথাবার্ত্তা হইল। যোগশাস্ত্রেও ইঁহার বিশেষ অধিকার আছে। ইনি ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে লাসার কোনও মঠে প্রবেশ করেন। তাহার পর জ্ঞান ও যোগ অভ্যাস করিয়া বাণিজ্য দ্বারা অর্থসঞ্চয় করেন। তার পর সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দেহত্যাগের জন্য এই মহাতীর্থ ত্রেতাপুরীতে আসিয়াছেন। ইনি আজীবন এখানেই থাকিবেন। ইঁহার সেবার জন্য দুই জন ডাবা আছে। ইনি কোনও মঠের অন্তর্গত নহেন। স্বাধীনভাবে ভজন সাধনে দেহত্যাগের দিন অপেক্ষা

করিতেছেন।* ইঁহার সঙ্গে প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা আমার আলাপ হইয়াছিল। এখানকার লামারা সকলেই এখানে কিছু দিন অবস্থিতির জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাঁহাদের অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না। কারণ, কৈলাস ও মানস সরোবরে আমার মন, দেহ ত্রেতাপুরীতে থাকিবে কি করিয়া? সুতরাং ত্রেতাপুরী ত্যাগ করিতে হইল। রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে আমরা ত্রেতাপুরী ত্যাগ করিলাম।

অদ্যকার পথ বড় সুন্দর। অবরোহণ নাই। পর্ব্বত শ্যামল তৃণে সমাবৃত; মাঝে মাঝে কণ্টকবৃক্ষ। অনেক দিন বরফ ভিন্ন শ্যামল তৃণ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই, অদ্য তাহা দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। সানন্দমনে চলিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে ৪।৫ জন তীর্থযাত্রীর সহিত দেখা হইল। তাঁহারা সকলেই উত্তর মহাসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে দুটি সন্ন্যাসিনী, একটি সন্ন্যাসী, আর দুই জন গৃহস্থ। ইঁহারা দুই বৎসর হইল গৃহত্যাগ করিয়াছেন। তিব্বতের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া কৈলাস যাইতেছেন। কৈলাস হইতে ইঁহারা জ্বালামুখী, কাশী ও বুদ্ধগয়া হইয়া নেপালের পশুপতিনাথে গমন করিবেন। কেবল শীত ঋতুর অপেক্ষা করিয়া পাহাড়ে আছেন; কার্ত্তিক মাসে সমভূমিতে যাইবেন। ইঁহারা সকলেই শৈব। সন্ন্যাসীটির মস্তকে দীর্ঘজটা, হস্তে ত্রিশূল, ললাটে ভস্মত্রিপুণ্ড্র, গলে রুদ্রাক্ষ, হস্তে রুদ্রাক্ষের জপমালা। সন্ন্যাসিনীদেরও ভূষণ সেইরূপ। সন্ন্যাসিনীদিগকে দেখিয়া স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইল না। তাঁহারা তপস্যা দ্বারা জীবনকে শিবগত করিয়া এমন মূর্ত্তি পাইয়াছেন যে, দেখিলেই ভক্তির সঞ্চার হয়। আমি ইঁহাদিগকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া গন্তব্য পথে চলিতে লাগিলাম। বেলা অনুমান ১১টার সময় একটি নদীর তীরে প্রকাণ্ড এক গুহা পাইলাম। গুহাটি দেখিয়া তথায় থাকিবার ইচ্ছা হইল। সঙ্গীদিগকে বলিলে তাহারাও সম্মত হইল। এই দিবস এই স্থানেই রহিয়া গেলাম। এই স্থানের নাম "ডোপা"। ডোপা একটি আড্ডা। এখানে অনেকেই রাত্রিযাপন করেন। আমরা গুহাতে বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দেখি, নদীর পর পার হইতে ৪।৫ জন লোক আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার সঙ্গী ভৃত্যেরা বলিল, "ইহারা সকলেই ডাকাত।" আমি বলিলাম, "কি করিয়া চিনিলে?" ভৃত্যেরা বলিল, "ইহাদের সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র আছে; আর ইহাদের আকৃতি এমন বিকট যে, দেখিলেই ভয়ের সঞ্চার হয়। আমরা জানি, এই

জাতীয় লোকেরাই ডাকাতি করিয়া থাকে।” এই বলিয়া আমার সঙ্গে যাহা ছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, সমস্ত টাকা একত্র করিয়া কতক গুহার মধ্যে মাটীর নীচে এবং কতক পর্ব্বতের উপরে মাটীর নীচে লুকাইয়া রাখিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ডাকাতেরা আমাদের নিকট আসিল, এবং আমাদের অবশিষ্ট দ্রব্যাদি সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিল। আমার সঙ্গের শক্তিমূর্ত্তি ও ত্রিশূল দেখিয়া আর কিছু বলিল না; আমার ভৃত্যোদের নিকট হইতে তামাকু ও অগ্নি লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আজিকার মত আমরাও নিস্তার পাইলাম।

পর দিন প্রাতঃকালে নদী পার হইলাম। অদ্য অপর একটি নদীর তীরে তীরে চলিতে হইবে। আমরা নদী পার হইয়া অপর একটি নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। অদ্যকার পথও ভাল; একেবারে সমভূমি। নদী-তীর হরিদ্বর্ণ ঘাসে আবৃত ও নয়নারাম। আজ চলিতে আর ক্লান্তি নাই; মনের আরামে চলিতেছি। যাইতে যাইতে দেখিলাম, সম্মুখে একটি হ্রদ। হ্রদের চারি দিকে পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের মধ্যে দক্ষিণদিকস্থ পর্ব্বতের নাম “দোঞ্চু”। দোঞ্চু অর্থাৎ সপ্তনদীর সঙ্গমস্থল। দোঞ্চুতে একটি মঠ আছে; সেই মঠে যাইয়া আমরা বিশ্রাম করিব। এই স্থানে আর দুইটি নদী আসিয়া একটি হ্রদ হইয়াছে। হ্রদের মধ্যে শতদ্রু নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে, এবং হ্রদ হইতে শতদ্রু বাহির হইয়া নিম্নে গিয়াছে। এই সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া তথায় প্রায় তিন ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিলাম। ঐ হ্রদের উপ-কূলে শত সহস্র চামর, মেষ ও ছাগ চরিতেছে। তাহাদের বর্ণ শুভ্র; হ্রদের উপকূল শ্যামল ঘাসে আবৃত; বোধ হইল, হ্রদের মধ্যে সহস্র সহস্র শ্বেতপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রায় ১১ টার সময় দোঞ্চু মঠে উপস্থিত হইলাম।

দোঞ্চু মঠ অতি ক্ষুদ্র ও পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গে স্থাপিত। মঠের নিম্নে সমভূমি। সেই সমভূমিতে গৃহস্থদিগের অসংখ্য তাম্বু পড়িয়াছে। গ্রাম্য পশুতে মাঠ পরিপূর্ণ। কুকুরও যথেষ্ট আছে। মাঠে কুকুরের রব হইতেছে, ঐ রব পর্ব্বতশৃঙ্গে ঠেকিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই প্রতিধ্বনি শুনিয়া বোধ হইল, পর্ব্বত হইতে অগণ্য কুকুর রব করিতেছে। এই কুকুর-রবে ভীত হইয়া আমি মঠের অদূরে বসিয়া পড়িলাম। আমার সঙ্গীরা আমার পশ্চাতে পড়িয়া ছিল, তাহারা আসিয়া বলিল, “এখানে বসিলেন

কেন? মঠে চলুন।” আমি বলিলাম, “এই মঠে অনেক কুকুর আছে, আমি আগে যাইব না; তোমরা অগ্রে অগ্রে যাও, আমি তোমাদের পশ্চাতে যাইতেছি।” বিষ্ণু সিংহ বলিল, মঠে কুকুর নাই। মাঠে কুকুর রব করিতেছে, তাহার প্রতিধ্বনি শুনিয়া আপনি ভীত হইয়াছেন ” এই কথা শুনিয়া বিষ্ণু সিংহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। মঠের দ্বারদেশে যাইয়া দেখি, কতকগুলি বস্তার উপর একটি ভোলামহেশ্বর পুরুষ বসিয়া আছেন। সম্মুখে কতকগুলি চামর বাঁধা আছে, এবং কতকগুলি লোক সোহাগা ও লবণ বস্তা বাঁধিয়া চামরের পৃষ্ঠে বোঝাই করিতেছে। বিষ্ণু সিংহের কথায় বুঝিলাম, ইনি এই মঠের ‘লামা’। আমি লামাকে অভিবাদন করিলাম। লামা আমাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন, “আপনি মঠে প্রবেশ করুন, আমি আপনার সমস্ত আয়োজন করিয়া মঠে যাইতেছি।” আমি মঠে যাইয়া মঠের সম্মুখের বারান্দায় আসন করিয়া বসিলাম। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি লোক আসিল। কেহ বলিল, ইনি ইংরাজের অনুচর। কেহ বলিল, না, ইনি তীর্থযাত্রী ও কাশীর লামা; ও কথা বলিলে পাপে ডুবিয়া, মরিবে। নিম্নখু গ্রামের এক জন মোড়ল গোছের লোক আমাকে বলিল, “তুমি বোধ হয় ইংরাজের লোক, আমি এখনই যাইয়া দারচিন্ ও বরখাতে খবর দিতেছি।” আমি বলিলাম, “তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর; আমিও কল্য দারচিন্ যাইব। আমি তীর্থভ্রমণ করিতে আসিয়াছি, জীবনের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়াছি, তুমি বা তোমার রাজা আমার কি করিবে?” এই কথা শেষ হইতে না হইতে লামা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কথার মর্ম্ম বুঝিয়া তাহাকে বলিলেন, “তুমি আমার মঠ হইতে চলিয়া যাও। তোমাদের জ্বালায় দেখিতেছি আর সাধু মহাত্মারা আমার মঠে পদধূলি দিবেন না। তুমি ইঁহার কি করিবে? তুমি দারচিন্ ও বরখায় যাইয়া খবর দাও, আমিও তথায় চিঠি লিখিয়া দিতেছি। ইনি সাধু। ইঁহাকে লইয়া পীড়াপীড়ি করিলে তোমাদের ভাল হইবে না।” লামার এই কথা শুনিয়া লোকটা একান্ত অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেল। লামাজী আসিয়া আমার আসনে বসিলেন। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, এই লামা সিদ্ধ মহাপুরুষ; ইনি পূর্ব্বজন্মের পরিচয় দিয়া এই দোঙ্কু মঠের লামা হইয়াছেন। আমি করযোড়ে বলিলাম, “মহারাজ, আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত শুনিতে আমার একান্ত কৌতূহল হইয়াছে; আপনি কৃপা করিয়া আপনার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বলুন। আর কি করিয়া এত অল্প

বয়সে আপনি লামা হইলেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।” লামা বলিলেন, আমার জন্মস্থান এ স্থান হইতে পশ্চিম দিকে থুলিং মঠে। থুলিং মঠ এ স্থান হইতে ১৫।১৬ দিনের রাস্তা। আমার বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন আমি জানিতে পারিলাম, আমি পূর্ব্বজন্মে দোঞ্কু মঠের লামা ছিলাম। এই কথা আমার পিতা মাতাকে জানাইলাম ও বলিলাম, ‘আমি তোমাদের ঘরে থাকিব না, আমি সন্ন্যাসী হইব ও অচিরে আমার মঠে চলিয়া যাইব।’ এই সংবাদ থুলিং মঠের প্রধান লামার কর্ণে উঠিল। তিনি লাসার প্রধান লামার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। লাসা হইতে লামা আসিয়া দোঞ্কু মঠের কি কি জিনিসপত্র আছে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্ত বিষয়ের উত্তর দিলাম, এবং মঠে সেই সময় যত আয় ব্যয় স্থিতি ছিল, সমস্ত তাঁহাকে বলিলাম। তিনি আমার কথা লিখিয়া লইলেন, এবং দোঞ্কু মঠে যাইয়া আমার কথার সঙ্গে মঠের খাতাপত্র টাকা কড়ি সমস্ত মিলাইয়া বুঝিলেন, আমার কথা ঠিক হইয়াছে। এইরূপ ঠিক ঠাক করিয়া লামা আমাকে সঙ্গে করিয়া লাসায় চলিয়া গেলেন। আমার কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি লাসায় থাকিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। আজ বার বৎসর হইল, এই মঠে আসিয়াছি।” এই কথা বলিয়া লামা বলিলেন, “আপনার আহারের জন্য আমি মাখন, চা, ও ছাতু লইয়া আসিয়াছি, গ্রহণ করুন।” আমিও তাঁহার প্রদত্ত সামগ্রী গ্রহণ করিয়া বলিলাম, “আগে দেব দর্শন করিব, তার পর আহারাদি করিব।” তাঁহার ইঙ্গিতে অপর এক জন লামা দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল। আমি দেবদর্শন করিতে উঠিলাম; উঠিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এই মন্দিরটিও ত্রেতাপুরীর দেবমন্দিরের মত, সেইরূপ সাজান; তবে এই মন্দিরে দিনরাত্রি ১৯টা প্রদীপ জ্বলিতেছে, এবং প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধমূর্ত্তি। পার্শ্বে বিষ্ণুমূর্ত্তি ও শিবমূর্ত্তির অভাব নাই। তবে এখানে শিবমূর্ত্তির বামাঙ্গে ভগবতীর মূর্ত্তিও দেখিতে পাইলাম।

এই মন্দির দেখিয়া বাহিরে আসিলাম। লামা তাঁহার বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। আমি আহারাদির উদ্যোগে ব্যস্ত হইলাম। এই মন্দিরে প্রায় দিবারাত্রই পাঠ ও বাদ্য হইয়া থাকে। আর বেলা ২টা হইতে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত পাঠ ও বাদ্য চলিতেছিল। আমাদের দেশে ব্যাধিশান্তির জন্য যেমন ব্রাহ্মণেরা স্বস্ত্যয়ন করেন, এ দেশেও ব্যাধিনিষ্কৃতির জন্য লামারা স্বস্ত্যয়নাদি করিয়া থাকেন। তবে ইঁহারা দক্ষিণার জন্য পীড়াপীড়ি করেন না; মাখন,

চা ও ছাতু পাইলেই পরম সন্তুষ্ট। রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত লামাদের সঙ্গে মন্দিরে ছিলাম; পরে লামা শয়ন করিতে চলিয়া গেলেন, আমিও তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শয়ন করিলাম। ঘণ্টা দুই বিশ্রামের পর রাত্রি দুই দণ্ড থাকিতে এই মঠ হইতে দারচিন্ যাত্রা করিলাম।

শ্রীরামানন্দ ভারতী।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।

আবিষ্কার না বলিয়া আবিষ্কারপরম্পরা বলা উচিত; কেন না, গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র কর্ত্তৃক নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার স্রোতের মত ধারা বাঁধিয়া চলিতেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি নূতন তত্ত্বের নির্ণয় হইয়াছে, আবার প্রত্যেক নির্ণীত তত্ত্ব এক একটা আঁধার দেশ আলো-পূর্ণ করিয়া দিয়াছে—বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিহাসে ইহার তুলনা যে অত্যন্ত অধিক আছে, তাহা নহে।

আমাদের ছোট মুখে বড় কথা বলিতে ভয় হয়। কিন্তু সত্তর বৎসর পূর্ব্বে যখন লণ্ডনের রাজকীয় বিজ্ঞানসমাজের (রয়াল ইনষ্টিটিউশনের) প্রাচীরা-ভ্যন্তর হইতে মাইকেল ফ্যারাডের আবিষ্কারপরম্পরা একের পর এক বাহির হইয়া বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর শ্বাসরোধের উপক্রম করিয়াছিল, সেই সত্তর বৎসরের প্রাচীন ইতিহাস কতকটা মনে আসে। কিন্তু আমাদের এত ছোট মুখে এত বড় কথা না আনাই ভাল।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র তাড়িত-উর্ম্মির অস্তিত্ব ধরিবার জন্য নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, প্রথম যখন শোনা যায়, তখন কথাটাতে বিশ্বাস হয় নাই। কেন না, বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে হাজার চাষ দিয়াও বৈজ্ঞানিক ফসলের উৎপাদন অসম্ভব, ইহা ত একটা ধ্রুব বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া বহুপূর্ব্বে অব-ধারিত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু যখন স্বচক্ষে দেখা গেল, একটা অতি ক্ষুদ্র বাক্সের ভিতর হইতে তাড়িততরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া আর একটা ছোট বাক্সের ভিতর রক্ষিত লোহার তারের উপর পতিত হইবামাত্র সেই তারে তাড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন

হইতেছে, এবং প্রবাহবলে কম্পাসের কাঁটা নাড়া হইতে পিস্তলের আওয়াজ পর্য্যন্ত চলিতে পারিতেছে, তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!

বস্তুতই সেদিন বিজয়ের দিন বটে, কেন না এত অল্প আয়াসে এত বড় দুঃসাধ্য কাজ যে সাধিত হইতে পারে, তাহা ইহার পূর্ব্বে শুনি নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মান অধ্যাপক হার্ৎজ্ তাড়িত তরঙ্গের উৎপাদনের ও তাড়িত তরঙ্গের অস্তিত্বপ্রতিপাদনের উপায় বাহির করিয়াছিলেন, এবং পণ্ডিতেরা এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু সেই অস্তিত্বপ্রতিপাদন যে এত অল্প আয়াসে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা জানিতাম না। যাহাই হউক, বিজ্ঞানের রণক্ষেত্রে সেনানীগণ যেখানে যত দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, আমাদের স্বদেশীয় এক ব্যক্তি সেখানে অগ্রণী হইয়াছেন, ইহা প্রকৃতই বিজয়বার্ত্তা।

সেই দিন হইতে নূতন নূতন সংবাদ সহকারে ভারতবাসীর এই বিজয়-বার্ত্তা পৃথিবী জুড়িয়া ঘোষিত হইতেছে, ইহা অসীম আনন্দের কথা, কিন্তু আনন্দপ্রকাশে যেটুকু স্বাস্থ্যের ও সবলতার প্রয়োজন, সেইটুকু বল ও স্বাস্থ্য বুঝি আমাদের নাই।

ঘটনা বৃহৎ, কিন্তু এই বৃহৎ ঘটনা কিরূপে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব, তাহা বুঝিতেছি না।

ধাতুদ্রব্য কাহাকে বলে, বুঝাইতে হইবে না; কোন্ জিনিষ ধাতু নহে, তাহাও বুঝাইতে হইবে না। ধাতু, যথা সোনা রূপা তামা। ধাতু নহে, জল বায়ু ইট কাট। কিন্তু যাহা ধাতু ও যাহা ধাতু নহে, উভয়ের অভ্যন্তরে যে আকাশ নামক সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহার স্বরূপ ঠিক্ বুঝাইয়া না দিলে অনেকেই হয় ত বুঝিবেন না। কিন্তু সে কথা বুঝাইবার এখন সময় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এই সূক্ষ্মপদার্থ বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, এবং সূর্য্যমণ্ডল ও নক্ষত্রমণ্ডলী হইতে সংবাদবহন এই আকাশের নিরূপিত কার্য্য। সূর্য্যের ও নক্ষত্রের শরীরগত পরমাণুগুলি এই আকাশে যে ধাক্কা দেয়, তাহাই ঢেউ উৎপাদন করিয়া আমাদের চোখে লাগে। সেই ঢেউএর ধাক্কা মস্তিষ্কে উপনীত হইলে যে অনুভূতি জন্মে, তাহাকেই বলি আলো ও তাহার অভাবই আঁধার। এবং সেই আলোকের অনুভূতি দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লই, ঐখানে ওটা সূর্য্য আর ঐখানে ওটা একটা তারকা। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকাশের স্থিতিস্থাপকতা এত

বেশী যে, সেই ঢেউগুলি প্রায় সেকণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে আকাশ বাহিয়া চলিয়া থাকে।

আলোকের উৎপাদক শক্তি সেই আকাশের ঢেউ, কিন্তু তাড়িত শক্তি ও চৌম্বক শক্তি নামে আরও দুইটা আমাদের অতিপরিচিত শক্তি আছে, সেই দুইটার সহিত আকাশের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, সত্তর বৎসর পূর্ব্বে তাহা কাহারও কল্পনায় আসে নাই। উপরে যে মনস্বী পুরুষ মাইকেল ফ্যারাডের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারই আবিষ্কারপরম্পরা প্রথমে সম্ভাবনা দেখাইয়া দেয় যে, সেই আলোকবাহী আকাশ পদার্থই তাড়িত শক্তির ও চৌম্বক শক্তিরও আধার হইতে পারে।

তৎপরে মাক্সোয়েল ফ্যারাডের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে ভিত্তিভূমি করিয়া প্রায় প্রতিপন্ন করেন যে, সেই আকাশমধ্যে কোনরূপ টান পড়িলেই তাড়িত শক্তির, ও আকাশমধ্যে কোনরূপ ঘূর্ণী উৎপন্ন হইলেই চৌম্বক শক্তির উৎপত্তি হয়। একখানা তামার থালা ও একখানা দস্তার থালা উপরি উপরি স্পর্শ করিয়া দুইখানাকে বিচ্ছিন্ন করিলেই, উভয়ের মধ্যগত আকাশে, অর্থাৎ উভয়ের ব্যবধানভূত বায়ুর মধ্যস্থ আকাশে টান পড়ে; তখন আমরা বলি, থালা দুখানা তাড়িতযুক্ত হইয়াছে। এই টানটা বায়ুর মধ্যগত আকাশেই পড়ে, এবং বায়ুর ন্যায় যে সকল দ্রব্য ধাতু নহে, তাহাদের মধ্যস্থ আকাশেই পড়ে; ধাতুদ্রব্যের মধ্যস্থ আকাশে এই টান সংক্রান্ত হয় না। ধাতুর মধ্যে আকাশটা যেন স্থিতিস্থাপকতাবর্জ্জিত; যেন উহা টান সহিতে পারে না। আর অপধাতু বা অধাতব পদার্থের মধ্যস্থ আকাশ যেন টানসহ। অধাতব পদার্থের আকাশ যেন রবারের মত বা ইস্পাতের মত, আর ধাতব পদার্থের মধ্যস্থ আকাশ যেন মোমের মত বা কাদার মত। ধাতব পদার্থের মধ্যস্থ আকাশে এই টান দিলে সেই আকাশ যেন মোমের মত বা কাদার মত বা গুড়ের মত বা জলের মত সরিয়া যায় ও গড়াইয়া যায়, উহাতে টান পড়ে না; এইরূপে উহাতে তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন হয়। আর অধাতব পদার্থের অভ্যন্তরস্থিত আকাশে টান দিলে উহা রবারের মত বা স্প্রিংএর মত, খেঁচিয়া ধরে; উহাতে তাড়িত প্রবাহ জন্মে না।

ধাতুপদার্থের উদাহরণ একটা তামার তার। এই তারের ভিতর আকাশে টান পড়িলে উহা ক্রমেই সরিয়া যায় ও গড়াইয়া যায় ও এইরূপে উহার মধ্যে

তাড়িতপ্রবাহ জন্মে। এই তাড়িতপ্রবাহের সাহায্যে আমরা আজকাল টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরণ করি ও টেলিফোনের শব্দ চালনা করি ও ট্রাম-পথে গাড়ী চালাই ও রাজপথে ও গৃহমধ্যে আলো জ্বালি।

তারপথে এই তাড়িতপ্রবাহ চলিবার সময় তাহার চতুঃপার্শ্বে বাহিরে বায়ুমধ্যস্থ আকাশে ঘূর্ণাবর্ত্ত উপস্থিত হয়। সেইখানে একটা লোহার কাঁটা ধরিলে লোহার অণুগুলা সেই ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিয়া যায়, কাঁটাটাও ঘুরিয়া গিয়া সেই আবর্ত্তের পাকের অনুকূলে দণ্ডায়মান হয়। এই ব্যাপারের নাম চৌম্বক ব্যাপার, এবং সেই তদবস্থ লোহার কাঁটার নাম চুম্বকের কাঁটা বা কম্পাসের কাঁটা—বা দিগ্দর্শন-শলাকা।

ম্যাক্সোয়েল দেখাইয়াছিলেন, সেই আকাশের কোন অংশে একটা টান দিয়া ছাড়িয়া দিলে, সেই অংশটা কিছু ক্ষণ দুলিবার সম্ভাবনা;—একটা স্প্রিংকে যেমন টানিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা দুলিতে থাকে। এবং আকাশ যখন বিশ্বব্যাপী, তখন উহার এক অংশে এইরূপ একটা দোলন ঘটাইয়া দিলে সেই আন্দোলনের ধাকায় চারি দিকে ঢেউ উঠিয়া দিগ্বিদিকে ছুটিবার সম্ভাবনা। আলোকের ঢেউগুলি যদি আকাশপথে সেকণ্ডে লক্ষক্রোশ বেগে চলিতে পারে, তবে এই তাড়িতের টানে উৎপন্ন ঢেউগুলিও ঠিক সেই লক্ষক্রোশ বেগেই চলিবার সম্ভাবনা।

ম্যাক্সোয়েল বলিয়াছিলেন, আকাশই যদি তাড়িত শক্তির আধার হয়, তাহা হইলে আকাশে যখন ছোট ছোট আলোকের ঊর্ম্মি চলিয়া থাকে, তবে বড় বড় তাড়িত ঊর্ম্মিরও আকাশপথে চলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু সম্ভাবনাই প্রমাণ নহে। আকাশই তাড়িত-শক্তির আধার বটে কি না; আর আধার হইলেও আকাশে সেইরূপ বড় বড় ঢেউ উঠে কি না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবশ্যক। আলোক বহন করে যে আকাশ, সেই আকাশই তাড়িতশক্তির আধার না হইতেও পারে। তজ্জন্য স্বতন্ত্র আকাশ বা আকাশতুল্য পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। এবং তাড়িতের ঢেউ একটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অপরিচিত নূতন ব্যাপার—কেবল অনুমান বা যুক্তিবলে ইহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না, প্রত্যক্ষ নিদর্শন আবশ্যক।

হার্ৎজ্ সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য দুইটা যন্ত্রের প্রয়োজন। একটাতে তাড়িত তরঙ্গ উৎপাদন করিবে,

আর একটাতে উহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিবে। প্রথম যন্ত্রে আকাশে একবার টান দিয়া ছাড়িয়া দিলেই আন্দোলন জন্মিবে, দ্বিতীয় যন্ত্রে সেই আন্দোলনের ধাক্কা আসিয়া পৌঁছিলে সে কোন রকমে সাড়া দিবে। আলোকের সঙ্গে তুলনা কর। প্রথমটা যেন দীপশিখা, সেই স্থলে আকাশে ধাক্কা লাগিয়া আলোকতরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে। দ্বিতীয়টা যেন আমাদের চোখ, সেখানে সেই তরঙ্গ প্রতিহত হইয়া আলোকের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

টান দিয়া আকাশে ধাক্কা দিবার উপায় পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। মেঘের কোলে যখন বিদ্যুল্লতা চমক দেয়, তখন আকাশে সহসা ধাক্কা পড়ে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রে যখন ছোট স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তখনও আকাশে সহসা ধাক্কা লাগে। বিড়ালের গায়ে একটা চাপড় দিলেও যে আকাশে ধাক্কা না লাগে, এমন নহে।

হার্ৎজের বাহাদুরী এই দ্বিতীয় যন্ত্রটির আবিষ্কারে—যে যন্ত্রটি তাড়িত তরঙ্গের পক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মত কাজ করে। দূরোৎপন্ন সুদীর্ঘ তাড়িত তরঙ্গ আকাশ বহিয়া এই যন্ত্রে ধাক্কা দিলে সেই যন্ত্রমধ্যেও তাড়িতের খেলা আরম্ভ হয়, এবং সেই তাড়িতের খেলার বিবিধ প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়। তাড়িতের খেলার প্রত্যক্ষ ফল নানাবিধ। আলো জ্বালা হইতে গাড়ী টানা পর্য্যন্ত তাহার উদাহরণ।

হার্ৎজ্ এই যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া দেখান, বাস্তবিকই আকাশের মধ্য দিয়া তাড়িতের ঢেউ চলিয়া থাকে। দূরে একটা ধাতুপৃষ্ঠে তাড়িতপ্রবাহ নাচাইয়া দিলে সেই তাড়িত নৃত্য বায়ুর ব্যবধান অর্থাৎ বায়ুমধ্যস্থ অদৃশ্য আকাশের ব্যবধান ভেদ করিয়া, সেই আকাশপথে সঞ্চালিত হইয়া, দূরস্থিত আর একখানা ধাতুপৃষ্ঠে তাড়িতপ্রবাহ নাচাইয়া দেয়, ও সেই নর্ত্তনের প্রত্যক্ষ ফল চক্ষুর গোচর করিয়া দেয়। মাক্সোয়েল যাহা জ্ঞান-চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, হার্ৎজ্ তাহা চর্ম্মচক্ষুর বিষয়ীভূত করিয়া দিলেন।

তাড়িতপ্রবাহ ও তাড়িততরঙ্গ এই দুইটি শব্দ, পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছি, ও আবার ব্যবহার করিতে হইবে। পাঠকগণকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত, প্রবাহ ও তরঙ্গ উভয়ের অর্থে তফাত আছে। প্রবাহের বশে পদার্থ এক মুখে চলে, যেমন নদীতে স্রোতের জল। আর তরঙ্গের বশে গতি ইতস্ততঃ ঘটে; নদীর তরঙ্গে তরণী উঠা নামা করে ও দোদুল্যমান হয়। সেইরূপ তাড়িতের প্রবাহে আকাশ একমুখে গড়াইয়া চলে—এই

প্রবাহে টেলিগ্রাফের খবর চলে। আর তাড়িতের তরঙ্গে আকাশ ইতস্ততঃ দুলিতে থাকে; দোদুল্যমান হয়। ধাতুফলকের পিঠে তরঙ্গ সংক্রামিত হইলে আকাশ একবার এ ধার যায়—এক বার ও ধার যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সর্ব্বত্র এই অর্থগত প্রভেদটি মনে রাখা আবশ্যক। তরঙ্গের সহিত প্রবাহের এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য উপরে 'দোলন' 'আন্দোলন' 'নৃত্য' 'নর্ত্তন' 'নাচ' প্রভৃতি স্পন্দনবোধক শব্দের ব্যবহার করা গিয়াছে।

এখন দেখা গেল, আকাশমধ্যে ছোট বড় বিবিধ উর্ম্মি উৎপন্ন হইয়া সেকণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে চলে। ছোট ছোট ঢেউগুলির নাম আলোক-তরঙ্গ, বড় বড় ঢেউগুলির নাম তাড়িততরঙ্গ; ছোট বড় সকল ঢেউ আকাশতরঙ্গ। উপযুক্ত উর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্র থাকিলেই আমরা সেই সকল উর্ম্মির অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারি। আমাদের চক্ষু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাশ-তরঙ্গ, যাহার নাম আলোক, তাহার পক্ষে উর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্রের কাজ করে। উপযুক্ত উর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্রের অভাবেই হার্ৎজের পূর্ব্বে কেহ বড় বড় আকাশতরঙ্গের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

হার্ৎজের পরবর্ত্তী কালে এই উর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্রের প্রভূত উন্নতিসাধন হইয়াছে। একটা নলের ভিতর লোহার গুঁড়া পুরিলে সেই লৌহচূর্ণের স্তর ভেদ করিয়া তাড়িতপ্রবাহ চলিতে পারে না। কিন্তু দূর হইতে আকাশতরঙ্গ আসিয়া এই লোহাচুরে পতিত হইলেই কি জানি কিরূপে উহার তাড়িতপ্রবাহ-প্রতিরোধের ক্ষমতা কমিয়া যায়; তখন উহার ভিতর দিয়া অবাধে তাড়িতপ্রবাহ চলিতে পারে। এই তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা তখন তুমি চুম্বকের কাঁটা নাড়াইয়া দিতে পার, বা আলো জ্বালিতে পার, বা পিস্তলের আওয়াজ করিতে পার, বা গাড়ী টানিতে পার। এই লোহাচুরে উর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্রের কাজ চলিতে পারে। এইরূপ যন্ত্রকে ইংরাজীতে Coherer বলে।

ধাতুচূর্ণের কণিকাগুলির মাঝে কেবল ফাঁক। নিরেট ধাতু পদার্থে তাড়িতপ্রবাহ স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে,—কিন্তু ধাতুচূর্ণে এই ফাঁক পার হইয়া যাইতে পারে না। অধ্যাপক লজ অনুমান করেন যে, আকাশতরঙ্গের প্রভাবে কোন মতে এই ফাঁকগুলি বুজিয়া যায়; কণিকাগুলি পরস্পর সংযুক্ত ও সংহত হয়; তখন তাড়িতপ্রবাহ অবাধে চলে। এই cohesion বা সংযোগ-সাধন বা সংহতিসাধন দ্বারা কাজ করে বলিয়া যন্ত্রের নাম coherer.

ধাতুর গুঁড়া না হইলেই যে coherer প্রস্তুত হয় না, এমন নহে। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের coherer কতকগুলি তারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তারে তারে স্পর্শ থাকে, স্পর্শস্থলে তাড়িততরঙ্গের ধাক্কা পড়িলেই তারের প্রবাহ-পরিচালন-শক্তি জন্মে।

ফলে যে রূপেই হউক, তাড়িততরঙ্গের ধাক্কা পাইলে অপরিচালক দ্রব্যে পরিচালকতা জন্মে, অথবা কুপরিচালক দ্রব্য সুপরিচালক হইয়া যায়। Coherer অর্থাৎ উর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্রগুলির মূল তথ্য এই।

মার্কণি যে উর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ত্রিশ চল্লিশ ক্রোশ বা ততোধিক দূর হইতে সমাগত তাড়িততরঙ্গ অবলীলাক্রমে ধরা পড়িতেছে।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ও ইতালির মার্কণি বিনা তারে সংবাদপ্রেরণে সমর্থ হইয়াছেন, এই বার্ত্তা প্রায় সমকালে প্রচারিত হয়। মার্কণি এই কয় বৎসর মধ্যে বহুক্রোশ দূর হইতে বিনা তারে সংবাদপ্রেরণে সমর্থ হইয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র বহুদূর হইতে সংবাদপ্রেরণ জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। তাঁহার বন্ধুবর্গ এই জন্য কতকটা হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন। জগদীশ বাবু তাঁহার বন্ধুগণের নিকট অনুযোগভাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যে সংবাদপ্রেরণের ব্যবসায়ে খ্যাতিলাভে মতি হয় নাই, এ জন্য স্বদেশ কালে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে। ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে তাঁহার অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকিত বটে, কিন্তু আজ আমরা যে সকল নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া চমকিত ও বিস্মিত হইতেছি, সে আশা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইত।

যাহা হউক, তৎকালে জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত উর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্র অতি অদ্ভুত উদ্ভাবনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। সেই শ্রেণীর বা তদুদ্দেশ্যে নির্ম্মিত আর সকল যন্ত্রই উহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। স্বোদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাড়িততরঙ্গের বিবিধ ধর্ম্মনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; প্রকৃতির বিবিধ গুপ্ত রহস্য আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এবং নিত্য নূতন রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া যশস্বী হইতেছিলেন। অচিরে প্রতিপন্ন হইল যে,—আকাশবাহিত তাড়িততরঙ্গে ও আকাশবাহিত আলোকতরঙ্গে কোন মৌলিক প্রভেদ বর্ত্তমান নাই।

আলোকতরঙ্গের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্ম আছে। ধাতু পদার্থের মধ্যে আলোকতরঙ্গ প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য ধাতু পদার্থ অনচ্ছ হয়।

মসৃণ ধাতুনির্ম্মিত প্রাচীরের পিঠে ঠেকিলে আলোকতরঙ্গ প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে, বা প্রতিফলিত বা পরাবর্ত্তিত হয়।

সান্দ্র পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে হইলে উহার গতির মুখ ঘুরিয়া যায়, অর্থাৎ আলোকরশ্মি তির্য্যগ্‌গামী হইয়া তিরোবর্ত্তিত হয়।

দেখা গেল যে, আকাশতরঙ্গেও ঠিক এই এই ধর্ম্ম বর্ত্তমান।

এই যন্ত্রের সাহায্যে তাড়িততরঙ্গের যে সকল অজ্ঞাতপূর্ব্ব ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা এখন পুরাণ কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাড়িততরঙ্গ একখানা বাঁধা কেতাবের পাতার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়, আর বহিখানা ঘুরাইয়া ধরিলে আর অবাধে যাইতে পারে না; চুলের গোছার ভিতর চলে, ঘুরাইয়া ধরিলে আর অবাধে চলে না; কাষ্ঠদণ্ডের ভিতরে আঁশগুলি কোন্ মুখে রহিয়াছে, তাহা ঠিক্ করিয়া বলিয়া দেয়; প্রস্তরখণ্ডের কোন্ দিকে পরিচালকতা বেশী, কোন্ দিকে কম, তাহা ঠিক্ ধরিয়া দেয়; ইত্যাদি তত্ত্ব চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে নূতন আবিষ্কৃত হইলেও এখন পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি তাড়িততরঙ্গের যে অভিনব ধর্ম্ম বৈজ্ঞানিকগণের চমক লাগাইবার উপক্রম করিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক।

ধাতুচূর্ণ তাড়িতপ্রবাহের অপরিচালক, কিন্তু ধাতুচূর্ণের উপর তাড়িততরঙ্গের ধাক্কা পড়িলে উহার পরিচালকতা সহসা বৃদ্ধি পায়; তখন সেই ধাতুচূর্ণ বাহিয়া তাড়িতপ্রবাহ চলিতে পারে। ইহা পুরাণ কথা, এবং ধাতুচূর্ণের এই শক্তি অবলম্বন করিয়া আধুনিক উর্ম্মিনির্দ্দেশক coherer যন্ত্র সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। ধাতুচূর্ণের কণিকাগুলির মধ্যে একটা কিছু বিকার উৎপন্ন হয়, যাহার ফলে এইরূপ ঘটে। কণিকাগুলিকে আবার স্বভাবে আনিতে হইলে একটা আঙুলের ঠোকা দেওয়া প্রয়োজন হয়; একবার নাড়িয়া দিলে তবে উহারা প্রকৃতিস্থ হইয়া আপনার স্বাভাবিক অপরিচালকত্ব শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

দুই বৎসর হইল জগদীশচন্দ্র দেখান, এইরূপ নাড়া দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক নহে। এমন অনেক ধাতুদ্রব্য আছে, যাহাকে নাড়া না দিলেও আপনা আপনি স্বভাবে ঘুরিয়া আইসে। একটা তারে একটা

মোচড় দিলে প্রথমে পাক লাগে, কিন্তু তারটার পাক আবার আপনা হইতেই খুলিয়া যায়, কতকটা সেইরূপ।

ফলে স্থিতিস্থাপক দ্রব্যমাত্রেরই স্থিতিস্থাপকতার একটা সীমা আছে। স্থিতিস্থাপক তারকে মোচড়ান দিলে পাক লাগে, আবার স্থিতিস্থাপকতা গুণে আপনা হইতেই সেই পাক খুলিবারও প্রবৃত্তি থাকে। কিন্তু এই সীমার ভিতরে মোচড় দিলেই পাক খুলে। সীমা ছাড়াইয়া গেলে, আর সে পাক আপনা হইতে খুলে না। তখন জোর করিয়া আবার পাক খুলিতে হয়।

ইস্পাতে ও সীসাতে এইখানে প্রভেদ; কুঞ্চিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে আপনা হইতে ইস্পাত ঘুরিয়া আসে। সীসাকে বাঁকাইয়া ধরিলে উহার আকুঞ্চন স্থায়ী হইয়া যায়।

ধাতু পদার্থের অণুগুলাতেও যেন এইরূপ একটা স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম্ম আছে। তাড়িততরঙ্গের ধাক্কা পাইয়া অণুগুলি স্বস্থানচ্যুত হইয়া পড়ে ও আপনার স্থিতিস্থাপকতা গুণে আবার স্বস্থানে ঘুরিয়া আসিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ধাকাটা যদি অতিমাত্রায় প্রবল হইয়া উহাদিগকে স্থিতিস্থাপকতার সীমা ছাড়াইয়া স্থানভ্রষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে আর আপনা হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে না। তখন জোর করিয়া নাড়া দিয়া আঙুলের ঠেলা দিয়া উহাদিগকে ঘুরাইয়া আনিতে হয়। এই জন্য coherer যন্ত্রে আঙুলের ঠোকর দেওয়া আবশ্যক হয়।

দ্বিতীয় আবিষ্কার আরও বিচিত্র। এ পর্য্যন্ত জানা ছিল যে, তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পাইলে ধাতুচূর্ণের তাড়িতপ্রবাহ-পরিচালন-ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। জগদীশচন্দ্র দেখান, কতিপয় ধাতুর পরিচালনক্ষমতা বাড়ে, কিন্তু অনেক ধাতুর পরিচালনক্ষমতা আবার কমিয়া যায়। এইরূপে "সোনা রূপা আদি করি যত ধাতু আছে," সকলেরই উপর পরীক্ষা করিয়া জগদীশচন্দ্র প্রতিপন্ন করিলেন যে, ধাতুগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে; কাহারও পরিচালনশক্তি তাড়িততরঙ্গসংক্ষোভে বাড়িয়া যায়; কাহারও বা কমিয়া যায়। এই তথ্যটি সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্ব; ইয়ুরোপে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তাড়িততরঙ্গের সহিত পরিচালনশক্তির এই সম্বন্ধ কেবল ধাতুবিশেষেই আবদ্ধ নহে, ধাতুপদার্থমাত্রেই—কেবল ধাতু পদার্থ কেন—ধাতু—অপধাতু—বা অধাতু—সকল পদার্থ ই—অল্পবিস্তরপরিমাণে বর্ত্তমান আছে, তাহা প্রতিপন্ন হওয়ায় জড় পদার্থের একটা নূতন ধর্ম্মের আবিষ্কার হইল

বলা যাইতে পারে। মাইকেল ফ্যারাডে বহুদিন পূর্ব্বে পদার্থমাত্রেরই চুম্বকত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন। এই নূতন আবিষ্কারের সহিত সেই প্রাচীন আবিষ্কারের অনেকটা তুলনা হইতে পারে।

গোটা সত্তর মূল পদার্থ এখন রাসায়নিকগণের পরিচিত। ইহাদের সকলেরই পরিচালকতা তাড়িততরঙ্গের প্রতিঘাতে পরিবর্ত্তিত হয়; ইহা প্রতিপন্ন হইল। আবার কোন দ্রব্যের পরিচালকতা বাড়ে, কাহারও কমে; এই হ্রাসবৃদ্ধির মাত্রায় আবার তারতম্য আছে। কোন দ্রব্যের বেশী বাড়ে, কাহারও কম বাড়ে; কাহারও বেশী কমে, কাহারও কম কমে; এই হ্রাস-বৃদ্ধির মাত্রা অনুসারে মৌলিক পদার্থগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া দেখিলে একটা বিস্ময়কর রহস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

রুসীয় রাসায়নিক মেন্দেলীয়েফ পরমাণুর গুরুত্ব অনুসারে মৌলিক পদার্থ-গুলিকে সাজাইতে গিয়া উহাদের মধ্যে এক বিচিত্র সম্বন্ধের আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন। সত্তরটি মূল পদার্থের মধ্যে পরস্পর একটা অদ্ভুত গোছ জ্ঞাতি-সম্পর্ক বর্ত্তমান আছে, মেন্দেলীয়েফের অনুসন্ধানে তাহা প্রকাশ পায়। ক্রুকস প্রভৃতি বহু পণ্ডিত সেই জ্ঞাতিসম্পর্কের বিচার করিয়া এই সত্তর প্রকার দ্রব্য কিরূপে একই মূল দ্রব্যের বিকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার নিরূপণের জন্য কতই না প্রয়াস পাইয়াছেন। বিবিধ প্রাণিজাতির ও উদ্ভিজ্জাতির মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্কের সন্ধান পাইয়া ডারুইন যেমন এই বিভিন্ন জাতির সৃষ্টিপ্রণালীর আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এই সত্তর জাতীয় মূল পদার্থের মধ্যেও সেইরূপ জ্ঞাতিসম্পর্কের স্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়া উহাদেরও সৃষ্টি-প্রণালী আবিষ্কারের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা অদ্যাপি সফল হইয়াছে, বলা যায় না। জড় পদার্থের বিবিধ জাতির সৃষ্টিরহস্য ভবিষ্যতের যে ডারুইন আবিষ্কার করিবেন, তিনি এখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সম্পর্ক মেন্দেলীয়েফের আবিষ্কৃত সম্পর্কের সমর্থন দ্বারা তাঁহার পথ অনেকটা সুগম করিবে, সন্দেহ নাই।

তাড়িততরঙ্গের প্রতিঘাতে কোন বস্তুর পরিচালকতা বাড়ে, কাহারও কমে। কিন্তু এখানেই কথা ফুরাইল না। এই আঘাতের প্রবলতানুসারে আবার একই ধাতুরই পরিচালকতা হয় ত কমে, অথবা বাড়ে। আঘাতের তারতম্যানুসারে কখনও বা বাড়িয়া যায়, কখনও বা কমিয়া যায়। আবার যে সকল ধাতুর পরিচালকতা সহজে বাড়ে কমে না, তাহাকে একটু গরম করিলে

আবার বাড়িতে থাকে, বা কমিতে থাকে। অণুগুলি যেন জমাট বাঁধিয়া ছিল; উত্তাপ পাইয়া তাহারা কতকটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল, স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া হেলিবার দুলিবার অবকাশ পাইল। এখন তাড়িততরঙ্গের ধাক্কায় তাহারা হয় এ দিকে, কিংবা ও দিকে, হেলিয়া পড়িবার অবকাশ পাইল।

কেবল যে মৌলিক পদার্থেরই এরূপ তরঙ্গাঘাতে অবস্থাবিকার ঘটে, তাহা নহে। যৌগিক পদার্থেরও এইরূপ তরঙ্গের ঘা পাইয়া প্রতিক্রিয়া উৎপাদনের ক্ষমতা বর্ত্তমান রহিয়াছে। জগদীশচন্দ্র লোহাভস্ম (সাদা কথায়, লোহার মরীচা) লইয়া তদুপরি তাড়িততরঙ্গের আঘাত দিয়া উহার অদৃশ্য অণুগুলিকে কিরূপে নাচাইয়া দিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা নিতান্তই কৌতুকজনক।

তরঙ্গপ্রতিঘাতে ধাতুচূর্ণের পরিচালকতা বৃদ্ধি পায় দেখিয়া খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক লজ সাহেব একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছিলেন। উপরে তাহার আভাস দিয়াছি। তরঙ্গের ধাক্কা পাইয়া কণিকাগুলির অণুগুলি কতকটা সংহত ও সন্নিকৃষ্ট হয় ও জমাট বাঁধে; যাহারা ছাড়াছাড়ি ছিল, তাহারা কাছাকাছি আসে; ফলে পরিচালকতা বাড়িয়া যায়। এই সংহতি বাড়ে বলিয়াই পরিচালকতা বাড়ে। সংহতির ইংরাজি নাম cohesion; এই জন্য ধাতুচূর্ণনির্ম্মিত উর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্র coherer আখ্যা পাইয়াছে।

কিন্তু যদি কোন দ্রব্যের পরিচালকতা বাড়ে, কাহারও আবার কমে; এবং সেই একই দ্রব্যের পরিচালকতা কখনও বা বাড়ে, কখনও বা কমে; ইহাই যদি স্থির হইল, তাহা হইলে আর সংহতির ব্যাখ্যা অমূলক হইয়া দাঁড়ায়; অধ্যাপক লজের সিদ্ধান্তও ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

মোটা কথায় তাড়িততরঙ্গের ধাক্কা খাইলে জড় পদার্থমাত্রেরই,—ধাতুই বল আর অপধাতুই বল,—জড় পদার্থমাত্রেরই, পৃষ্ঠদেশের অণুগুলি বিচলিত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া এ দিকে ও দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এ দিকে বিক্ষিপ্ত হইলে পরিচালনশক্তি বৃদ্ধি পায়; ও দিকে বিক্ষিপ্ত হইলে পরিচালনশক্তি হ্রাস পায়। এই নূতন ব্যাখ্যাই এখন সঙ্গত বোধ হইতেছে।

আবার অণুগুলি স্থানভ্রষ্ট ও বিচলিত হইলেও স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতা-বশে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে সচেষ্ট থাকে। কাজেই বিচলিত হইলেও কিছু ক্ষণ পরে আপনা হইতেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসে ও স্বাভাবিক পরিচালন-শক্তি ফিরিয়া পায়। প্রবল ধাক্কা পাইলে স্থিতিস্থাপকতার সীমা অতিক্রান্ত হইয়া যায়, তখন আর আপনা হইতে ফিরিতে পারে না; তবে বাহির হইতে

কেহ নাড়িয়া দিলে বা উত্তাপ প্রয়োগ করিলে, আবার স্বভাবে ফিরিয়া আসে। ফিরিয়া আসিবার সময় কখনও বা স্বস্থান ছাড়িয়া অন্য মুখে কিছু দূর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। পেণ্ডুলমকে যেমন ডাহিনে তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে স্বস্থানে আসিবার চেষ্টা করে, এবং চেষ্টা করিতে গিয়া আবার বামে উঠিয়া পড়ে, কতকটা সেইরূপ। এইরূপ, যাহা ক্ষণেকের জন্য অতিপরিচালক হইয়াছিল, তাহা আবার ক্ষণেকের জন্য অপরিচালক হইয়া পড়ে।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার-স্রোত যদি এই পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া যাইত, তাহা হইলেও তাঁহার কার্য্যের জন্য বিস্মিত হইয়া নিরস্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু সেই স্রোত এখন যে নূতন মুখ অবলম্বন করিয়া নূতন পথে চলিয়াছে, তাহাতে কোথায় যে আমাদিগকে লইয়া যাইবে, এবং কোন্ কূলহীন প্রকাণ্ড মহাসাগরে লীন হইয়া আমাদিগকেও ভাসাইয়া দিবে, তাহা বিস্ময় ও চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যে গঙ্গাপ্রবাহ স্বর্গ হইতে ধরাতলে নামাইয়া আনিবার প্রয়াস করিতেছেন, তাহার স্পর্শলাভে কোন্ সগরসন্তানের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে, তাহা বলিতে পারি না; যিনি অগ্রণী হইয়া এই পুণ্যধারার পথপ্রদর্শন করিতেছেন, তিনিও হয় ত জানেন না, ইহার সমাপ্তি কোথায়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভূমিকাস্বরূপ দুই একটা পুরাতন কথার আলোচনা আবশ্যক।

নির্জ্জীব জড়ের ও জীবন্ত জীবের মধ্যে বিবিধ সাদৃশ্য থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। জীব-দেহে সাধারণ জড়ধর্ম্ম সমুদয়ই বিদ্যমান আছে; তবে জড়ধর্ম্ম ব্যতীত কোন অসাধারণ ধর্ম্ম বা অতিজড় ধর্ম্ম—যাহা নির্জ্জীব জড়ে বিদ্যমান নাই, এরূপ কোন অসাধারণ ধর্ম্ম—বিদ্যমান আছে কি না, তাহা বিচার্য্য বিষয় হইয়া রহি-য়াছে। জীবদেহে রক্তসঞ্চালন, শ্বাসগ্রহণ, খাদ্যপরিপাক প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলি সাধারণ জড়বিজ্ঞানের পরীক্ষিত তত্ত্বগুলির সাহায্যে বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু তথাপি জীবশরীরের সমগ্র প্রক্রিয়া বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝা যায় না। গতিবিজ্ঞান আর তাপবিজ্ঞান আর তাড়িতবিজ্ঞান আর রসায়ন-বিজ্ঞান প্রভৃতির সাহায্যে শারীরিক প্রক্রিয়ার অর্থ কতক কতক বুঝা যায়; কিন্তু সমস্ত বুঝা যায় না।

পণ্ডিতগণের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীর পণ্ডিতে বলেন,—

জীবন-তত্ত্বের সমগ্রভাগ জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিবার কখনও সম্ভাবনা নাই। তাপ ও তাড়িত ও রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনরূপ অজ্ঞাত ক্রিয়ার প্রভাবে জীবনযন্ত্র প্রধানতঃ কাজ করে। সেই অজ্ঞাত অপরিচিত শক্তিকে vital force বা জীবনীশক্তি বা এইরূপ একটা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। উহা জড়বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে, বা হইবে না। জড় পদার্থে এই জীবনীশক্তি নাই; কাজেই উহা জড়। জীবদেহে উহারই প্রভুত্ব; এই জন্য জীবদেহে জীবন। জীবে ও জড়ে এই জন্য মূলগত বিরোধ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতের মত অন্যরূপ। তাঁহারা স্বতন্ত্র জীবনীশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, এখন আমরা জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত জীবনক্রিয়া বুঝাইতে পারি না বটে, কিন্তু জড়-বিজ্ঞানের উন্নতিসহকারে এমন দিন আসিবে, যখন আমরা প্রাকৃতিক পরি-চিত শক্তিসমূহের সাহায্যেই জীবনের কাজ সমস্ত বুঝাইতে পারিব। জীবের ও জড়ের মধ্যে এখন যে ব্যবধান দেখা যাইতেছে, তাহা তখন থাকিবে না। বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে কোন মূলগত প্রভেদ নাই। জীবদেহে ও জড়দেহে কোন মৌলিক প্রভেদ নাই। জীববিজ্ঞান কালে জড়বিজ্ঞানেই পরিণত হইবে।

ফলে অনেক সময়ে দেখা যায়, উভয় পক্ষে মতের প্রকৃত অনৈক্য নাই; কেবল অকারণে কথা কাটাকাটি হইয়া বিতণ্ডার সৃষ্টি হইতেছে। মূলে কেবল কথার অর্থ লইয়া ঝগড়া। এখানেও অনেকটা সেইরূপ।

বর্ত্তমান কালে আমরা জড় উপকরণ লইয়া জীবশরীর নির্ম্মাণ করিতে পারি না, এ কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক জৈব পদার্থ, ইংরাজিতে যাহাকে অর্গানিক পদার্থ বলে, যথা ঘি, তেল, চিনি, মদ প্রভৃতি পদার্থ, যাহা সচরাচর প্রাণিদেহে বা উদ্ভিদের দেহমধ্যে নির্ম্মিত হয়, তাহা আজকাল জড় উপাদানেও নির্ম্মিত হইতেছে। এমন দিন ছিল, এই সকল পদার্থ মানুষে জড় উপাদান লইয়া প্রস্তুত করিতে পারিত না, ঘির জন্য গরু ও তেলের জন্য সরিষাগাছ ও চিনির জন্য ইক্ষুদণ্ড ও মদের জন্য দ্রাক্ষালতা প্রভৃতির অনুগ্রহের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইত। কিন্তু আজ-কালকার রাসায়নিক পণ্ডিতেরা এই সকল জৈব অর্থাৎ জীবজ পদার্থ জড় উপাদান হইতে অবাধে নির্ম্মাণ করিতে পারেন। এই জন্য তাঁহাদের এক সময়ে অত্যন্ত দুরাশা হইয়া পড়িয়াছিল যে, রাসায়নিক পণ্ডিত খানিক কয়লা

আর জল আর আমোনিয়া উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ডাল রুটী, এমন কি, মাছ মাংস পর্য্যন্ত তৈয়ার করিয়া ফেলিতে পারিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সে আশা অদ্যাপি ফলবতী হয় নাই। এখনও ডাল রুটী ও মাছ মাংসের জন্য রসায়নবিদের পরীক্ষাগারে না গিয়া প্রকৃতিদেবীর বৃহত্তর কর্ম্মশালায় উপস্থিত হইতে হয়, এবং শীঘ্র যে সে আশা সফল হইবে, তাহাও বোধ হয় না।

পক্ষান্তরে কিছু দিন পূর্ব্বে অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস ছিল, এবং অদ্যাপি অনেক অপণ্ডিতের বিশ্বাস আছে যে, জড়পদার্থ হইতে কৃমিকীট মাছি মশা প্রভৃতি জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রাণিবর্গকে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই বিশ্বাস হইতে মুক্ত ছিলেন, বলা যায় না। কিন্তু অধিক দিনের কথা নহে, এই বিশ্বাসের মূলভিত্তি পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়াছে। যত দূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে জড় পদার্থ হইতে জীবের উৎপত্তির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। জীব হইতেই নূতন জীব জন্মে; বীজ হইতে গাছ হয় ও বীজ হইতেই জন্তু হয়। এখন জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের ইহাই ধ্রুব বিশ্বাস। স্বেদজ প্রাণীর অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। মানুষ হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলেই অণ্ডজ।

জীবের উৎপাদন দূরে থাক, যে মশলায় জীবদেহ নির্ম্মিত, ইংরাজিতে যাহাকে প্রোটোপ্লাজম বলে, যাহার বাঙ্গলা পারিভাষিক প্রতিশব্দ খুঁজিয়া মিলিল না, তাহা এ পর্য্যন্ত জড় উপাদানে নির্ম্মাণ করিবার কোন উপায়ই দেখা যায় না। সেই প্রোটোপ্লাজম পদার্থ এখনও কোনও রসায়নবিৎ কয়লা, জল ও আমোনিয়ার সাহায্যে নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যদি কখনও সমর্থ হয়েন, তখন জীবের ও জড়ের ব্যবধান দূর হইয়াছে বলিয়া নৃত্য করিবার কারণ মিলিবে; এখন নহে। কাজেই উভয়ের মধ্যে সম্প্রতি প্রকাণ্ড ব্যবধান বিদ্যমান। কিন্তু—

প্রোটোপ্লাজম এখনও নির্ম্মিত হয় নাই, সুতরাং জীবদেহ জড় উপাদানে গঠিত হইলেও সেই জড় উপাদানগুলি লইয়া আমরা জীবদেহ নির্ম্মাণ করিতে পারি না। আমরা পারি না, কিন্তু প্রকৃতি পারেন। নৈসর্গিক কারণে জড় উপাদানেই জীবদেহ গঠিত হইতেছে। উদ্ভিদের শরীর বা জন্তুর শরীর বিশ্লেষণ করিয়া জড় উপাদান ব্যতীত অন্য উপাদান এক কণিকাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমরা কিই বা পারি? আমরা জীবদেহনির্ম্মাণে অসমর্থ; জড়দেহনির্ম্মাণেই কি আমরা সমর্থ? যখন আমরা উদজান পোড়াইয়া জল তৈয়ার করি, আর গন্ধক পোড়াইয়া গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত করি, সে নির্ম্মাণ কি আমাদেরই কাজ? এক হিসাবে উহা আমাদের কাজ বটে, আর এক হিসাবে আমাদের কাজ নহে। উদজান আপনা-আপনি প্রাকৃতিকধর্ম্মবশে অম্লজানসংযুক্ত হইয়া পোড়ে ও জলে পরিণত হয়; গন্ধকও আপনা-আপনি প্রাকৃতিকধর্ম্মবশে পুড়িয়া গন্ধকদ্রাবকে পরিণত হয়, আমাদের সেখানে প্রভুত্ব বা কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। কাজেই উহা আমাদের কৃত কর্ম্ম নহে। আমরা জিনিষগুলাকে এমন ভাবে সাজাইয়া গোছাইয়া যোজনা করিয়া দিই, উদজানে হাওয়া মিশাইয়া আগুন ধরাইয়া দিই, আর গন্ধকে আগুন ধরাইয়া হাওয়া আর জল মিশাইয়া দিই, তখন উদজান আর গন্ধক আপনা হইতে প্রাকৃতিক ধর্ম্মে পুড়িতে থাকে, ও জল তৈয়ার হয় ও গন্ধকদ্রাবক তৈয়ার হয়। এইটুকুই যা আমাদের কর্ত্তৃত্ব। অর্থাৎ, আমাদের যা কিছু কর্ত্তৃত্ব এই যোজনা কার্য্যে; পাঁচটা উপকরণকে আমরা এইরূপে জোটাইয়া দিয়া থাকি, যাহাতে উহারা আপন আপন ধর্ম্মবশে নূতন নূতন জিনিষের উৎপত্তি করে।

জীবদেহের নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও সেই কথা। জল আর গন্ধকদ্রাবক আমরা জড় উপাদান লইয়া নির্ম্মাণ করি; কিন্তু জড় উপাদান লইয়া জীবদেহ নির্ম্মাণ করিতে পারি না। উভয়ে এই ব্যবধান। কিন্তু সেই ব্যবধানের অর্থ কি? এই নির্ম্মাণের অর্থ কি? নির্ম্মাণ আমরা করি না; নির্ম্মাণ প্রকৃতি করেন; প্রাকৃতিক ধর্ম্মে নির্ম্মাণ কার্য্য চলে, উভয়ত্রই চলে। আমাদের নির্ম্মাণের নাম যোজনা। একত্র আমরা এই যোজনায় সমর্থ; অন্যত্র এই যোজনা কার্য্যে অসমর্থ। জীবদেহেও জড় উপাদান ব্যতীত অজড় অপরিচিত অজ্ঞাত উপাদান কিছুই বিদ্যমান নাই। সেই কয়লা আর উদজান আর অম্লজান আর যবক্ষারজান, সমস্তই জড় পদার্থ—নিতান্ত পরিচিত জড় পদার্থ। কিন্তু এই সকল জড় উপাদানগুলিকে কিরূপে যোজনা করিলে প্রোটোপ্লাজম গঠিত হইবে, কিরূপে উপাদানগুলিকে সাজাইয়া গোছাইয়া সমাবেশ করিলে প্রোটোপ্লাজম ও জীবদেহ নির্ম্মিত হইবে—প্রাকৃতিকধর্ম্মবশে নির্ম্মিত হইবে, তাহা আমরা অদ্যাপি জানি না। এই যোজনা কার্য্যে আমরা একান্তই অজ্ঞ, কাজেই আমাদের জীবদেহনির্ম্মাণচেষ্টা অদ্যাপি সফল হয় নাই। প্রকৃতিতে

এই নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে ; প্রকৃতির কারখানায় জড়দেহ ও জীবদেহ উভয়ই আপনা-আপনি সর্ব্বদাই নির্ম্মিত হইতেছে। জড় হইতেই জড় নির্ম্মিত হইতেছে ; ও জীবদেহ হইতে জীবদেহ ও জড়দেহ উভয়ই নির্ম্মিত হইতেছে। প্রকৃতিতে সেই যোজনা কার্য্য ঘটে বলিয়া জড়দেহ ও জীবদেহ উভয়ই নিয়ত গঠিত হইতেছে। জড়দেহের নির্ম্মাণানুযায়ী যোজনা কার্য্যে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। কিন্তু জীবদেহনির্ম্মাণের জন্য যে যোজনার প্রয়োজন, তাহা আমরা এখনও শিখিতে পারি নাই। কাজেই আমরা সেখানে অজ্ঞ অনভিজ্ঞ অসমর্থ।

এমন দিন আসিতে পারে, যখন আমরা প্রকৃতির কর্ম্মশালায় কার্য্যপ্রণালীর অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে করিতে জানিতে পারিব যে, কিরূপে উপাদানগুলির সমাবেশ করিলে জীবদেহ নির্ম্মিত হইতে পারিবে। তখন অবশ্যই আমরা জীবদেহ "নির্ম্মাণ" করিতে সমর্থ হইব। আবার এমন দিন না আসিতেও পারে ; যদি না আসে, তাহা হইলে আমরা জীবদেহগঠনে কখনই সমর্থ হইব না। তাহা হইলে আমাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কৃটিমাংস কোন কালেই প্রস্তুত হইবে না। অথবা হয় ত পৃথিবীর নৈসর্গিক অবস্থা এখন এমন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে, আর এখন জড় উপাদানের সেইরূপ সংযোজন ঘটনাই আর জীবনীশক্তির সাহায্য ব্যতীত অসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এখন কেবল জড়শক্তির সাহায্যে জড় উপাদান হইতে জীবদেহের নির্ম্মাণচেষ্টা পণ্ডশ্রমমাত্র।

সে যাই হউক, আমাদের পক্ষে নির্ম্মাণের অর্থ যোজনামাত্র, এবং জীবই বল আর নির্জ্জীবই বল, সর্ব্বত্রই নৈসর্গিক নিয়মে গঠনকার্য্য চলে, তাহার উপর আমাদের প্রভুত্ব কিছুই নাই। আমরা এক জায়গায় যোজনাকার্য্যে সমর্থ হইয়াছি, অন্যত্র এখনও হই নাই, বা হইতে পারিব না ; এই যুক্তির দোহাই দিয়া জীবের ও নির্জ্জীবের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য রহস্যময় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবার আবশ্যকতা আদৌ দেখা যায় না।

আসল কথা, যাঁহারা জীবনী-ক্রিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মের অতীত বলিতে চাহেন, এবং জীবনীশক্তি নামে একটা অতিপ্রাকৃত শক্তির কল্পনা ছাড়িতে চাহেন না, তাঁহারা সকল সময়ে স্পষ্ট কথা না বলিলেও, তাঁহাদের মনের মধ্যে একটা গোল আছে। মনুষ্যজাতির অধিকাংশ লোকে "সৃষ্টিকর্ত্তা" নামক এক সৃষ্টিছাড়া "কি-জানি-কি-ময়" পদার্থ কল্পনা করিয়া মনের বোঝা

লঘু করিবার চেষ্টায় রহিয়াছে। প্রকৃতির কর্ম্মশালায় যখন একটা অদ্ভুত গোছের রহস্যাবৃত যোজনাব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে মানুষের চিন্তায় তাহার তথ্যভেদ ও রহস্যভেদ কুলায় না, অথচ মনের বোঝা ভারী হইয়া আসে, তখন মানুষ সেই বোঝাটা এই কল্পিত সৃষ্টিকর্ত্তার উপরে নিক্ষেপ করিয়া নিজে অব্যাহতি লাভ করে ও বিশ্রামভোগের অবসর পায়। জাগতিক ব্যাপারের সর্ব্বত্র এই সৃষ্টিকর্ত্তার প্রভুত্বের আরোপ করিয়া স্বয়ং চিন্তার দায় হইতে মুক্তি পাইয়া অত্যন্ত আরাম পায়; এবং যখনই কোন ব্যক্তি যবনিকা উত্তোলন করিয়া প্রকৃতির কোন একটা অজ্ঞাত রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করেন, তখনই সেই মনঃকল্পিত প্রভুর শক্তিসঙ্কোচের আশঙ্কা করিয়া চীৎকারে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত করিতে থাকে। এই শ্রেণীর লোকের জন্য এই কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, প্রকৃতির রহস্যাবরণ উন্মোচন করিয়া গুপ্ত তথ্যের আবিষ্কার করিবার, অথবা প্রকৃতির নাটমন্দিরের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থ ব্যবধান ভেদ করিবার, শক্তি ও অধিকার যখন মানুষের আছে; এবং সেই শক্তি জ্ঞানের ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হওয়াতেও যদি সৃষ্টিকর্ত্তার প্রভুশক্তি সঙ্কুচিত না হইয়া থাকে, এখনও হইবার কোন আশঙ্কা নাই। মাধ্যাকর্ষণ ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের আবিষ্ক্রিয়ায় ও অন্যান্য বিবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ তথ্যের আবিষ্কারে পুনঃ পুনঃ এই ব্যবধান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; এখন জীব ও নির্জ্জীবের মধ্যে পর্দ্দাটা কেহ তুলিয়া ফেলিলেও বিশ্বব্যাপার বিপর্য্যস্ত হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

জীবনীশক্তি নামক কোন অজ্ঞাত শক্তির অস্তিত্ব আছে কি না, তাহার বিচারের এখনও সময় হয় নাই। আধুনিক জড়বিজ্ঞান যে কয়টি শক্তির অস্তিত্ব অবগত আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন শক্তি যে থাকিবে না, তাহার কোনই কারণ নাই। তাপ ও তাড়িত ও রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যেই যে সমস্ত জীবনীক্রিয়ার তথ্য বুঝান যাইবে, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। বিজ্ঞানের ইতিহাসেই নিত্য নূতন শক্তির সহিত, অথবা একই শক্তির অভিনব মূর্ত্তির সহিত আমাদের নূতন পরিচয় স্থাপিত হইতেছে। তখন জীবনীক্রিয়ার জন্য যদি একটা অভিনব অচিন্তিতপূর্ব্ব বা অজ্ঞাতপূর্ব্ব শক্তি, বা শক্তির অভিনব মূর্ত্তি, কালে আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। এবং এই শক্তিকে জীবনীশক্তি বা vital force বা যাহা ইচ্ছা

প্রণালীর সহিত যখন আমাদের পরিচয় হইবে, তখন উহা প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত প্রাকৃতিক শক্তি ভিন্ন নিয়মবন্ধনহীন অতিপ্রাকৃত শক্তিরূপে গণ্য হইবে না।

জীবন্ত জড়দেহে আর নির্জীব জড়দেহে প্রধান বিভেদ কতকটা এইরূপ,—

(১) জীবদেহে বাহির হইতে কোন শক্তি কাজ করিলে উহা সাড়া দেয়। এই সাড়া দিবার ক্ষমতা জীবদেহের প্রধান ও বিশিষ্ট লক্ষণ। চিমটি কাটিলেই মাংসপেশীর সঙ্কোচন ঘটে; চোখের স্নায়ুতন্ত্রীতে আলোকতরঙ্গের ধাক্কা লাগিলেই মস্তিষ্কযন্ত্র বিচলিত হইয়া হাত পায়ের মাংসপেশীকে নাড়িয়া দেয়। কখনও বা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়, তখনই তাহার ফল টের পাওয়া যায়। কখনও বা বহু বৎসর পরে তাহার ফল প্রকাশ পায়। আজ বাহিরের শক্তি সহসা স্নায়ুযন্ত্রে একটা ধাক্কা দিয়া গেল; সেই ধাক্কাটা সম্প্রতি স্নায়ুযন্ত্রে কোনরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকিল। আবার পঞ্চাশ বৎসর পরে স্বপ্নে বা জাগ্রদ-বস্থায় সেই ধাক্কার ফল সহসা প্রকাশ পাইল। পেশীযন্ত্র ও স্নায়ুযন্ত্র ঘটিত যাবতীয় ব্যাপারের মূলে এই সাড়া দিবার ক্ষমতা। এবং এই সাড়া দিবার শক্তি আছে বলিয়াই জীবদেহ জড়জগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষণে সমর্থ। জীবদেহ এমন ভাবে, এমন সময়ে, সাড়া দিবার চেষ্টা করে, যাহাতে তাহার মঙ্গল ঘটে, যাহাতে তাহার আত্মরক্ষণ ঘটে। এইরূপ সাড়া দিবার ক্ষমতা, এই responsiveness, জড়দেহে বর্ত্তমান দেখা যায় না। জড়দেহেও বাহ্যশক্তির সংঘাতে সঙ্গে সঙ্গে বিকার জন্মে বটে, কিন্তু তাহা ঠিক্ এরূপ নহে। উভয়ের মধ্যে অনেকটা তফাত। কিরূপ তফাত, তাহা সহজে অল্প কথায় বুঝান যায় না। তবে জড়দেহের ও জীবদেহের এ বিষয়ে পার্থক্য এত স্পষ্ট, যে এ স্থলে তজ্জন্য বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন দেখি না। হার্বার্ট স্পেন্সার জীবনের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাও প্রধানতঃ এই সাড়া দিবার ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

হার্বার্ট স্পেন্সরের মতে—বাহ্য ব্যাপারের সহিত আভ্যন্তর ব্যাপারের সামঞ্জস্য বা সঙ্গতিরক্ষার অবিরাম নিরন্তর প্রয়াসের নামই জীবন। বাহ্য জগৎ হইতে বিবিধ শক্তি জীবদেহকে নিরন্তর আক্রমণ করিতেছে, জীবদেহ আবশ্যকমত তাহার সাড়া দিয়া, অর্থাৎ আবশ্যকমত বিলম্বে বা অবিলম্বে আত্মপ্রসার বা আত্মসঙ্কোচ বা আত্মবিকার সাধিত করিয়া, সেই আক্রমণ

নিবারণের বা আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিক্রিয়ার নিরন্তর চেষ্টার নামই জীবন।

(২) জীবদেহের আত্মপোষণের বা বৃদ্ধির ক্ষমতাও জড়দেহ হইতে স্বতন্ত্র। নির্জীব জড়পদার্থ তৈয়ারি মশলা আপন অঙ্গে বাহিরে বাহিরে সংলগ্ন করিয়া বৃদ্ধি পায়। যেমন একটা মিছরীর দানা বা ফটকিরির দানা অথবা একখানা মেঘ বা কুয়াসা। আর জীবদেহ অপূর্ণগঠিত উপাদান অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া সেই উপাদান হইতে আপনার শরীরোপযোগী মশলা তৈয়ার করিয়া বৃদ্ধি পায়। গাছের পাতা হাওয়া আর জল আর ভস্ম বাহির হইতে অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া গাছের দেহ নির্ম্মাণ করে। মনুষ্যদেহ শাকান্ন অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া মাংস মজ্জা স্নায়ু নির্ম্মাণ করিয়া লয় ও বৃদ্ধি পায়।

(৩) জীবদেহ আপনাকে খণ্ডিত ও বিভক্ত করিয়া বংশ রক্ষা করে ও সন্তান উৎপাদন করে। একখণ্ড জীবদেহ হইতে বহুখণ্ড জীবদেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ও পিতৃপুরুষের সমুদয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা আরম্ভ করে।

প্রধানতঃ জীবদেহের প্রধান লক্ষণ, যে লক্ষণ আশ্রয়ে জীবদেহে ও জড় দেহে প্রভেদ, উল্লিখিত তিনটি। প্রথম—জীবদেহ বাহ্যশক্তির আহ্বানে সাড়া দেয়। দ্বিতীয়—জীবদেহ বাহিরের অপূর্ণগঠিত উপাদান অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া তাহার পূর্ণতা সাধিত করিয়া বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়—জীবদেহ কালে কালে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বংশবিস্তার করে ও সন্তান সর্ব্বাংশেই পিতৃধর্ম্ম পাইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত জন্ম মৃত্যু ও ব্যাধি স্বতন্ত্র জীবধর্ম্মস্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, একটু তর্কের স্থল। জন্মের অর্থ, পিতৃপুরুষ হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবনের আরম্ভ। উহা তৃতীয় লক্ষণের অন্তর্গত। মৃত্যু অর্থে সেই স্বাধীন জীবনের সমাপ্তি। স্পেন্সারের সংজ্ঞানুসারে বাহ্যপ্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেওয়া যদি জীবনের প্রধান লক্ষণস্বরূপে ধরা যায়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, যখন জীব সেই আহ্বানে আর সাড়া দিতে পারে না, তখনই তাহার মৃত্যু। উন্নত জীবমাত্রেরই জীবনের এক দিন সমাপ্তি ঘটে, সে দিন বাহির হইতে বিবিধ শক্তি আক্রমণ করিলেও সেই জীব সেই আক্রমণ নিবারণে চেষ্টা করে না; সেই দিন তাহার মৃত্যু। জীবমাত্রের না বলিয়া উন্নত জীবমাত্রের বলিলাম; কেন না, জীবমাত্রেরই মৃত্যু অনিবার্য্য, তাহা আজি-

কার দিনে বোধ করি আর বলা চলে না। ওয়াইজমান (Weissmann) স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন, নিকৃষ্টতম জীবের মৃত্যু অনিবার্য্য নহে; তাহারা প্রকৃতই অমরত্বের অধিকারী। জন্ম ও মৃত্যু গেল, থাকে ব্যাধি। জীব বাহ্য প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেয়, এরূপে সাড়া দেয়, যাহাতে তাহার আত্মরক্ষা চলে, যাহাতে তাহার মঙ্গল হয়। ফলে জীব এই ক্ষমতার বলে বাহ্যশক্তিকে আপনার জীবনের অনুকূল করিয়া লয়; এই অবস্থার নাম স্বাস্থ্য। আর যখন বাহ্যশক্তি জীবনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়, যখন বাহ্যশক্তির আক্রমণনিবারণে জীব অংশতঃ অশক্ত হইয়া পড়ে, সেই অবস্থার নাম ব্যাধি। সুস্থ অবস্থায় যাহা জীবনের অনুকূল, ব্যাধির অবস্থায় তাহা প্রতিকূল। সুস্থ অবস্থায় জীব যেমন সাড়া দিতে পারে, ব্যাধির অবস্থায় তেমনটি পারে না। মৃত্যু ও ব্যাধিকে এই ভাবে দেখিলে জীবদেহের উল্লিখিত প্রথম লক্ষণের অন্তর্গত করা যাইতে পারে।

আর একটা কথা আছে। দেহপুষ্টিকে আমরা দ্বিতীয় লক্ষণ ও বংশবৃদ্ধিকে তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া বলিয়াছি। কিন্তু আধুনিক জীবতাত্ত্বিকগণের বিবেচনায় এই দুইটি লক্ষণের মধ্যে কোন মূলগত বিভেদ নাই। বংশবৃদ্ধি দেহপুষ্টিরই একটা অবান্তরভেদমাত্র, আধুনিক জীববিদ্যা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। নিম্নতম পর্য্যায়ের জীবে আত্মপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি এই উভয় ব্যাপারের মধ্যে সীমানির্দ্দেশ প্রায় অসাধ্য। এই সকল জীবের শরীর কেবল একটিমাত্র কোষে নির্ম্মিত। খাদ্যগ্রহণসহকারে এই কোষটি অর্থাৎ জীবের দেহটি ক্রমে পুষ্টি পায় ও বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধিসহকারে একটা সীমায় উপস্থিত হইবামাত্র তাহার সমগ্র শরীরটি ভাঙ্গিয়া দ্বিধাবিভক্ত হয়; একটি কোষ হইতে দুইটি কোষ নির্ম্মিত হইয়া দুইটি স্বাধীন জীবের উৎপত্তি করে। এক পিতৃপুরুষ আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দুইটি সন্তানের উৎপাদন করে। পিতা বৃদ্ধ হইয়া সন্তানে পরিণত হয় মাত্র। কেবল নিকৃষ্ট জীবে কেন; উন্নত জীবের মধ্যেও এই প্রণালী বর্ত্তমান। গাছ বৃদ্ধি পাইয়া শাখা বিস্তার করে। সেই শাখাকে ছেদন করিয়া পৃথক্ ভাবে রোপণ করিলে শাখাই আবার স্বতন্ত্র বৃক্ষে পরিণত হয়। ফলে বংশপুষ্টি ও আত্মপুষ্টির মধ্যে মূলগত ভেদ বাহির করা যায় না। সুতরাং উল্লিখিত তিনটি লক্ষণকে দুইটিমাত্র লক্ষণে আনা যাইতে পারে। এবং এই দুই লক্ষণ থাকায় জড়দেহে ও জীবদেহে ব্যবধান।

জড়ে ও জীবে এখন এই দুই বিষম ব্যবধান বর্ত্তমান। জগদীশচন্দ্রের নূতনতম আবিষ্ক্রিয়ায় ইহার মধ্যে একটা ব্যবধান, অর্থাৎ প্রথম ব্যবধান দূর হইবার উপক্রম হইয়াছে।

জীবদেহের এই বাহ্যশক্তির প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা, এই সাড়া দিবার ক্ষমতা, এই responsiveness, জীবদেহের প্রত্যেক অংশেই ও প্রত্যেক অঙ্গেই বর্ত্তমান। একখণ্ড মাংসপেশী লইয়া বা একটা স্নায়ুতন্ত্রী লইয়া তাহাতে চিমটি কাটিলেই ইহা বুঝা যায়। শরীরবিদ্যার যে কোন পুস্তক উদ্ঘাটন করিলেই মাংসপেশীর ও স্নায়ুতন্ত্রীর এই সাড়া দিবার শক্তি সম্বন্ধে বিবিধ তত্ত্ব পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। দুই চারিটার এখানে উল্লেখ করিব।

১। একখানা মাংসপেশীতে একটা ধাক্কা দিলেই উহা একটু পরে খানিকটা সঙ্কুচিত হয়। ধাক্কার পরেই সঙ্কোচ, তার পর ক্রমশঃ স্বভাবে ফিরিয়া আসে।

২। এই সঙ্কোচের একটা সীমা আছে। প্রবল ধাক্কায় সঙ্কোচনমাত্রা এই সীমায় পৌঁছে; তার পর ধাক্কা দিলে আর সীমা ছাড়ায় না।

৩। একবারে প্রবল ধাক্কা না দিয়া সামান্য আঘাত দিলে খানিকটা সঙ্কোচ হয়। আবার আঘাতে আর একটু সঙ্কোচ, আবার আঘাতে আর একটু। পর পর আঘাতে সঙ্কোচ একটু একটু করিয়া বাড়ে। কিন্তু প্রথম আঘাতে যতটা বাড়ে, দ্বিতীয় আঘাতে তত নহে; তৃতীয়ে আরও কম; চতুর্থে আরও কম। এইরূপে সেই সীমায় পৌঁছিলে সঙ্কোচ আর বাড়ে না।

প্রথম আঘাতে যতখানি সঙ্কোচ ঘটে, দ্বিতীয় আঘাতে ততখানি ঘটে না, জীবাঙ্গের এই গুণের ফল বিবিধ। এক সের বোঝার উপরে আর এক সের বোঝা স্পষ্ট ভার বাড়ায়। কিন্তু এক মণ বোঝার উপর এক সের বোঝা চাপাইলে আর তেমন ভারবোধ হয় না। শাকের আঁটি স্বতন্ত্রভাবে ভারী, কিন্তু বোঝার উপর শাকের আঁটি নগণ্য। আবার আঁধার ঘরে প্রদীপের আলো কত উজ্জ্বল, কিন্তু সূর্য্যালোকে প্রদীপের সেই আলোর উজ্জ্বলতা কোথায়? শরীরবিদ্যা শাস্ত্রে Fechner's Law ও Webers' Law নামে যে আঘাত ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কসূচক নিয়ম আছে, তাহার মূল এই।

৪। আঘাতের পর আঘাত, সঙ্কোচের পর আর একটু সঙ্কোচ। কিন্তু এই আঘাতের পর আঘাত খুব তাড়াতাড়ি দিলে, সঙ্কোচন ব্যাপার আর

বিরামের অবসর পায় না। এক টানে সঙ্কোচ ঘটে। মাংসপেশী একবারে ধনুষ্টঙ্কারে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

৫। আঘাত যখন খুব প্রবল হয়, তখন সঙ্কোচনের মাত্রা পরম বা চরম সীমায় পৌঁছে; এবং প্রবল আঘাতে এই পরম সঙ্কোচলাভের পর মাংসপেশী আর সহজে স্বভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে না। তখন ধাক্কা দিলেও আর প্রতিক্রিয়া ঘটে না। মাংসপেশীটা যেন প্রবল আঘাতে শ্রান্ত হইয়া পড়ে, এই অবস্থার নাম ক্লান্তির অবস্থা, বা শ্রান্তির অবস্থা। কালক্রমে এই শ্রান্তির অপনোদন ঘটে; সঙ্কুচিত মাংসপেশী তখন ধীরে ধীরে স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হয়। মাংসপেশী বা স্নায়ুযন্ত্র বা মস্তিষ্ক, জ্ঞানেন্দ্রিয়ই বল আর কর্ম্মেন্দ্রিয়ই বল, শ্রমাতিশয্যে এই ক্লান্তিলাভ জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গেরই সাধারণ ধর্ম্ম, এবং বিশ্রাম দ্বারা ক্লান্তির অপনোদনও নিত্য ঘটনা। উত্তাপপ্রয়োগে বা মর্দ্দনে ক্লান্ত মাংসপেশীর স্বাস্থ্যলাভ ঘটে।

৬। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, মাংসপেশী আবার স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হয়। মৃদু আঘাতের পর তখনই ফিরিয়া আসে, প্রবল আঘাতের পর বিলম্বে সুস্থ হয়। কিন্তু বিষময় পদার্থের সান্নিধ্য এই স্বভাবপ্রাপ্তিতে ও স্বাস্থ্যলাভে বিলম্ব ঘটায়। অথবা যে পদার্থের অস্তিত্ব এই স্বাস্থ্যলাভের অন্তরায় হয়, উহারই নাম বিষ। আর যে পদার্থ স্বাস্থ্যলাভের অনুকূল, তাহারই নাম ঔষধ।

ফলে জীবদেহমধ্যে বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান থাকিয়া কখনও বিষের, কখনও বা ঔষধের কাজ করে। যাহা স্বাস্থ্যলাভের প্রতিকূল, তাহা বিষ; যাহা স্বাস্থ্যলাভের অনুকূল, তাহা ঔষধ। কোন দ্রব্য অবসাদক, কোন দ্রব্য উত্তেজক। আবার একই দ্রব্য মাত্রাভেদে কখনও বা উত্তেজক, কখনও অবসাদকের কাজ করে; মাত্রাভেদে বিষ বা ঔষধের ফল জন্মায়। হোমিওপাথির আচার্য্যেরা বলিবেন, যাহা মাত্রাধিক্যে বিষবৎ, তাহাই ন্যূনমাত্রায় পরম ভেষজ।

আঘাতে ও উত্তেজনায় মাংসপেশীর উল্লিখিতরূপ বিবিধ প্রতিক্রিয়া ঘটে। বিবিধ বাহ্যশক্তির প্রয়োগে মাংসপেশী ভিতর হইতে নানা রূপে সাড়া দেয়। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাডফোর্ড নগরে সমবেত ব্রিটিশ আসোশিয়েশনের এবং গত মে মাসে লণ্ডন রয়াল ইন্‌ষ্টিটুশনে বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সমীপে যে নূতন আবিষ্কারবার্ত্তা প্রচার

করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, এইরূপ প্রতিক্রিয়াশক্তি কেবল জীবদেহেই আবদ্ধ নহে। জড় দেহেরও ঠিক এইরূপ প্রতিক্রিয়া শক্তি বর্ত্তমান আছে। আঘাতে ও উত্তেজনায় মাংসপেশী বা স্নায়ুতন্ত্রী যেমন সাড়া দেয়, তাড়িততরঙ্গের আঘাতে নির্জ্জীব জড় পদার্থ ঠিক্ সেই একই রকমে সাড়া দিতে পারে।

জীবদেহে ও নির্জ্জীব জড়দেহে প্রভেদ কিসে, জিজ্ঞাসা করিলে মোটামুটি এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে:—

১। জড়দেহ পরিণত উপাদানযোগে বাহির হইতে বৃদ্ধি পায়। জীবদেহ অপরিণত অপূর্ণগঠিত উপাদান বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া অভ্যন্তরে গ্রহণ করে, ও তাহাকে পূর্ণগঠিত করিয়া স্বয়ং বৃদ্ধি পায়; এবং বৃদ্ধি পাইতে পাইতে আপনি বিভক্ত হইয়া বা আপনার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া নূতন জীবের উৎপাদন করে। এই দুই ব্যাপারের নাম আত্মপুষ্টি ও বংশপুষ্টি। বিসদৃশ বস্তু দেহমধ্যে গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধির নাম আত্মপুষ্টি; ও আপনাকে ছিন্ন করিয়া সদৃশ বস্তুর উৎপাদনের নাম বংশপুষ্টি; উভয় ব্যাপারই মূলতঃ অভিন্ন; জীবদেহে উভয়ই বর্ত্তমান; জড়দেহে একেরও অস্তিত্ব নাই।

২। জড়দেহ বাহ্যশক্তির উত্তেজনায় বিকৃত হয় ও প্রতিক্রিয়াও উৎপাদন করে বটে, কিন্তু তাহাতে উহার শুভাশুভ কিছুই নাই। জীবদেহ বাহ্যশক্তির আক্রমণে বিকৃত হইয়া সাড়া দেয়; এবং সেই বাহ্যশক্তিকে আপনার স্বাতন্ত্র্যরক্ষার অনুকূল করিয়া লইতে চায়। এই সাড়া দেওয়ার অবিরাম চেষ্টা, এই আক্রমণনিবারণের নিরন্তর প্রয়াসের নামই জীবন। যখন উচিতমত সাড়া দিতে পারে না, আক্রমণনিবারণপ্রয়াস।যখন সম্পূর্ণ সফল হয় না, তখন বাহ্যশক্তি জীবনের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল হয়, তখনকার অবস্থা ব্যাধি; এবং যখন সাড়া দিবার ক্ষমতা চিরন্তরে লোপ পায়, যখন বাহ্যশক্তির আক্রমণ আর নিরস্ত হয় না, তখন মৃত্যু।

সংক্ষেপে এই দুইটা বিষয়ে জড়দেহে ও জীবদেহে পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য কিরূপ? বৃদ্ধি পাইবার ক্ষমতা যে জড়ের একবারে নাই, এমন নহে। বায়ুমধ্যে মেঘের শরীর ক্রমে বৃদ্ধি পায়। পর্ব্বতশীর্ষে তুষারশৈল ক্রমে বৃদ্ধি পায়, চিনির সরবতে মিছরীর দানা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই জড়দেহের বৃদ্ধি ও জীবদেহের বৃদ্ধি (আত্মপুষ্টি ও বংশপুষ্টি) উভয়ের মধ্যে এতটা প্রভেদ যে, উভয় বৃদ্ধিকে এক পর্য্যায়ে ফেলিতে সাহস হয় না।

সেইরূপ আবার বাহ্যশক্তির আহ্বানে নির্জ্জীব জন্তুও যে সাড়া না দেয় এমন নহে। বাত্যাবলে শৈলশিখর ভূমিসাৎ হয়, ভূকম্পে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত ও বিদীর্ণ হয়; পর্ব্বতবক্ষে যুগব্যাপী নৈসর্গিক উৎপাতের চিহ্ন সকল অঙ্কিত রহিয়া যায়। এ সমস্তই বিকার বা বিক্রিয়া; কিন্তু জীবদেহে বিকার বা বিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল প্রতিকার বা প্রতিক্রিয়া আছে; তাহার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া নির্জ্জীব জড়ে খুঁজিয়া মেলে না। এই প্রতিক্রিয়াই জীবন, এই প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতাই স্বাস্থ্য, এই প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতার আংশিক বিলোপে ব্যাধি ও পূর্ণবিলোপে মৃত্যু। জড়ের স্বাস্থ্য বা ব্যাধি বা মৃত্যু কাব্যের ভাষাতে স্থান পাইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষাতে উহার এত দিন স্থান ছিল না। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে বোধ করি উহা বিজ্ঞানের ভাষাতেও স্থান পাইতে চলিল।

লোহাভস্মের মত নিতান্ত নির্জ্জীব জড় পদার্থের উপর তাড়িততরঙ্গের ধাক্কা দিয়া জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন,—

১। তরঙ্গের উত্তেজনায় উহার পরিচালনক্ষমতা সহসা বাড়িয়া যায়। এক ধাক্কায় বাড়ে; আবার ক্রমশঃ স্বাভাবিক পরিচালকতা ফিরিয়া আসে।

২। পরিচালনশক্তির বৃদ্ধির একটা সীমা আছে, প্রবল ধাক্কায় পরিচালন-মাত্রা সেই সীমায় পৌঁছে; তখন আর ধাক্কা দিলে বাড়ে না।

৩। ধাক্কার পর ধাক্কা দিলে প্রতি আঘাতে পরিচালন ক্ষমতা একটু একটু করিয়া বাড়িয়া যায়। কিন্তু প্রথম ধাক্কায় যতটা বাড়ে, দ্বিতীয় আঘাতে ততটা নহে, তৃতীয় আঘাতে আরও কম ইত্যাদি।

৪। পুনঃ পুনঃ দ্রুত গতিতে আঘাতের পর আঘাত দিয়া বিরামের অবকাশ না দিলে পরিচালনশক্তি একটানে আপনার নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত বাড়িয়া যায়। ইহাই জড় পদার্থের ধনুষ্টঙ্কার।

৫। প্রবল আঘাতে পরিচালনশক্তি একবারে চরম সীমায় উপস্থিত হয়। তখন আর আঘাত দিলেও কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। ইহাই জড় পদার্থের ক্লান্তিলাভ। ইহাই উহার সাময়িক ব্যাধি, এবং এই ব্যাধির ফল স্থায়ী হইলেই মৃত্যু। আবার একটা নাড়া দিলে অথবা একটু গরম করিলে স্বভাবে প্রতিনিবৃত্ত হয়। প্রচলিত coherer যন্ত্রে তাড়িততরঙ্গের আঘাতে এই ক্লান্তির অবস্থা ঘটে, নাড়া না দিলে সেই ক্লান্তির অপনোদন হয় না।

৬। নির্জ্জীব জড় দেহেও বিভিন্ন দ্রব্য প্রবেশ লাভ করিয়া কখন অবসাদকের কখনও বা উত্তেজকের মত কাজ করে। কোন দ্রব্যে সেই জড়দেহের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়, কোন দ্রব্যে কমাইয়া দেয়। কোনটা বিষের মত কাজ করিয়া স্বভাবপ্রাপ্তির অন্তরায় হয়; কোন দ্রব্য ঔষধের কাজ করিয়া স্বভাবপ্রাপ্তির অনুকূল হইয়া থাকে। একই দ্রব্য মাত্রাভেদে কখনও অবসাদক, কখনও বা উত্তেজক হইয়া থাকে।

তাড়িতোর্ম্মির উত্তেজনায় জড় দ্রব্য বিকৃত হয়, ইহা পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু সেই বিকৃত অবস্থা হইতে স্বভাবপ্রাপ্তিঘটনায় জড়দেহে ও জীবদেহে এমন সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সত্য। জড়দেহে বিকারপ্রাপ্তির ও স্বভাবপ্রাপ্তির নিয়ম যে জীবদেহের বিকারপ্রাপ্তি ও স্বভাবপ্রাপ্তির অনুরূপ, তাহা ইতিপূর্ব্বে কেহ জানিত না। জগদীশচন্দ্র গতবৎসর শ্রাবণ মাসে বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই জড়ের ও জীবের মধ্যে এই অচিন্তিতপূর্ব্ব সাদৃশ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ আসোশিয়েশনের সম্মুখে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতেই এই সমস্ত আবিষ্কারপরম্পরা সমবেত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সম্মুখে প্রথমে উপস্থিত হয়। তৎপরে তিনি লণ্ডন রয়াল সোসাইটিতে আরও কতিপয় প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন, ও রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউশনে নিমন্ত্রিত হইয়া আপনার আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ঐ সকল প্রবন্ধের যতটুকু বিবরণ এ দেশে উপনীত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি বিজ্ঞানের গহন বনে যে নূতন মার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পুরোমুখ যাত্রা অদ্যাপি অব্যাহত রহিয়াছে। দিগ্বিজয়ী বীরের মত তিনি যাত্রাকালে মরুপৃষ্ঠে অম্ভোধারার উৎস খুলিয়া দিতেছেন, "নাব্যা নদী"কে "সুপ্রতরা" করিয়া ও কুঠারাঘাতে "বিপিন" সকলকে "প্রকাশ" করিয়া পুরোমুখে অগ্রগামী হইতেছেন।

আঘাত পাইলে মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়; স্নায়ুতন্ত্রীতে সঙ্কোচনপরিবর্ত্তে তাড়িতপ্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। মাংসপেশীর সঙ্কোচনলাভের প্রণালী ও স্নায়ুতন্ত্রীর তাড়িতবিকারলাভের প্রণালী ঠিক একই নিয়মের অনুসরণ করে। শরীরবিদ্যা শাস্ত্রে এই সাদৃশ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রীর সহিত একটা তামার তারের যে সাদৃশ্য আছে, তাহার উল্লেখ কোন

শাস্ত্রেই নাই। একটা স্নায়ুর সূতার এক প্রান্তে আঘাত দিলে উহাতে তাড়িতপ্রবাহ জন্মে, তাহা শরীরতত্ত্বজ্ঞমাত্রেই জানেন; কিন্তু একটা তামার তারের এক প্রান্তে আঘাত দিলে, একটা মোচড় দিলে, যে তাড়িতপ্রবাহের উৎপত্তি ঘটে, তাহা কেহ জানিত না।

আবার আঘাতপরম্পরায় স্নায়ুসূত্রে তাড়িতপ্রবাহ একটা চরম সীমায় উপস্থিত হয়; সেই সীমা আর ছাড়ায় না। সেইরূপ আঘাতপরম্পরায় তারমধ্যে তাড়িতপ্রবাহ একটা চরম পরিমাণের প্রতি অগ্রসর হয়, সেই চরম পরিমাণ ছাড়ায় না, ইহা ইতিপূর্ব্বে কেহ জানিত না। অতিশয় উত্তাপের বা অতিশয় শৈত্যের প্রয়োগে স্নায়ুতন্ত্রী মৃতকল্প হইয়া পড়ে, তখন আর উত্তেজনা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়া ঘটে না; উহা সকলেই জানিত। কিন্তু একটা নির্জীব ধাতুময় তারের তাড়িতপ্রতিক্রিয়াশক্তি যে উত্তাপযোগে বা শৈত্যযোগে লোপ পায়, তাহা কেহ জানিত না। দ্রব্যগুণে স্নায়ুতন্ত্রীর উত্তেজনা বাড়ে; আবার দ্রব্যগুণে স্নায়ুতন্ত্রী অবসন্ন হয়; তাহাও সকলে জানিত; কিন্তু নির্জীব ধাতুপদার্থনির্ম্মিত একটা তার যে দ্রব্যগুণে উত্তেজিত বা অবসন্ন হয়, উহার প্রতিক্রিয়া শক্তি বাড়িয়া যায় বা কমিয়া যায়, তাহা কে জানিত? ঔষধের উপকারিতা ও বিষের অপকারিতা, মদের মাদকতা ও আফিমের অবসাদকতা, এতদিন জীবন্ত পদার্থের জীবনীশক্তির বিশেষণস্বরূপে প্রযুক্ত হইত। জড়দেহের প্রতি ঐ সকল বিশেষণপ্রয়োগ শশবিষাণ বা বন্ধ্যাপুত্রের মত নিরর্থক হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন হইতে জড়দেহের প্রতি ঐ সকল বিশেষণপ্রয়োগ অর্থশূন্য হইবে না।

প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল; আলোকসম্পাতে চক্ষুরিন্দ্রিয় কিরূপে আহত হয়, তৎসম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র অনেকগুলি নূতন সংবাদ বৈজ্ঞানিকগণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। আলোকতরঙ্গের আঘাতে আবার চক্ষুর ভিতরে স্নায়ুযন্ত্র যেরূপ বিকারলাভ করে, আলোকতরঙ্গ ও তাড়িত-তরঙ্গ উভয়েরই আঘাত পাইয়া জগদীশচন্দ্রের নির্ম্মিত কৃত্রিম চক্ষু তদনুরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়। চক্ষু দর্শনক্রিয়াসম্পাদনের জন্য যন্ত্রমাত্র, কিন্তু সেই যন্ত্রের আভ্যন্তরিক ক্রিয়াপ্রণালী কিরূপ, তাহা শরীরবিদ্যাশাস্ত্র ঠিক জানে না; এখন সেই কাজকর্ম্মের প্রণালী বুঝিবার পথ বোধ হয় বাহির হইতে পারে। কিন্তু এই বৃহৎ কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া পাঠকগণের আর সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিব না।

জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি বৈজ্ঞানিকসমাজে শেষ পর্য্যন্ত কিরূপে গৃহীত হইবে, বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকসমাজে একটা বাহির হইতে উত্তেজনার আঘাত পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকসমাজ-শরীর সেই উত্তেজনায় কিরূপ সাড়া দিবে, জানি না। উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান অতি দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু স্থিতিশীলতায় বৈজ্ঞানিকসমাজের কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কেহ কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলে বৈজ্ঞানিকসমাজ সেই ব্যক্তিকে কতকটা সন্দেহের, কতকটা আশঙ্কার সহিত দেখিতে থাকেন। নূতন সত্যকে সহসা অঙ্গীকার করিতে চাহেন না। অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত সত্য যতই মনোরমবেশে আসুক, বৈজ্ঞানিকসমাজ তাহাকে বাসদান করিতে স্বভাবতঃ কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। জ্বলন্ত আগুনে উহার "বিশুদ্ধি" বা "শ্যামিকা" পরীক্ষা না করিয়া উহাকে গ্রহণ করেন না। এইরূপ অগ্নিপরীক্ষার পর যাহা সত্য, তাহা উজ্জ্বলতর হইয়া বাহির হয়; আর যাহা অসত্য, তাহা অগ্নিপরীক্ষায় ভস্মমাত্র রাখিয়া যায়। জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষিত তত্ত্বগুলিও এইরূপ অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সেই অগ্নিপরীক্ষার পর উহার আকার কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে আমাদের বাক্যব্যয় ধৃষ্টতামাত্র।

এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে জড়ের ও জীবের মধ্যে অন্যতর প্রধান ব্যবধান দূর হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জড়ের ও জীবের মধ্যে দুইটি প্রধান ব্যবধান রহিয়াছে, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বাহ্য প্রকৃতির উত্তেজনায় জীবদেহ প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে। জীবদেহ অনুক্ষণ অবিরামে বাহ্যজগতের প্রতি এই প্রতিক্রিয়া প্রয়োগ করিতেছে; এই প্রয়োগ কার্য্যে অবিরাম চেষ্টাই জীবন। জড়দেহেরও যদি সেই প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা বর্ত্তমান থাকে, জড়দেহ যদি বাহ্যশক্তির উত্তেজনায় বিকারলাভ করিয়া সাড়া দেয়, জড়দেহ যদি বাহ্যশক্তির আঘাতে উত্তেজিত বা অবসন্ন, ব্যাধিগ্রস্ত বা রোগমুক্ত হয়, তাহা হইলে জড়ের ও জীবের মধ্যে অন্ততঃ একটা ব্যবধান তিরোহিত হইবে। আর একটা ব্যবধান তখনও অভগ্ন রহিবে, তাহা বলা আবশ্যক। জীব বাহ্য জগৎ হইতে খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিয়া আত্মপোষণ করে, ও আত্মপুষ্টিসহকারে বংশবৃদ্ধিসাধন করিয়া স্বয়ং সংসার হইতে অবসর লয়, আপনার বংশধরে আপন ধর্ম্মের সংক্রমণ করিয়া তাহার প্রতি জীবনের খেলা খেলিবার ভার দিয়া যায়; জীবের এই অপর লক্ষণ, এই বিশিষ্ট জীবধর্ম্ম, তখনও জড়ের ও জীবের মধ্যে ব্যবধানস্বরূপে প্রজ্ঞার চক্ষু আবৃত রাখিয়া সম্প্রদায়বিশেষকে আরও কিছু দিন সান্ত্বনাপ্রদান করিবে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

বিংশ শতাব্দীর কবিতা।

রসাত্মক বাক্যই কাব্য বা কবিতা। ভাবাভিব্যক্তি তাহার ফল। তাহার উদ্দেশ্য,—

'কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥'

প্লেটো বলিয়াছেন, কবিরা যে সকল মহতী বাণীর উচ্চারণ করেন, তাহা তাঁহারাই বুঝেন না। আমাদের দেশে আদি কবি বাল্মীকির রসনায় বাগ্দেবীর আবির্ভাবসম্বন্ধীয় প্রবাদেও অলৌকিক শক্তির পরিচয়। সহচরবিনাশব্যথিতা ক্রৌঞ্চীর শোকে কাতর কবির মুখ হইতে সহসা কবিতার উৎস উৎসারিত হইয়াছিল। তাহার পর সেই উৎসারিত উৎস হইতে যে প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা গোমুখীনিঃসৃত গঙ্গাপ্রবাহেরই মত যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতবর্ষের তপ্তবক্ষে স্নিগ্ধতার সঞ্চার করিয়াছে। রামায়ণের পুণ্যকথা আজও ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে পরিচিত। সে কথায় ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়কাহিনী সমুজ্জ্বলতম বর্ণে চিত্রিত। সে কথায় পিতৃভক্তি ও পতিপ্রেমের উচ্চ আদর্শ, অপত্যস্নেহের আতিশয্য, সত্যের প্রতি অনুরাগ—চিত্তবিনোদন করে। Inspiration বা ভাবাবির্ভাব কবিহৃদয়ের রহস্য। ভাবাবেশকালে ভাববিভোর কবি ভাবনির্দ্দিষ্ট পথে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের মত চালিত হয়েন।

কবিতা ছন্দে বদ্ধ হওয়াই রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আরিষ্টটল বলিয়াছেন, ছন্দঃই কবিতার প্রাণ নহে। সিডনি এই কথারই পুনরুক্তি করিয়া বলিয়াছেন, ছন্দোবদ্ধ রচনা না করিয়াও কবি হওয়া যায়; আবার ছন্দোবদ্ধরচনাকারমাত্রই কবি নহেন। এ সকল কথার যাথার্থ্য কে না অনুভব করিয়াছেন? জর্ম্মানীর আমদানী সস্তা কাগজ ও এদেশের সস্তা ছাপাখানা—এই দুইয়ের কল্যাণে প্রতিমাসে বস্তা বস্তা ছন্দোবদ্ধ রচনা প্রকাশিত হইতেছে। সংবাদপত্রে সে সকলের বিজ্ঞাপন, কখনও বা সমালোচনা, প্রকাশিত হয়। কোন পুস্তক দুইখানি বিক্রীত হয়—কোনখানি বা আদৌ বিক্রীত হয় না; সকলেরই চরম গতি এক—গুদামে কীটদষ্ট হইয়া পুরাতন কাগজের দরে কাগজের কলে যাইয়া নির্বৃতিলাভ ও জন্মান্তরবাদমতে পুনরায় কাগজ-জন্ম-গ্রহণ। এ সকলই যদি কবিতা হইত, তবে আমরা কবিতার পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সমুচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া দেবত্বের গর্ব্ব করিতে পারিতাম। কিন্তু হায়!—সে সকলের অধিকাংশই কবিতানামের একান্ত অযোগ্য, কবিতার অপমান। তবে কেহ কেহ আশঙ্কা করেন, ছন্দের বাধা না থাকিলে স্বতঃজন্মলব্ধ কীটকুলের মত এই সকল অপদার্থ পুস্তকের সংখ্যা করা যাইত না। এখন বটতলার "কবি"—

"গঙ্গায় ডুবেছে গণেশের মামা
অষ্টমীর দিন মোকদ্দামা!"

প্রভৃতি বিবিধ "কাব্য" ও "মহাকাব্য" রচনা করিয়া "একটি পয়সা দিয়ে পড়" বলিয়া পাঠকসমাজকে (পাঠিকা-সমাজকে বলিলেই অধিক সঙ্গত হয়) সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

গণ্ডী না থাকিলে যে কি হইত, তাহা কল্পনা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলরের সহিত এই বিষয়ে টেনিসনের কথা হইয়াছিল। ছন্দের মাধুরীতে টেনিসন সিদ্ধহস্ত। তিনি এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, ছন্দঃ স্মৃতির সহায়তা করে। যাহা গুরু, তাহা আপনার ভারে অল্প দূর যাইয়াই পতিত হয়; যাহা লঘু, তাহা প্রতিভাদত্ত গতিবেগে বহু দূর যাইতে পারে। গুরুভার প্রস্তরখণ্ড অমিতবল ভীমসেনের প্রক্ষেপবেগে যত দূর যায়, অর্জ্জুনের গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত লঘুশর তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক দূর যায়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে লক্ষ্যভেদ ভীমের সাধ্যাতীত; অর্জ্জুনের পক্ষেই সম্ভব। তাঁহার শর লঘু! কত পণ্ডিতের গম্ভীর উপদেশ এখন বিস্মৃতিগর্ভগত; অথচ কত তুচ্ছ কবিতা মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। ছন্দঃ কবিতাকে সংক্ষিপ্ত করে।

কবিতায় অভাবেই ভাবের বিকাশ। কবিতায় ব্যক্ত অল্প, অব্যক্ত অধিক। সেই অল্প ব্যক্তে অধিক অব্যক্ত ব্যক্ত হইয়া উঠে। কবিতার একটি তুলিপাতে পাঠকের বা শ্রোতার হৃদয়ে বহু চিত্র ফুটিয়া উঠে। কবিতায় শ্রোতাই প্রথম—পাঠক পরে। এই শ্রোতার মনে সামান্য কথায় বহু ভাবের বিকাশসাধনই কবিতার উদ্দেশ্য, তাহাতেই কবিতার সার্থকতা। কবিতার এক চরণে যে ভাব ব্যক্ত হয়, গদ্যের বহু পৃষ্ঠাতেও তাহা হয় না। কালিদাস উমার বর্ণনায় বলিয়াছেন, "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।" লতিকা স্বভাবকোমলা; পল্লববিকাশে তাহার কোমলতা যেমন বর্দ্ধিত হইয়াছে—লাবণ্যশ্রী তেমনই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, আবার লতিকা সঞ্চারিণী। তিনটি কথার উপমায় শৈলসুতার মনোজ্ঞ কোমলতা, অসাধারণ লাবণ্য-মাধুরী ও সঙ্গে সঙ্গে গতিবিভঙ্গ যেমন প্রকাশিত হইল—তেমন গদ্যের শতশব্দাড়ম্বরেও প্রকাশিত হইত না। স্বল্প কথায় সকল বক্তব্য ব্যক্ত হইল, বুঝি অধিকও হইল। পাঠকের বা শ্রোতার মনে কল্পনাদীপ্তিপ্রকাশে ভাবের শতদল ফুটিয়া উঠিল। শেলী চাতকের বর্ণনায় বলিয়াছেন, "Like an unbodied joy whose race is just begun." কত স্বল্প কথায় ভাব ব্যক্ত হইল! টেনিসন প্রেমমদিরাপানবিহ্বল প্রেমিকের মুখ দিয়া প্রেমিকার বর্ণনা করাইয়াছেন—

"Rosy is the West,	"পূর্ব্ব আকাশে গোলাপী কিরণ,—
Rosy is the South,	দক্ষিণাকাশে গোলাপী বরণ,—
Roses are her cheeks,	দুই গণ্ডে তা'র গোলাপ মোহন,
And a rose her mouth,"	গোলাপে উপমা সে চারু আনন।"

এখানে একটি উপমার সাহায্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও নায়িকার সৌন্দর্য্য ব্যক্ত হইল। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য চিত্রিত হইল। গোলাপ ফুলের কল্পনায় আমাদের মনে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে—তাহার ঔজ্জ্বল্য, তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার কোমলতা, তাহার গর্ব্বিত ভাব, সব মিলিয়া আমাদের মানসপটে নায়িকার যে চিত্র অঙ্কিত করিল, চিত্রকরের তুলিকায় সে চিত্র ফুটা সম্ভব নহে।

যুগধর্ম্মের প্রভাব সাহিত্যের সকল অঙ্গেই লক্ষিত হয়—কবিতাতেও তাহা পরিস্ফুট। জাতীয় জীবনের কোন প্রধান ঘটনার ছায়া কবিতায় দৃষ্ট হয়। জাতীয় জীবনে কোন ভাবের তরঙ্গ প্রবল হইলে কবিতায় তাহার আঘাতচিহ্ন থাকিয়া যায়। আতসী প্রস্তর যেমন বিক্ষিপ্ত আলোকরাশিকে এক বিন্দুতে আনিয়া তাহার দাহকরী শক্তির বিকাশ করে—সম্মুখধৃত দ্রব্যে তাহার চিহ্ন অঙ্কিত করে; কবিতা তেমনই জাতীয় জীবনের প্রবল ভাবকে স্বল্পায়তন পরিসরে বদ্ধ করিয়া সহজে দেদীপ্যমান করে। কবিহৃদয়ে ভাবের চিহ্ন সহজেই গভীর হয়। কবিতা কবিহৃদয়ের প্রতিবিম্ব। চসারের সময়ে ইংলণ্ড বিজয়গৌরবদৃপ্ত—

আনন্দপ্রফুল্ল—তাই চসারের কবিতায় আনন্দের প্রবাহ বীচিবিভঙ্গে বেণী বিনাইয়া বহিয়া গিয়াছে। শেলী ও বায়রণ ফরাসীবিপ্লবের কবি। উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে; টেনিসনের কবিতায় বিজ্ঞানের ছায়াপাত লক্ষিত হইবে। কবি আপনার সময়ের প্রচলিত ভাব ছাড়াইতে পারেন নাই। তাহা তাঁহার সাফল্যের অন্যতম কারণ। কুতূহলী পাঠক ডসন-প্রণীত Princess পুস্তকের সমালোচনায়, অভিব্যক্তিবাদের আভাষ টেনিসন ডারউইনের পূর্ব্বেও দিয়াছেন কি না, তাহার বিচার দেখিতে পাইবেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ হইয়া গিয়াছে। সেদিন উনবিংশ শতাব্দীর কল্পনাবহুল সাহিত্যে কাহার কাহার প্রাধান্য বচনাতীত, তাহার আলোচনায় এক জন বলিয়াছেন—বায়রণ, গেটে, স্কট, বলজাক ও টুর্গেনিফ। এখন বিংশ শতাব্দীর অবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের কোষ্ঠী কাটিবার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। ভবিষ্যৎবক্তাও অনেক—ভবিষ্যৎবাণীও অনেক। ভট্টপল্লী, শ্রীরামপুর, নদীয়া ও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা অনেক। মতও বহুবিধ।

এই বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের—গদ্য ও পদ্য উভয়েরই প্রকৃতি, গতি, পরিণতি কি হইবে, তাহার আলোচনা চলিতেছে।—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কবিতার কথাই আমাদের আলোচ্য। "লিট্রেচর" পত্রে প্রকাশিত সুকবি হার্বার্ট ওয়ারেণের প্রবন্ধ আমাদের প্রধান অবলম্বন। এখন বিংশ শতাব্দীর আগমনে জিজ্ঞাস্য,—

কিরূপ কবিতা তা'র, কে বা কবিগণ;
প্রকাশ করিয়া সব কহ বিবরণ!

চসারের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের কাব্যগগনে বহুদিন কোন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের উদয় হয় নাই—ইংলণ্ডের কাব্যকুঞ্জে কোন কলকণ্ঠ কোকিলের কূজিত শ্রুত হয় নাই। চসারের তিরোভাব ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী প্রকৃত কবির আবির্ভাব—এই দুই ঘটনার মধ্যে দেড় শত বৎসরের ব্যবধান। ইংলণ্ডের কবিতার ইতিহাসে এরূপ ঘটনা যে কেবল একবার ঘটিয়াছে, এমন নহে। তবে ব্যবধান এত দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। যাহা হউক, লেখকের মতে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তিসম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কাউপারের মৃত্যুকালে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে না হইতে উনবিংশ শতাব্দীর স্বাগততূর্য্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের কাব্যকাননে নববসন্তের আবির্ভাব হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রণ, কোলরিজ, শেলী ও কিট্স্ এই বসন্তের "কলকণ্ঠ গায়ক সুন্দর।" শতবর্ষে এই সঙ্গীতের বিরাম লক্ষিত হয় নাই—শতাব্দীব্যাপী সঙ্গীতস্রোতঃ ইংলণ্ডকে শ্রীসমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। এখানেও শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের বিরতি। বিস্ময়ের বিষয় বটে! শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেও পরিবর্ত্তন পরিস্ফুট।

এবারও কি শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের নিবৃত্তি হইবে? আমরা যে পুরাতনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নূতনের সম্মুখীন হইয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এই নূতনের গতি ও প্রকৃতি কিরূপ হইবে? বহুদিন পূর্ব্বে টিণ্ডাল তাঁহার Fragments of Science গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে কবির কার্য্য আরও গুরুতর। এখন ধর্ম্মতত্ত্বের প্রবাহের অন্তর্ধানে যে বেলাভূমি নগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকেই কবিতায় সমাচ্ছাদিত রাখিতে হইবে। এই ভবিষ্যৎবাণীর সাফল্যের জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া ছিলাম। আমরা নূতন শতাব্দীতে নূতন যুগের কবিদলের নিকট অনেক প্রত্যাশা করিতেছিলাম। কিন্তু হায়!—টিণ্ডালের মত সূক্ষ্মদর্শীরও ভ্রম হয়! মানবের সকল আশা পূর্ণ হয় না। অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনার অতর্কিত আগমনে আমাদের কল্পনার

হইয়া যায়। নহিলে আজ—এই সভ্যতার গর্ব্বদৃপ্ত অভ্যুদয়কালে, এই সংগ্রামের ও শিষ্টাচার বাহুল্যের যুগে, হেগে "শান্তিসমিতির" অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া বুয়র সমরের বহ্নিশিখা সভ্যতার কৃত্রিম আবরণ ভস্মসাৎ করিয়া "সভ্য" জগতের অন্তর্নিহিত কদর্য্যতার উলঙ্গমূর্ত্তি জনসমাজে উপস্থিত করিত না। ইংলণ্ডে উন্মত্ততার তাণ্ডবনৃত্যে দিক কম্পিত। লোলজিহ্বা, বিকটদশনা নররক্তরঞ্জিতখর্পরা নৃমুণ্ডমালিনী এখন ইংলণ্ডে সম্পূজিতা; তাহার মন্দিরসম্মুখে নিত্য শত শত নরবলির উৎসবে তামসিকতার পূজা হইতেছে। আর ইংলণ্ডের জনগণ সমাজ, সভ্যতা, স্নেহ, মমতা সব ভুলিয়া সেই পূজায় যোগ দিয়াছে। চেম্বার্লেন, রোড্‌স ও মিলনার সে পূজার পুরোহিত, কিপলিং প্রভৃতি সে পূজার তন্ত্রধার। Imperialism সে পূজার মহামন্ত্র। বার্ক, ব্রাইট প্রভৃতি কর্তৃক সেবিত ইংলণ্ডের, মিণ্টন, ষ্টৌ প্রভৃতি কর্তৃক সেবিত ইংরাজী সাহিত্যের এ অধঃপতন দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা করে,—

"আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরা,
কোলের সন্তান তব।"

বর্ত্তমান লেখকের মতে বিংশশতাব্দীর কবিতা সাম্রাজ্যের কবিতা,—বিজ্ঞানের কবিতা। Imperialism এখন কবিতার প্রধান বিষয়। যে ইংলণ্ডে একদিন মিল্‌টনের বজ্রকণ্ঠে ধ্বনি উঠিয়াছিল,—"Avenge O Lord," যে ইংলণ্ডে সেদিন ও টেনিসনের কল্পনা "ধরায় শান্তির স্বর্গ" রচনা করিবার সম্ভাবনা দেখিয়াছিল—

"Till the war drum throbb'd no longer, and the battle-flags were furl'd,
In the Parliament of man, in the Federation of the world."

সেই ইংলণ্ডে এখন কিপলিং ইংরাজের আত্মম্ভরিতা তৃপ্ত করিয়া সম্পূজিত। অন্যজাতি সকলকে "Half devil—half child" বলিয়া ইংরাজকেই বড় করিয়া আদৃত। বিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সভ্যতার এই কি পরিণতি? "হায় বিধি চাঁদে হৈল রাহুর আহার"? কাহার আসনে আজ কে বসিয়াছে! "দেবতার সিংহাসনে বসেছে দানব!" এ দুর্দ্দশার দিনে অকালনির্ব্বাপিতজীবনদীপ প্রতিভাবান ষ্টিফেনসের কথা মনে পড়ে। "সে দিন, কবে বা হ'বে"—

"When Rudyards cease from kipling
And Haggards ride no more."

সে যাহা হউক, আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক বলেন, সাম্রাজ্যের কবিতা কিরূপ হইবে? ভার্জিল ও হরেস রোমান সাম্রাজ্যের স্বাগতগীতি গাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শতাব্দীব্যাপী সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার গতিরোধ। ইংরাজের সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যের কবিতাও কি এই পথের পথিক হইবে? টেনিসন ইংরাজী ভার্জিল, তিনি ইংরাজ সাম্রাজ্যের প্রথম কবি; তিনিই কি শেষ কবি হইবেন? তাহা বোধ হয় না; কারণ, রোমান সাম্রাজ্যের সহিত ইংরাজ সাম্রাজ্যের প্রভেদ আছে—ইংরাজ সাম্রাজ্যকে আত্মরক্ষার জন্য সদা চেষ্টিত থাকিতে হইবে। রোমান সাম্রাজ্য যে সকল অংশ লইয়া গঠিত ছিল—সে সকল অংশ স্বেচ্ছায় অধীনতাপাশবদ্ধ হয় নাই—সুযোগ পাইলেই সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত ছিল। যে সকল অংশ লইয়া ইংরাজ সাম্রাজ্য সংগঠিত, সে সকলই ইংলণ্ডের দুহিতা। ইংরাজের সম্বন্ধে কিপলিং গাহিয়াছেন,—

"করে বটে বাস তা'রা দেশদেশান্তরে,
হৃদয় তা'দের কিন্তু রহে এক স্থানে।"

সম্রাজ্ঞী হইয়াও জননী ইংলণ্ডের স্বহস্তদত্ত মুকুট পাইতে প্রয়াসী হয়, প্রার্থনা করে, "Mother crown me Queen." এখনও টেনিসনের সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচিত হইতেছে। তাঁহার প্রভাব যে এখনও অক্ষুণ্ণ, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

আবার টেনিসনই ইংরাজ কবিদলে সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞানের কবি। তিনি মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভবিষ্যতের কবি অতীতের কবির অপেক্ষা প্রচুর রচনার বিষয় পাইবেন।

সকল ললিত কলার মত কবিতাও ভাবমূলক; কবিতার ভাবের অভিব্যক্তি যত অধিক, চিন্তার অভিব্যক্তি তেমন নহে। আনন্দদানই কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য; তাহাতেই তাহার চরম ও পরম সার্থকতা। এই আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে কবিতা পাঠকের বা শ্রোতার হৃদয়ের প্রসারবৃদ্ধি করে; উদারতা সম্বর্দ্ধিত করে।

এখন দেখা যাইতেছে, বহু কবি ও অভিনেতার চেষ্টায় রঙ্গালয়ের যে পরিমাণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে রঙ্গালয়ে প্রকৃত কবিতার স্থানাভাব হইবে না।

মিষ্টার ষ্টিফেন ফিলিপ্‌স সে দিন একটি কবিতায় বিংশশতাব্দীর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। সে অনবদ্য কবিতা অনিন্দ্যসুন্দর স্বপ্নমাধুর্য্যে সঞ্জীবিত। সুখ ও স্বাস্থ্যের আবির্ভাব হইবে। যুদ্ধ থাকিবে না (!), মৃত্যুর অবসান হইবে—মৃত্যুতে বন্ধুবিচ্ছেদসম্ভাবনা থাকিবে না। এ সব স্বপ্নই বটে! কিন্তু "আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও"—নূতন যুগের কবিকুল শান্ততর সংসারের সঙ্গীতস্রোতে জগতের কর্ণকুহর তৃপ্ত করিবেন।

প্রবন্ধলেখকের এই কথার প্রতিবাদ করিয়া 'লিট্‌রেচর' বলেন, জাতীয় উন্নতির যুগের সঙ্গে সঙ্গে যে সাহিত্যে উন্নতির যুগের আবির্ভাব হয় নাই—এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর। পেলোপনেসস যুদ্ধের ফলে গ্রীক সাহিত্যে পেরিক্লিসের যুগের আবির্ভাব নহে। শেষোক্ত পূর্ব্বোক্তের পূর্ব্ববর্ত্তী—পরবর্ত্তী নহে। ইংলণ্ডে Wars of the Roses কোনও সাহিত্য-যুগের স্রষ্টা নহে। রাণী আনের রাজত্বে ইংলণ্ডের কাব্যশতদল শত-দলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তখন "অসিঝনৎকার" নীরব।

প্রকৃতপক্ষে কবিতা শান্তির। যুদ্ধের কবিতা সাময়িকমাত্র; কিছু ক্ষণের জন্য তাহা জনসাধারণের মনে অসাধারণ অধিকার সংস্থাপন করিতে পারে বটে, কিন্তু সে প্রভাব চিরস্থায়ী হইতে পারে না; তাহার খদ্যোৎদীপ্তির নির্ব্বাণ অবশ্যম্ভাবী। উত্তেজক মদ্যের মত তাহারও অবসাদ আছে। সে কবিতা মানবহৃদয়ের কোন স্থায়ী ভাবের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত নহে; তাহা ঘটনাপরিবর্ত্তনের সামান্য ফুৎকারে ফাটিয়া যায়। তাহার স্থায়িত্ব অসম্ভব।

যুদ্ধবিগ্রহের কলরব অল্প দিনেই থামিয়া যায়—উন্মত্ত জীবন তাহার পর অবসাদ প্রাপ্ত হয়; তখন মহত্ত্বের কবিতার মধুর মুরলীধ্বনি জাতীয় জীবনে নবজীবনের সঞ্চার করিতে পারে।

পুরাতন ভৃত্য।

"বল্‌চি এখনি দূর হও!"

"আজ্ঞে কি দোষ করলুম?"

"বেটা নবাবপুত্র হয়েচ, কি দোষ তার আবার তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে! ভাল চাও ত এখনি দূর হও, নইলে শেষে ঘাড়ে ধরে, বার' করে দেব।"

"আজ্ঞে যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, আপনি মনিব, এইবার আমাকে ক্ষমা করুন, আর কখনো এ রকম কাজ হবে না। আপনার পায়ে ধরে ভিক্ষা চাচ্চি।"

"কোন কথাই শুন্‌তে চাইনে, এখনি বে'র হও, এই দরওয়ান—"

তখন পুরাতন ভৃত্য অযোধ্যা আর একটিও কথা না বলিয়া বাবুকে প্রণাম করিয়া একটি ভাঙ্গা সিন্ধুক ও ছেঁড়া মাদুরে জড়ান বহুকালের তৈলনিষিক্ত অঙ্গারকৃষ্ণ একটি বালিস মুটের মাথায় দিয়া ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইয়া চলিল। অল্প দূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ঝি নিস্তারিণীকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "নিস্তার, আমার কাছে মনুকে একবার এনে দিতে পার, যাবার আগে একবার শেষ কোলে করে নিই।"

নিস্তারিণী বলিল, "আমাদের কি আর ইচ্ছে নেই, তা' আমরা কি করব বল, বাবু যে তোমার কাছে মেয়েকে দিতে মানা করেচে। দিলে কি আর রক্ষে আছে। তাই ত, এতদিনের পুরোণা লোকটাকে এমন্ কল্লে, আমাদের অদৃষ্টে না জানি কত লাথি ঝাঁটা আছে।" শেষোক্ত কথাগুলি নাসিকা-নির্গত ঈষৎ ভগ্নস্বরে পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে নিস্তারিণী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অযোধ্যা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হতাশমনে চলিয়া গেল।

অযোধ্যা বহুকালের পুরাতন ভৃত্য। হরিহর বাবুর পিতার নিকট সে কাজ করিয়াছে। হরিহর বাবুকে সে স্বহস্তে মানুষ করিয়াছে, এবং এক্ষণে তাঁহার পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা মনুকে (মৃণালিনী) মানুষ করিতেছিল। স্বর্গীয় কর্ত্তা ইহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ অনুগ্রহ করিতেন। তাঁহার আমলে অযো-ধ্যার খুব সুখ ও প্রতিপত্তি ছিল। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত ইহাকে

মানিয়া চলিত। কর্ত্তার মৃত্যুর পর হরিহর বাবুও বরাবর অযোধ্যাকে একটু সমীহ করিয়া চলিতেন। কিন্তু দুই বৎসর হইল দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণের পর হইতে হরিহর বাবুর কেমন ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। নূতন গৃহিণী পুরাতন ভৃত্যের মর্য্যাদা কি বুঝিবেন! অযোধ্যার কর্ত্তৃত্ব তাঁহার একেবারে অসহ্য বিষতুল্য বোধ হইত। তিনি চাহিতেন, প্রাচীন ভৃত্য তাঁহার নিকট নিতান্ত নরম থাটো হইয়া চলে, কিন্তু অযোধ্যা সব সময়ে তাহা পারিয়া উঠিত না। এই জন্য প্রভুপত্নী ও ভৃত্যে প্রায়ই খিটি মিটি বাধিত। আজ অযোধ্যা আর থাকিতে না পারিয়া মুখের উপর দুই এক কথা শুনাইয়া দিয়াছিল। প্রভুপত্নী কাঁদিয়া আকুল, ধুয়া ধরিলেন,—অযোধ্যাকে না তাড়াইয়া দিলে তিনি জলস্পর্শও করিবেন না। এই জন্য হরিহর কর্ত্তৃক অযোধ্যার এইরূপ লাঞ্ছনা।

এইরূপ তিরস্কৃত অপমানিত হইয়াও অযোধ্যা যে থাকিবার জন্য একান্ত অনুনয় বিনয় করিয়াছিল, বারবার ক্ষমাভিক্ষা চাহিয়াছিল, তাহার যে অন্ন মারা গেল কিম্বা তাহার যে অন্য গতি নাই—সে জন্য নয়। সে জানিত, চেষ্টা করিলে অন্য স্থানে ইহা অপেক্ষা বেশী মাহিনায় চাকরী পাইতে পারে। কিন্তু স্বার্থের প্রতি তাহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া যে পরিবারের জন্ম মৃত্যু উৎসব রোগ শোক বিপৎপাতে নিতান্ত আপনার জনের মত হাসি অশ্রু শরীরের রক্ত সম্মিলিত করিয়া আসিয়াছে, যে গৃহের প্রত্যেক ছোট বড় সকলের শৈশবদৌরাত্ম্যের লাঞ্ছনা আজ পর্য্যন্তও দেহে ধারণ করিয়া আছে, যাহার কড়ি বরগা ইট পর্য্যন্তও তাহার নিকট নিতান্ত পরিচিত আত্মীয়বৎ,—প্রভু যদি মোহবশতঃ অপমানও করিয়া থাকেন, কেমন করিয়া সে সে পরিবার সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায়! বিশেষতঃ মনু তাহার প্রাণ। সে জানিত, তাহাকে ছাড়িয়া মনু এবং মনুকে ছাড়িয়া সে একদণ্ডও থাকিতে পারিবে না। কিন্তু মনিব যখন কিছুতেই শুনিলেন না, তখন সে আর কি করে? তাহার মনে যাহা হইতেছিল, তাহা সেই জানে!

বহিষ্কৃত হইয়া অযোধ্যা মনিববাড়ীর দুই চারিখানা বাড়ীর পরে এক আলাপী মণিহারীর দোকানে গিয়া উঠিল। মাসে মাসে দোকানদারকে কিছু দিবে বলিয়া তাহার সহিত সেইখানে থাকিবার ও খাইবার বন্দোবস্ত করিল। আসল অভিপ্রায় এই যে, এইখানে থাকিলে ঝির সঙ্গে মনু যখন রাস্তার এ দিকে বেড়াইতে আসিবে, তাহার সহিত দেখা হইবে।

অপরাহ্নে ঝির সঙ্গে রাস্তায় বেড়াইতে আসিয়া মনু প্রায় প্রত্যহই অযোধ্যাকে দেখিতে পাইত। বাড়ীর কেউ কোথাও আছে কি না, একবার এ দিক ও দিক দেখিয়া একেবারে সবেগে অযোধ্যার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত ও তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া কত যে প্রশ্ন করিত, তাহার ঠিক্ নাই। "বাবা তোমাকে দুষ্টু বলে," "বাবা তোমার কাছে যেতে বারণ করে", "তুমি বাবাকে বলনা আর কর্‌বে না","তুমি কোথা থাক, কি খাও" ইত্যাদি। কখনও কখনও বাড়ী হইতে দুই একটা পয়সা আনিয়া অযোধ্যাকে দিয়া বলিত, "তুমি এই পয়সা নিয়ে মুড়ি কিনে খেও।" তখন অসুরতুল্য ভীমদেহ অযোধ্যার নিরোধ করিবার সহস্র চেষ্টা সত্বেও চোখ দিয়া জল পড়িত।

একদিন মনু বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময়ে অযোধ্যাকে রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিল, বলিল, "তুমি লুকিয়ে আমাদের বাড়ী একবার এস না!" ঠিক এই সময়ে হঠাৎ মনুর পিতা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনু পিতাকে দেখিয়া ভ্যাবাচাকা খাইয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া কি করিবে ঠিক্ করিতে না পারিয়া অযোধ্যাকে বলিল, "তুমি দুষ্টু তুমি চলে যাও।" মনু যে কি জন্য কি ভাবে কথাগুলি বলিল, ভৃত্যের তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না। মনুও মনে মনে বেশ বুঝিল, "অযুদা" তাহার কথা কখনও অন্যভাবে গ্রহণ করিবে না।

একদিন বাবু যখন গাড়ীতে উঠিবেন, অযোধ্যা পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া শেষ একবার চেষ্টা করিয়া দেখিল, যদি তাহাকে রাখেন। বাবু যখন কোন মতেই সম্মত হইলেন না, তখন অযোধ্যা মনে মনে ভাবিল, মনুকে দেখা দিয়া কেনই বা তাহাকে কষ্ট দিই, এবং আমিও কষ্ট পাই। অতঃপর মণিহারির দোকান হইতে বাসা উঠাইয়া সে যে কোথায় চলিয়া গেল, কেহ বলিতে পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অযোধ্যা চলিয়া যাইবার পর হইতে মনু দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। তাহার খেলা ধূলায় স্পৃহা নাই, আহারে রুচি নাই; মনে স্ফূর্ত্তি নাই; সারাদিন সে মুখ ভার করিয়া থাকে। অপরাহ্নে বেড়াইতে গিয়া ঝিকে ঠেলিয়া মণিহারীর দোকানে লইয়া যায়; সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করে, " 'অযুদা'

কোথায়?" দোকানদার প্রত্যহই বলে, "মা, সে ত এখানে নাই।" তখন মনুর মুখখানি কষ্টে শুকাইয়া এতটুকু হইয়া যাইত।

অযোধ্যার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে মনুর ভারি শক্ত ব্যায়রাম হইল। প্রায় বৎসরাবধি ভুগিয়া আরোগ্যলাভ করিল বটে, কিন্তু অযোধ্যাকে সে একেবারে ভুলিতে পারিল না।

মনু যখন ব্যায়রামে ভুগিতেছিল, অনেক জায়গা হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছিল। হরিহর বাবু জমীদার, তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহ দিবার জন্য অনেকেই লালায়িত। মনুর ব্যায়রামের জন্য হরিহর বাবু এত দিন কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এক্ষণে একটি ভাল পাত্র মনোনীত করিয়া তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া ঘরজামাই রাখিবেন, সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করিলেন।

মনু হরিহর বাবুর একমাত্র কন্যা ও বড় আদরের। অল্পদিনের মধ্যে খুব ধূমধামের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হইল। বহুদিন ধরিয়া থিয়েটার নাচ প্রভৃতি কত যে আমোদ প্রমোদ হইল, তাহার ঠিকানা নাই। হায়, মনুর মা (হরিহর বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী) যদি এই সময়ে বাঁচিয়া থাকিতেন! মনুর মাকে স্মরণ করিয়া হরিহর বাবু বিবাহের পূর্ব্বদিন সমস্ত রাত ধরিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিবাহের পর যে ঘটনা ঘটিল, তাহাতে হরিহর বাবুকে বজ্রদীর্ণ কদলীবৃক্ষের ন্যায় একেবারে ভূমিশায়িত করিল। বিবাহের এক মাস পরেই জামাইটি কলেরা রোগে আক্রান্ত হইল। কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার দেখান হইল, কিছুতেই বাঁচিল না। হরিহর বাবু আর বিছানা হইতে উঠিতে পারিলেন না। কন্যার দশা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ যেন ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কন্যার মুখের দিকে চাহেন, আর দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যায়। সমস্ত আমোদ আহ্লাদ, এমন কি, মাছ খাওয়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন। কন্যা আপনার দারুণ অবস্থা বুঝিতে না পারুক, অন্যকে কাঁদিতে দেখিলে সেও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিত।

হরিহর বাবু মনে মনে ভাবিলেন, হয় ত নিরপরাধ প্রভুভক্ত অযোধ্যাকে তাড়াইয়া দিয়াই তাঁহার এই সর্ব্বনাশ ঘটিল। এই ভাবনা কুশাঙ্কুরের ন্যায় দিবারাত্র তাঁহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিতে লাগিল। অযোধ্যাকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য চারি দিকে লোক পাঠাইলেন, কেহ কিছু ঠিকানা করিতে পারিল না।

অযোধ্যার দেশে চিঠি লিখিলেন। সেখান হইতে উত্তর আসিল, আজ দুই তিন বৎসর যাবৎ অযোধ্যা দেশে যায় নাই।

হরিহর বাবু দিন দিন কঙ্কালপ্রায় শীর্ণ হইতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে পরামর্শ দিল। হরিহর বাবুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও আত্মীয় স্বজন জোর করিয়া তাঁহাকে বিলাসপুরে পাঠাইয়া দিল। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও মনু গেল।

কলিকাতার জমীদার বাবু আসিয়াছেন, গ্রামে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। দরিদ্র ভিখারী দোকানদার সকলেই ভাবিল, এই বার দু পয়সা লাভ করিব। হরিহর বাবুও মুক্তহস্তে সকলকে দান করিতে লাগিলেন।

দুই মাস গত হইয়াছে। রাত্রি প্রায় এগারোটা, জ্যৈষ্ঠ মাস। হরিহর বাবু বিছানায় বসিয়া বসিয়া পার্শ্বস্থিতা নিদ্রিতা কন্যাকে বাতাস করিতেছেন। তখন স্বামী স্ত্রী কেহই আহার করেন নাই। এমন সময়ে বাহিরে ভীষণ রৈ রৈ শব্দ শুনা গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বহুতর মশালের আলো দেখা দিল। হরিহর সভয়ে কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় দস্যুদল সবলে দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের বাঁধিয়া ফেলিল। তৎপরে আগুন ধরাইয়া বাক্স ভাঙ্গিয়া যে যাহা পাইল, দুই হস্তে লুণ্ঠন করিতে লাগিল। সকলে যখন এইরূপ কার্য্যে ব্যস্ত, মনু হঠাৎ 'অযুদা' 'অযুদা' বলিয়া চীৎকার করিয়া দলপতির কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে তাহাকে কোলে করিয়া খানিকক্ষণ নিঃস্পন্দ নির্ব্বাক হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর দলের সকলকে ডাকিয়া বলিল, "যা' হইবার হইয়াছে, এক্ষণে সমস্ত জিনিষপত্র রাখিয়া তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও, যে আমার কথা অমান্য করিবে, এই খড়্গ দ্বারা তাহার মুণ্ডপাত করিব!" দস্যুরা ব্যাপারখানা কি বুঝিতে না পারিয়া সর্দ্দারের আদেশে বিষণ্ণমনে চলিয়া গেল। তখন অযোধ্যা প্রভু ও প্রভুপত্নীর বন্ধনমোচন করিয়া পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "এখন আমাকে পুলিশের হাতে দিন আর যাহাই করুন, আমি আর আপনাদের ছাড়িতেছি না।" হরিহর বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "অযোধ্যা, তুমি আমাকে মানুষ করিয়াছ, তুমি আমার পিতৃতুল্য, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তোমাকে যে কত খুঁজিয়াছি, তাহার ঠিক নাই।"

সকলে প্রকৃতিস্থ হইলে অযোধ্যা বলিতে লাগিল,—"মনুকে ছাড়িয়া

চলিয়া যাইবার পর আমি যেন ঠিক পাগলের মত হইয়াছিলাম। কত দিন যে অনাহার অনিদ্রায় কাটাইয়াছি, তাহার ঠিক নাই। ছোট মেয়ে দেখিলেই মনুর কথা মনে পড়িয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইত। ক্রমে ভগবানের প্রতি অবিশ্বাস আসিল, মানুষের উপর ঘৃণা জন্মিল, দয়া মায়া স্নেহ সমাজের কৌশল এবং পাপ পুণ্য কথার কথা বোধ হইল। অত্যাচার নিষ্ঠুরতাই আমার মূলমন্ত্র হইল। শেষে এক ডাকাতের দলে মিশিলাম। আমার আকৃতি দেখিয়া তাহারা আমাকে দলপতি করিল। এই বিলাসপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে আমাদের আড্ডা। হায়, কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তাহার ঠিক নাই। শুনিলাম, কলিকাতা হইতে এক বড় জমীদার বিলাসপুরে আসিয়াছেন, সেই জন্য আজ রাত্রে এইখানে ডাকাতি করিতে আসিয়াছিলাম। কে জানিত, এখানেই আপনাদের দেখিতে পাইব!”

রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া হরিহর বাবু ভৃত্যকে আহারের যোগাড় করিতে আদেশ দিলেন, এবং বলিলেন, অযোধ্যাও তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিবে।

সকলে আহারে উপবেশন করিলে হরিহর বাবু নিজ হাতে করিয়া অপর্য্যাপ্ত মাছ মাংস অযোধ্যার পাতে দিলেন। অযোধ্যা বলিল, “এস মনু, দিদি এস, আগেকার মত এক সঙ্গে খাই।” হরিহর বাবু ছলছলনেত্রে বলিলেন, “মনু যে বিধবা, ও খাইবে না।” হাতের ভাত আর মুখে উঠিল না, অযোধ্যা সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ষাবর্ণনা।

[কালিদাস-কৃত ঋতুসংহারের বর্ষাবর্ণনার অনুবাদ।]

হের প্রিয়ে কিবা শোভা! কামিজনপ্রিয়
　　বর্ষাকাল—
প্রভাবে প্রদীপ্ত অতি;—সমুদিল যেন
　　মহীপাল।
মত্ত কুঞ্জরের মত জলভরা নব মেঘ
　　রাজে;
তড়িত পতাকা যেন; অশনি, মাদল সম
　　বাজে। ১

গগনের চারি ভিতে নবঘন উদিল।
গর্ভিণী-চুচুকপুটে যে নীলমাধুরী ফুটে,
কোথা বা সে নীলরূপে নব শোভা ধরিল;
কোথা শোভা অনুপম দলিত অঞ্জন সম;
কোথা নীলপদ্মপত্র-সম কান্তি ফুটিল। ২

সঞ্চরিছে মেঘ ঐ মৃদুমন্দ গমনে।
তৃষ্ণায় চাতকদল যার কাছে চাহে জল,
বারিভরে বিলম্বিত আজি গো সে গগনে;
বর্ষি ধারা বহুতর গরজিছে মনোহর
শ্রোত্রসুখকর ওই গুরু গুরু গর্জ্জনে। ৩

অশনি মাদল-রূপে বাজাইয়ে সঘনে,
বিদ্যুতের গুণ জুড়ি ইন্দ্রধনু হাতে করি,
তীক্ষ্ণশর-রূপে ধারা বরষিয়া ভুবনে,
প্রবাসীর চিত মেঘ বিঁধিতেছে ললনে। ৪

প্রভিন্ন বৈদূর্য্য সম তৃণাঙ্কুরে মনোরম
নবীন কন্দলীদলে পরিবৃতা ধরণী;
সুরক্ত সিন্দূরপ্রায় ইন্দ্রগোপ শোভা পায়;
নীল-রক্ত-যুতা তাই সুভূষিতা অবনী
বরাঙ্গনা সম কিবা শোভা পায় আপনি। ৫

আনন্দ-মগন-চিতে মনোহর কেকাগীতে
বিথারি কলাপকলা চারুচিত্রে শোভিত,
চুম্বনে ও আলিঙ্গনে আবেগে আকুল মনে
নাচিছে হরষভরে ময়ূরেরা নিয়ত। ৬

কুলটা কামিনী প্রায় উছলিত বাসনায়
প্রাবৃটে তটিনী বড় বেগবতী হইল।
বেগে কূলতরু নাশি, সমল সলিলরাশি
লয়ে নদী পয়োনিধি-উদ্দেশেতে ছুটিল। ৭

হরিণীর দন্তে ছাঁটা কচি শ্যাম তৃণে আঁটা
কানন প্রান্তর যত নীল শোভা ধরিল।
উদ্গতপল্লবক্রমে বিভূষিত, বিন্ধ্যভূমে
বনরাজি হের আজি নর-মন হরিল। ৮

বিলোল নয়নে যেন শোভিছে আনন, হেন
মনে হয় কুবলয় সুশোভিত কাননে।
বিচরে হরিণ তাহে সচকিতনয়নে।
সৈকতিনী বনস্থলী করে মন কুতূহলী
এইরূপে শোভা কত বিকশিয়া বিজনে। ৯

ঘন অন্ধতমিস্রায় আবৃতা শর্ব্বরী হায়,
ঘন ঘন নবঘন ডাকে গুরু গর্জ্জনে;
ক্ষণপ্রভা-দীপ্তিভরে কত কষ্টে পথ হেরে
যায় নারী অভিসারে কামরাগতর্জ্জনে। ১০

গভীর ভীষণ স্বনে শুনি মেঘ-গরজনে,
তড়িতের চকমকে চমকিয়া সঘনে,
(বটে পতি অপরাধী) তবু তারে নিরবধি
মানিনী কামিনী আজি আলিঙ্গিছে শয়নে। ১১

পল্লব সুমনোহর সিক্ত চারু বিম্বাধর;
শোভে বারি বিন্দু বিন্দু ইন্দীবর-নয়নে।
নাহি মালা আভরণ কিম্বা গন্ধবিলেপন;
আজি বিরহিণী ধনী আশাহীনা জীবনে। ১২

পাণ্ডুবর্ণে ধূসরিত কীট-রজঃ-তৃণাবৃত—
সর্পসম বক্রগতি যায় ধারা বহিয়া;
সভয়ে মণ্ডূকগণ করে তাহে নিরীক্ষণ;—
চলিছে ভুজঙ্গ বুঝি, ভ্রমবশে ভাবিয়া। ১৩

শ্রুতিহারী মধুস্বনে প্রফুল্ল নলিনীগণে
ত্যজি ভৃঙ্গ মূঢ়মতি যাইতেছে উড়িয়া;
আনন্দনর্ত্তন-রত হেরিয়া ময়ূর যত,
পড়িছে কলাপে তার নবোৎপল ভাবিয়া। ১৪

নবীন বারিদরবে ঘন ঘন বনে সবে
মত্ত বনকরী যত ভীমনাদ করিছে;
মদবারি-ভরা তার কপোলেতে অনিবার
বিমল-কমল-ভ্রমে অলি উড়ি পড়িছে। ১৫

পর্ব্বতের শৃঙ্গ'পরে নবাম্বুদ খেলা করে ;
চারি ধারে প্রস্রবণ ঝর ঝর বহিছে।
সুখভরে শিখিগণ নাচিতেছে অনুক্ষণ,
আজি মরি গিরি যত নরচিত মোহিছে।১৬

কাঁপাইয়ে সমীরণ কদম্ব-কেতকী-বন,
সর্জ্জ অর্জ্জুনের বনে বিচরণ করিয়া,
সুবাসে ভরিয়া তনু, বহি শীত মেঘ-অণু,
দিতেছে নরের মন আবেগেতে ভরিয়া। ১৭

শ্রবণে পরিয়া দুল—মধুর সুরভি ফুল—,
লুটায়ে কুণ্ডল চারু শ্রোণীতটে আলসে,
সীধুগন্ধে মুখ ভরি কুচযুগে হার পরি
কামিজন-চিত নারী ভরে রতিলালসে। ১৮

তড়িত-লতায় যুত ইন্দ্রধনু বিভূষিত
জলভরে অবনত নব ঘন শোভিল ;
মেখলা কুণ্ডলমণি পরি শোভে বিনোদিনী;
প্রবাসে বিরহি-চিত দুঁহে আজি হরিল। ১৯

কেতকী কদম্ব ফুলে নবকেশরের দলে—
রচি মালা রমণীরা, কবরীতে গেঁথেছে ;
ককুভ-মঞ্জরী দিয়া চারু দুল বিরচিয়া,
কুতূহলে শ্রুতিমূলে দুলাইয়া দিতেছে। ২০

কর্ণলগ্ন পুষ্পবাসে সুরভিয়া কেশপাশে,
ছিল নারী—অঙ্গে মাখি কালাগুরুচন্দনে ;
শুনি মেঘ-গরজনে প্রদোষে আকুলমনে
গুরুগৃহ তেজি যায় শয়নের ভবনে। ২১

ইন্দ্রধনু-সুরঞ্জিত জলনম্র মেঘ যত
মৃদুল অনিলভরে, মন্দ মন্দ চলিল ;—
নীল পদ্মপত্র সম সেই শোভা অনুপম
হেরি, বিরহিণী-চিত অপহৃত হইল। ২২

দোলে শাখা বায়ুভরে, বন যেন নৃত্য করে—
বিকচ কদম্বে যেন রোমাঞ্চিয়া শিহরে ;
ফুটায়ে কেতকী যত হাসে বন অবিরত ;
প্রশমিত তাপ তার নবধারা-শীকরে। ২৩

আজি প্রিয় বর্ষাঋতু পতিসম সোহাগে,
কামিনীর কর্ণে দুল দিতেছে কদম্বফুল ;
দিতেছে ফুলের মালা, গাঁথি তাহে সরাগে—
ফুল মালতীর ফুল যূথিকা কলিকাকুল ;
তাই বালা পরে মালা শিরোভাগে, সুভগে। ২৪

ভূষিছে রমণীগণ চারু হারে পীনস্তন,
আয়ত নিতম্ববিম্ব সূক্ষ্ম শুভ্র বসনে।
নবজলসেকজাত রোমরাজি, সুললিত
ত্রিবলী বিভাগে শোভে কামিনীর জঘনে।২৫

কুসুমিত অবনত পাদপে দোলায়ে কত,
সুগন্ধ কেতকীরজঃ বিতরিয়া যতনে,
জলকণে সুশীতল সুরভিত সুনির্ম্মল
পবন, প্রবাসি-চিত হরিতেছে, ললনে। ২৬

বহুগুণে রমণীয়, কামিনীর নিত্যচিত্তহারী,
তরু লতিকার সেই অকপট বন্ধু সুমহান,
প্রাণিগণ-প্রাণভূত বর্ষাঋতু, জনহিতকারী,
বাঞ্ছিত কল্যাণ যত তোমা সবে করুন প্রদান।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সহমরণ ।*

প্রাচীন কথা ।

মিষ্টার হ্যালিডে (পরে সার্) যখন হুগলীর অস্থায়ী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত, সেই সময় একদিন সংবাদ পাইলেন যে, সহরের অনতিদূরে এক হিন্দু সতী আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিবেন। সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী করিয়া তিনি ও তাঁহার সঙ্গী দুই জন শ্বেতাঙ্গ (এক জন ডাক্তার ও অপর জন পাদরী) ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গঙ্গাতীরে এক স্থানে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে; সম্মুখে চিতা প্রস্তুত ; এবং এক জন আলুলায়িত-কুন্তলা, বিষণ্ণবদনা প্রৌঢ়া রমণী নিকটেই উপবিষ্টা। আগন্তুক বিদেশী তিন জন বসিবার জন্য চেয়ার পাইলেন। কালেক্টরের সঙ্গীরা বাঙ্গলা বুঝেন না। অগত্যা তিনি তাহাদের দ্বিভাষী হইয়া বাঙ্গলায় রমণীর সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা নানা কথায় ও তর্কে স্ত্রীলোকটিকে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রমণী স্থির গম্ভীর অথচ প্রশান্তভাবে তাঁহাদের সমস্ত যুক্তির উত্তর প্রদান করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আগন্তুকগণ বিশেষ চমৎকৃত হইলেন। চিতায় আরোহণ করিবার জন্য সতী বিশেষ ব্যগ্র হইয়া সাহেবদের অনুমতি চাহিলেন। অনন্যোপায় হইয়া কালেক্টর সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু সঙ্গী ধর্ম্মযাজক কিছুতেই ছাড়িবার লোক নন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জান কি,—তুমি কিরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে ?" প্রত্যুত্তরে ঈষৎ ঘৃণার স্বরে রমণী বলিলেন, "একটি প্রদীপ আন।"

বলিবামাত্র তথায় প্রদীপ, তুলা ও ঘৃত আনীত হইল। রমণী স্বয়ং শলিতা প্রস্তুত করিয়া প্রদীপ সাজাইয়া উহা জ্বালিবার আদেশ করিলেন। দীপ

* এই ঘটনাটি প্রকৃত। কোন পুণ্যবান পরিবারে ঘটে, তাহার উল্লেখ নাই। লোক-হিতৈষী মহানুভব লর্ড বেণ্টিঙ্ক মহোদয় কর্ত্তৃক ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ নিবারণের আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব প্রথম ছোটলাট বাহাদুর সার ফ্রেডরিক হ্যালিডে স্বয়ং আমাদের বর্ত্তমান চীফ সেক্রেটারী, অনারেবল বকল্যাণ্ড মহোদয়ের নিকট যেরূপ গল্প করিয়াছিলেন, তাহা বকল্যাণ্ডের নবপ্রকাশিত পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনাটি তাহা হইতে সংগৃহীত হইল।—লেখক।

জ্বালিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখা হইল। তিরস্কারপূর্ণ কটাক্ষে বিদেশী-দের দিকে ফিরিয়া সতী অবলীলাক্রমে স্বীয় অঙ্গুলি জ্বলন্ত শিখায় স্থাপিত করিলেন। কি ভীষণ দৃশ্য! দেখিতে দেখিতে আঙ্গুলটি ঝলসিয়া ফোস্‌কা পড়িল, ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইল, অবশেষে পেন-কলম অগ্নিতে ধরিলে যেরূপে পুড়িয়া বাঁকিয়া যায়, সেইরূপ কুঞ্চিত হইয়া গেল। এরূপ দৃশ্যে অনভ্যস্ত আগন্তুকগণ একেবারে অবাক! সতী নির্ব্বাক নিস্পন্দ! যেন কিছুই হয় নাই। তাঁহার আননে সামান্য কষ্টের চিহ্নমাত্র নাই!

সতী এইবার সদর্পে বলিলেন, "এখন বুঝিলেন কি?" হ্যালিডে অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "হাঁ! বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।" "তবে এখন আমি যাইতে পারি?" বলিয়া সতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে চিতা; প্রায় উচ্চে ৪½ ফুট। দৈর্ঘ্যেও তদনুরূপ, প্রস্থে তিন ফুট। শুষ্ক কাষ্ঠের চারিটি স্তরে উহা গঠিত। রমণী তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ঘণ্টার নিনাদ ও হুলুধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহার স্বামী ইতঃপূর্ব্বে প্রবাসে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সেই সংবাদ পাইয়া সতী স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী হই-তেছেন। পতির ত্যক্ত বসনাদি বক্ষে ধারণ করিয়া সাধ্বী সতী চিতায় শয়ন করিলেন। হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তাঁহার উপর আবার কয়েক ইঞ্চি পুরু করিয়া কাঠ বিছাইয়া দেওয়া হইল। তখন সমাগত ব্যক্তিরা বাঁশের সহিত তাঁহাকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিল; মিষ্টার হ্যালিডে ও তাঁহার সহচরদ্বয় ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহারা বিরত হইল।

অবশেষে রমণীর যুবা পুত্র চিতায় অগ্নিসংযোগ করিলেন। ধূপ ও ঘৃতের সহযোগে বহ্নি ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বিদেশী দর্শকত্রয় চিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যত ক্ষণ উত্তাপ সহ্য করিতে পারিলেন, তত ক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনোনিবেশ করিয়াও কিছু নড়িবার কি কোন প্রকারের শব্দ শুনিতে পাইলেন না। জ্বলন্ত অনলে সতীর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। পিতৃহীন পুত্র মাতৃহীন হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

গৃহসংস্কারবিৎ শম্বুক।

একজাতীয় শম্বুক আছে, তাহার ইংরেজী নাম ষ্ট্রম্বস (Strombus)। দেহের বহিরাবরণ (যাহাকে কঙ্কাল বলা যাইতে পারে) কোন কারণে ভগ্ন হইলে ইহারা অনতিদীর্ঘ কালে মধ্যে নূতন আবরণ দ্বারা দেহ আবৃত করে। এইরূপ শক্তি থাকাতে এই জাতীয় শম্বুকের কোমল মাংসল দেহ বিবিধ শত্রুর অত্যাচার হইতে নিরাপদ ও অক্ষত থাকে।

তাহাদের এই দেহসংস্কার ব্যাপারে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। আঘাত পাইয়া আমাদের কোন নখ নষ্ট হইয়া গেলে অল্প সময়ের মধ্যে তাহার স্থানে নূতন নখ জন্মিয়া থাকে; হরিণ প্রভৃতি পশুর শৃঙ্গ কাটিয়া দিলে, বসন্তাগমে বৃক্ষশাখার ন্যায়, তাহা পুনরায় উদ্গত হইয়া থাকে; আমাদের মাথার চুল কাটিলে তাহা পুনরায় গজাইয়া থাকে।—যে স্বাভাবিক নিয়মে নখ, শৃঙ্গ, কেশ প্রভৃতি পুনরুদ্গত হয়, ঠিক্ সেই নিয়মের প্রভাবেই এই শম্বুকের নষ্ট দেহাবরণ পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়।

যাবতীয় জীবিত শম্বুকের দেহের বৎসরে দুই তিন বার জীর্ণসংস্কার হইয়া থাকে। শম্বুকের দেহাভ্যন্তর হইতে একপ্রকার পদার্থ নির্গত হয়, তাহার সাহায্যে এই চুণকামটা সুন্দররূপে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে; যেন কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হইয়া আছে। কিন্তু কণ্ট্রাক্টর বড় চতুর; অথবা মালিক বড় নির্ব্বোধ। চুণকামটা কেবল বাহিরেই হয়; ভিতরে সেই মান্ধাতার আমলে, অর্থাৎ প্রথম গৃহনির্ম্মাণকালে যাহা ছিল, তাহাই থাকে। কিন্তু যাঁহারা কোনও শম্বুক বা ঝিনুকের অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিবেন যে, সেই পুরাতন কালের কাজ হাল আমলের নূতন কণ্ট্রাক্টরের কাজ অপেক্ষা অনেক ভাল। উহা কেমন উজ্জ্বল ও মসৃণ!

পুরাতন ভিত্তির উপরেই এইরূপ ঘন ঘন জীর্ণসংস্কার হইয়া থাকে। অর্থাৎ, শম্বুকের দেহকঙ্কালে এবার যে স্তরটি নূতন অধিষ্ঠিত হইল, আগামী বারে সেই স্তর না ফেলিয়াই তাহার উপরে নূতন স্তর স্থাপিত হইয়া থাকে। এইরূপে শম্বুকের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্তরের উপর স্তর পড়িয়া উহার দেহাবরণ ক্রমে স্থূলতর হইতে থাকে।

শুক্তি হইতে যে মুক্তা জন্মে, তাহাও কতকটা উপরিউক্ত জীর্ণসংস্কার ব্যাপারের মত। কোন প্রকারে যদি একটি বালুকাকণা বা তদ্রূপ কোনও পদার্থ শুক্তির কঠিন বহিরাবরণ ও কোমল দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে ঝিনুক একটু যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকে। আমাদের চক্ষে বালি প্রবেশ করিলে আমরাও সেইরূপ যাতনা অনুভব করি। আমাদের চোখের বালির বেলা আপনা-আপনি চোখে জল আসিয়া ঐ কণাটিকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করে; আর শুক্তির শরীর হইতে একপ্রকার তরল পদার্থ নির্গত হইয়া বালুকাকণাকে আবৃত করিয়া ফেলে। এই আবরণটি শুষ্ক হইবামাত্র, পুনরায় তরল পদার্থ ক্ষরিত হইয়া তদুপরি প্রলেপের ন্যায় লাগিয়া থাকে। এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী প্রলেপের ফলে বৃহদায়তন মুক্তার সৃষ্টি হয়। ইহার সহিত স্বাতিনক্ষত্রের কোন সম্বন্ধ নাই।

ষ্ট্রম্বস শম্বুকের ভগ্নদেহাবরণের স্থলে যে নূতন স্তর জন্মে, তাহার ভিতরের পার্শ্ব দেখিতে অতি সুন্দর,—স্ফটিকের মত নির্ম্মল ও উজ্জ্বল। অপিচ উহা স্ফটিকের মত অর্দ্ধ-স্বচ্ছ। উহার ভিতর দিয়া শম্বুকের দেহ অস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

এই শম্বুকের যথেষ্ট মাংসপেশী আছে, এবং মাংসপেশীর শক্তিও প্রচুর। তাহারই বলে সে নিজের বাসগৃহ স্কন্ধে লইয়া অনায়াসে লম্ফপ্রদান করিয়া থাকে। একজাতীয় শম্বুক আছে, তাহারা এই শম্বুকের পরম শত্রু। কোনরূপে নিকটে পাইলেই তাহারা ইহার শরীরে ছিদ্র করিতে আরম্ভ করে। উল্লম্ফনশক্তির কল্যাণেই তখন এই জাতীয় শম্বুক আত্মরক্ষা করিতে পারে। যখন সে নিরীহ ভদ্রলোকের মত বিনা লম্ফে ধীরে ধীরে চলে, তখন অন্যান্য পরিচিত শম্বুকের মত পদরূপী নিম্ন দেহের পর্য্যায়ক্রমিক আকুঞ্চন প্রসারণ দ্বারা অগ্রসর হইয়া থাকে।

অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর লুকাইবার একটা না একটা স্থান আছে। একজাতীয় শম্বুক শত্রু কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া বালি বা কঙ্করের মধ্যস্থ স্বীয় বাসগৃহে আশ্রয় লইয়া থাকে। জাহাজী পোকা (Ship worm) নামক বিখ্যাত পোকা জাহাজের গায়ে ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রাবাস দুর্ভেদ্য দুর্গস্বরূপ করিয়া লয়। কিন্তু এই শম্বুকের কোন আশ্রয়স্থান নাই; ইহাদের আত্মরক্ষার উপযোগী প্রধান অস্ত্র সেই ত্রেতার বীরের অস্ত্রটির ক্ষুদ্র সংস্করণমাত্র। যদি তাহার সাহায্যে এই শম্বুকজাতি স্বীয় দেহ অক্ষত রাখিতে না

পারে, তবে কালবিলম্ব না করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ মাখিতে বসে। এই দুইটি ভোঁতা অস্ত্র লইয়া সে যে বেশী দিন পিতৃপুরুষের নাম রাখিতে পারিবে, তাহা বোধ হয় না; "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" (অন্য কথায়—"জোর যার, মুল্লুক তার"—Might is right) প্রকৃতি রাণীর বর্ত্তমান রাজ্যশাসনপ্রণালীর মূলমন্ত্র। এমন রাণীর মুল্লুকে সম্ভবতঃ ইহারা শীঘ্রই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিতাকুঞ্জ।

নিত্যকৃষ্ণ বসু।

হে সৌম্য সুহৃদ, কোথা, ভবে মোহ করি'
সহসা কি মনে হ'ল—মর্ত্ত্যস্বপ্ন ভুল
তাই কি এ ধরণীর মুছে দিলে মরি,
অগাধ অসীম স্নেহ—প্রণয় অতুল।
যে ক'টি গাঁথিয়া গেছ কবিতার কুঞ্জ,
কাব্যের গগনে যেন স্নিগ্ধ শুকতারা!

গীতে ঝরে নির্ঝরিণী মৃদু কুলুকুল,
উচ্ছ্বাসের মন্দাকিনী—ত্রিদিবের ধারা!
বিরহীর রুদ্ধকণ্ঠে গাথা বরষার,
প্রেমের মদির নেশা, নেত্র ঢুলুঢুল;
প্রভাতের সুখস্বপ্ন,—বিষাদ সন্ধ্যার,
বসন্তের নব পিক—ভ্রমর চটুল;
তুলি' ও বীণায়, দিয়ে অমর ঝঙ্কার,
গেছ চলি' কবি!—করি বিশ্ব প্রেমাকুল!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

উৎপ্রেক্ষিতা।

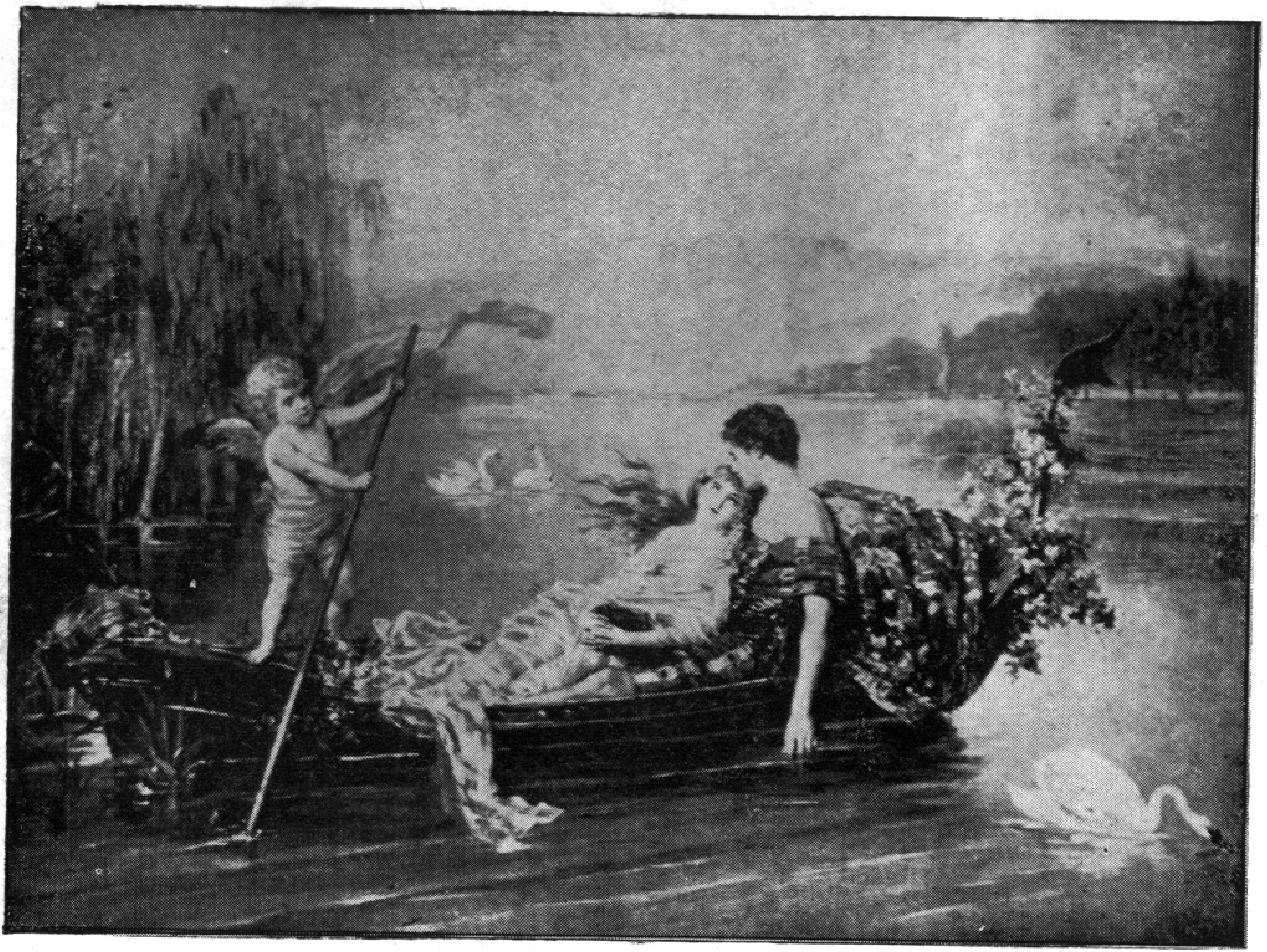
একি রচিয়াছ গীতি, হে কবি আমার!
আমার নয়নে আছে আলোক উষার—
তাই ফুল ফুটে উঠে তব বন-মাঝে!—
শুনে মরি লাজে।

এ কি গো স্বপন হায় নয়নে তোমার;—
আমার রূপের ভাতি আকাশের পার
কনক-বরণ ধরি' শোভা পায় সাঁঝে!—
শুনে মরি লাজে।

এ কি তব ছন্দোবদ্ধ প্রলাপ অসার;—
আমার অস্ফুট বাণী শ্রবণে তোমার
শত বীণা বেণু সম সুমধুর বাজে!—
শুনে মরি লাজে।

একি হায় মোহ তব, হে কবি আমার,
আমার চরণস্পর্শে যৌবনসঞ্চার
লভিয়া বসন্তে ধরা শোভে নব সাজে!—
শুনে মরি লাজে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।



মীনকেতনের তরণী।

প্রেমালোক।

বিষাদে—বিরাগে খুঁজেছি প্রণয়;
খুঁজেছি প্রণয় নয়ন-জলে;
খুঁজেছি হরষ-মথিত হৃদয়,—
কোথা প্রণয়ের আলোক জ্বলে।

প্রভাত-সমীরে, সাঁঝের গগনে,
তারার হাসিতে, রবির করে,
হৃদয়ে, বাহিরে—নিখিল ভুবনে
পাইনি তাহারে ক্ষণেক তরে।

খুঁজে খুঁজে সারা—শ্রান্ত যখন,
দেখিনু সহসা মাধবী-রাতে,
উজল করিয়া বিশ্ব-ভবন
সে আলো তোমারি নয়নে ভাতে'।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

প্রদোষে।

প্রদোষে যখন সখি! বিষাদের ভরে
উদাস অন্তর ক্লান্ত পড়িবে নোয়ায়ে,
এইখানে এসে বস' একা এই ঘরে,
ঢেলে দিয়ো তনুখানি সায়াহ্নের বায়ে।
অই যে কোমল সুধাসরস সঞ্চার
করুণ সান্ত্বনা সম শান্ত সমীরণ,
মনে করো আসে যেন নিশ্বাস কাহার
প্রেমের বেদনাতপ্ত পরশ সেচন।
ওই সন্ধ্যাতারা সখি! আকাশের পরে
মৃদুল কিরণ-কম্পে ঈষৎ চঞ্চল,
ভাল করে চেয়ে দেখো যদি ক্ষণ তরে
মনে হয় ও কাহারো আঁখি-ছল-ছল;
গৃহকর্ম্ম অবসরে যদি কোন দিন
মধুর মোহেতে চিত্ত হয় উদাসীন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচী।

চিত্রশালা।

মীনকেতনের তরণী।

এই চিত্রখানির নাম "মীনকেতনের তরণী"। ইটালীয় চিত্রকর আই. স্পিরিডনের অঙ্কিত এই ছবিখানি য়ুরোপীয় চিত্রশালায় একটি দেখিবার জিনিস বটে! আমরা এই ছবিখানি দেখিয়া কালিদাসের "শশিনা সহ যাতি কৌমুদী" স্মরণ করিতে পারি। সুন্দর জিনিস দেখিলে সুন্দর জিনিস মনে পড়ে! এ বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে স্মারক কবিতার অভাব নাই। রঘুবংশের

"তরঙ্গবাতেন বিনীতখেদঃ
রহস্তদুৎসঙ্গনিষণ্ণমূর্দ্ধা।"

কিংবা উত্তরচরিতের

"অশিথিলপরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি"

প্রভৃতি অপূর্ব্ব কবিতা শেলির কবিতাটির সঙ্গে এই চিত্রখানির পার্শ্বে লিখিয়া রাখা যাইতে পারে।

তরঙ্গিণীর নীল নীরে তরণী; যাত্রী তরুণ তরুণী—'পরস্পরেণ স্পৃহনীয়শোভা'; আর ভুবনবিজয়ী মন্মথ স্বয়ং কর্ণধার। মরালমিথুন অনুরাগভরে অন্যোন্যের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া আত্মহারা। তীরে "মর মর সর সর অরণ্যের ধানী।" দূরে গিরিশ্রেণী—যেন চিত্রে আঁকা। প্রেম আদিম বসন্তদিনের ছায়ালোকবিচিত্র গোধূলিবেলার স্বপ্নালস সমীরের মত,

মুগ্ধ প্রণয়িযুগলের বক্ষে কাঁপিতেছে। কিশোরীর স্বপ্ন-রঞ্জিত নেত্রযুগে কি বিহ্বল সকরুণ মাধুর্য্য! হে কিশোর, তুমি মৌন কেন? হে প্রেমিক, প্রিয়াকে বল—কবির ভাষায় বল,—

"নির্ঝর মিশিছে তটিনীর সাথে,
তটিনী মিশিছে সাগর পরে,
পবনের সাথে মিশিছে পবন
চির সুখময় প্রণয়ভরে!
"জগতে কিছুই নাইক একেলা,
সকলি বিধির বিধানগুণে
একের সহিত মিলিছে অপরে,
আমি বা কেন না তোমার সনে?

"ওই দেখ গিরি চুমিছে আকাশ,
ঢেউ 'পরে ঢেউ পড়িছে ঢলি,
যে ফুলবালারে কে বা না দোষিবে
ভাইটিরে যদি যায় সে ভুলি!
"রবিকর দেখ চুমিছে ধরণী,
শশিকর চুমে সাগর-জল,
তুমি যদি মোরে না চুম ললনা—
এ সব চুম্বনে কি তবে ফল?'

তার পরে,

"রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বনদানে
পাণ্ডু করি দাও।"

আর, তুমি হে চপল! এই ফুলতরী কোথায় বাহিয়া লইতে চাও? যুবজন-চিত্তে যে বিচিত্র বেদনা জাগাইয়া তুলিয়াছ, তার কেমন পরিণতি হইবে? দেখো যেন মরুতটে লাগিয়া সাধের তরণী বিচূর্ণ না হয়! এই সুগভীর তৃষা মরীচিকার নিষ্ঠুর ছলনায় যেন বিড়ম্বিত না হয়! তুমি যদি সত্যই দেবসম্ভব হও, তবে এই প্রেমমুগ্ধ মিথুনকে অমৃতধামের নন্দনপুলিনে লইয়া যাও; নিরাপদে এ তরণী বাহিয়া মন্দাকিনীতে ভাসাও। দম্পতি প্রেমামৃত পান করিয়া কি অমর হয় নাই?

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত ফলানন্দ শর্ম্মার "তরমুজ্ ও খরবুজ্" একটি চলনসই গল্প। বিশেষত্বের মধ্যে রাঙ্গাদিদি আছেন, এবং তাঁহার হুলুধ্বনির আতিশয্য দেখিয়া স্বয়ং ফলানন্দ শর্ম্মা বলিয়াছেন,—"তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি।" কিন্তু প্রকৃতির অতিরিক্ত নহিলে কবি-কল্পনা যে পরিতৃপ্ত হয় না! শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "রামায়ণের দুইটি চিত্র" নামক সন্দর্ভটি অত্যন্ত উপাদেয় ও এবারকার 'ভারতীর' একমাত্র গৌরব। দীনেশ বাবু সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় মায়াতুলিকার সাহায্যে রামায়ণ-বর্ণিত অযোধ্যা ও লঙ্কার নিখুঁত ছবি আঁকিয়া পাঠককে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়াই নিরস্ত হন নাই, উভয় চিত্রের তুলনায় সমালোচন ও বিশ্লেষণ করিয়া সৌন্দর্য্যদৃষ্টি ও ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন। দীনেশ বাবুর মতে, "কবি অযোধ্যার চিত্রগুলিতে নিবৃত্তির আদর্শ আঁকিয়াছেন। * * * কিন্তু লঙ্কার চিত্রটি ইহার বিপরীত।" এই সুকল্পিত ক্ষুদ্র পটের তাহাই প্রতিপাদ্য, এবং লেখক তাহা উদাহরণ দিয়া সুচারুরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এমন মনোজ্ঞ রচনায় 'হনুমানোক্ত' প্রভৃতি ভাষার ক্লেদ দেখিয়া কষ্ট হয়,— যদিও 'একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেম্বিবাঙ্কঃ।' "কাটজুড়ী তীরে" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের উৎকল-চিত্র। উড়িষ্যার সামাজিক ব্যবস্থা, উৎকল প্রজার অবস্থা, দুর্ভিক্ষের কারণ প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া চিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছেন, অথচ অভীষ্ট বিষয়ে সফল হইতে পারেন নাই। উড়িষ্যার 'ইকনমিক' অবস্থা প্রভৃতি বিবিধ সমস্যার সমাধান এ ভাবে নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে লেখক 'দুই নৌকায় পা দিয়া' ভাল করেন নাই। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর "অজহর"

একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। 'অজ্‌হর' আফ্রিকার একটি বিদ্যামন্দির। লেখক বলিতেছেন,—"পৃথিবীর মধ্যে অজহর যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম বিদ্যামন্দির তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রথমে সাহসী হই নাই, কিন্তু অনুসন্ধানে ও তুলনায় জানিতে পারিলাম, 'আফ্রিকার অদ্ভুত অজ্‌হর জগতের কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির তাহা নহে, ইহার সমকক্ষ বা সমতুল্য হইতে পারে, এমন বিদ্যামন্দির জগতে আর নাই। অপূর্ব্ব অজ্‌হর জগতে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।'—Lane's Modern Egyptians." প্রবন্ধের বিষয় যেমন মনোরম, ভাষা তেমন নয়। আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা এই প্রার্থনীয় মণিকাঞ্চনযোগ দেখিতে পাইব। "ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি" শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের রচনা। সংবাদপত্রে সাময়িক প্রসঙ্গের চর্ব্বিতচর্ব্বণ বরং চলে, এবং সময়বিশেষে তাহা অপরিহার্য্যও বটে, কিন্তু মাসিকপত্রে সাময়িক প্রসঙ্গের অবতারণা দেখিলে লোকে অন্ততঃ যৎকিঞ্চিৎ বিশেষত্বের আশা করিয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য রচনায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের স্বাক্ষর ভিন্ন আর কোনও বিশেষত্ব নাই। "ন্যায়াধীশের উন্মত্ততা" অত্যন্ত পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। "নষ্টনীড়" চলিতেছে,—একে ক্রমশঃপ্রকাশ্য উপন্যাস, তাহাতে মাত্রা সূচিকাভরণের ন্যায়। "ভাষাতত্ত্ব" একটি সমালোচনা। অত্যন্ত গুরুগম্ভীর গবেষণা—আমাদের দন্তস্ফুট করিবার সাধ্য নাই।

প্রবাসী। শ্রাবণ। "বিবিধ প্রসঙ্গে" বিচিত্র উল্কী ও কেশসজ্জার বিবরণ প্রভৃতি বিবিধ তথ্য বিদ্যমান। "ভারতবর্ষের শিল্প"ই এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। লেখক প্রাচীন ও আধুনিক অনেক ভারতীয় শিল্পের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে উদীয়মান যশস্বী ভাস্কর ম্হাত্রের পরিচয় আছে। ম্হাত্রে-গঠিত সরস্বতী-মূর্ত্তির চিত্রখানি তত সুস্পষ্ট হয় নাই। এক জন চিত্রকর লিখিয়াছেন, ম্হাত্রের সরস্বতীর মুখে স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুখের অনেকটা আদল পাওয়া যায়। দৃষ্টিবিভ্রম, না সত্যই সাদৃশ্য আছে? প্রতিভাশালী ম্হাত্রের শিল্পসাধনা সফল হউক, তিনি কলালক্ষ্মীর প্রসাদ-বর লাভ করিয়া ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করুন। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের "জলাতঙ্ক" নামক বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভটি জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। এরূপ প্রবন্ধের অনুশীলনে লাভ আছে। প্রবন্ধের শেষাংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; আর একটু বিশদ ও বিস্তৃত হইলে ভাল হইত। ভাষার ত্রুটিতেও এই উপাদেয় প্রবন্ধটির সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। বিজ্ঞানবিৎ মহলানবিশ মহাশয়ের নিকট আমরা অনেক আশা করি;—আশা করি, তিনি ভাষার সৌষ্ঠববিধানে উদাসীন হইবেন না। এবারকার প্রবাসীতে আর কোনও উল্লেখযোগ্য রচনা দেখিলাম না। চারি মাসেই এত দৈন্য?

প্রদীপ। শ্রাবণ। প্রথমেই শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোমের "কল্পনার স্মৃতি" ইতিশীর্ষক একটি সনেট। সেই মামুলি সুরের চিরপুরাতন বিরহ-গান শুনিতে শুনিতে কান ঝালপালা হইয়া গেল। কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"শুধু কি প্রবাসে বসি একেলা আঁধারে,
অশ্রুগুলি গণি' যাবে জীবনের বেলা?"

কিন্তু কবির 'এ বৃথা সংশয় কেন?' তাঁহার হাতে পাঁজী, তিনি আজ 'মঙ্গলবার' কি না জিজ্ঞাসা করিতেছেন? এখনকার কবিরা ত সঙ্গে সঙ্গেই অশ্রু গুণিতে আরম্ভ করেন! কেবল অশ্রুমুক্তা গণিয়া যদি 'জীবনের বেলা' কাটিত, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যে এত অনুনাসিক কান্না শ্রুতিগোচর হইত কি? তার পর শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দের "যমুনা"। যখন

যমুনা, তখন সুতরাং কবিতা। "যমুনা"য় অবশ্য তমাল, বনমালী, মুরলী ও নীলজলধারার অভাব নাই। যমুনার প্রায় সমস্ত সৌন্দর্য্য একত্র পুঞ্জীকৃত করিয়াও কবির তৃপ্তি হয় নাই। দিব্যচক্ষে

"নগনা গোপিনীগণ ঐ তব ঘাটে
বিয়াকুল বিলুণ্ঠিত বসনের তরে"

নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাও লিপিবদ্ধ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। হায় যমুনা! উপসংহারে কবি বলিতেছেন,—"যমুনে লো, সবই আছে আগের মতন,* * * কেবল গোপাল নাই যশোদার ঘরে।"—গোপালের অভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই; তাহা ধ্রুব সত্য। কবিতাটিও 'যশোদার ঘরে'র মত ;—'সবই আছে আগের মতন', এমন কি, 'মুরলী,-মন্দ্রন' পর্য্যন্ত মজুদ, 'কেবল কবিত্ব নাই কবিটির ঘরে'। সুতরাং 'যশোদার ঘর' ও এই কবিতা, উভয়ের অবস্থাই সমান শোচনীয়। "সংগ্রাম সাহ" শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়ের রচিত একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। লেখকের শেষ সিদ্ধান্ত এই,—"এখন নিঃসংশয়ের সহিত বলা যাইতে পারে, ভূষণারাজ, সাহাবাদপুরের কেল্লার সংস্থাপক ও রাঠোর-বিজয়ী সংগ্রাম একই ব্যক্তি। * * * যখন সংগ্রাম আপনাকে বাঙ্গালী বৈদ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এবং বঙ্গীয় সমাজের সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন তাঁহাকে আমাদের বাঙ্গালী বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা কর্ত্তব্য।" ঐতিহাসিকগণ কি বলেন, জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসের "কার্য্যমূলক শিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি"র প্রতিপাদ্য কি, বুঝিতে পারিলাম না। ভাষা যেমন বিলাতী, তেমনই অস্পষ্ট। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী "রসকদম্ব" প্রবন্ধে কবিবল্লভ নামক অজ্ঞাত কবির রচিত 'রসকদম্ব' নামক অভিনব কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। লেখকের মতে, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে 'রসকদম্ব' একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মুদ্রাঙ্কণ বাঞ্ছনীয়। "অভিধান-আলোচনা" প্রবন্ধে অমরকোষ-ধৃত কতিপয় শব্দের অর্থ লিপিবদ্ধ দেখিতেছি। লেখক প্রবন্ধরচনার যে অনন্ত উপাদান আবিষ্কৃত করিয়াছেন, লক্ষ প্রবন্ধেও তাহা নিঃশেষিত হইবার নহে। অমর, মেদিনী প্রভৃতি বিবিধ কোষ, প্রকৃতিবাদ, বাচস্পত্য, শব্দকল্পদ্রুম, ওয়েবষ্টার প্রভৃতি নানাবিধ অভিধান হইতে শব্দ ও অর্থ চয়ন করিয়া প্রবন্ধে পরিণত করিতে পারিলে কোনও কালে মাসিকপত্রের প্রবন্ধের অভাব হইবে না। লেখক এই নূতন প্রবন্ধখনির আবিষ্কার করিয়া সম্পাদকসম্প্রদায়ের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "হিমাচল-বক্ষে" ভ্রমণকাহিনীর আকর্ষণ নাই। খরবাহিনী নগনদীর দ্রুতস্রোতে ক্ষুদ্র উপল যেমন ভাসিয়া যায়, 'সেণ্টিমেণ্ট্যালিটী'র প্রবল প্রবাহে ভ্রমণবৃত্তান্তের অতি সঙ্ক্ষিপ্ত উপাদানটুকু তেমনই কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। সহৃদয় লেখকের যে ভাবুকতা ও সুচিন্তা রত্নকণার ন্যায় "হিমালয়ে"র সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিল, ক্রমাগত তাহারই পুনরাবৃত্তি 'রাংতা'র ন্যায় 'খেলো' হইয়া পড়িতেছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি ফেনাইবার গুণে অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাবুকতা রবার নয় যে, টানিলেই বাড়িতে থাকিবে। জলধর বাবুর চিত্রখানি সুন্দর। একবার তাঁহাকে দুগ্ধপানে রত দেখিয়াছিলাম, এবার তিনি দণ্ডপাণি কম্বলচ্ছদ পরিব্রাজকের ভূমিকায় দণ্ডায়মান। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'অমিতাভে'র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, "অমিতাভ আদ্যোপান্ত অতি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।" 'শান্তরস' কি 'Sublimity'র প্রতিশব্দ? "বারাণসী," "রণরঙ্গিণী" প্রভৃতির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সঙ্কলিত "প্রতিহিংসা" গল্পটির আখ্যানবস্তু যেমন ঘোরালো, তেমনই রক্তাক্ত।



শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। যুবরাজের উজীর।

বোথরার নির্ব্বাসিত যুবরাজ।

পশ্চাতে যুবরাজের শরীর-রক্ষক।

KUNTALINE PRESS.

হিমারণ্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

অদ্য আমার শরীর তত ভাল নহে; তবে মনের উৎসাহে অনুরাগে চলিতে আরম্ভ করিলাম। দঙ্কু হইতে দারচিন বার মাইলের কম হইবে না। অদ্য দারচিন না গেলে আশ্রয়স্থান পাইব না। রাস্তায় জল নাই, কাঠ নাই, আশ্রয় নাই। সম্মুখে একটি মাঠ; এই মাঠ পার হইলেই একটি নদী; নদীর পর দারচিন। সুতরাং এই মাঠটি কত সুবিস্তৃত, অনুমানে বুঝিয়া লইতে হইবে। অদ্য বড়ই শীত; চলিতে চলিতে হস্ত পদ অসাড় হইয়া যাইতেছে, হাতের যষ্টি খসিয়া পড়িতেছে, শরীরকে যন্ত্রের ন্যায় চালাইতেছি। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের উদয় হইল, অন্ধকার ঘুচিল, উত্তর দিকে কৈলাস পর্ব্বত প্রকাশিত হইল। প্রথমতঃ কৈলাসের দৃশ্য অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। চতুর্দ্দিকে বরফময় প্রাচীরে বেষ্টিত, মধ্যে অভ্রভেদী বরফময় উচ্চ শিখর; শিখরদেশ রবির ছায়াপাতে স্বর্ণশৃঙ্গ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ উচ্চ শৃঙ্গের চারি দিকে বরফময় সহস্র সহস্র শৃঙ্গ উচ্চ শৃঙ্গকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বরফময় পর্ব্বতের ছায়া নিম্নে পড়াতে সেই স্থান কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কৃষ্ণবর্ণের উপর শুভ্র, শুভ্রের উপর স্বর্ণবর্ণ; কি আশ্চর্য্য শোভা! ইহার নিম্নে অসমতল বন্ধুর পর্ব্বত। এই বন্ধুর পর্ব্বতগুলি দেখিলে বোধ হয়, ভগবান শঙ্কর যাত্রী-দিগের কৈলাসপুরীদর্শন সুগম করিয়া দিবার জন্য সোপানাবলী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। আমি যে প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতেছি, তাহার উত্তর দিকে কৈলাস। আমরা পূর্ব্ব দিকে যাইতেছি। পথপ্রদর্শককে বলিলাম, "চল, আমরা উত্তর দিকে যাই, কৈলাস দেখিতে দেখিতে যাইব।" পথপ্রদর্শক বলিল, "আমাদিগকে উত্তর দিকেই যাইতে হইবে, কিন্তু আপাততঃ পূর্ব্ব দিকে না গেলে পথ পাইব না।" সুতরাং তাহার কথা অনুসারে পূর্ব্ব দিকেই চলিতে লাগিলাম। আজ আমার শরীরে অভূতপূর্ব্ব বল আসিয়াছে। কৈলাস পর্ব্বত দেখিয়া আমার মনে এত উৎসাহ হইয়াছে যে, আমি তীরবেগে অগ্রে অগ্রে চলিলাম, সঙ্গীরা আমার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। ক্রমে বেলা অধিক

হইতে আরম্ভ হইল। অদ্য আমার পিপাসাও নাই, ক্ষুধাও নাই; শারীরিক ক্লান্তিও নাই; বৃদ্ধ হইয়াও যুবক হইলাম। অদম্য উৎসাহের মধ্যে ডুবিয়া নিজের বার্দ্ধক্য ভুলিয়া গেলাম; মুখ হইতে 'হর হর বম্ বম্' শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। 'জয় কৈলাসপতি!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম।

এইরূপ চলিতে চলিতে একটি পার্ব্বতীয় নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গীরা অনেক দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রায় এক ঘণ্টার পর তাহারা আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গীরা বলিল, "আর চলিতে পারি না, অত্যন্ত ক্ষুধা ও প্রবল পিপাসায় একান্ত শক্তিবিহীন হইয়া পড়িয়াছি, কিছু না খাইলে আর চলে না।" আমি বলিলাম, "জল কোথায়?" তাহারা বলিল, "এই নদীতে জল আছে।" তাহাদের কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। আমি জানি, পার্ব্বতীয় নদীতে অনেক সময়েই জল থাকে না, নদীবক্ষ কেবল প্রস্তর ও কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়াই থাকে। তবে যদি কোনও দিন অতিরিক্ত-পরিমাণে বরফ পড়ে, তাহা হইলে ২।৪ ঘণ্টার জন্য নদী প্লাবিত হইয়া যায়; কিন্তু সে জল এত কর্দ্দমাক্ত ও ঠাণ্ডা যে, পান করা অসাধ্য। একে ত এই দেশের নদীর দশা এইরূপ, তাহাতে যদি বা কোন কোন নদীতে সামান্য জল থাকে, তাহাও বরফগলা জল; সুতরাং পথিকদিগকে ঝরণা ও উৎস খুঁজিয়া লইতে হয়। সঙ্গীরা একান্ত পিপাসাতুর হইয়াছিল, আমি আমার কমণ্ডলুর জল তাহাদিগকে দিলাম; তাহারা ঐ জল পাইয়া কিছু শান্ত হইল। অল্প বিশ্রামের পর আবার নদীর দিকে চলিতে লাগিলাম। নদীর মধ্যে গিয়া দেখি, তথায় এক বিন্দুও জল নাই। নদীর এই দৃশ্য দেখিয়া সকলের প্রাণ শুকাইয়া গেল, এবং তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "অদ্য জলাভাবে প্রাণ যাইবে; তবে দেখি 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ'!" এই বলিয়া তাহারা চলিতে লাগিল।

এই প্রান্তরে প্রায় প্রতিদিনই বরফ পড়িয়া থাকে, কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপে সেই বরফ গলিয়া যায়; সুতরাং পথিকদের জানা উচিত, এই প্রান্তরে শীত ঋতু ভিন্ন সমস্ত ঋতুতেই জলাভাব হইয়া থাকে। তবে যাঁহারা এই পথের অভিজ্ঞ, তাঁহারা কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা যেখানে জল আছে, সেই স্থানের অনুসন্ধান করিতে পারেন। প্রথম চিহ্ন বন্য অশ্ব ও বন্য চমরীর পদচিহ্ন; এই পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়া চলিলে তিন চারি মাইলের মধ্যে জল পাওয়া

যায়; কারণ, এই সব জন্তু জল ভিন্ন থাকিতে পারে না। তৎপরে কর্দ্দমাক্ত ভূমি। এই ভূমি খনন করিতে করিতে পানীয় জল পাইবার সম্ভাবনা। আর যে স্থানে কণ্টকগুল্ম আছে, সেখানেও জল পাওয়া যায়। নদী অতিক্রম করিয়া আমরা নদীর পূর্ব্ব তীরে উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণ দিকে সোঁ সোঁ শব্দ শুনিয়া আমার সঙ্গী পূর্ণানন্দ গিরি বলিল, "ও দিকে জল আছে।" এই বলিয়া সে কমণ্ডলু গ্রহণপূর্ব্বক সেই দিকে ছুটিল। আমার অপর সন্ন্যাসী সঙ্গী কমণ্ডলু লইয়া উত্তর দিকে ছুটিলেন। সকলেই জলান্বেষণে ব্যতিব্যস্ত। আমার এক জন ভৃত্য তথায় মোট রাখিয়া জলান্বেষণে চলিয়া গেল। সে কতকটা ভিজা মাটি দেখিয়া বলিল, "এখানে জল আছে, খনন করিলেই জল পাইব।" তাহার কথায় সকলে মিলিয়া মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। অল্প খনন করিবার পরই অতি পরিষ্কৃত জল দেখা দিল। সেই জল পান করিয়া সকলে পিপাসানিবারণ করিল, আর বলিতে লাগিল, "কৈলাসপতি আজ বাঁচাইলেন; আর কিছু ক্ষণ জল না পাইলে আজ প্রাণ যাইত।" প্রায় এক ঘণ্টার পর পূর্ণানন্দ ও অপর সাধুটি জল না পাইয়া নিরাশহৃদয়ে শুষ্ককণ্ঠে ফিরিয়া আসিলেন।

আমরা এই স্থানে কিছু ক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিলাম। সঙ্গীরা তৃণ, গুল্ম ও ঘুঁটে সংগ্রহ করিয়া আহারাদি প্রস্তুত করিতেছে, আর আমি একটি কাঁটার ঝোপের নিকট বসিয়া চারি দিকের দৃশ্য দেখিতেছি। উত্তরে তুষারাবৃত কৈলাস, পূর্ব্বও অসংখ্য হিমশিখরের উন্নত প্রাকারে বেষ্টিত, পশ্চিম হিমালয়ের শৃঙ্গমালায় আচ্ছাদিত, দক্ষিণ শ্বেতপর্ব্বতজালে অবরুদ্ধ; চারি দিকই যেন কর্পূরধবল শ্বেতপর্ব্বতের প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যে প্রান্তর। এই প্রান্তর আমাদের দেশের ন্যায় নিরাশাব্যঞ্জক নহে, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পর্ব্বতের বিচ্ছেদ আছে, অর্থাৎ একেবারে একটানা নহে। এই প্রান্তরের মধ্যে বর্ত্তুলাকার ছোটখাট অনেকগুলি পাহাড় আছে। পর্ব্বতগুলি নেড়া, গাছপালার নামগন্ধও নাই। বর্ষা ঋতু পাইয়া পর্ব্বতের উপর শ্যামল তৃণ জন্মিয়াছে। কোন কোন পর্ব্বতশিখর নীল, লোহিত, শ্বেত ও হরিদ্বর্ণের ঋতুপুষ্পে সমাবৃত; কোনটি সুবৃহৎ প্রস্তররাশির স্তূপ; কোনটি গৈরিক রঙ্গে অনুরঞ্জিত; একটি অপরটির সমান নহে, পরস্পর অসমানভাবে দণ্ডায়মান হইয়াই যেন হিমশৃঙ্গের উচ্চতা দর্শনপূর্ব্বক লজ্জায় অধোবদন হইয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিয়াছে।

আমার আর এই দৃশ্য উপভোগ করিবার সময় হইল না। ক্ষুধার জ্বালায় অর্দ্ধসিদ্ধ আহারীয় অমৃত বলিয়া ভোজন করিলাম। আহারান্তে চলিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে সঙ্গীদের মধ্যে এক জন বলিল, "এখন আর ধীরে ধীরে চলিলে হইবে না। এই মাঠের মধ্যে ডাকাতের ভয়; ইহারা দিনে ডাকাতি করে। যদি একবার আমাদিগকে দেখিতে পায়, তবে আর রক্ষা নাই; আমরা পর্ব্বতের আড়ালে আড়ালে যাইব। মাঠের লোক যাহাতে আমাদিগকে দেখিতে না পায়, এরূপ ভাবে চলিতে হইবে। দুই এক জন লোক দেখিলেই ডাকাতদের সাহস বেশী হয়, তাহারা হঠাৎ আসিয়া আক্রমণ করে। এখন আমরা অগ্রপশ্চাৎরূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিব। আমরা এখন ছয় জন; ইহা দেখিলে ডাকাতেরা হঠাৎ আক্রমণ করিতে সাহসী হইবে না। আর যে দিকে খুব বড় বড় পাথর আছে, সেই দিক দিয়া চলিব। ডাকাতে আক্রমণ করিলে খুব পাথর ছুঁড়িতে পারিব।" এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম।

অনুমান দুইটার পর আমরা একটি নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। এই নদীটি খুব বৃহৎ, কিন্তু জল কম। নদীটি কৈলাস হইতে বাহির হইয়াছে, এবং রাবণ হ্রদে পড়িয়াছে। এই স্থান হইতে কৈলাসের দৃশ্য আরও সুন্দর। এখন এমন স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই কৈলাস। সম্মুখে কৈলাসগঙ্গা। এই নদীকে ভুটিয়া ভাষাতে 'সবজা খাম্বা' বলে। সবজ অর্থাৎ ময়ূর,—খাম্বা, মুখ। এই নদী ময়ূরের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া কর্ণাপি নাম গ্রহণ করিয়াছে। পরে এই নদীই সরযূ ও ঘাগ্রা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই কর্ণাপি কৈলাসের দক্ষিণ দিক হইতে বিনির্গত। আমি কৈলাসগঙ্গাতে আসিয়া স্নান করিলাম, এবং পেট ভরিয়া জলপান করিলাম। আমার এই কার্য্য দেখিয়া বিষ্ণু সিং বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। সে বলিল, "এইরূপ কার্য্য করিয়া নিশ্চয় আপনি পীড়াগ্রস্ত হইবেন।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তাহাতে ক্ষতি কি? পীড়া হইলে মৃত্যু; কৈলাসে যদি মৃত্যু হয়, তাহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?" এই বলিয়া নদীর পর পারে উত্তীর্ণ হইলাম। এই স্থান হইতে দারচিন্ দেখা যায়। পর পারে উত্তীর্ণ হইয়াই সকলে বিশ্রাম করিলাম। বিশ্রামান্তে আবার চলিতে লাগিলাম। এমন সময় আকাশে মেঘ

কিছু ভীত হইয়া দ্রুতবেগে দারচিনের দিকে ছুটিতে লাগিলাম। সঙ্গে ছত্র ছিল, কিন্তু পবনবেগে ছত্র উড়িয়া গেল, বিন্দু বিন্দু বরফপাতে বস্ত্র সকল ভিজিয়া গেল। কি করিব, উপায় নাই। এখানে এমন একটি বৃক্ষ বা গুহা নাই যে, তথায় যাইয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করি। এইরূপ চলিতে চলিতে অপর একটি নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। দেখিতে দেখিতে নদীর জল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নদীর বেগও বর্দ্ধিত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় নদী উত্তীর্ণ হওয়া অসমসাহসের বিষয়। তবে হিমালয়ে অসমসাহস না করিলে জীবনরক্ষা হয় না ; সুতরাং সকলেই নদীর মধ্যে অবতরণ করিলাম, এবং নির্ব্বিঘ্নে নদী উত্তীর্ণ হইলাম। আমি বিষ্ণু সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হঠাৎ নদীর বেগ ও জল বর্দ্ধিত হইবার কারণ কি ?" সে বলিল, "আমরা কৈলাসের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি ; সমস্ত দিন কৈলাসে যত বরফ গলিয়াছে, এখন সেই বরফগলা জল এই নদী দিয়া বাহির হইতেছে।" এখন ক্রমে এই নদীর জল ও বেগ বর্দ্ধিত হইবে, আবার প্রাতঃকালে জল কমিতে আরম্ভ হইবে। ইহার জন্যই প্রাতঃকালে ও বৈকালে এ দেশের নদী কেহ পার হয় না। আমরা যেরূপ অসমসাহস করিয়া আজ নদী পার হইয়াছি, এইরূপ নদী পার হইতে যাইয়া অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে ও নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে। আমরা নদী পার হইয়া দেখি, বাতাসও নাই, মেঘও নাই, বরফপাতও নাই। আকাশ পরিষ্কার, বায়ুবেগ শান্ত, সূর্য্যের উত্তাপ উঠিয়াছে। এ যেন প্রকৃতি দেবীর খেলা ; এই আছে, এই নাই ; এত মেঘ, এত গর্জ্জন, এত বরফপাত, মুহূর্ত্তমধ্যে সব শান্ত ও আরামপ্রদ !

এখন আমরা ধীরে ধীরে চলিতেছি, আর এক মাইল গেলেই দারচিনে যাইতে পারিব। এ দিকে আমার সঙ্গীরা মাঠ হইতে কাঠ, কাঁটার গাছ ও ঘুঁটে সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দারচিনে যাইয়া অগ্নির প্রয়োজন হইবে, সুতরাং এ স্থানে ঘুঁটে ও কণ্টক-গুল্ম সংগ্রহ না করিলে উপায় নাই। অল্প ক্ষণের মধ্যেই কাষ্ঠসংগ্রহ করিতে করিতে দারচিনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দারচিন শোভার কোলে স্থাপিত। এ শোভা গ্রাম্য ও বন্য শোভার সমাবেশ। নগর আছে, অথচ নাগরিক ভাব বা বিলাসিতা নাই। এই স্থানটি নদীপরিবেষ্টিত ও কৈলাস পর্ব্বতের পদতলে স্থিত। অনবরত নদীর ঘোর ও গভীর গর্জ্জন অধিবাসীর কর্ণে প্রবেশ

ভাব বা বিলাস নাই। দোকান পাট আছে বলিলেও চলে, নাই বলিলেও চলে; কারণ, আটা, ছাতু, লুণ অনেকেই বিক্রয় করিয়া থাকে, তবে দোকান সাজাইয়া রাখিবার প্রথা এ দেশে নাই, সুবিধাও নাই; অতিরিক্ত শীত, বরফপাত ও ডাকাতের উৎপাতের জন্য দোকানদারেরা পণ্যবস্তু বাহিরে রাখে না। এ সহরের অধিকাংশ লোক তাম্বুতে বাস করে। তাম্বু চমরীর রোমে নির্ম্মিত, সুতরাং খুব গরম। তাম্বুর চতুর্দ্দিকই নানা রঙ্গে রঞ্জিত নিশান দ্বারা পরিশোভিত। ইহারা এমন নিশানপ্রিয় যে, পথ, ঘাট, নদীতীর, প্রস্তরস্তূপ, এই সকল স্থানে অসংখ্য নিশান নগরের গাম্ভীর্য্য ও অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। আজ দারচিনের মাঠে ৫০।৬০টি তাম্বু পড়িয়াছে। পাঁচ ছয় শত যাত্রী আসিয়াছেন, সকলেই কৈলাস পরিক্রম করিয়া বাণিজ্যার্থ প্রান্তসীমায় যাইবেন; কেহ জ্ঞানীমা মণ্ডি, কেহ ছক্রা মণ্ডী, কেহ বা তকলাখার মণ্ডিতে যাইয়া ভারতবর্ষীয় লোকের সঙ্গে বাণিজ্য করিবেন। এই সব মণ্ডির বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। অদ্য এখানে বড়ই ধূমধাম। ব্যবসায়ী যাত্রীরা আপন আপন ছাগ, মেষ, চমরী ও ঘোটক উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহারা অন্যান্য পশুপালের সঙ্গে মিলিত হইয়া পর্ব্বতপ্রান্তরে ও পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছে। চারি দিকে হৈ চৈ শব্দ হইতেছে; এই কিড়িং মিড়িং ভাষার বিন্দুবিসর্গও আমি বুঝিতেছি না। আমার বোধ হইতেছে, এই মনুষ্যকলরব নদীকল্লোলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এক অব্যক্ত ভাষার সৃষ্টি করিতেছে। সেই ভাষার অর্থ আমি এই বুঝি, এক শব্দ আর এক শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শব্দের উদয় হয়, ইহার নাম অপূর্ব্ব। এই দিকে তাম্বুর অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই শীতবস্ত্র ও খাদ্য বস্তু সঙ্গে করিয়া কৈলাসযাত্রা করিতেছে। তাহারা পিপীলিকাদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দুরারোহ পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছে, আর আমি হাঁ করিয়া তাহাদিগকে দেখিতেছি। অন্য দিকে আজ পশুদের মহোৎসব; তাহারা অনেক দিনের পর স্বাধীনতা পাইয়াছে, সঙ্গী পাইয়াছে, শষ্পাচ্ছাদিত চারণভূমি পাইয়াছে, তাহাদের আনন্দ দেখে কে? ভারবাহী ভার পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা পাইয়া স্বর্গীয় সুখ অনুভব করে, ইহা মনুষ্যের পক্ষেও যেমন, পশুর পক্ষেও সেইরূপ। এতদ্দেশীয় চমরী, মেষ, ছাগ, ঘোটক প্রভৃতি গৃহপালিত পশুমাত্রই শ্বেতবর্ণ; ইহারা এত শুভ্র যে, কর্পূরবৎ গৌরবর্ণ বলিলেও চলে। যখন এই সব

পশুগণ স্বাধীনভাবে প্রান্তরে বা পর্ব্বতাদিতে বিচরণ করে, তখন দূর হইতে অনুমান হয় যে, শ্বেতবর্ণ পুষ্প সকল পর্ব্বতপ্রান্তরের শ্যামলাঙ্গে ধীরে ধীরে বিচরণ করিয়া প্রকৃতির শোভামধ্যে শোভার অনুসন্ধান করিতেছে। বাস্তবিক দারচিনের এই দৃশ্যটি আমার অতি মনোহর বলিয়া বোধ হইল। আমাদের হিসাবে আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষা ঋতু; হিম প্রদেশে এই ঋতুই বসন্ত। ছোট ছোট পর্ব্বত ও প্রান্তরে বরফ নাই; সময় পাইয়া নানা বর্ণের তৃণ যেন আস্পর্দ্ধার সহিত পর্ব্বতাঙ্গে ও প্রান্তরের হৃদয়ে, আপন আসন বিস্তার করিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছে। নদীর তীরভূমিতে নানা বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। এই পুষ্পে গন্ধ নাই; কিন্তু তৃণে গন্ধ আছে। প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি যেন সুগন্ধ হারাইয়া গন্ধচোর সুগন্ধ তৃণরাজিকে দলন করিবার জন্য তাহাদের স্কন্ধে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এখানে নানা রঙ্গে চিত্রিত পক্ষীর অভাব নাই, কিন্তু বেচারাদের বড়ই দুর্দ্দশা! বৃক্ষ নাই, বসিবে কোথায়? পক্ষিগণ কখনও বা প্রস্তরখণ্ডে, কখনও বা নদীতীরে, কখন ও বা প্রান্তরে বসিয়া পুলকিতস্বরে আশ্রয়-বৃক্ষের বিরহগীত গাহিতেছে, আর অভিমানভরে বলিতেছে যে, "হে কৈলাস! শীত আসুক,—আমরা আর এখানে থাকিব না, তোমার হিম লইয়া তুমিই থাক!"

দারচিন একটি ছোট খাট সহর। এখানে কৈলাসের প্রধান লামার রাজধানী ও বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগের একটি বৃহৎ আড্ডা। কতকগুলি ঘরও আছে। কিন্তু অধিকাংশ গৃহই ছাদহীন। দরজা জানালা সবই আছে, কেবল ছাদ নাই। এ কৈলাস পর্ব্বতের নিম্নস্থান। এখানে প্রচুর-পরিমাণে বরফ পড়িয়া থাকে। আশ্বিন মাসের পর এখানে জন প্রাণীর বাস করিবার সাধ্য নাই। এই অবস্থায় যদি ঘরের ছাদ থাকে, তবে বরফ পড়িয়া ছাদ ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার জন্য দারচিনে খুব সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ঘরে ছাদ দিতে পারে না। কারণ, যখন বরফ পড়ে, তখন ১০।১২ জন লোক ছাদের উপর রাখিয়া বরফ পরিষ্কার করাইতে হয়; নতুবা বরফের ভারে ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে। আর একটি কথা, এই প্রদেশে কড়ি বরগার উপযুক্ত কাষ্ঠ নাই। ১৫।১৬ দিনের রাস্তা হইতে কাষ্ঠ আনাইতে হয়। সুতরাং ধনী ভিন্ন কেহই এ দেশে ছাদ উঠাইতে পারে না। ছাদহীন গৃহগুলি মৃত্তিকা ও প্রস্তরে প্রস্তুত। আমাদের দেশের কাঁচা গাঁথুনি যেরূপ মাটী ও ইষ্টক দ্বারা হয়, এ দেশের অধিকাংশ ঘর সেইরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে

এ দেশের মাটি এত শক্ত যে, আমাদের দেশের পাকা গাঁথুনি এ কাঁচা মাটির গাঁথুনির কাছে হার মানে। এই সহরের কোনও শৃঙ্খলা নাই। ঘরগুলি ছিন্নভিন্নভাবে প্রস্তুত। বাণিজ্যব্যবসায়ীরা আসিয়া ছাদহীন গৃহের উপর তাম্বু খাটাইয়া তন্মধ্যে বাস করে। ২।৩টি গৃহে ছাদ আছে; তাহার মধ্যে প্রধান লামার গৃহই উৎকৃষ্ট। আমি দারচিনে প্রবেশ করিয়া দেখি, ভোট, তিব্বত ও লাদাক হইতে অনেক ব্যবসায়ী এখানে আসিয়াছে। ভুটিয়ারা তাহাদের অভ্যাসানুসারে আমাকে ছদ্মবেশী ইংরাজ বলিয়া ঠিক করিল। আমি নিরুপায়। ইহাদের হাতে পড়িলে জীবনরক্ষা কঠিন। সুতরাং প্রধান লামা বা রাজার শরণাপন্ন না হইলে অন্য উপায় নাই। ভুটিয়ারা বড়ই মূর্খ, বুঝাইলেও বুঝিবে না; আর আমি ভুটিয়া ভাষা জানি না, এক বিষ্ণু সিংহের উপর নির্ভর। সে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে, তাহারও ঠিক নাই। কাজে কাজেই আমি বিষ্ণু সিংহকে সঙ্গে লইয়া রাজদর্শনে চলিলাম। আমার জিনিষপত্র ও সঙ্গীয় লোক এখানেই পড়িয়া রহিল। রাজভবন অধিক দূরবর্ত্তী নহে। আমরা কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই রাজভবনে প্রবেশ করিলাম। এখানকার প্রধান লামাকে রাজা বলে। রাজভবনটি বড়ই অপরিচ্ছন্ন। বাহিরে ভেড়া, গরু, চমরী ও ঘোড়ার আড্ডা। বড়ই দুর্গন্ধ। অতি কষ্টে দৌবারিকের নিকট আসিলাম। সেখানে এক জন লামা প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহা জানা আবশ্যক, তিব্বতের মঠে দৌবারিক, প্রহরী, ভৃত্য, পাচক, পশুপালক, সকলেই লামা বা ডাবা। আমাকে দেখিয়া সেই দৌবারিক লামা প্রধান লামা বা রাজার আদেশ অনুসারে আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। রাজা তখন ছাদের উপর বেড়াইতেছিলেন; আমাকে দেখিয়া তিনি আমার নিকট আসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" আমি উত্তর করিলাম, "আমি কাশী-লামা; তীর্থভ্রমণ করিতে আসিয়াছি; এখন আপনার অতিথি।" এই বলিয়া লামাকে একখণ্ড মিছরী উপহার দিলাম। লামা উপহার গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আমার উপরে ত স্থান নাই, আপনি নিম্নতলে যাইয়া আসন গ্রহণ করুন। আপনাদের সমস্ত বন্দোবস্ত মঠ হইতে হইবে।" আমি তাঁহার কথানুসারে পূর্ব্বোক্ত লামার সহিত নিম্নতলে গেলাম। নিম্নতলে কতকগুলি সীমান্তবাসী জোহারী ছিল। লামা তাহাদিগকে এ দিকে ও দিকে সরাইয়া আমার স্থান করিয়া দিলেন।

"চা" আসিল। আমি "চা" পান করিয়া শীতের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলাম। এ দিকে আমার সঙ্গীরা জিনিসপত্র সহ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার আহারেরও উদ্যোগ হইতে লাগিল। আমরা এখন রাজনিকেতনে আছি। প্রতি ঘণ্টায় রাজ-অনুচরেরা আমার সংবাদ লইতেছেন। যদিও এ রাজগৃহটি সামান্য, তথাপি এই কৈলাসধামে এইরূপ গৃহ অতি মূল্যবান ও দর্শনযোগ্য। বাটীর চতুর্দ্দিক বিস্তৃত প্রাচীরে বেষ্টিত, একটিমাত্র প্রবেশদ্বার, তাহাও এমন আঁকা-বাঁকা যে, আগন্তুক লোক সহজে প্রবেশ করিতে ভীত হন। রাজবাটী দেখিলে বোধ হয়, একটি ছোটখাট দুর্গ। উপরে লামার বৈঠকখানা, শয়নগৃহ, তোষাখানা ও ভাণ্ডার। আর রন্ধনশালা নিম্নতলে। নিম্নতলে ৪।৫ টি গৃহ আছে। তাহার একটি গৃহে আমি ও আর কতকগুলি বোহারী ব্যবসায়ী আছি, তাহাদের জিনিসপত্র আছে। এ ভিন্ন এ বাটীর আর কিছু বিশেষত্ব নাই; তবে প্রাচীরের মধ্যে খুব বেশী স্থান আছে, সেখানে পালিত পশুদিগকে রাখা হয়। আর বড় বড় ২০।২৫ টা কুকুর আছে। এই কুকুরগুলি এত ভীষণ যে, দেখিলেই প্রাণপুরুষ শুকাইয়া যায়। কুকুরগুলি দিনে বাঁধা থাকে, রাত্রিতে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়; পুলিশ বল, পাহারা বল, কুকুরই সব। রাত্রিতে কাহার সাধ্য ঘর হইতে বাহির হয়? বাহির হইলেই এই সকল দুর্দ্দান্ত কুকুর খণ্ডখণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। সুতরাং বলি, এই সহরে কুকুরই পাহারা, কুকুরই প্রহরী, কুকুরই পুলিশ। অন্য পুলিশ দারচিনে নাই। দারচিনের লামাকে এই দেশের লোকেরা রাজা বলে। কারণ, তাঁহার অধীন ২।১ টি জমীদার আছে। তাহাদের তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা। প্রজাদের বিচারের ভারও এই লামার হস্তে। একে ত ইনি প্রধান লামা, তাহাতে আবার ইনি কৈলাসের সমস্ত মঠের প্রধান। দেদিফু, নেন্দিফু প্রভৃতি কৈলাসের মঠের লামারা ইঁহার অধীন। ইনি এক জন প্রধান বাণিজ্যব্যবসায়ী, সুতরাং ইঁহার সম্মান রাজাদের অপেক্ষাও অধিক।

শ্রীরামানন্দ ভারতী।

অজ-কাহিনী।

রঘুবংশের গৌরব দিলীপের তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত, এবং রঘুর বীরত্ব ও বৈধ শাসনে প্রসারিত হইয়াছিল। এই জন্য দিলীপ-চরিত্রে ব্রতনিষ্ঠা ও রঘু-চরিত্রে শৌর্য্য ও বৈধকর্ম্মানুষ্ঠান প্রদর্শিত হইয়াছে। সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুশাসিত বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বররূপে অজের অভ্যুদয়। অজ লব্ধরাজ্যের রক্ষাবিধানে যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। এই কার্য্যের উপযোগিতায় তিনি প্রিয়দর্শনের পুত্র প্রিয়ংবদের নিকট সম্মোহন অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।

এক একটি চরিত্রে এক একটি বিশেষভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। অজ-চরিত্রে দাম্পত্য প্রণয়ের পবিত্রতা বিশেষভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। রঘুবংশীয়দিগের অন্য কাহারও চরিত্রে এ ভাব পরিস্ফুট ছিল না, তাহা নহে; অথবা অজ-চরিত্রে শৌর্য্যাদিগুণ প্রবল ছিল না, তাহাও নহে। তবে যে গুণটি যাঁহাতে বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, তাঁহার সেই গুণ মুখ্যতঃ চিত্রিত হইয়াছে।

অজ-কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া, কবি প্রথমতঃ ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের কথা বিবৃত করিয়াছেন। বর্ণনা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কালিদাসের সময়ে স্বয়ংবর-প্রথা প্রচলিত ছিল না; পূর্ব্বকালে যাহা প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা ছিল, তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাগে, দূর দূর প্রদেশে, রাজগণ রাজত্ব করিতেন। বিভিন্ন রাজ্যে গতায়াতও তত সুকর ছিল না। এক দিকে রাজপুত্র ভিন্ন রাজকুমারীদিগের বিবাহ হইতে পারে না; অন্য দিকে কোন রাজপুত্র বিবাহে স্বীকৃত হইবেন, তাহাও জানিতে পারা যাইত না। কোন এক রাজকুমারকে লক্ষ্য করিয়া কোন রাজকুমারীর বিবাহপ্রস্তাব করিলে, যদি সেই প্রস্তাব গৃহীত বা স্বীকৃত না হইত, তাহা হইলে প্রস্তাবকারী রাজবংশের অপমান হইত। এই জন্য রাজাদিগের সকলের সুবিধার জন্য, স্বয়ংবর-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। কোথাও কোন বিশেষ যোগ্যতাপ্রদর্শন করিতে পারিলে, কেহ কেহ কুমারীর পাণিগ্রহণের উপযোগী বিবেচিত হইতেন। কিন্তু সাধারণতঃ এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, রাজকুমারী যাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিবেন,

ছিল না। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা পূর্ব্বাহ্ণেই স্থির করিতে পারিতেন যে, কোন্ কোন্ রাজকুমার বিবাহের অভিলাষী। কন্যা কাহাকে বরমাল্য প্রদান করিবেন, তাহাও সভা সমাগত হইবার পূর্ব্বেই প্রায় স্থির থাকিত। যাঁহারা একালে নির্ব্বাচনপ্রথার পক্ষপাতী, তাঁহারা আপাতদৃষ্টিতে যাহা নির্ব্বাচন-প্রণালীর মত, তৎসম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। নির্ব্বাচনপ্রণালী ভাল, কি কর্ত্তৃপক্ষীয়ের মনোনয়ন ভাল, এ তর্কের উত্থাপন করিব না। সকল লোকেরই উদ্দেশ্য সুখলাভ; সকলেরই ইচ্ছা, পুত্র কন্যা সুখী হয়। এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই মনোনয়ন হউক বা নির্ব্বাচন হউক, কোন একটা উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু কেহ যখন একটা বিশেষ মত খাড়া করিয়া দল বাঁধিয়া বসে, তখন উদ্দেশ্য ভুলিয়া, উপায়টির সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রচারিত করে। ইহাতে অপরপক্ষীয় মতের গুণ দেখিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। এ কথা কি কেহ বলিতে পারেন যে, যে দেশে নির্ব্বাচনপ্রথা নাই, সে দেশে দাম্পত্য প্রেম নাই? অথবা ইহাই কি কেহ বলিতে পারেন যে, যেখানে নির্ব্বাচনপ্রথা, সেখানেই যৌবনের প্রথম মত্ততার অবসানে কেবল স্ত্রীপরিত্যাগের মকদ্দমা লাগিয়া রহিয়াছে?

বিবাহেই বল, অথবা অন্য কোনও বিষয়েই বল, স্থায়ী সুখলাভের উপায় আত্মসংযম ও চরিত্রনিষ্ঠা। যাহার প্রকৃতি মন্দ, সে এ পৃথিবীতে কোথাও মনের মানুষ পায় না; অথবা প্রকৃত বন্ধুলাভ করিয়া সুখী হইতে পারে না। যে ব্যক্তি স্বার্থপর, চঞ্চল, বা অন্য রকমে দুর্জ্জন, সে যতই সাগর ছেঁচিয়া মাণিক তুলুক না কেন, সে মাণিক তাহার দু' দিনের অলঙ্কার। দুষ্টে দুষ্টে মিলন, একটা বৃহৎ কলহের প্রথম অধ্যায়মাত্র। যাহারা 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই', তাহারা ভাগ বখরার সময় কাটাকাটি করিয়া মরে। চরিত্র সংশোধিত না থাকিলে ভালবাসার বিকাশ হয় না; এই জন্য স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যাহা প্রকৃত প্রেম, এ সংসারে তাহা বড় দুর্ল্লভ। নির্ব্বাচনই বল, আর মনোনয়নই বল, লক্ষ লোকের মধ্যে এক একটি উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে, যেখানে দৈবাৎ বা বিধাতার কৃপায়, প্রাণে প্রাণে এমন মিলন সংঘটিত হয় যে, মনে হয় যেন এক জনের জন্য অপর জন সৃষ্ট হইয়াছিল। মনে হয়, যেন ইহাদিগের পরস্পর মিলন না হইলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য নষ্ট হইত। পবিত্রচরিত্র অজের অদৃষ্টে বিধাতা এই মিলন লিখিয়াছিলেন, তাই সকল

পরস্পরেণ স্পৃহনীয়শোভম্ নচেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ ॥

অজ রাজার রাজত্বের সময়ে না হউক, কিন্তু কালিদাসের অভ্যুদয়ের সময়ে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যে সকল আর্য্য রাজার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, স্বয়ংবর-সভার বর্ণনায় তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমগ্র ভারতবর্ষে তখন একছত্র রাজত্ব না থাকিলেও, সমগ্র দেশে কি প্রকার প্রাচীন আর্য্যসভ্যতা ও আর্য্যগৌরব প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা এই বর্ণনায় হৃদয়ঙ্গম হয়। প্রাচীন সৌভাগ্য চিরবিলুপ্ত ;—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সৌভাগ্যের সাক্ষিস্বরূপ প্রাচীন রাজধানীগুলিও বিনষ্ট হইয়াছে। কমলাকান্তের ভাষায়, আমাদের বঁধুও গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে। পুষ্পপুর গঙ্গার অতলগর্ভে নিহিত ; এবং অঙ্গ-রাজপুরী ভাগলপুর প্রদেশের মৃত্তিকারাশির মধ্যে বিলীন ! জলবেণীরম্যা নর্ম্মদা এখনও মণ্ডলার উভয় পার্শ্বে প্রবাহিতা ; কিন্তু সেই গুল্ম-পরিপ্লুত দেশে মাহিষ্মতী নগরীর চিহ্নমাত্র নাই ! এ কালের মথুরায় সেই প্রাচীন শৌরসেনী সভ্যতা কই ? এই স্থানে এক দিন যে আদর্শ প্রাকৃত ভাষার বিকাশ হইয়াছিল, একালের ভাষাগুলি প্রায়শঃ তাহারই ছায়া। কিন্তু আজি দেশময় কেবল ছায়াটুকু পড়িয়া রহিয়াছে ; সেই গৌরবসূর্য্য চির-অস্তমিত। (১) মৃত পতির সৌন্দর্য্য ও গুণবর্ণনা শুনিলে বিধবার শোকবেগ যেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ষষ্ঠ সর্গের বর্ণনা পড়িলে যে আমাদের সেইরূপ হইবে, এ কথা কালিদাসের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। অজ যেমন এই স্বয়ংবরলব্ধ রত্ন হারাইয়াও, তাহার পবিত্র স্মৃতি জাগরূক রাখিয়া, কর্ত্তব্যপালন করিয়া দেহপাত করিয়াছিলেন ;—আমরাও যদি সেইরূপ ঐ লুপ্তগৌরবের স্মৃতিটুকু পুষিয়া, নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যে দৃঢ়ব্রত হইতে পারি, তাহা হইলেই কৃতার্থতালাভ করিতে পারিব। বিধাতার নির্ব্বন্ধে পত্নীবৎসল অজ নবযৌবনে পত্নীহারা হইলেন। প্রিয়জনবিয়োগে সকলেই শোক-সন্তপ্ত হয় ; সকলেই বিলাপ করে ;—কিন্তু অজের শোক ও অজবিলাপ সে শ্রেণীর নহে। যাঁহারা পত্নীর শ্রাদ্ধ অতিবাহিত হইতে না হইতেই

(১) সাহিত্যদর্পণে নাটকব্যবহৃত যে সকল বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে শৌরসেনী ভাষারই অধিক গৌরব দেখা যায় ;—

"পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাম্।
শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাম্ ॥"

নূতন বিবাহের সম্বন্ধ করেন, তাঁহারাও শোকপ্রকাশ করিয়া বিলাপ করিয়া থাকেন। নিত্য নিত্য ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইলেও, এ দেশের সাহিত্যে ইহার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত পাইলাম না বলিয়া, অগত্যা বিদেশীয় কবি ব্রাউনিংএর "My last Duchess" কবিতাটির কথা পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। অজ রাজার চরিত্রনিষ্ঠা ও গভীর অনুরাগের পরিচয় দিবার জন্য, কবি তাঁহাকে শোকসময়ে সান্ত্বনা ও প্রবোধবচন শুনাইবার জন্য ঋষিদিগকে আনিয়াছেন। "তাই ত মহাশয়, আপনাদের কথা কি করিয়া না রাখি!" বলিয়া, বামহস্তে চক্ষুর জল মুছিয়া, উপরোধের ছুতা ধরিয়া, কত লোক লৌকিক শোকপ্রদর্শনে বিরত হইয়া, হাতে সুতা বাঁধিয়া বসেন! কিন্তু অজ, সকল অনুরোধ এড়াইয়া, নবীন যৌবনে, অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী সাজিলেন; এবং যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন ইন্দুমতীর প্রতিকৃতিমাত্র দর্শন করিয়া সময়াতিপাত করিলেন। বিবাহ বিষয়ে মনুর আদর্শ এই স্থানে পূর্ণ অভিব্যক্ত। পত্নীবিয়োগে নবযৌবনে পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য কোনও দেশের সাহিত্যে বর্ণিত দেখি নাই। হয় ত থাকিতে পারে, কিন্তু আমি পড়ি নাই। এ দেশে বিবাহ বিষয়ে কখনও আইনের কঠোরতা (overlegislation) ছিল না; কিন্তু আদর্শ যাহা, তাহার কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইত। আমারও মনে হয় যে, জোর করিয়া কোন প্রকার সদাচার সমাজবদ্ধ করিতে গেলে, সাধারণ লোকেরা অন্যবিধ উপায়ে অসদাচারের অনুষ্ঠান করে। একবিবাহের কড়াকড়ি আইন প্রচলিত হইলে, এই প্রকার ফল ফলিবার সম্ভাবনা। কড়াকড়ি না থাকিয়া উচ্চ আদর্শ থাকিলে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে যে সদ্‌গুণ সমাজে বিকাশ লাভ করে, অলক্ষিতভাবে অন্য দশ জন তাহার অনুকরণ করিয়া গৌরবলাভ করিতে চেষ্টা করে। পুরুষ হউন, স্ত্রী হউন, পত্নী বা পতির বিয়োগে ব্রহ্মচর্য্যতৎপর হইবেন, এই আদর্শ কেবল ভারতবর্ষেই উল্লিখিত হইয়াছে। অন্য দেশে বা অন্য সমাজে পবিত্রতা বা ইন্দ্রিয়সংযম নাই, অথবা উচ্চ আদর্শ আছে বলিয়াই এ দেশে ঘৃণিত ও দূষিত ব্যবহার অনুষ্ঠিত হয় না,—আমি তাহা বলিতেছি না।

নিখুঁৎ অনুষ্ঠান, নির্দ্দোষ ব্যবহার, অথবা নিষ্পাপ আচার কোন মানবসমাজেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ভ্রান্তি, ত্রুটি ও অপারগতা আমাদের সকল কার্য্যের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু যেখানে আদর্শ যত উচ্চ, সুন্দর ও পবিত্র, সেখানে মনুষ্যত্ববিকাশের সম্ভাবনা তত অধিক। একবিবাহের

শ্রেষ্ঠত্ব সকল সভ্যসমাজেই স্বীকৃত; কিন্তু কোন যুগেই সর্ব্বসাধারণ লোকের মধ্যে ইহার অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না। ইউরোপীয় সমাজে পতি বা পত্নীর জীবদ্দশায়, অথবা রাজাজ্ঞায় বিবাহভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত, কেহ অন্য বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু যাহাকে আদর্শ "একবিবাহ" বলে, এই অনুষ্ঠান তাহার অনুবর্ত্তী নহে। যে প্রকার পবিত্রতা ও ইন্দ্রিয়সংযম মনুষ্যত্বের পক্ষে আদর্শ বলিয়া এক-বিবাহের গৌরব কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইউরোপীয় ব্যবস্থা তদনুযায়িনী নহে। এ ব্যবস্থা সামাজিক ক্ষণিক সুবিধার জন্য। (২) কথাটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করিয়া বলিতেছি। খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন যে, মৃত্যুর পর আত্মার বিনাশ হয় না; মৃত ব্যক্তি শরীরবিহীন হইয়াও পরলোকে বাস করেন। এ দেশে ও সে দেশের মধ্যে যে প্রভেদ, অথবা বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত ও পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তের মধ্যে যে প্রভেদ, ইহকাল ও পরকালের মধ্যে ততটা প্রভেদও আছে বলিয়া মনে করেন না। এরূপ স্থলে, যখন পতি বা পত্নী, দুই দিন বা দুই বৎসরের জন্য প্রবাসী হইলে, অন্যসঙ্গলাভ ব্যভিচার বলিয়া গণ্য; তখন, আজি মরিব কিংবা কালি মরিব, এ কথার অনিশ্চয়তার মধ্যে, অন্য লোকের স্ত্রী বা স্বামীর সহিত বিবাহ ও সহবাস, ব্যভিচার বলিয়া গণিত হয় না কেন? কথা এই যে, এই আদর্শে একনিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য নাই; সামাজিক সুবিধা বা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বিবাহপ্রথার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আজি কালি সকল কথাতেই নাকি ইউরোপীয় আদর্শ চলিতেছে, সেই জন্য উভয়বিধ আদর্শের উল্লেখ করিলাম। যদি স্বীকার করা যায় যে, উচ্চ আদর্শ সত্ত্বেও, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে চরিত্র-হীনতা অধিক, তাহা হইলেও, হীন আদর্শ গ্রহণ করিবার যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট হয় না। তবে যদি কবিপ্রদর্শিত আদর্শ নিতান্ত অসম্ভব ও অননুষ্ঠেয় হয়, তবে কোনও কথাই নাই। যাহা হউক, লোকব্যবহারে দেখিতে না পাইলেও, যখনই পড়িব,

তস্য প্রসহ্য হৃদয়ং কিল শোকশঙ্কুঃ প্লক্ষপ্ররোহ ইব সৌধতলং বিভেদ।
প্রাণান্তহেতুমপি তং ভিষজামসাধ্যং লাভং প্রিয়ানুগমনে ত্বরয়া স মেনে।

তখনই বিমোহিত হইব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

(২) অযথা ইউরোপীয়দিগের নিন্দার জন্য এ কথা লিখি নাই। আমি ইউরোপীয় এক-বিবাহের কথা যাহা লিখিলাম, তাহা হর্বর্ট স্পেন্সারের Principles of Sociology গ্রন্থে বিশেষ বর্ণিত আছে। স্পেন্সার যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা লিখিলে, ইউরোপীয় আদর্শের পক্ষপাতিগণ আমাকে ফাঁসি দিবার উদ্যোগ করিতেন।—লেখক।

বাসুদেব ঘোষের নূতন কীর্ত্তি।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া যে অভিনব ধর্ম্মের প্রচার করেন, তাহার প্রবল প্রবাহে একদা বঙ্গদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। অসংখ্য নরনারী কুলক্রমাগত ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভেচ্ছায় এই নবীন ধর্ম্মতরীর আশ্রয় লইয়াছিল। অনেক মুসলমানও নাকি স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া এই নব ধর্ম্মের দলপুষ্টি করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। দেশের অবস্থা তখন কিরূপ হইয়াছিল, ইহা হইতেই তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে নবযুগ প্রবর্ত্তিত করেন। এই যুগে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষীণ কলেবর কেবল পরিপুষ্ট হইয়াছিল, এমন নহে; বিবিধ সুরভি কুসুমদামে পরিশোভিত হইয়া সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিতও করিয়াছিল। সেই প্রসূন-নিচয় অদ্যাপি পরিম্লান হয় নাই। যত দিন ধরাপৃষ্ঠে বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, তত দিন তাহা লুপ্ত হইবার নহে। ভক্ত বৈষ্ণবগণ ভাবাবেশে উদ্ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাদের আরাধ্য দেবতার লীলাবর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। ইহাই বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশের জন্মদাতা। আমাদের পদাবলীসাহিত্যের উপমা নাই। অসংখ্য পদকর্ত্তা বৈষ্ণব কবি কেবল পদ রচনাই করিয়া গিয়াছেন। খণ্ড খণ্ড পদরচনায় পরিতৃপ্ত না হইয়া অনেকে কাব্যাকারেও তাঁহাদের আরাধ্যের লীলাবর্ণনা করিয়া মনের সাধ মিটাইয়াছেন। এইরূপে বৈষ্ণবসাহিত্য বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। বৈষ্ণবসাহিত্যের বিস্তর পদ ও গ্রন্থ এখনও অনাবিষ্কৃত ও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অনুসন্ধান এখনও আরব্ধ হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না! কিন্তু শীঘ্রই পূর্ণোদ্যমের সহিত এই কার্য্যে সকলের প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

প্রাচীন পুঁথির সন্ধান করিতে করিতে আমরা সম্প্রতি দুই জন প্রসিদ্ধ মহাজনের বিলুপ্ত কীর্ত্তির আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি। এত দিন আমাদের আদি কবি চণ্ডীদাস ও বাসুদেব ঘোষ পদকর্ত্তা বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতীব আনন্দের বিষয় এই যে, চণ্ডীদাসের "শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন" ও বাসুদেব ঘোষের "গৌরাঙ্গ-চরিত" আবিষ্কৃত হওয়ায়, অতঃপর তাঁহারা

গ্রন্থকর্ত্তৃরূপেও পরিচিত হইতে চলিলেন! অদ্য বাসুদেব ঘোষের এই নূতন কীর্ত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বঙ্গীয় পাঠকগণের গোচর করিব।

আমরা এই গ্রন্থের দুইখানি হস্তলিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, দুই হস্তলিপিই অসম্পূর্ণ ও নিতান্ত কদর্য্য। অতীব কষ্টের সহিত পাঠোদ্ধার করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা এত অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপূর্ণ বোধ হয় যে, উহা এখন প্রকাশের অযোগ্য। এই কাব্যে বঙ্গসাহিত্যের আর এক প্রকার অদ্ভুত লিপিপদ্ধতি দৃষ্ট হয়। এই জন্যও "গৌরাঙ্গ-চরিত" সযত্নে রক্ষণীয়।*

ইহার নামকরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গোলযোগ দৃষ্ট হইতেছে। এক হস্তলিপিতে 'গৌরাঙ্গ-চরিত' ও অপরখানিতে 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি' নাম আছে। মূলতঃ দুইখানিতে কোনও প্রভেদ নাই। 'গৌরাঙ্গ-চরিতে'র প্রথমাংশ আছে, এবং 'সন্ন্যাসপটি'র শেষাংশ আছে। সুতরাং মোটের উপর গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল ভ্রম প্রমাদ না থাকিলেই গ্রন্থখানি শীঘ্র প্রকাশিত হইতে পারিত।

গ্রন্থে দুইটিমাত্র ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম, অপরটি পরে যথাস্থানে পরিদৃষ্ট হইবে।

"তোমাকে গৌরাঙ্গ দিব, তার পদে বিকাইব,
অবতার দাস অনুদাস।
বাসুদেব ঘোষ ভণে, কান্দ শচী কি কারণে,
জীবের লাগ্যা হইআছে সন্ন্যাস॥
—সন্ন্যাসপটি।

বাসুদেব ঘোষ প্রায় চারি শত বৎসরের লোক। ইনি চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। গৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে ইহার অনেকগুলি পদ আছে। সম্প্রতি সে পদগুলি 'সাহিত্য-পরিষৎ' সভার কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত হইতেছে। সেই অতুলনীয় পদাবলীর অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য ও কবিত্বসুধা যাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বাসুদেবের লেখনীর শক্তিসামর্থ্যের পরিচয়দান বিড়ম্বনামাত্র। বঙ্গভাষায় একখানি অভিনব গ্রন্থ

* এখানে বলা আবশ্যক যে, এই পুঁথিখানি আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান সারদাচরণ চৌধুরী আমাকে সংগ্রহ করিয়া দেওয়ায় পরম উপকৃত হইয়াছি। তজ্জন্য সারদা আমার আশীর্ব্বাদভাজন।

ও এক জন মহাত্মার লুপ্ত কীর্ত্তির পুনরুদ্ধার হইল বলিয়া ইহা যত আদরণীয়, অন্য কারণে আমরা ইহাকে তত আদরণীয় মনে করি না। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, কবিত্ব হিসাবেও ইহা প্রতিষ্ঠালাভের যোগ্য। নিমাই-চাঁদের সন্ন্যাসযাত্রা এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। সুতরাং বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন যে, ইহার ভাষা তীব্রশোকোদ্দীপক ও মর্ম্মস্পর্শিনী। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর করুণ কাতরোক্তিতে পাষাণহৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। পাঠ-বিকৃতিদোষে সম্পূর্ণ রসগ্রহণে ব্যাঘাত জন্মিলেও, যখনই পাঠ করিয়াছি, তখনই ইহার করুণ ভাষা হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কার ভাষার সরলতা। এই গ্রন্থের ভাষাও এত সরল যে, সামান্য শিক্ষিত লোকের পক্ষেও ইহার মর্ম্মগ্রহণ একান্ত সহজ।

ইহা বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ এক নূতন শ্রেণীর গ্রন্থ, এবং সম্ভবতঃ ইহাই এই শ্রেণীর অদ্বিতীয় গ্রন্থ। আমাদের এ কথার তাৎপর্য্য পরে বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবে। অন্য কথায় বলিতে গেলে, ইহার ভাষা গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত। বৈষ্ণব-সাহিত্যের আর এক বিশেষত্ব এই যে, বৈষ্ণবগণ কথাবার্ত্তায় যে ভাষা ব্যব-হার করিতেন, কাব্যাদিতে মনোভাবপ্রকাশের জন্যও তাঁহারা সেই ভাষার প্রয়োগই সঙ্গত মনে করিয়াছেন। এই জন্য এই গ্রন্থে কথিত ভাষার অনেক শব্দ-রূপ স্থান পাইয়াছে। ইহাতে ধুয়া, কথা, দিশা এবং ঠাঠ চিহ্নিত বিশেষ বিশেষ স্থল আছে। প্রাচীন কাব্যাদিতে 'ধুয়া'র খুবই প্রাচুর্য্য; 'কথা' ও 'দিশা'র ব্যবহারও কোন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়; যেমন জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গলে'। 'ঠাঠের' নাম বোধ হয় এই প্রথম শ্রুত হইল। 'কথা'র ভাষা গদ্য; ধুয়া, দিশা ও ঠাঠের ভাষা পদ্য। দেখিয়া বোধ হইতেছে, ধুয়া ও ঠাঠ একই শ্রেণীর পদার্থ। পদবিশেষের শেষে এক গ্রন্থে যেখানে 'ধুয়া'র নির্দ্দেশ আছে, অপর গ্রন্থে সেইখানেই 'ঠাঠ' লিখিত আছে। নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণে'ও দিশা ধুয়ার স্থান অধিকার করিয়াছে, দেখিয়াছি।

সমালোচ্য গ্রন্থ, চণ্ডীদাসের 'শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন' ও ঠাকুর নরোত্তম দাসের কৃত আমাদের প্রচারিত 'রাধিকার মানভঙ্গ', এই তিনখানি গ্রন্থেই ছন্দের বিষয়ে বিস্তর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। হস্তলিপিটির অপকর্ষ হেতু গ্রন্থের অনেক স্থল বোধগম্য হয় না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তথাপি গ্রন্থের আরম্ভটি কেমন সুন্দর দেখুন,—

তপ্ত-কাঞ্চন কান্তি দেখ না অপরূপ পরং। তপত কাঞ্চন জিনি, গৌরাঃ বরণখানি,
গৌরাঙ্গ চান্দের মুখে সুধা হাসি নয়ানে তরঙ্গ॥

ছাড়িয়া নটরালী ভেশ, মুড়াইআ চাঁচর কেশ,
বংশী ছাড়িআ ধর গৌরাং শ্রীদণ্ডক ভং।
রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পাও, সোণার বরণ গাও,
দেখিআ খঞ্জন পাখী হল তার সং॥
আইস আইস নিত্যানন্দ কহ বিবরণ।
কুশলে নি আছে গৌরাং ভারতীর সং॥

ছাড়িআ কমলমধু, তেজি বিষ্ণুপ্রিয়া বধু,
কি সুখে রহিছ নিমাই রস করি ভং।
বাসুদেব ঘোষে বোলে, ঐ রাঙ্গা চরণতলে,
নিদানকালে রাখ মোরে চরণে শরণ॥

—গৌরাঙ্গ-চরিত।

পূর্ব্বে আমরা যে 'ধুয়া' প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছি, একটি স্থান হইতে বাছিয়া এখানে তাহার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমাদের বিশ্বাস, ইহা হইতেই পাঠকগণ এই গ্রন্থের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন।

দিশা।

ক্ষীর সর ননী প্রভু করিআ ভোজন।
রত্নময় সিংহাসনে করিল শয়ন॥
নিদ্রাএ পীড়িত হইআ শচীর নন্দন।
স্বপ্ন দেখে ব্রজলীলা শ্রীবৃন্দাবন॥

জাগ্রত হইআ প্রভু কান্দিআ উঠিল।
শ্রীমতী রাধিকা আমার কোথাতে রহিল॥ধু।
জয় রাধে শ্রীরাধে বল্যা।
গৌরাঙ্গ উঠ্যাছে কান্দ্যা॥

কথা।

গৌরাং রোদন করিতেছেন আর বোলিতেছেন।

দিশা।

কোথা এ রহিল আহ্মার রসবৃন্দাবন।
কোথা এ রহিল আহ্মার রসগোপীগণ॥
কোথা এ রহিল আহ্মার কালিন্দী যমুনা।
কোথা এ রহিল আহ্মার মথুরার থানা॥
কবে যাইব আমি সেই ব্রজপুরে।
স্নান করিব আমি রাধাকুণ্ডনীরে॥
কবে পাব সাধুসঙ্গ।
যাব কবে রাধাকুণ্ড॥

রাধাকুণ্ডে করিআ স্নান।
পবিত্র করিআ জ্ঞান॥
আহ্মার এমন ভাগ্য কবে হবে।
শ্রীরাধার চরণ পাবে॥

—গৌরাঙ্গ চরিত।

গঙ্গার নীর হোতে বিপ্র তটেতে উঠিআ।
অমনি রহিল নিমাইর পন্থ নিরখিআ॥ ঠাঠ।
প্রেম দিতে বল্যাছিলে।
মাএর কোল পাইআ ভুল্যা গেলে॥

কথা।

তখন সেই বিপ্র রোদন করিতেছেন আর কহিতেছেন।

এখানে একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে; উদ্ধার করিতে পারি নাই। ইহার পরবর্ত্তী অংশটি বোধ হয়, 'দিশা';—পুঁথিতে ঐ স্থানে কিছু লেখা নাই।

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী।
যেমনি বাজাও তেমনি বাজি॥
আমার দশা দেখা ভারী।
দয়া না হইল ব্রজের হরি॥
দীন হীন কাঙ্গালের পানে।
হের গৌর দুই নয়ানে॥
তোমার নাম শুনি আইলাম ধাইআ।
দয়া না হইল কি লাগিআ॥
কি কর মাএর কোলে থাকি।
আমি দীন হীন কাঙ্গালে ডাকি॥

—গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি।

এই গ্রন্থে ব্যাকরণঘটিত দুই একটি বিশেষত্ব দেখিতেছি। উত্তম পুরুষে নামপুরুষের ক্রিয়ার প্রয়োগ সম্ভবতঃ এই প্রথম জানা গেল। অবশ্য, পদ মিলাইবার খাতিরেই ঐরূপ করিতে হইয়াছে। আমাদের উদ্ধৃত অংশ হইতেই পাঠক দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া লউন। প্রাচীন সাহিত্যে যে যে বিশেষত্ব দেখা যায়, তাহা এ গ্রন্থেও আছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। আমি, তুমি ইত্যাদি শব্দ আহ্মি, তুহ্মি রূপে লিখিত। অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি প্রায়ই প্রাদেশিক কথোপকথনের ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আর আর কথা এথানে বিস্তারিত লিখিবার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থের শেষ এইরূপ,—

নবদ্বীপবাসীদের প্রশ্নোত্তরে গৌরাঙ্গদেব বলিতেছেন,—

"আমি আসিয়াছি নদ্যা হোতে।
যাবে আমি ব্রজপথে॥

কথা।

তখন রোদন করা নবদ্বীপবাসীরা কহিতেছেন।

ও গৌরাঙ্গ হে। ঠাঠ।
রাধাকৃষ্ণ বোল মুখে।
ব্রজে যাইব আপন সুখে॥
তাহা শুনি গৌরাঙ্গ হরি ব্রজেতে চলিল।
শুনি ব্রজের নাগরী সবে জনম সাফল হইল॥
শুন রে ভকত জন করি নিবেদন।
শ্রীকৃষ্ণচরণে রে যার সদাএ মন॥ ঠাঠ।
রাধা কৃষ্ণ বোল মুখে।
এই জনম যাইবে সুখে॥"

"ইতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি সমাপ্ত। ইতি সন ১১৮৫ মঘী তারিখ ৮ আষাঢ় রোজ আদিত্য বার বৈকালবেলা সমাপ্ত।"

'গৌরাঙ্গ-চরিতে'র হস্তলিপির শেষে কোনও তারিখ নাই। এই পুঁথিখানির সঙ্গে অন্য কতকগুলি বিষয় লিখিত আছে; তাহার শেষের তারিখ এই;—১১৯৪ মঘীর আষাঢ়। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ৬½ পাত এবং শেষোক্তখানি ৮½ পাত স্থান অধিকার করিয়াছে। কাগজের দুই পৃষ্ঠে লিখিত। গ্রন্থের আকার সুতরাং ক্ষুদ্র। দুই হস্তলিপি একই বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে।

লিপিকরের নাম নাই; তবে গ্রন্থ দুইখানি আনোয়ারা গ্রামেই নকল হইয়াছিল, দেখা যাইতেছে।

চট্টগ্রামে আমরা অনেক বৈষ্ণবপদাবলী পাইয়াছি। সকলে শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, অনেক মুসলমানের রচিত 'পদাবলী'ও আমাদের নিকট আছে। তন্মধ্যে 'বাসুদেব' ভণিতাযুক্ত একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। জানি না, ইনি আমাদের কবি বাসুদেব কি না।

মাধবী।

বিনোদ তুমি আমার ঘরে যাবে;
আমার ঘরে আইলে বন্ধু জাতি নাহি যাবে॥
কালা কালা বন্ধু কালা মাথার কেশ।
নানান ভঙ্গিমা দেখি রাধার প্রাণি শেষ॥*
কালা কালা বন্ধুরে কালারে ভঙ্গিমা।
জটা কালা ফোটা মালা অলক্ষ্য মহিমা॥
জীয় জীয় ননদী খাও দুটি আঁখি।
শ্যামের চরণ ভজি আমি রাধা থাকি॥
বাসুদেবে কহে হিত শুন রে কালিয়া।
নিত্য নিত্য আইস যাও আমারে ভাণ্ডিয়া॥

কবি বাসুদেব কৃষ্ণবিষয়ক পদও লিখিয়াছিলেন না কি?

শ্রীআবদুল করিম।

শারদ-গীতি।

অয়ি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা
জননী বঙ্গভূমি,
আজি শরৎ-সময় কি নব শোভায়
সাজিয়াছ, মাতা তুমি!
তব প্রান্তররাজি পূর্ণ, মা, আজি—
হরিৎ-লহরী-লীলা;
তব চারি দিকে, মাতা, স্নেহের বারতা
তুমি চিরস্নেহশীলা।
দেবতার শুভ স্নেহবরিষণ
সিক্ত করেছে ধরার আনন,
তাই অন্নে পূর্ণ বঙ্গ-ভবন তাই
উজলে হরষ-কল;
তব চির-ক্ষুধাকুল সন্তান-কুল আজ
মুছেছে নয়ন-জল।

বুঝি কোজাগর গভীর নিশায়
ভক্তি-আবেগে প্রাণের ব্যথায়
কৃষিবধূকুল ডেকেছিল আয়—
যুড়িয়া যুগল পাণি;
স্বরগ-ভবনে শুনিয়া শ্রবণে
সে ক্ষীণ কাতর বাণী,
ইন্দিরা মাতা স্নেহে বিগলিতা
স্নিগ্ধ করুণা-ভরে—
মুষ্টি মুষ্টি স্বর্ণ-বৃষ্টি
করেছিলা ধরা 'পরে।
শুষ্ক ধরণী শস্য-জননী
উর্ব্বর ভূমিতল;
তাই সুখময় কৃষক-হৃদয়
বাহুতে দ্বিগুণ বল।

* "রাধারে দেখিয়া কানু ধরে নানা বেশ"।—পাঠান্তর।

তব চির দীনহীন, অনশন-ক্ষীণ
সন্তান, মাতা, যারা
চাহি' তব মাঠ পানে ফুল্ল নয়ানে
আশায় ভাসিছে তা'রা—
দেবের কৃপায় যদি ঘুচে যায়
চিরক্ষুধিতের ক্ষুধা,
যদি দেব-আশীর্ব্বাদ ঘুচায় বিষাদ,
ক্ষুধাতুর পায় সুধা।
তাই চিরদিন দেশে উঠিছে জননী!
মঙ্গল গীত ছাইয়া অবনী,
উছলিছে তাই হরষের ধ্বনি,
মঙ্গল-কোলাহল।
এবার লাঙ্গলের ফালে উঠেছে কপালে
শুভ মঙ্গল-ফল।

তব চিরলাঞ্ছিত সন্তান যত
লাঞ্ছনা তব করিতেছে কত,
তবু স্নেহদান কর অবিরত
তুমি চির-স্নেহে ভাসি';
হৃদয় বিদারি' দাও হৃদি ভরি'
শুভাশীষ, স্নেহরাশি।
তুমি সহিয়াছ কত, সহিতেছ কত,
তবু স্নেহ কর দান;
তুমি চিরদিন, মাতা, স্নেহে বিগলিতা,
চিরস্নেহাকুল প্রাণ।
আজ ক্ষুধিত আননে দিতেছ যতনে
জীবন-অন্ন, অয়ি!
তুমি চির-উর্ব্বরা, চির-স্নেহ-ভরা,
চিরশুভাশীষময়ী!

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

গৃহত্যাগ।

জনপ্রবাদমূলক গল্প।

"বৌ ঠাকুরাণি! আপনি বিবেচনা করে দেখুন, আমার কথা ন্যায়সঙ্গত কি না। আপনার স্বামীর পিতামহ ও আমার পিতামহ সহোদর ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা একবার বিষয় ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। তার পর আমার পিতা নিজের যত্নে বিষয় বাড়াইয়াছিলেন। আপনার আশীর্ব্বাদে আমিও পাঁচ জনকে লইয়া দুই বেলা দুই মুঠা খাইতেছি। আপনার স্বামী তাঁহার বাটীর অংশ আমাকে বিক্রয় করিয়া উচিত মূল্য লইয়াছিলেন। এখন আমার বাটীতে বা আমার কারখানায় আপনার দাবী দাওয়া কি আছে?"

"আমি অত ঘোর ফেরের কথা বুঝি না। আমার শ্বশুর আর তোমার বাপের এ বাড়ীতে সমান অংশ। আমি কি এখন বিধবা হয়েছি বলে ভেসে যাব?"

"রাধামাধব! ও কথা মুখে আনবেন না। আপনি বাড়ীর গিন্নি, আপনি আমার মার মত সংসারে থাকুন, আমরা সকলে আপনার হাততোলা থাকব। আর ধরুন, আপনার গর্ভে যখন সন্তানাদি নাই, তখন এর পর সমস্ত বিষয় ত সীতারাম পাবে"—

"কেন আমার বিষয় আমি যাকে ইচ্ছে দিয়ে যাব। আমার ভিক্ষে-পুত্তুর বিরূপাক্ষকে দিয়ে যাব, এতে যদি রাজদরবার করতে হয়"—

ভ্রাতৃজায়ার কথা শুনিয়া দেবর একটু সক্রোধে বলিলেন, "আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন, আমি আর আপনার সহিত কলহ বিবাদ করিতে চাহি না। যদি আপনি আমার নিকট সহমানে চাহিতেন, আমি আমার সমস্ত বিষয় ছাড়িয়া দিতাম। কিন্তু যখন আপনি আমাকে রাজদরবারে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, তখন আপনি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া দেখুন। জগন্নাথ ধর্ম্মপথে থাকিতে ভয় পায় না।"

ভ্রাতৃজায়া কুপিতা ফণিনীর ন্যায় সগর্জ্জনে বলিলেন, "যদিও দরবারে হারি, তাহা হইলে আমার শ্বশুরের ভিটায় তোমাকেও বাস করিতে দিব না। যেমন করে পারি, তোমাকেও ভিটা-ছাড়া করিব ; এ যদি না পারি, তা হ'লে আমি সর্ব্বেশ্বর কুণ্ডুর মেয়ে নই।"

* * * *

১

প্রাচীন সপ্তগ্রামের উপনগর হলুদপুরের এক পথের ধারে এক বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে প্রায় ৩০।৪০ জন লোক সমবেত হইয়া নানাপ্রকার জটলা করিতেছিল। ইহাদের দলে অজাতশ্মশ্রু কিশোর হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই ছিল। যদি কোনও আগন্তুক তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিত, তাহা হইলে একেবারে বলিয়া দিতে পারিত যে, তাহারা সকলেই অথবা অধিকাংশই তন্তুবায়।

সেদিন ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি ; বিশ্বকর্ম্মা পূজা ; আবার বৃহস্পতিবার বলিয়া লক্ষ্মীপূজা। তন্তুবায়দিগের মধ্যে অনেকের কৌলিক প্রথা আছে যে, সংক্রান্তির দিন বৃহস্পতিবার হইলেই লক্ষ্মীপূজা হয়। সুতরাং সেদিন তন্তুবায়গণের তিনটি উৎসব সংঘটিত হইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা পূজা, অরন্ধন ও লক্ষ্মীপূজা। বিশ্বকর্ম্মা পূজার দিন সকল শিল্পীরই অবকাশ। অবকাশ পাইয়া তন্তুবায়গণ নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। পথের যে

স্থলে তাহারা সমবেত হইয়াছিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার এক পার্শ্বে একটি বৃহৎ অট্টালিকা ; পথের অপর পার্শ্বে প্রায় ৩।৪ বিঘা ভূমিতে কতকগুলি সুবিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত কুটীর। কুটীরগুলি সমান্তরালভাবে নির্ম্মিত। অকস্মাৎ দেখিলে হাট বা বাজার বলিয়া মনে হইত, কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই সে ভ্রম দূর হইত। কুটীরগুলির মধ্যে সারি সারি অনেকগুলি "তাঁত" পাতা আছে। এক একটা কুটীরে প্রায় ২০।২৫ খানা তাঁত। এই প্রকার সর্ব্বসমেত প্রায় ৬।৭ খানা কুটীর ছিল। পূর্ব্বকথিত অট্টালিকার অধিকারী জগন্নাথ ভড় এই কুটীরগুলিরও অধিকারী। এগুলি জগন্নাথের "তাঁত-ঘর," বা "কারখানা"। প্রায় দেড় শত তন্তুবায় এই তাঁত-ঘরে নিত্য কায করিত, এবং ভড় মহাশয়ের আশ্রয়ে সুখে কালযাপন করিত। হলুদপুরে ও তৎসন্নিহিত ৪।৫ খানা গ্রামে এরূপ অনেকগুলি কারখানা ছিল ; কিন্তু ভড় মহাশয়ের কারখানাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

বিশ্বকর্ম্মা পূজার উপলক্ষে হলুদপুরের যাবতীয় তন্তুবায় আজ জগন্নাথ ভড়ের গৃহে নিমন্ত্রিত। সুতরাং ভড় মহাশয়ের গৃহে আজ সমারোহ ব্যাপার। কিন্তু রন্ধনের কোনও আয়োজন নাই! ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি, অরন্ধন। রন্ধনব্যাপার পূর্ব্বদিনেই শেষ হইয়া আছে। নিমন্ত্রিতগণ পর্য্যুষিত অন্ন, পাঁচ ছয় প্রকার ডাল, দশ পনের প্রকার ভাজা ইত্যাদিতে উদর পূর্ণ করিবে। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা প্রায় পাঁচ ছয় শত।

কয়েক দিন অত্যন্ত বর্ষা গিয়াছে। সূর্য্যদেব একেবারে দেখা দেন নাই। আজ প্রাতে যদিও বৃষ্টি নাই, তথাপি সূর্য্যদেব অদৃশ্যই আছেন। তাঁতীরা তাই আজ অবকাশের দিনে বৃষ্টি বন্ধ দেখিয়া বড়ই উল্লসিত হইয়াছিল। প্রাচীন রামনিধি গুঁই একটা বড় হুঁকাতে শোষটান দিয়া হরি সেনের হাতে হুঁকাটি অর্পণ করিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল :—

"সেনের পো! এবারকার চড়ান্‌টা কেমন ওৎরাবে?"

সেনের পো দার্শনিকের ন্যায় গুরুগম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা ঠিক বলতে পারি না গুঁই মশাই। আর বারে যে লালপাড় শাড়ীটা বুনে ছিলেম, তার চেয়ে সরেশও হতে পারে, আর চাই কি নিরেশও হতে পারে।"

সেনের পোর এই স্থিরসিদ্ধান্ত শুনিয়া হারাধন রক্ষিত বলিল, "কর্ত্তা বলছিল যে আবার না কি বর্গীর হাঙ্গামা হবে? তবেই মারা যাব আর কি!"

বর্গী? ঘাসের বিচি চাল—তাও টাকায় দু'মণ কিনে খেতে হ'ল;—আবার এর উপর বর্গী! তা' হলে দেখছি টাকায় দেড় মণ বিকোবে। আমরা না খেতে পেয়ে মারা যাব। বার আনা চালের মণ! গৌর তোমার ইচ্ছে!"

শিবু দে বলিল, "গুঁই মশাই যা বলেছ! বাবার কাছে শুনেছি যে টাকায় চার সের ঘি আমাদের দেশে বিকিয়েছে, আর—সেদিন হাবু নন্দী বল্‌লে যে, এখন আর আড়াই সেরের বেশী পাওয়া যায় না। হাবু নন্দীর দোকান ফাঁদা ত নয়, দিনে ডাকাতি! টাকায় আড়াই সের ঘি!"

শিবু দের কথায় বাধা দিয়া প্রাচীন গুঁই মশাই বলিল, "আরে তোর বাবার বয়স আর কতই ছিল? আমার চেয়ে না হয় দশ বছরের বড় হবে। কর্ত্তা বলছিল, সেদিন রাজবাড়ীতে শুনে এসেছে, হুগলীর দক্ষিণে না কি আর এক দল সাদামুখো মেলেচ্ছ কোন্ দেশ থেকে এসেছে। ফরাঙ্কি নাকি তাদের নাম। তারাই নাকি সব জিনিষ লুটে নিয়ে যাচ্চে। তারা দেশে গাছের পাতা পরে থাকত, এখানে এসে আবার কাপড় পরতে শিখেছে।"

রাধানাথ ভড় বলিল, "তারা নাকি চাল ঘিয়ের সোয়াদ পেয়েছে। এ সব লক্ষণ ভাল নয়। ভাল কথা, এবারে আমার এক চড়ান কাপড় যে উৎরে যাচ্ছে গুঁই মশাই, সে আর কি বলব! যেন কলার মাজ; এমন কাঁচি আমার হাতে কখনও জন্মায় নি।"

গুঁই মহাশয় বলিল, "বর্ষা নেমেছে, এই ত কাঁচি কাপড় বোনবার সময়। টানের সময় কি কাঁচি কাপড় জন্মায়? পাড়ি কাপড়"—

অকস্মাৎ অদূরে স্ত্রীকণ্ঠে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। সকলে ব্যাপার কি জানিবার জন্য সেই দিকে যাইতে উদ্যত হইতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক একটা বাজরা মাথায় করিয়া অতিকষ্টে কর্দ্দমাক্ত পথ দিয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। আর তাহার পশ্চাতে প্রায় ৪।৫ জন পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী অনুসরণ করিতেছে। ফিরিঙ্গীরা মনে ভাবে নাই যে, অকস্মাৎ ত্রিশ চল্লিশ জন লোকের সম্মুখে পড়িতে হইবে। সেই জন্য তাহারা সম্মুখে লোকসমাগম দেখিয়া একটু পশ্চাৎপদ হইল; কিন্তু তাঁতীদলের যুবকগণ অগ্রসর হইয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে ঘেরাও করিল। তাহারা প্রথমে কিলটা ঘুঁসাটা চালাইবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে ধরা দিল। সকলে তাহাদিগকে লইয়া কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইল।

২

অট্টালিকার অধিকারী বা কর্ত্তা জগন্নাথ ভড়ের বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর হইবে। মস্তক মুণ্ডিত, মধ্যে শিখা, নাসায় তিলক, কণ্ঠে তুলসীর কণ্ঠী, হস্তে জপের মালা। তন্তুবায়গণের মধ্যে প্রায় সকলেই গোস্বামীর সেবক, বৈষ্ণবমতাবলম্বী। বিশেষতঃ, জগন্নাথ ভড়ের পূর্ব্বপুরুষগণ চিরকাল অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত বলিয়া বিখ্যাত। বাটীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই নিরামিষাশী। ধর্ম্মভীরু ও পরোপকারী বলিয়া তাঁহার প্রতিবাসী ব্রাহ্মণকায়স্থগণও "ভড়ের পোকে" শ্রদ্ধা করিতেন। জগন্নাথের বাটীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত। বিবাহ অথবা অন্নপ্রাশন উপলক্ষে একেবারে দুই তিন সহস্র স্বজাতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্র আহারাদি করাইতেন। তাঁহার আয়ও যথেষ্ট ছিল। অতি সূক্ষ্ম সূত্রবস্ত্র তাঁহার কারখানায় প্রস্তুত হইত। সেই সকল বস্ত্র সপ্তগ্রাম, হুগলী, ঘাঁটাল, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ, যশোহর, কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ প্রভৃতির ব্যাপারীরা আসিয়া ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত, এবং নিজ নিজ দেশে অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিত। তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে বর্ত্তমান হিসাবে অল্প লোক হইলেও তখনকার হিসাবে তিনি বহু গোষ্ঠীর পোষক ছিলেন। বর্ত্তমান হিসাবে তাঁহার পরিবারে কেবল পত্নী, পুত্র ও কন্যা; কিন্তু আমাদের দেশী হিসাবে সংসারে মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্কন্যা, ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, মাসী, পিসী, তাঁহাদের পুত্র, কন্যা ও জামাতা প্রভৃতিতে প্রায় ৮০।৯০ জন লোক। এই পোষ্যবর্গের মধ্যে অনেকেই তাঁহারই কারখানায় তাঁত বুনিত। অনেক স্ত্রীলোক তাঁহার কারখানার জন্য সুতা কাটিত। ভড় মহাশয় সকলকেই যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতেন, অথচ তাহাদিগকে সংসারে রাখিয়া অকাতরে অন্নদান করিতেন। ধন জন ধেনু ধান্য, এই চতুর্ব্বিধ সম্পত্তি পূর্ব্বে লক্ষ্মীর অনুচর বলিয়া গণ্য হইত; কিন্তু এখন লক্ষ্মীর অনুচরগণের 'লিষ্ট' হইতে "জনে"র নাম কাটা গিয়াছে; "ধেনু" ও 'ফার্লো'তে আছেন; চাকরী যায় যায় হইয়া আছে। কেবল ধন ও ধান্য, তাও ধান্য কত দিন থাকিবেন, বলা যায় না। আশা আছে, অদূর ভবিষ্যতে কাঠায় ধান্য না রাখিয়া টাকা অথবা গভর্মেণ্ট পেপার রাখিয়া লক্ষ্মীপূজা হইবে।

কর্ম্মবাড়ী বায়সসমাকুলিত বৃক্ষের ন্যায় কোলাহলে পরিপূর্ণ—এমন সময় পথে স্ত্রীকণ্ঠে চীৎকার ও কোলাহল শুনিয়া জগন্নাথ পথে বাহির

হইয়া দেখিলেন, তাঁহার কয়েক জন কারিগর চার পাঁচটা ফিরিঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার দ্বারদেশে সমাগত হইয়াছে।

ফিরিঙ্গী দেখিয়াই তিনি সভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি ?"

রাধু ভড় বলিল, "কর্ত্তা মশাই! এই ফিরিঙ্গীরা গদার মাকে মেরেছে।"

বাধা দিয়া হারাধন বলিল, "মারে নি কর্ত্তা, মার্ত্তে এসেছিল। আমরা গিয়া"—

সেনের পো বলিল, "না মারেনি, গদার মার বাজরা থেকে বেগুন কেড়ে নিতে এসেছিল।"

একযোগে সকলের কথা হইতে অনেক কষ্টে অবশেষে ভড় মহাশয় ভাব গ্রহণ করিলেন যে, এই ফিরিঙ্গী কয়টা গদার মার বার্ত্তাকু কাড়িয়া লইতে আসিয়াছিল। তাই ইহারা দুর্ব্বৃত্তগণকে ধরিয়া আনিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া ভড় মহাশয় গদার মাকে বলিলেন, "গদার মা, তোর কত বেগুন আছে ?"

গদার মা বলিল, "দেড় পণ।" গদার মা তখনও কাঁপিতেছিল।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাম কত ?"

"বনমালী ধাড়া ছ' পয়সা বলেছিল, আমি দিই নাই।"

"আচ্ছা, আমি বারো পয়সা দিচ্ছি, আমায় দিয়ে যা।"

গদার মা আশ্চর্য্য হইয়া আনন্দবিহ্বলস্বরে বলিল, "বারো পয়সা ?"

কর্ত্তা বলিলেন, "দিগে যা, আর গোলমাল করিসনে। কাল দাম নিয়ে যাস, আজ লক্ষ্মীপূজা—"

গদার মাকে বার্ত্তাকু লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া জগন্নাথ বলিলেন, "বেগুন বাড়ীতে দিতে হবে না, এই ফিরিঙ্গীদের দে—"

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সে কি কর্ত্তা! সে ব্যাটারা ডাকাত বোম্বেটে—"

"তা জানি ; তবু কি জান, খাবার জিনিসে যখন লোভ হয়েছিল, তখন বঞ্চিত করা উচিত নয়।"

অনন্তর ইঙ্গিত করিয়া ফিরিঙ্গীদিগকে বার্ত্তাকু লইতে বলায় প্রথমে তাহারা কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা ইসারা করিয়া জানাইল,—পয়সা নাই। যখন তাহারা বুঝিল যে, পয়সা দিতে হইবে না, তখন এক জন নিজের [illegible]

সেই কোটটা ধরিয়া রহিল, এক জন বাজরা হইতে বার্ত্তাকু লইয়া কোটে ফেলিতে লাগিল।

ইত্যবসরে জগন্নাথের ভ্রাতুষ্পুত্র আসিয়া সংবাদ দিল, "জ্যাঠা মহাশয়—পাতা প্রস্তত হয়েছে।"

আহার্য্য প্রস্তত শুনিয়া সকলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। যাহারা ফিরিঙ্গীদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল, তাহারা আবার স্নান করিয়া শুচি হইতে গেল। গদার মা শূন্য বাজরা লইয়া প্রস্থান করিল। সকলকে যাইতে দেখিয়া ফিরিঙ্গীরা হাসিতে হাসিতে বার্ত্তাকুর মোট লইয়া চলিয়া গেল। এক জন খানিক দূর হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতি সন্তর্পণে তস্করের ন্যায় জগন্নাথের কারখানাবাটীতে প্রবেশ করিল। এবং প্রায় দণ্ড দুই পরে আবার নীরবে অতি সাবধানে বাহির হইয়া গেল। তাহার অনুচরবর্গ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া পথিকের মনে ভীতি উৎপাদন করিতেছিল। এক জন একটা বার্ত্তাকু লইয়া চর্ব্বণ করিতেছিল। যখন তাহাদের সঙ্গী তাহাদের সহিত মিলিত হইল, তখন সকলে একেবারে উচ্চহাস্য করিয়া তালে তালে গান গাহিতে গাহিতে সমপাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিল।

যথাসময়ে শিল্পিগণ আহার শেষ করিয়া আবার পথে আসিয়া সমবেত হইল। রাধা ভড় শুঁই মহাশয়ের সাক্ষাতে ধূমপান করে না, সেই জন্ম শুঁই মহাশয়ের হাত হইতে হুঁকা লইয়া কারখানা-ঘরে প্রবেশ করিল ও মুহূর্ত্তপরে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

সকলে একবাক্যে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

"সর্ব্বনাশ করেছে, কে সব তাঁতের সুতো কেটে দিয়েছে।" সকলে মহাকোলাহলসহকারে কারখানাতে গিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশই বটে। প্রায় ৩০।৪০ খানা তাঁতের সুতা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তখন সেই কারখানা হইতে মহা আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। অনেকেই কর্ত্তাকে সংবাদ দিতে ছুটিল। সকলেই বুঝিল, এ সেই বোম্বেটেদের কার্য্য।

৩

সপ্তগ্রামের প্রাচীন রাজবংশের শেষ রাজা হিরণ্যগোবর্দ্ধন সপ্তগ্রামের দুর্গমধ্যস্থ প্রাসাদে বসিয়া আছেন। রাজার বয়ঃক্রম প্রায় ৭০।৭২ বৎসর হইবে। মস্তকে দীর্ঘ কুঞ্চিত শ্বেত কেশ; তদুপরি একটি জরির কায করা টুপি।

পরিধানে পায়জামা ও শ্বেত সূক্ষ্ম মলমলের "জোড়া"। মহারাজ হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পূর্ব্বপুরুষগণ এককালে সমস্ত দক্ষিণ বঙ্গের অধিপতি ছিলেন; পাঠানদিগের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের কুটিল কটাক্ষে সেই নিম্ন বঙ্গের অধীশ্বরের বংশধর মোগলদিগের অধীনে এক জন সামান্য ভূস্বামিমাত্র। এখন তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরবের মধ্যে ভগ্নদুর্গমধ্যে ভগ্ন প্রাসাদমাত্র অবশিষ্ট আছে। হুগলীর মুসলমান ফৌজদারই এখন সপ্ত-গ্রামের সর্ব্বময় কর্ত্তা; রাজা কেবল নামে রাজা। মুসলমানগণের সংস্রবে আসিয়া আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ ক্ষমতাশালী নরপতি যখন স্ব স্ব কলেবর যাবনিক পরিচ্ছদে সুশোভিত করা শ্লাঘ্য মনে করিতেন, তখন এই প্রাচীন রাজবংশের নামমাত্রাবশেষ রাজা যে মুসলমানদিগের ন্যায় বেশভূষা করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। রাজার ললাটে চন্দনচিহ্ন দেখিলে তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া বুঝা যাইত। রাজা জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু কথাবার্ত্তায় বাঙ্গালী।

রাজা স্থূল উপাধানে স্বীয় সুদীর্ঘ কৃশ দেহভার রক্ষা করিয়া ধূমপান করিতেছেন, এমন সময় এক জন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "মহারাজার কাপড়ওয়ালা জগন্নাথ ভড় রাজদর্শনের অপেক্ষা করিতেছে।"

রাজা অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "লইয়া আইস।" ক্ষণকাল পরে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত জগন্নাথ ভড় দূর হইতে রাজাকে দেখিয়া করযোড়ে সমীপবর্ত্তী হইলেন ও নিকটে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। জগন্নাথের পুত্র সীতারাম আজ পিতার সহিত রাজদর্শনে আসিয়াছিলেন। সীতারাম মধ্যে মধ্যে রাজদর্শনে আসিতেন, কিন্তু বৃদ্ধ রাজা প্রত্যেক বারই তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব মনে করিতেন। সীতারামও পিতার অনুকরণে রাজাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অনন্তর জগন্নাথ পুত্রের নিকট হইতে তিন চারি জোড়া অতি সূক্ষ্ম উৎকৃষ্ট বস্ত্র লইয়া সসম্ভ্রমে রাজার চরণতলে সংস্থাপন পূর্ব্বক করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

রাজা জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্গে এটি কে জগন্নাথ?"

জগন্নাথ পুনরায় ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "এটি মহারাজের দাসানুদাস—আমার পুত্র।"

রাজা জগন্নাথকে বড় স্নেহ করিতেন। কারণ, তাঁহার এই লুপ্ত গৌরবের দিনে তিনি জগন্নাথ ও জগন্নাথের অনুচরবর্গের নিকট হইতে যেমন রাজোচিত সম্মান পাইতেন, তেমন আর কোথাও পাইতেন না। রাজার অনুচরগণও

রাজাকে সম্মানপ্রদর্শন করিতেন বটে, কিন্তু এমন আন্তরিক শ্রদ্ধা অকপট সম্মান আর কোথাও তিনি পাইতেন না। জগন্নাথ স্বভাবসিদ্ধ বিনয়গুণে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। বিশেষতঃ মহারাজ হিরণ্যগোবর্দ্ধন যে অতি প্রাচীন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই রাজবংশ চিরকাল জগন্নাথের পূর্ব্বপুরুষগণকে কৃপাপ্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, এ কথা জগন্নাথ শুনিয়াছিলেন।

সীতারাম করযোড়ে বলিলেন, "এ দাসের নাম সীতারাম ভড়।"

"বেশ বাবা বেশ! তোমরা বংশানুক্রমে আমাদের অনুগত। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজেরা তোমাদের পুর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে চিরকাল বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া লইতেন। আমিও তোমার পিতামহের নিকট বস্ত্র লইয়াছি, কিন্তু আমা হইতেই শেষ হইল। আমার অবর্ত্তমানে—"

রাজার কণ্ঠস্বর শোকে রুদ্ধ হইয়া আসিল, মহারাজ অপুত্রক।

জগন্নাথ কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "মহারাজ! ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যত দিন মহারাজ আছেন, আমরাও তত দিন সাঁতগাঁয়ে আছি। মহারাজের স্বর্গারোহণ হইলে আমাদিগকেও সাতগাঁ ছাড়িয়া যাইতে হইবে।"

রাজা বলিলেন, "কেন, সাতগাঁ ছাড়িবে কেন?" বলিয়াই আবার আপন মনে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সাতগাঁয়ে আর থেকেই বা কি করবে? কি আর আছে? বাজার ভেঙ্গে গেল, যা গঞ্জ গোলা ছিল, তাও সব হুগলীতে গেল। সরস্বতীও ক্রমে আমারই মত সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ছেন। সাতগাঁ যাবে, হুগলী হবে। এই চিরকাল হয়ে আসছে। গত বৎসর মুরশিদাবাদে নবাব বাহাদুরের কাছে শুনে এলাম, আবার নাকি বর্গীরা বাঙ্গলায় আসবে। সেবার ভাস্কর বর্গী এসে কি কাণ্ডটাই না করলে? যে দিন কাল পড়েছে, এখন পালাতে পাল্লেই মঙ্গল, কি বল জগন্নাথ?"

জগন্নাথ সদুঃখে বলিলেন, "যখন মহারাজ সমস্ত বাঙ্গলার অধীশ্বর হয়ে বর্গীর কথা বলছেন, তখন আর আমরা কি বলব? আমাদের ভরসা মহারাজের শ্রীচরণ। আপদ বিপদে পড়লে ছুটে আগে মহারাজের কাছে এসে পড়ি। তাই আজ সীতাকে সঙ্গে লয়ে এই দারুণ বর্ষাতে মহারাজের শরণাগত হয়েছি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? কিছু হয়েছে নাকি?"

মহারাজ আজ প্রাতে ৫।৬ জন বোম্বেটে একটা স্ত্রীলোকের নিকট হ'তে বেগুণ কেড়ে নিতে গিয়েছিল। আমার লোক জন পড়ে বাধা দেয়। আমি জান্‌তে পেরে সেই বেগুণ কিনে বোম্বেটেগুলোকেই দিলেম; বলি, আহা খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, হ'ক বম্বেটে! তা মহারাজ! বোম্বেটেরা বেগুন নিয়ে যাবার সময় লুকিয়ে আমার কারখানায় গিয়ে ৪০।৪৫খানা তাঁত ছিঁড়ে কেটে লণ্ড ভণ্ড করে দিয়েছে। প্রায় তিন চার শত টাকা লোকসান হয়েছে। কারিকরগুলো কেঁদেই অস্থির। আহা গরীব লোক। তা কি করি, সকলকে বল্লেম যে, যার যার লোকসান হয়েছে, আমি সব দিব। মহারাজ! এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে শরণাগত।"

রাজা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন,"তাই ত জগন্নাথ! তোমার ত বড় লোকসান করে দিয়েছে, কি করা যায়! বোম্বেটেদের আমি দমন করব কি, হুগলীর ফৌজদার সাহেব কিছু করে উঠতে পারেন নি। নবাব বাহাদুর বর্গীর ভয়ে অস্থির। আর কি সে দিন আছে জগন্নাথ? আমি যদি বৃদ্ধ ও অশক্ত না হতেম, হা জগদীশ্বর!"

মহারাজ যে যৌবনে কোথাও যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তথাপি তাঁহার বিশ্বাস যে, বাহুতে বল থাকিলে এমনটা হইত না। রাজার কথায় জগন্নাথ নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু হতাশ হইলেন না; কারণ, তিনি জানিতেন যে, রাজার নিকট কোনও প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। তথাপি পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ শিশু যেমন অজ্ঞাত আকর্ষণে তাহার মাতার নিকট ছুটিয়া যায়, সেইরূপ রাজার প্রতি শ্রদ্ধাবাহুল্য তাহাকে সম্পদে বিপদে রাজার নিকট টানিয়া আনিত।

প্রায় ২।৩ দণ্ড নানাপ্রকার কথাবার্ত্তার পর জগন্নাথ রাজচরণে প্রণাম পূর্ব্বক সপুত্র বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৪

এই ঘটনার পর প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। মহারাজ হিরণ্য-গোবর্দ্ধন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ রামনিধি গুঁই মহারাজের অনুসরণ করিয়াছে। পাঁচ বৎসরে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে একবার বর্গীরা আসিয়া সাতগাঁ আক্রমণ করে; সে সময় সকলে সাত-গাঁ ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে পলায়ন করিয়াছিল। আবার এ বৎসর বর্গী আসি-য়াছে; বর্দ্ধমান হইয়া পাণ্ডুয়ায় আসিয়া সপ্তগ্রামাভিমুখে আসিতেছে। প্রজারা

শশব্যস্ত হইয়া চারি দিকে পলায়ন করিতেছে। জগন্নাথ সপরিবারে ধনিয়াখালিতে পলায়ন করিয়াছেন।

সাতগাঁয়ের প্রায় তিন চারি ক্রোশ উত্তরে একটা প্রান্তরে অনেকগুলা ছোট ছোট তাঁবু পড়িয়াছে। মধ্যে ৩।৪ টি তাঁবু একটু উচ্চ ও তাহাদের শিখরদেশে ত্রিশূল-অঙ্কিত পতাকা উড়িতেছে; প্রায় প্রত্যেক তাঁবুর নিকট দুই একটি করিয়া অনতিউচ্চ হৃষ্টপুষ্ট অশ্ব বাঁধা আছে। রক্তচন্দনচর্চ্চিত-ললাট, কর্ণে রৌপ্য বা স্বর্ণের কুণ্ডল, কাহারও বা হস্তে বলয়, বিচিত্র পরিচ্ছদে অঙ্গ আবৃত করিয়া বর্ষাধারী সৈনিকপুরুষগণ মধ্যে মধ্যে পাহারা দিতেছে। সকলের সম্মুখের কেশ মুণ্ডিত, এবং পশ্চাতের কেশ দীর্ঘ। অনেকের গলদেশে যজ্ঞোপবীত লম্বমান।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। প্রায় সকল তাঁবুর নিকটই একটা করিয়া চুল্লী জ্বলিতেছে। কোথাও ৫।৭ জন একত্র হইয়া গান করিতেছে। এমন সময় মধ্যের একটা বড় তাঁবু হইতে দুই জন লোক বাহির হইয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে আসিতে লাগিল। এক জনের বেশভূষা দেখিলে তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হয়, আর এক জনের কটিতটে অসি লম্বমান, সে বর্গীর সর্দ্দার।

সর্দ্দার বলিল, "আচ্ছা, আমাদের সকল কথাই স্থির রহিল। কিন্তু তোমাকে বলিয়া রাখি, তুমি বাটীর দ্বারে একটা ত্রিশূল চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখিও। তাহা হইলে তোমার বাটী বুঝিতে পারিব। আমরা প্রথমে তোমার বাটীতে উপস্থিত হইয়া তোমাকে ধরিয়া আনিব। তুমি তাহার বাটী দেখাইয়া দিবে। যদি তোমার কথিত ধনরত্ন না পাই, তাহা হইলে কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমাকে নিষ্কৃতি দিব না।"

বাঙ্গালী বলিল, "যে আজ্ঞা।"

অস্ত্রধারী আবার বলিল, "তুমি বলিতেছ, সে শূদ্র, তুমি ব্রাহ্মণ; তাহার সহিত তোমার এত মনান্তর কেন?"

"সে অনেক কথা! কেবল এই পর্য্যন্ত বলিলে বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশীদার আমার ভিক্ষা মা। ভিক্ষা-মার মৃত্যুর পর আমি তাঁহার সমস্ত বিষয় পাইব; কিন্তু সেই লোকটা আমার ভিক্ষা-মাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে; একাকী সমস্ত বিষয় ভোগ করিতেছে। আমি নালিশ দরবার করিয়াও কোনও ফল পাই নাই; তাই আপনার শরণাগত

হইলাম। আমার প্রাপ্য অর্দ্ধেক সম্পত্তি আমাকে দান করুন, মহাদেব আপনার মঙ্গল করিবেন।”

“সে লোকটার বাৎসরিক আয় কত হইবে?”

“অনেক; বোধ হয় লক্ষ টাকার কাছাকাছি হইবে; অন্তত. ৭৫ হাজার টাকার কম নহে।”

“তোমার নাম বলিলে”—

“বিরূপাক্ষ চট্টোপাধ্যায়।”

“মনে থাকিবে।”

সর্দ্দার ললাট স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ শঙ্কিতচিত্তে সপ্তগ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিল।

চতুর্থ দিনের প্রাতঃকালে দেখা গেল, সেই প্রান্তর জনশূন্য হইয়াছে। কোথাও জীব জন্তুর চিহ্নমাত্র নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে অঙ্গারপূর্ণ চুল্লী, অশ্বপুরীষ ও দুই একটা ভগ্ন মৃণ্ময়পাত্র পড়িয়া আছে। সপ্তগ্রামবাসীরা মনে করিল যে, বর্গীরা অন্য দিকে, সম্ভবতঃ জাহানাবাদের দিকে, চলিয়া গিয়াছে। যাহারা গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা একে একে আবার আসিতে আরম্ভ করিল।

দুই তিন দিন পরে এক দিন রাত্রে অকস্মাৎ হলুদপুরে হাহাকার উত্থিত হইল। প্রায় তিন চারি সহস্র বর্শাধারী বর্গী অশ্বারোহণে আসিয়া হলুদপুর আক্রমণ করিল। সকলে বর্গীর প্রস্থানসংবাদে শান্ত হইয়াছিল; এক্ষণে অকস্মাৎ এই নৈশ আক্রমণে ভয়ে মৃতপ্রায় হইল। বর্গীরা কুটীর আক্রমণ না করিয়া কেবল অট্টালিকাই আক্রমণ করিতে লাগিল। তিন চারিটা অট্টালিকা আক্রমণ করিয়া অবশেষে তাহারা জগন্নাথের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। এক জন ছদ্মবেশী বর্গীর সর্দ্দারের সঙ্গে আসিতেছিল, সে মৃদুস্বরে বলিল, “এই বাড়ী।”

সর্দ্দারের আদেশ পাইয়া বর্গীরা “জয় ভবানী! জয় ভবানী!” নাদে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া বর্শার আঘাতে বৃহৎ দ্বার ভগ্ন করিয়া মুক্ত জলপ্রবাহের ন্যায় জগন্নাথের গৃহে প্রবেশ করিল। যে রাত্রে বর্গীরা জগন্নাথের গৃহ আক্রমণ করে, তাহার পূর্ব্ব দিন বর্গীদের প্রস্থানের জনরব শুনিয়া জগন্নাথ সপরিবারে নিজের বাটীতে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার সময় দ্রব্য সামগ্রী ও অর্থাদি নানা স্থানে গুপ্তভাবে রাখিতে বাধ্য

হইয়াছিলেন, এক্ষণে বাটীতে আসিয়াই সে সকল দ্রব্য আনয়ন করেন নাই। দুই চারি দিন দেখিয়া তবে আবার গৃহস্থালী পাতিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। রাত্রে হলুদপুরে বর্গীর আগমন জানিতে পারিয়াই জগন্নাথ সপরিবারে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন। কেবল যুবক সীতারাম একাকী গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পিতাকে বলিলেন, "আপনি সকলকে লইয়া প্রস্থান করুন, আমি আপনাদের পশ্চাৎ যাইতেছি।"

জগন্নাথের বাটীর দ্বার ভগ্ন হইবামাত্র সীতারাম পশ্চাদ্দ্বার দিয়া বাগানে প্রস্থান করিলেন, এবং এক ঘনপত্র নিবিড় বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া দস্যুদের সংহারিণী লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন। গৃহ মধ্যে চীৎকার, কোলাহল দ্রব্যাদি ও কাষ্ঠভঙ্গের শব্দ হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে বাটীর সম্মুখভাগ অগ্নির আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। সীতারাম বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের কারখানা ঘরগুলি অগ্নিসাৎ হইল। তিন চারি দণ্ড পরে সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল; কেবল উপরে একটা কক্ষ হইতে অস্ফুট কাতরধ্বনি আসিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি বৃক্ষে কাটাইয়া অতি প্রত্যূষে সীতারাম বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে বর্ষিত লণ্ড ভণ্ড খাট বিছানা ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অধিকাংশ কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্য ভগ্ন ও অর্দ্ধদগ্ধ। সীতারাম দ্রুতপদে উপরে গমন করিয়া যেখান হইতে কাতরধ্বনি আসিতেছিল, সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক বদ্ধমুখ রক্তাক্তকলেবর জ্ঞানশূন্য নরদেহ পতিত রহিয়াছে। সীতারাম দ্রুতগতি তাহার নিকট গমন করিয়া তাহার মুখের বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "এ যে বিরূপাক্ষ দাদা!" অনেক কষ্টে বিরূপাক্ষের চেতনা সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। বর্গীরা বিরূপাক্ষের কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া দিয়াছে।

৫

সীতারামের নিকট সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইয়া জগন্নাথ বলিলেন, "আর এ সাতগাঁয়ে থাকা উচিত নয়। যখন আমাদের রাজাই নাই, তখন আর কাহার আশ্রয়ে থাকিব? এখানে কাজ কর্ম্মেরও আর সুবিধা নাই। কারখানা বাটী গেল, কারিগরেরা সকলে কে কোথায় পলায়ন করিল—সকলি তাঁহার ইচ্ছা।" অনেক পরামর্শ তর্ক-বিতর্ক আন্দোলনের পর হুগলীতে গিয়া বাস

করাই যুক্তিসঙ্গত স্থির হইল। গঙ্গাতীরে বাস, তার পর নিকটেই ফৌজদারী; হুগলীতে বাস করিলে বিপদের আশঙ্কা অনেক কম।

সেই দিন সীতারাম হুগলীতে গিয়া কোনও এক আত্মীয়ের সাহায্যে একটা বাটী আপাততঃ স্থির করিয়া আসিলেন এবং জগন্নাথও পাঁজি দেখিয়া শুভ দিনে সপরিবারে হুগলীতে গমন করিলেন। কিন্তু এখানে আসিয়া আবার এক নূতন বিপদে পতিত হইলেন। হুগলীর প্রায় সকল পল্লীতেই মুসলমানের বাস। তাহাদের কুক্কুট আসিয়া জগন্নাথের বাসা বাটী অপবিত্র করিয়া দিত। কুক্কুটের এই অত্যাচার জগন্নাথের অসহ্য বোধ হইল, তিনি হুগলী ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

দুই তিন দিন পরে একদিন জগন্নাথ সন্ধ্যার সময় গঙ্গাদর্শন করিয়া আসিতেছেন, এমন সময় এক উজ্জ্বল গৌর বর্ণ সুন্দর ব্রাহ্মণযুবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। জগন্নাথ ব্রাহ্মণের পদরেণু গ্রহণ করিলেন এবং কথায় কথায় ব্রাহ্মণের সহিত নানা প্রকার আলাপ পরিচয় হইল। ব্রাহ্মণ বলি-লেন যে, সাগরপার হইতে যে একদল ম্লেচ্ছ বণিক আসিয়া হুগলীর দক্ষিণে চন্দননগর নামক স্থানে কুঠী স্থাপন করিয়াছে, তিনি তাহাদের সেই কুঠীতে কর্ম্ম করেন। বণিকদিগের কোনও কর্ম্মোপলক্ষে হুগলীতে ফৌজদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ব্রাহ্মণের নাম ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে জগন্নাথ মনে মনে স্থির করিলেন যে, একবার চন্দননগরে গিয়া চেষ্টা করিবেন যদি সেখানে বাসের কোনও সুযোগ হয়। কালবিলম্ব অবিধেয় মনে করিয়া, তিনি পর দিন প্রাতে সীতারামকে লইয়া চন্দননগর গমন করিলেন। অনেক স্থানে খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে সেই ইন্দ্রনারায়ণের সন্ধান পাইলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের আগমনের কারণ জানাইলে, চৌধুরী সযত্নে তাঁহাদিগকে আপনার আলয়ে লইয়া গেলেন এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজারাম চৌধুরীর সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণবাটী প্রসাদ পাইয়া জগন্নাথ আপনাকে চরি-তার্থ জ্ঞান করিলেন। অনন্তর জগন্নাথ, সীতারাম, রাজারাম ও ইন্দ্রনারায়ণ চারি জনে নানা স্থানে বাটী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জগন্নাথের সুবৃহৎ পরিবারের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে এরূপ বৃহৎ বাটী আপাততঃ কোথাও পাইলেন না। তখন চন্দননগরে বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ

করে নাই, সুতরাং অধিক সংখ্যক ধনবানের বাস ছিল না। গোন্দলপাড়ার হালদার মহাশয়গণ এবং খলিসানির বসু মহাশয়েরাই বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। চন্দননগরের অধিকাংশ স্থানই এই দুই প্রাচীন জমীদারদিগের অধীনে ছিল।

অবশেষে ভূমি ক্রয় করিয়া আবাসবাটী নির্ম্মাণ করাই সকলের মতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল। তখন জগন্নাথ বিদেশে এই উপকারী বন্ধুর সান্নিধ্য পরিত্যাগ করা অযৌক্তিক বলিয়া ভাবিলেন এবং তন্নিমিত্ত ইন্দ্রনারায়ণের বাটীর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত পতিত জমী ক্রয় পূর্ব্বক বেতস-বন পরিষ্কৃত করাইয়া বাটী নির্ম্মাণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন। এই ভূমি ক্রয়ে এবং অন্যান্য ব্যাপারে জগন্নাথ ইন্দ্রনারায়ণের নিকট যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে জগন্নাথের অট্টালিকা নির্ম্মিত হইলে, তিনি হুগলী হইতে পরিবারস্থ সকলকে এবং সপ্তগ্রাম হইতে জ্ঞাতিকুটুম্বগণকে চন্দননগরের বাটীতে আনাইলেন। এ দিকে তিনি ইন্দ্রনারায়ণের উদ্যোগে নবাগত ফরাসী বণিকদিগের সহিত সূত্র ও বস্ত্রের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই প্রভূত উন্নতি লাভ করিলেন। ইন্দ্রনারায়ণও ক্রমে ক্রমে নিজের অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে ফরাসী কোম্পানীর দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। হলুদপুরের কারখানা উঠিয়া চন্দননগরে আসিল। শিল্পিগণ সংবাদ পাইয়া আবার কর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিন চারি বৎসরের মধ্যে চন্দননগরের কার্পাসবস্ত্র দেশ বিদেশে প্রেরিত ও বহুমূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। জগন্নাথের কারখানায় সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র ফ্রান্সের বিলাসিনীদিগের অতিশয় স্পৃহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

জগন্নাথের বংশাবলী এখনও চন্দননগরে বিদ্যমান আছেন, কিন্তু জগন্নাথের গৌরব সে বস্ত্রের কারখানা আর নাই। তাঁহার অনুচরবর্গের বংশাবলীর কল্যাণে আজও সকলে "ফরাসডাঙ্গার ধুতি ও শাড়ী" দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু বোধ হয় মেঞ্চেষ্টারের প্রতিযোগিতায় এবং দেশীয় ধনিগণের উৎসাহ অভাবে দুই তিন পুরুষ পরে এই সূক্ষ্ম শিল্প চন্দননগর হইতে লোপ পাইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পৃথিবীর অভ্যন্তর।

সে অনেক দিনের কথা, একদিন দুই ভ্রাতায় কথক মহাশয়ের পুরাণকথা শুনিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আমার নীরস প্রাণে বোধ হয় যথার্থই পুরাণ-বৈরাগ্য ঘটিয়াছিল, তাই ফিরিয়া আসিতে না আসিতে সকল কথাই অলক্ষ্য-ভাবে আমার হৃদয় হইতে অপসৃত হইয়াছিল; কিন্তু পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর অনাবিল প্রাণে কথক মহাশয়ের প্রত্যেক কথাই যেন মহা বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিয়াছিল, তাই বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াও সে তাহাই লইয়া মহা তোলা-পাড়া করিতেছিল। আমি তাহার চিন্তার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "মেজ-দা, পাতাল কি পৃথিবীর ভিতরে? তবে আমরা বরাবর নীচের দিকে নামিয়া যাই না কেন? পৃথিবীর ভিতরটা খুব শক্ত নিরেট, না মেজ-দা? এই দেখ না আমি এত লাফালাফি কচ্চি কই মাটি ত বসে যাচ্চে না?" কথাটা প্রাণে লাগিল, যুক্তি যতই শৈশবসুলভ হউক না, কথাটা কেমন প্রাণে বাজিল। শিশুর সরল ও পবিত্র হৃদয়েই বুঝি সত্যের বেশী আভাস পাওয়া যায়। ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল। যখন কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গণিতে হইত, তখন একটি শিশুকে দুইটি অঙ্গুলির একটি অঙ্গুলি ধরিতে বলিতাম। ধরিতে দিবার আগেই একটি অঙ্গুলিকে প্রশ্নের অনুকূল ও অপরটিকে প্রতিকূল বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিতাম। শিশুর শৈশবপ্রাণে কেমন একটু পবিত্রতা, কেমন একটু অমানুষিকতা আছে যে, উহার ফলে সিদ্ধান্ত প্রায় বড় মিথ্যা হইত না! তাই বলিতে-ছিলাম, পঞ্চমবর্ষীয় সহোদরের কথাটা প্রাণে একটু বাজিল। সে অনেক দিনের কথা, সেই দিনই আমার এক সুশিক্ষিত প্রিয়তম বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিলাম, পৃথিবীর অভ্যন্তর কি সত্য সত্যই নিরেট?

বিজ্ঞানশাস্ত্র মতে এই পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী এক মহান্ জ্যোতির্ম্ময় অণ্ডের মধ্যস্থিত ছিল, ক্রমে ঐ অণ্ড (Nebula) ক্ষুভিত হইলে সঙ্কোচ বিকাশ হেতু ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল বাঁধিয়াছে। এই প্রাচীন অণ্ড মহা দীপ্তিমান্ এবং অত্যন্ত উষ্ণ ছিল। আজ যে ভূমিতলে আমরা অনায়াসে বীরমাতন করিতেছি, ও যাহার শীতল পৃষ্ঠে গড়াগড়ি দিয়া শৈশবের ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছি, ইহাও এক সময়ে সেই তেজোময় মহান্ অণ্ডের এক অংশ ছিল। ক্রমে তাহা হইতে পৃথক্ মণ্ডল বাঁধিয়াছে

এবং ক্রমশঃ শীতল হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। লর্ড কেলভিন্ (Lord Kelvin) বলেন, পৃথিবী এইরূপে ২,০০,০০,০০০ দুই কোটি বৎসর ধরিয়া শীতল হইতেছে। যেমন উপরিতলস্থ অংশ শীতল হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহা কঠিন হইয়া ফলাদির খোসার ন্যায় ভিতরকার তরল পদার্থের আবরণ হইল ; তাই কেহ কেহ পৃথিবীতলকে কমলালেবুর খোসার সহিত উপমা দিয়া ইহার অভ্যন্তর লেবুর রসের ন্যায় তরল বলিয়া স্বীকার করেন। দেখিতে পাওয়া যায়, যে সমস্ত আগ্নেয়গিরি ৫০ বৎসর ধরিয়া শীতল হইতেছে, তাহাদের অভ্যন্তর হইতে এখনও গলিত ধাতু নির্গত হয়। ইহার কারণ, উপরকার আবরণ শীতল হইয়া যত স্থূল হইতে থাকে, ততই ভিতরকার অংশ স্তরে স্তরে কম শীতল হয়, এই স্থূলতানুসারে উত্তাপ নাশের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীর পক্ষেও এই নিয়ম। বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রত্যেক ৩৪ হাতে এক এক ডিগ্রী ফারণ্‌-হাইট্ (Farhnheit) উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। অতএব এক মাইল অভ্যন্তরে ১০০° (F) তাপ বৃদ্ধি হইবে, ১০ মাইল দূরে ১০০০° তাপ বৃদ্ধি হইবে, ৩০ মাইল অভ্যন্তরে ৩০০০° তাপ বৃদ্ধি হইবে। ইহা অপেক্ষা বেশী উত্তাপপরিমাণ বৈজ্ঞানিকের কল্পনায় আসে না। বোধ হয়, পাছে ইহার অধিক তাপে আপনাদের তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক দ্রব হইয়া ক্রমে বাষ্পীভূত হইয়া যায়, সেই ভয়ে আর বেশী দূর কল্পনা লইয়া যাইতে সাহসী হন না। যাহা হউক, ইহাই অক্সি-হাইড্রোজন ব্লোপাইপের (Oxy hydrogen Blowpipe) উত্তাপ পরিমাণ। প্ল্যাটিনাম্ নামক ধাতু ইহাতে গলিয়া যায়, সৈনিকের কামান, গোলাগুলি তরবারি প্রভৃতি দ্রব হইয়া অকর্ম্মণ্য হয়, অলঙ্কারাভিমানিনীর সাধের 'সোনা' হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া যায়, আর পৃথিবীর প্রস্তরখণ্ড একেবারে তরল হইয়া যায়! অভ্যন্তরীণ তাপ অল্প নীচেই এত স্পষ্ট যে, বৈজ্ঞানিক জুড্ (Judd) সাহেব বলেন, কোন কোন শীতপ্রধান দেশে গরম জল যোগাইবার জন্য গভীর খাদ কাটিবার প্রস্তাব হইতেছে। সম্প্রতি বুদাপেস্ত (Buda-Pesth) নগরে এই অভ্যন্তরীণ উত্তাপ বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, যদি কখনও আমাদের খনিজ কয়লা ফুরাইয়া আসে, তবে এই অভ্যন্তরীণ উত্তাপ যে তখন তাহার স্থান অধিকার করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, তাপবৃদ্ধির পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ধরিলে, সহস্র মাইল দূরে পৃথিবীর অভ্যন্তরের তাপ ১,০০,০০০° এক লক্ষ ডিগ্রী হইবে, কিন্তু ইহা

কিছুতেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃতপক্ষে তাপবৃদ্ধির সীমা আছে; কারণ পৃথিবীর অভ্যন্তরে, উত্তাপের বৃদ্ধির পরিমাণ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হয় এবং কিছু দূরে উত্তাপের বৃদ্ধি আর একেবারেই অনুভূত হয় না। বিজ্ঞানবিদ্ মিল্‌ন্ (Milne) সাহেব বলেন যে, প্রায় দুই শত মাইল ভিতর পর্য্যন্ত এই উত্তাপবৃদ্ধি অল্লাধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ ধারণা হইতে পারে যে, এতদূর পরে পৃথিবীর অভ্যন্তর গলিত দ্রব্যে একটি মহাসমুদ্রবৎ। এখন দেখা যাউক, পৃথিবীর অভ্যন্তর সত্য সত্যই গলিত দ্রব্যে একটি মহাসমুদ্রবৎ তরল না কঠিন।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে এই পৃথিবীর অভ্যন্তর লইয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানজগতে নানা রহস্যময়ী কল্পনা হইতেছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে, পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে যেরূপ কিম্ভুতকিমাকার বিবিধ ধারণার উৎপত্তি হয়, তাহার চূড়ান্ত এইখানে পাওয়া যায়। পরমজ্যোতিষী কেপ্‌লার্ (Keplar) অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই পৃথিবী একটা বিকট যক্ষ বিশেষ, ইহার তিমি মৎস্যের ন্যায় নিশ্বাস প্রশ্বাস হেতু সমুদ্রে জোয়ার ভাটা হয়। এমন কি তাঁহার ধারণা ছিল, পৃথিবীর আত্মা আছে এবং ইহা স্মৃতি ও মনন-শক্তিবিশিষ্ট। হ্যালী (Halley) নামক আর এক জন জ্যোতির্ব্বিদ্ পৃথিবীর কঠিনত্ব জগদীশ্বরের অপটু রচনাচাতুর্য্যের পরিচায়ক ভাবিয়া, পৃথিবীকে লৌকিক গৃহাদির ন্যায় নানা তলবিশিষ্ট অনুমান করিয়াছিলেন। অতি পূর্ব্বকালের কথা কি, দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও পাশ্চাত্য জগতে এই ধারণা ছিল। সার্ জন্ লেস্‌লির (Sir John Leslie) মত মহা পণ্ডিতও পৃথিবীর অভ্যন্তরকে ফাঁপা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মতে ইহার ভিতর এক প্রকার অতি প্রসারশক্তিসম্পন্ন ব্যোমসদৃশ পদার্থ পাই। ক্রমে ক্রমে অপরাপর বিজ্ঞানবিদ্ কবি পণ্ডিতেরা কল্পনাবলে পৃথিবীর অভ্যন্তর অপূর্ব্ব বৃক্ষ ও পশ্বাদি সমাকীর্ণ করিয়া তুলিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ অন্ধকার দূর করিবার জন্য প্লুটো ও প্রসার্পাইন নামক দুইটি জ্যোতিষ্ক আছে। আবার কেহ কেহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া স্থির করিলেন, অভ্যন্তর আলোকিত করিবার জন্য উহাদেরও আবশ্যক নাই, ভিতরকার বায়ু, অত্যন্ত চাপপ্রযুক্ত স্বতঃই দ্যুতিমান্। সাইমন্স্ (Simmons) নামে এক জন পণ্ডিতের মতে পৃথিবীর উত্তরতম কেন্দ্রে একটি বৃহৎ ছিদ্র আছে, তাহা দ্বারাই পৃথিবীর অভ্যন্তর

আলোকিত। তিনি এই ধারণার এত দৃঢ় পক্ষপাতী ছিলেন যে, ইহার ভিতর দিয়া যাইবার জন্য হাম্বোল্ট্ (Humboldt) ও ডেভী (Davy) সাহেবকে মধ্যে মধ্যে বিশেষরূপ পীড়াপীড়িও করিতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত লোকের এই ধারণা ছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে, পৃথিবীর অভ্যন্তর লইয়া বিজ্ঞানজগতে এক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে পৃথিবীর অভ্যন্তর এখন নিরেট, কঠিন, উত্তপ্ত ও স্থির। অনেকে আগ্নেয়গিরির তরল উদ্গিরণ দেখিয়া, পৃথিবীর অভ্যন্তর তরল গলিত ধাতুর মহাসমুদ্র অনুমান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে আগ্নেয়-গিরির উৎপত্তিস্থান এই পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তরল গলিত ধাতুর সমুদ্রে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল স্থানের উদ্গিরণ সমান নহে। এমন কি, খুব নিকটবর্ত্তী দুইটি স্থান হইতে এক সময়ে যে সমস্ত গলিত ধাতু নির্গত হয় তাহাও অধিকাংশ স্থলে এত বিভিন্ন যে, তাহারা যে এক স্থান হইতে নির্গত হইতেছে, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। আগ্নেয়গিরিতত্ত্বের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; তবে ইহা স্থির যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর যদি গলিত ধাতুর সমুদ্র হইত, এবং তাহা হইতেই আগ্নেয়গিরি উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে সকল আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ সমান হইত।

আবার পৃথিবীর অভ্যন্তর যদি তরল হইত এবং পৃথিবীর মৃত্তিকাময় তলদেশ দ্বারা ঐ তরল অভ্যন্তর আবরিত থাকিত, তাহা হইলে সমুদ্রে জোয়ার ভাটা না হইয়া, বোধ হয়, মৃত্তিকার জোয়ার-ভাটা বা উত্থান পতন হইত। ইহার কারণ লর্ড কেল্‌ভিন্ বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। গণনা দ্বারা তিনি ঠিক করিয়াছেন, চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ এত বেশী যে, ৩১২ মাইল ব্যাসের একটি ইস্পাতের ফাঁপা গোলক, চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে রবারের গোলকের (Rubber ball) ন্যায় ব্যবহার করে, অর্থাৎ অনায়াসে আকর্ষণে স্ফীত হয়। অগত্যা পৃথিবীর তলদেশ যে স্ফীত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? পৃথিবীর তলদেশ স্ফীত হইলে, সেই সঙ্গে পৃথিবীতলস্থ জলদেশ উঠিত নামিত, সুতরাং জলে জোয়ার ভাটা না হইয়া ভূমিতলে জোয়ার ভাটা হইত।

পৃথিবীর অভ্যন্তর নিরেট কি তরল ইহার নির্ণয় করিতে হইলে, পৃথিবীর ভার সম্বন্ধেও একটু পর্য্যালোচনা করিতে হয়। আগ্নেয়গিরি

হইতে যে সমস্ত গলিত পদার্থ নির্গত হয়, তাহা যত গভীর স্থান হইতে আসে, ততই বেশী ভারী। অতএব, পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী পদার্থ দূরবর্ত্তী পদার্থ হইতে অপেক্ষাকৃত গুরু। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব সাধারণতঃ ৫.৫, অর্থাৎ আমাদের প্রস্তর বালুকা ও ধাতুময় পৃথিবীর ভার যদি ইহার আকারের জলময় গোলকের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর ভার, ইহারই আকারের সাড়ে পাঁচটি জলের গোলকের ভারের সমান হইবে। সেইরূপ পৃথিবীর তলদেশের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৫। অতএব, পৃথিবীর আভ্যন্তরিক কেন্দ্রগত স্থানের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ১০ হইবে। তাহা না হইলে পৃথিবীর সাধারণ গুরুত্ব গড়ে ৫.৫ হইত না। সুতরাং সমান সমান অংশ ধরিলে, পৃথিবীর তলদেশ অপেক্ষা, আভ্যন্তরিক কেন্দ্রগত স্থানের গুরুত্ব চতুর্গুণ বেশী।

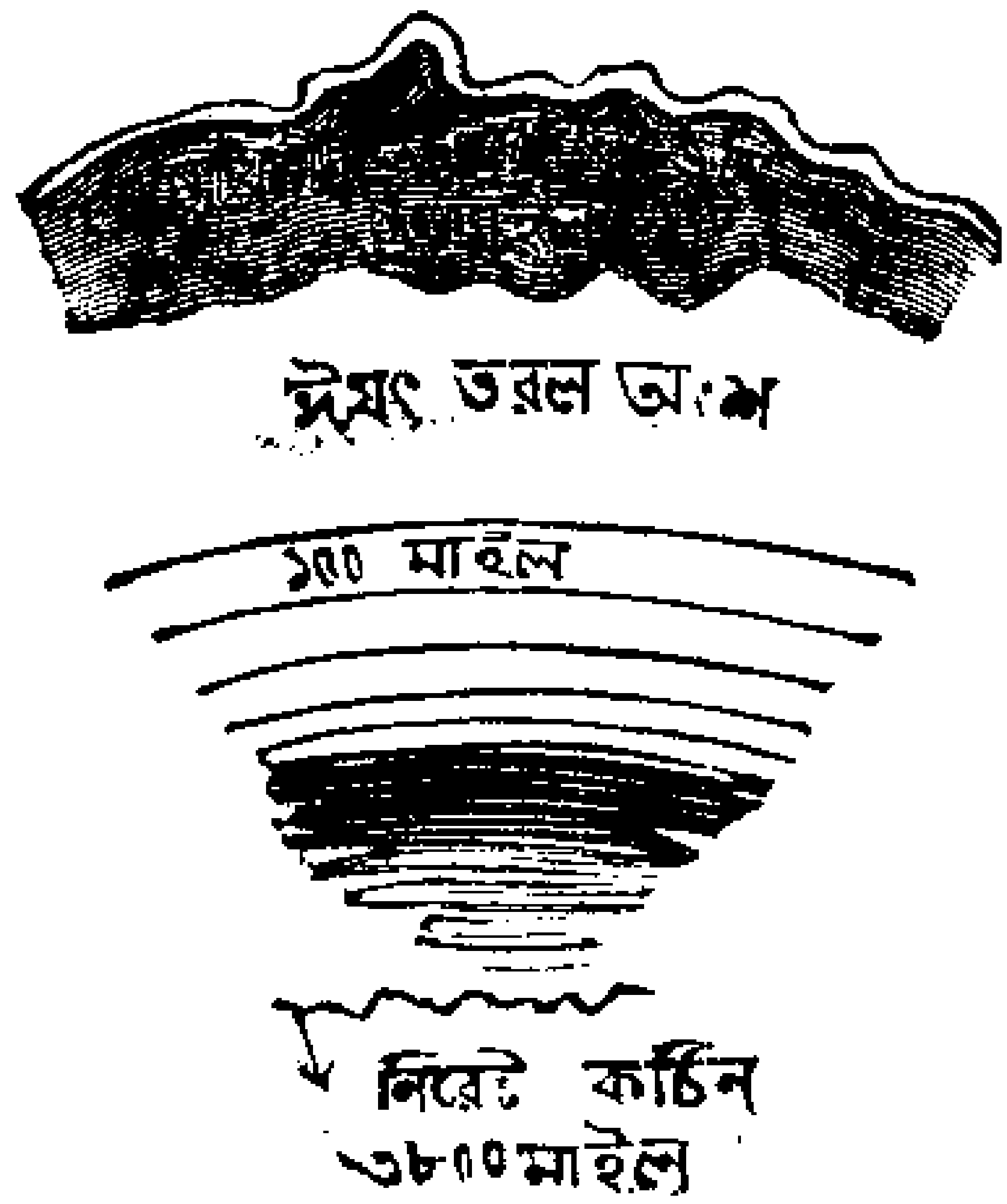
যদি পৃথিবীর তলদেশস্থ পদার্থ ও আভ্যন্তরিক কেন্দ্রগত স্থানের পদার্থের উপাদান একই প্রকার মনে করি, এবং চাপ হেতু কেন্দ্রগত স্থানের পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব চতুর্গুণ বেশী অনুমান করি, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে, পৃথিবী-তলের দুই ফুট লৌহ কি অপর কোন বস্তুর একটি ঘন চতুষ্কোণ পৃথিবীর কেন্দ্রে ১ ফুট ঘন চতুষ্কোণে পরিণত হইবে। আবার চাপ দ্বারা আকুঞ্চিত যে অংশ পৃথিবীর কেন্দ্রে ১ঘন ফুট ছিল, তাহাই চাপ সরাইয়া লইলে পৃথিবী-তলে ৪ ঘন ফুটের আকারে প্রসারিত হইবে। বৈজ্ঞানিকেরা কঠিন পদার্থের অকুঞ্চনীয়তা স্থিরীকৃত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা পরিমাণে এত অল্প যে তাহার সীমা আছে। সুতরাং এইরূপ একটি অসম্ভব আকুঞ্চনীয়তা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না। অগত্যা পৃথিবীতলস্থ পদার্থ ও তাহার কেন্দ্রগত পদার্থের উপাদান সমান ও একই হওয়া কিছুতেই বিজ্ঞানশাস্ত্রানুমোদিত নহে।

আলোকবীক্ষণ (Spectroscope) নামক একটি যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সৌর জগতের অপরাপর জ্যোতিষ্কনিচয়ের পক্ষে এই নিয়ম যে, কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে অধিকতর-গুরুত্বসম্পন্ন পদার্থের সমাবেশ দেখিতে পাই। পৃথিবীর পক্ষেও বোধ হয় এই অনুমান ও যুক্তিই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যখন অতীতের মহাক্ষোভের কোন স্খলিত খণ্ড আসিয়া আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি করিতেছিল, তখন পৃথিবীর সেই তরল শৈশবাবস্থায়, যে সমস্ত পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী, তাহারাই স্তরে

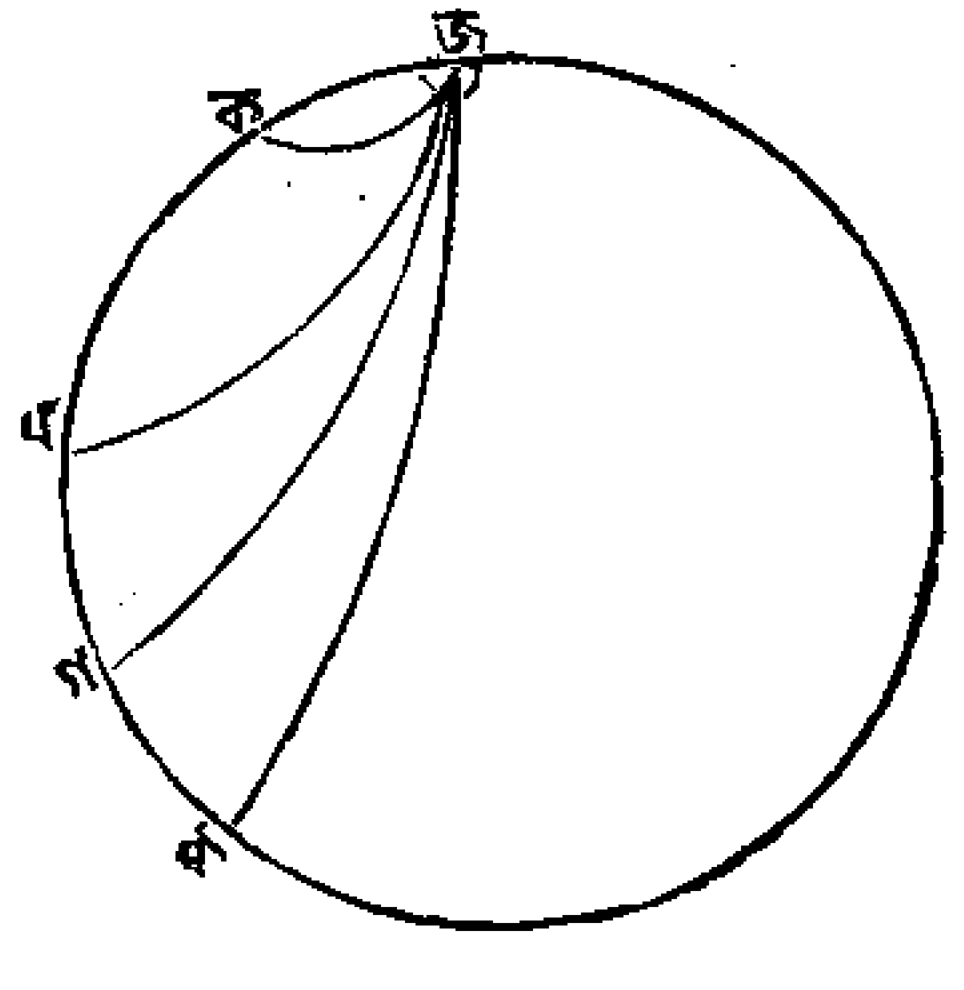
স্তরে কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং অপেক্ষাকৃত লঘু পদার্থ সকল দূরবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়াছে। আবার ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, অপেক্ষাকৃত কঠিনতর পদার্থ—যেমন প্ল্যাটিনাম্ (Platinum), ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২১, স্বর্ণ (১৯), রৌপ্য (১০), সীসক (১১), লৌহ (৭)—স্তরে স্তরে গুরুত্বানুসারে কেন্দ্রের নিকটে ও দূরে সজ্জিত আছে, এবং যে গুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব কম—যেমন সিলিকন্ (Silicon) ২·৪, এলুমিনিয়াম্ (Aluminium) ২·৫, সোডিয়াম্ (Sodium) ·২৭ কারবন্ (Carbon) ৩·৩—তাহাই ভূমিতলস্থ যাবতীয় প্রস্তর মৃত্তিকা বালুকা প্রভৃতির প্রধান উপকরণ। এই কল্পনা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক না হইলেও ইহাই যে সাধারণ নিয়ম এবং পদার্থনিচয়ের সমাবেশের ইহাই যে সাধারণ প্রবৃত্তি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশ্বক্রিয়ার সেই ঘোর আবর্ত্ত ও বিবর্ত্তে, কোন কোন লঘু পদার্থ পৃথিবীর অভ্যন্তরগত হইয়াছে, এবং কোন কোন গুরুভার-বিশিষ্ট পদার্থ পৃথিবীতলে ছট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। তাই আমাদের কাছে সোনার আদর এত বেশী, তাই বুঝি ঐশ্বর্য্যের রাজা কুবের-দেবের আবাসভূমি সেই পাতালে। আবার আমরা এলুমিনিয়াম্ এত বহুল পরিমাণে পাই যে, একখানি ইষ্টকে খাঁটি অর্দ্ধসের এই ধাতু আছে। একটি দরিদ্রের ঘরে যে পরিমাণ এলুমিনিয়ম আছে, তাহাতে একখানি বৃহৎ যুদ্ধের জাহাজ প্রস্তুত হয়। আমরা যেমন পৃথিবীতলে স্বর্ণের অভাব জন্যও কত-কটা আদর করি এবং মাটীকে মাটী জ্ঞান করি, সেইরূপ পৃথিবীর অভ্যন্তরে যদি আমাদের মত কোন প্রাণীর বাস থাকিত, তাহা হইলে, ইষ্টকের বর্ণে মোহিত হইলে, হয় ত তাহারা পাসকরা ছেলের বিবাহে একশত ভরি সোনার পরিবর্ত্তে দুইখানি পগমিলের ইট্ চাহিত কিম্বা সোনার অঙ্গুরীয়ের পরিবর্ত্তে সিলিকমের আঙ্গটীর ফর্দ্দ দিত। আবার কৃষকেরা সোনারূপার কুটির নির্ম্মাণ করিতেও কষ্ট মনে করিত না। সম্প্রতি বিজ্ঞানবিদ্ মিল্‌ন্ তাঁহার শাইড্ (Shide) মানমন্দিরে ভূমিকম্পের কম্পনপ্রবাহতত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর আবরণ বা খোসা ৫০ মাইল পৃথিবীর তলদেশ ছাড়িয়া দিলে, তাহার পর ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত পৃথিবীর অভ্যন্তর ঈষৎ তরল চট্‌চটে, তাহার পর পৃথিবীর আভ্যন্তরিক কেন্দ্র পর্য্যন্ত একেবারে নিরেট।

১৮৯৭ সালের ১২ই জুন তারিখের সেই ভীষণ ভূমিকম্পের পর সকলেই বোধ হয় ভূমিতত্ত্ব একটু আধটু আলোচনা করিয়াছেন, এবং সিস্‌মোগ্রাম, (Seismogram) সিস্‌মোগ্রাফ (Seismograph) প্রভৃতির নাম ও তাহারও

অবিদিত নাই। সিস্‌মোগ্রাফ্‌ এক প্রকার যন্ত্র। ইহা দ্বারা যেখানেই ভূমিকম্প হউক না কেন, কম্পনপ্রবাহগুলি একটি পরিবর্ত্তনশীল কাগজের ফিতার উপর ফটোগ্রাফের মত অঙ্কিত হইয়া যায়। এইরূপ ফিতাগুলিকে সিস্‌মোগ্রাম বলে। ইহা দেখিলেই কম্পনপ্রবাহের তীক্ষ্ণত্ব ও চাঞ্চল্য সমস্তই পরিষ্কার রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। কোনও স্থানে ভূমিকম্প হইলে, কম্পনপ্রবাহ যেমন পৃথিবীর তলদেশে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, তেমনই একটি সরল রেখায় পৃথিবীর অভ্যন্তর ভেদ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও ধাবিত হয়। ঐ সিস্‌মোগ্রাম দ্বারা মিল্‌ন্‌ সাহেব দেখাইয়াছেন যে, ভূমিকম্প হইলে জাপান হইতে যে সমস্ত কম্পনপ্রবাহ পৃথিবীর অভ্যন্তর দিয়া ধাবিত হয়, সেই সমস্ত কম্পন ওয়াইট্‌ দ্বীপে (Isle of Wight) ঠিক ১৬ মিনিটে পঁহুছায়। কিন্তু ঐ কম্পনপ্রবাহ যদি ইস্পাতের মধ্য দিয়া এত দূর যাইত, তাহা হইলে ইহার দ্বিগুণ সময় লাগিত। বিজ্ঞানশাস্ত্রের মতে কঠিন বস্তুর মধ্য দিয়া কম্পনপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত দ্রুত ধাবিত হয়, অর্থাৎ বস্তু যত বেশী কঠিন হইবে তাহার মধ্য দিয়া কম্পনপ্রবাহ সেই পরিমাণে দ্রুত ধাবিত হইবে। অতএব উপরি উক্ত পরীক্ষা দ্বারা অনেকটা সপ্রমাণ হয় যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ইস্পাত অপেক্ষা অন্ততঃ দ্বিগুণ কঠিন।



পার্শ্বস্থ চিত্রে গোলকের বৃত্তের পরিধিকে যদি পৃথিবীর তলদেশ অনুমান করা যায়, তবে, জ স্থানে ভূমিকম্প হইলে, যে কম্পনপ্রবাহ পৃথিবীর অভ্যন্তর দিয়া ধাবিত হয়, তাহা প্রথমে প তাহার পর গ, খ, ক, স্থানে যথাক্রমে যন্ত্রে অনুভূত হইবে। এবং যে কম্পনপ্রবাহ পৃথিবীর তলদেশ দিয়া ধাবিত হয়, তাহা তাহার পর ক্রমশঃ ক, খ, গ স্থান হইতে প স্থানে অনুভূত হয়। অতএব এই পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, যত বেশী কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান ভেদ করিয়া কম্পনপ্রবাহ ধাবিত হয়, তত বেশী দ্রুত ধাবিত হয়। অতএব



ইহা দ্বারা মিলন্ সাহেবের ধারণা যে সপ্রমাণিত হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে তাহার পরীক্ষাগুলি বিশেষরূপে আর আলোচনা করিলাম না।

আর একটি বিষয় আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। অনেকটা স্থির হইল যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর নিরেট হওয়াই সম্ভব। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর অভ্যন্তর এখনও ভয়ানক উষ্ণ। তবে কিরূপে এত উত্তাপে এই কাঠিন্য সম্ভব হয়। কারণ উত্তাপের সাধারণ নিয়ম পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি করা এবং সেই সঙ্গে কঠিন পদার্থকে দ্রব করা এবং দ্রব পদার্থকে বাষ্পীভূত করা। কিন্তু উত্তাপ দ্বারা যেমন বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ চাপ দ্বারা পদার্থের আয়তন আকুঞ্চিত হয়। অতএব যদি চাপ দ্বারা পদার্থকে আকুঞ্চিত করিয়া রাখা যায় ও তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিবার সুযোগ দেওয়া না যায়, তবে উত্তাপের নিয়ম ব্যর্থ হয়। বলিয়াছি, ২০০মাইল পর্য্যন্ত পৃথিবীর অভ্যন্তর কিঞ্চিৎ তরল, কিন্তু তাহার পর নিরেট। গণনা দ্বারা দেখা যায়, ২০০ মাইল অভ্যন্তরে পৃথিবীর চাপ প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চে ১৬কি ১৭ হাজার মণ। অতএব এই বিষম চাপ দ্বারা আকুঞ্চিত হইয়া অভ্যন্তরের পদার্থ অত্যন্ত উষ্ণ হইলেও, দ্রব হয় না; কারণ আয়তনবৃদ্ধির সুযোগ পায় না।

পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জগতে যে সমস্ত কল্পনা ছিল, সংক্ষেপে তাহা দেখাইলাম এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞান-জগতে পৃথিবীর অভ্যন্তর লইয়া যেরূপ বিশ্বাস, তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন পৃথিবীর অভ্যন্তরটা সত্য সত্যই নিরেট না বৈজ্ঞানিকদিগের মহামূল্য মস্তিষ্ক প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয়ে অক্ষম, তাহার বিচারের ভার ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক মহাশয়দের হাতেই রহিল।

শ্রীবসন্তকুমার পাল।

সহযোগী সাহিত্য।

শিল্প।

কাশ্মীরী শাল।

লোকে কথায় বলে, নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল। হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই, তাই কেহ বিধবা হইয়াছে শুনিলে, লোকে প্রথমেই বলে, "আহা! ছেলে মেয়ে

কিছু আছে ত ?"—অর্থাৎ সকল যাওয়ার অপেক্ষা কিছু থাকা ভাল। সেই হিসাবে দেশীয় শিল্প সম্বন্ধে আমাদের আনন্দপ্রকাশের অবকাশ হইয়াছে। দেশীয় শিল্পের যে পরিমাণ উন্নতি হইলে, দেশের ধন অনেকটা দেশেই থাকিত, অনেক দুঃখী দরিদ্র দুইবেলা দুই মুষ্টি আহার পাইত, আমাদের রাজনীতি-চর্চ্চা প্রাংশুলভ্য-ফললোভে উদ্বাহু বামনের চেষ্টা বলিয়া বোধ হইত না—সে পরিমাণ উন্নতি হয় নাই। কর্ম্মযোগের যে পরিমাণ অভ্যাসফলে আমরা স্বাতন্ত্র্য-বলে বলীয়ান হইয়া সমাজে পূজ্য হইতে পারিতাম, তাহা এখনও হয় নাই। তবে আনন্দপ্রকাশের অবকাশ কোথায় ? আমরা এখন বুঝিয়াছি বা বুঝিতেছি যে, দেশীয় শিল্পের উন্নতি ব্যতীত আমাদের উন্নতি-সম্ভাবনা একান্তই সুদূরপরাহত। আমাদের দারিদ্র্য এ বিষয়ে আমাদিগের ঔদাসীন্য দূর করিয়াছে—আমাদের আলস্যমুদ্রিতচক্ষু উন্মীলিত করাইয়াছে। আর কোন কোন বিদেশী এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছেন। আমাদের স্বদেশীয় কেহ বিদেশে শিল্পশিক্ষা করিতেছেন শুনিলে, আমাদের দেশে কল কারখানা সংস্থাপনের সংবাদ পাইলে আমরা সুখী হই। হাতের কাছে আমেদাবাদী ধুতি পাইলে ম্যান্‌চেষ্টারকে পরিহার করি। বিলাতী বলিলেই, দেশী ফেলিয়া গ্রহণ করি না। এখন আবার হ্যাট্‌কোটধারী আমাদের কৃষ্ণচর্ম্ম স্বদেশীয়ের পরিধানে ঢাকা, শান্তিপুর ও ফরাসডাঙ্গার ধুতি দেখিতে পাই। এখন আবার কটকের চটি গ্লাস্‌কেসে রাখিয়া বিক্রয় করিয়া বিক্রেতা লাভবান হইয়া থাকেন। এখন আবার কচিৎ কোন ধনীর গৃহসজ্জায় ইংরাজের চিনামাটীর পুত্তলির স্থানে আগ্রার প্রস্তরের খেলানা ও বিলাতী 'ভাসে'র স্থানে বিদরী ও মিনা করা 'ভাস' দেখি। এখন আবার ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন, কৃষ্ণনগরের পুত্তলি প্রভৃতি আমাদের গৃহশোভার সংবর্দ্ধন করিতেছে। ইহাতে আমরা আনন্দে অভিভূত হই। এই সময় গৃহকলহ ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বিস্মৃত হইতে পারিলে, আমাদের উন্নতির গতি দ্রুততর হইতে পারে। হইলে বড়ই ভাল হয়।

কাশ্মীরের শাল বহুমূল্য—এক সময় এ দেশের গৌরব ছিল। তাহা অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক। কাশ্মীরী শালের ব্যবসা বিলোপোন্মুখ। পূর্ব্বে যে সকলেই বহুমূল্য শাল ব্যবহার করিত, এমন নহে। ধনীর গৃহে কাশ্মীরী শাল সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইত। তাহাতে মর্য্যাদার পরিচয় পাওয়া যাইত। লক্ষ্মী চঞ্চলা, কিন্তু সর্ব্বদাই অস্তিত্ববতী; তিনি এককে পরিহার করিয়া অপরকে প্রসাদদানে কৃতার্থ করেন। ধনী দরিদ্র হয়, দরিদ্র "সম্পদে কাঁপিয়া উঠে।" ধনী তখনও ছিল—এখনও আছে। তবে এখন আর ধনীর কাছে কাশ্মীরী শালের সে আদর নাই। রাজা বিদেশী, রাজার জাতির বেশ অন্যবিধ। মুসলমান রাজ্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহ আর কোন শিল্পজাতের উপর, বিশুষ্ক ধরণীবক্ষে আষাঢ়ের ধারার মত, বর্ষিত হয় না। তবে দেশী ধনীর অভাব নাই। তাঁহাদের কাছে কাশ্মীরী শাল অনাদৃত কেন ? রুচির পরিবর্ত্তনই ইহার একমাত্র কারণ। ইহার পর সুদূর ফ্রান্সদেশে বিলাসিনীদিগের অনুগ্রহপুষ্ট হইয়া কাশ্মীরী শাল কিছু দিন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। জর্ম্মানীর সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধিল। এক দিকে বিলাসবিষজর্জ্জরিত ফ্রান্স—রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে শিবিরে 'কস্‌মেটিক' সাহায্যে গুম্ফ শোভন না করিয়া বাহিরে আসিতে অসম্মত; অপর দিকে নববলদৃপ্ত জর্ম্মানী—সপুত্র সম্রাট যুদ্ধক্ষেত্রের সকল কষ্ট সহ্য করিতেছেন—কুটবুদ্ধি বিস্‌মার্ক মন্ত্রী, রণনিপুণ মলকে সেনাপতি। ফ্রান্সের পরাজয় হইল; জর্ম্মানী ফ্রান্সের বক্ষে চরণচিহ্ন রাখিয়া, আলসাস ও লোরেণ লইয়া ক্ষতমুখ মুক্ত রাখিয়া গেল। জাতীয় দুর্গতির সময় ফ্রান্সের বিলাসরসরঙ্গিণীগণ বিলাসব্যসন ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের অনুগ্রহবঞ্চিত হইয়া কাশ্মীরী শালের ক্ষণবিলম্বিত বিলোপপ্রাপ্তি আরম্ভ

স্থায়ী হইল। আর কিছু দিন পরে কাশ্মীরী শালের কথা ইতিহাসগর্ভগত হইবে, তখন তাহার কথা কেবল ভারতের বিলুপ্ত শিল্পের বিবরণীগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সংপ্রতি কে, কে, মুখোপাধ্যায় এই সংক্ষিপ্ত নামে, অম্বালাবাসী আমাদেরই কোন স্বদেশীয় 'সোসাইটী অব আর্টসে'র 'জর্ণালে' কাশ্মীরী শালের কথা লিখিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা নিম্নে সেই প্রবন্ধাবলম্বনে কাশ্মীরী শালের কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও কাশ্মীরী শাল ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প ব্যবসা বলিয়া পরিগণিত হইত। দেশ বিদেশের লোক কাশ্মীরী শালের শিল্পনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইত। এখন সে ব্যবসা

সেকালে।

বিলুপ্তপ্রায়। যত দূর জানা যায়, তাহাতে বোধ হয় অতি প্রাচীন কাল হইতে কাশ্মীরে শালের ব্যবসা প্রচলিত ছিল। বিলাসী মোগল সম্রাটদিগের শাসনকালেই শালের ব্যবসার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি। মোগল সম্রাটদিগের বিলাস দেশের শিল্পীদিগের পক্ষে অজস্র কল্যাণের মূল ছিল। যে তাজমহল দেখিবার জন্য আজ বিদেশের ভ্রমণকারীরা ভারতে আগমন করেন—সেই সৌন্দর্য্যপ্রাসাদ নির্ম্মাণে কত শিল্পী শিল্পনৈপুণ্য লাভের শুভ অবসর লাভ করিয়াছিল! সেই বিচিত্র, লতা-পত্র-পুষ্প-খচিত প্রাচীর, সেই মুরীয় খিলানের দ্বার, সেই সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন কি ভারতে শত শিল্পীর আবির্ভাবে সহায়তা করে নাই? মোগলদিগের রাজধানীর বর্ণনা পাঠে দেখা যায়, শিল্পের উৎসাহ বর্দ্ধন মোগল সম্রাটদিগের অন্যতম কার্য্য ছিল। এখনও ভারতের নানা দিকে তাহার নিদর্শন বিক্ষিপ্ত। যেমন রাজাকে লইয়া রাজধানী, তেমনই রাজার রুচিতেই প্রজার রুচি। নহিলে আজ দেশীয় রাজন্যবর্গের ও ধনীদিগের ভবনে গভর্মেণ্টের পাব্‌লিক ওয়ার্কসের ছায়া লক্ষিত হইত না; তাঁহাদিগের প্রাসাদ-কক্ষে বিদেশের চিত্র ও উদ্যানে বিদেশিনীর মর্ম্মরমূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম না; দেশীয় গালিচা অনাদৃত ব্রাসেলসের কার্পেট আদৃত হইত না। সে কথায় আর কায নাই। তখন রাজা কাশ্মীরী শালের আদর করিতেন, প্রজার কাছেও তাহার আদর ছিল। তখন প্রত্যেক অর্থশালী পরিবারেই দুই এক জোড়া কাশ্মীরী শাল থাকিত। রাজদরবারে বা ক্রিয়া কর্ম্মের সময় গৃহকর্ত্তা কাশ্মীরী শাল ব্যবহার করিতেন। ইহাতে লোকের সামাজিক সম্মানের পরিচয় পাওয়া যাইত। সকলেই কাশ্মীরী শাল সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেন। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহাতে গর্ব্বানুভব করিত।

পূর্ব্বোক্ত কারণে তখন যথেষ্ট কাশ্মীরী শাল বিক্রীত হইত। কাশ্মীরের সকল অংশেই শাল প্রস্তুত হইত। কোন কোন গ্রামে সকল অধিবাসীই এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত।

একালে।

রমণীরা, এমন কি বালকবালিকারাও কার্য্য করিত। সহস্র সহস্র কাশ্মীরী পরিবার শালের ব্যবসায়েই জীবিকা অর্জ্জন করিত। এত শাল বিক্রীত হইত যে, তাহাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইত না। উপার্জ্জনও হইত ভাল। এখন অবস্থা পরিবর্ত্তিত। ইহার প্রধান কারণ রুচির পরিবর্ত্তন। অর্থাৎ যে সকল ধনী ষ্টুয়ার্টের কারখানায় প্রস্তুত গাড়ীতে কুকের আড়গোড়ায় ক্রীত ও মন্‌টিথের সাজে সজ্জিত অষ্ট্রেলিয়াদেশজাত অশ্ব জুড়িয়া—আপনারা র‍্যাংকেনের দোকানে প্রস্তুত ফ্রক্‌কোটে দেহ ও ওয়াট্‌সের প্রস্তুত পাদুকায় পদ সজ্জিত করিয়া ভেফিয়াদিসের দোকানে ক্রীত ইজিপ্সিয়ান্ সিগারেট টানিতে টানিতে ক্লাবে গমন করেন; সেখানে অস্‌লারের ঝাড়ে প্রজ্জলিত-বিদ্যুতা-লোক কক্ষে ল্যাজারাসের দোকানে প্রস্তুত টেব্‌লে বিলিয়ার্ড খেলেন ও শ্রান্তি বোধ করিলে পেলেটির দোকানের আহার্য্য আহার ও কেল্‌নারের O. H. M. S. পান করেন—তাঁহাদের

রূপান্তরিত ; যে সকল কুটীর বর্ত্তমান,—সে সকল দারিদ্র্যের পরিচায়ক। এখন সে সকল সুখী পরিবারও পরিবর্ত্তিত ; গ্রামবাসীরা দারিদ্র্য দুঃখপিষ্ট। তাহাদের দিনাতিপাত হওয়াই দুঃসাধ্য। অনেক স্থলে গ্রাম পরিত্যক্ত ; অধিবাসীরা জীবিকার্জ্জনোদ্দেশে অন্যত্র গমন করিয়াছে। এখন তাহারা ইমারতের কার্য্যে বা জলাশয়-খননে দিন গুজরান করিতে পারিলেই যথেষ্ট বিবেচনা করে। কেহ বা জ্বালানি কাষ্ঠ কাটে, কেহ বা পাথর ভাঙ্গে। ইহারা সকলেই মোসলমান ও শ্রমদক্ষ। যাহাদিগের সূক্ষ্ম শিল্প জগতের সর্ব্বত্র আদৃত ছিল, তাহাদের এ দুর্দ্দশা কি শোচনীয়! যাহারা সূক্ষ্ম-শিল্প-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিল, তাহারাই এখন উদরান্নের জন্য কোদালি, কুঠার, কর্ণিক ধরিতেছে!

এই সকল শিল্পীর অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য প্রমাণের জন্য লেখক দেড় শত বৎসরের পুরাতন একজোড়া শালের ছায়াচিত্র দিয়াছেন। তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় আমরা পাঠককে বিরক্ত করিতে চাহি না। যাঁহাদের গৃহে এখনও পুরাতন কাশ্মীরী শাল বৃহৎ সিন্দুকে জীর্ণ হইতেছে--তাঁহারা যদি একবার মনোযোগ দিয়া তাহার সহিত আজ কালকার প্রচলিত ও আদৃত গাত্রবস্ত্রের তুলনা করিয়া দেখেন, তবে বুঝিবেন—

"রজত ফেলিয়া দূরে—
যতন করিয়া রাঙের পশরা
তুলিয়া লয়েছ শিরে।"

এখন ষাট টাকার 'দোরোখা'ই সেরা—কিন্তু তখন ছয় শত টাকার কাশ্মীরী শাল ধনীর অঙ্গে উঠিত—প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পুরাতন কাশ্মীরী শাল এখনও ব্যবহারোপযোগী আছে। পুরাতন শালের পাড় বদলাই করিতে যাইয়া জানা গিয়াছে—সেরূপ উৎকৃষ্ট জিনিস আর প্রস্তুত হয় না ; বৃদ্ধ শালবিক্রেতা বলিয়াছে, আমি এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করি নাই, দেখিয়াছি ; আমার পুত্রগণ দেখেনও নাই। তেমন শাল আর প্রস্তুত হয় না। শালওয়ালার আর সে শাল প্রস্তুত করিবার সঙ্গতি বা প্রবৃত্তি নাই। তাহা ব্যয়সাধ্য—এক জোড়া প্রস্তুত করিতে কয়েক বর্ষ লাগে। এত দিন সংসার চলে কিসে? প্রস্তুত হইলেও কিনিবে কে? দুই এক জন দেশীয় রাজন্য মধ্যে মধ্যে দুই এক জোড়া শাল ক্রয় করিলে বা কাশ্মীরের লাঞ্ছিত মহারাজা দুই একটা শালের তাম্বু বুনাইলে একটা ব্যবসা চলে না। দেশের লোকের মধ্যে বহুলপ্রচলন ব্যতীত এ ব্যবসার পুনরুত্থান অসম্ভব। এখন পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে নকল কাশ্মীরী শাল প্রস্তুত হয়। সে সকল সস্তা। বিদেশ হইতে কলে বুনা যে শাল আসে, তাহার কাঁচা রং নয়নরঞ্জন আপাতরম্য। এখন কৃত্রিমেরই আদর ; সবই কৃত্রিম। কাজেই এখন লোক সেই সকল চটকদার জিনিস ক্রয় করিয়া অর্থের অপব্যবহার করে।

য়ুরোপের কলে বুনা শালের তুলনায় কাশ্মীরী শাল বয়নপ্রণালী অতি সহজ ও সাদা সিদা। সকলেই জানেন "তিব্বৎদেশীয় ছাগলের লোমে শাল প্রস্তুত হয়।" ছাগলের কোমল লোম পরিষ্কার করিয়া সেই সূত্রে শাল বুনা হয়। হাতের তাঁতে শাল ওপাড় বুনা হয়। ইহাই কাশ্মীরীদের বাহাদুরী। হাতের তাঁতে যেরূপ সূক্ষ্ম-শিল্প-পরিচায়ক বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহার মতন বস্ত্র প্রস্তুত করা কলের সাধ্যাতীত। কাশ্মীরী শাল নির্ম্মাতা শালে যে সকল বর্ণের ব্যবহার করে, সে সকল রসায়নবিদের পরীক্ষাগারে প্রস্তুত নহে, পরন্তু স্বভাবজ ;—পাকা। কাশ্মীরী শাল নির্মাতৃগণের বিশ্বাস কাশ্মীরের কতকগুলি নির্ঝর ও হ্রদের জল বিশেষগুণসম্পন্ন, সে জলে বস্ত্র কাচিলে বর্ণ পাকা হয়। কাশ্মীরী শাল সেই জলে ধৌত করা হয়। তেমন সুন্দর ও পাকা রং প্রায়ই দেখা যায় না।

শাল বয়ন।

এখন কথা—এই ব্যবসার পুনরুত্থান সম্ভব কি না? যদি শালের আদর হয়, তবে এ ব্যবসার পুনরুত্থান অসম্ভব নহে। কারণ, যাহারা, শাল প্রস্তুত করিত, তাহারা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, জাতীয় ব্যবসার বিলোপে তাহারা উদরান্ন-সংস্থান-চেষ্টায় নানাস্থানে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত। সামান্য লাভের আশায় তাহারা আবার স্বদেশে আসিয়া জাতীয় ব্যবসায় মন দিতে পারে। কিন্তু শাল কিনিবে কাহারা? লেখক বলেন, দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশাপিষ্ট ভারতে ইহার আদরের আশা নাই। আমরা এই স্থলে লেখক মহাশয়ের সহিত মতভেদ প্রকাশে সাহসী হইতেছি। ভারতের চিরবর্দ্ধনশীল দারিদ্র্যের কথা এখন অল্পমূল্যের মুদ্রার মত সর্ব্বত্র প্রচলিত। কন্‌গ্রেস্‌-মণ্ডপে বক্তার বজ্রকণ্ঠে এই কথা ঘোষিত হয়; সংবাদপত্র সাহায্যে এই বিশ্বাস সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তরেও সঞ্চারিত হয়; বৈঠকখানায়, ট্রামগাড়ীতে, বন্ধু-সম্মিলনে এই কথা প্রচারিত হয়। ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের স্থান এ নহে। তাহার বিচার করিতে হইলে—দেশের পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিতে হয়, দেশজের মূল্য কিরূপ বাড়িয়াছে ও রপ্তানীর পরিমাণ কত গুণ হইয়াছে, তাহার হিসাব করিতে হয়। আমদানী রপ্তানীর মূল্য বুঝিতে হয়।

শালের ব্যবসার পুনরুত্থান

সহযোগী সাহিত্যের স্বল্পপরিসরে সে আলোচনা সম্ভব নহে; তাহা সহযোগী সাহিত্যের উদ্দেশ্যেরও বহির্ভূত। আমরা এস্থলে এই কথামাত্র বলিব, রুচির পরিবর্ত্তন না হইলে, এদেশেও কাশ্মীরী শালের যথেষ্ট কাটতি হইতে পারে। এখন যেমন কৃষক মামুলী কন্থা ও শানুক ছাড়িয়া গ্রাসিফ্রক্ ও এনামেল পাত্র ব্যবহার করিতেছে, তেমনই যে ধনীর বংশপতি পিতামহ মুচেন চটি পায় দিয়া অনায়াসে পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিতেন, তিনি এখন ল্যাণ্ডোর যুড়া জুড়িয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করেন। শতবর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় কয়টা প্রাসাদ ছিল? পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কয়জনের আস্তাবলে বড় বড় ওয়েলার অশ্ব গৃহবিগ্রহের মত আদরে রক্ষিত হইত? এখন 'ল্যাণ্ড হোলডার্স এসোসিয়েসনে'র সভার দিনে বা 'সঙ্গীত সমাজে'র অভিনয় রজনীতে গাড়ী বাছিয়া লওয়া দায়—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সহরে কতগুলি যুড়ী ছিল? এখন যাঁহার আয় দশ সহস্র টাকা, তাঁহার গৃহসজ্জা কি পূর্ব্বের লক্ষপতির গৃহসজ্জার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট নহে? এখন ধনীর গৃহনির্ম্মাণের জন্য 'কারারা' মর্ম্মর আসে, গৃহসজ্জার জন্য কত দেশ হইতে কত কি আসে, তাহার তালিকা আর দিব না। এখন যাঁহারা ড্রেস সুটের জন্য অনায়াসে ইংরাজ দরজীর দোকানে 'চেক'কাটেন ও ইংলণ্ড হইতে জামা কাচাইয়া আনেন, বিলাতের নকল ছবি আসল বলিয়া রত্নের মূল্যে ক্রয় করেন, গভর্মেণ্টের নামের গন্ধ থাকিলে চাঁদার খাতায় সহি করিবার জন্য প্রসববেদনাতুরা গর্ভিনীর মতব্যস্ত হইয়া পড়েন, তাঁহারা কি কাশ্মীরী শাল ব্যবহার করিতে পারেন না? তাঁহাদের গৃহসজ্জায় কি কাশ্মীরী শালের ব্যবহার অসম্ভব? তবে দেশীয় চাট্‌নি যেমন য়ুরোপ হইতে সুন্দর শিশি-বদ্ধ হইয়া আসিয়া 'বিলাতী' বলিয়া বহুমূল্য ও আদৃত হয়, তেমনই য়ুরোপে আদর-লাভের পূর্ব্বে বুঝি কাশ্মীরী শাল এ দেশেও আদর পাইবে না। আমরা বক্তৃতা ও রচনার স্বাধীনতা পাইয়া ঘোষণা করি, ইংরাজ আমাদের দেশকে দরিদ্র করিতেছে। আমরা কি একবারও ভাবিয়া দেখি, আমরা আপনারাই মনুষ্য নামের অযোগ্য হইতেছি! সে কথায় আর কাজ নাই। লেখক মহাশয় বলিতেছেন, ইংলণ্ডের কৃপাদৃষ্টি হইলে, আমাদের গৌরব কাশ্মীরের শালের ব্যবসা আবার শ্রীসমুজ্জ্বল হইতে পারে। দাশরথি গাহিয়াছিলেন—

"ঘটিলে অসাধ্য ব্যাধি বৈদ্য নাহি পা'ন বিধি,
সে রোগের ঔষধ কেবল ব্রাহ্মণের পদরজ।"

"ভারতে দেবতা ব্রিটিশ এখন।" সেই ব্রিটিশের করুণাকণা দান ব্যতীত আমাদের কোন বিষয়েই উপায় নাই। এই অবসরে একটা কথা বলিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি না। বৈদ্য বড় কি কায়স্থ বড়, এই তর্কে এখন সমাজ আলোড়িত। আমরা প্রস্তাব করি জাতিভেদের নূতন ব্যবস্থা করা হউক;—ইংরাজই ব্রাহ্মণ, ভারতের আর সকল জাতিই শূদ্র।

ব্রিটিশ বিলাসীরা যদি গৃহসজ্জায় কাশ্মীরী শালের ব্যবহার করেন; ব্রিটিশ মহিলারা যদি নকল ছাড়িয়া আসল শাল পরিধান করিতে আরম্ভ করেন, তবে কাশ্মীরী শালের ব্যবসা আবার উন্নতি প্রাপ্ত হইবে। আমাদের দেশের ধনীদিগের নিকট বিলোপোন্মুখ দেশীয় শিল্পের উৎসাহপ্রাপ্তির আশা নাই; সাতসমুদ্র-তের নদী-পারবাসী নিত্যনিন্দিত ব্রিটিশ ধনিগণের কৃপাকটাক্ষই আমাদের শেষ আশা। হে কর্ম্মবীর ইংরাজ, তোমার উচ্ছিষ্ট-মুষ্টিই আমার রাজভোগ, আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিও না। আগামী কন্‌গ্রেসে এইরূপ একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিলে মন্দ হয় না। বক্তার অভাব হইবে না।

ইংলণ্ডে কাশ্মীরী শালের কাট্‌তি করিতে হইলে সেখানে ও ভারতে 'এজেণ্ট' রাখিতে হইবে। ইংলণ্ডের লোক যে মাপের, যে রকমের শাল চাহিবেন, ইংলণ্ডের 'এজেণ্ট' তাহা ঠিক করিয়া ভারতের 'এজেণ্টে'র নিকট লিখিবেন। তিনি সেই নির্দ্দেশানুসারে শাল প্রস্তুত করাইয়া লইবেন। কাশ্মীরীরা যোড়া যোড়া শাল প্রস্তুত করে, দুইখানি ঠিক একরূপ। তাহারা একরূপ শাল অনেক বুনিতে পারে। কাজেই পর্দ্দা, টেব্‌ল ঢাকা প্রভৃতির জন্য একরূপ অনেক শাল আবশ্যক হইলেও সরবরাহ করা কঠিন হইবে না। অর্থাৎ কাট্‌তি হইলে, যেমন জিনিস আবশ্যক তেমনই জিনিষ সরবরাহ করা যাইতে পারে।

আশা করি ব্যবসায়নিপুণ বিদেশী বণিকগণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই প্রস্তাবের বিষয় বিচার করিয়া, সম্ভব হইলে, আপনারা লাভবান হইবেন ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতের একটি বিলোপোন্মুখ শিল্পের মৃতপ্রায় শরীরে নবীন জীবনের সঞ্চার করিয়া ভারতবাসীর শূন্য ধন্যবাদভাজন হইবেন।

যাত্রার উদ্বোধন।

চুপ্ চুপ্, দূরে দূরে সরিয়া দাঁড়াও সবে,
যাত্রী আজ সিন্ধুপারে যায়;
বেজেছে আহ্বান-ভেরী, আর বড় নাই দেরি,
পলে পলে সময় ফুরায়;
অমূল্য দুর্ল্লভ ধন এই মহা সন্ধিক্ষণ
ব'য়ে যাবে বিষাদ-মায়ায়?
নিস্তব্ধ পুরীর-দ্বারে উত্তরিতে দাও তারে
সচেতন সজাগ আত্মায়।

তোমাদের সেবা-যত্ন সকলি বিফল করি'
যাত্রী আজ বহু দূরে যায়;
রাখ ব্যাখ্যা তত্ত্ব-তথ্য, নিষ্ফল ঔষধ-পথ্য
আর কেন? সময় ফুরায়!
আন তাই—থাকে যদি তন্ত্র মন্ত্র মহৌষধি—
রুগ্ন ভগ্ন আত্মার বোধন;
নহে, আনি দাও শান্তি, আপনার ভুলভ্রান্তি
আপনি সে করুক্ শোধন।

আপনি বিমুখ ধরা দিয়েছে বিদায় যারে,
তারে আর রাখিবে কেমনে?
ফুরালো দিনের আলো, মিছে কেন দীপ জ্বালো?
নিভে যাবে দুরন্ত পবনে।
এ পারে আসিছে রাত্রি, ও পারে পেল কি যাত্রী
প্রত্যূষের প্রথম আভাস?
আজন্মের সঙ্গী সবে বিদায় দিতেছে যবে,
আর তার কাহারে বিশ্বাস!

অভাগা পারে নি কিন্তু প্রাণান্ত বিদায় নিতে,
স্থির-নেত্রে ভাসে অশ্রুথরে;
এই সন্ধ্যা, এই রবি, এই ধরা শ্যামছবি,
মুছে যাবে এ জন্মের তরে!
বার বার মুগ্ধ হিয়া ফিরিছে বিদায় নিয়া
প্রতি অণু-পরমাণু কাছে;
হুতাশে আকুল প্রাণ নিঃশেষে করিছে পান
জন্ম উৎসে যত সুধা আছে!

জোয়ার আসিল উঠে, বাতাস লাগিল পালে,
তূর্য্যনাদ ক্রমে উঠে বাড়ি';
তটের চরণে পড়ি' আছাড়ি' মরিছে তরী,
যেতে নাহি চায় তারে ছাড়ি';

টুটে গেল মোহবন্ধ মিটে গেল দ্বিধা দ্বন্দ্ব,
ক্ষুদ্র তরী পড়িল সাঁতারে ;
ধীরে, তিল তিল ক'রে সংসার যেতেছে স'রে ;
জল স্থল ঢাকিল আঁধারে !

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

চিত্রশালা।

শীতার্ত্ত মদন।

আর্নেষ্ট জীন অবার্ট পারিসের অধিবাসী। অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি ললিতকলার আকর্ষণে কলাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তিনি ডিলারোচের নিকট শিক্ষানবিশী সারিয়া কলাচর্চ্চায় অবহিত হন। উত্তরকালে বিবিধ বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহারই অঙ্কিত একখানি প্রসিদ্ধ চিত্রের প্রতিলিপি 'সাহিত্যে'র পাঠক পাঠিকাদিগের জন্ম উপহার কল্পিত হইল। চিত্রখানির নাম 'শীতার্ত্ত মদন'। যে দেশে নিদাঘ-তাপে "মাঠ আছে কাট হয়ে, ধরা ফুটি ফাটা", সে দেশে এই 'শীতার্ত্ত' কথাটার অর্থ বুঝান আবশ্যক হইতে পারে। আমাদের দেশে "চারুলোচনা কিঙ্করী"র কঙ্কণ-কণিত মুখর-মৃণাল-ভুজধৃত ময়ূরপুচ্ছবিরচিত ব্যজনের কথা কাব্যগত হইলেও, বৎসরের অধিকাংশ কাল আন্দোলিত টানাপাখার নিম্নে সুখসম্মিলনের কথা মিথ্যা নহে। আর যে দেশে অবার্টের প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে, সে দেশে অগ্নিকুণ্ডই সুখসম্মিলন-কেন্দ্র। যে দেশে হিমাতিশয়ের ফলে স্থলচরের ও জলচরের মৃত্যু অসাধারণ ঘটনা নহে, যে দেশে হিম ঋতুতে স্বল্পায়ু দিবস কুহেলিকাচ্ছন্ন,

"স্বচ্ছ অন্ধকার মাখা রবি যেন পটে আঁকা,
কুহেলি আঁধারে ঢাকা ধরার আনন।"

সে দেশে হিম ক্লেশের নামান্তরমাত্র। তাই সে দেশে জরা হিম ঋতুর সহিত উপমিত, হিম বিরাগের পরিচায়ক, বিগত-প্রণয়-দীপ্তি দৃষ্টি "হিম আঁখি" বলিয়া কাব্যে বর্ণিত।

আলোচ্য চিত্রখানি সমালোচকগণ কর্ত্তৃক দ্বিবিধ অর্থে গৃহীত হইয়াছে। কেহ বলেন, ইহা কুসুমায়ুধের সহস্র ছলের একটি মাত্র।

"কেন দুখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল,
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল ?"

প্রেমের পথ কণ্টকাকীর্ণ, প্রেম দুঃখসহচর। বিরহের অন্ধকার নহিলে প্রেমের কিরণ স্ফুটতর হয় না ; বেদনার স্পর্শ ব্যতীত প্রেমের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। কে সাধ করিয়া যাতনা বরণ করিবে ? তাই মদন ছল করিয়া সুন্দরীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কালিদাসের কল্পিত অমরায় মহাদেবের ভয়ে অনঙ্গ আর ফুলধনু ধারণ করে না ; কিন্তু—



শীতার্ত্ত মদন।

"নয়ন-ভ্রূভঙ্গে চতুরা কামিনী
কিন্তু গো হানে যে নয়নঠার,
হৃদয়ে কামের ফুলশর জিনি'
বাজে সে সন্ধান অমোঘ তা'র।"

যাহার এত বল, তাহার নিকটে যাইতে ছলের আবশ্যক। তাই নিরস্ত্র হইয়া প্রণয়দেবতা কাতরতা জানাইয়া, রমণীর দয়ার উদ্রেক করিতেছেন। এই ছলে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবেন। তাহার পর বিশ্ববিজয়ী মদনের করস্পর্শে—

"রমণীবক্ষে রুদ্ধ প্রকৃতি
আত্ম প্রকাশ করিবে বলে ;
অটল গর্ব্ব টুটি' যা'বে তা'র—
দরবিগলিত অশ্রুজলে।"

আবার কোন কোন সমালোচকের মতে মদন প্রকৃতই কাতর। চিত্রলিখিত প্রান্তর-দৃশ্যে তরুরাজি হিমবিগলিতপত্র, প্রকৃতি ম্রিয়মাণা। রমণীর মুখে বিষাদের ছায়া। দম্পতি-কলহের হিমবাতে—মনোমালিন্যের তুষারপাতে মদন কাতর। সে ক্লেশ সহিতে পারে না, তাই অনুরাগের অগ্নিতাপে আপনার হিমজড় প্রভাব পুনরুজ্জীবিত করিতে আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রেমক্ষুধাতুর রমণী-হৃদয়ে স্নেহ-শিশির-স্নিগ্ধ করুণা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। তিনি কতক্ষণ সেই সরল, অসহায় শিশুর কাতরতা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিবেন? কন্দর্প অচিরে তাঁহার সহচর হইয়া মনোমালিন্যের কুহেলিকা অপসৃত করিবে ; তখন অন্ধকারের পর আলোকের মত এই মনোমালিন্যের অবসানে প্রেম দীপ্ততর হইয়া উঠিবে। তখন "চুম্বনে ভাসিয়া যা'বে বিষাদ—বিরাগ।"

হাজারা।

২

যদুপতি কৃষ্ণ শরাঘাতে লোকান্তরিত হইলে যদুবীরগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া নিধনপ্রাপ্ত হয়, এ সংবাদ হস্তিনায় পৌছিলে, মহাবীর অর্জ্জুন দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া যদুকুলমহিলাগণকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করেন। পথে সিন্ধুদেশ অতিক্রম করিয়া পঞ্জাবের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হইলে, আফগানস্তানের অধিবাসী অসুরদিগের সহিত যে বিবাদ উপস্থিত হয় তাহাতে পার্থ পরাজিত হন। আফগানেরা এই অবসরে যদুকুলের অনেক রমণী অপহরণ করে। তাহার পর অবশিষ্ট কয়েকজন পুরস্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া অর্জ্জুন সিন্ধুতীরে উপনীত হইলে, তক্ষশীলার দুর্দ্দান্ত তক্ষকেরা তাহাদিগকে করায়ত্ত করে। তখন অর্জ্জুন নিষ্প্রভ ও নিরস্ত্র হইয়া

বিষণ্ণবদনে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করেন। তক্ষকেরা যদুকুলের রমণীদিগের অলৌকিক রূপমাধুরী দেখিয়া বিমোহিত হয়। ইহারই কিয়ৎকাল পরে দেখিতে পাওয়া যায়, হস্তিনাপুরী তক্ষকদিগের দ্বারা কবলিত, মহারাজ পরিক্ষিৎ তক্ষক কর্ত্তৃক দংশিত। মহাভারতকার যাহাই বলুন, তক্ষশীলার অধিবাসিগণ যে তক্ষক, এবং তাহারাই যে প্রচণ্ডভাবে হস্তিনা আক্রমণ করিয়া পরীক্ষিতকে কবলিত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তক্ষশীলার অধিপতির নাম—সহস্রশীর্ষা। এই সহস্রশীর্ষার নামেই হাজারা নাম প্রথিত রহিয়াছে। আম্ব রাজ্যের অন্তর্গত এক উপত্যকা-ভূমির উপর যে বৃহৎ বিস্তৃত মণ্ডপ দেখিতে পাওয়া যায়, তদুপরি এক সুবৃহৎ দুর্গ সংস্থাপিত ছিল। কালে তক্ষশীলার প্রভাব বিলুপ্ত হইলে, তক্ষকবংশধরেরা সহস্রশীর্ষাকে দেবত্ব প্রদান করেন। তাহার পর অদ্যাবধি সেই সহস্রশীর্ষ-দেবের পূজা এই মণ্ডপ-মঞ্চে হইয়া আসিতেছে। সম্ভবতঃ কাশ্মীরের নাগ-বংশীয় রাজারা তক্ষশীলা অধিকার করেন। তাহাতেই নাগতক্ষকের সম্মিলন। কালে নাগ বলিলে যেমন সর্প বুঝাইতেছে, সর্পরাজ তক্ষকও যে সেই জাতীয় বলিয়া পরিচিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কাশ্মীর প্রসঙ্গে নাগবংশের বিবরণ লিখিত হইবে। উপস্থিত প্রস্তাবে "হাজারা" রাজ্যের সবিস্তার বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, বিবৃত করিব।

তক্ষশীলা এখন মহাবনে পরিণত। লোকে ইহাকে এখন "মহাবন"ই বলিয়া থাকে। প্রায় আড়াই সহস্র বৎসর অতীত হইল, মহাবীর সেকেন্দর (Alexander the Great) ভারত-আক্রমণ-কালে সিন্ধু নদের তীরে উপস্থিত হইয়া এই মহাবন দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার পর বৌদ্ধরাজ অশোক এই মহাবনের মধ্য দিয়া আফগানস্তানে উপনীত হন। তাঁহার জয়চিহ্ন-স্তূপ সকল অদ্যাপি সেই বনমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইতিহাস তক্ষশীলার কোন কথাই বলিতে পারে না। উহার স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কেবল তাহারই মাত্র বর্ণনা করিব।

বর্ত্তমান রাওলপিণ্ডী হইতে সিন্ধুনদের পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত স্থানকে পুরাকালে "সাচি হাজারা" বলিত। জেনারল ক্যানিংহ্যামও তাহাই কহিয়াছেন। সিন্ধুর পরপার হইতে নওসেরা পর্য্যন্ত স্থানকে পুস্কল রাজ্য কহে। তক্ষকেরা এই পুস্কল রাজ্যও অধিকার করিয়া সহস্রশীর্ষার নিয়মাধীনে আনিয়াছিল। তাহা হইলে, পুরাকালের 'সাচি হাজারা' অতি বৃহৎ বলিয়া অনুমিত হইবে।

কিন্তু মুসলমানদিগের রাজত্বকালে পুস্কল আবার স্বতন্ত্র হইয়া যায়। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট ইহাকেই "হাজারা" বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। ইহারই বিবরণ এ স্থলে সর্ব্বাগ্রে লিখিত হইবে।

জেলা ব্রিটিশ হাজারা।

জেলা ব্রিটিশ হাজারা, পেশোয়ার কমিশনরের অধীন, জেলা পেশোয়ারের উত্তর পূর্ব্ব এবং জেলা রাওলপিণ্ডীর উত্তর পশ্চিম প্রান্তে সংস্থাপিত। উত্তর অক্ষাংশ ৩৩°৪৫´ এবং ৩৫°২´ তথা পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৭২°৩৬´ এবং ৭৪°৫´। সুদূর উত্তর সীমা হইতে মানচিত্রে ইহার আকার কুশীর মত বিস্তৃত, সিন্ধু এবং ঝিলম নদীর মধ্যগত, উত্তর কাগান উপত্যকা হইতে দীর্ঘে প্রায় ৬০ মাইল, প্রস্থ যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, সেখানে ১৫ মাইল এবং সমস্ত ভূমির পরিমাণ দীর্ঘ হইতে—১২০ × ১৪০ মধ্যভাগের পরিমাণ ৫৬ মাইল। ইহার দক্ষিণ সীমায় মরী, রাওলপিণ্ডী এবং পশ্চিম সীমায় সিন্ধু প্রবাহিত থাকিয়া ইস্পাজই, পেশোয়ার ও স্বাধীন আম্ব রাজ্যকে ইহা হইতে স্বতন্ত্র রাখিয়াছে। উত্তর সীমায় কালাপাহাড় (Black-mountain), স্বাধীন সোয়াৎ রাজ্য, কাগান পর্ব্বতমালা এবং কাশ্মীর রাজ্য। পূর্ব্বসীমায় কাশ্মীর, কুনার এবং ঝিলম্ নদী।

এই বিস্তৃত বিভাগ ৫ তহসীলে বিভক্ত; যথা আটক, হরিপুর, এবটাবাদ, মানসেরা এবং তানাওয়াল।

হাজারার পরিমাণ-ফল ৩০৩৯ বর্গমাইল এবং উহা ১১৮৩টি গ্রামে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ৫টি মাত্র স্থান নগর বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, কিন্তু ১০,০০০ লোকের অধিবাস কোনও স্থানেই নাই। সমস্ত প্রদেশ পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত, নিম্নভূমির উচ্চতা (সমতল ভূপৃষ্ঠ হইতে) ১,২০০ ফিট হইতে ১৬,৭০০ ফিট পর্য্যন্ত।

ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব রমণীয়। উত্তরে তুষার-ধবলিত হিমালয়ের সীমা হইতে ক্রমে অনতিদীর্ঘ পর্ব্বতমালা গগনভেদী দেওদার (Pine) ও ওকবৃক্ষে আচ্ছন্ন। তন্নিম্নে শস্যশ্যামলা ক্ষেত্র সকল নানাবর্ণে সুশোভিত, নানা জাতীয় পক্ষিকূজনে প্রতিধ্বনিত, এবং মধ্যে মধ্যে শত শত নির্ঝরিণী ঝর ঝর শব্দে প্রবাহিত থাকিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। ক্রমোচ্চ পর্ব্বতমালা কিরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা অবগত হইলেও পাঠক কতকটা বুঝিতে পারিবেন, প্রকৃতিদেবী হাজারার সৌন্দর্য্য কেমন সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

কাগান শিখর	১০,০০০ হইতে ১৬,৭০০ ফিট্		সারবান	৬,২৪৩	ফিট্
মাকড়া	১২,৭৬২	ফিট্	খাণ্ডিয়ানি	৮,৮৪৫	"
মুশাকামুশালা	১৩,৩৭৮	"	সিঁয়াজানি	৯,৭৯৬	"
সোনী	১৩,০১২	"	মোক্ষপুরী	৯,২৩২	"
ভালেজা	৯,৬৪৪	"	চাম্বী	৮,৭৫২	"
কালাঢাকা	৯,১৫৭	"	শ্রীবান্	৫,৬৬১	"
টাঙ্গী আইল	৬,১৮৩	"	শীরখান	৪,৪১৯	"
শ্রীকোট	৭,১৫৭	"	এবটাবাদ	৪,১৫০	"
ভাইল্দা	৮,৫০৩		মানসেরা	৩,২০০	"
দোধা	৪,৫১৬	"	হরিপুর	১,৮০০	"
ত্রীরি	৪,৬০১	"	তরবেলা	১,২০০	"
বিলিয়ানা	৬,১৯২	"			

উপরি উক্ত পর্ব্বতমালার মধ্যে তিনটি সুবৃহৎ হ্রদ আছে :—

প্রথম—১০,৭১৮ফিট উচ্চ কাগান-শিখরে যে হ্রদ বর্ত্তমান, তাহার পরিমাণ ৫০০শত গজ ; তাহার নাম "সাইফুলমুলুক সরোবর"। তাহার অপর প্রান্তে দ্বিতীয়, "সুতু সরোবর" নামে যে হ্রদ বর্ত্তমান, তাহার পরিমাণ দীর্ঘে প্রায় ১ মাইল, এবং প্রস্থে ৩০০ শত গজ। ইহা ১১,১৬৬ ফিট উচ্চ শিখরে অবস্থিত। তৃতীয়টি ইহারই মত উচ্চ শিখরে মানস সরোবরের ন্যায় প্রায় অর্দ্ধমাইল গোলাকারে বিস্তৃত ; ইহার নাম দুদীবাত সরোবর। ইহার জল দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। উচ্চশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে, অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত কটাহে দুগ্ধ-রাশি সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহার নিকটস্থ খড়ী মাটির পর্ব্বত বিধৌত হইয়া যে এই জলের বর্ণ শুভ্র হইয়াছে, তাহা কেহ না বলিয়া দিলেও বুঝিতে পারা যায়। অমরনাথে উল্লিখিত শেষনাগ হ্রদ ঠিক এইরূপ। এই তিনটি সরোবরের অগাধ এবং শ্বেতবর্ণ জলের শোভা অতি বিচিত্র। চতুর্দ্দিকের গিরিশৃঙ্গ তুষারধবলিত, মধ্যে মধ্যে গগনভেদী মহীরুহ সকল দণ্ডায়মান থাকিয়া যে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে, তাহার বর্ণনা এ সামান্য লেখনীর অসাধ্য। এই সকল জলরাশি বরফের ন্যায় শীতল বলিয়া ইহার মধ্যে কোনরূপ জলজীব দেখিতে পাওয়া যায় না। কাগান উপত্যকার গূজরেরা তথায় পশুচারণও করিতে পারে না, তাই হ্রদের কুলসন্নিহিত জলও সর্ব্বক্ষণ নির্ম্মল থাকে। শীতকালে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়, সুতরাং তদুপরি ভ্রমণকারীরা অনায়াসে বেড়াইতে পারেন। সেই সময়ে হ্রদের বক্ষস্থলে

দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকের শোভা দেখিলে বিমোহিত হইয়া পড়িতে হয়। ঊর্দ্ধদিকে নির্ম্মল গগনে শুভ্র সূর্য্যকিরণ প্রভাসিত থাকিয়া যে অগ্নিকণা বর্ষণ করিতে থাকে, তাহার প্রভাবে গিরিশৃঙ্গ হইতে তুষাররাশি বিগলিত হইয়া ঝর ঝর শব্দে সহস্র সহস্র নির্ঝরিণী প্রবাহিত করিয়া হ্রদের চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। তুষার-মণ্ডিত মহীরুহগণের তুষাররাশিও ঐ উত্তাপে বিগলিত হইয়া সহস্রধারে ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। দেখিয়া বোধ হয় যেন, তরুকুল এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া, বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে নিরন্তর অবিরলধারে প্রেমাশ্রুপাত করিতেছে। হিমালয়বাসী বিহঙ্গকুল এতকাল যেখানে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারাও এখন ভয়ে কলরব করিতে করিতে আকাশপথে উড্ডীন হইতেছে। এই সকল স্থানেই স্বর্গীয় পক্ষী (Birds of Paradise) অবস্থিতি করিয়া থাকে। তাহারা যখন দলবদ্ধ হইয়া উড়িতে থাকে, তখন তাহাদের সুদীর্ঘ শোভাময় পুচ্ছ সকল হেলিয়া দুলিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে। যে সকল উপনদী এই সকল হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া সুদূর সিন্ধু এবং চন্দ্রভাগায় মিলিত হইয়াছে, তাহাদেরও গতি অপূর্ব্ব। কাশ্মীরে অবস্থিতি কালে শঙ্করাচার্য্য-শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া বিতস্তার যেরূপ বক্রগতি দেখিয়া চমকিত হইয়াছিলাম, এই সকল নদীরও সেই ভাব দেখিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। পার্ব্বতীয় কোন নদী সরলভাবে গন্তব্য পথে গমন করে না, সর্পগতির ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া সম্মুখের সমস্ত উপত্যকা-ভূমি ঘেরিয়া বেড়িয়া নিম্নপথে গমন করে। উচ্চশিখরোপরি উপবিষ্ট হইয়া এ দৃশ্য দেখিলেও বিমোহিত হইয়া পড়িতে হয়। কাগান হ্রদ হইতে কুনার শাখানদী এইরূপে ১,০৭১ মাইল পথ বেষ্টন করিয়া চন্দ্রভাগার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। সীরণ, দোড় এবং হারো শাখানদী এইরূপে যথাক্রমে ৬৩৯, ৩৯০ এবং ৪৪৪ মাইল পার্ব্বতীয় পথ অতিক্রম করিয়া সিন্ধুর গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

জলবায়ু।

হাজারার জলবায়ু বড়ই স্বাস্থ্যকর, প্রকৃতির সুন্দর শোভাই তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। ইহার দক্ষিণ প্রান্তে গ্রীষ্মের প্রভাব কিঞ্চিৎ অনুভূত হয় বটে, কিন্তু উত্তর প্রান্ত বারমাস অতিশয় শীতল থাকে। সুতরাং প্রধানতঃ শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এই তিন ঋতুই এখানে বর্ত্তমান। আগষ্ট হইতে

অক্টোবর পর্য্যন্ত তিন মাস বসন্তের প্রভাব অনুভূত হয়। তাহার পরই হেমন্তের প্রভাব বিস্তারিত হয়। তখন তুষার-পাত হইয়া সমস্ত দেশ শ্বেতবর্ণ দেখায়। ছয় সহস্র ফিট উর্দ্ধ পর্ব্বতমালা মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত বরফে আচ্ছন্ন থাকে, তাহার পর তাহা দ্রবীভূত হইয়া নিম্ন প্রদেশের নদী সকলকে প্লাবিত করিয়া ফেলে। এপ্রেল মাস হইতে গ্রীষ্মের প্রভাব অনুভূত হয় এবং ক্রমে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া জুন মাসের প্রারম্ভে গ্রীষ্মের পরিণাম বর্ষায় পরিণত হয়। তখন এরূপ মুসলধারে বর্ষা হিমালয়ের আর কোনও শৃঙ্গেই দেখিতে পাওয়া যায় না। আগষ্ট মাসে বর্ষার নিবৃত্তি হইয়া নির্ম্মল আকাশ প্রকাশিত হয়। তখন নদীপার্শ্বস্থ ক্ষেত্রসকল অকূল পাথারে ভাসিতে থাকে, এবং এইরূপে জলসিক্ত হইয়া প্রচুর শস্য উৎপন্ন করিবার শক্তি লাভ করে। তাহার পর অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন করিয়া কৃষকের আগার পূর্ণ করিয়া দেয়। গভর্ণমেণ্টের রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, হাজারায় কখনও মন্বন্তর হয় নাই। ১৮৬১ খ্রিষ্টীয় অব্দে দুর্ভিক্ষে যখন সমস্ত পঞ্জাব হাহাকারে পূর্ণ হইয়াছিল, তখন সমস্ত দেশ হাহাকার করিতেছে দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট এই আদেশ প্রচার করেন যে, যে জেলায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রবলতর, তথায় রাজকর মাপ করা হইবে। তৎকালে হাজারার ডেপুটি কমিশনর মেজর অ্যাডাম্ রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে, "হাজারায় বাকী খাজনা অনাদায় নাই, বরং উপস্থিত বর্ষে রাজকর যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। উচ্চ হাজারার প্রজাগণ উপস্থিত মন্বন্তরে শস্য বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে, এবং নিম্ন হাজরার অধিবাসিগণ ঐরূপে দেনার দায় হইতে মুক্ত আছে।" কিন্তু দেশীয় ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১৭৮৩ সংবতে (১৮৪০ খ্রিষ্টীয় অব্দে) এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত হাজারা জনশূন্যপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। শস্য টাকায় সাড়ে তিন হইতে সাড়ে চার সের পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়াছিল। পরিশেষে তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে। তাহার পর যে সকল দুর্ভিক্ষ সময়ে সময়ে ঘটে, তাহা মারাত্মক বলিয়া অনুমিত হয় না।

বর্ষার অপগমে অন্যান্য পার্ব্বতীয় দেশে যেরূপ পীড়ার আধিক্য হয়, ঘাস পাতা পচিয়া যেরূপ ম্যালেরিয়ার সঞ্চার করে, এ প্রদেশে তাহার প্রকোপ তাদৃশ হয় না। কিন্তু তাপিশতার (Enteric fever) নামক এক প্রকার জ্বর স্থানে স্থানে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায়

অবস্থিতি করে, তাহাদের মধ্যে প্রায় জ্বরের আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা প্রায় ১০ বৎসর কাল এ প্রদেশের স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিয়া ছিলাম, কিন্তু কখনও এরূপ সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হই নাই। তবে স্থানে স্থানে জলদোষে পাথরী এবং গলগণ্ডের প্রভাব যথেষ্ট দেখিয়াছি। কিন্তু এই সকল পীড়া কুনার নদীর তীরস্থ জনপদেই অধিক হইয়া থাকে।

হাজারার অধিবাসিগণ সর্ব্বক্ষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। গৃহস্থেরা ঘরদ্বার, প্রাঙ্গণ প্রতিদিন মার্জ্জন করে এবং গৃহের আবর্জ্জনা দূরে ফেলিয়া দেয় বলিয়া সাধারণতঃ পীড়ার আধিক্য হয় না। কিন্তু উচ্চ হাজারার এই সকল নিয়ম দরিদ্র-গৃহে দৃষ্ট না হইলেও, নিম্ন ভূমিতে অচিরাৎ জল সরিয়া যায় বলিয়া, কাশ্মীরের সমতলভূমিবাসী মনুষ্যদিগের ন্যায় ইহাদিগকে মোংরা দেখা যায় না।

হাজারায় নানা প্রকার খনিজ পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে চূণের প্রস্তর এবং লৌহধাতু অধিক। পুরাকালে যথেষ্ট স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত, কিন্তু এখন যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে উহা সংগ্রহের ব্যয় সঙ্কুলন হয় না।

উত্তর হিমালয়ে যে গহন বন আছে, তাহাতে প্রচুর দেওদার (Pine) বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, তাহারই জন্য কাগানে গভর্ণমেণ্টের "পাঞ্জি টিম্বার এজেন্সি" সংস্থাপিত আছে। তাহাতে প্রতি বৎসর যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে। এক একটি পুরাতন বৃক্ষ এত স্থূল যে, চারিজনে হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহা বেষ্টন করিতে পারে না। আমরা একদিন জঙ্গলের মধ্যে একটি পতিত বৃক্ষ দেখিয়াছিলাম। তাহার একপার্শ্বে কেহ দাঁড়াইলে, অন্যপার্শ্ব হইতে দণ্ডায়মান মনুষ্যকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাহার স্থূলতার উচ্চতা ৭ ফিটেরও অধিক বলিয়া বোধ হয়। আর দুই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, তাহার সুগন্ধ এমন স্নিগ্ধকর যে বহুকাল হইতে সেই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ চীনদেশে গন্ধসার (Scent) প্রস্তুত হইবার জন্য প্রেরিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যাঁহারা সুগন্ধি তৈল এবং নানাবিধ আতর প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এদিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। অন্যান্য বৃক্ষ, গৃহাদিনির্ম্মাণ কার্য্যে ও জ্বালানি কাষ্ঠে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আজি কালি তাহা হইতেই লক্ষ লক্ষ স্লিপার প্রস্তুত হইয়া রেলওয়ের কার্য্যে লাগিতেছে। তাহাতেও প্রচুর লাভ।

লোকে জঙ্গল বিভাগের ঠিকা লইয়া প্রতিবৎসর এক একটি জঙ্গল ক্রয় করে। তাহার পর দশ, কুড়ি বা পঞ্চাশ জন বাড়ুই (সূত্রধর) নিযুক্ত করিয়া প্রায় ৬ মাস কাল জঙ্গলে অবস্থিতি করিয়া প্রচুর তক্তা, স্লিপার, কড়ি, বরগা ইত্যাদি প্রস্তুত করে। পরিশেষে কতকগুলি মজুর নিযুক্ত করিয়া সেই সকল কর্ত্তিত কাষ্ঠখণ্ড নদীতীরে নামাইয়া আনে, এবং মাড় বাঁধিয়া জলে ভাসাইয়া দেয়। এই সকল মাড় ধরিবার জন্য স্থানে স্থানে ডিপো আছে। তথা হইতে উহা রেলের মালগাড়িতে বোঝাই করিয়া দিতে পারিলে যথাস্থানে পৌঁছিয়া বহুমূল্যে বিক্রীত হয়। এইরূপে কার্য্য করিয়া আমাদের পরিচিত একটি সামান্য লোক প্রচুর ধন লাভ করিয়া হাজারার সর্দ্দার (মাননীয় ব্যক্তি) বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। আমাদের দেশের কৃতবিদ্য লোকেরা সামান্য চাকুরীর জন্য লালায়িত না হইয়া যদি এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে যথেষ্ট লাভবান হইতে পারেন। ইহাতে অধিক মূলধনের প্রয়োজন নাই। দুই চারি বা পাঁচ ছয় শত টাকা সংগ্রহ করিয়া এদেশে উপস্থিত হইয়া শ্রমশীলতার পরিচয় দিতে পারিলে, ৫।৭ বৎসরের মধ্যে ধনবান হইয়া পড়িতে পারেন। আমরা তীর্থযাত্রাকালে হৃষীকেশ নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছি। তাহা পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন হিমালয় প্রদেশে ধনভাণ্ডার কত রূপেই সঞ্চিত রহিয়াছে। সিসম্ নামক (Dalbergia) এক প্রকার বৃক্ষ উপত্যকা-ভূমিতে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। দ্বারবঙ্গের অন্তর্গত পুসা পল্লীর নিকট গভর্ণমেণ্ট এই সিসমের চাষ করিয়াছিলেন, সে সকল বৃক্ষ এখন প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। একজন বঙ্গদেশীয় লোক এই সিসম বৃক্ষের ঠিকা লইয়া যথেষ্ট লাভবান হইয়াছেন। সিসম কাষ্ঠের উত্তম কড়ি, বরগা, তক্তা হইতে পারে, এবং তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় বলিয়া লোকে উহা দ্বার: দ্বার, জানালা মেজ, চৌকী প্রভৃতি গৃহসরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া থাকে। সিসম ভারতের এখন সর্ব্বত্র পরিচিত, এ ব্যবসা আরম্ভ করিলে যে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দেওদার (Pine)—বৃক্ষ কাগান জঙ্গলে বিস্তর জন্মিয়া থাকে, এক একটা বৃক্ষ তিন চারি শত ফিটেরও অধিক উচ্চ হয়। এই জন্য জাহাজের মাস্তুলের নিমিত্ত সচরাচর ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার তক্তাও গৃহকার্য্যে প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাছ কাটিয়া পর্ব্বত হইতে গড়াইয়া নদীতে ফেলিয়া উহাকে ভাসাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইতে হয়।

ফরাস নামক এক প্রকার বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, তাহার কাষ্ঠ আঁশ-হীন বলিয়া এন্‌গ্রেভারদিগের ব্যবহারে আসিতে পারে।

হাজারার সর্ব্বত্র নানাজাতীয় ফুলের অপর্য্যাপ্ত মধু জন্মিয়া থাকে, এবং এখানে উহা অতি সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার ব্যবসায়ও বেশ চলিতে পারে।

অনুসন্ধান করিলে, এ প্রদেশে অনেক পাথুরিয়া কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইতে পারে। সংপ্রতি এখানকার কালেক্টরীর হেড্‌ক্লার্ক (Mr. Hewson) একটি খনি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে যথেষ্ট কয়লা পাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মূলধনের অভাবে খনির কার্য্য যথারীতি চলিতেছে না। যদি কেহ সে কার্য্য তাঁহার হস্ত হইতে ঠিকার হারে লইতে পারেন, তাহা হইলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। খনি হইতে হোসেন আবদান রেলষ্টেশনের দূরতা ৪০।৪২ মাইলের অধিক নহে।

শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। ভাদ্র। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্কলিত "সন্ধ্যাগান" নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি সুপ্রথিত ফরাসী কবি ভিক্টর হ্যুগোর 'সেরেনাদ' নামক 'প্রসিদ্ধ' গানের অনুবাদ। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "প্রণয়পরিণাম" নামক গল্পটি পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছি। রচনাটির আদ্যোপান্ত সুমধুর হাস্যরসে অনুপ্রাণিত, কিন্তু অতিরঞ্জিত নহে। হিন্দু বয়েজ্ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মাণিকলাল প্রতিবেশিনী 'কুসুমের সঙ্গে বাল্যকাল হইতে কত খেলা করিয়াছে, * * * কিন্তু তখন ত কোনও রূপ চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করে নাই।' এক দিন মাণিক কুসুমদের বাগানে গাছে উঠিয়া পেয়ারা পাড়িতেছিল; ঠিক সেই সময়ে কুসুম মার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। তাহার 'পরিহিত বসন খানি জলসিক্ত,—পৃষ্ঠবিলম্বিত ঘনকৃষ্ণ কেশরাজির প্রান্ত দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে, আর্দ্র মুখখানি প্রভাতের সোনালি রৌদ্র লাগিয়া প্রতিমার মত চিক্ চিক্ করিতেছে। দেখিয়া মাণিক হৃদয় হারাইল।' সুতরাং 'মাণিক নিশ্বাস ফেলিয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিল। তাহার কোঁচার খুঁটে গোটা দশেক পেয়ারা। ভাল দেখিয়া গোটা দুই রাখিয়া বাকী সমস্ত বাগানে ছড়াইয়া দিল। পেয়ারায়—বিশেষতঃ কোসো পেয়ারায়—আর তাহার চিত্ত নাই।' চতুর্দ্দশবর্ষীয় মাণিক প্রেমে পড়িয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল; তাই সে

নির্ব্বিচারে সব পেয়ারা ফেলিয়া দেয় নাই! যদি সে আগে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়া পরে প্রেমে পড়িত, তাহা হইলে ভাল মন্দ বিচার না করিয়া অম্লানবদনে সব পেয়ারা ফেলিয়া দিত, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই! সেদিন রবিবার; সুতরাং মাণিক নিশ্চিন্তচিত্তে প্রেমানলে দগ্ধ হইতে লাগিল; পড়িবার ঘরে ডিক্সনারী মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িয়া মাণিক কত কি ভাবিতে লাগিল। মাণিকের সহপাঠী বন্ধু বিপিন ও শরৎ মারবেল খেলিবার জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল, কিন্তু প্রেমাতুর মাণিক সে দিন খেলিতে গেল না। তাহার পূর্ব্বরাগ যেমন সুন্দর, বিরহও তেমনই রমণীয়! 'মাণিক আর ফুট্‌বল খেলে না, জিম্‌ন্যাষ্টিক ছাড়িয়া দিয়াছে; দ্বিপ্রহরে স্কুল পালাইয়া গঙ্গা-তীরে বসিয়া কবিতা লেখে। প্রভাতে সন্ধ্যায় নানা ছলে কুসুমদের বাড়ী গিয়া কুসুমকে দেখিয়া আসে।' প্রেমিকজনসুলভ সহজাত-সংস্কারবশে মাণিক ক্রমেই কুসুমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিল। বৈশাখের শেষে স্কুল কলেজ বন্ধ হইল। একে নিদাঘের গ্রীষ্ম, তদুপরি বিরহের তাপ, মাণিকের দুর্দ্দশা সহজেই কল্পনা করা যায়! সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে মাণিকের পিস্‌তুতো ভাই প্রভাস আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভাস মাণিকের অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। মাণিক তাহাকে গুরুজনের ন্যায় খাতির করিত, ভয় করিয়া চলিত। কিন্তু বলিয়া রাখি, প্রভাস একজন নীরব কবি,—বোধ করি জন্ম-কবি। 'তাহার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রোমান্স্, কেবল প্রেমপাত্রীর অভাবে কোনও মতে প্রেমে পড়া হইতে বিরত আছে।' মাণিকের ভাবগতিক দেখিয়া প্রভাস বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—ব্যাপারটা কি? কিন্তু মাণিক কিছুতেই স্বীকার করিবে না।—সহজে কি মনের কপাট খোলা যায়? কিন্তু এক দিন মাণিকের কবিতার খাতা প্রভাসের হস্তগত হইল; সে নিপুণ 'বেদে', অনায়াসে 'সাপের হাঁড়ি' ধরিয়া ফেলিল। অবশেষে মাণিক সব স্বীকার করিল। তখন কবিবর প্রভাস মাণিকের দুঃখে বিগলিত হইয়া মাণিক-কুসুমের মিলনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে কুসুমের মন বুঝিতে হয়। কুসুম মাণিককে ভাল বাসে ত? প্রভাসের পরামর্শে মাণিক কুসুমের মন বুঝিতে গেল, এবং যে কৌশলে সে কুসুমের নিকট বিবাহপ্রস্তাবের অবতারণা করিল, তাহাও চমৎকার, কিন্তু আমাদের স্থানাভাব। কুসুমলতার উদ্দেশে লিখিত মাণিকলালের কবিতাটি পড়িয়া কুসুমের দিদি নলিনী যে দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে কেবল কুসুমই দগ্ধ হইল, মাণিকের গায়ে তাহার আঁচটি লাগিল না। কিন্তু মাণিকের অদৃষ্টে তদপেক্ষা গুরুতর দুর্গতি সঞ্চিত ছিল। প্রভাস স্থির করিল, মাণিকের বাপকে বলিয়া কুসুমের সহিত মাণিকের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিবে। কিন্তু বিড়ালের গলায় কে ঘণ্টা বাঁধে? অনেক চিন্তার পর প্রভাসই মাণিকের পিতার নিকট প্রস্তাব করিতে গেল। নন্দ চৌধুরীর সহিত প্রভাসের কথোপকথন উপভোগ-যোগ্য! দৌত্যের উপসংহারে প্রভাস বলিল, 'মাণিক বলেছে, যদি বিয়ে না হয় তা হলে ওর জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে।' চৌধুরী বলিলেন, 'মরুভূমি? ওঃ!' তামাক টানিতে টানিতে নন্দ চৌধুরী বলিলেন, 'ম্যানিকাকে ডাক।' প্রভাসের আশা হইল। তবে বোধ করি উভয়ের মিলন অসম্ভব নয়। কিন্তু মাণিক ত ভয়ে বাপের কাছে আসিতেই চাহে না। প্রভাস অনেক বুঝাইয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিল। 'মাণিক প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার পিতা আরসীর কাছে দাঁড়াইয়া একটা পাকা গোঁফ উঠাইবার চেষ্টা করিতে-ছেন। মাণিকের ছায়া আরসীতে পড়িল।' নন্দ চৌধুরী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মাণিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর এগ্‌জামিন কবে?' মাণিক বলিল, 'আর বারো দিন আছে।'

না খালি খেলিয়ে গেলিয়ে বেড়াচ্ছিস ?' 'আজ্ঞে না, খেলা বেশী করি নে।' 'তবে কি করিস্ ? লবে পড়েছিস্, না কি শুনলাম ?' মাণিক তাঁহার স্বর ও ভঙ্গিমা দেখিয়া উত্তর করিতে সাহস করিল না। দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। তাহার পিতা ধীরে ধীরে তাহার কাছে সরিয়া আসিলেন। আসিয়া বাম হস্ত দিয়া মাণিকের দক্ষিণ শ্রবণেন্দ্রিয়টি ধারণ করিলেন। করিয়া বলিলেন, 'উত্তর দিচ্ছিস্ নে যে ?' প্রেমিক নিরুত্তর। নন্দ চৌধুরীর কর-কমল-কল্পিত কতিপয় চপেটপুষ্পাঞ্জলি দক্ষিণা লইয়া মাণিকের প্রেম চম্পট দান করিল। একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি, নন্দ চৌধুরী ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার "চিকিৎসা আশু ফলপ্রদ হইল। মাণিক ছেলেটিকেও সুবোধ বলিতে হইবে। উপন্যাসের অনুকরণে প্রেমে পড়িয়াছিল, কিন্তু উপন্যাসের অনুসারে গৃহত্যাগ করিল না—বিষও খাইল না। বিষ খাইল না—তবে কুসুমের বিবাহের সময় লুচি খাইল বিস্তর।" মুক্তকণ্ঠে বলিব, নন্দ ডাক্তারের চিকিৎসাপ্রণালী অতি চমৎকার,—যথার্থই আশু ফলপ্রদ। প্রভাত বাবু গল্পটির রচনায় বিশিষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে নির্ম্মল হাস্যরস অত্যন্ত বিরল। আমাদের সাহিত্যে অতিরঞ্জন-মূলক হাস্যরসের অভাব নাই বটে, কিন্তু সাহিত্যের হিসাবে বিকৃত রস-রচনার, অতিরঞ্জনমূলক হাস্যরসের মূল্য অধিক নহে। সামাজিক বা সাময়িক 'সং' অতি সহজে প্রাকৃত জনের দন্তরুচিকৌমুদীর বিকাশ করিতে পারে, কিন্তু তাহা কখনও সাহিত্যের অঙ্গীভূত বা চিরস্থায়ী হয় না। যাহা স্বভাবসঙ্গত, মানবপ্রকৃতির অনুগত, অথচ হাস্যরসের উদ্দীপক, সাহিত্যে তাহাই বরণীয়। প্রভাত বাবুর 'প্রণয়পরিণামে' সেই হাস্যরস-নিপুণতার পরিচয় আছে। অকালপক্ক মাণিকের চপলতা মাত্র ভিত্তি করিয়া তিনি হাস্যরসের ফোয়ারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও স্বভাবের অতিরিক্ত অতিরঞ্জনের উপাদান ব্যবহার করেন নাই। ইহাই তাঁহার ক্ষমতার নিদর্শন। তাঁহার এই রস-রচনা শক্তি পূর্ণ পরিণতি লাভ করুক। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ "মগধের প্রাচীন ইতিহাসে" যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রবন্ধে বৈদিক, পৌরাণিক ও বৌদ্ধ যুগের মগধের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত "তাতার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়" নামক সাময়িক সন্দর্ভটি পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম-প্রবাসীর "হিন্দোল" নামক প্রবন্ধটি মনোজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর সহিত পঞ্চরাত্রি হিন্দোলসুখ উপভোগ করিয়াই তৃপ্ত হইয়াছিলেন, 'অধুনা হিন্দুস্থানী বিলাসিনী-গণের কিন্তু তাহাতে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় না, শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত প্রতীক্ষাও সহে না,—শ্রাবণের আরম্ভ মাত্রেই তাঁহারা উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া সুরম্য হিড়োঁরে ঝুলিতে থাকেন ও সঙ্গে সঙ্গে কমনীয় কণ্ঠে 'কজরী' গাহিয়া বিলাসীর বাসনা তৃপ্ত করেন। লেখক এই প্রবন্ধে কতিপয় 'কজরী' উদ্ধৃত করিয়াছেন। লেখকের মতে, কজরী গানে "হিন্দী সাহিত্যের কতক পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু * * কজরীর কাণ্ড প্রধানতঃ ঠেঁট (Slang হিন্দীতেই পর্য্যবসিত। অতএব, তদ্দ্বারা হিন্দী কবিত্বের, পরন্তু গদ্য সাহিত্যের সম্যক্ অবস্থা নিরূপণ সম্ভবে না।" শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ ভট্টাচার্য্যের "বাঙ্গালীর শ্রেণীবিভাগ" প্রবন্ধে এবার বিবিধ শ্রেণীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের পরিচয় দিয়াছেন। প্রসঙ্গটি সময়োপযোগী ও আলোচনার যোগ্য। "কাটজুড়ি-তীরে" শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচিত উড়িষ্যার বন্যার কাহিনী। ঘটনাটি ত্রিশ বৎসরের পুরাতন ;—লেখকের বাল্যস্মৃতি হইতে সঙ্কলিত। বন্যার বর্ণনা উপাদেয়, কিন্তু লেখকের স্মৃতিশক্তি তদপেক্ষাও প্রশংসনীয়। তাহার পর রবীন্দ্র বাবুর "নষ্টনীড়"—'চিরকুমার সভা'র পাগড়ী পরিয়া

প্রদীপ। ভাদ্র। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের "অবগুণ্ঠিতা" নামক কবিতাটি অবগুণ্ঠন। মোচন না করিলে 'প্রদীপে'র প্রথম পৃষ্ঠা ভিন্ন আর কাহারও কোনও ক্ষতি ছিল না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোমের "সীতা-বনবাসে" অমিত্রাক্ষরে রচিত ক্ষুদ্র কবিতা। কবি 'শ্যামতৃণোপরি নিদ্রায় মগনা' কোনও সুন্দরীর মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যপটে সীতার বিশেষত্ব আদৌ প্রতিফলিত হয় নাই। 'গোলাপ-অধরে মুক্তাসম স্বেদনীর, মোহমগ্ন স্নিগ্ধ আঁখি দুটি, এলায়িত শিথিল কুন্তল ও মৃণাল বাহুলতা' রঘুকুলরাজলক্ষ্মীর অনন্যসাধারণ নহে। সুতরাং কবিতাটির নাম অন্বর্থ হয় নাই। কিন্তু তাঁহার কবিত্ব শক্তি প্রশংসনীয়। "মঙ্গলের গ্রহে বিধিবৈচিত্র্য" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত কথাচ্ছলে মঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত "সাহজাহান বাদসাহের রাজৈশ্বর্য্য" নামক ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি "মূল পারসী হইতে গৃহীত।" কিন্তু ফুট নোটটি হরিসাধন বাবুর সম্পূর্ণ নিজস্ব ও তাঁহার আবিষ্কৃত মৌলিক সত্যে পরিপূর্ণ! সাহিত্যের 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' ও তাহার লেখক হরিসাধন বাবুর চক্ষুঃশূল। তাই সমালোচককে গালি দিয়া হরিসাধন বাবু নিজের গাত্র-দাহ নিবারণ করিয়াছেন। হরিসাধন বাবু যদি আমাদের গালি দিয়াই নিরস্ত হইতেন, সত্যের অপলাপ না করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিয়া কখনও লঘুতা স্বীকার করিতাম না। কিন্তু দেখিতেছি, এই সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিকটি অম্লানবদনে অসঙ্কুচিতচিত্তে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। সত্যের অনুরোধে তাহার প্রতিবাদ আবশ্যক। গত বৈশাখের সাহিত্যে তাঁহার রচিত ও 'প্রদীপে' প্রকাশিত "সাহজাহান বাদসাহের দৈনিক জীবন" নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশিত হয়। হরিসাধন বাবু বলিতেছেন, "সমালোচক মহাশয় যিনিই হউন না কেন, তিনি যে মুদিতনেত্রে, না বুঝিয়া সুঝিয়া, বা এলিয়াটের পত্রোদ্ঘাটন না করিয়াই, এলিয়াট হইতে প্রবন্ধটি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া পাঠকবর্গের নিকট আভাস দিয়াছেন, তাহা আমাদের কাছে অর্ব্বাচীন বলিয়া বোধ হইল না।" দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, এই উক্তির আদ্যো-পান্তে এক বর্ণও সত্য নাই। "সাহজাহান বাদসাহের দৈনিক জীবন" সম্বন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম,—"সাজাহান বাদশাহের দৈনিক জীবন" দ্বিতীয় প্রবন্ধ সুপাঠ্য। যাঁহাদের 'এলিয়ট' পড়িবার উপায় নাই, তাঁহারা উপকৃত হইবেন।" হরিসাধন বাবু এই মন্তব্যে অপরূপ 'আভাসে'র আঘ্রাণ পাইয়াছেন; কেন না, এইরূপ কোনও 'আভাসে'র আরোপ না করিলে সাহিত্য-সম্পাদককে গালি দিবার সুবিধা হয় না। সুতরাং হরিসাধন বাবুকে কল্পনাশক্তির উদ্বোধন করিয়া অভিনব সত্যের আবিষ্কার করিতে হইয়াছে! হরিসাধন বাবু বলিতেছেন,—"* * বুঝিয়াছি, ইংরাজের লেখা ইতিহাস ছাড়িয়া মূল গ্রন্থ অবলম্বন করিলে অনেক নূতন কথা জানিতে পারা যায়।" বটে! যিনি চিরকাল 'ইংরেজের লেখা' ইতিহাস তর্জ্জমা করিয়া 'ঐতিহাসিক' হইয়াছেন, সেই উচ্ছিষ্টভোজীর মুখে এ কথা শোভা পায় না। অন্ততঃ হরিসাধন বাবু এক বৎসর পূর্ব্বেও এ কথা বুঝিতেন না, আমরা তাহা জানি। 'ইংরাজের লেখা ইতিহাস ছাড়া' দূরে থাকুক, গত বৎসর 'কলিকাতা রিভিউ' হইতে মিসেস্ বেভারিজের লিখিত "গুলবদন বেগম" নামক প্রবন্ধটি বেমালুম আত্মসাৎ করিয়া ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসের "ভারতী'র পৃষ্ঠা কলুষিত করিতেও সত্যসন্ধ হরিসাধন বাবু বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। তবে বিদুষী মিসেস্ বেভারিজ 'ইংরাজ' নহেন, ইংরাজ-মহিলা! তাই যদি হরিসাধন বাবু তাঁহার 'লেখা ইতিহাস' না 'ছাড়িয়া' থাকেন,

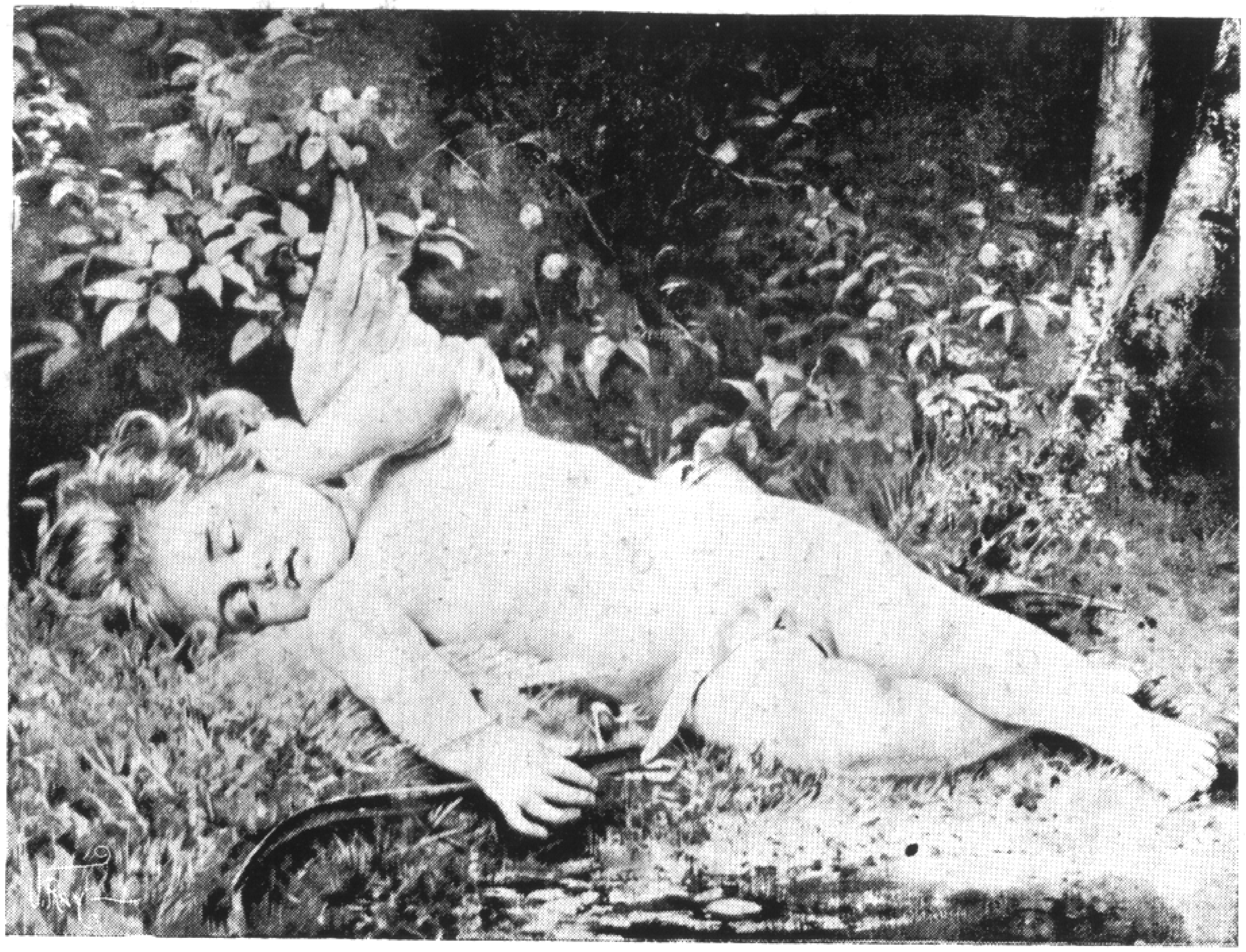
বিচারের ইতিহাস লিখিবার জন্য হরিসাধন বাবুকে উপকরণ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, হরিসাধন বাবু অনায়াসে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর রচনা 'না বলিয়া গ্রহণ' করিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিলেন! মহিলার সম্পত্তি বলিয়াও তাঁহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ হইল না! সে সঙ্কোচ থাকিলে, তিনি "গুলবদন বেগম" স্বরচিত প্রবন্ধ বলিয়া 'ভারতী'তে প্রকাশ করিয়া আর এক জন মহিলাকে,—ভারতী সম্পাদিকাকে—বিড়ম্বিত করিতেন না। হরিসাধন বাবুর এই 'ঐতিহাসিক' কীর্ত্তি সত্যের অনুরোধে, কর্ত্তব্যবোধে ১৩০৭ সালের কার্ত্তিক মাসের সাহিত্যের 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'য় যতদূর সম্ভব শিষ্ট ভাষায় কীর্ত্তিত হইয়াছিল। হরিসাধন বাবু সাহিত্যের এই ঘোরতর অপরাধ বিস্মৃত হন নাই। সেই জন্যই এতকাল পরে 'ধান ভানিতে শিবের গীত' গাহিতে বসিয়াছেন। তাই ফুটনোটে হলাহল উদ্গারণ করিতেছেন! এই অমার্জ্জনীয় অপরাধেই হরিসাধন বাবু আমাদিগকে, 'সঙ্কীর্ণচিত্ত' 'অনুদার' 'সবজান্তা' প্রভৃতি শিষ্ট বিশেষণে বিশেষিত করিয়া আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিতেছেন। তাঁহার সে সুখে বাদী হইতে চাহি না। যাহারা হরিসাধন বাবুর ন্যায় 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' প্রভৃতি অমূল্য নীতি এখনও কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই, তাহারা 'অনুদার' 'সঙ্কীর্ণচিত্ত' নয় ত কি? কিন্তু সবিনয়ে বলিতে হইতেছে, 'আমরা 'সবজান্তা' নহি; তাহা হইলে সম্ভবতঃ বহুপূর্ব্বেই হরিসাধন বাবুর গালিপুষ্পাঞ্জলির ভাগী হইতে পারিতাম! হরিসাধন বাবু বলিতেছেন, "প্রবাসীর সমালোচনা করিতে গিয়া সমালোচক মহাশয় যে অভিজ্ঞতার (?) পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রবাসী-সম্পাদক সঞ্জীবনীতে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।" হরিসাধন বাবু "প্রবাসীর" সম্পাদকের পত্র পড়িয়াই নিরস্ত হইয়াছেন; তাহার পর সেই সঞ্জীবনীতেই প্রবাসীর সম্পাদকের সত্যনিষ্ঠার যে পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বোধ করি তিনি ইচ্ছা করিয়াই দেখেন নাই। ঐতিহাসিকের সত্যনিষ্ঠা এমন মধুর, তাহা জানিতাম না! হরিসাধন বাবু বলিতেছেন,—"সাহিত্যের সবজান্তা সমালোচক মহাশয়ের বোধ হয় অজ্ঞাত নহে যে, বাঙ্গলা মাসিক সাহিত্যের প্রবন্ধলেখকদের ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া, পরিশ্রম ও শরীরপাত করিয়া, মাসিকে প্রবন্ধ যোগাইতে হয়।" আমরা সবজান্তা নহি,—তবু 'এটুকু-জান্তা', তাহা অস্বীকার করিব না। সাহিত্যসেবকদিগের নিঃস্বার্থ সাধনার পুণ্যফলেই আমাদের সাহিত্য দিব্যলাবণ্যচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত হইতেছে, তাহা জানি। কিন্তু হরিসাধন বাবুর স্মৃতিশক্তি ঐতিহাসিক ধ্যানে সমাধিস্থ না হইলে, তিনি বিপরীত দৃষ্টান্তও স্মরণ করিতে পারিতেন। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কলঙ্কিত হইবার ইচ্ছা নাই। নতুবা হরিসাধন বাবুকে তাহার অকাট্য প্রমাণ দিতে পারিতাম। হরিসাধন বাবুর শেষ অভিযোগ, আমরা তাঁহার 'প্রকৃত কর্ম্মশীল ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় বন্ধু' শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্বন্ধে 'অনুদার মত' প্রকাশ করিয়াছি। "সাহিত্য সমালোচনা করিতে গিয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ করিবার কি আবশ্যকতা আছে," তাহাও হরিসাধন বাবু বুঝিতে পারেন নাই। যদি বুঝিতেন, তাহা হইলে আলোচ্য ফুটনোটে সাহিত্য-সম্পাদককে ব্যক্তিগত আক্রমণ করিয়া ভদ্রতা ও সুরুচির পরিচয় দিতেন না। আষাঢ়ের সাহিত্যে অক্ষয় বাবুর সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক ত্রৈমাসিকের অকালমৃত্যুর জন্য আমরা আক্ষেপ করিয়াছিলাম। হরিসাধন বাবুর বিচারে তাহাই ব্যক্তিগত আক্রমণ! হরিসাধন বাবু ফুটনোটটি লিখিবার আগে যদি বিদ্বেষের চশমাখানি খুলিয়া রাখিতেন, গুলবদন বেগমের কাহিনী যদি বিস্মৃত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে 'আক্ষেপ'কে আক্রমণ ভাবিতেন না!—আমরা আবার বলিতেছি, 'ঐতিহাসিক চিত্র' সম্বন্ধে আমরা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, তাহার

প্রত্যেক বর্ণ সত্য। কোনও ঐতিহাসিক তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। হরিসাধন বাবু ফুটনোটের রচনায় সমস্ত বিদ্যা নিঃশেষিত না করিলে মূল প্রবন্ধটি সুপাঠ্য করিতে পারিতেন। 'চন্দ্রমাশালিনী নক্ষত্রকিরীটিনী নীলাকাশের গায়ে পড়িতে হইলে 'গায়ে জ্বর আসে'। তবে 'চন্দ্রমাশালী নক্ষত্রকিরীটী নীলাকাশ' লিখিলে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ঘটিত কিনা বলিতে পারি না! 'নীলাকাশের গায়ে' 'মড়া-দাহকে'ও পরাজিত করিয়াছে বটে, কিন্তু ইতিহাস ঠিক আছে! 'এক ক্রোড় স্বর্ণমুদ্রা' কি? 'ক্রোর' জানি, কোটীও বুঝি, 'ক্রোড়' শব্দে এখানে কি বুঝিব? এক 'কোঁচড়' কি হরিসাধন বাবুর অভি-প্রেত? 'ঝালরে কপোতডিম্বাকারে নানাবিধ মুক্তা দোদুল্যমান।' ঝালরে কপোত ডিম্বাকারে অশ্বডিম্ব বরং দুলিতে পারে, নানাবিধ মুক্তা কেমন করিয়া দোলে, হরিসাধন বাবু তাহা কোনও বিজ্ঞ মৌলবীকে জিজ্ঞাসা করিবেন কি? 'দিক্‌বলয় * * বাসে আকুলিত হইয়া উঠিত' কেন? 'আকুল' হইয়া বুঝি তৃপ্তি হইত না? 'বাসন্তী উৎসব' হরিসাধন বাবুর মৌলিক আবিষ্কার, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'রাজকোষে এত স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চিত থাকিত যে তাহা গণনা করা অসম্ভব।' 'থাকিত' অতীত, কিন্তু 'অসম্ভব' যে মোগলযুগ হইতে এক লম্ফ দিয়া 'বর্ত্তমানে'—ইংরেজের রাজত্বে আসিয়া পড়িতেছে! 'সকলের অপেক্ষা রাজধানীর ধনভাণ্ডারের ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি অবর্ণনীয়!' শিষ্টপ্রয়োগের অপূর্ব্ব উদাহরণ! 'এই সব অপরিমেয় স্বর্ণ রৌপ্য পাত্রাদি ভাণ্ডার হইতে বাহির হইয়া, সাধারণের চক্ষে বাদসাহের অতুল ঐশ্বর্য্যদীপ্তি প্রকাশ করিত।' পাত্রগুলি সজীব ছিল দেখিতেছি, নহিলে আপনারা 'বাহির হইতে' পারিত না! আবার ঐতিহাসিকের ইন্দ্রজাল দেখুন, তাহারা বাহির হইত, কিন্তু 'সাধারণের চক্ষে অতুল ঐশ্বর্য্যদীপ্তি প্রকাশ করিত'! কিন্তু যদি সিন্দুকে লুকাইয়া থাকিত, তাহা হইলে বোধ করি হরিসাধন বাবুর কলমের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হইত না। তাহার পর 'দীর্ঘাকার মুক্তাসমূহ'ও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! লম্বা মুক্তা! হরি-সাধন বাবু ইতিহাসের ভক্ত বটেন, কিন্তু ভূগোলের দুঃখেও উদাসীন নহেন। য়ুরোপ এত কাল 'মহাদেশ' ছিল, হরিসাধন বাবু তাহার 'দেশ' সংজ্ঞা বিধান করিয়া ভূগোলের পঙ্কোদ্ধার করিয়াছেন। শিবির সন্নিবেশেও লেখকের অভিজ্ঞতা অল্প নহে।—'এই শিবিরশ্রেণীর মধ্যে বাদসাহের শয়ন ও বিশ্রাম কক্ষ, প্রকাশ্য ও গোপনীয় দরবারগৃহ, প্রভৃতি সবই থাকিত। সর্ব্ব-মধ্যে বেগমদিগের তাঁবু।' 'সর্ব্বমধ্যে'র অভীষ্ট কি সর্ব্বমধ্যস্থলে? অথবা সাহজাহানের বন্দোবস্ত নূতনতর ছিল—তখন প্রত্যেক তাঁবুর মধ্যে বেগমদিগের তাঁবু পড়িত?—যেমন কাশীর কৌটার ভিতর কৌটা! 'বাদশাহী সফরে' সচরাচর যেরূপ ইন্দ্রজালের অভিনয় হইত, তাহা দেখিলে ভানুমতীও বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইতেন, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। যথা, 'আরবী অশ্বের উপর অশ্বারোহীরা চলিয়া যাইত!' চিরানীর সারকাসেও ঘোড়ার উপর ঘোড়-সোওয়ার চলিতে দেখি নাই! শুধু তাই নয়;—আবার 'ব্যজনী ও চামর লইয়া, চামরধারীরা থাকিত!' একহাতে চামর, একহাতে ব্যজনধারী! কি কসরৎ! আরও আছে;—'হস্তিযূথের উপর রত্নঝালরময় হাওদা'! এইরূপ ও অন্যরূপ বিবিধ রত্নভূষণে হরিসাধন বাবুর তর্জ্জমাসুন্দরী অত্যন্ত দীপ্তিমতী হইয়াছেন। হরিসাধন বাবু 'অলিন্দ'কেও অনায়াসে 'অলিন্দ্য' করিয়া-ছেন। তা' হউক, একটা য-ফলার ভারে অলিন্দ দমিবে না; তিনি যে 'ত্রিতল চতুস্তল প্রকাণ্ড সৌধগুলির, অলিন্দ্যে য-ফলা দিতে গিয়া পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গেন নাই, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। ক্রমেই পুঁথি বাড়িয়া যাইতেছে; 'বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির কথা মনে পড়িতেছে! অগত্যা হরিসাধন বাবুর রচনা-খনির সমস্ত মণিগুলি উদ্ধার করিতে পারিলাম না। উপসংহারে কৃতাঞ্জলিপুটে হরিসাধন বাবুকে জিজ্ঞাসা করি,

'ইংরাজ লেখকগণে'র অত্যাচারে জর্জ্জরিত মোগল-ইতিহাসের পুষ্টির জন্য বঙ্গীয় ব্যাকরণের মুণ্ড-স্তূপ কি নিতান্তই আবশ্যক? শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "বরযাত্রী" নক্সা ও গল্পের সংমিশ্রণ। গ্রাম্যচিত্র, রমণীয়; আখ্যানবস্তু তদনুরূপ হইলে 'সোনায় সোহাগা' হইত। শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাসের "প্লেগাসুরে"র নিকট আমরা ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত অনন্তনারায়ণ রায়ের অনন্ত "মেঘরাজ্যে" চিরপুরাতন মেঘের লীলা। দার্জ্জিলিঙ্গের একঘেয়ে কাহিনী আর ভাল লাগে না। ছবিগুলি সুন্দর। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের "হিমাচল-বক্ষে" ক্রমেই 'অচল' হইয়া উঠিতেছে। আটা ভিজাইতে এক প্যারা, লবণ-লঙ্কা-সহযোগে রুটীভক্ষণে আর এক প্যারা! তাহাতেও পাঠকের নিস্তার নাই। ক্ষুধাশান্তির পর পরিব্রাজক পরম করুণাময় পরমেশ্বরের করুণার ব্যাখ্যায় 'চারুপাঠ'কেও পরাভূত করিয়াছেন। খ্রীষ্টানদের একটা পদ্ধতি আছে, আহারের পূর্ব্বে উপাসনা,—Grace before meat. সুপ্রসিদ্ধ পরিহাস-রসিক চার্লস্ ল্যাম্ব্ বলিয়াছেন, যখন আহার্য্য-সম্মুখে রসনায় রসসঞ্চার অনিবার্য্য, তখন রসসিক্ত রসনায় ঈশ্বরের নামোচ্চারণ বিড়ম্বনা! সেই জন্যই বুঝি জলধর বাবু দশ পনের বৎসর পরে, রসনাতৃপ্তির জন্য, ভগবানের উদ্দেশে ধন্যবাদবর্ষণ করিতেছেন। যাহা হউক, করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় জলধর বাবুর কথঞ্চিৎ ক্ষুধা শান্তি হইলেও, তাঁহার বুভুক্ষু পাঠকগণের ক্ষুধার সময় উদরে কিছুই পড়িল না; সুতরাং পিত্তে গলা তিক্ত হইয়া উঠিল।

প্রবাসী। ভাদ্র। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের "গ্রহ-কঙ্কর" সুপাঠ্য জ্যোতিষিক প্রবন্ধ। তাহার পর শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর "বঙ্গ সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ।" পড়িয়া জানিলাম,—"ইহারা [ঝুমুর, তর্জা, কবি প্রভৃতি] বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন পক্ষে—বাঙ্গালীর চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে—যে সহায়তা করিয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় ইহার সামান্য অশ্লীলতা সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়।" ঝুমুর, তর্জ্জা বাঙ্গালা ভাষার 'পলি'র কাজ করিয়া থাকিবে, বাঙ্গালীর চিন্তাশীলতার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই। আর কবিওয়ালা, যাত্রাওয়ালা, তর্জ্জাদার, ঝুমুরওয়ালা প্রভৃতিই কি বাঙ্গলা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের 'অধিকর্ত্তা'? দীনেশ বাবু কি বলেন? শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "তেলেগু দেশে" সুপাঠ্য ভ্রমণকাহিনী। লেখক বলিয়াছেন, "তেলেগু দেশে ঘোড়ার গাড়ীর আমদানী হয় নাই।" আমরাও তেলেগু দেশে বসিয়া লিখিতেছি,—এই মাত্র পনী-ব্যাণ্ডি (গাড়োয়ানের ইংরাজী) চড়িয়া ভাইজ্যাগ ঘুরিয়া আসিলাম। যে যান গরুতে টানে, তাহার নাম 'ব্যাণ্ডি'; যাহা ঘোড়ায় টানে, তাহার নাম 'ঝট্‌কা'। সম্পাদকের "আণ্ডামানী" সুখপাঠ্য; বিবিধ তথ্যপূর্ণ, সুলিখিত সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত সৈয়দ এম্‌দাদ আলীর "সেকেন্দ্রা" নামক পদ্যটি উল্লেখযোগ্য। মুসলমান কবির হিন্দুপ্রীতি ও সদ্ভাব প্রশংসনীয়। 'প্রবাসীর' আর কোনও রচনা উল্লেখ-যোগ্য নহে। 'প্রবাসী'র শেষ পৃষ্ঠায় "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা" ইতিশীর্ষক একখানি বানরের ছবি অঙ্কিত দেখিতেছি। দুই পার্শ্বে দুই বানর উপবিষ্ট, একের হস্তে দর্পণ, তাহাতে বানরের প্রতিবিম্ব। রামানন্দ বাবু প্রাণপণে রসিকতার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা এই বানুরে রসিকতার রসগ্রহ করিতে পারিলাম না। "পূর্ণিমা"য় প্রবীণ ন্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, "বঙ্গদর্শনে" কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "পুণ্যে" শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী মাসিক সাহিত্যের সমালোচনা করেন, এবং সাহিত্যে এই নগণ্য লেখক মাসিক সাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে কে কে রামানন্দ বাবুর বানুরে চিত্রের উদ্দিষ্ট? কেহ কেহ বলিতেছেন, প্রয়াগতীর্থে বানরের অভাব নাই; প্রয়াগপ্রবাসী কোনও বানর আরসীতে মুখ দেখিয়াছে; তাহাই চিত্রের প্রতিপাদ্য। কিন্তু

বোধ করি, এ অনুমান সত্য নয়। কারণ, এ চিত্রের সহিত তত্রত্য আজব-বরের কাহারও মুখের সৌসাদৃশ্য দেখিতেছি না। চিত্রের বিষয় কুহেলিকায় আচ্ছন্ন বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত স্বপ্রকাশ। রামানন্দ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক। তাঁহার সৌজন্যের খ্যাতি আছে। তিনি শিক্ষকের পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মত লোকের এরূপ লঘুতা অমার্জ্জনীয়। বিরাগভাজন সমালোচকদিগকে বানর সাজাইয়া তিনি যে সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, ভদ্রসমাজের শীলতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত তাহার বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। মেঘনাদ মেঘের অন্তরাল হইতে শত্রুর প্রতি বাণসন্ধান করিত; রামানন্দ বাবুও সেই পথের পথিক!—তিনি ছবির অন্তরাল হইতে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিয়া বিদ্বেষবুদ্ধি চরিতার্থ করিতেছেন। কিন্তু দানবের চরিত্রে যে কাপুরুষতা মার্জ্জনীয়, মানবের চরিত্রে তাহার সমর্থন করা যায় না। গুপ্তঘাতী 'গুণ্ডা'র গুপ্ত আঘাতের সহিত এরূপ আক্রমণের অণুমাত্র প্রভেদ নাই। আশা করি, যাঁহারা কলম ধরিতে শিখিবার পূর্ব্বেই 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারাও ইহা অস্বীকার করিবেন না। রামানন্দ বাবু 'মানুষের মত' নিজের ভ্রম ও অপরাধ স্বীকার করুন; এবং যদি কোনও সমালোচকের কৃত সমালোচনা তাঁহার অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, প্রকাশ্য ভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়া প্রতিপক্ষকে আত্মরক্ষার অবকাশ দিন। ভদ্রতা, শীলতা, ও সুরুচির মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিলে যাহাদের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হয় না, তাহারা সারস্বত সমাজের যোগ্য নহে। নীচতাই যাহাদের একমাত্র উপজীবা, সাহিত্যের উচ্চ ব্রত গ্রহণে তাহাদের অধিকার নাই। পবিত্র সাহিত্য-মন্দির কলুষিত না করিয়া তাহারা 'কবি'র দলে প্রবেশ করুক,—'খেউড়ে'র ন্যাকারে যথেষ্ট পুষ্টি ও পর্য্যাপ্ত তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে। রামানন্দ বাবুকে সে দলের অন্তর্ভুক্ত হইতে দেখিলে আমাদের চিত্তক্ষোভের সীমা থাকিবে না।



প্রেমের সুপ্তি।

KUNTALINE PRESS.

হিমারণ্য।

দারচিন একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। প্রধান লামার মঠ, একটি প্রকাণ্ড আড়ত। ভিন্ন দেশীয় ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য দ্রব্য ও নগদ টাকা লামার নিকট গচ্ছিত রাখে। এখানে চোর ও ডাকাতের ভয় আছে, কিন্তু লামার প্রতাপে ডাকাতেরা কৈলাসের সীমার মধ্যে ডাকাতি করে না। দারচিন কৈলাসের অন্তর্গত; এখানে কোনও ভয় ভাবনা নাই। নিম্নস্থ সন্ন্যাসী যাত্রীদিগকে কৈলাস-ভ্রমণের জন্য দারচিনের লামার অনুমতি লইতে হয়। দারচিনের লামাকে চিরকুমার থাকিতে হয়। স্ত্রী গ্রহণ করিলে এই মঠের মহন্তকে গদি হারাইতে হয়। অধিক কি এই মঠে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত নাই। পূর্ব্বে যিনি লামা ছিলেন, তিনি স্ত্রীগ্রহণ করিয়া মঠ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। এখন তিনি তাম্বুর ভিতরে বাস করিতেছেন। এই ত গেল লামার বিবরণ। আমি আজ খুব ভাল স্থানে আছি, জোহারী লোকেরা আমার সেবা করিতেছে, লামার লোকেরা মধ্যে মধ্যে আমার তত্ত্ব লইতেছেন ও চা যোগাইতেছেন। যেখানে বিপদের সম্ভাবনা, সেখানেই সম্পদ। ভগবানের ইচ্ছায় সকলই হইয়া থাকে। সম্পদ বিপদ হয়, বিপদ সম্পদ হয়; বিষ অমৃত হয়, অমৃত বিষ হয়; আজ তাহাই হইল। দারচিন কৈলাসের দ্বার। দারচিনের লামা অনেক সাধুকে কৈলাস প্রবেশ করিতে দেন না, কারণ যদি ইংরেজপ্রেরিত দূত সাধুর ছদ্মবেশে আসিয়া কৈলাসের সমস্ত বিবরণ জানিয়া লয়, তাহা হইলে ধর্ম্মনষ্ট হইবে এবং রাজ্যের অনিষ্ট হইবে। লামার আশ্রয় পাইলাম, তাঁহার অতিথিরূপে গৃহীত হইলাম, আর ভয় নাই; এখন আমি অনায়াসে কৈলাস প্রদক্ষিণ করিতে পারিব। আরও শুনিলাম কৈলাস-প্রদক্ষিণ জন্য কল্য এখানে বরখার রাজা (মানসসরোবরের রাজা) আসিবেন। মানসসরোবর যাইতে হইলে বরখা হইয়া যাইতে হইবে। রাজাজ্ঞা না পাইলে মানস-সরোবরে যাওয়া ঘটিবে না। সুতরাং মনে মনে স্থির করিলাম, এক দিন এখানে অপেক্ষা করিয়া বরখার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। পর দিন প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক মঠের প্রধান লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার সঙ্গে কৈলাস ও মানসসরোবর ভ্রমণ করিবার

কথাবার্ত্তা হইল। তিনি বলিলেন,"আপনি ভয় করিবেন না, আমি আপনাকে কৈলাস-ভ্রমণের অনুমতি দিলাম। অদ্য বরখার রাজা এখানে আসিবেন, তাঁহাকে বলিয়া মানসসরোবর গমনেরও বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আপনি অদ্য এখানে বিশ্রাম করুন, কল্য আহারান্তে কৈলাস-ভ্রমণে বাহির হইবেন।" পূর্ব্বে কেহই কৈলাস পরিক্রম করিতে পারিতেন না, স্থতরাং কাহারও ভাগ্যে গৌরীকুণ্ড দর্শন ঘটে নাই। কেবল মাত্র তীর্থযাত্রীরা এই দারচিন নামক স্থানে অবস্থিতি করিয়া দূর হইতে কৈলাস সন্দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। কারণ কৈলাস অতি দুরারোহ পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে আরোহণ করিবার কোনও পথ ছিল না। এমন কি বন্য পশুরাও এই পর্ব্বতে বিচরণ করিতে পারিত না।

দারচিন কৈলাসের পাদমূলে। পুরাকালে লামারা এই স্থানে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতেন। তপস্বী লামাদিগের মধ্যে দুই এক জন সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। এক জনের নাম জিপচুন, অন্যের নাম নারোপা। জিপচুন নাংবা নামক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, এবং নারোপা ফিবা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। জিপচুনের প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল যে, তুমি কৈলাস-শিখরে আরোহণ কর ও কৈলাস পরিক্রম করিয়া কৈলাস-শিখরস্থ তীর্থ সমূহ আবিষ্কার কর।" জিপচুন দৈবারত মহাযোগী ছিলেন, তাঁহার উপাস্য দেবতা শিব। ফিবা বৌদ্ধ, নিরাকার বা শূন্যবাদী। জিপচুন স্বপ্নে ইষ্টদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। কৈলাস পরিক্রম করিবার পথ ঘাট কিছুই ছিল না। বন্যজন্তুও এই দুরারোহ পর্ব্বতে বিচরণ করিত না। তিনি ইষ্টদেবের আদেশ প্রতিপালন করিতে না পারিয়া অন্নজলপরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগাসনে আসীন হইলেন। এক দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখেন, একটী প্রকাণ্ড নেন্ (এক প্রকার বন্য ছাগ বিশেষ) হিমালয়ে আরোহণ করিতেছে। মহাত্মা সেই নেনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত বন্য ছাগ এক পর্ব্বতের সানুপ্রদেশে যাইয়া শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে অদৃশ্য হইল। লামা এই দৃশ্য দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, "কৈলাসের মধ্যে এই স্থানের কিছু বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, ইহাই তীর্থ। আর এই বন্য ছাগও প্রকৃত ছাগ নহে, দেব-প্রেরিত। আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই দেবাদিদেব মহাদেব ইহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। স্থতরাং আমাকে কিছু দিন এখানে বিশ্রাম করিয়া একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে

এখানে "নেস্তিফু" নাম দিয়া এক দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। "নেস্ত" বন্ধ ছাগ, তাহা দ্বারা আবিষ্কৃত বলিয়া এই স্থানের নাম "নেস্তিফু" হইল। উক্ত মহাত্মা এখানে কিছু দিন বাস করিয়া দেখেন, এক দিবস প্রাতঃকালে একটি "ডি" অর্থাৎ "মাদী চমরী" উর্দ্ধে উঠিতেছে। লামা ঐ চমরীকে দৈব-প্রেরিত মনে করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে চমরী এক স্থানে যাইয়া অদৃশ্য হইল। লামাও সেই স্থানের বিশেষ মাহাত্ম্য বুঝিয়া তথায় কিয়ৎকাল বাস করিলেন এবং একটি মঠ সংস্থাপন করিয়া তাহার নাম "ডিডিফু" রাখিলেন। এই ডিডিফু কৈলাসের দ্বিতীয় তীর্থ। "ডি" অর্থাৎ "চমরী" দ্বারা আবিষ্কৃত বলিয়া এই মঠের নাম "ডিডিফু" হইল। ইহাও কৈলাস পর্ব্বতের পাদমূলে। এই স্থান হইতে একটি নদী অতিক্রম করিয়া একবারে উর্দ্ধে উঠিতে হয়। মহাত্মা জিপচুনের এত উর্দ্ধে উঠিতে সাহস হইতেছে না, অথচ কৈলাস-শিখর দর্শন না করিলেও মন তৃপ্ত হইতেছে না। কি করেন, তাঁহাকে দেবতার উপর নির্ভর করিয়া এখানে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইল। এক দিন প্রভাতে উঠিয়া দেখেন, এক দল ভেরিয়া (মেষভক্ষক ব্যাঘ্র) পর্ব্বতারোহণ করিতেছে। লামাও তাহাদের সঙ্গ লইলেন। বেলা দুই প্রহরের সময় একটা প্রকাণ্ড ও উচ্চ পর্ব্বতশিখর সমীপে যাইয়া ব্যাঘ্রদল অদৃশ্য হইল। সেই প্রস্তরখণ্ড হইতে "ডোলমা" অর্থাৎ ভগবতী সাক্ষাৎভাবে লামাকে দর্শন দিয়াই প্রস্তরে বিলীন হইয়া গেলেন। জিপচুন এই স্থানকে ভগবতীর স্থান মনে করিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গৌরীকুণ্ডে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। এইটি লামার আবিষ্কৃত তৃতীয় তীর্থ।

গৌরীকুণ্ডে থাকিবার স্থান নাই। বাধ্য হইয়া সিদ্ধ মহাপুরুষকে নিম্নে অবরোহণ করিতে হইল। তিনি অবরোহণ করিতে করিতে ক্ষিবা সম্প্রদায়ের নারোপার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। যে স্থানে নারোপার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সেই স্থানে একটি মঠ আছে। সেই মঠের নাম "জমভলফ" অর্থাৎ মিলন-স্থান। এই স্থানে দুই লামাতে মিলিত হইয়াছিলেন ও বিভূতি অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য্য লইয়া বাদ প্রতিবাদ হইয়াছিল। জিপচুন বলিলেন, "আমি প্রধান যোগী," নারোপা বলিলেন, "আমি প্রধান যোগী।" এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা হওয়াতে সিদ্ধান্ত হইল, পরদিন প্রত্যুষে বাহির হইয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে কৈলাসশৃঙ্গে উপস্থিত হইতে পারিবে সে-ই প্রধান যোগী।

নারোপা প্রভাতের অনেক পূর্ব্বে জিপচুনকে না বলিয়া কৈলাসশৃঙ্গে আরোহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তখনও জিপচুনের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। সূর্য্যোদয় হইতেছে দেখিয়া তাঁহার ভৃত্য তাঁহাকে জাগরিত করিয়া দিল; তিনি উঠিয়া, যোগবলে মুহূর্ত্ত মধ্যে কৈলাস-শিখরে উপস্থিত হইলেন। তখনও নারোপা তথায় যাইতে পারেন নাই। কিছু পরে নারোপা তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নারোপাকে বিলম্বে উপস্থিত হইতে দেখিয়া জিপচুন এক পদাঘাতে তাঁহাকে নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন। নারোপা যে পথে নিম্নে পড়িয়াছিলেন, অদ্যাপি কৈলাস-শিখরে বরফের উপরে একটি কৃষ্ণবর্ণ রেখাস্বরূপ সেই পথ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে, নারোপা ক্রোধান্ধ হইয়া এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত জিপচুনের মাথার উপর চাপাইয়া দেন। জিপচুন দুই হাতে সেই পর্ব্বত ধারণ করেন। অদ্যাপি সেই পর্ব্বতে জিপচুনের দুই হস্তের অঙ্গুলির চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান আছে। জিপচুন ও নারোপা যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানে দুইটি মন্দির আছে। এই ত্ গেল কৈলাস আবিষ্কারের ইতিহাস।

আমি দুই তিন জন বৃদ্ধ লামার নিকট হইতে ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছি। সে যাহা হউক, পাঠকবর্গের স্মরণার্থ লিখিতেছি যে, আমি দারচিনের লামা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এখানে এক দিবস থাকিব বলিয়া প্রতিশ্রুত আছি। এখানে যখন আমাকে এক দিবস অপেক্ষা করিতে হইল, তখন বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া আসনচ্যুত ভূতপূর্ব্ব লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। লামা একটা বৃহৎ তাম্বুতে থাকেন, এই এক তাম্বুর মধ্যেই বৈঠকখানা, শয়নাগার, তোষাখানা, গুদাম, রন্ধনশালা প্রভৃতি। তাম্বুর চারিদিকেই সুবৃহৎ নিশান, নিশানে তিব্বতীয় ভাষায় নানাবিধ মন্ত্র লিখিত। তাম্বুর দ্বারদেশে ৪।৫ টি কুকুর। এই কুকুর ভুটিয়া-পরিচ্ছদধারী প্রান্তসীমাবাসিদিগকে কিছু বলে না, কিন্তু ইহাদের যত ক্রোধই বিদেশীয়দিগের প্রতি। আমি বিদেশী, কুকুরগণ আমাকে দেখিয়া ভয়ানক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু রক্ষা এই যে কুকুরগণ লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল। কুকুরের রব শুনিয়া লামার লোক বাহিরে আসিল ও আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। লামা গদি হারাইলেও দরিদ্র নহেন। ইঁহার তাম্বুতে ৫।৬ জন পরিবার ও পরিচারিকা আছে। লামার স্ত্রীও অতি সরল লোক; ইঁহাদের আতিথেয়তায় আমি অতিশয় প্রীত হইলাম। লামার তাম্বু সেই

দেশের ধরণে সুসজ্জিত, চারিদিকে বেঞ্চের ন্যায় কাষ্ঠাসন। কাষ্ঠাসনের উপরে খুব মোটা ও ভাল কম্বলের গদি। এই আসনের সম্মুখে আবার কাষ্ঠাসন, এই কাষ্ঠাসনে চার পেয়ালা, ছাতুর কৌটা ও মাখন প্রভৃতি আহারীয় বস্তু সুসজ্জিত। তাহার পর আবার কাষ্ঠাসন, এই কাষ্ঠাসনে দেবমূর্ত্তি এবং গ্রন্থ। এই দেবমূর্ত্তি ও গ্রন্থ আলোকমালায় পরিবেষ্টিত। দেবমূর্ত্তি মধ্যে চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্ত্তি, বৌদ্ধমূর্ত্তি ও অষ্টভুজা শক্তিমূর্ত্তিই প্রধান। আরও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহা কোন্ দেবমূর্ত্তি আমি ঠিক করিতে পারি নাই। লামার ওখানে কেহ অতিথি উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ গদির নিকটে একখানি কাষ্ঠাসন আসিবে। এই কাষ্ঠাসনের উপরিভাগে ছাতু, মাখন ও চার পেয়ালা সুসজ্জিত হইবে। এই চার পেয়ালা গুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত, অতি সুন্দর ও পরিপাটি। লামা যে কেবল আমাকেই এই সব আহার দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, তাহা নহে। তাঁহার তাম্বুতে যে যায়, সে-ই এইরূপ সাদরে অভ্যর্থিত হয়। আমার সঙ্গী ভৃত্যেরাও এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়াছিল। পদচ্যুত লামা আমাকে 'কাশী লামা' বলিয়া অতি সম্মানের সহিত স্বীয় আসনে বসাইলেন। লামাটি জ্ঞানী, বেদান্তে বিশেষ অধিকার আছে। ইঁহার সঙ্গে বেদান্ত সম্বন্ধে ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ইনি, ইংরেজরাজ্য ২।৩ বার ভ্রমণ করিয়াছেন্। অল্প পরিমাণে হিন্দি লিখিতে ও পড়িতে পারেন; চিত্রবিদ্যাও নিপুণ। ইঁহার নিজের চিত্রিত কয়েক খানি বৌদ্ধমূর্ত্তি ও কৈলাসের প্রতিকৃতি দেখাইলেন। ইঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। ইনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আমি এখন মঠচ্যুত; যদি মঠে থাকিতাম, তবে কৈলাস ও মানসসরোবর ভ্রমণের সমস্ত বন্দোবস্ত আমিই করিয়া দিতাম। কি করিব, বিধি প্রতিকূল।" আরও বলিলেন, "ইহার জন্য আমি দুঃখিত নহি; বিবাহ করা উচিত মনে করিয়াই বিবাহ করিয়াছি। এখন এই ভাবেই জীবন কাটাইব। কৈলাসে দেহত্যাগ করিব।" ইঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া বাসায় আসিলাম। ইঁহার নিকট বিদায় লইবার সময় বলিলেন, "কৈলাস প্রদক্ষিণ করিয়া যাইবার সময় যেন আর একবার সাক্ষাৎ হয়।"

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে শুনিলাম বরখার রাজা আসিয়া-

এমন সময় আমি তথায় যাইয়া রাজোচিত সম্মান জানাইয়া, মানস-সরোবরে অবাধে যাইতে পারি এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন, "আপনি সাধু, কেহই আপনার পথরোধ করিবে না। আপনি আমার রাজধানী হইয়া যাইবেন। সেখানে আমার লোক আছে, আমি তাহাকে অদ্যই সংবাদ দিব, সে আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবে। আপনি রাজধানীতে এক রাত্রি বিশ্রাম করিয়া সরোবরে চলিয়া যাইবেন।" আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল; আমি "জয় কৈলাসপতি" বলিয়া প্রস্থান করিলাম। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় তিনি বলিলেন, "কিছু বিলম্বে আপনার ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলে, আমি আপনার আহারার্থে কিছু দিব।" আমি, "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

অনেক দিনের পর অদ্য রজনীতে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা গেলাম। মনে দারুণ চিন্তা ছিল, পাছে কোনরূপ সন্দেহ করিয়া, তিব্বতের রাজারা আমার কৈলাস-দর্শন ও মানসসরোবরে স্নানের বাধা দেন; কারণ ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, কয়েক জন সাধু দারচিন ও বরখার রাজা দ্বারা বাধা পাইয়া, শূন্যমনে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং একজন সাধু দাপাতে কয়েদও ছিলেন। তাঁহার দোষ এই যে, তিনি ইংরাজী কিতাব, ইংরাজী জুতা ও বস্ত্র সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলেন; ইহার জন্যই এই শাস্তি। সুতরাং আমি সাধু বা তিব্বত-ভ্রমণেচ্ছুদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন কখনই কোনও প্রকার ইংরাজী বস্ত্র সঙ্গে না রাখেন অথবা তীর্থ ভিন্ন অন্য স্থানে না যান এবং ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ের অনুসন্ধান না করেন। অদ্য আমার সেই চিন্তা দূরীভূত হইয়াছে, আর কোনও প্রকার চিন্তা আসিয়া আমার মনকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না। এই সব বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হওয়া আমার সাধ্যের অতীত। দেবকৃপা না হইলে কিছুতেই কেহ অবাধে কৈলাসপতির দর্শন ও মানস-সরোবরে স্নান করিতে পারে না। আমি দেবকৃপায় অদ্য সমস্ত জঞ্জাল হইতে উত্তীর্ণ হইলাম এবং দেবকৃপাতেই আমার সমস্ত সুবিধা হইল। উত্তর কাশী হইতে যাত্রার দিন আমি সংকল্প করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে আরম্ভ করি, প্রতিদিনই নিয়মিতরূপে চণ্ডী পাঠ করিয়া আসিতেছি, অদ্য আমার সেই পাঠের ফল ফলিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, আমার অভীষ্ট দেবীর মূর্ত্তি আমি মাথায় করিয়া বহিয়া লইয়া যাইতেছি, অবস্থানুযায়ী পূজাদিও করিতেছি; আমার এই পূজার ফলও ফলিল। আমি গুরুদেব ও ইষ্ট

দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম। আমার জীবনদাতা পরমসহায় অজ্ঞানতিমিরনাশক গুরুদেবের কৃপাকণা সর্ব্বদাই আমাকে রক্ষা করিতেছে। আমার যাহা কিছু হইতেছে, হইয়াছে ও হইবে, তাহা একমাত্র গুরুপ্রসাদের ফল। এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিব্বতের হিমারণ্য ভ্রমণ করিতেছি, পর্ব্বতপ্রমাণ বিপদ তূলর ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে। আমি দুর্ব্বল, বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত শরীরের বল হারাইয়াছি, অনেক কাল নষ্ট করিবার পর জাগরিত হইয়াছি বলিয়া যোগবল সঞ্চয় করিতে পারি নাই। অর্থবলের পরিচয় কৌপীন, জ্ঞানবল একবারেই নাই, তবে গুরুবল ও দেববলের বিশ্বাস করিয়া এই তীর্থভ্রমণে প্রবৃত্ত হই। আমি আমার পরবর্ত্তী ভ্রমণকারীদিগকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, যে কোন উপাসকসম্প্রদায়-ভুক্তই হউন না কেন, তাঁহারা যেন স্বীয় উপাস্যের উপর পূর্ণ নির্ভর করিয়া যাত্রা করেন, তাহা হইলে অনায়াসে হিমারণ্য উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে; অদ্য কৈলাস-যাত্রার দিন। আহারাদিও প্রস্তুত হইয়াছে, আমি প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া কৈলাস-গঙ্গাতে অবগাহন করিয়া পূজা পাঠ সমাপন করিলাম এবং যাত্রার জন্য একান্ত অধীর হইয়া উঠিলাম। আমার সঙ্গীরা বলিল, "আজ এত অধীরতা কেন? ছয় মাইল পথ যাইয়াই বিশ্রাম করিতে হইবে; আর অদ্যকার পথও ভাল, কোনও ভয় নাই। এ পথে ডাকাতেরও ভয় নাই। এই দেশীয় ডাকাতেরা আমাদের সঙ্গেই, কৈলাস-পরিক্রমকারী কোনও যাত্রীকেই কিছু বলিবে না। ইহারা সব স্থানে ডাকাতি করে, মানসসরোবরও বাছে না, কিন্তু কৈলাসে ইহারা ডাকাতি করে না। ইহারা কৈলাসকে ও কৈলাসপতিকে বড় মানে, যা কিছু ভয় কেবল বরফের।" আমি বলিলাম, "এখন আর ভয়ের ধার ধারি না, কৈলাসে আসিয়াছি, কৈলাসের প্রথম ও প্রধান মঠ দারচিনে অবস্থিতি করিতেছি, অগৌণে কৈলাস-ভ্রমণ করিতে বাহির হইব, আর বিলম্ব করিব না, চল এখনই চল।" তাহারা আমার কথা শুনিয়া যাত্রার বন্দোবস্ত করিল। অতিরিক্ত যা কিছু খাদ্য ছিল, তাহা মঠে রাখিয়া দিল; কেবল প্রয়োজনীয় শীত বস্ত্র ও অতি অল্প আহারীয় সঙ্গে লইয়া চলিল। আমি লামার কাছে বিদায় লইয়া কৈলাস-ভ্রমণে যাত্রা করিলাম।

/ নারোপা-প্রবর্ত্তিত ফিবা সম্প্রদায়ের লোকেরা বামাবর্ত্তে এবং জিপ-[illegible] প্রবর্ত্তিত [illegible] সম্প্রদায়ের লোকেরা দক্ষিণাবর্ত্তে কৈলাস পরিক্রম

করিয়া থাকেন। কারণ মহাত্মা জিপচুন দক্ষিণাবর্ত্তে যাইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নারোপা বামাবর্ত্তে যাইতেছিলেন, কিন্তু তিনি কৈলাস পরিক্রম করিতে পারেন নাই। বামাবর্ত্তে ছয় মাইল গমন করিয়া পথিমধ্যে "জুগুলফু" নামক স্থানে উভয় লামার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জিপচুনের আবিষ্কৃত দক্ষিণাবর্ত্ত পথে কৈলাস পরিক্রম করিতে আরম্ভ করিলাম।/কৈলাসে আরোহণ করিতেছি, মন আনন্দে পূর্ণ হইতেছে, এই আনন্দের বর্ণনা অসম্ভব। কিছু দূর যাইতেছি আর বিশ্রাম করিতেছি। এই বিশ্রাম ক্লান্তিজনক নহে। বসিয়া একবার হৃদয়পটে কৈলাসের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া লইতেছি আর কৈলাসের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতেছি, তাহা ঠিক হইল কি না। যাইতে যাইতে একটি উচ্চ পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। পর্ব্বতটি কৈলাসের অন্তর্গত। এই পর্ব্বতের নিম্ন-ভাগে অতি উচ্চ একটি নিশান ঝুলিতেছে। নিশান-দণ্ডটি প্রায় ১০০ হস্তের কম নহে। আমি এই নিশান দেখিয়া সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানে কি আছে?" আমার একজন সঙ্গী ও যাত্রী উত্তর করিল, "এই যে নিশানের উর্দ্ধে পর্ব্বত দেখিতেছেন, এইটি শ্মশান।" এই পর্ব্বতটি নিম্ন হইতে প্রায় পাঁচ বা ছয় শত হস্ত উচ্চ, নিম্নে নদী। নদী হইতে পর্ব্বত একবারে সোজা উঠিয়াছে, পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ স্থান সমতল, তথায় বৃক্ষ বা তৃণ কিছুই নাই; সেখানে কতকগুলি কাক ও শকুনি বসিয়া আছে দেখিয়া মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের উদয় হইল। এমন সুন্দর স্থানে এ কি! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে কি প্রকারে মানবদেহ সমাহিত হইয়া থাকে?" সঙ্গী উত্তর করিল, "যখন কাহারও মৃত্যু হয়, তখন লামারা আসিয়া গণনা করিয়া দেখেন, ইহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কিরূপ করিতে হইবে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, 'মৃত্যুচিহ্ন দেখিয়া সেইরূপ স্থির করা হয়।' সকলকেই প্রথমতঃ ঐ নিশানের উর্দ্ধদিগ্বর্ত্তী পর্ব্বতের উপরিভাগে উঠিতে হয়। কাহারও কাহারও দেহ ঐ পর্ব্বতে অক্ষুণ্ণভাবে রাখা হয়। কাহারও হস্ত পদ কাটিয়া অপর অপর স্থানে নিক্ষেপ করা হয়। কাহারও শরীরের মাংস পক্ষীদিগকে বিতরণ করা হয়। কাহারও কাহারও হস্ত পদ ও মাথা কাটিয়া মঠে রাখা হয়; তার পর মাংসগুলি শুষ্ক হইলে নরকপাল দেবালয়ে স্থাপিত করা হয়। হস্ত ও পদের নলি পরিষ্কার করিয়া তাহা দ্বারা দেবালয়ে বাদ্য হইয়া থাকে। এই হস্ত ও পদের নলী শঙ্খের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার

শব্দ শঙ্খ হইতেও গম্ভীর ও মধুর। যাহাদের অদৃষ্ট মন্দ, যাহারা পাপী; তাহাদের দেহকে কোন প্রকার বিকৃত করা হয় না। ঐ পাহাড়ের উপরেই রাখিয়া দেওয়া হয় এবং কোনও পশু বা পক্ষী স্পর্শও করে না।” নিম্নস্থ দেশের ন্যায় এই দেশে মৃত দেহ ভস্মীভূত অথবা সমাহিত হয় না। এই প্রকার মৃতদেহের পরিণাম ইহাদের পক্ষে বৈধ ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। নরকপাল দেবালয়ে রক্ষিত হয় এবং কেহ কেহ নরকপাল দ্বারা ডম্বরু প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

শ্রীরামানন্দ ভারতী।

রঘুবংশ।

(রামায়ণ-কথা।)

কালিদাস অতি সংক্ষেপে রামায়ণ-কথার বর্ণনা শেষ করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বজনপ্রিয়, তিনি রঘুবংশাবতংস, তাঁহার পবিত্র চরিত্র ভারতবর্ষে আদর্শ, এবং রামায়ণ-কথা ঘটনাবৈচিত্র্যে কাব্যের অতি উপাদেয় আখ্যানবস্তু। অথচ এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। ইহার কারণ সহজেই প্রতীত হইতে পারে। যে অমৃতময়ী কথার বর্ণনা স্বয়ং বাল্মীকি করিয়াছেন, তাহার উপর লেখনী-চালনা দুঃসাহসিকতা। যিনি পরিপক্ক বয়সে রঘুবংশ লিখিতে বসিয়াছিলেন, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যে বিষয় বাল্মীকি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বর্ণনায় কৃতিত্ব লাভ অসম্ভব। যখন কবি ভবভূতি রামায়ণ-কথা লইয়া দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তখন কালিদাস কি সে বিষয়ের নূতন মনোহর বর্ণনা করিতে পারিতেন না? এ কথার বিচার করিতে হইলে, ভবভূতি এবং কালিদাসের উদ্দেশ্যের বিচার করিতে হয়। ভবভূতি পরিবর্ত্তিত সমাজের সমক্ষে, রামচরিত্রের নূতন আদর্শ গড়িয়া, জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার রামায়ণ, বাল্মীকি-বর্ণিত কথা হইতে অনেক স্থলেই স্বতন্ত্র। এ কথাটি বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে, স্বতন্ত্র দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হয়; কিন্তু এ বিষয়টি, আমার স্নেহাস্পদ শ্রীমান সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, স্বপ্রণীত “ভবভূতি” নামক সুরচিত গ্রন্থে, বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। কালিদাস নূতন আদর্শ গড়িবার চেষ্টা করেন নাই; সর্ব্ব

সাধারণের নিকট রামায়ণ যে ভাবে পরিচিত, তাহাই অবলম্বন করিয়া, আপনার কাব্যের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। এ উদ্দেশ্যের বিষয়, বহু পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে লিখিয়াছিলাম। প্রচলিত প্রবাদ অনুসরণ না করিলে কালিদাসের অভীষ্টসিদ্ধি হইত না। কারণ সর্ব্বত্রগৃহীত পুরাতন কথা হইতে, যদি সন্নীতির ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যাখ্যা অধিক চিত্তাকর্ষক হয়। এই জন্য কালিদাস গ্রন্থারম্ভেই অঙ্গীকার করিয়াছেন ;—

"অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥"

অন্য যে সকল কবি বাল্মীকি-বর্ণিত কথা লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, ভবভূতি ভিন্ন তাঁহাদিগের কাহারও কাব্য, যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই। বাল্মীকির রচনা, জগতে এমন অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যে শুধু ঐ রামায়ণ খানির আশীর্ব্বাদে, ভারতগৌরব চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সীতার সৃষ্টি, সমগ্র জগতের মধ্যে যে কি প্রকার মহিমাময়ী, তাহা একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

আদি কবি ব্রহ্মা। তাঁহার পর এই মর-জগতে বাল্মীকি এবং বেদব্যাস প্রকৃত কবি বলিয়া ভারতসমাজে চিরপূজ্য। তাই কর্ণাটরাজপ্রিয়া কবির নাম উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "একোভূন্নলিনাৎ ততোঽপি পুলিনাৎ বল্মীকতশ্চাপরঃ।" বাল্মীকির মাহাত্ম্য, জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, একালে হোমরের ইলিয়ডের সহিত না কি রামায়ণের তুলনা হইয়া থাকে, সেই জন্য সেই কথাটার উপলক্ষে, সীতা-সৃষ্টির অতুলনীয়তা ও বিশেষত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এ দেশীয় সৃষ্টি, গ্রীক জাতীয় সৃষ্টির অনুরূপ নহে ; গ্রীকদেশীয় এবং ভারতবর্ষীয় কাব্য-শিল্প এবং প্রয়োগবিজ্ঞান, সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই জন্য প্রায় সাধারণতঃ ইউরোপীয় কাব্যাদির সহিত ভারতীয় কাব্যাদির তুলনায় সমালোচনা সম্ভবপর নহে। এই প্রভেদ বিশেষ করিয়া বুঝাইবার আমার ক্ষমতা নাই। বিশেষতঃ উদ্দিষ্ট বিষয়ের সহিত সে কথার কোনও সম্পর্ক নাই। কেবল তুলনা দ্বারা সীতা-সৃষ্টির বিশেষত্ব দেখাইব।

হোমরের হেলেন, কোমল-সৌন্দর্য্য-পরিশোভিতা; এবং সৌন্দর্য্যালোলুপের প্রলোভনের বস্তু। কিন্তু সীতা সতীত্বাগ্নি-বেষ্টিতা দেবীমূর্ত্তি এবং ভক্তপূজ্যা। হেলেন পারিসের উপপত্নী ; এবং ভাগ্যচক্রে তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী।

গ্রীকবীরশ্রেষ্ঠ, হেলেনের রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছিলেন; হেলেনের চিত্তবৃত্তিও, মানিলসের বার্ত্তাবহ জানিয়াও, সেই বীরের প্রতি প্রধাবিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত দশানন, প্রলোভনে পড়িয়া সীতাকে অপহরণ করে নাই; দাদ্ তুলিবার জন্য চুরি করিয়াছিল। রাম ভিন্ন যে কেহ তাঁহাকে দেখিয়াছে; স্ত্রী হউক পুরুষ হউক, সকলেই দেবী বলিয়া তাঁহার চরণতলে প্রণত হইয়াছে। সতীত্বনাশ যাহার নিত্য ব্যবসায় ছিল, সেই দুর্বৃত্ত রাবণ পর্য্যন্তও সতীত্বাগ্নিরক্ষিতা সীতার অঙ্গস্পর্শ করিতে সাহসী হয় নাই। রাবণের দুর্দ্দশার সময়ে তাঁহার মন্ত্রী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "পতিব্রতায়াস্তপসা নূনং দগ্ধোঽসি মে প্রভো।" হেলেনকে যখন পারিসের গৃহ-বাতায়নে সমরদর্শন-তৎপরা দেখিলাম, তখন তিনি সেই অতুলসৌন্দর্য্যভূষিতা, এবং পারিসের গৃহলক্ষ্মী। কিন্তু লঙ্কারাজ্যে, সীতা, "সর্ব্বলঙ্কাবিনাশিনী কালরাত্রি" বলিয়া বর্ণিতা। সুন্দরাকাণ্ডের ঊনবিংশ সর্গের ৬ষ্ঠ শ্লোকে আছে :—

"মলমণ্ডনদিগ্ধাঙ্গীং মণ্ডনার্হামমণ্ডনাম্।
মৃণালী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি ন বিভাতি চ॥"

কি মোহ আছে জানি না; ফিরিয়া ফিরিয়া কতবার যে পড়িয়াছি, তবুও সাধ মিটিল না। সতীত্বশোভিত সৌন্দর্য্যের এমন মধুর বর্ণনা আর কোথাও আছে কি না জানি না।

হেলেন উপভোগের সামগ্রী; তাই মানিলস্ তাঁহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সীতার অদৃষ্টে অগ্নিপরীক্ষা ঘটিল। অগ্নিপ্রবেশের সময় সীতাদেবীর মুখে যে বাক্যগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার কাছে হুতাশন হীনপ্রভ; কাজেই সে দেবীমূর্ত্তিকে দগ্ধ করা, অগ্নির সাধ্যাতীত। যুদ্ধকাণ্ডের ১১৬শ সর্গটি যেন অগ্নিময় বলিয়া মনে হয়। এই দেখুন :—

"যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবক।
যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানিতি রাঘবঃ
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবক।"
ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে সতীত্ববিষয়ে ইউরোপ এবং ভারতবর্ষের আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে হউক, অচেতন অবস্থায় হউক, অথবা অন্য যে কোনও প্রকারে হউক, পরপুরুষ-স্পৃষ্ট হইলেই সতীত্ব ধ্বংস হইল—ইহা ভারতবর্ষের আদর্শ। এইজন্য যে কোনও প্রকারে কোন অবিবাহিতা রমণী পুরুষ-সংস্পৃষ্টা হইলেই,

নিখুঁৎ সতীত্ব বজায় রাখিবার জন্য, আসুর, পৈশাচ প্রভৃতি বিবাহ, হিন্দুসমাজে বিবাহ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। ইউরোপীয় ব্যবহারশাস্ত্রপ্রণেতৃগণ ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ঘাড়ে অনেক বর্ব্বরতার বোঝা চাপাইয়াছিলেন। যাহা হউক, ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী এই দুই মহাত্মা আমাদের সে, কলঙ্ক মোচন করিয়া, ব্যবহারশাস্ত্রপ্রণেতাদিগকে ইহার প্রকৃত তথ্য বুঝাইয়া দিয়াছেন।

জিতেন্দ্রিয়ত্ব-লাভের উপর যদি সাংসারিক সকল সম্পদ নির্ভর করে, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, রামায়ণ-পাঠ পরম পুণ্যলাভের সোপান। এই রামায়ণ-পাঠের ফলস্বরূপ লঙ্কাকাণ্ডের শেষে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া মনে হয়ঃ—

"শ্রুত্বা শুভং কাব্যমিদং মহার্থং
প্রাপ্নোতি সর্ব্বাং ভুবি চার্থসিদ্ধিং।
আয়ুষ্যমারোগ্যকরং যশস্যং
সৌভ্রাতৃকং বুদ্ধিকরংশুভঞ্চ।"

কেবল যে সীতাচরিত্রের অতুলনীয়তাই বুঝিলাম, তাহা নহে; বাল্মীকি-বর্ণিত বিষয়ের কাব্যোচিত বর্ণনা না করিয়া যে কালিদাস বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতে তাহাও বুঝিতে পারি।

কালিদাসের সময়ে শ্রীরামচন্দ্র ভারতবর্ষে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছিলেন; এজন্য দশম সর্গে রামাবতার-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই রামাবতার-বর্ণনার উপলক্ষে কবি যে দেবস্তোত্র লিখিয়াছেন, তাহা কাব্য-রসিকের নিকট যেমন মনোহর, ভক্তিপরায়ণ উপাসকের নিকটও তেমনই প্রাণস্পর্শী। আমার যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে এ দেশের অন্য কোনও কাব্যে দেবভক্তি-প্রণোদক, সর্ব্বশ্রেণীর উপাসকের উপযোগী শ্লোক রচিত হয় নাই। অন্ততঃ প্রসিদ্ধ ষট্ মহাকাব্যের মধ্যে কোথাও নাই। শিশুপালবধ, নৈষধ-চরিত, কিরাতার্জ্জুনীয়, কিম্বা ভট্টিকাব্যে নাই। অবশিষ্ট দুই খানিই কালি-দাস-রচিত। কুমারসম্ভবের দেবস্তোত্র, দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা; অথবা কুমার-সম্ভব কাব্য যে হরপার্ব্বতীসম্মিলনচ্ছলে সৃষ্টির দার্শনিক তত্ত্বের অভিব্যক্তি তাহারই আভাষ প্রদান। ধর্ম্মশিক্ষার নামে ধর্ম্মশিক্ষা প্রায়শঃ তিক্ত হয়; এইজন্য এই কাব্য-কৌশল প্রশংসনীয়। একাদশ সর্গের নাম সীতার বিবাহ বর্ণন। কিন্তু ইহাতে সীতাবিবাহের মূল কথা কয়েকটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে

মাত্র। বিশ্বামিত্র আসিয়া দশরথের নিকট যখন রামলক্ষ্মণকে রাক্ষসবধের জন্য যাচ্ঞা করিলেন, তখন, দশরথের অনভিমতি, বিশ্বামিত্রের বিচার প্রভৃতি অনেক বিষয় রামায়ণে বর্ণিত আছে। কিন্তু কালিদাস তাহা এক শ্লোকে শেষ করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র প্রার্থনা করিলেন, এবং রাজা দশরথ তাহা পূর্ণ করিলেন; এইমাত্র। তাড়াতাড়ি রাক্ষসবধ ও বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল; কেবল রামমাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য পরশুরামের উপাখ্যান অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। সমগ্র গল্পটি নিতান্ত না বলিলে নয় বলিয়া, দ্বাদশ সর্গে, লঙ্কাকাণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত, পরবর্ত্তী সকল ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে।

তাহার পর শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা-প্রত্যাবর্ত্তন। এই সর্গটি কাব্য-সৌন্দর্য্যে সবিশেষ অলঙ্কৃত। রামায়ণের ১২৩ শ সর্গে, যুদ্ধকাণ্ডে, অগ্নিপরীক্ষার পর রামসীতা বিমানারোহণ করিলেন, ইহা বর্ণিত আছে। কবি কালিদাসও তাহাই লিখিয়াছেন। কিন্তু বাল্মীকি বিমানারোহণ করাইয়া রামকর্ত্তৃক সীতাদেবীকে কেবল লঙ্কাপুরী দর্শন করাইয়াছেন; কাজেই সুবিধা পাইয়া, কবি কালিদাস লঙ্কাপুরীর বর্ণনা না করিয়া, লঙ্কার পরবর্ত্তী পথের বর্ণনা করিয়াছেন। যখন সীতাদেবীকে হারাইয়া শ্রীরামচন্দ্র বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন শোকবিহ্বলচিত্তেই সে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন। সুতরাং সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারেন নাই। বাল্মীকির বন-বর্ণনা সেই সময়ের বলিয়া, কালিদাস বনভূমির সৌন্দর্য্য, উপভোগ-ক্ষম করিয়া উহা শ্রীরামচন্দ্রের নয়নপথে ধরিয়াছেন। দুঃখান্তে পূর্ব্বদুঃখস্মৃতি কেমন সুখবর্দ্ধন করিতেছে, এই অনুপম বর্ণনায় তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। যে জাতির সাহিত্যে এমন মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা আছে, সে জাতির সাহিত্য অক্ষয় এবং অবিনশ্বর। সেই ছায়াপথের মত প্রসারিত ফেনসংলগ্ন সেতু, সেই ফেনিলাম্বুরাশি, সেই মেঘনির্ম্মুক্ত শরতের আকাশের মত নীল বারিরাশির উপর প্রস্ফুট চারুতারকার মত সূর্য্যরশ্মিসম্পাত, সেই অয়শ্চক্রনিভ লবণাম্বুরাশির তমালতালীবনরাজিনীলা সুদূর বেলা-ভূমি, সেই কেতকরেণুপূর্ণ বেলানিল, চিরকাল সাহিত্যসেবকদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিবে। সমগ্র ত্রয়োদশ সর্গ এত সৌন্দর্য্যপূর্ণ যে, পুনরুক্তি দ্বারা তাহার পরিচয় দান করা অসাধ্য।

ত্রয়োদশ সর্গের শেষে কবি কালিদাস লিখিয়াছেন যে, সাধু ভরতের জ্যেষ্ঠানুবৃত্তিজনিত জটাযুক্ত শিরোদেশ, সীতাদেবীর চরণসংলগ্ন হইয়া পবিত্র

দান করুন, আমরা যেন ভারতের প্রাচীন গৌরবের পুনরভ্যুদয়ের ব্রত গ্রহণ করিয়া একদিন ভরতের মত, সতীত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণস্পর্শের যোগ্য হই। কিন্তু হায়, সে দিন কবে আসিবে? দেবি জানকি, কবে তুমি এই পতিত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ধর্ম্মপথভ্রষ্ট জাতির মস্তকে তোমার চরণ স্থাপন করিয়া এ জাতির উদ্ধার সাধন করিবে?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

চণ্ডীদাসের "শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন"।

প্রাচীন কালে বাঙ্গালীদের কোন সাহিত্য ছিল না, এখন এ কথা আর কেহই বলিতে পারেন না। বিগত কয় বৎসরের গবেষণায় বঙ্গের বিলুপ্তপ্রায় সাহিত্য-গৌরবের যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দ্বারা কেবল আমাদের অতীত সাহিত্য-প্রিয়তার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে এমন নহে, এই অতীতকালীন সাহিত্যের অংশ বিশেষ আমরা জগতের সাহিত্য প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়া প্রশংসালাভ করিবারও অধিকারী হইয়াছি। বর্ত্তমান বঙ্গভাষা গঠনের প্রাক্কালে যদি আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অবহেলিত না হইত, তাহা হইলে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আরও অনেক অমূল্য সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিতাম। দুঃখের বিষয়, এইরূপ অনেক সম্পত্তি হইতে আমরা আজ চিরদিনের নিমিত্ত বঞ্চিত হইয়াছি। এতদ্দ্বারা আমাদের যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বর্ণনা অপেক্ষা কল্পনা করাই অধিকতর সহজ। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য এখন আক্ষেপ করা অরণ্যে রোদন বই আর কিছুই নহে। এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার জন্য [illegible] সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। অনেক সাহিত্যপ্রিয় স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি এখন প্রাচীন সাহিত্যানুশীলনে নিরত হইয়াছেন, ইহা অতি আনন্দের কথা বটে; কিন্তু দেশের আয়তন ও লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা কিছুই নয় বলিলেও বলা যায়। দুই চারিজনের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, এখনও যে গুলির উদ্ধার হইতে পারিত, তাহাও চিরদিনের জন্য কালের অনন্ত গর্ভে স্থানলাভ করিবে, এই কথাটুকু যেন আমাদের সাহিত্যপ্রেমিকমাত্রেরই স্মরণ থাকে।

বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে প্রাচীন পুথি পাওয়া যাইতে পারে। সেইগুলি সমস্তই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা সহজ কথা নয় বটে, কিন্তু তৎসমস্ত আলোচনা করিয়া দেশের ও সাহিত্যের ইতিবৃত্তের উপকরণ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা কিছুই অসাধ্য বা অসম্ভব নহে। তবে এই পুথি ও উপকরণরাশি সংগ্রহ করা বিশেষ শ্রমসাধ্য কাজ বটে। কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্রও কষ্ট স্বীকার ও ধৈর্য্যাবলম্বন না করিলেই বা এইরূপ মহৎ কার্য্য কিরূপে সাধিত হইতে পারে? জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন কখনও কোনও জাতির প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না, এ কথা আমাদের সকলেরই সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

বঙ্গের আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস, বঙ্গীয় সাহিত্যামোদিগণের হৃদয়ের দেবতা। তাঁহার যে সঙ্গীত, "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" পশিয়া, প্রাণ আকুল করিয়াছে, বঙ্গে তাহা কেহ ভুলিতে পারিবেন কি? এ হেন মহাত্মার ভণিতাযুক্ত নূতন কোনও পদ বা কবিতা দেখিলে কাহার না হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে? তাঁহার কোন কীর্ত্তি যদি অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত থাকে, তাহাও আমাদের ঘোর কলঙ্কের কথা। এই সুদীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকার পর এখন আমরা বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণকে চণ্ডীদাসের "শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন" সম্বন্ধে দুই একটি কথা শুনাইব। কিন্তু এই চণ্ডীদাস, আমাদেরও সেই স্বভাবকবি চিরপ্রিয় চণ্ডীদাস কি না, সে বিষয়ের মীমাংসা আমরাও এখন করিয়া উঠিতে পারি নাই।

প্রকৃতির রম্য নিকেতন চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যের এত উপকরণ আছে যে, দুই এক জনের জীবনব্যাপী পরিশ্রমেও তাহার সম্যক্ উদ্ধার-সাধন হইতে পারে কি না, বলা যায় না। স্বদেশীয় কবিদিগের কীর্ত্তি ভিন্ন বিদেশীয় মহাজনদের কীর্ত্তিকলাপও এখানে বিস্তর পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, সাহিত্যবিষয়ে চট্টগ্রাম প্রাচীনকালে বড় পশ্চাৎপদ ছিল না; অধিকন্তু তৎকালে এই স্থান বিস্তর কবি ও পদকর্ত্তার জন্মভূমি ছিল। তখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাব ছিল না, সুতরাং অন্য স্থানের লোকের রচিত গ্রন্থাদি এখানে এত অধিক পরিমাণে কিরূপে প্রচারিত হইল, জানিতে কৌতূহল জন্মে।

চণ্ডীদাসের পদগুলি এখন প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও কত অপ্রকাশিত আছে, কত বা বিনষ্ট হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। তাঁহার রচিত পদাবলী ভিন্ন তিনি অন্য কোনও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত জানা না গেলেও, তাঁহার রচিত অন্য কোনও কাব্য যে ছিল, আজকালকার সাহিত্য-সমাজ এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত মনে করেন না।

উপরে 'শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন' নামক যে গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে চণ্ডীদাসের এই ভণিতা দুইটি পাওয়া যাইতেছে :—

(১) "চণ্ডীদাসে বোলে সার।
কৃষ্ণ গতি সভাকার॥"
(২) "যশোদাএ দিল কৃষ্ণ শ্রীদামের কোলে।
রাধাকৃষ্ণ পানে চাইআ চণ্ডীদাসে বোলে॥"

এই ভণিতা দুইটি ভিন্ন ইহাকে চণ্ডীদাসের রচিত বলিবার পক্ষে আমাদের আর কোন প্রমাণ নাই। প্রত্নতত্ত্বালোচনা বড়ই দুরূহ কাজ, বিশেষতঃ ভারতীয় ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে। নামের সাদৃশ্য মাত্র দেখিয়াই কোনও গ্রন্থ কি পদবিশেষকে কোন স্বনামপ্রসিদ্ধ মহাজনের বলিয়া বিবেচনা করা, সুযুক্তিসঙ্গত নহে। এমন হইতে পারে, ঐ নামের অন্য কবিও ছিলেন। আবার তখন তখন অনেক নগণ্য ব্যক্তি নিজে কিছু রচনা করিয়া, কোনও প্রসিদ্ধ মহাত্মার ভণিতা দিয়া তাহা চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। এই 'কলঙ্কভঞ্জন' সম্বন্ধেও আমাদের মনে সেরূপ সংশয়ের উদয় না হইতেছে, এমন নহে।

তবে ইহা আমাদের পরিচিত প্রিয় চণ্ডীদাস কবির কি না, কিরূপে জানিব? এই পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় একাধিক 'চণ্ডীদাস' কবির আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হই নাই এবং চণ্ডীদাসের মত কোমল সুরে বীণা বাজাইবার লোকও বঙ্গভাষায় আর দ্বিতীয় আবিষ্কৃত হন নাই। এই দুইটি কথা চিন্তা করিলে, 'কলঙ্কভঞ্জন' খানি তাঁহারই লেখনীপ্রসূত বলিয়া মনে করিলেও, করিতে পারা যায়। এই গ্রন্থখানি পাওয়া যাইতেছে চট্টগ্রামে, আর চণ্ডীদাসের জন্মস্থান হইতেছে বীরভূমে। কেবল তখনকার কালে কেন, এখনও উভয় স্থানের মধ্যে বিরাট ব্যবধান! পূর্ব্ববঙ্গের একজন কবি বীরভূমের একজন কবির ভণিতা দিয়া গ্রন্থ চালাইয়া দিবার জন্য প্রলুব্ধ হইতে পারেন কি না, ইহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। চণ্ডীদাসের কবিতা যেন স্বভাবের কোমল উৎস হইতে স্বতঃই বিনিঃসৃত হইয়াছে। এই কলঙ্কভঞ্জনের অনেক স্থানেও আমরা সে ভাবের পরিচয় পাই। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়াই, আমরা ইহাকে উক্ত মহাত্মারই কীর্ত্তি বলিয়া নিরূপিত করিতে চাই। প্রাচীন কাব্যাদি যে সকল অদ্ভুত উপায়ে তখন দেশদেশান্তরে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে এই গ্রন্থের চট্টগ্রামে প্রচার কিছুই অসম্ভব নহে। অনুসন্ধান করিলে, বীরভূমে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানেও

'কলঙ্কভঞ্জনের' প্রথম তিন পাত পাওয়া যায় নাই বলিয়া ইহার আরম্ভ কিরূপ তাহা জানিতে পারি নাই। শ্রীকৃষ্ণের কপটমূর্চ্ছাপনোদনের জন্য যমুনা হইতে রন্ধ্রময়ী কলসী করিয়া বারি আনয়ন এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়; সুতরাং প্রথম তিন পাতের অভাব স্বত্বেও ঘটনা বুঝিতে কোন ব্যাঘাত হইবে না। যে হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা এত কদর্য্য ও ভ্রান্তিসঙ্কুল যে, পাঠোদ্ধার করিতে আমাদিগকে বিস্তর ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। তাহাও স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ বা পরিত্যক্ত বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থখানি যে অতি সুন্দর ছিল, তাহা দৃষ্টিমাত্রেই বলা যায়। ইহার ছন্দ বঙ্গভাষায় অভিনব,—'রাধিকার মানভঙ্গে'র অনুসৃত ছন্দের প্রায় অনুরূপ। মনে হয়, এইরূপ ভক্তিরসাশ্রিত কাব্যের পক্ষে এই ছন্দই বিশেষ উপযোগী। দুঃখের বিষয়, ভ্রান্তিজালে বিজড়িত বলিয়া ইহা উপভোগ করিতে রসভঙ্গ হয়। এই জন্য কোন একটি স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিতেছি না। নিম্নে যাহা উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা হইতে পাঠক মহাশয় দেখিবেন, অকারণে ইহাকে আমরা চণ্ডীদাসের রচনা বলি নাই।

জটিলা কুটিলার অকৃতকার্য্যতার পর শ্রীমতী রাধিকাকে জল আনিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে—

"রাধে বোলে—
কলঙ্কিনী হইয়াছি আমি সব লোকের ঠাঞি।
কেমতে আনিব জল যমুনাতে যাই॥ ধু।
নিবেদি তোমার ঠাই,
আমার সমান কলঙ্কিনী নাই॥
মনের দুঃখ নিবারিতে যাই যার ঘরে।
শ্যামকলঙ্কিনী বোলি খোটা দেহি মোরে॥ ধু।
দুঃখ নিবেদিতে যাই,
বোলে আইল কলঙ্কিনী রাই॥
তৃষ্ণাযুক্ত হৈয়া আমি যার ঠাই খুজি পানি।
সেহ বোলে ঐ আইল রাধা কলঙ্কিনী॥
যশোদাএ বোলে রাধা শুনহ বচন।
জল আনি রক্ষা কর কানাইর জীবন॥ ধু।
তুমি বহি কে মোর আছে।
কৈব দুঃখ কার কাছে॥
যশোদাএ লৈল কৃষ্ণ রাধা যাএ জলে।
চৌতিশ অক্ষরে স্তব করে যাদবেরে॥ ধু।
রাধে বোলে ও ভগবান!
তোমার পাদপদ্ম বহি গতি নাহি আন॥ ধু।
তোমার শ্রীচরণ করিছি সার।
আপন গুণে মোরে কর পার॥
তরাও তরাও মোরে নাও ডুবিয়া রহিল।
জগত ভরিয়া মোর কলঙ্ক রহিল॥ ধু।
যদি মোরে না তরাবে।
নামের মহিমা যাবে॥"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হস্তলিপিখানি বড়ই কদর্য্য; অনেক স্থলেই উলট পালট হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। লিপিকর কারসাজি করিতে যাইয়া এই সুন্দর গ্রন্থখানি মাটী করিয়া দিয়াছেন। আমাদের বোধ হইতেছে 'রাধিকার মানভঙ্গে'র মত ইহার পদগুলি ও সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহার শেষ এইরূপঃ—

"যদি তোমার দয়া থাকে।
পুত্র দান দেয় মোকে॥
শুনিয়া রাণীর বাণী, কহে রাধে সুবদনী,
লৈয়া যাও তোমার গো নন্দন।
কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ দেখি, রাধার অন্তরে সুখী,
করিলেক চরণ বন্দন॥
শ্যামের বামে দাড়াইল, দুই হরষিত হইল,
দুহ প্রেমে হরষিত হৈল সর্ব্বজন।
শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল।
ভক্তের আনন্দ হইল॥
সবে হরি হরি বোল।
শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল॥"

"ইতি শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত। ইতি সন ১১৮২ মঘী তারিখ মাহে ১৮ ফাল্গুন রোজ বুধবার বৈকাল বেলা। এই বৈইর মালিক শ্রীকাশীনাথ দেয়-দাস পীছরে গ্রাম মোহন চৌধুরী।" পুথি খানি সম্ভবতঃ আনোয়ারা গ্রামেই নকল হইয়া থাকিবে।

প্রাচীন কীটদষ্ট-কাগজের মধ্যে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত নিম্নোদ্ধৃত পদটি পাওয়া গিয়াছে। ইহা কোন্ চণ্ডীদাসের কে বলিবে? তবে দেখিলেই উহা আমাদের মহাকবির রচিত বলিয়া বোধ হয়। 'চণ্ডীদাস' গ্রন্থে উহা পাওয়া যায় না। গীতটি এইঃ—

সুখের সায়রে, দুঃখ উপজিল,
ভাঙ্গিল যৌবন মোর।
আপনা জানিয়া, পিরীতি করিলাম,
বন্ধুয়া হইল পর॥
সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিলাম,
কুজন বোলিবে; কে?
অমৃত বলিয়া, গরল ভক্ষিলাম,
ঢলিয়া পড়িনু সে॥
আপনা ভাবিয়া পিরীতি করিলাম,
পর কি আপনা হয়।
মিছা প্রেম করি, কান্দি কান্দি মরি,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

আমরা অতিরিক্ত মাত্রায় চণ্ডীদাসভক্ত। তজ্জন্য তাঁহার প্রতি যদি আমরা এই প্রবন্ধ উপলক্ষে অন্যায় অনুরাগিতা দেখাইয়া থাকি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা আমাদিগকে কেহ দেখাইয়া দিলেই, ভ্রম সংশোধন করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। এই গ্রন্থ তাঁহার হউক আর না হউক, তাঁহার ভণিতা দেখিয়া অবধি ইহার প্রতি আমাদের কেমন একটি শ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে। এই জন্য ইহা অমূল্যরত্নস্বরূপ যত্নে রক্ষা করিয়াছি।

শ্রীআবদুল করিম।

বঙ্গে নীল।

অল্প সময়ের ব্যবধানে দুইটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। প্রথম—বঙ্গে নীলের ব্যবসায় বিলোপোন্মুখ লক্ষ্য করিয়া তাহার হিতকল্পে কি করা যাইতে পারে সে কথার আলোচনার জন্য বেঙ্গল গভর্মেণ্ট বর্ত্তমান বর্ষে ৭৫,০০০৲ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। দ্বিতীয়—বড় লাটের মন্ত্রণাসভায় আসামের কুলী-আইন বিচারের দিন এই বাঙ্গালা গভর্মেণ্টের কর্ত্তা সার জন উডবার্ণ অনুপস্থিত ছিলেন। যে দিন আসামের জঙ্গলে অত্যাচারপীড়িত কুলীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া আসামের চিফ কমিশনর মিষ্টার কটন সৎ সাহসের পরিচয় দিয়া ভারতবাসী প্রজামাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন, সে দিন ছোটলাট মন্ত্রণাসভায় ছিলেন না। হইতে পারে কাকতালীয়বৎ এই দুইটি ঘটনা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধশূন্য ; কিন্তু দুষ্ট লোকে বলিতেছে, উভয় ঘটনাই বঙ্গের ছোট লাটের "কর"-প্রীতির পরিচায়ক। প্রথম ব্যাপারে নীল-কর ও দ্বিতীয় ব্যাপারে চা-কর তাঁহার স্নেহের পাত্র। উভয় ঘটনাতেই ছোট লাট এক মূল নীতির অনুসরণ করিয়াছেন,—সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য দেশের জনসাধারণের স্বার্থের অবহেলা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সত্য বটে নীল এ দেশের একটি পুরাতন ব্যবসা, তাহার বিলোপনিবারণকল্পে চেষ্টা প্রশংসার্হ ; কিন্তু বঙ্গদেশে অনেক পুরাতন ব্যবসা লোপ পাইয়াছে বা পাইতে বসিয়াছে, গভর্মেণ্ট সে সকলের জন্য কি করিয়াছেন? নীলকরগণ য়ুরোপীয়—তাই এ স্নেহাতিশয্য। রসায়নের উন্নতিই নীলের ব্যবসাবিলোপের সর্ব্বপ্রধান কারণ। ব্যয়িতজীবনীশক্তি মরণাহত রোগীকে উত্তেজক ঔষধ সাহায্যে জীবিত রাখা যেমন অসম্ভব, গভর্মেণ্টের এই পচাত্তর হাজার টাকার চাড়া দিয়া নীলের বিধ্বোতভিত্তি জীর্ণ ঘর খাড়া রাখাও তেমনই অসম্ভব। বিজ্ঞান-বাহন বিংশ শতাব্দীতে নীলের ব্যবসার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী ; মধ্য হইতে কেবল বাঙ্গালার রাজস্বের পচাত্তর হাজারী সূচিকাভরণের অপব্যয়।

এ সকল কথার আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় নহে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক। নীলের কথায় বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায় পূর্ণ। আমরা তাহারই আলোচনা করিব। এক

সময় নীলের ব্যবসা বঙ্গদেশের অতি প্রধান ব্যবসা ছিল ; বঙ্গদেশের চারি দিকে—পল্লীতে পল্লীতে নীলের কুটি বর্ত্তমান ছিল।* ১৮৬০ খ্রিষ্টীয় অব্দে যখন নীল-করের অত্যাচারজর্জ্জরিত বঙ্গে নীল-বিদ্রোহের বহ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠে, তখন পর্ণকুটীরবাসী প্রজা হইতে বড়লাট লর্ড ক্যানিং পর্য্যন্ত সকলেই বিচলিত হইয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালার ছোট লাট প্রজারঞ্জক সার জন পিটার গ্রাণ্ট, উদারহৃদয় পাদরী মিষ্টার লং, "হিন্দুপেট্রিয়ট" পত্রের সম্পাদক স্বাধীনচেতা বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহামতিগণের চেষ্টায় বঙ্গের প্রজাবৃন্দ "নীল-কর বিবধরের" "বিষপোরামুখ" হইতে কতক পরিমাণে পরিত্রাণ লাভ করে। তখন "নীলদর্পণ" প্রণয়ন করিয়া দীনবন্ধু প্রকৃত দীনবন্ধুর কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার কশাঘাতে নীল-করের মুখ হইতে মুখস খসিয়া পড়িয়াছিল। তখন পল্লীগ্রামের ধূলিধূসর বিরল-পান্থ পথে যাইতে পথিত ক্ষেত্রে হলকর্ষণ-রত কৃষকের কণ্ঠে গীত গান শুনিত—

"নীল বাঁদরে সোণার বাংলা কল্লে এবার ছারে খার !
অসময়ে হরিশ ম'ল, লংএর হ'ল কারাগার।
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার।
রাম সীতার কারণে। সুগ্রীবে মিলন করে বধে রাবণে,
যত সওদাগরেরা সহায় এদের, * * দুটো এডিটার॥
এখন, স্পষ্ট লেখা ঘুরে গেল, জজসাহেব এক অবতার॥
যত * * * রাজত্ব হ'ল, সাধুর পক্ষে গঙ্গাপার।"

আমরা এই সময়ের কথা বলিব।

নীলের হাঙ্গামাই সার জন পিটার গ্রাণ্টের শাসন-সময়ের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। তখন তাঁহার মত উদারচেতা, তেজস্বী ব্যক্তি বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়াই অত্যাচারপিষ্ট প্রজাকুল রক্ষা পাইয়াছিল। নহিলে, নীল-করদিগের সকল আবদারের রক্ষা হইলে দেশের সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইত।

১৮৫৯ খ্রিষ্টীয় অব্দের ১লা মে সার জন পিটার গ্রাণ্ট বঙ্গের ছোট লাট হইলেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই নীলকর ও প্রজার মধ্যে মনোবাদ

* আমি যে গ্রামে বসিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহার উত্তর ও দক্ষিণ দুই প্রান্তে এখনও দুইটি নীলকুটির ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। প্রসিদ্ধ "বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানি" ইহার একটির সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। ইহা কৃতী পুরুষ মিষ্টার লারমুরের তত্ত্বাবধানে ছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাঠক এই কৃতী পুরুষের পরিচয় পাইবেন।—লেখক।

প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এই জন্য নীলের বিষয়ে গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এপ্রিল মাসে বারাসাতের এক জন নীলকর গভর্মেণ্টের নিকট বিজ্ঞাপিত করেন যে, প্রজারা তাঁহার নীল বুনিতে অস্বীকার করিতেছে। ইহার কারণনির্দ্দেশস্থলে তিনি বলেন যে, নীলের চাষে যে প্রজার লাভ কম তাহা নহে; তবে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট নীলের বিরোধী হওয়ায় প্রজার এই স্পর্দ্ধা ও আপত্তি। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, ম্যাজিষ্ট্রেট কিছুই অন্যায় করেন নাই। এই উপলক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনারে মনোমালিন্য ঘটে; কিন্তু ছোট লাট ম্যাজিষ্ট্রেটেরই পক্ষসমর্থন করেন। এই ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ইডেনই পরে বঙ্গের ছোট লাট হইয়াছিলেন।*

এই বৎসর আগষ্ট মাসে ছোট লাট জলপথে নদীয়া জিলায় সফরে বাহির হইয়া প্রজার নিকট অনেক দরখাস্ত পাইলেন। সেই সকল দরখাস্তে প্রকাশ, নীলকরের সহিত মোকর্দ্দমায় প্রজারা ন্যায় বিচার পায় না। অপবাদ গুরুতর বলিয়া ছোট লাট বিশেষ প্রমাণ লইলেন; জানিলেন, অভিযোগ অনেকাংশে প্রকৃত। স্থানীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা তিরস্কৃত ও নীলঘটিত মোকর্দ্দমায় সত্বর ন্যায়সঙ্গত বিচার করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। ক্রমে উভয় পক্ষ হইতেই গভর্মেণ্টের নিকট অনেক আবেদন উপস্থিত হইতে লাগিল। নীলকরেরা অভিযোগ করিলেন, প্রজারা ন্যায্য নীল করিতে অস্বীকার করিতেছে। প্রজারা জানাইল, অত্যাচার করিয়া—বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নীল করিতে বাধ্য করা হইতেছে।

প্রজাদের দরখাস্তে ছোট লাট হুকুম দিলেন, যে প্রজারা দাদন লইয়াছে বা নীল বুনিতে অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহারা নীল বুনিতে বাধ্য; কিন্তু যে সকল প্রজা তাহাতে অনিচ্ছুক তাহাদিগকে নীল বুনিতে বাধ্য করা যাইবে না।

'নীলকর সভা' জানাইলেন, প্রজাদের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, গভর্মেণ্ট নীলের চাষের বিরোধী। সে ভ্রম দূর করা হউক এবং তাঁহাদের সুবিধার জন্য বিশেষ আইন করা হউক যে, চুক্তিভঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সরাসরি বিচার

---

* ছোট লাট ইডেনের মর্ম্মরমূর্ত্তির আবরণ-উন্মোচন উপলক্ষে তাৎকালিক ছোট লাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলী যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই—তিনি একাকী ক্ষমতাশীল নীলকর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; নীলকরের অত্যাচার-নিবারণের কার্য্য তৎকর্ত্তৃক আরব্ধ। যাঁহারা এরূপ কার্য্য করেন তাঁহাদের পক্ষে লোকাপবাদ-ভোগ অনিবার্য্য। ইডেনের অদৃষ্টেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।—লেখক।

হইবে। প্রথম প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়া ছোট লাট ১৪ই মার্চ্চ (১৮৬০) সেই মর্ম্মে এক পরোয়ানা জারী করিলেন। দ্বিতীয় প্রার্থনা গুরুতর। ছোট লাট বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, সত্বর কোন ব্যবস্থা না করিলে সে বৎসর নীলের মরসুম অতীত হইয়া যায়। এদিকে প্রজারা যেরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ আইনের বিধান ব্যতীত তাহাদিগকে চুক্তির সর্ত্ত পূর্ণ করিতে বাধ্য করা অসম্ভব। শেষে ৩১ শে মার্চ্চ তারিখে প্রজাদিগকে চুক্তির সর্ত্ত পূর্ণ করিতে বাধ্য করিবার জন্য ও উভয় পক্ষের অভিযোগের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, তদন্তের 'কমিশন' নিয়োগের এক আইন 'পাশ' করা হইল। এই আইন "An Act to enforce the fulfilment of indigo contracts and to provide for the appointment of a Commission of inquiry" নামে পরিচিত।

এই আইনে আপাততঃ স্থির হইল (১) বৈধ উপায়ে যে সকল চুক্তি করা হইয়াছে, বর্ত্তমান মরসুমে সে সকলের সর্ত্ত পূরণ করিবার জন্য সরাসরি বিচার হইতে পারিবে এবং (২) কেহ ভয় দেখাইয়া বা অন্যবিধ অবৈধ উপায়ে কাহাকেও চুক্তিভঙ্গ করিতে বা নীলের ফসল নষ্ট করিতে বাধ্য করিলে, সে দণ্ডিত হইবে। আইনে দণ্ডের বিধান রহিল।

প্রধানতঃ নদীয়া, যশোহর ও মালদহ জিলাতেই নীলের হাঙ্গামা হইয়াছিল। পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জিলার ব্যাপার তত গুরুতর হয় নাই।

গ্রাণ্ট্ আইন 'পাস' করিয়া বিশেষ বিবেচনা করিয়া আইন অনুযায়ী বিচারের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে উপদেশ দিলেন। যে সকল জিলায় গোলযোগ বাধিয়াছিল, সেই সকল জিলায় সৈন্য পাঠান হইল। সাজসজ্জায় সামান্য হাঙ্গামা হইয়াই ব্যাপার শেষ হইয়া গেল। দুই এক স্থানে ব্যাপার কিছু গুরুতর হইলেও, প্রথমে সর্ব্বত্র যেরূপ বিপদের আশঙ্কা ছিল, তত্তুলনায় সহজেই সব মিটিয়া গেল। নদীয়া জিলায় নূতন আইনঘটিত মোকর্দ্দমার বাহুল্যপ্রযুক্ত স্বতন্ত্র বিচারক নিয়োগের আবশ্যক হইল। পাবনা, যশোহর প্রভৃতি অনেক জিলায় কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের চেষ্টায় আপাততঃ বিপদ নিবারিত হইল।

সমস্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য যে 'কমিশন' নিযুক্ত হইল, তাহাতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিষ্টার সিটন-কার ও রিচার্ড টেম্পল্, প্রজা ও খ্রিষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের পক্ষ হইতে পাদ্রী মিষ্টার সেল, নীলকরদিগের পক্ষ

হইতে মিষ্টার ফার্গুসন এবং জমীদারদিগের পক্ষ হইতে বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 'কমিশনার' নিযুক্ত হইলেন। মিষ্টার সিটন-কার 'কমিশনে'র সভাপতি পদে বৃত হইলেন। 'কমিশন' ১৮ই মে হইতে আরম্ভ করিয়া ১৪ই আগষ্ট সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ করিলেন। ১৩৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইল। ইহার মধ্যে ১৫ জন সরকারী কর্ম্মচারী, ২১ জন নীলকর, ৮ জন পাদরী, ১৩ জন বাঙ্গালী ভূম্যধিকারী ও ৭৭ জন রায়ৎ। ২৭শে আগষ্ট 'কমিশনার'-গণ 'রিপোর্ট' দাখিল করিলেন। মূল 'রিপোর্টে' সিটন-কার, সেল ও চট্টোপাধ্যায় সহি করেন। টেম্পল্ সর্ব্বাংশে ইঁহাদিগের সহিত একমত না হইয়া এক স্বতন্ত্র 'রিপোর্ট' লিখিলেন। ফার্গুসন তাহাতে সহি করিলেন এবং নিজে এক স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলেন। প্রথমোক্ত তিন জন আবার তাহার এক উত্তর লিপিবদ্ধ করিলেন।

'রিপোর্টে' নীলসংক্রান্ত সকল বিষয়েরই আলোচনা করা হইয়াছিল। প্রজাদের পক্ষের অভিযোগ, তাহারা স্বেচ্ছায় নীল বপন করে না। যে সময় তাহারা আপনাদের অন্য অন্য লাভকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে চাহে, সেই সময় তাহাদিগকে নীলবপন ও পাট করিতে বাধ্য করা হয়। নীল কাটান ও গাড়ী বোঝাই করিয়া কুটিতে আনয়নকরাও বেগারে নিষ্পন্ন হয়। কুটির লোক সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জমীতে নীল বুনায়, এমন কি জমিতে অন্য ফসল থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া নীল বুনায়। তাহারা বাধ্য হইয়া নীলকরের নিকট ঋণী হইয়া পড়ে এবং সেই ঋণ পুরুষানুক্রমে টানে। কুটির লোকের দাঙ্গা, গুমি, কয়েদ, স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি বিবিধ পৈশাচিক ব্যবহারে এবং ঋণে প্রজারা প্রকৃত স্বাধীনতা হারাইয়া এক প্রকার ক্রীতদাসের দশা প্রাপ্ত হয়। The system generally was vicious in theory, injurious in practice and radically unsound.

নীলকরের পক্ষ হইতে বলা হইল, প্রজার উপর নীল-করের শাসন দেশীয় জমীদারের শাসন অপেক্ষা অল্প পীড়াদায়ক। আপনার জমী নহিলে নীলের আবাদে নানা অসুবিধা বলিয়াই তাঁহাদিগকে জমীদারী করিতে হয়। সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সন্দিগ্ধতা ও ঈর্ষ্যা, পুলিষের অসাধুতা, আদালতের দূরত্ব ও বিচারের দীর্ঘসূত্রিতায় তাঁহাদিগের বিশেষ অসুবিধা হয়। দেশীয় প্রজাগণের উপকার-করণার্থই তাঁহারা এদেশে আছেন। সভ্যতাবিস্তার,

উন্নতিসংসাধন এবং অত্যাচারনিবারণের জন্যই তাঁহাদের স্থিতি। দেশে তাঁহাদের উপস্থিতি রাজা ও প্রজা উভয়েরই পক্ষে শুভকর।*

'কমিশনে'র মন্তব্য তিন ভাগে বিভক্ত, যথা (১) নীলকরগণের ও প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যাসত্যনির্দ্ধারণ, (২) নীলকরগণ প্রচলিত প্রথার যে সকল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারেন সে সকলের নির্দ্দেশ, (৩) আইন, শাসন ও বিচার বিষয়ে যে সকল পরিবর্ত্তন গভর্মেণ্টের করণীয়, সে সকলের নির্দ্দেশ।

এই বৎসর ১৭ই ডিসেম্বর সার জন পিটার গ্রাণ্ট 'কমিশনে'র 'রিপোর্ট' সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। এই মন্তব্যে আমরা অনেক কথা জানিতে পাই। দেখিতে পাই, নীল-করের অত্যাচার বহুপূর্ব্ব হইতে আরব্ধ। বহুদিন পূর্ব্বেও এ বিষয়ে গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সেকালে য়ুরোপীয়গণকে দেশাভ্যন্তরে বাস করিতে হইলে, কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট হইতে অনুমতি-পত্র গ্রহণ করিতে হইত। ১৮১০ খ্রিষ্টীয় অব্দে গভর্মেণ্ট দেশীয়দিগের প্রতি অত্যাচারের অভিযোগে চার জন নীল-করের অনুমতি-পত্রের প্রত্যাহার করেন। তাহাদের বিরুদ্ধে চারিটি অভিযোগ প্রবল (১) আঘাত,—ইহাতে আইনের চক্ষে খুন না হইলেও আঘাতপ্রাপ্ত দেশীয়গণের জীবননাশ হইয়াছে, (২) কয়েদ, (৩) অন্য কুটির সহিত দাঙ্গা, (৪) দেশীয়গণকে প্রহার। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অর্দ্ধশতাব্দী পরে 'কমিশনের' 'রিপোর্টে' যে সকল অত্যাচারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল নূতন নহে। এতদিনের অভ্যাসেও যে সে সকল অত্যাচার বাঙ্গালার নিরীহ প্রজার সহনীয় হইয়া যায় নাই, ইহাই একান্ত বিস্ময়ের বিষয়। তৎকালে গভর্ণর জেনারেল যে 'সার্কুলার' জারী করেন, তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের প্রতি আদেশ ছিল, সামান্য বলিয়া যে সকল প্রহারের মোকর্দ্দমা 'সুপ্রিম কোর্টে' বিচারের উপযুক্ত নহে, সে সকলের বিষয়ও গভর্মেণ্টকে

* নীলদর্পণের" ভূমিকায় দীনবন্ধু ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আর কিছু বলিবার অবকাশ নাই। "তোমরা কহিয়া থাক যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যাদানে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং সুযোগক্রমে ঔষধ দেন; এ কথা যদিও সত্য হয়, কিন্তু তাহাদের বিদ্যাদান-পয়স্বিনী-ধেনু বধে পাদুকাদানাপেক্ষাও ঘৃণিত এবং ঔষধ বিতরণ কালকূটকুম্ভে ক্ষীর ব্যবধান মাত্র। শ্যাম চাঁদ আঘাত উপরে কিঞ্চিৎ টার্পিণ তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সরি করা হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কুটিতে ঔষধালয় আছে, বলিতে হইবে।" ইহা চূড়ান্ত জবাব।—লেখক।

জানাইতে হইবে, এবং য়ুরোপীয়মাত্রকেই বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, এ দেশে বাস করিতে হইলে তাঁহারা দেশীয়দিগের প্রতি অত্যাচার করিতে পাইবেন না।

১৮১১ খ্রিষ্টীয় অব্দে যশোহরের কালেক্টর প্রস্তাব করিলেন, ভিন্ন ভিন্ন কুঠীর মধ্যে তিন চারি ক্রোশ ব্যবধান রাখার ব্যবস্থা করা হউক। গভর্মেণ্ট তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, ইহাতে চতুঃপার্শ্বস্থ বহু সহস্র বিঘার নীলের উপর একজন মাত্র নীলকরের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে, সুতরাং প্রতিযোগিতার অভাবে প্রজার লাভ কম হইয়া দাঁড়াইবে। অধিকন্তু যদি জমীদারদিগকে এই প্রস্তাবে বাধ্য করা হয়, তবে তাঁহাদের ন্যায্য স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে না। প্রায় ১৮৪৪ খ্রিষ্টীয় অব্দ পর্য্যন্ত—বিশেষতঃ নীল-কর সভা সংস্থাপনাবধি—নীলকরগণ আপোষে আপনাদের মধ্যে দেশ ভাগ করিয়া লওয়ায় প্রজার বিশেষ অসুবিধা হয়। ইহাতে নীলকরদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা লোপ পায়, এবং তাঁহারা ইচ্ছামত অল্পমূল্যে নীল লইতে থাকেন। পূর্ব্বে প্রজারা প্রতিযোগী নীল-করের নিকট ইচ্ছামত মূল্য লইতে পারিত, এবং তাহাতে কোন হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে, এক পক্ষের সাহায্য পাইত। ইহাতে সে সম্ভাবনা লুপ্ত হইল। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে গভর্ণর জেনারল লর্ড মিণ্টো যশোহরের কালেক্টরের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যায়। 'রিপোর্টে' দেখা যায়, যে সকল কারণে ১৮১০ খ্রিষ্টীয় অব্দে চারি জন নীল-করের বাসের অনুমতিপত্র প্রত্যাহৃত হয়, সে সকল কারণ তিরোহিত হয় নাই।

ছোট লাট স্বীয় মন্তব্যে চারি প্রকার অভিযোগের প্রত্যেকের একটি করিয়া দৃষ্টান্ত দেন। 'রিপোর্টে' পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরে এক নদীয়া জেলাতেই নীলকরঘটিত ৫৪টি মোকর্দ্দমার উল্লেখ ছিল। ১৮১১ অব্দের 'সার্কুলারে' দেশীয়দিগকে প্রহার করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু এই তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, একটি মোকর্দ্দমায় নীলবপনে অস্বীকৃত প্রজাকে প্রহার করিবার অভিযোগে নীল-করের কর্ম্মচারীর এক মাস জেল হয়। ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে নীল-কর আবেদন করেন। যে স্থানে নীলকর জমীদার নহেন, সে স্থানে প্রজার কতকটা সুবিধা ছিল। কিন্তু নীলকরগণ ক্রমেই জমীদারী, পত্তনী বা ইজারা লইতে লাগিলেন, সুতরাং প্রজার সহিত মূল জমীদারের আর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সম্পর্ক রহিল না। তাহারা আর জমীদারের আশ্রয় পাইত না। এই

বিষয় লক্ষ্য করিয়া প্রজাবিদ্রোহ সম্বন্ধে গ্রাণ্ট্‌ মহোদয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ এই যে, প্রজারা দুই পুরুষ ধরিয়া যে অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছে, তাহার নিবারণচেষ্টাই এই বিদ্রোহের কারণ।

১৮১০ খ্রিষ্টীয় অব্দ হইতে নীল-করগণ আপনাদের সুবিধার জন্য বিশেষ আইন-প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮১১ খ্রিষ্টীয় অব্দে গবর্ণর-জেনারল লর্ড মিণ্টো বলেন, নীলকরগণের বিশেষ সুবিধার জন্য দেওয়ানী আদালতে বিচার্য্য মোকর্দ্দমা ফৌজদারী বিচারের উপযোগী, এরূপ নির্দ্দেশ করিবার কোনও আবশ্যক নাই। কিন্তু আন্দোলন-ফলে ১৮৩০ খ্রিষ্টীয় অব্দে এক বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ হয়। তাহাতে স্থির হয়, প্রজারা নীলের চুক্তিভঙ্গ করিলে তাহাদের বিচার দেওয়ানী আদালতে না হইয়া, ফৌজদারী আদালতে হইবে! এই আইনসংক্রান্ত কাগজপত্রে ইহার কোনও উপযোগিতাই লক্ষিত হয় না। কিন্তু—কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম; আবশ্যক অনাবশ্যকে আসে যায় না। "রাজ-নন্দিনী হয়ে' প্যারী যা করেন্‌ তাই শোভা পায়!"

মূল্যের স্বল্পতা হেতু নীল-বপনে প্রজার অনিচ্ছাই নীলকরের অত্যাচারের প্রধান কারণ। ক্রমে ক্রমে সমস্ত শস্যাদির মূল্য দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ বর্দ্ধিত হয়; মজুরের পারিশ্রমিক ও গবাদি পশুরক্ষার ব্যয়ও তদনুপাতে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু নীলকরগণ নীলের মূল্য বাড়াইলেন না। ইহাতে প্রজার ক্ষতি হইতে লাগিল। নীল-কর অত্যাচার করিয়া, তাহাদিগকে দিয়া, নীল করাইতে লাগিলেন। গ্রাণ্ট্‌ মহোদয় স্বীয় মন্তব্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বের কয় বৎসরে কৃষিজাতমাত্রেরই মূল্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইলেও নীলকরগণ কর্তৃক প্রদত্ত নীলের সামান্য মূল্য এক আনাও বাড়ে নাই! প্রজারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী না হওয়া পর্য্যন্ত নীলকরগণ নীলের মূল্য বাড়াইবার কল্পনাও করেন নাই।

নীলকরের অত্যাচার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। এ দিকে মহকুমার সংখ্যাবৃদ্ধিতে প্রজারা দেখিল যে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা অসম্ভব নহে। প্রজারা ইহাও বুঝিল, কেহ তাহাদিগকে অনিচ্ছায় —জোর করিয়া—নীল বুনাইবার চুক্তিবদ্ধ করিতে পারে না। নীলকরগণ অনেক সময় নূতন মহকুমা স্থাপনে আপত্তি করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'রিপোর্টে' দৃষ্ট হয়, যশোহরের এক জন নীল-কর তাঁহার কুঠীর নিকটে মহ-[illegible] আপত্তি করায়, মহকুমা সংস্থাপনের প্রস্তাব স্থগিত থাকে।

কারণনির্দ্দেশস্থলে নীলকর অন্যান্য কারণের মধ্যে বলেন, দেশীয়গণ স্বভাবতঃই মামলাপ্রিয়, নিকটে আদালত পাইলে তাহারা কেবলই মোকর্দ্দমা করিবে। মহকুমা সংস্থাপনের প্রস্তাব স্থগিত রহিল। এ দিকে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এক দিন ঘটনাক্রমে কুঠীতে বেড়াইতে গেলেন। পথে এক জন প্রজা নালিশ করিল, কুঠীতে কয় জন লোককে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান করায় ধরা পড়ে, কুঠীর গুদামে অনেক-গুলি লোক কয়েদ রহিয়াছে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন কুঠীতে প্রায় দুই মাস কয়েদ ছিল! বিচারে কুঠীয়ালের জরিমানা এবং এক জন আমলার জেল ও জরিমানা হয়। মহকুমার সংস্থাপনে নীলকরের আপত্তির কারণ সহজেই অনুমেয়।

অনেক জমীদার নীল-করের গরজ বুঝিয়া অতি উচ্চ মুনাফায় তাঁহা-দিগকে জমীদারী ইজারা দিতেন। এই অত্যধিক মালেকান খাজনা সংগ্রহের জন্য নীলকরগণ প্রজার উপর অত্যধিক কর ধার্য্য করিতেন। অধিকন্তু প্রজারা তাঁহাদের অধীন বলিয়া নীল বুনিতে বাধ্য হইত। ছোট লাট নীল-কর ও জমীদার উভয়েরই কার্য্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

‘কমিশন’ নীলকরদিগের সাক্ষ্য হইতেই সপ্রমাণ করেন, নীল বুনন প্রজার পক্ষে ক্ষতিজনক। ‘বৃটিশ ইণ্ডিয়ান’ সভা দেখান, এক বিঘা জমীতে উৎপন্ন নীল গাছ হইতে যে নীল পাওয়া যায়, তাহার মূল্য দশ টাকা মাত্র। গাছ হইতে নীল প্রস্তুত করিতে ব্যয় আছে। সুতরাং ঐ দশ টাকার মধ্যে নীল প্রস্তুত করার ব্যয় ও নীলকরের লাভ বাদ দিলে প্রজার ঝুলিতে বড় কিছু পড়ে না। অপর পক্ষে, এক বিঘা জমীতে অন্য কোন ফসল উৎপন্ন করিলে প্রজাই দশ টাকা মূল্য পায়। ছোট লাট স্বীয় মন্তব্যে বলিয়াছিলেন, বঙ্গের প্রজা ক্রীতদাস নহে, পরন্তু প্রকৃত পক্ষে জমীর স্বত্বাধিকারী। তাহা-দের পক্ষে এরূপ ক্ষতির বিরোধী হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। যাহা ক্ষতি-জনক, তাহা করাইতে গেলে অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী; এই অত্যাচারের আতিশয্যই নীল-বপনে প্রজার আপত্তির মুখ্য কারণ।

কোন কোন বাঙ্গালী জমীদারও নীলের কায করিতেন। প্রজারা তাঁহা-দের জন্য বিনামূল্যে—স্বেচ্ছায় কিছু কিছু নীল করিয়া দিত। তাঁহারা অল্প লাভেই তুষ্ট হইতেন, এবং তাঁহারা প্রজার মনের ভাব জানায় তাহাদের সহিত বিশেষ অসদ্ভাব হইত না। কিন্তু ইংরাজ নীল-করগণ শেষ ফলের প্রতি দৃষ্টিহীন

হইয়া, আশু লাভের জন্যই বিশেষ ব্যস্ত হইতেন। অধিকন্তু তাঁহারা প্রজার মনোভাবানভিজ্ঞ। এই সকল কারণেই তাঁহাদের ব্যবহার প্রজার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে।

'কমিশন' বলেন, দাদন একটা প্রলোভনমাত্র। নীলের ফলন গড়ে বিঘা প্রতি নয় কি দশ বাণ্ডিল। মূল্য টাকায় পাঁচ কি ছয় বাণ্ডিল, ক্বচিৎ বা চার বাণ্ডিল। খরচা—বিঘা প্রতি বীজের মূল্য চারি আনা হইতে আট আনা; কুঠীতে নীল পৌঁছানর খরচ বিঘা প্রতি চারি আনা হইতে দশ আনা ষ্ট্যাম্পের ব্যয় দুই আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত। ইহার উপর খাজনা ও শ্রমজীবীর পারিশ্রমিক আছে। সুতরাং যথোচিত সমস্ত ব্যয় বাদ দিলে লাভ যাহা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। মিষ্টার লারমুরের সাক্ষ্যে জানা যায়, বেঙ্গল-ইণ্ডিগো কোম্পানীর ভিন্ন ভিন্ন কুঠীতে ১৮৫৮—৫৯ অব্দে ৩৩,২০০ জন প্রজা নীল করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ২৪৪৮ জন মাত্র নীলের মূল্য বাবদ সামান্য দাদনের অতিরিক্ত কিছু পাইয়াছিল। * রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ জমীদার জয়চাঁদ পাল চৌধুরী মহাশয়ের অনেক নীলকুঠী ছিল। ইনি 'কমিশনে' সাক্ষ্য দেন। ইহাঁর সাক্ষ্যে অনেক প্রকৃত কথা জানা যায়। গত বিশ বৎসর ধরিয়া নীলের বিরোধী হইলেও, প্রজারা কেন নীল করিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে পাল চৌধুরী মহাশয় বলেন—প্রহার, কয়েদ, ঘর জ্বালান প্রভৃতি বিবিধ অত্যাচারে। 'কমিশন' প্রকারান্তরে এ সকলই স্বীকার করিয়াছেন। পাল চৌধুরী মহাশয়ের উত্তর উদ্ধৃত করিয়া ছোট লাট স্বয়ং বলিয়াছেন "This, diluted into becoming official language, I find to be the conclusion of the Commission; and it is certainly the inevitable deduction from the whole body of evidence."

ক্রমশঃ।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

---

* আমি যে স্থানে বসিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, তাহার অনতিদূরে কাটগড়া কুঠীতেই মিষ্টার লারমুরের প্রধান কার্য্যালয় ছিল। এই কুঠীর গৃহ এখনও বর্ত্তমান। এখনও বৃদ্ধদিগের মুখে "লারমন সাহেবের" অনেক অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এ প্রদেশে জনশ্রুতি বহুদিন সে কাহিনী বহন করিবে। শুনিয়াছি, ইনিই "নীলদর্পণের" লোকপ্রসিদ্ধ "শ্যামচাঁদ" নামের স্রষ্টা।—লেখক।

ছোট কাকী।

১

নয় বৎসরের একটি পুত্র রাখিয়া রামদয়ালের স্ত্রী স্বর্গারোহণ করিলেন। বত্রিশ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হইয়া রামদয়াল বড়ই বিপদে পড়িলেন—হৃদয়েও দারুণ ব্যথা পাইলেন। তবে রামদয়াল খাঁটি বাঙ্গলানবীশ, পাড়াগাঁয়ের জমীদারের কাছারীর ১৬ টাকা বেতনের তহশীলদার ;—তাঁহার পত্নীশোক কবিতাতেও উচ্ছ্বসিত হইল না, বা দীর্ঘকেশ ও গৈরিক বসনেও তাহা প্রকটিত হইল না। দিন যেমন যাইতেছিল, তেমনই যাইতে লাগিল ;—আকাশের নক্ষত্রও খসিয়া-পড়িল না, অশ্রুপ্রবাহে মাসিকপত্রের পৃষ্ঠাও অভিষিক্ত হইল না। কিন্তু রামদয়াল বড়ই বিপদে পড়িলেন।—বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক ছিলেন না ; কনিষ্ঠ কৃষ্ণদয়াল বর্দ্ধমানের উকীল। তিনি সপরিবারে সেখানেই থাকেন। তাঁহার স্ত্রী পল্লীগ্রামের খড়ের চালা-ঘরে বাস করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। সুতরাং পরিবারে লোক থাকিয়াও নাই।

স্ত্রীর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত রামদয়াল নিজেই রন্ধনাদির ভার গ্রহণ করিলেন। পিতা-পুত্রে অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলেন। শ্রাদ্ধের সময়ে কৃষ্ণদয়াল বাবু তিন দিনের জন্য বাটীতে আসিলেন ;—সপরিবারে নহে, একাকী। শ্রাদ্ধশেষে রামদয়াল বাবু কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, তুমি অমরকে সঙ্গে লইয়া যাও। বাড়ীতে থাকিলে তাহার পড়াশুনাও হইবে না, আর দেখে শুনেই বা কে? দুইটা ভাত দিবারও লোক নাই। প্রতিবেশীরা একটি বয়ঃস্থা মেয়ে দেখিয়া পুনরায় দার-পরিগ্রহের প্রস্তাব করিলেন। রামদয়াল একই কথা বলেন, "অমরনাথ বাঁচিয়া থাকুক।"

কৃষ্ণদয়াল বাবু দাদার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিলেন না,—মনে মনে অনিচ্ছা থাকিলেও সম্মত হইলেন। রামদয়াল একমাত্র পুত্রকে বর্দ্ধমানে পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদয়াল তিন দিন পরেই চলিয়া গেলেন ; যাইবার সময় দাদাকে বলিয়া গেলেন, তিনি যেন সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং অমরকে বর্দ্ধমানে রাখিয়া আসেন।

আজ নয় বৎসর অমরকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, এক দিনের জন্য চোখের আড়াল করেন নাই। অমরকে বর্দ্ধমানে রাখিয়া আসিতে রামদয়ালের মনে বড়ই কষ্ট হইল; কিন্তু কি করেন,—উপায় নাই।

যাইবার কথা শুনিয়া অমর বড়ই বিমর্ষ হইল। "বাবা, আমি তোমার কাছেই থাকিব। আমি ত দুরন্তপনা করিনে বাবা!" একদিন বড়ই কাতরভাবে অমরনাথ পিতাকে এই কয়টি কথা বলিল। রামদয়াল অনেক করিয়া ছেলেকে বুঝাইলেন। কাকার কাছে কোন কষ্ট হইবে না; লেখাপড়া না শিখিলে কি চলে? অগত্যা অমর স্বীকার করিল।

২

মাতৃহীন অমরকে লইয়া রামদয়াল বাবু যথাসময়ে বর্দ্ধমানে কৃষ্ণদয়াল বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণদয়াল তখন বাসাতেই ছিলেন; তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাদার পায়ের ধূলা লইলেন। অমরকে বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিলেন।

কৃষ্ণদয়ালের পত্নী অবসরপ্রাপ্ত সবজজ রমেন্দ্র বাবুর কন্যা; সবজজের মেয়ে বলিয়া তাঁহার মনে যথেষ্ট আত্মগরিমা ছিল, এবং কৃষ্ণদয়াল এম. এ, বি. এল্. হইলেও জুনিয়ার উকীল বলিয়া পত্নী মনোরমা তাঁহাকে কৃপার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহার যে যৎকিঞ্চিৎ পসার হইয়াছে, তাহা যে মনোরমার পিতার সই সুপারিসেরই জোরে, তাহা ভাবিয়া তিনি বিশেষ গর্ব্বিতা ছিলেন। একদিন পাড়ার কোনও জুনিয়ার উকীলের স্ত্রী তাঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া, তাঁহার স্বামীর ভাল উপার্জ্জন হইতেছে না, অথচ কৃষ্ণদয়াল বাবু তাঁহার পরে আসিয়াও বেশ পসার করিয়াছেন বলিয়া, কৃষ্ণদয়ালের প্রশংসা করিতে লাগিলেন; মনোরমার এ স্বামি-প্রশংসা ভাল লাগিল না। তাঁহার স্বামী যে নিজের গুণে পসার করিয়াছেন, এ কথা প্রতিপন্ন হইলে তাঁহার যে পসার কমিয়া যায়! তাই তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "ভাগ্যি বাবা সবজজ ছিলেন, তাই হাকিমদিগকে বলিয়া কহিয়া দিয়াছিলেন, তা নইলে আমাদেরও বাসাখরচ চলিত না। আর বাবা ত সর্ব্বদাই জিনসটা পত্রটা দিয়া সাহায্য করিতেছেন।" মনোরমার পরিচয় দিবার আর আবশ্যক হইবে না। তবে একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক,—মনোরমার সন্তানাদি হয় নাই।

অমর যখন বাড়ীর মধ্যে যাইয়া কাকীমাকে প্রণাম করিল, তখন

মনোরমা কি একখানি বই পড়িতেছিলেন ; অমর প্রণত হইলে তিনি একবার তাহার দিকে চাহিলেন, আবার পরক্ষণেই বই পড়িতে লাগিলেন। অমর একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।

অমর দ্বারের বাহির হইবামাত্রই মনোরমা বিশেষ বিরক্তির সহিত বলিলেন, "আবার একটা গেরো এসে জুট্‌লো।"

৩

বৈঠকখানা ঘরের পাশেই ছোট একটি কুঠুরী ; তাহাতে কৃষ্ণদয়াল বাবুর মোহরের হরেকৃষ্ণ শয়ন করিত। অমরের জন্য হরেকৃষ্ণ সেই ঘরটি ছাড়িয়া দিল। ছেলেমানুষ পড়াশুনা করিবে, নির্জ্জন ঘর হইলেই ভাল হয়। হরেকৃষ্ণ নিজের তক্তপোষখানি অমরকে ছাড়িয়া দিল। বাড়ীর ভিতর হইতে মনোরমা অনেক অনুসন্ধান করিয়া একখানি ছেঁড়া লেপ ও একটা মলিন বালিস বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন—ইহাই অমরের বিছানা। কৃষ্ণদয়াল বাবু অমরকে মিউনিসিপাল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

গিন্নীর আদেশ ছিল, বাবুর ও তাঁহার নিজের জন্য সরু চাউলের ভাত হইবে, আর সকলের জন্য মোটা চাউলের ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণঠাকুর ত আর এম. এ. বি এল. নয়, বা তাহার বাড়ীতে সবজজের মেয়ে বধূরূপেও বিরাজমানা নহে ; সুতরাং সে ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীর যেমন দস্তুর, তাহাদের মত গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ীতেও যাহা হইয়া থাকে, সেই ভাবিয়া, অমরের জন্যও সরু চাউলই বাহির করিয়া লইত। এ ব্যাপার পাঁচ ছয় দিন গৃহিণীর দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছিল। এক দিন হঠাৎ তিনি রান্নাঘরে যাইয়া দেখেন, অমর সরু চা'লের ভাত খাইতেছে। সবজজের কন্যা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কাহার হুকুমে ঠাকুর সরু চাউল এত নষ্ট করিতেছে বলিয়া ঠাকুরের কৈফিয়ৎ তলব হইল। ঠাকুর ভালমানুষ, সে বলিল, "মা ঠাকরুণ, খোকা বাবু আপনার পেটের ছেলের মত, তাই ভাবিয়া তাকেও সরু চাউলের ভাত দিই।" গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন, "আরে আমার পেটের ছেলে!—" আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কৃষ্ণদয়াল বাবু স্নান করিবার জন্য ভিতরে আসিলেন, এবং "ব্যাপার কি" জিজ্ঞাসা করায় "কিছু না" বলিয়া গৃহিণী উপরে চলিয়া গেলেন। সেই দিন হইতে চাকর বাকরের হাঁড়িতে অমরের অন্নের

৪

একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া অমর কাঁদ-কাঁদ মুখে বাড়ীর মধ্যে গেল। বিকালে সে আর কখন বাড়ীর ভিতর যাইত না; কারণ, তাহার ছোটকাকা বা ছোটকাকী তাহার জন্য কোনও প্রকার জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া দেন নাই। দুই তিন দিন দেখিয়া হরেকৃষ্ণ নিজ হইতে রোজ অমরকে দুইটি করিয়া পয়সা দিয়া যাইত, অমর তাহারই দ্বারা জল খাইয়া ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিত। অমরের উপর হরেকৃষ্ণের বড়ই স্নেহ হইয়াছিল। গরীবের দুঃখ গরীবেই বোঝে!

অমর আজ বাড়ীর ভিতর যাইয়া কাকীমাকে বলিল, "কাকীমা, আজ তিন দিন আমাকে স্কুলে যাইয়া এক ঘণ্টা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়; আমার রোজই লেট (Late) হয়।"

"লেট হয় তার আমি কি কোরবো?"

"আপনি যদি ঠাকুরকে একটু বোলে দেন, তা হ'লে সে সকালে ভাত দিতে পারে।"

"সে সব হবে টবে না। তোমার জন্য আবার সকালে কে ভাত রাঁধিতে যাবে। সকলে যেমন খায়, তেমনি খেয়ে থাকতে পার থাক, না পার দেশে চলে যাও। ঠাকুরপুত্র আর কি!"

অমর আর কথা কহিতে পারিল না; সে কাঁদিয়া ফেলিল। অপরাহ্নে হরেকৃষ্ণ বাসায় আসিলে অমর তাঁহাকে সকল কথা বলিল। হরেকৃষ্ণ লেখা-পড়া সামান্যই জানে, কিন্তু তাহার হৃদয় বড়ই কোমল। সে অমরের কথা শুনিয়া সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার চক্ষে জল দেখিয়া অমরও কাঁদিতে লাগিল। শেষে হরেকৃষ্ণ বলিল, "কেঁদো না ভাই, কষ্ট না করিলে কি লেখাপড়া হয়? বিদ্যাসাগরের নাম ত জান; তিনি কত কষ্ট ক'রে পড়াশুনা করেছিলেন, তাই তিনি বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন। তুমিও কষ্ট কোরছো, তুমিও বিদ্যাসাগর হবে। আমি আজ বাবুকে ব'লে তোমার সকালে ভাতের বন্দোবস্ত কোরে দেবো।"

সেইদিন রাত্রে কৃষ্ণদয়াল যখন কাজকর্ম্ম সারিয়া বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য উঠিলেন, সেই সময়ে হরেকৃষ্ণ অমরের দেরীতে স্কুলে যাওয়ার কথা বলিল; গিন্নী কি বলিয়াছেন, সে কথা আর বলিল না।

কৃষ্ণদয়াল বাবু শয়নগৃহে গিয়া মনোরমাকে বলিলেন, "দেখ,

ঠাকুরকে ব'লে দিও—কা'ল থেকে যেন একটু সকাল সকাল রান্না করে। অমরের স্কুলে যেতে দেরী হয়,—সেই জন্ম তাকে নাকি শাস্তি পেতে হয়।"

মনোরমা এই কথা শুনিয়া একেবারে ফুলিয়া উঠিলেন, অতি কর্কশ-স্বরে বলিলেন, "তা তোমার চাকর বামুন, হুকুম করলেই পার। আমি কোথাকার কে যে, তোমার চাকরের উপর হুকুম চালাতে যাবো? আমার এক পেট, খেতে দিতে যদি কষ্ট হয়,—বলিলেই পার, আমি বাপের বাড়ী চলে যাই। তারা আর আমাকে ফেল্‌তে পারবে না। এত অপমান কেন? এখন ভাইপো আপন হোলো; অপর আমার বাবা যে এত-গুলি টাকা গণিয়া দিয়াছিলেন, তা' আর এখন মনে হবে কেন?"

কৃষ্ণদয়াল একেবারে নিরুত্তর। ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিলেন; সে দিন আর তাঁহার আহার হইল না। অন্তঃপুরে যে সুধাপান করিয়া আসিলেন, তাঁহাতেই তাহার উদর পরিতৃপ্ত হইল।

৫

মাঘ মাস; বড় শীত। সেবার অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা শীত একটু বেশী পড়িয়াছিল। অমর একেলা সেই ছোট কুঠুরীতে থাকে। একদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে ছেলেমানুষ শয্যা কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রাতে উঠিয়াই অমর সে কথা তাহার সুখ দুঃখের একমাত্র সুহৃৎ হরেকৃষ্ণের নিকট অতি সঙ্কুচিতভাবে বলিতেছিল, এমন সময়ে ঝি সেই স্থান দিয়া যাইতে-ছিল। সেই দিন প্রাতে আবার বৃষ্টি হইতেছিল। একে মাঘ মাস, তাহাতে আবার বৃষ্টি, শীত আরও বেশী হইয়াছিল। ঝি জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?" হরেকৃষ্ণ বলিল, "ছেলেমানুষ, রাতে উঠ্‌তে পারেনি; তাই ঘুমের ঘোরে—।" ঝি বাড়ীর মধ্যে পদার্পণ করিয়াই সে কথা মনোরমাকে বলিল।

তখনও বৈঠকখানায় লোকজন আসে নাই, তখনও বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। মনোরমা একেবারে বৈঠকখানায় হাজির! "লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া! তোল্‌ বিছানা, মাদুর। এখনই পুকুর থেকে সব কেচে নিয়ে আয়। কি আমার আদুরে গোপাল রে!" হরেকৃষ্ণ কি বলিতে যাইতেছিলেন; গৃহিণী তাঁহাকে এক ধমক দিয়া নিরস্ত করিলেন। আবার হুকুম হইল, "তোল্‌ বিছানা! এখুনি কেচে এনে দিবি, তবে আমি এখান থেকে নড়বো।"

নয় বৎসরের ছেলে অমরনাথ ভয়ে একবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছিল। কি করে? সেই শীতের দিনে, সেই বৃষ্টির মধ্যে, কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া অমরনাথ প্রথমে লেপটি লইয়া ভিজিতে ভিজিতে পুষ্করিণীতে গিয়া তাহা কাচিয়া আনিল, তাহার পর সেই ছেঁড়া মাতুরটি লইয়া আবার ঘাটে গেল। শান-বাঁধা ঘাট, বৃষ্টি পড়িয়া পিচ্ছিল হইয়াছিল; অমর পা হড়কাইয়া সেই ঘাটে পড়িয়া গেল। তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল। ঘাটে পড়িয়া গিয়া একবার শুধু সে বলিল, "বাবা গো!" তাহার পর কতক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। কিন্তু বসিয়া থাকিয়া কি হইবে! কাকীমা যে বকিবেন। পায়ে ও মাথায় বড়ই লাগিয়াছিল; অমর বড় কষ্টে উঠিল। মাতুরটা জলে ডুবাইয়া দুই হাতে ধরিয়া লইয়া আসিল; মাতুরের জলে তাহার কাপড়-খানি একেবারে ভিজিয়া গেল, বৃষ্টিতেই পূর্ব্বে অনেকটা ভিজিয়াছিল।

সে দিন রবিবার; অমরের স্কুল বন্ধ। সমস্ত দিন চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় অমরের কেমন অসুখ করিতে লাগিল। কিছুই আহার করিল না; রাত্রে ভয়ানক জ্বর।

প্রাতঃকালে কৃষ্ণদয়াল বাবু শুনিলেন, অমরের জ্বর হইয়াছে। "সামান্য জ্বর, সারিয়া যাইবে। আজ কিছু খেতে দিও না!" ভ্রাতুষ্পুত্রকে না দেখিয়াই এই আদেশ প্রচার করিয়া কৃষ্ণদয়াল বাবু স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন; এবং দ্বিপ্রহরে আহারাদি করিয়া কাছারীতে গেলেন।

অপরাহ্নে কাছারী হইতে আসিয়া হরেকৃষ্ণ দেখিল, অমর বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। নিকটে কেহই নাই। গায়ে হাত দিয়া দেখে, গা ভয়ানক গরম, চক্ষু দুইটি জবা ফুলের মত লাল হইয়াছে, আর অমর অনবরত মাথা নাড়িতেছে। হরেকৃষ্ণকে দেখিয়া অমর বলিল, "দাদা! একটু জল খাবো, তৃষ্ণায় আমার বুক ফাটিয়া গেল যে দাদা।" ঘরে একটু জলও কেহ রাখিয়া যায় নাই। হরেকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি একটু জল আনিয়া অমরের মুখে দিল; কতকটা জল সে গিলিল, কিন্তু আর কতকটা গিলিতে পারিল না।

কৃষ্ণদয়াল বাবু সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে বাসায় আসিলেন। তখন হরেকৃষ্ণ বলিল, "অমরের জ্বর বড়ই বেশী হইয়াছে।" কৃষ্ণদয়ালবাবু বলিলেন, "রাতটা যাক্, কা'ল সকালে কেষ্ট কম্পাউণ্ডারকে ডেকে যা হোক করা যাবে।" হরেকৃষ্ণ বলিল, "বাবু, জ্বরটা ভাল বোধ হোচ্চে না, একবার ডাক্তার ডাকলে হয় না?"

"না হে, অত ব্যস্ত হ'লে কি হবে?—তা,না হয়, তুমি সরকারী ডাক্তারখানায় গিয়ে আমার নাম ক'রে একটু ফিবার মিক্শ্চার এনে দাও।"

হরেকৃষ্ণ বিষণ্নমুখে র‍্যাপারখানি গায়ে দিয়া ডাক্তারখানায় গেল। কিন্তু সে প্রথমে ডাক্তারখানায় না গিয়া একেবারে বরাবর ষ্টেশনে চলিয়া গেল; সেখানে দুইটি টাকা দিয়া রামদয়ালকে একটা টেলিগ্রাম করিল। তাহার পর ডাক্তারখানা হইতে একটা ফিবার মিক্শ্চার আনিয়া সমস্ত রাত্রি অমরকে খাওয়াইতে লাগিল।

কিছুতেই জ্বর থামিল না। রাত্রে প্রলাপ আরম্ভ হইল। অমর প্রলাপে শুধু বলে, "কাকীমা, আর আমি বিছানা খারাপ করিব না।"

৬

প্রাতঃকালে কৃষ্ণদয়াল বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অমরের অবস্থা বড়ই খারাপ। তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; মনে হইল, কি একটা জঞ্জাল! কি করেন, সরকারী ডাক্তারকে আনিতে পাঠাইলেন। বেলা নয়টার সময়ে ডাক্তার আসিল; রামদয়ালও তখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডাক্তার বলিলেন, "রোগীর জীবনের আশা নাই, জীবন-দীপ নিভিবার আর বিলম্ব নাই। বেলা বারোটা পর্য্যন্তও থাকে কি না সন্দেহ।" ডাক্তার ঔষধ দিলেন। প্রলাপ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রামদয়াল একমাত্র পুত্রকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

একবার অমর চমকাইয়া উঠিল; পরক্ষণেই বলিল, "কাকীমা! আর আমি বিছানা খারাপ করিব না।" তাহার পরেই সব নীরব হইল। অমরের ক্ষুদ্র আত্মা অমরধামে চলিয়া গেল।

শ্রীজলধর সেন।

আবহবিদ্যা।

২

প্রথম প্রস্তাবে আবহবিদ্যাসম্বন্ধীয় কতকগুলি স্থূল স্থূল বিষয় বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং এই বিদ্যার উন্নতিকল্পে অন্যান্য গবর্মেণ্টের ন্যায় আমাদের গবর্মেণ্ট কি করিতেছেন ও এ বিদ্যা এ পর্য্যন্ত কত দূর উন্নত হইয়াছে, তাহারও কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গিয়াছে। প্রথম প্রস্তাবের শেষভাগে প্রাচীন ভারতীয় আবহবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বায়ু সম্বন্ধে আরও কতকগুলি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইতেছে।

আমরা যাহাকে বায়ু বলিয়া থাকি, তাহা প্রধানতঃ চারিটিমাত্র গ্যাসের মিশ্রণ; যথা,—অক্‌সিজেন (Oxygen), নাইট্রোজেন (Nitrogen), কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস (Carbonic acid) ও জলীয় বাষ্প। বায়ুতে ইহারা সমভাগে নাই। ১০০ বোতল বায়ুর মধ্যে ৭৮ বোতল নাইট্রোজেন, ২১ বোতল অক্‌সিজেন, এক বোতল জলীয় বাষ্প ও অতি অল্পপরিমাণ কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস্ থাকে—প্রায় এক বোতলের দ্বাদশাংশ। ইহা ছাড়া আগন্তুক অনেকগুলি গ্যাসও সময়ে সময়ে বায়ুর সঙ্গে মিলিয়া বায়ু অস্বাস্থ্যকর করিয়া থাকে। পচা জলভূমি ও দুর্গন্ধময় নালি হইতে সালফারেটেড্ হাইড্রোজেন (Sulphuretted hydrogen) নামক গ্যাস উঠে। হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ (Hydrochloric acid), নাইট্রিক এসিড্ (Nitric acid), সালফিউরিক এসিড (Sulphuric acid), কার্ব্বোরেটেড্ হাইড্রোজেন (Carboretted Hydrogen) এমোনিয়া (Ammonia) ও ওজন (Ozone) ইত্যাদি আরও কতকগুলি শত্রু মিত্র গ্যাস বায়ুতে কখনও কখনও পাওয়া যায়। তা ছাড়া ধূলা, বালি, কয়লার গুঁড়া, প্লেগাদি সংক্রামক রোগের বীজ প্রভৃতি এই বায়ুসাগরে ভাসিয়া ভাসিয়া আপন আপনাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। গুল্ম, লতা, তরু হইতে আরম্ভ করিয়া কীট, পতঙ্গ, পশু ও মনুষ্য পর্য্যন্ত এই বিশাল জীবপ্রবাহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ কিরূপে এই কয়টি গ্যাস দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে, কিরূপে আমরা অক্‌সিজেন গ্যাস নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া

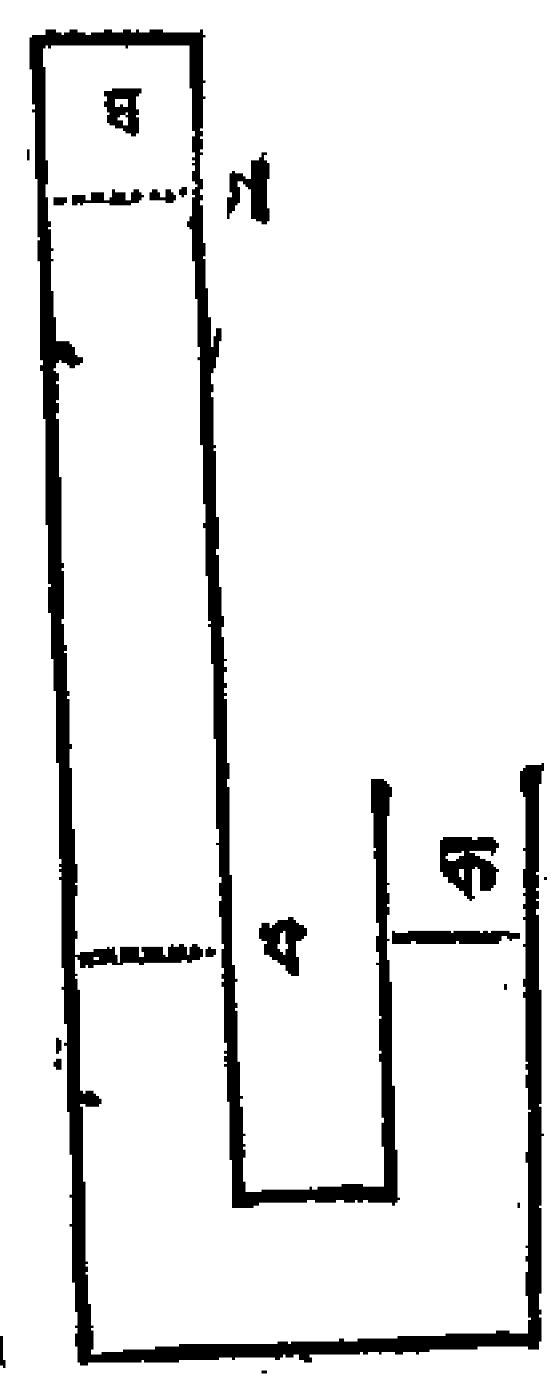
কার্ব্বনিক এসিড্ প্রশ্বাসের সহিত নির্গত করি, কিরূপে উদ্ভিদরাজি কার্ব্বনিক এসিড্ হইতে কার্ব্বন গ্রহণপূর্ব্বক আমাদের ব্যবহারের জন্য অক্সিজেন বাহির করিয়া বায়ুর নির্ম্মলতা রক্ষা করিতেছে, ইত্যাদি বিস্ময়কর জাগতিক ব্যাপার আজ কাল প্রায় অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু যে সকল মহাত্মা কঠোর তপস্যা দ্বারা প্রকৃতি দেবীর গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, এবং দিবসরজনী তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া আমাদের ক্ষুদ্রত্ব দূর করিবার জন্য জ্ঞানের পরিসর বর্দ্ধিত করিতেছেন, সেই মহাত্মারাই ধন্য! আসুন পাঠক! আমরা তাঁহাদের উদ্দেশে বারবার নমস্কার করি।

অক্সিজেন আমাদের প্রাণ রক্ষা করে, কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস্ উদ্ভিদ-জগতের পুষ্টিসাধন করে। জলীয় বাষ্প সকল স্থানে সমান থাকে না। রাজপুতানার উত্তপ্ত মরুভূমিতে অতিশয় অল্প, আবার নদীজলাশয়পূর্ণ বাঙ্গলায় খুব বেশী। উভয় স্থানেই উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসতি আছে; কিন্তু উভয় স্থানে তাহাদের প্রকৃতি বিভিন্ন। ওজন(Ozone) প্রাণবিনাশকারী অনেক গ্যাসের বিশ্লেষণ করিয়া প্রাণিজগতের উপকার করে। আবার এমোনিয়ার (Ammonia) মত দুষ্টপ্রকৃতি গ্যাস অতি অল্পই আছে। যে সকল মারাত্মক গ্যাস বায়ু অপেক্ষা গুরু বলিয়া নিজে চলিতে পারে না, এমোনিয়া তাহাদিগকে বহন করিয়া বেড়ায়। এমোনিয়া বায়ু অপেক্ষা লঘু, সুতরাং বায়ুর ভিতর দিয়া যেখানে সেখানে যাতায়াত করিতে পারে। যেখানে মানুষ আছে, এমোনিয়া সেই স্থানে ঐ মারাত্মক গ্যাসগুলিকে লইয়া যায় ও তাহাদিগকে অনিষ্টসাধন করিতে শিখাইয়া দেয়। সম্প্রতি এমোনিয়ার এইরূপ চলাচল বন্ধ করিবার এক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, কতকগুলি গাছের নিম্নদিকে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখ আছে; এমোনিয়া নিকটে আসিলেই তাহারা সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখ ব্যাদান করিয়া সমস্ত এমোনিয়া পান করিয়া ফেলে। সুতরাং সালফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন প্রভৃতি যে সকল প্রাণহিংসাকারী গ্যাস এমোনিয়ার স্কন্ধে ভর করিয়া চলিয়া থাকে, তাহারা বাহকাভাবে গাছের নীচে পতিত হয় ও মাটীর সহিত মিশ্রিত হইয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। আর কতকগুলি গাছ হইতে ওজন (Ozone) নির্গত হয়। ওজন বিষাক্ত গ্যাসকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহাদের সমস্ত অপকারক্ষমতা হরণ করিতে পারে। সুতরাং যদি আমরা আমাদের বাসস্থানের চারি দিকে বিশেষতঃ

যে দিক হইতে কোন দুর্গন্ধময় কি মেলেরিয়া-ভারাক্রান্ত গ্যাস আসিবার সম্ভাবনা, সে দিকে সেই গাছগুলি রোপণ করি, তাহা হইলে দুষ্ট এমোনিয়ার শত্রুতা হইতে আমরা কতকটা রক্ষা পাইতে পারি। কেহ কেহ এরূপ উপদেশ দেন যে, বাসস্থানের একুশ ফিট দূরে ওজন-(Ozone)-উৎপাদনকারী গাছগুলি লাগাইয়া তাহার প্রায় ছয় ফিট দূরে এমোনিয়া-ভক্ষণকারী গাছ এরূপ ভাবে লাগাইতে হইবে, যেন বাহির হইতে যে দিকেই এমোনিয়া আসুক না কেন, সেই দিকেই কোন না কোন গাছের উদরস্থ হইয়া যায়। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছের পাতায় মৃদু মনোরম গন্ধ থাকে, সেইগুলিই কোন না কোন প্রকারে উপকারী। সূর্য্যমুখী ফুলের গাছ, তামাকের গাছ, শুয়ার (Dill) গাছ, ভুট্টার গাছ ও মৌরীর গাছ এমোনিয়া পান করিয়া থাকে। আর পুদিনা, তুলসী, Borage myrtle, sage of all kinds, mignionette, Verbena (lemonscented), heliotrope ওজন (Ozone) উৎপন্ন করে। সুতরাং বাড়ীর ভিতরের দিকে তুলসী, পুদিনা ইত্যাদি লাগাইয়া বাহিরের দিকে সূর্য্যমুখী ও ভুট্টার গাছ লাগাইলে আমরা মেলেরিয়া প্রভৃতি বিষাক্ত বায়ু হইতে অনেকটা আত্মরক্ষা করিতে পারি। বায়ুবিজ্ঞানের সূত্র অনেক দুর ছাড়িয়া কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি,—আবার সেই সূত্র গ্রহণ করা যাউক।

আয়তনে চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য্য অনেক বড়। প্রায় ২৬০ লক্ষটা চন্দ্র একত্র করিলে সূর্য্যের মতন হইতে পারে। কিন্তু দূরত্বে চন্দ্র আমাদের অনেক নিকটে। সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯২৭ লক্ষ মাইল দূরে; কিন্তু চন্দ্র কেবলমাত্র ২৪০ হাজার মাইল। এত নিকটে থাকাতে পৃথিবীর উপর চন্দ্রের আকর্ষণের ফলস্বরূপ নানাবিধ নৈসর্গিক ব্যাপার লক্ষিত হইয়া থাকে। জোয়ার ভাটা যে এই আকর্ষণের ফল, তাহা চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াই বুঝা যায়। তা ছাড়া চান্দ্রিক আকর্ষণের প্রমাণস্বরূপ প্রাকৃতিক বহুবিধ ঘটনা সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির সাহায্যে পরিলক্ষিত হয়। পদার্থ যত তরল হয়, ততই আকর্ষণের বলে পরিবর্ত্তিত হয়। জল তরল বলিয়া জোয়ার ভাটা তাহাতে প্রকাশ পায়। বায়ু তাহা অপেক্ষাও তরল, সুতরাং চন্দ্রের আকর্ষণ তাহাতে আরও বেশী প্রতিফলিত হইবার কথা। কিন্তু দেখা যায় না বলিয়া তাহা বুঝিতে যন্ত্রাদির সাহায্য আবশ্যক হয়। ভূমির উপর চন্দ্রের আকর্ষণ যদিও সাধারণ ভাবে অবোধ্য, তথাপি যন্ত্রের সাহায্যে ভূমির স্তরের কম্পন বোধগম্য হয়।

বায়ুমান যন্ত্র কিরূপে নির্ম্মিত হয়, এবং তাহা দ্বারা কিরূপে চন্দ্রাদির আকর্ষণজনিত বায়ুর চাপের ন্যূনাধিক্য বুঝা যায়, তাহা জানা থাকিলে জোয়ার ভাটার ন্যায় বায়ুমণ্ডলে আকর্ষণ বিকর্ষণের কিরূপ পরিণতি হয়, তাহা কতকটা বুঝা যাইতে পারে। বায়ুমান যন্ত্র আর কিছুই নহে, কেবল একটি বক্র কাচের চোঙ্গা বা নল। তাহার এক দিক খোলা ও অন্য দিক একেবারে রুদ্ধ। এই নলে পারা পুরিয়া বদ্ধ দিক উপর দিকে করিয়া দিলেই বায়ুমান যন্ত্র হইল। যে দিক বদ্ধ, সে দিক হইতে (প্রতিকৃতিতে যথা ঘ নামক স্থান) বায়ু সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করা হইয়াছে; সুতরাং সে দিকে বায়ুর চাপ পড়িতে পারে না। যে দিক, খোলা (প্রতিকৃতিতে যথা ক প্রান্ত) সে দিকে বায়ুর চাপ পড়িয়া, যে দিকে বদ্ধ, সে দিকে পারাকে অনেক দূর উঠাইয়া রাখিয়াছে। খ হইতে গ পর্য্যন্ত পারার ওজনই বায়ুর ওজন। বায়ুমান যন্ত্র একরূপ জিনিষ মাপিবার তুলাদণ্ডের ন্যায়। ক নামক স্থানে উপরকার বাতাসের সমস্ত ওজন পড়িয়া খ হইতে গ পর্য্যন্ত যত পারা, তত ওজন উপরে উঠাইয়া রাখিয়াছে। যদি নলের ক প্রান্ত ভূপৃষ্ঠ হইতে যত দূর বায়ু আছে, তত দূর পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইত, তাহা হইলেও এতটুকু পারাই অন্য প্রান্তে উঠিত। এইরূপ দীর্ঘনলে যত বায়ু ধরে, তত বায়ুর ওজনই অপর প্রান্তের পারার ওজন। পারা না হইয়া যদি জল হইত, তাহা হইলে রুদ্ধ প্রান্তের জলীয় স্তম্ভের দৈর্ঘ্য অনেক অধিক হইত। মোটামুটি ধরিতে গেলে ১০০০ ফিট উচ্চ এক নলে যত বায়ু ধরিবে ও তাহার ওজন যত হইবে, ঐরূপ ব্যাসের নলে এক ইঞ্চ পারার ওজনও তত। সুতরাং সহজেই বুঝা যায় যে, যত উচ্চে উঠা যায়, ততই বায়ুর চাপ শরীরে কম লাগে। যদি কোনও দিন কলিকাতায় বসিয়া দেখ যে, পারা এক ইঞ্চ নামিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে মনে করিতে পার যে, তখন ১০০০ ফিট উর্দ্ধে উঠিবার ফল হইয়াছে।



পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা গিয়াছে যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বায়ুমান যন্ত্রের পারা প্রাতে ১০টা ও রাত্রিতে ১০ টার সময় সর্ব্বোচ্চে উঠিতে দেখা যায়; আর শেষরাত্রি ৪টা ও অপরাহ্ণ ৪টার সময় সর্ব্বনিম্নে নামিয়া থাকে। বায়ুমানযন্ত্র স্থিত পারদস্তম্ভের দৈনিক পরিবর্তন প্রায় এক ইঞ্চের দশমাংশের একাংশ হইতে

বিংশাংশ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। সুতরাং আমরা প্রত্যহই দুইবার পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থান করি, এবং দুইবার ঊর্দ্ধে উঠিবার ফল ভোগ করিয়া থাকি। যেন ভূপৃষ্ঠে আমাদের একটা আবাসবাটী, আর ১০০ ফিট ঊর্দ্ধে একটা বাগানবাটী আছে। পূর্ব্বাহ্ণে দশটার সময় একবার নীচে নামিয়া থাকি; ৪টার সময় বাগানবাটীতে যাই; আবার রাত্রি ১০টার সময় শয়নার্থ বাটীতে আসিয়া ভোরে ৪টার সময় বাগানবাটীতে প্রস্থান করি। এইরূপ ঊর্দ্ধে উঠা ও নীচে নামা অতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যখন অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্র বা অসময়ে হইয়া যায়, তখনই প্রবল বাত্যা ও ঝড় প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎপাত ঘটিয়া থাকে।

১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ৬ ঘণ্টা। যখন লণ্ডনে পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা, তখন কলিকাতায় অপরাহ্ণ ৪টা। ইহাতেই দেখা যাইতেছে, লণ্ডনে যখন বায়ুর চাপ অধিক, তখন কলিকাতায় চাপ অল্প। সেইরূপ প্যারিসে যখন চাপ অধিক, তখন মাণ্ডালাতে চাপ অল্প। কোনও স্থানে চাপ অধিক হইলে সে স্থানের বায়ু চারি দিকে বিভিন্ন হইয়া পড়িবার কথা। আর চাপ অল্প হইলে চারি দিক হইতে সে স্থানে বায়ু প্রধাবিত হইয়া আসে। এইরূপে বায়ুসাগরের মন্থন বিমন্থন প্রতিনিয়ত চলিতেছে। পৃথিবীর আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুসাগরের উত্থান পতন সংঘটিত হইতেছে।

প্রাচীন ভারতের আবহবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা চন্দ্রের সহিত বৃষ্টি-তত্ত্বের নিগূঢ় সম্বন্ধের উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বর্ষাকালে কোন্ দিন্ বৃষ্টি হইবে, কোন্ দিন হইবে না, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য তিথি নক্ষত্রাদির সাহায্য আবশ্যক। কৃষ্ণপক্ষে কি শুক্ল পক্ষে বৃক্ষলতাদি অধিক বাড়িয়া থাকে, চন্দ্রের কিরণে শস্যাদি কিরূপ পুষ্ট হয় ও ফল উৎপাদন করিয়া থাকে, ইত্যাদি বিষয়ে ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে চন্দ্রের অনেক নামের মধ্যে ওষধীশ, ওষধিপতি, ওষধিগর্ভ নামও পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কিন্তু চন্দ্রের সহিত বৃষ্টির সম্বন্ধ এখনও প্রতিপন্ন করিতে পারে নাই। এলাহাবাদের Pioneer পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় গত ৫ই অগষ্ট তারিখের পায়োনীয়রে ভারতীয় আবহবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।* তাহা দেখিয়া হয় ত

* "Meteorology was not an absolutely unknown science

ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্টের আবহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ইলিয়ট মহোদয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াছেন, অথবা অসম্ভব বলিয়া মুখ ফিরাইয়াছেন। কোনও নূতন সত্যই নির্ব্বিবাদে ও সহজে পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যেরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, হয় ত ভারতীয় আবহ-বিদ্যা ভারতের দিক দিয়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই পাশ্চাত্য জগতে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। গত ২৯শে অগষ্টের Nature নামক বিলাতের বিখ্যাত পত্রে এক জন বৈজ্ঞানিক তিথির সহিত বৃষ্টির সম্বন্ধ স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন। তিনি গ্রীনুইচের (Greenwich) ২৪ বৎসরের বৃষ্টির তালিকা হইতে সুন্দর প্রতিকৃতি দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, তিথির সহিত বৃষ্টির অকাট্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। তৃতীয় প্রবন্ধে ভারতীয় আবহবিদ্যা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীঈশানচন্দ্র দেব।

---

of old, Varahamihir, investigated the law of the weather-variations and arrived at certain conclusions which he recorded in his well-known work *Vrihat-samhita*. Eight chapters of the book, from the twenty-first to the twenty-eighth deal chiefly with the signs and indications by which rain can be predicted. In the twenty first chapter it is stated that, if when the star *ardra* is on the ascendant, an observer sees clouds having certain characteristics which are described, he can be sure that rain will fall at the place after six months and ten days, and rules are given by which the quantity of the rainfall can also be forecasted. A Bengali gentleman, Babu Ishan Chunder Deb, has been making observations for some time past with the object of ascertaining what truth there is in this theory of *Varahamihirian* meteorology. He says that he has already accumulated deta sufficient to convince him that there is an important scientific truth concealed in it, and promises to publish his discovery after further study of the subject. This reversion to ancient empirical theory coupled with the rise of quite a brood of professional rain compellers is not, we are afraid, very satisfactory evidence of the influence of scientific meteorology in India.

The Pioneer, 5th August, 1901, in an editorial leader.

সহযোগী সাহিত্য।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

ডাক্তার হেডিনের ভ্রমণাবদান।

যে নিঃশঙ্ক কর্ম্মযোগীর মহনীয় ভ্রমণকথা ইতঃপূর্ব্বে দুইবার * "সাহিত্যে" আলোচিত হইয়াছে, আজ আমরা পাঠকগণকে তৎসম্বন্ধে আরও কিছু শুনাইব। বিগত ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে, ডাক্তার হেডিনের মধ্য এসিয়ায় দ্বিতীয় পর্য্যটন আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত তারিখ হইতে গত বৎসরের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ গত আষাঢ়ের "সহযোগী সাহিত্যে" লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সম্প্রতি ডাক্তার হেডিনের সর্ব্বশেষ পত্রাবলী হইতে জানা গিয়াছে, তিনি তৎপরে (এই বৎসরের ২০শে এপ্রিল অবধি) আরও কত কৌতূহলোদ্দীপক ও প্রয়োজনীয় আবিষ্কার করিয়াছেন।

পূর্ব্বকথা।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, ডাক্তার হেডিন ইয়ারখন্দ্ ও তারিম নদী ধরিয়া লবনর প্রদেশে যাইয়া, বহুতর ভৌগোলিক তথ্যের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তথাকার পরিশ্রমের সাফল্য-সংবাদ যাবতীয় ভৌগোলিক পণ্ডিতগণের নিকট নিশ্চয়ই পরম আনন্দের কারণ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যে পুরাতন পরিশুষ্ক হ্রদগর্ভ আবিষ্কৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, "উহাই আদিম লবনর"—এই সাফল্য-গর্ব্বই তাঁহার নিজের অপরিসীম আনন্দের হেতু হইয়াছিল। অধুনা যে হ্রদটি "লবনর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা যে আদিম লবনর নয়, এ কথা তিনি প্রথম হইতেই বলিয়া আসিয়াছেন। এই উক্তি সপ্রমাণ করিয়া তিনি স্বয়ং যে অপরিসীম আনন্দ লাভ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শেষ পত্রের বিষয়।

গত বৎসর অক্টোবর মাসের শেষে, ডাক্তার হেডিন লিখিয়াছিলেন, তিনি তিব্বত-ভ্রমণের পর স্বকীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে, আরও দুইটি অভিযানে প্রবৃত্ত হইবেন। প্রথম,—তেইমিরলিকের পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বতপুঞ্জে পরিভ্রমণ; দ্বিতীয়,—নবাবিষ্কৃত প্রাচীন হ্রদগর্ভের পুনরায় পর্য্যবেক্ষণ। এই দুই স্থানের পর্য্যটনকথাই তাঁহার সর্ব্বশেষ পত্রের বিষয়ীভূত। কোনও ইংরাজ সহযোগীর প্রবন্ধ হইতে আমরা এই দুই স্থানের ভ্রমণবিবরণ সংগ্রহ করিলাম।

১ম—পর্ব্বত-পরিভ্রমণ।

বিগত নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে তিনি পশ্চিমস্থ Kum-Kul পর্ব্বতশ্রেণীতে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের মাপ লইলেন। হেডিন এক মাস মাত্র এই প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন; এই-এক মাসের পরিশ্রমেই তিনি অনেক আবিষ্কার করিয়াছেন! তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপূর্ব্ব দেশের মধ্য দিয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন; তজ্জন্য অনেক নূতন পথের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

ইহার পর, তিনি দুরূহতর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নয় জন পার্শ্বচর, এগারটি উষ্ট্র ও দশটি ঘোটক তাঁহার সঙ্গে চলিল। দুর্গম পার্ব্বত্য পথ দিয়া ডাক্তার হেডিন প্রথমে Khanambalএ পঁহুছিলেন। এই পথটি Little dale's Road এর দক্ষিণে

---

* ১৩০৪ সালের মাঘ মাসের ও বর্ত্তমান বৎসরের আষাঢ় মাসের "সহযোগী সাহিত্য" দ্রষ্টব্য।

অবস্থিত, এবং Khanambalএ গিয়া মিলিয়াছে। তথা হইতে তিনি বিস্তারসুন্দর Anambar-ula প্রদক্ষিণ করিয়া, Sirtingএর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার পর Khanambalএ ফিরিয়া আসিয়া, ডাক্তার হেডিন মরুপার হইয়া বরাবর উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তেমিরলিক হইতে সমস্ত গন্তব্য পথ তিনি অঙ্কিত করিয়া লইয়াছেন। তিনি দেখিলেন, সে পথের যে সকল মানচিত্র ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একখানিও ঠিক নয়।

এই পর্ব্বতভ্রমণ এত দিন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছিল; কিন্তু ইহার সমাপনের সমকালে ডাক্তার হেডিন ও তাঁহার সহচরদিগকে বিশেষ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। তাঁহার সযত্ন সংবেক্ষণাদির জন্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব; পক্ষান্তরে নানাবিধ পরীক্ষা ও চিত্রাদি অঙ্কনের অনুরোধে ধীর-গমন সর্ব্বদাই অপরিহার্য্য। তথাপি তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া প্রতিদিন দশ ক্রোশ চলিতেছিলেন।

জলাভাব।

এমন সময় হঠাৎ জলের অভাব ঘটিল! দ্বাদশ দিন যাবৎ এক বিন্দু জল পাওয়া যায় নাই! দ্বাদশ দিনযামিনী বিনাজলে শ্রান্তক্লান্তদেহে তাঁহারা কোনও ক্রমে চলিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিনে এক স্থানে হিমশিলা পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা তৎসাহায্যে অবশিষ্ট কয় দিন প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন; নতুবা জলাভাবে সকলেরই প্রাণবিয়োগ অনিবার্য্য হইত।

তিনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পুরাতন লবনর আবিষ্ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল মানচিত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের সাহায্যে বিনা আয়াসে Altimish Buluk এ উপস্থিত হইলেন; এবং তথা হইতে হ্রদগর্ভের উত্তর তটের অভিমুখে চলিলেন। উষ্ট্রগুলি তুষারভারে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তার হেডিন তাহাদিগকে "Buluk"এ পাঠাইয়া, সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এক সপ্তাহ বাস করিলেন। এই সাত দিন তিনি অক্লান্তভাবে অবিরাম পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সংখ্যাতীত চিত্র অঙ্কিত করিতে, বহুতর ফটোগ্রাফ তুলিতে, এবং নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করিতে তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত। এই সাত দিনের পরিশ্রমে তিনি যে সকল নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনই সংখ্যাবহুল। কিন্তু চৈনিক ভাষায় কাগজের উপর লিখিত বারখানি সম্পূর্ণ চিঠির আবিষ্কারই, তাঁহার মতে, সর্ব্বাধিক কৌতূহলোদ্দীপক। এই চিঠিগুলির কোনও অংশ বিনষ্ট হয় নাই; কালের ধ্বংসকরী প্রবৃত্তি তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই! বস্তুতঃ উহাদের অবিকৃত অবস্থা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। চিহ্ন ও অক্ষরগুলি সম্পূর্ণ পরিস্ফুট ও সুস্পষ্ট! অন্যান্য প্রাচীন দ্রব্যজাতের মধ্যে তিনি ত্রিশখানি ছোট ছোট কাষ্ঠখণ্ড পাইয়াছেন। ডাক্তার হেডিন বলেন, সেগুলি সম্ভবতঃ কোন প্রকার টিকিটরূপে ব্যবহৃত হইত। প্রত্যেকখানির উপর কোন না কোন সম্রাটের নাম; এবং তাঁহার রাজত্বের বৎসর, মাস, এমন কি, তারিখ পর্য্যন্ত খোদিত। এক জন Siah কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড পড়িয়া বলিলেন, সেগুলি আট শত বৎসরের পুরাতন। কিন্তু যত দিন না ডাক্তার গৃহে ফিরিয়া সেগুলির অনুবাদ করিতেছেন, তত দিন সাধারণের কৌতূহলতৃপ্তির সম্ভাবনা নাই। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তিনি একটি মনোরম বৌদ্ধমন্দির দেখিতে পাইয়াছেন। তাহার ভিতর কতকগুলি সুন্দরতম শিল্পচাতুর্য্যময় দারুগঠিত গৃহসজ্জা বিদ্যমান। তাহাদের মধ্যে একটি কোন বৃক্ষজাতীয়

২য়,— হ্রদগর্ভের পুনঃপর্য্যবেক্ষণ।

বহু মৎস্যের অস্থিপুঞ্জ দেখিয়াছেন ; এবং দক্ষিণে Korakoshun হ্রদে আজ কাল যে সকল মৎস্য দেখা যায়, এগুলি তাহাদের অস্থিপঞ্জরেরই অনুরূপ। তিনি বলেন, এই সকল দেখিয়া স্পষ্টতররূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাঁহার আবিষ্কৃত হ্রদগর্ভই আদিম লবনর—এবং বড় বেশী দিনের কথা নয়,—উহা জলপূর্ণ ছিল। এই মন্দিরে তিনি আর একটি দর্শন-যোগ্য দ্রব্য পাইয়াছেন!—একটি বুদ্ধ-মূর্ত্তি, কাষ্ঠে খোদিত। তিনি যে চিঠির কাগজে লিখিতেছিলেন, ঠিক তাহার অর্দ্ধাকৃতি একখানি কাষ্ঠ-খণ্ড পাইয়াছেন ; তাহাতে তিব্বতীয় ভাষায় কি লিখিত আছে। যে সকল চৈনিক পত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার একখানিতে লিখিত আছে, স্থানটির নাম Lolan ; এবং হ্রদগর্ভের নিকটস্থ যে পুরপথের কথা ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, এই পত্রে তাহারও উল্লেখ আছে ;—সেটি Lo-lan হইতে Sa-dseheeতে গিয়া মিশিয়াছে। এইরূপ বহুবিধ খোদিত কাষ্ঠ ও ধ্বংসাবশেষের বহুল ফটো তিনি সঙ্গে লইয়াছেন। ইউরোপের কত অনুসন্ধিৎসু ছাত্র সে সকল দেখিবার আশায় একান্ত উৎসুক হইয়া আছেন!

এই ভগ্নাবশেষ হইতে সঙ্কলিত দ্রব্যসমূহের ও বহুবিধ তথ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার সমগ্র অভিমতের ব্যাখ্যান এক্ষণে সম্ভব নয়। তবে, তিনি এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, কেবল লবনর সমস্যা সম্বন্ধেই একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিবার উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি হ্রদগর্ভ ও Kara-koshun এর মধ্যবর্ত্তী ভূপৃষ্ঠের সমতার তারতম্যও নিরূপিত করিয়াছেন। পুরাতন হ্রদগর্ভের উত্তরতটস্থ ভগ্নাবশেষ Kara-koshun হ্রদের উপরিভাগ অপেক্ষা ২,২৭২ metre উচ্চতর। পরীক্ষার দ্বারা হ্রদের গভীরতাও নিরূপিত হইয়াছে। তাঁহার পরীক্ষার সময় আধুনিক হ্রদের স্রোত উত্তর দিকে এত বেগে বহিতেছিল যে, তীরে তাঁবু খাটানও পর্য্যটকগণের পক্ষে নিরাপদ ছিল না।

তাঁহার শেষ পত্রের তারিখ বর্ত্তমান বৎসরের ২৭শে এপ্রিল। এই পত্র তিনি Charkhlik হইতে লিখিয়াছেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখেন, তাঁহার নামীয় বহু পত্র পড়িয়া আছে। আশ্চর্য্যের কথা, সকলেই তাঁহাকে লিখিয়াছেন, চীনের গোলযোগে সাবধান হইয়া থাকিও (তিনি যে চীন সাম্রাজ্যেরই স্থানবিশেষে পর্য্যটন করিতেছিলেন!) নৃপতি অস্কার ও অন্যান্য বন্ধুবর্গ তাঁহাকে সতর্ক করিয়াছেন,—"চীনেরা বড় নিষ্ঠুর, তোমার পর্য্যটন বন্ধ রাখ ; আমাদের ভয় হয়, কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া তুমি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইবে।" এই পাপশঙ্কী স্নেহের আতিশয্য দেখিয়া হেডিন না হাসিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের' মধ্যস্থলের একটি সহর হইলেও charkhlikএ কেবলমাত্র ১৫ জন চীন আছে। তাহারা ত তাঁহাকে ও তদীয় সহচর চার জন কসাককে যমের মত ভয় করে! চীনেরা ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া হেডিনের প্রত্যেক আদেশ পরিপালন করিত ; উষ্ট্র, অশ্ব, ভোজ্য প্রভৃতি নির্দেশপ্রাপ্তিমাত্র আনিয়া উপস্থিত করিত ;—ফলতঃ, তাহাদের নিকট হইতে অনিষ্টাশঙ্কার কারণ ছিল না।

চীনের ভয়।

ইহার পরে ডাক্তার হেডিন তিব্বতে যাইবেন, লিখিয়াছিলেন। সেখানে,—তিনি তাঁহার স্নেহার্দ্র বন্ধুগণকে আশ্বাস দিয়াছেন,—চীনের ভয় নাই!

ডাক্তার হেডিন প্রথম পর্য্যটনের সময় (১৮৯৩-৯৭) যে ভাবে মধ্য এসিয়ায় আপনার স্মরণীয় সপ্তাহ করিয়াছিলেন, এবার সেরূপ করেন নাই। প্রথম বারে তিনি কেবলমাত্র নানা স্থানের নক্সা, ফটোগ্রাফ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াই নিরস্ত হন নাই,—তৎসম্বন্ধে পুস্তকরচনাতেও ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। এবার কিন্তু তিনি

কার্য্য-ব্যবস্থা।

সংকল্প করিয়াছেন, গৃহে না ফিরিয়া গ্রন্থরচনায় সময়ক্ষেপ করিবেন না। সুতরাং তিনি প্রকৃত পর্য্যটকের কর্ত্তব্যে অধিকতর সময় দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবার তিনি ৭২৬ খানি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—তন্মধ্যে ১৫০ খানি খুব বড়। প্রথম বারের চিত্র-সংগ্রহ অপেক্ষা এবারকার সংগ্রহ প্রায় দ্বিগুণ। তাঁহার ইচ্ছা আছে, সেগুলি ৬০।৭০ খানি বড় বড় মানচিত্রে প্রকাশ করিবেন। যে সকল ভৌগোলিক ও ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার বিবরণও তিনি দুইখানি পুস্তকে প্রকাশিত করিবেন। প্রত্যেক পুস্তক প্রায় পাঁচ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে।

হেডিন এ বৎসরের মধ্যে ইউরোপে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না। শেষ পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, charkhlikএ আট দশ দিন থাকিবেন। তার পর, তিনি

কবে ফিরিবেন ?

তেমিরলিক হইতে তিব্বত অতিক্রম করিয়া সিন্ধুনদের জন্মস্থান দর্শনানন্তর মানসসরোবরের কিঞ্চিৎ উত্তরে যাইবেন। তাঁহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণের জন্য ধীরে ধীরে চলিতে হইবে। অতএব এ বৎসর আর তিনি গৃহে ফিরিতে পারিবেন না। তাঁহার সঙ্কল্প আছে, যদি পারেন, গৃহে প্রতিগমন করিবার পূর্ব্বে কলিকাতায় বড়লাট লর্ড কর্জ্জনের সহিত একবার দেখা করিবেন। আর, যে চারি

আর দুটি সঙ্কল্প।

জন কসাক তাঁহার অনুগামী হইয়াছে, তাহাদিগকে তিনি রুসিয়ার কোনও প্রদেশে নামাইয়া দিয়া যাইবেন। তাহাদের নিকট যে অমূল্য ও প্রভূত উপকার পাইয়াছেন, তাহার পুরস্কারস্বরূপ তিনি তাহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইয়া আশ্বস্ত হইবেন—তাহাদিগকে আর প্রবাসকষ্ট ভোগ করিতে দিবেন না।

অপাংক্তেয় শব্দ।

ব্রাহ্মণের মধ্যে অপাংক্তেয় আছে। সুন্দর সভ্য সুশিক্ষিত আর্য্যপ্রকৃতিসম্পন্ন,—গুণে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ,—অথচ ব্রাহ্মণেরা জাতিচ্যুত করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম, আচারে ব্যবহারে শিক্ষায় দীক্ষায় ব্রাহ্মণ, তথাপি অপাংক্তেয়। কেন কেহ জানে না, বলিতে পারে না ;—কতকগুলি অপ্রামাণ্য কিম্বদন্তী বিজয়ী দলের সম্বল। তবে কিছু না কিছু ছিল, অনেক দিনের কথা, সারিগাছার অনেক বাহিরে, খুঁজিতে যাইলে চক্ষু বিসারিত হয়, দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করিয়া গিরিসঙ্কট পার হইয়া অনেক দূরে—অনেক দূরে চলিয়া যায়।

শব্দের মধ্যেও অপাংক্তেয় আছে। সে অনেক দিনের কথা। সহস্র দ্বিসহস্র কুলায় না, বুঝি বা পঞ্চনদে। দেবভাষা অনার্য্যসংসর্গে কলুষিত হইয়াছে। অনার্য্য ভৃত্য, অনার্য্য প্রতিবেশী, ছেলেরা ও গৃহিণীরা কথাবার্ত্তায় কর্ত্তাদের সহিত অনার্য্য কথা ব্যবহার করেন। কর্ত্তাদের ভয়

হইল,—সাহিত্য ও শাস্ত্র, দর্শন ও ব্যাকরণ বুঝি বা অসাধু সংসর্গে অপবিত্র হয়। নদীতে বাণ আসিয়াছে, সহর যায় যায়। কাজেই খানিকটা স্থান ছাড়িয়া দিয়া, যাহা বাঁচাইবার উপায় নাই তাহা ছাড়িয়া দিয়া, ক্যান্টন্‌মেণ্টের চারি দিকে একটা বাঁধ দিবার প্রয়োজন হইল। সাহেবদের আস্তানা দুর্গ দিয়া ঘিরিতে হইল। সেই সময় সাধুভাষা—সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি। সাধু-অসাধু-জড়িত একটা ভাষা গৃহের জন্য, অবোধদের জন্য, গৃহ-কার্য্যের জন্য, বালক, স্ত্রীলোক ও দেশীয়দের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান ও সংহিতার জন্য একটা গড়খাইকরা সংস্কৃত ভাষা 'রিজার্ভ' করিলেন। অপরটির নাম প্রাকৃত হইল। সাধারণের জন্য, পণ্ডিতেতর সাধারণের জন্য, প্রকৃতিপুঞ্জের জন্য প্রাকৃত ভাষা রক্ষিত হইল। মোগল আমলের উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানী দেবরাজ্যের প্রাকৃত। প্রাকৃত সংস্কৃতের পূর্ব্বতন; প্রাকৃত দেশী ও দেবভাষার সঙ্কর। সুতরাং প্রাকৃত সংস্কৃতের জ্যেষ্ঠ হইলেও জ্যেষ্ঠা ভগিনী নহে। সংস্কৃতের ব্যাকরণ হইল, প্রাকৃতেরও ব্যাকরণ হইল। প্রাকৃত বৈয়াকরণ আপন ভাষাকে মূলভাষা ও 'নরাণাম্ আদিকল্পিতা' বলিয়া প্রচার করিলেন।

'সা মাগধী মূলভাষা নরেয় আদিকপ্পিকা'; সেই প্রাকৃত হইতে গাথা, গাথা হইতে পালী, পালী হইতে ত্রিহুতী উড়িয়া আসামী, ত্রিহুতী হইতে বাঙ্গালা। আসামী ও উড়িয়া বাঙ্গালার প্রাচীন ভাষার ভগিনী। সুতরাং আসামী ও উড়িয়াকে বাঙ্গালার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিতে হয় বল, মাসীমা বলিলে মন্দ হয় না।

সে যাহা হউক, যখন সংস্কৃত ভাষা গঠিত হয়, তখন দেবভাষা বা আর্য্য ভাষার অনেকগুলি শব্দ—আর্য্যসন্তান কোনও কারণে সংস্কৃত ভাষায় স্থান পায় নাই। সংস্কৃত দলে তাহারা অপাংক্তেয় হইয়াছিল; পাঁচ সাত হাজার বৎসর পরে আমাদের বলিবার অধিকার নাই—কেন ব্রাহ্মণসন্তান অপাংক্তেয় হইল, আর্য্যশব্দ অনার্য্য-দলে রহিয়া গেল।

শব্দের জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু আছে; শব্দের হ্রাস বৃদ্ধি আছে; জরা ও যৌবন আছে। শব্দ জীবপদার্থ না হইলেও জীবশরীরী, সংস্কৃতের সন্তান বাঙ্গালার শোভাবিধান করিতেছে।

"আছি"কে "অস্মির" সন্তান বলিলেও হয়, রূপান্তর বলিলেও হয়। সন্তান পিতার রূপান্তরমাত্র, "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।" কতকগুলি দেব-

সন্তান ; আকারে প্রকারে শিক্ষায় দীক্ষায় চরিত্রে ও সৌন্দর্য্যে দেবসন্তান বাঙ্গালা ভাষায় রহিয়া গিয়াছে। ইহাদের নাম জানি, ইহাদের পিতামহের নাম জানি, কিন্তু পিতার নাম জানি না। দেবভাষায় ইহাদিগকে দেখিতে পাই, বাঙ্গালা ভাষায় ইহাদিগকে দেখিতে পাই। কিন্তু সংস্কৃতে ইহাদের পরিচয় নাই।

সাহেবগঞ্জের পাহাড়ে কতকগুলি পাহাড়ীয়া বাস করে। কেহ কেহ ইহাদিগকে মালপাহাড়ী বলে। আকারে প্রকারে ও ভাষায় ইহারা আর্য্য-সন্তান। অনার্য্য সহবতে অনার্য্য হইয়া রহিয়াছে। পুরাণে শুনিয়াছি, কোন ক্ষত্রিয়ের পাঁচ সন্তান পিতৃশাপে অনার্য্য হইয়াছিল। আর্য্যসন্তান অনার্য্য হইয়াছিল কোন কারণে, কিন্তু আকার প্রকার বর্ণচিহ্ন পাঁচ সাত হাজার বৎসরেও পরিবর্ত্তিত হয় না। বর্ণ বুঝি কালের অতীত। ফেরোয়ার স্তম্ভে নিগ্রোর যে আকৃতি, যে বর্ণ দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চিত্রিত হইয়াছিল, আজও নিগ্রোর সেই আকৃতি, সেই বর্ণ। আফ্রিকা ছাড়িয়া আমেরিকায় গিয়াছে, সভ্য শিক্ষিত পণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু যে নিগ্রো, সেই নিগ্রোই রহিয়া গিয়াছে।

ভাষা শাস্ত্রের উৎকর্ষে দেবভাষার প্রকৃতি আমরা জানিতে পারিতেছি ; গ্রীক, লাতিন, টিউটনিক ভাষার তুলনা করিয়া কোন্ শব্দটি আর্য্যভাষা, কোন্‌টি নহে, বলিবার চিনিবার জানিবার উপায় হইয়াছে। সংস্কৃত আপন আত্মীয়কে মদগর্ব্বে অস্বীকার করিলেও, অপাংক্তেয় বলিয়া সমাজচ্যুত করিতে চাহিলেও, আমরা তাহাদিগকে উচ্চবর্ণে লুপ্ত স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পশ্চাৎপদ হইব না। আমরা গোষ্ঠীপতি, আমাদের সে অধিকার আছে।

একটি শব্দ ছেলে। ছাওয়াল, ছাবাল, ছেলিয়া প্রভৃতি রূপে ভারতের নানা ভাষায় এ শব্দটি পাওয়া যায়। ইহাই চিয়েল, চিল্ড ও চাইল্ড রূপে আঙ্গ্‌লো-স্যাক্‌সন্ ও ইংরাজী ভাষায় বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহ কাহারও নিকট ঋণ করে নাই। সুতরাং আর্য্য জাতির প্রাচীন ভাষায় এ শব্দটি বর্ত্তমান ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অথচ ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না। ইংরাজী 'ব্যানার্' শব্দ বোধ হয় বন্ধ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থ, একটুক্‌রা কাপড়, যাহা একখণ্ড বংশে বাঁধা যায়। ইংরাজী ব্যানার শব্দের অর্থ, পতাকা। সংস্কৃত অভিধানে পতাকা-বাচকও কোন শব্দ বন্ধ

ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু উড়িয়া ভাষায় পতাকার একটা নাম 'বাণা'। কবি অভিমন্যু সামন্ত সিঁহার তাঁহার বিদগ্ধচিন্তামণি নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"বাণা উড়ুছি যে দীনজনকৃতার্থিনী"। উড়িয়া 'বাণা' শব্দ প্রাচীন আর্য্য ভাষায় অবশ্য বিদ্যমান ছিল; নতুবা ইংরাজী ভাষায় যাইবে কি প্রকারে? সংস্কৃত ভাষা গঠিত হইবার সময়ে আচার্য্যগণ কোনও কারণে ইহাকে জাতিচ্যুত করিয়াছিলেন।

আর একটি শব্দ শোঁকা। শব্দের আকৃতি দেখিলে ইহাকে চণ্ডাল-জাতীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শোঙ্গা, শুঙ্গা প্রভৃতি আকারে ইহা হিন্দী, উড়িয়া, আসামী ভাষায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ইংরাজ কবি চসার শোঁক (Smoca) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আঙ্গলো-স্যাক্সন্ (Smoc) শোঁক, ডচ্ (Smook) শুঁক, ডানিশ্ (Smoge) শোঁগ, সকলেই একার্থবাচক। বোধ হয়, আর্য্য ভাষায় শ্মু ধাতু হইতে এই সকল শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত ধাতুমালায় শ্মু ধাতু নাই। ইংরাজী Smoke ও Smother একই ধাতু হইতে উৎপন্ন। বোধ হয়, শ্মু ধাতু নিশ্বাস বন্ধ করা অর্থে ব্যবহৃত হইত। যাহাতে শ্বাস বন্ধ হয়, এই অর্থে ইংরাজী স্মোক্ ও শ্বাসবন্ধ করা অর্থে ইংরাজী স্মদার শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে; ইংরাজী স্মেল্ (Smell) শব্দও শ্মু ধাতু হইতে উৎপন্ন। ডচ্ ও ডানিশ্ ভাষায় 'শ্মুর' শব্দের অর্থ বাষ্প ও গন্ধ।

তাই বলিতেছিলাম, আচার্য্যগণ সংস্কৃত ভাষা গঠন করিবার সময় অনেকগুলি আর্য্যশব্দ কোনও কারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

অনুসন্ধান করিলে এমন শব্দ অনেক পাওয়া যাইবে। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন "দেশজ" বলিয়া যে সকল শব্দ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাদের কেহ কেহ শ্রেষ্ঠবর্ণে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

উদ্ভিদের বংশবিস্তার।

সূচনা ;—আত্মরক্ষা।

জীবন-সংগ্রামে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই মূলনীতি অপরিহার্য্য। আত্ম-রক্ষার জন্য জীবকে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যাহার শরীরে বল অধিক, সে শত্রুর বিনাশ-সাধন করিয়া নিজের সুবিধা করিয়া লয়। যাহার শারীরিক বল নাই, সে বুদ্ধিবলে শত্রুর সংহার করে। যে শত্রুর বিনাশসাধনে অক্ষম, অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুঝিয়া উঠিতে পারে না, সে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাধান্যে পরাজিত হইয়া এমন স্থানে পলাইয়া যায়, যেথানে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, বা থাকিলেও তদপেক্ষা দুর্ব্বল। যাহাদের শারীরিক বল নাই, বুদ্ধি-চাতুরী বা ছলনাই তাহাদের প্রধান অস্ত্র। যাহাদের বল অধিক, আত্মরক্ষার উপায়-উদ্ভাবনের ক্ষমতা অধিক, তাহারাই রক্ষা পায়; যাহারা অক্ষম বা অযোগ্য, তাহারা নির্ব্বংশ হয়।

সংসার-ক্ষেত্রে কেবল প্রয়োজনীয় অন্নের সংস্থান করিয়া জীবনধারণ করিবার জন্য প্রত্যেক জীবকেই সর্ব্বদা বিশেষভাবে সচেষ্ট থাকিতে হয়। ধরণীতল সীমাবদ্ধ; জীবসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধনশীল। সংসারে যে পরিমাণ আহার্য্য মিলে, বিবর্দ্ধনশীল জীব-পরিবারের ভোক্তার সংখ্যার অনুপাতে তাহা প্রচুর নহে। তাই সকলকেই অন্নের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। নিজের দেশে জন্মস্থানে যাহারা পূর্ব্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারাই অতিকষ্টে আপনাদের আহারের সংস্থান করিতেছে;—নূতন যাহারা আসিতেছে, তাহারা ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে। সুতরাং সকলের পক্ষে 'দেশে' থাকা সুবিধা-জনক নহে; অনেককে স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে অন্ন খুঁজিতে যাইতে হয়। শ্বেতদ্বীপে অন্নলাভ অতি কষ্টসাধ্য, তাই শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণদ্বীপে উড়িয়া গিয়া জুড়িয়া বসেন! শ্বেতাঙ্গের বাহুবল অধিক না থাকুক, বুদ্ধিবল ও 'সাধন' অধিক। ফলে আমেরিকায়, ভারতবর্ষে, অষ্ট্রেলিয়ায় ও আফ্রিকায় ধবল আগন্তুকের সবল সন্তানের প্রচুর বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তি, এবং তত্রত্য শ্যাম অধি-বাসীর দুর্ব্বল বংশের দ্রুতক্ষয় ও অচিরভাবী উচ্ছেদ।

মধ্যভারতের উপলবন্ধুর প্রান্তর ও বালুকাময় মরুভূমে অন্ন সহজলভ্য নহে, তাই লোটা ও কম্বলমাত্র সম্বল করিয়া মারওয়াড়ী বহুদূরবর্ত্তী

বিদেশে অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে যায়। বহুজনাকীর্ণ জাহ্নবীকূল হইতে হিন্দুস্থানী আসামের চা-বাগানে, ব্রহ্মদেশের খনিতে, দেমারারা ও মরিশসের ইক্ষুক্ষেত্রে মজুরী খাটিতে যায়। বন্যাপ্লাবিতা বা শুষ্কসলিলা মহানদীর চির দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট তীরভূমি হইতে দারিদ্র্যপীড়িত উড়িয়া দলে দলে বঙ্গদেশে আসিয়া নানা উপায়ে অন্নসংস্থানের চেষ্টা করে। চীনদেশের জনসংখ্যা অত্যধিক, তাই চীনা আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষে আসিয়া অন্নের সংস্থান করে। বাঙ্গালী অপেক্ষাকৃত ধনী, অন্নের অভাব এখনও অত্যন্ত অধিক বোধ করে নাই, তাই বাঙ্গালীকে দলে দলে বিদেশে অন্নের চেষ্টায় এখনও যাইতে হয় নাই। তাঁহাদের এ অবস্থাও অধিক দিন থাকিবে না।

মানুষের যে অবস্থা, জীবরাজ্যের প্রত্যেক প্রাণীরই সেই অবস্থা। আফ্রিকায় যে বনে বেবুনের দল ফল মূল খাইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছিল, এখন আর সে বনে তাহাদের যথেষ্ট আহার্য্যের সংস্থান হইতেছে না, তাই তাহারা সদলে অন্য বনে আশ্রয় লইতেছে। দলমধ্যে সংখ্যারও বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং সেই দলে জাত অনেক তরুণ-বয়স্ক স্ব-দল পরিত্যাগ করিয়া অন্য বনে গিয়া নূতন দলের গঠন করিতেছে। হস্তিযূথ বহুকাল একই গিরিবনে বিচরণ করে না, আহারের অন্বেষণে পর্ব্বতান্তরের আশ্রয় লয়। যে সকল প্রাণী দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহাদিগকে প্রায়ই এক বনস্থলী পরিত্যাগ করিয়া অন্য বনস্থলীতে যাইতে হয়। যে সকল পক্ষী দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহাদিগকেও আহারের অন্বেষণে এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া বহুযোজন দূরে অন্য স্থানে যাইতে দেখা যায়। এইরূপ, বাদুড়, কোন কোন জাতীয় মূষিক, এমন কি, পিপীলিকা পঙ্গপালাদি নিকৃষ্ট প্রাণী কীটপতঙ্গাদিকেও জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া দলবদ্ধ হইয়া বিদেশে 'উপনিবেশ-স্থাপন' করিতে যাইতে দেখা যায়।

পশুপক্ষীদের মধ্যে এরূপ দেখা যায় যে, শিশুসন্তান যত দিন অসহায় থাকে ও উপার্জ্জনক্ষম না হয়, তত দিন মাতা নিজের সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করিয়া সন্তানের লালন পালন করে। সন্তান একটু বয়োধিক ও আহার অন্বেষণে সক্ষম হইয়া উঠিলে তাহার সহিত জননীর সমস্ত সম্বন্ধ লুপ্ত হইয়া যায়। তখন খাদ্য লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধে। যে অপেক্ষাকৃত বলবান, সে দুর্ব্বলকে তাড়াইয়া খাদ্য ভক্ষণ করে। কুকুর, বিড়াল, সিংহ, ব্যাঘ্র, ছাগ, মেষ, গো, মহিষ, হরিণ, বানর প্রভৃতি সকল পশুর সন্তানই

যথাকালে পিতামাতার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করে। জননীরাও, যাহাতে সন্তানেরা শীঘ্র শীঘ্র নিজে 'করিয়া খাইতে পারে,' সেই বিষয়ের শিক্ষাদানে তৎপর হয়।

প্রাণী সম্বন্ধে যে কথা, উদ্ভিদ্ সম্বন্ধেও সেই কথা। উদ্ভিদের জীবনবৃত্তিও প্রাণীরই অনুরূপ। জীবনধারণের জন্য তাহাকেও আহার্য্যের আহরণ করিতে হয়, বংশরক্ষার জন্য তাহাকেও সন্তান-উৎপাদন করিতে হয়। প্রাণী অপেক্ষা উদ্ভিদের বংশ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এক এক বৃক্ষে কত ফল ও কত বীজ জন্মে, তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। অহিফেন বা পোস্তগাছের এক একটি 'ঢেঁড়ি' বা বীজকোষে এক হাজার পর্য্যন্ত বীজ থাকে। শিয়ালকাঁটার এক একটি বীজকোষে দুই তিন শত বীজ থাকে। ভুট্টার এক একটি কাণ্ডে দুই হাজার বীজ থাকে। কুকুরশোঁকার একটি গাছে, বা হোগলাজাতীয় ঘাসের একটি শীষে ছয় সাত হাজার বীজ থাকে। একটি তামাক গাছে তিন লক্ষ বীজ জন্মে। একটি বটগাছে কত ফল জন্মে! সেই একটি ফলে কত বীজ জন্মে! সমস্ত গাছটিতে একবারে কত বীজ জন্মে, তাহা কল্পনা করা যায় না।

পৃথিবীতে যত গাছপালা আছে, সকলগুলির সকল বীজই যদি মৃত্তিকায় অনুকূল অবস্থায় পতিত হইয়া অঙ্কুরিত হইত, তাহা হইলে স্থানাভাবে ও রসাভাবে সকলগুলিই বিনষ্ট হইত। কিন্তু সকল বীজই ভূমিতে পতিত হয় না, হইলেও অঙ্কুরিত হইবার মত অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। কত বীজ শুকাইয়া ও পচিয়া নষ্ট হয়। কত বীজ কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী ও মানবের উদরসাৎ হইয়া তাহাদের দেহের পুষ্টিসাধন করে। অতি অল্পসংখ্যক বীজই অঙ্কুরিত হয়; আবার যতগুলি অঙ্কুরিত হয়, তাহাদের সবগুলিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। নানাপ্রকার প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত যে সংগ্রাম করিতে হয়, তাহাতে সনাতন নিয়মানুসারে সবল ও যোগ্যতমেরা রক্ষা পায়, দুর্ব্বল ও অযোগ্যেরা বিনষ্ট হয়। যে সকল গাছপালা বৃদ্ধি পায়, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি তৃণভোজী পশু ও মানবের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া অকালে বিনষ্ট হয়। সুতরাং অতি অল্পসংখ্যক বীজই অবশেষে গাছে পরিণত হইয়া উদ্ভিদ্জীবনের পূর্ণতা লাভ করে।

এক একটি গাছ হইতে উৎপন্ন প্রভূত বীজরাশির মধ্য হইতে অতি অল্পসংখ্যক বীজই বৃক্ষে পরিণত হয়। এই অল্পসংখ্যকের মধ্যেও যদি সমস্ত

বীজ, মূল বা উৎপাদক বৃক্ষের ঠিক তলদেশে পতিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিত, তাহা হইলে তাহাদিগকেও অচিরে অনাহারে বিনষ্ট হইতে হইত। জননী-বসুন্ধরার বক্ষঃস্থিত রসপীযূষ সহস্র মূলের পোষণ করিতে করিতে সহসা যদি লক্ষকণ্ঠে শোষিত হইত, তাহা হইলে অল্পদিনেই রসপায়ীদিগের কোমল কণ্ঠে আর রস মিলিত না। এতদ্ব্যতীত বৃক্ষতলের অল্পায়তন স্থানে বহুসংখ্যক বর্দ্ধিষ্ণু বৃক্ষশিশুর দেহাবয়বের যথাযথ বিস্তার ও প্রসার হইতে পারিত না;—পক্ষান্তরে তাহারা পরস্পর সংপীড়িত ও পিষ্ট হইত, এবং অত্যন্ত ঘনসন্নিবেশ ও মস্তকোপরিস্থ মূলবৃক্ষের শাখাপ্রশাখার ঘনচ্ছায়াবরণের ফলে, জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক উপাদান—বায়ু ও সূর্য্যালোকের অভাবে, বিনষ্ট হইত।

এমন অনেকপ্রকার উদ্ভিদ্ আছে, যাহারা মৃত্তিকাস্থিত উদ্ভিদ্‌দেহের প্রয়োজনীয় কতকগুলি ধাতব পদার্থ অতি শীঘ্র শীঘ্র নিঃশেষ করিয়া ফেলে। সেই জাতীয় কোনও উদ্ভিদের অনেকগুলি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কোন স্থানে একত্র বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ক্রমশঃ রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অবশেষে সেই নিঃশেষিত-সার মৃত্তিকা হইতে আর কোনও মতেই জীবন-রস টানিয়া বাহির করিতে পারে না। ইহা বুঝিয়াই বুদ্ধিমান কৃষক একই স্থানে উপর্য্যুপরি একই প্রকার ফসলের চাষ না করিয়া বিভিন্নপ্রকার ফসল উৎপন্ন করে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, উদ্ভিদ্‌বীজ মূলবৃক্ষ হইতে যত দূরে ছড়াইয়া পড়িবে, জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবার ও বংশলোপের আশঙ্কা হইতে নিস্তার পাইবার পক্ষে ততই সুবিধা ঘটিবে, এবং দৈবাধীন শুভঘটনাক্রমে যে সকল বীজ অনুকূল অবস্থায় পতিত হইবে, তাহারাই অঙ্কুরিত ও পরিণত হইয়া বংশব্যাপ্তির সহায়তা করিবে।

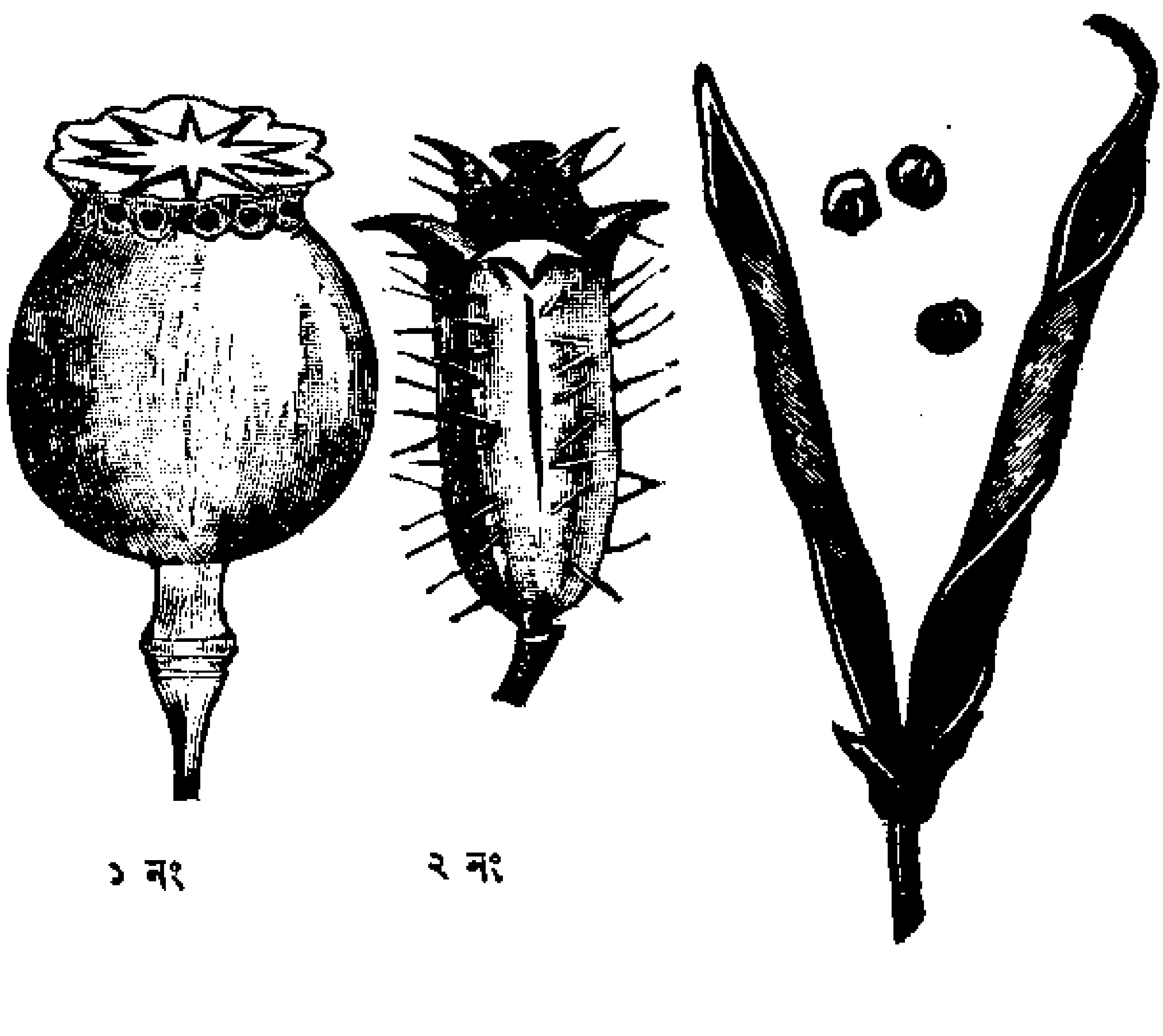
প্রাণীর হস্তপদ আছে, স্বেচ্ছাক্রমে যথা তথা ভ্রমণ করিতে পারে। এক স্থানে আহার না জুটিলে অন্য স্থানে চলিয়া যাইতে পারে। উদ্ভিদ্ কি করিবে? সে চলচ্ছক্তিরহিত; ভূতলে বদ্ধমূল হইয়া তাহাকে আজন্ম একই স্থানে অতিবাহিত করিতে হয়; অথচ প্রাণীর ন্যায় তাহাকেও জীবনধারণের জন্য সর্ব্বদা প্রয়াস পাইতে ও সংগ্রাম করিতে হয়। সেই জন্য বৃক্ষ এক স্থানে বদ্ধমূল থাকিলেও, তাহার অপত্যগণের দূরদেশে নূতন স্থানে গিয়া নির্ব্বিবাদে ও সহজে জীবিকানির্ব্বাহের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য প্রকৃতি অনেক উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রক্ষেপণ শক্তির দ্বারা দূরে বীজ-বিকীরণ করে। বায়ুপ্রবাহ ও জলস্রোত বীজব্যাপ্তির প্রধান সহায়। পশুপক্ষী ও মনুষ্য দ্বারাও নানাপ্রকার উদ্ভিদের ফল ও বীজ দেশদেশান্তরে নীত ও পরিব্যাপ্ত হয়।

আত্মশক্তিতে বীজব্যাপ্তি।

সাধারণতঃ, ছোট ছোট গাছপালার, বিশেষতঃ ওষধির ফল ও বীজ পাকিয়া গাছতলাতেই ঝরিয়া পড়ে। তজ্জন্য তাহাদিগের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। বীজ পাকিলেই এই সকল গাছপালার আয়ুঃশেষ হয়। সুতরাং উদরান্নের জন্য সন্তানের সহিত তাহাদের দ্বন্দ্ব বাধিবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। এই সকল গাছপালার আকার আয়তনও খুব ছোট, এবং ইহাদের শিকড়ও মৃত্তিকার ভিতর বহু দূর প্রবিষ্ট হয় না, উপরে উপরেই থাকে। বীজ গাছতলায় পড়িয়া অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইলেও তাহাদের আহার্য্যের অপ্রাচুর্য্য হয় না।

যথাকালে বৃন্তচ্যুত হইয়া ফল, বা ফল ফাটিয়া বীজ, গাছতলায় পড়াই বীজব্যাপ্তির প্রথম ও সহজ উপায়। এতদপেক্ষা ঈষৎ উন্নত উপায় বা কৌশল পোস্ত, শিয়ালকাঁটা প্রভৃতি গাছে দৃষ্ট হয়। এই সকল গাছের বীজকোষ পাকিলে লম্বালম্বি বিদীর্ণ হইয়া একেবারে ব্যাত্তমুখ বা "হাঁ" হইয়া পড়ে না। বীজকোষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত হয়, অথবা তাহা আংশিকরূপে ফাটে, এবং কোষটি এমন ভাবে অবস্থিত থাকে যে, মধ্যস্থ বীজগুলি অল্পে অল্পে



১ নং ২ নং ৩ নং

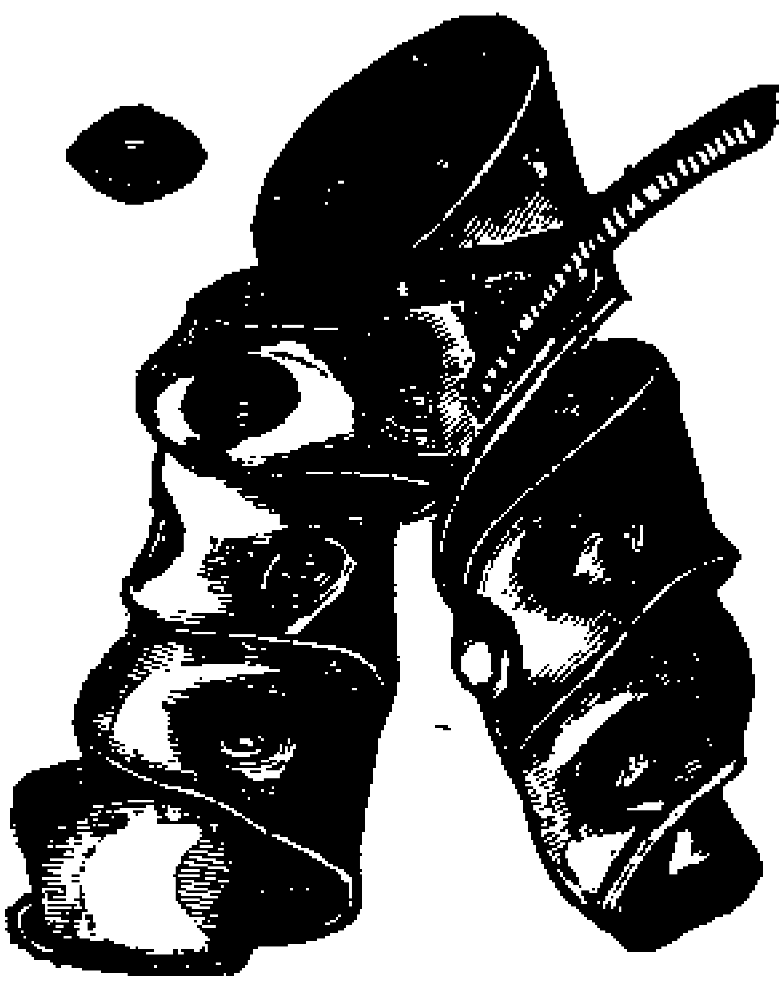
বিদারণমুখের সঙ্কীর্ণ পথে বাহির হইয়া বায়ুপ্রবাহজনিত আন্দোলনের ফলে গাছ হইতে কিয়দ্দূরে ছড়াইয়া পড়ে। পরিপক্ক হইলে পোস্তর ঢেঁড়ির (১নং)

শীর্ষপ্রদেশে চতুষ্পার্শ্বে দশটি ছিদ্র হয়। শিয়ালকাঁটার (১নং) বীজকোষের শীর্ষপ্রদেশ ফাটিয়া পাঁচটি ও ক্যাম্পিয়ানের বীজকোষ ফাটিয়া দশটি মুখ হয়। বঙ্গদেশের মাঠে ঘাটে বর্ষে বর্ষে এক প্রকার আগাছা জন্মে (Campanula dehisens), তাহা এক ফুট উচ্চ হয়, পত্র শূলাকার ও দন্তযুক্ত, শীত ও বসন্তকালে সাদা সাদা ঘণ্টাকার ফুল হয়। ইহার অণ্ডাকৃতি ছোট ছোট বীজকোষের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ থাকে। বিদারণসময়ে বীজকোষের অগ্রভাগ ফাটিয়া পাঁচটি মুখ হয়। এই জাতীয় অন্যান্য গাছের বীজকোষের শীর্ষপ্রদেশের চতুষ্পার্শ্ব ছিদ্রযুক্ত হয়। পবনান্দোলনে সেই সকল রন্ধ্র বা ফাঁক দিয়া বীজগুলি চতুর্দ্দিকে ছট্‌কাইয়া পড়ে। এইরূপ অনেক রকমের গাছপালা আছে, যাহাদের পরিপক্ক বীজকোষ হইতে বীজ সকল শাখার আন্দোলনে দূরে ছড়াইয়া পড়ে। বনে জঙ্গলে এমন অনেক লতা বা ঝোপগাছ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের পরিপক্ক, শুষ্ক, স্ফীত ও ফাঁপা, ঈষৎ-উন্মুক্ত বীজকোষের মধ্যে বীজ সকল আল্‌গা হইয়া থাকে; বীজকোষ নাড়া পাইলেই তাহারা বাহির হইয়া পড়ে। নাড়িলে ঝম ঝম শব্দ হয়, এই জন্য এইরূপ কোন কোন ফলকে "ঝুম্‌ঝুমি" নামও দেওয়া হইয়াছে।

এমন অনেক গাছ আছে, যাহারা নিজের বীজ নিজেই ছড়াইয়া দেয়। ইহাদের ফল বা বীজকোষের গঠনপ্রণালী এইরূপ যে, বীজ পাকিলে সেই কোষ বা পুটদেহ শুষ্ক হইয়া তাহাতে এত টান পড়ে যে, কোষ-কপাট সকলের সন্ধি সহসা বিচ্ছিন্ন হয়, এবং বীজকোষ সশব্দে "স্প্রিং"এর ন্যায় সবেগে দ্বিধা বা বহুধা ভিন্ন হইয়া যায়, এবং মধ্যস্থিত বীজগুলি সজোরে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। আকান্‌থেসি (Acanthaceœ) বংশীয় অনেক গাছের বীজকোষ ঐরূপ সবেগে ফাটিয়া যায়। তাহাতে মধ্যস্থ বীজ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। ভারতবর্ষের পূর্ব্বোপকূলের অনেক লোনা হ্রদ ও খালবিলের ধারে এবং বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে এক প্রকার কণ্টকময় ঝোপগাছ সচরাচর দৃষ্ট হয়। তাহার বড় বড় নীল ফুল হয়। নাম হরিকুশ বা 'হাকুঁচ-কাঁটা' (Acanthus illicifora)। ইহার বীজকোষ ছোট ডিমের মত; বিদারণ সময়ে সবেগে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ঐ বংশীয় নীললতা (Thunbergia) বঙ্গদেশের ঝোপে জঙ্গলে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গাছ লতানে; পাতা পানের পাতার ন্যায়; ফল বড় বড়, প্রায় চার ইঞ্চ

চৌড়া, ঘণ্টাকার, নীল। ইহার ফল বা বীজকোষ গোল ও চঞ্চুযুক্ত, পাকিলে সবেগে দ্বিখণ্ড হইয়া বীজ বিক্ষেপ করে। ঐ বংশের অন্তর্গত কুরুণ্টক বা কাঁটা জাতি (Barleria prionites), সাদা জাতি (B. dichotoma) দাসী (B. cœrulea), কালমেঘ (Justicia paniculata) কাঁটাকলিকা (Ruella longifolia) প্রভৃতি গাছের বীজকোষও বেগে স্ফোটনশীল ও বীজবিক্ষেপকারী।

শিম্বী-বংশীয় (Leguminœ) অনেক গাছের "ছড়" বা শিম (৩ নং) ফাটিয়া তাহার কপাট দুখানি সবেগে 'স্ক্রুর' আকারে গুটাইয়া যায়, তাহাতেই বীজগুলি দূরে ছট্‌কাইয়া পড়ে। অনেক প্রকার মটর ও শিমের বীজ ঐ প্রকারে বীজকোষ হইতে বিক্ষিপ্ত হয়। রক্তচন্দনের (Adenanthera Pavonina) খুব বড় বড় গাছ হয়, তাহার ছড় বা শিমও বেশ বড় বড় হয়। তাহা পাকিয়া শুষ্ক হইলে সশব্দে লম্বালম্বি ফাটিয়া যায়, এবং দুই অংশ বা কপাট সবেগে বহির্মুখ হইয়া গুটাইয়া যায় (৪ নং) তাহাতে কপাটসংলগ্ন রক্তবর্ণ বীজগুলি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। গর্স (Gorse, furze ; Ulex Europeœs) নামে এক প্রকার ছোট কাঁটা গাছ আছে ; তাহার মটরের মত শুঁটি হয়। শুঁটির মধ্যে বীজ যখন বেশ পুষ্ট হয়, তখন বীজে পরিপূর্ণ শুঁটিটা বেশ ফোলা ও টান হইয়া থাকে। বীজ পাকিলে ক্রমে রস শুকাইয়া শুঁটির

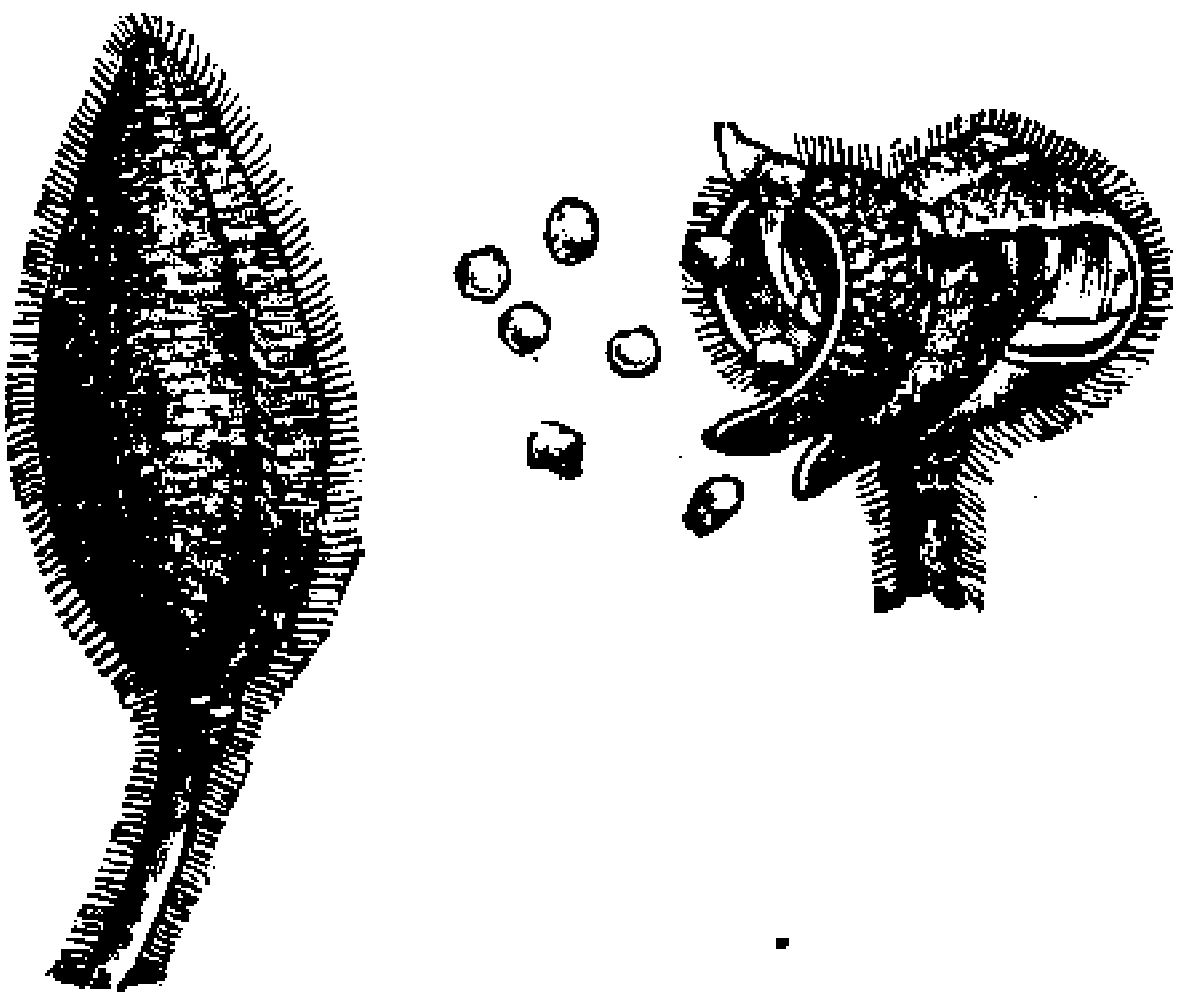


(৪ নং)

কপাট দু'খানির পার্শ্বভাগ আকুঞ্চিত হইতে থাকে, কিন্তু দুই ধারের পশুর্কার ন্যায় শক্ত অংশ তাহাদিগকে স্বস্থানে বিস্তৃত করিয়া রাখে। অবশেষে যখন এক দিন রৌদ্রতাপে বীজকোষ শুষ্ক হইয়া এত আকুঞ্চিত হইয়া যায় যে, দুই পার্শ্বের কঠিন পশুর্কাও আর কপাট দু'খানিকে প্রসারিত করিয়া রাখিতে পারে না, তখন কপাট দু'খানি সশব্দে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সহসা সবেগে গুটাইয়া যায়, এবং কোষমধ্যস্থ সমস্ত বীজকে "গুলির" ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করে। ভারতবর্ষের বনে জঙ্গলে অনেক স্থানে ঐরূপ অনেক গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে ইহাদের ফল পাকে, সেই

সময়ে যে বনে ঐ প্রকারের গাছ অনেক থাকে, সেই বনে কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিলে চারি দিকে ফল ফাটিবার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

সকলেই দেখিয়াছেন, দোপাটি ফুলের সুপক্ক বীজকোষ স্পর্শ করিবামাত্র ফাটিয়া গিয়া কোষের (৫ নং) প্রত্যেক অংশ বা কপাট গুটাইয়া যায়, এবং বীজগুলি দূরে ছটকাইয়া পড়ে। আমরুলের (oxalis acetosa) বীজকোষও দোপাটির বীজকোষের ন্যায় সবেগে ফাটিয়া যায়। জিরেনিয়ামের ফল পাঁচটি বীজকোষের সমষ্টি।



(৫ নং)

এক একটি কোষে এক একটি বীজ থাকে। ফলের মধ্যস্থিত উন্নত দণ্ডের নিম্নভাগে চতুর্দ্দিকে কোষগুলি অবস্থিতি করে। প্রত্যেক কোষের শীর্ষভাগ বন্ধনীর ন্যায় সরু ও লম্বা, এবং তাহা দণ্ডে সংলগ্ন হইয়া দণ্ডাগ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। বীজ পাকিলে ফলটি উর্দ্ধমুখ হয়, এবং বীজকোষের বন্ধনীর ন্যায় অংশে খুব টান পড়িতে থাকে; অবশেষে কোষগুলি ফাটিয়া দণ্ড হইতে আল্‌গা হইয়া যায়, এবং বন্ধনীগুলিও দণ্ডের মধ্যভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, "স্প্রিং"এর মত হঠাৎ বাঁকিয়া উপর দিকে উঠিয়া পড়ে, এবং সেই আকর্ষণের বলে বা ঝাঁকড়ানির চোটে, বীজ বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। ওট (oat, avena sativa) পাকিলে বৃন্ত বা পুষ্পকুণ্ড



(৬ নং)

হইতে বীজ এত জোরে নিক্ষিপ্ত হয় যে, পরিষ্কার শুষ্ক দিনে সুপক্ক ওটক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমন করিলে চতুর্দ্দিক হইতে ওট নিক্ষিপ্ত হইবার শব্দ বেশ শুনিতে পাওয়া যায়।

কোন রসাল পাকা ফল অঙ্গুলি দ্বারা ধরিয়া চাপিলে যেমন তাহার মধ্য

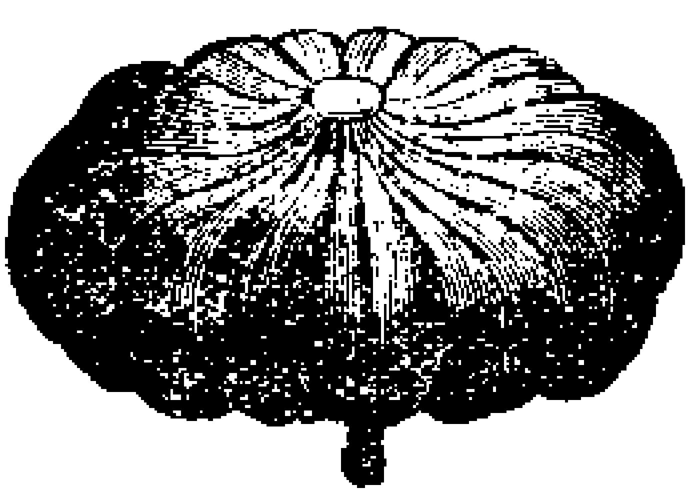
হইতে বীজ বেগে বাহির হইয়া পড়ে, কোন কোন ফল সঙ্কুচিত হইয়া নিজে নিজেই এইরূপে চাপিয়া বীজ বাহির করিয়া দেয়। ভায়োলেট (Violet canina) ফুলের বীজ পাকিলে বীজকোষ তিন ভাগে ফাটিয়া যায়, কিন্তু তাহার মুখ উপর দিকে থাকে (৬)। প্রত্যেক কপাট ক্ষুদ্র ডোঙ্গার মত ও তাহাতে তিনটি হইতে ছয়টি বীজ থাকে। প্রত্যেক বীজ সূত্রবৎ বন্ধনী বা নাভিরজ্জু দ্বারা কোষ-কপাটের সহিত সংযুক্ত থাকে। সেই জন্য বীজকোষ ফাটিয়া যাইবামাত্র বীজ বাহির হইয়া পড়ে না। নৌকাকার কপাট তিনখানি ক্রমেই যত সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তাহাদের দুই পার্শ্ব বা ধার তত পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হয়; অবশেষে মধ্যস্থলের বীজগুলিকে চাপিয়া ধরে; কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বীজগুলি এই চাপ সহ্য করে; পরে চাপের আধিক্যে বীজের নাভিরজ্জু ছিন্ন হইয়া যায় এবং বীজ আট দশ ফিট দূরে ছটকাইয়া পড়ে।



(৭নং)

আমেরিকার উইচ হেজল (৭ নং) (Hamamclis virginica) ফলও ঐ প্রকারে চাপিয়া-বীজ বাহির করিয়া দেয়।

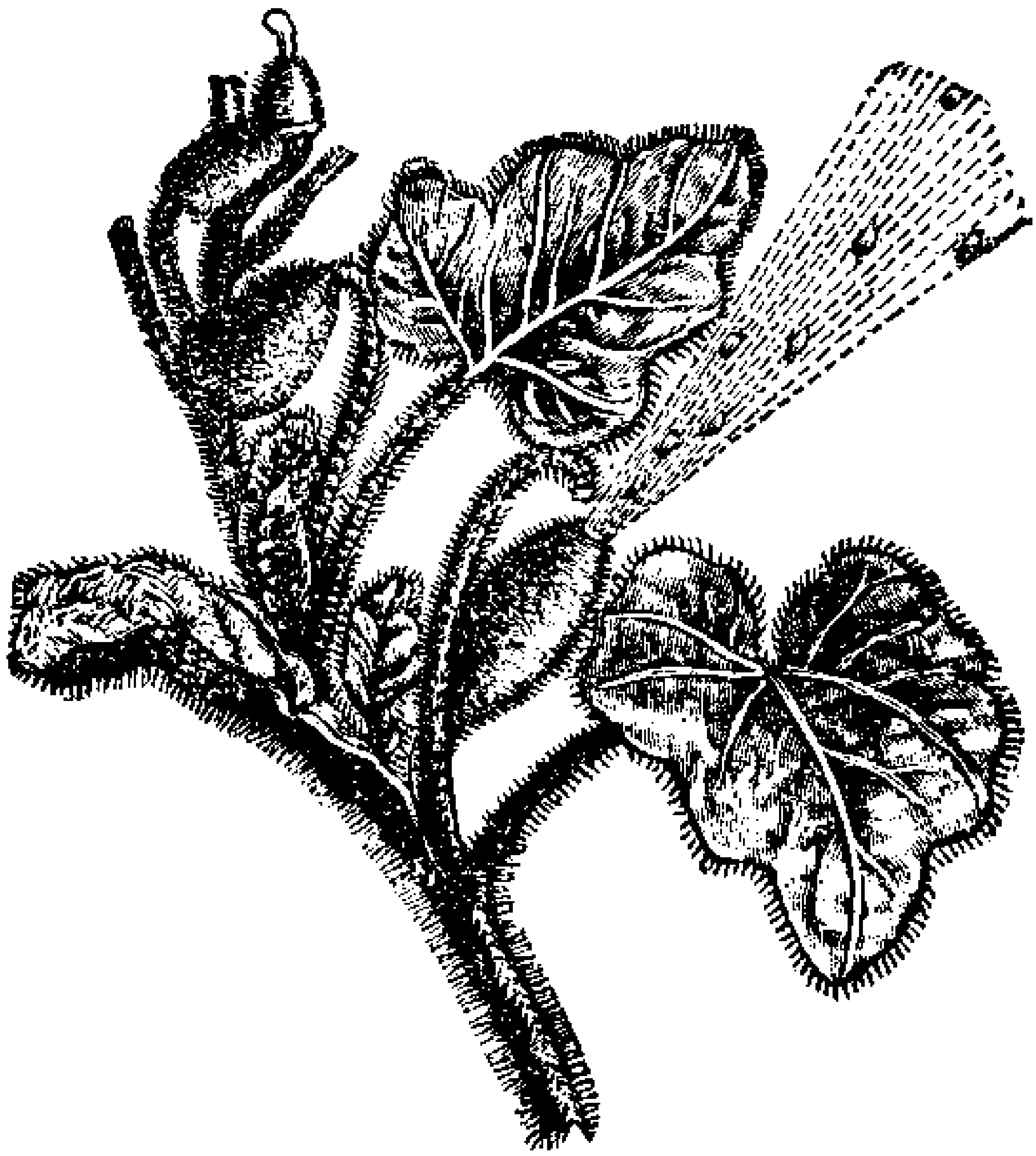
ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্ ও মধ্য আমেরিকা প্রদেশে ইউফরবিয়েসি (Euphorbiaceœ) বংশীয় হুরাক্রেপিটান্স্ (Hura crepitans) বা স্যাণ্ডবক্স নামক ফলও অতিশয় স্ফোটনশীল। এই ফল বার হইতে আঠার ভাগে বিভক্ত (৮ নং)। পাকিলে ইহার প্রত্যেক ভাগ বা কোষ পিস্তলের ন্যায় শব্দ করিয়া ফাটিয়া যায়, এবং সেগুলি এত বেগে নিক্ষিপ্ত হয় যে, নিকটে কেহ থাকিলে তাহাকে গুরুতর আঘাত পাইতে হয়।



(৮ নং)

ইউরোপের দক্ষিণভাগে ফুট-বংশীয় (Cucurbetaceœ) এক প্রকার গাছ হয়, তাহাকে মর্ম্মডিকা ইলেট্রিয়াম (Mormodica বা Eclabium

ফলপ্রাচীরও তৎক্ষণাৎ আকুঞ্চিত হয়। তজ্জনিত চাপে ফলমধ্যস্থ বীজ ও তরল মজ্জা সেই বিচ্ছেদস্থানের কোমল অংশ ভেদ করিয়া অতি বেগে উদ্গীরিত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।



(৯ নং)

বৃক্ষের স্বীয় আকুঞ্চনশক্তির বলে যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা বৃক্ষ হইতে কিয়দ্দূরে গিয়া পড়িলেও, বহু দূরে যাইতে পারে না। এই উপায়ে যে বীজ বিকীর্ণ হয়, তাহা কেবল বৃক্ষমূল হইতে কিছু দূরে পড়ে বলিয়াই রক্ষা পায়; নতুবা বায়ু ও আলোকের অভাবে বিনষ্ট হইত। যে সকল গাছে এই কৌশল আছে, সে সকল গাছ প্রায়ই ছোট ছোট, অথবা তাহাদের আয়ু বীজোৎপাদনকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী; এই জন্য ইহাদের বীজ বৃক্ষমূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ফাঁকা যায়গায় পড়িলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়।

বড় বড় গাছের বীজ বহু দূরে ব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক, তাই তাহার বীজ-বিকীরণের উপায় ভিন্ন। যে সকল ক্ষুদ্র গাছের বীজ বহু দূরে ব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক, তাহাদের বীজেও এমন কৌশল আছে যে, তাহা বহু দূরে নীত হইতে পারে। বহুদূরব্যাপক বীজগুলি প্রায়ই লঘু ও পক্ষযুক্ত, পবনদেব সেই সকল বিস্তীর্ণপক্ষ লঘু বীজকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া শূন্য মার্গে বহুদূরবর্ত্তী দেশে লইয়া যান। কোন্ কৌশলে কি উপায়ে পবন দ্বারা বীজ-ব্যাপ্তির সহায়তা হয়, তাহা আগামী বারে বলিব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।



প্রেমের জাগরণ।

চিত্রশালা।

১। প্রেমের সুপ্তি।

ফ্রান্সের কৃতী চিত্রকর লিঁয়ো রেজিন পেরল্ট, কলাকুশল পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ইঁহার 'প্রেমের সুপ্তি' নামক চিত্রে যে সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সচরাচর দুর্লভ। বালক পুষ্পশরের দেহে কি লাবণ্য, বনভূমির কি শোভা!

চিরচঞ্চল পুষ্পধন্বা সুপ্ত! ক্রীড়াক্লান্ত মন্মথের কমলনয়নদ্বয় সুপ্তিমুদিত—যেন কমল-কোরক আপনার মুদিত হৃদয়ে শত স্বপ্ন লইয়া কুসুম-জীবনের বিকাশাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে। পার্শ্বে কুসুমধনু—ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত। মীনধ্বজের নিদ্রার স্থানটি মনোরম, বিতত-হস্ত-প্রশাখ তরুরাজি সস্নেহে ছায়া বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে; নিম্নে কুসুমবহুল তৃণশয়ন। সুপ্ত মন্মথের অযত্নবিন্যস্ত কেশরাশি কৌমুদীপ্রতিমবর্ণ ললাটে, ও তৃণশয়নের কুসুমরাশি-মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অনঙ্গ সুপ্ত, তাই বনভূমিতেও চাঞ্চল্যলেশ নাই। কুসুম-কুন্তলা ধরণীর কুসুম-ভূষণ অকালজলদোদয়ে কমলের মত মুদিত। পবনের সাদর হিল্লোলে আর তাহাদের কোমল হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে না। মানসের রত্নমণিখচিত সোপানে হেমাম্বুজমাল্যগ্রন্থননিরতা চিরযৌবনসম্পদশালিনী যক্ষনারীর মৃণালসূত্র বিচ্ছিন্ন;—নিপুণ অঙ্গুলি শ্রান্ত। এক পুষ্পপানপাত্রে প্রিয়া সহ মধুপানরত মধুব্রত গুঞ্জন ভুলিয়া পুষ্পগর্ভে নিদ্রানিমীলিতনেত্র। বনস্পতির অঙ্গে পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকনম্রা লতাবধূর গাঢ় আলিঙ্গন শিথিল। বিহগের কলকাকলি নীরব। "যা'র সুখে সুখ সে বিনা অসুখ।" বুঝি প্রেমিকের চক্ষে প্রেমিকার কল্পনালোকরঞ্জিত সৌন্দর্য্যও মলিন প্রতীয়মান হইতেছে।

কিন্তু প্রেমের এ সুপ্তি কত ক্ষণের জন্য? জগতের শোভা ও সঙ্গীত কত ক্ষণ অদৃষ্ট ও অশ্রুত রহিবে? বুঝি অন্ধকারের পর আলোকের মত, হিমের পর বসন্তের মত, বিরহের পর মিলনের মত,—চরাচরে নবযৌবনবিকাশ মধুরতম করিবার জন্যই প্রেমের এই ক্ষণিক সুপ্তি, মুহূর্ত্তের জন্য এই ক্রীড়া-বিরতি।

২। প্রেমের জাগরণ।

প্রেমের জাগরণ ও প্রেমের সুপ্তি একই চিত্রকরের অক্ষয়কীর্ত্তি। "শ্যামল তৃণশয়নতলে ছড়ায়ে মধুমাধুরী" মদন নিদ্রিত ছিল। বিশ্বের সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুদিত-চঞ্চল-তার নয়নের মত সুপ্ত হইয়াছিল—বিশ্বের সঙ্গীত মুহূর্ত্তের জন্য তাহার কোমল অধর-পল্লবের হাস্যের মত তিরোহিত হইয়াছিল। কিন্তু মদনের সুপ্তি কত ক্ষণের জন্য? বুঝি বিশ্বশোভাকেন্দ্র রতির মুখর অধীর মঞ্জীর-রবে মদনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। বালারুণকিরণস্পর্শে পদ্মের মত সে আঁখিযুগ উন্মীলিত হইতেছে। তাই চারি দিকে ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাই আবার "বকুলবনে পবন হ'ল সুরার মত সুরভি।" আবার বিহগের কণ্ঠে কলকাকলি বাজিয়া উঠিল। আবার জীবজগতে অসহ্য পুলকদীপ্ত প্রেমবেদনা জাগিয়া উঠিল। প্রবাসী

বিরহী দূরগৃহে শিশিরমথিতা পদ্মিনীর দশাপন্না প্রিয়ার কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। অভিমানস্ফুরিতাধরার ফুল্লারবিন্দবৎ ওষ্ঠাধর পতির ওষ্ঠাধরসংলগ্ন হইল। বকুলতলে মলয়ানিলশিথিলাকুলা মালা গাঁথিতে গাঁথিতে—

"আজিকে তাই বুঝিতে নারে কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়-বীণা যন্ত্রে মহা পুলকে,
তরুণী বসি ভাবিছে মনে কি দেয় তা'রে মন্ত্রণা
মিলিয়া সব দ্যুলোকে আর ভূলোকে!
কি কথা উঠে মর্ম্মরিয়া বকুল-তরু-পল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কি ভাষা!
উর্দ্ধমুখে সূর্য্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা!"

জগতে আবার নিত্যনবীন যৌবনের বিকাশ হইল; আবার জীবনে অরুণকিরণচ্ছটা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। প্রবাসীর প্রথমেই রাজা রবি বর্ম্মার অঙ্কিত "অশোক-তরুতলে সীতা" নামক একখানি 'অপ্রকাশিতপূর্ব্ব' চিত্রের সুন্দর অনুকৃতি। এ সীতা চিত্রকর রাজা রবি বর্ম্মার মানসী হইতে পারেন, কিন্তু আদিকবি বাল্মীকির দেবতা নহেন। নিপুণ শিল্পী বিম্বাধরী বরবর্ণিনীর কল্পনায় সফল হইয়াছেন, কিন্তু অশোকবনবাসিনী একবেণীধারিণী পাবকশিখারূপিণী জনকনন্দিনীর পদনখেরও সন্নিহিত হইতে পারেন নাই। চিত্রকর যদি বাল্মীকির বর্ণরচিত অমরচিত্রের অনুগামী হইতেন, তাহা হইলে বোধ করি অধিকতর সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন। বাল্মীকির

"উপবাসকৃশাং দীনাং নিশ্বসন্তীং পুনঃপুনঃ।
দদর্শ শুক্লপক্ষাদৌ চন্দ্ররেখামিবামলাম্॥
পীড়িতাং দুঃখসন্তপ্তাং পরিক্ষীণাং তপস্বিনীম্।
গ্রহেণাঙ্গারকেণেব পীড়িতামিব রোহিণীম্॥
অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং কৃশামনশনেন চ।
শোকধ্যানপরাং দীনাং নিত্যদুঃখপরায়ণাং।
প্রিয়ং জনমপশ্যন্তীং পশ্যন্তীং রাক্ষসীগণম্।
স্বগণেন মৃগীং হীনাং শ্বগণেনাবৃতামিব॥
নীলনাগাভয়া বেণ্যা জঘনং গতয়ৈকয়া।
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব॥
তাং বিলোক্য বিশালাক্ষীমধিকং মলিনাং কৃশাম্।
তর্কয়ামাস সীতেতি কারণৈরুপপাদিভিঃ॥"

ইত্যাদি বর্ণনায় বিপন্না পদ্মিনীর ন্যায়, শুক্লপক্ষাদির চন্দ্ররেখার ন্যায়, অঙ্গারক-পীড়িতা রোহিণীর ন্যায়, মূর্ত্তিমতী করুণার ন্যায়, উপবাসকৃশা, দীনা, মলিনা, নিত্যদুঃখপরায়ণা, শ্বগণাবৃতা মৃগীর ন্যায় ভয়চকিতা তপস্বিনী সীতার যে পুণ্যচিত্র মানসপটে প্রতিবিম্বিত হয়, রাজার চিত্রে তাঁহার ছায়া কই? শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মৌলিকের "কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর" সুখপাঠ্য মনোরম রচনা;—ভারতবর্ষের দক্ষিণপশ্চিমকোণবর্ত্তী বিচিত্র মালাবার প্রদেশের

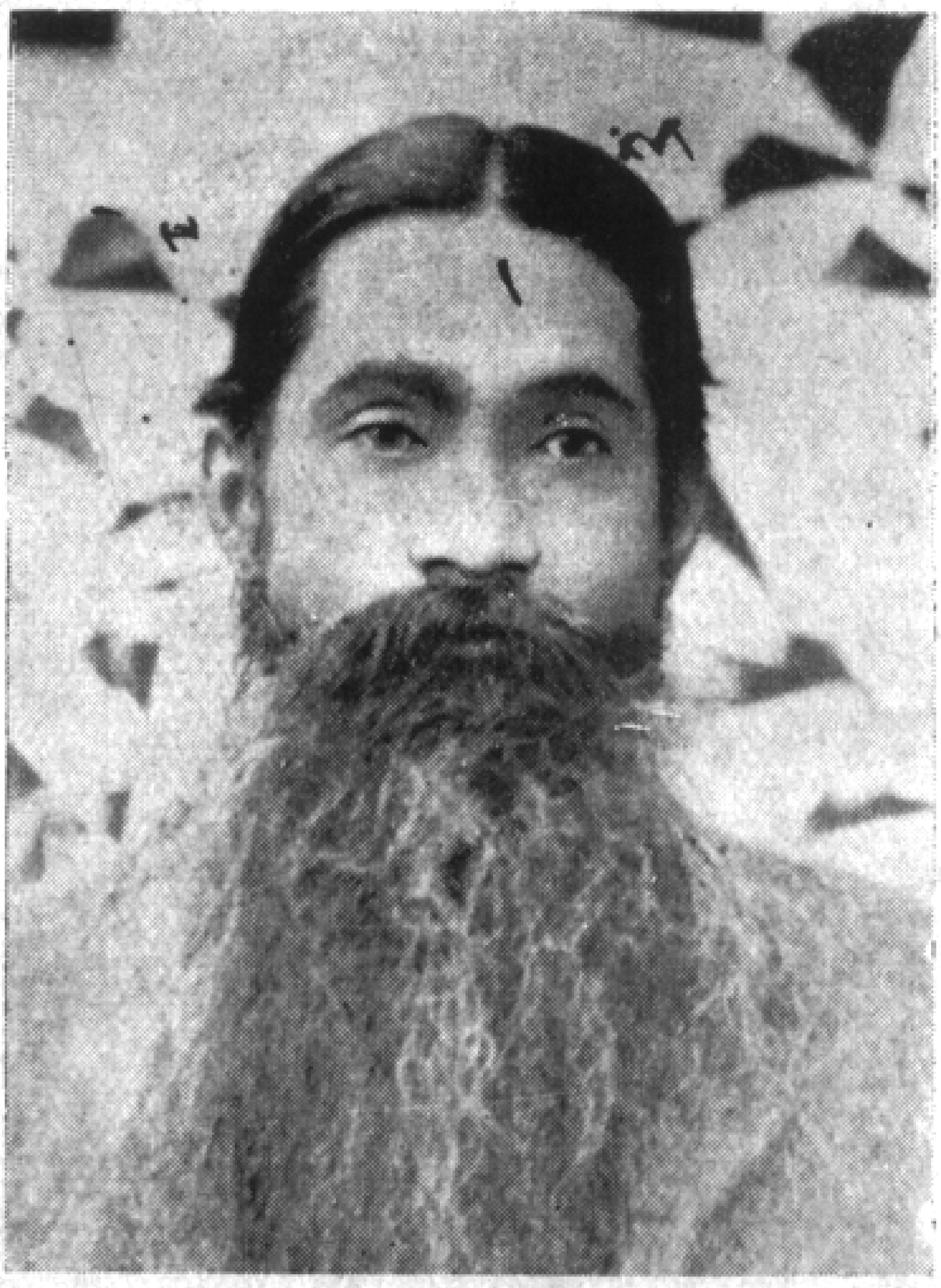
মুখোপাধ্যায়ের "শর্করা-বিজ্ঞান" এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসের "রাজার মৃত্যু" একটি সুদীর্ঘ কবিতা। মুখবন্ধে দেখিতেছি, "রাম-নির্ব্বাসনের ষষ্ঠ রজনীতে মহারাজা দশরথ রামের জন্য বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যার গৃহে প্রাণত্যাগ করেন।" অতএব অবিনাশ বাবু এই কবিতাটি রচনা করিয়াছেন? বাল্মীকির কীর্ত্তি তথাপি অক্ষুণ্ণ আছে, ইহা আমাদের অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। প্রাচীন কাহিনী অবলম্বন করিয়া অনেক কবি অমর হইয়াছেন, কিন্তু সে জন্য অন্ততঃ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য,—নিজস্ব সম্পদ্ আবশ্যক, আশা করি, অবিনাশ বাবুও তাহা অস্বীকার করিবেন না। পৌরাণিক যুগের প্রত্যেক মৃত্যুর এইরূপ ধারাবাহিক বৈচিত্র্যবর্জ্জিত একঘেয়ে অমিত্রাক্ষর পাঠ করিতে হইলে অনেক পাঠকের মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হইবে।—নূতন কবিরা কি বলেন,—তাহা কি প্রার্থনীয়? শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "মেয়েলি সাহিত্য ও বারব্রত" নামটি যেমন চিত্তাকর্ষক, রচনাটি সেরূপ নহে। দ্রুতলিখিত, অপরিণত, অসম্পূর্ণ বহু রচনার অপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটি প্রবন্ধেও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি হইতে পারে, এখনকার অনেক লেখক তাহা বিস্মৃত হইতেছেন। সাহিত্যের পক্ষে তাহা যেমন শোচনীয়, তেমনই সাংঘাতিক। "হীবরের রোজনামচা" সুখপাঠ্য; কিন্তু ভাষা বড় জটিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ধ্বন্যাত্মক কবিতা" সুপাঠ্য নিবন্ধ, কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অঙ্গহীন। লেখক মৃদঙ্গের বিলম্বিত তালে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তবলার দ্রুত বোলে এক নিশ্বাসে সমস্ত শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। দ্রুত-বিলম্বিত ছন্দেও প্রবন্ধ রচনা করা যায়, দীনেশ বাবু তাহার পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু আসর রাখিতে পারেন নাই। পালাবিশেষে ও সমাজবিশেষে টপ্পার পেলা পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার মত কালোয়াতের পক্ষে তাহা কখনও শোভন হইতে পারে না। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে দীনেশবাবুর অসাধারণ অধিকার আছে, তিনি ইচ্ছা করিলে রচনাটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারিতেন। যিনি অনায়াসে রত্নরাশি দান করিতে পারেন, তিনি মুষ্টিভিক্ষা দিলে সন্তুষ্ট হইব কেন? দীনেশ বাবু ভারতচন্দ্র ও জয়নারায়ণের উদাহরণ দিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার নিকট বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক কবিতার ধারাবাহিক ইতিহাস পাইবার আশা রাখি। দীনেশবাবু বলিতেছেন,—"কতকগুলি শব্দ আছে, যাহা শুধু ধ্বন্যাত্মক; তাহারা কোন দ্রব্যবিশেষের গুণ কিংবা অবস্থা জ্ঞাপক। 'ধক্‌ধক্ অগ্নি' বলিলে জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল অগ্নি-শিখার চিত্র চক্ষে ভাসিয়া উঠে। অথচ এই ধক্‌ধকের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা ঠিক বলা যায় না। 'ধক্ ধক্' বিশেষরূপে যেন অগ্নির ঔজ্জ্বল্যবাচক; সেই ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে 'ধক্ ধক্' যে কি কি কারণে এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু এই হেতুশূন্য শব্দটি নিরর্থ হইয়াও একান্তরূপে সার্থক। শত কথায় যে কাহিনী ভালরূপে বর্ণনা করা যায় না, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি অতি সংক্ষেপে অথচ অতি স্পষ্টরূপে বিশেষ্যের সেই গুণগুলিকে বুঝাইয়া দেয়। কবিতায় এই সংক্ষিপ্ত অথচ মর্ম্মজ্ঞাপক ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির অভিঘাতে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে কোন অপূর্ব্ব ছবির অবতারণা করা যায়। কাব্য সাহিত্যে উহারা মনের নহবৎ বাদ্য; কি বলিয়া যায়, তাহা যেন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, অথচ মন মোহিত করিয়া ফেলে। ইংরেজী সাহিত্যে ধ্বন্যাত্মক কবিতার সংখ্যা বেশী নহে, আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ কবি এডগার এলেন পো ধ্বন্যাত্মক কবিতা রচনার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন, এবং তাঁহার 'দাঁড়কাক' (The Raven) শীর্ষক কবিতাটি এই শ্রেণীর কবিতার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আমাদের ভারতচন্দ্র রায় এই ধ্বন্যাত্মক কবিতারচক-গণের শীর্ষস্থানীয়। ভারতচন্দ্রের অনেকগুলি কবিতা শুধু ধ্বনির তরঙ্গ তুলিয়া উন্মাদকর

সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। যে কথার অর্থ নাই, যাহা পক্ষীর কাকলীর ন্যায় অস্পষ্ট, তাহা তদীয় রচনায় সেই কাকলীর ন্যায়ই মিষ্ট, এবং চারুগ্রথিত সুসংস্কৃত শব্দরাশি হইতেও অধিক সার্থক হইয়াছে। গঙ্গাতরঙ্গবর্ণনোপলক্ষে তিনি 'ছলচ্ছল টলট্টল' কলকল তরঙ্গা" এই ছত্রটির অবতারণা করিয়াছেন। তরঙ্গের এই তিনটি বিশেষণের একটিরও অর্থ অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তথাপি এই তিনটি শব্দ যত দূর অর্থজ্ঞাপক হইয়াছে, ইহাদের পরিবর্ত্তে অন্য তিনটি উৎকৃষ্ট আভিধানিক শব্দ প্রয়োগ করিলেও সেরূপ হইত না। 'ছলচ্ছল'—জলের প্রবাহব্যঞ্জক, 'টলট্টল'—জলের নির্ম্মলতাব্যঞ্জক, এবং 'কলকল'—জলের নিক্কণব্যঞ্জক। 'মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে। ভভম্ভম ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে॥' প্রভৃতি কবিতাটিতে রৌদ্ররস যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেরূপ চিত্র সাহিত্যক্ষেত্রে সুলভ নহে। অথচ ভারতচন্দ্র কোন গুণবিশেষের দীর্ঘ ব্যাখ্যা দ্বারা এই চিত্র উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা পান নাই; ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি অর্থহীন গুরুগম্ভীর স্বরে যেন মহাদেবের রুদ্রমূর্ত্তির এক বিশাল চিত্রপট অমর অক্ষরে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। 'ধিয়া তা ধিয়া তা ধিয়া ভূত নাচে।' এবং 'ফণা ফণ্ ফণা ফণ্ ফণী ফন্ন গাজে।' প্রভৃতি শব্দের অট্টরোলে ভৈরবরস যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিয়াছে।" শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী "রাণী ভবানীর পত্র" মুদ্রিত করিয়া সিরাজউদ্দৌলার পশুত্ব প্রমাণিত করিতে চাহিতেছেন। পত্রখানি মৌলিক কি না, বলিতে পারি না। পত্রের প্রামাণ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে, আলোচ্য প্রবন্ধে এমন কোনও প্রমাণ দেখিতেছি না। একখানি পত্রের বলে, বা ব্যক্তিবিশেষের পত্রে প্রকটিত অভিযোগের প্রমাণে কোনও ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপাদিত হইতে পারে, তাহাও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আশা করি, বঙ্গের ঐতিহাসিকগণ,—অক্ষয়বাবু, কালীপ্রসন্নবাবু ও নিখিলবাবু এই পত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্য কেহ প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া এ বিষয়ে সাধারণের সংশয়ভঞ্জন করিতে পারিবেন না। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার ঘোষের "ভূতের বাবা" উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রচলিত একটি উপকথা। লেখক বলিতেছেন, "* * * একই প্রকার উপকথা একাধিক দেশে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার নানা উপকথা তুলনা করিয়া দেখিলে মানবপ্রকৃতির ভিত্তীভূত অনেক ধারণা ও বিশ্বাসে উপনীত হইতে পারা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সকলেই 'ছাঁদনদড়ি গোদা বাড়ি'র গল্প ছেলেবেলা শুনিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও ঐরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে। আমরা তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত করিতেছি।" লেখক 'সংক্ষেপে বর্ণনা' করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গল্পটি বিলক্ষণ 'বিনাইয়া' বুনিয়া গিয়াছেন। তাহা অনাবশ্যক। এরূপ গল্প শিশুরঞ্জন হইতে পারে, কিন্তু প্রাণপণ যত্নে মন্থন করিলেও এরূপ ঘোলে উপন্যাসপ্রিয় পাঠকের দুধের স্বাদ মিটিতে পারে না। সতীশবাবু গল্পের বাহার লইয়া বিব্রত হইতে বলেন নাই, এইরূপ উপকথার সংগ্রহ, তুলনায় সমালোচন ও বিশ্লেষণ করিয়া সার সত্যের উদ্ধারে অবহিত হইতে বলিয়াছেন। আশা করি, লেখক ভবিষ্যতে গল্পের অঙ্গরাগে সময়ক্ষয় না করিয়া প্রকৃত পথের পথিক হইবেন। শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রাচীন মানব" প্রবন্ধে মানবজীবনের আদ্য বৃত্তান্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 'প্রাগৈতিহাসিক সময়ের মানবজীবন সম্বন্ধে যে সকল আবিষ্কার হইয়াছে,' আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক তাহার পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধটি যেমন মনোরম, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। এরূপ জটিল বিষয়ের আলোচনা এমনতর সুখপাঠ্য

বহুদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গের অনেক লেখক-মণ্ডুক 'সায়েণ্টিফিক আমেরিকানে'র ক্রোড়পত্র বা তদ্রূপ অন্য কোনও কূপে চিরজীবন বিহার করিতেছেন, এবং স্বতঃসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ধরাকে সরা-সম দেখিতেছেন। কেহ তাড়িতবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলির আবিষ্কারগৌরব আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের স্কন্ধে আরোপিত করিয়া তাঁহাকে বিড়ম্বিত করিতেছেন, কেহ বা কবিকল্পনায় বিভোর হইয়া জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার-রূপ যাদুমন্ত্রবলে সঞ্জীবিত ধাতুখণ্ডের নৃত্য হাস্য ক্রন্দন দেখিতেছেন! তাঁহারা যদি এইরূপ প্রলাপবাদে বঙ্গসাহিত্য মুখরিত না করিয়া সতীশবাবুর পদবী ধরিয়া অগ্রে জ্ঞানের সঞ্চয়ে ও পরে তাহার বিতরণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আমরাও নিস্তার পাই, সাহিত্যও পরিত্রাণ-লাভ করে। শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "দেব মাসলেদার" ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "ভীমভৈ বা নূতন অলেখধর্ম্ম" উল্লেখযোগ্য ও আলোচনার যোগ্য। এবারকার "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা" দেখিয়া সমালোচকমাত্রই আনন্দলাভ করিবেন,—এরূপ আশা অসঙ্গত নহে। চিত্রে দেখিতেছি, নাবালক 'প্রবাসী' বয়োবৃদ্ধ সমালোচকের কর্ণমর্দ্দনে অগ্রসর! সমালোচক শাসাইবার অত্যন্ত সুন্দর ও সহজ উপায়! এখনও আঁতুড়ের গন্ধ যায় নাই,—ইতিমধ্যেই এই! আশা করা যায়, ছেলেটি বাঁচে ত বেতরিবত হইবে না। 'প্রবাসী'র সুরুচি ভদ্রসমাজে কিরূপ পুরস্কৃত হইতেছে, তাহার নমুনা-স্বরূপ 'বসুমতীর' মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি;—"প্রবাসীর 'সাহিত্য সমালোচনা'র সমালোচনাতে নূতনত্ব আছে, এবার যে ছবিটি বাহির হইয়াছে—তাহাতে একটি বালক কোন বয়স্ক লোকের বক্ষে স্থাপিত সিঁড়িতে উঠিয়া সেই বিস্ময়বিহ্বল ব্যক্তিটির কর্ণমর্দ্দন করিতেছে, সুতরাং বলিতে হয়, ভাদ্রের বানুরে কাণ্ড অপেক্ষা এবার একটু রুচিগত উন্নতি দেখা গেল, কিন্তু এই আলোচনায় কতখানি গাত্রদাহ ও কতখানি কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমরা স্থির করিতে পারিলাম না। রামানন্দ বাবুর ন্যায় ভদ্রলোক যদি কাগজের মর্য্যাদাবৃদ্ধির আশায় প্রার্থনামন্দির হইতে একেবারে মেছোহাটায় অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে প্রবাসী বন্ধ হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই।" কিন্তু নবজাত প্রবাসীর বালচাপল্যদমনের জন্য এমনতর দারুণ চাবুক কি নিতান্তই অপরিহার্য্য? 'অমৃতং বালভাষিতং' কি ভুলিবার মত পরামর্শ?

প্রদীপ। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসের "শোকার্ত্তা পুরী" একটি তথাকথিত কবিতা। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোমের "কৌমুদী" একটি সচিত্র কবিতা। কতকগুলি সুমিষ্ট শব্দের সমষ্টি। কবিতাটির কোনও কোনও অংশে রহস্যজাল এমন ঘনতর যে, সহজে প্রবেশ করা যায় না। 'ভুবনে ভরেছ জ্যোতিঃ মধুর উজ্জ্বলে' এই চরণটির অন্বয় কি? 'উদ্ভাসিয়া দশ দিক নীল নভোপরে' পাঠ করিয়া অকবি আমরা কি বুঝিব? 'ত্রিদিবের ঘুমঘোর' ঘোরতর 'কাব্যি', তাহা অবগত আছি, কিন্তু 'সুষুপ্তির মেলা' কি রকম? নৈয়ায়িক ও বৈয়াকরণে বিচার হইতেছিল। নৈয়ায়িক ব্যাকরণের মুণ্ডপাত করিতেছিলেন। বৈয়াকরণ বলিলেন, 'পণ্ডিতবর! নিরস্ত হও, আর ব্যাকরণের প্রাণসংহার করিও না।' সপ্রতিভ নৈয়ায়িক সদম্ভে কহিলেন, 'অস্মাকুনাং নৈয়ায়িকেষাং অর্থনি তাৎপর্য্যং শব্দনি কোশ্চিন্তা?' তেমনই এখনকার অনেক নব্য কবিও বলিতে পারেন, 'মিলেই আমাদের তাৎপর্য্য, অর্থের জন্য আবার চিন্তা কি!' শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুই পৃষ্ঠার মধ্যে "বেদ ও দেব" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন! তাঁহার মতে, অগ্নি 'তাপ' ও ইন্দ্র 'মেঘ'! "ঋষি প্রথমাবস্থায় জড় অগ্নিকেই দেবতা বলিয়াছেন, অগ্নির অতীত কোনও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বীকার করিতেছেন না,"—ইত্যাদি মামুলি ও বিলাতী বৈদিক তত্ত্ব বহুকাল

জীবনরক্ষা" আলোচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষের "মহর্ষি কালীকৃষ্ণ মিত্র" সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ জীবনচরিত। স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ মিত্র মহোদয় আদর্শ মহাপুরুষ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাকে 'মহর্ষি' বিশেষণে বিশেষিত না করিলেও ক্ষতি হইত না। 'মহর্ষি', 'স্বামী' প্রভৃতি উপাধির অপব্যবহার দেখিলে ব্যথিত না হইয়া থাকা যায় না। বঙ্গে যদি মহাপুরুষ পূজা এই 'রেটে' চলিতে থাকে, তাহা হইলে কালে 'মহর্ষি' রাখালচন্দ্র, 'রাজর্ষি' কেনারাম, 'ব্রহ্মর্ষি' হলধর ও 'দেবর্ষি' পেলারাম প্রভৃতি ঋষিবর্গের সংখ্যা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা।—সমস্ত ভারতবর্ষ যদি এইরূপে ঋষিগণের তপোবনে পরিণত হয়, তাহা হইলে 'আকর্ষি' শব্দটিকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া উপাধিস্বরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক জন আধুনিক মহর্ষি দার্জ্জিলিং যাইতেছিলেন। এক জন সহযাত্রী মহর্ষির অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইনি কে?' আধ্যাত্মিক মোসাহেবটি উত্তর দিলেন, 'ইনি মহর্ষি অমুকচন্দ্র;—মহাশয়ের নামটি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?' সহযাত্রী বলিলেন, 'আমি অর্শী অমুক।' মহর্ষির সহচর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অর্শী কি?' অর্শী গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'মশায়! আমি সম্প্রতি অর্শে ভুগিতেছি,—সুতরাং অর্শী; আশা করি, ইহার পর যখন অর্শ বাড়িবে, তখন মহর্ষি হইতে পারিব!' বাঙ্গলার বসোয়েল-গণের নিকট আমরা আর একটু সংযম ও সহজবুদ্ধির প্রত্যাশা করি। "অমর জীব" শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর রচিত একটি অতিসংক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তের "কুকি জাতির বিবরণ" সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ ঘোষের "মৃণালিনীর দৌত্য" একটি গল্প; এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি ৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর" এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। "মহারাজের অন্তঃপুরে নানা বয়সের প্রায় দেড় শত রমণী ছিল", ইত্যাদি অনেক গুরুতর তথ্যের সমাবেশ দেখিলাম। তথাপি শ্রীনিবাস বাবুর চিত্রিত ত্রিপুরার 'রোমান্স' অত্যন্ত বিচিত্র ও চিত্তহারী। "কর্ণ-কুন্তী সংবাদ" শ্রীযুক্ত শশিকুমার হেশের অঙ্কিত একখানি চিত্র। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, চিত্রখানি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় এই চিত্রের বিবরণে লিখিয়াছেন, "কর্ণের মুখশ্রীতে মহত্ত্ব ও তেজস্বিতা সুন্দররূপে পরিস্ফুট দেখা যায়।" চিত্রসৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য যে সৌন্দর্য্যদৃষ্টি ও কলাভিজ্ঞান নিতান্ত অপরিহার্য্য, আমরা সে সম্পদে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। সুতরাং উপেন্দ্রবাবুর কলাকুশল চক্ষে যে সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইয়াছে, আমাদের চর্ম্মচক্ষে তাহার এক বিন্দুও প্রতিভাত হয় নাই, ইহা বিচিত্র নহে। কর্ণের ভ্রুকুটীভঙ্গী যতই অস্বাভাবিক হউক, কুন্তীর দুর্দ্দশা তদপেক্ষা অধিক শোচনীয়, এমন কি, অসহনীয় বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহের "ওয়াণ্টেড্" ছাপা হইল কেন?



শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।



শ্রীযুক্ত দাদাভাই নারোজী।



শ্রীযুক্ত বদরুদ্দিন তায়াবজী।



স্বর্গীয় জর্জ্জ ইউল।

KUNTALINE PRESS.

হিমারণ্য।

কৈলাসের ঊর্দ্ধে গৌরী-কুণ্ড। গৌরী-কুণ্ড হইতে দুইটি নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। একটি উত্তর দিক দিয়া বামাবর্ত্তে কৈলাস শিখরকে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণদিকবর্ত্তী দারচিন মঠে ঊর্দ্ধদেশ ভেদ করিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়াছে। এই নদী পঞ্জাবে যাইয়া সিন্ধু নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এ দেশের লোকেরা এই নদীর নাম সিঙ্গিখাম্বা বলিয়া থাকে; অর্থাৎ, সিংহের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে বলিয়া সিন্ধুর উৎপত্তিস্থান সিঙ্গিখাম্বা নামে অভিহিত। অপরটি পূর্ব্ব দিক হইয়া কৈলাস শিখরকে দক্ষিণাবর্ত্তে বেষ্টন করিয়া দারচিনের ঊর্দ্ধে যাইয়া পড়িয়াছে। এই নদীও রাবণহ্রদ বা রাক্ষসতাল ভেদ করিয়া নিম্ন প্রদেশে সরযু বা ঘাগ্রা নামে খ্যাত হইয়াছে। এই নদীর বিষয় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। সুতরাং আমি যে পথে যাইতেছি, সেই পথ নদীর তীরে তীরে কৈলাসকে বেষ্টন করিয়া আবার দারচিনে উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দেশে দোলমঞ্চ যেরূপ, কৈলাসেরও আকার সেইরূপ। দোলমঞ্চ পরিক্রম করিবার সময় যেরূপ চতুর্দ্দিক পরিক্রম করিতে পারা যায়, সেইরূপ দারচিন হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাসের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া আবার দারচিনে আসা যায়। কৈলাসের চতুর্দ্দিক নদীবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। নদীর তীরে তীরে রাস্তাও কৈলাসকে বেষ্টন করিয়া দারচিনে আসিয়া মিশিয়াছে। গৌরীকুণ্ড হইতে আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে যে বরফ-শৃঙ্গ আছে, তাহাকে কৈলাস শিখর বলে। কৈলাস শিখরের আকার শিবলিঙ্গের অনুরূপ। এইরূপ শত শত লিঙ্গবৎ বরফমণ্ডিত শিখর আছে। তাহা কৈলাসের অন্তর্গত হইলেও উচ্চ শিখরকেই কৈলাস বলিয়া থাকে। এই কৈলাসের একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলাম! সকল শৃঙ্গগুলিই লিঙ্গবৎ; যেন শুভ্র শুভ্র লিঙ্গমূর্ত্তিবৎ লিঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কৈলাসপতি মহালিঙ্গের আকার ধারণ করিয়া কৈলাসে রাজসিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অথবা অনন্ত লিঙ্গবৎ অনন্ত চক্ষে এই সর্ব্বোচ্চ হিমালয়ের শৃঙ্গ হইতে সসাগরা পৃথিবীর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান দর্শন করিতেছেন। হিমালয় অজর, অমর, অক্ষয় ও অব্যয়; কৈলাসও তদনুরূপ। ভাষাতে

শব্দ নাই, ভাবে অনন্তত্ব নাই, বাক্যের অনন্ত স্ফূর্ত্তি নাই, চক্ষুর বর্ণনা-শক্তি নাই, বাক্যের দর্শনশক্তি নাই, সুতরাং কৈলাসের বর্ণনা হইল না।

এই স্থানে অনেকক্ষণ বসিয়া কৈলাস দর্শন করিতেছিলাম। আমার সঙ্গীরা বলিলেন, "আর দিন নাই, চলুন, এখনও দুই মাইল না গেলে আড্ডা পাইব না।" অনিচ্ছায় আমি তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। এই স্থানের নিম্নেই নদী, সুতরাং আমাকে একেবারে নদীতীরে অবতরণ করিতে হইল। এই নদীর নাম কৈলাসগঙ্গা। কৈলাসগঙ্গায় একটি সেতু আছে; এই সেতুটি বড় বড় প্রস্তরের উপর বৃহৎ কাষ্ঠ স্থাপিত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে সেতুটী ভাসিয়াও যায়। আজ সেতুটি ভাসিয়া যায় নাই, সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে সেতু পার হইলাম। সেতুর পর পারেই চড়াই। চড়াইয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে মঠ। দূর হইতে মঠের কোনও প্রকার চিহ্ন দেখা যায় না, কেবল প্রস্তরস্তূপ বলিয়া বোধ হয়। একে কৈলাস, তাহার পর চড়াই। এই চড়াইটিতে সকলেই গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলেন। তাহার উপর আবার পথিমধ্যে বৃষ্টি ও বাতাস আরম্ভ হইল। শীতে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। মঠ দেখিতে পাইতেছি; ইচ্ছা হইতেছে, দৌড়িয়া মঠে প্রবেশ করি; কিন্তু শরীর শক্তিহীন, পদে পদে পদস্খলন হইতেছে, দ্রুত চলিবার উপায় নাই; কি করি, বাতাস ও বৃষ্টি সহ্য করিয়া ধীরে ধীরে মঠে উপস্থিত হইলাম। মঠটি তেতালা। সর্ব্বোচ্চ তালাতে দেবালয়। মধ্যতালায় লামার বাস ও অতিথিশালা, রন্ধনশালা। নিম্নতলে কতকগুলি গুহা; এই সকল গুহায় পালিত পশু ও রন্ধনের উপযোগী কাষ্ঠ থাকে। আমি প্রথমে যাইয়া অতিথিশালায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে লাসার এক জন লামা বসিয়া আছেন। আমি সেখানে যাইয়া আসন করিলাম। লামা বলিলেন, "আমিও অতিথি; আমি আপনার কি সেবা করিব? আপনি এই মঠের লামার নিকট যান, তিনি বড় দয়ালু, আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত তিনি করিয়া দিবেন।" আমি তৎক্ষণাৎ লামার নিকট গমন করিলাম। লামা একটি প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া আছেন; চারি দিকেই শাক্যমুনির মূর্ত্তি সুসজ্জিত; মূর্ত্তির সম্মুখে ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছে, আর লামাকে সম্মুখে করিয়া ১৫।১৬ জন লামা ও ডাবা চা পান করিতেছে। লামা উচ্চ আসনে বেদীর উপর বসিয়া আছেন; অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসনে পশমের গদীর উপর তাঁহার পারিপার্শ্বিকেরা বসিয়া আছেন; সকলেরই সম্মুখে চা ও ছাতু। চা হইতে ধূম উদ্গত হইতেছে,

আর সেই গরম চা তাঁহারা পান করিতেছেন। আমি একেবারে যাইয়া লামার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া লামা তাঁহার আসন-পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, "আপনি চা পান করিয়া সুস্থ হউন, পরে কথা-বার্ত্তা হইবে।"

লামার ইঙ্গিত অনুসারে এক জন ডাবা গরম চা ও ছাতু আনিয়া দিল। আমি দুই তিন পেয়ালা চা পান করিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম, আমার ধড়ে প্রাণ আসিল। আমাকে সুস্থ দেখিয়া লামা মহাশয় বলিলেন, "এই মঠের লামা আমি নহি, দারচিনের লামাই এ মঠের লামা। আমি যাত্রী, ভগবানকে স্নান করাইবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এক জন ডাবার উপর মঠ-পরিচর্য্যার ভার সে এখনই আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।" এই বলিয়া মন্দিরের কর্ম্মচারীকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া অতিথিশালায় এক পশমের গদি পাতিয়া দিল, তাহার উপর আমার আসন পড়িল। এই কৈলাসে পশমের গদি ভিন্ন টিকিবার উপায় নাই। আমার সঙ্গীরাও লামার নিকট চা পান আর ছাতু আহার করিয়া সুস্থ হইল, এবং সান্ধ্যভোজনের উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর দেবালয়ে শঙ্খধ্বনি আরব্ধ হইল। লামা আমার নিকট লোক পাঠাইলেন। লামার লোকের সঙ্গে যাইয়া দেখি, সম্মুখে একটি শ্বেতপ্রস্তরের শিবমূর্ত্তি। লামা কুঙ্কুম ও কেশরের জল দ্বারা মূর্ত্তিকে মন্ত্র পড়িয়া স্নান করাইতেছেন, বাদ্যকরেরা শঙ্খ ও বাঁশী বাজাইতেছে, দর্শকেরা যোড়হস্তে স্নান দর্শন করিতেছেন। ধূপের সুগন্ধে দেবালয় আমোদিত। ভগবান শঙ্করের স্নান হইয়া গেলে তাঁহাকে শীতবস্ত্র দ্বারা আবৃত করা হইল। লামা শঙ্করকে আসনে স্থাপিত করিলেন। এই মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে আর একটি মন্দির আছে; সেই মন্দিরে কালীমূর্ত্তি স্থাপিত। আদ্যার মূর্ত্তি চতুর্ভুজা, বিকটবদনা ও লোলজিহ্বা। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ অস্ত্র সুসজ্জিত, দেখিলে বোধ হয়, অসুরনাশিনী অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবসমীপে বিশ্রাম করিতেছেন। এই দেবীমূর্ত্তির বাম ও দক্ষিণ খড়্গ, ঢাল, তলওয়ার, বন্দুক, বর্শা, শক্তি, শূল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। ইহা ব্যতীত অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব তিব্বতীয় অস্ত্র দেখিলাম; তাহাদের নাম জানি না। এই দেবালয়ে দুই তিনটি শঙ্খ দেখিলাম। শঙ্খগুলি খুব বৃহৎ, শব্দ গম্ভীর ও মধুর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই শঙ্খ তোমরা কোথায় পাইলে?"

এক জন উত্তর করিল, "মহাসাগর হইতে এই শঙ্খ সংগৃহীত হইয়াছে।" দারচিন কৈলাসের প্রথম মঠ, নেন্দি দ্বিতীয় মঠ। এই মঠেই মহাত্মা নেপ-চুনের আবিষ্কৃত প্রথম মঠ বা তীর্থ। এখানে তিনি কিছু দিন তপস্যা করিয়াছিলেন। এই মঠের ঊর্দ্ধদেশে পর্ব্বতাঙ্গে তিন চারিটি গুহা আছে। গুহাতে যোগীরা আসিয়া বাস করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে একটি যোগী ঐ গুহা হইতে অদৃশ্য হইয়া যান। তাঁহার ডম্বরু-চিহ্ন পর্ব্বতাঙ্গে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি উদ্দেশে সেই গুহাকে ও যোগিরাজকে প্রণাম করিয়া বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

অদ্য ২৫শে আষাঢ়। নেন্দি গুহাতেই বাস করিলাম। এখানে যে লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহার বাসস্থান ডেরিফু মঠে। পরদিন প্রাতঃকালে লামা ডেরিফু অভিমুখে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন, "আপনি ডেরিফু আসুন, আমি অগ্রে অগ্রে যাইতেছি; আপনি যাইয়া আমার মঠে অতিথি হইবেন।" আমি তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। অদ্য আমাদিগকে আট মাইল যাইতে হইবে। রাস্তা ভাল। বরাবর নদীর তীরে তীরে চলিয়া বেলা অনুমান বারটার সময় ডেরিফু মঠে উপস্থিত হইলাম। এই মঠটি প্রাচীরে আবৃত, একটি ছোট খাট দুর্গের অনুরূপ। মঠের সাজ সজ্জা, জাঁক জমক খুব; অনেকগুলি লামা ও ডাবা এই মঠে বাস করেন। চামর গাই, মেষ ও ছাগ প্রভৃতি সম্পত্তি এই মঠের যথেষ্ট আছে। লামা জ্ঞানবান, যোগী ও বুদ্ধিমান। আমি মঠে প্রবেশ করিয়া লামার নিকট চলিয়া গেলাম। এই মঠটীও দ্বিতল। উভয় তলেই দেবালয় ও গ্রন্থ সুরক্ষিত। আমি তথায় যাইবামাত্র লামা আসন হইতে উঠিয়া আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও বসিবার আসন দিলেন। আমিও তাঁহাকে এক খণ্ড মিছরী ও একটি সিকি প্রণামী দিলাম। ইহাতে লামাও অতিশয় প্রীত হইলেন। তিব্বতদেশীয় প্রত্যেক মঠের দস্তুর এই যে, আগন্তুক লামা মঠের প্রধান লামাকে প্রণামী দেন। যে লামা প্রণামী না দেন, তিনি মঠপ্রণালীর অনভিজ্ঞ বলিয়া মঠের মধ্যে স্থান পান না। তাঁহার উপর মঠাধ্যক্ষের সন্দেহ হইয়া থাকে। তিব্বত-ভ্রমণকারী সাধুদিগের এই প্রণালী একান্ত অনুসরণীয়। সাধুও যা, লামাও তা।

আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছি, এতদ্দেশে আমি কাশীলামা বলিয়া পরিচিত হইতেছি। মঠাধ্যক্ষ লামার সহিত কিছু কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাকে

সঙ্গে করিয়া দ্বিতীয় তলের দেবতা ও গ্রন্থ দর্শন করাইলেন। এই মঠে তিনটি শাক্যমুনির মূর্ত্তি এবং হরগৌরী, মহাকালী ও বিষ্ণুমূর্ত্তি সংস্থাপিত। আমি এই সব দর্শন করিয়া নিম্ন তলে আসিলাম। ভাল স্থানেই বাসা পাইলাম; কিন্তু এখানে একটা বিপদ ঘটিল। মঠের সূপকার লামা আমার সঙ্গী লোকদিগকে রন্ধনশালায় ঢুকিতে দিল না। সে বলিল, "তোমাদের লামা ইংরেজ, ইংরেজের লোকদিগকে আমরা মঠে প্রবেশ করিতে দিই না। তোমাদের লামাকে এখনই মঠ হইতে বাহির করিয়া দিব।" এই বলিয়া সে আমার বাসস্থানে আসিল। আসিয়া দেখে, আমি আমার বাসস্থানে দেবতা ও ত্রিশূল সংস্থাপিত করিয়া চণ্ডী পাঠ করিতেছি। এই সব দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল, আর বলিল, "লামাজী আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অনেক লোক এখানে আসিয়া থাকে। কৈলাস পবিত্র তীর্থ, এখানে অপরের প্রবেশের অধিকার নাই; তাই না জানিয়া আপনাকে ইংরেজ মনে করিয়াছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" আমি বলিলাম, "ইহাতে তোমার কোনও দোষ নাই; এইরূপ না করিলে মঠের পবিত্রতা রক্ষা হয় না।" তাহার পর সেই লামাই আমার প্রধান সেবক হইয়া আহারাদির উদ্যোগ করিতে লাগিল, এবং বলিল, "তুমি আমার হাতে খাইবে কি না?" আমি বলিলাম, "তুমিও লামা, আমিও লামা; আর এই উত্তরখণ্ডে বিচার করিলে দেহরক্ষা হয় না, সুতরাং তোমার হাতে খাইতে আমার কোনও আপত্তি নাই।" ইহার অব্যবহিত পরেই লামা আমার নিকট আসিলেন ও আমার সঙ্গে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ইহাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিলাম, ইনি নিজে শক্তি-উপাসক ও রাজযোগী। কিছু কথাবার্ত্তার পর আমাকে সঙ্গে করিয়া দ্বিতীয়তলস্থ দেবালয় দেখিতে লইয়া গেলেন। দ্বিতীয় তল একটি প্রকাণ্ড গুহা। প্রস্তর খনন করিয়া এই গুহা প্রস্তুত হইয়াছে। গুহার মধ্যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেব দেবীর মূর্ত্তি অত্যন্ত যত্নে সুরক্ষিত। সেবা পূজার বন্দোবস্তও আছে। সহস্র সহস্র ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিতেছে। গুহার বাম ও দক্ষিণে রাশি রাশি পুঁথি বস্ত্রাবরণে আবৃত। আমি লামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ পুস্তক কি ও কোন্ ভাষায় লিখিত ও কোথা হইতে আনীত হইয়াছে?" লামা উত্তর করিলেন, "এই সমস্ত পুস্তকই কাশী হইতে আনীত, পুস্তকের অক্ষর তিব্বতীয়, ভাষা সংস্কৃত। এই সব পুস্তক অতি গোপনীয়, লামা ভিন্ন

অন্যের দেখিবার অধিকার নাই। পাছে পুস্তক প্রকাশিত হয়, ইহার জন্যই পুস্তক অক্ষরান্তরিত হইয়াছে।” আমি এই সব দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, নেন্দি গুহাতে এই স্থানবাসী জনৈক লামার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, তাঁহার বাসস্থানে অতিথি হইব; কিন্তু ভ্রমবশতঃ আমি প্রধান মঠেই আসিয়া আড্ডা করিয়াছি। আমি বাসস্থানে আসিয়া দেখিলাম, সেই লামা ও তাঁহার তিন চারি জন শিষ্য মাখন, চা, ছাতু, ‘থুথু’ নামক মিঠাই ও কৈলাসপতির প্রসাদ লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। আমি তাঁহার উপহার সাদরে গ্রহণ করিলাম, এবং তাঁহার আলয়ে না যাইবার কারণ বলিলাম। তিনি বলিলেন, “এক স্থানে থাকিলেই হয়, তাহার জন্য কুণ্ঠিত হইবেন না।” এই বলিয়া আমার সেবার জন্য তাঁহার একটি ব্রহ্মচারী শিষ্যকে আমার নিকট রাখিয়া বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। আমরা সকলে মিলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় বিষ্ণু সিং বলিল, এক দল ডাকাত আসিয়াছে। এই কথা মঠে প্রচারিত হইল। মঠের অধিকারী সদর দরজা বন্ধ করিতে হুকুম দিলেন, এবং অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রস্তরখণ্ড লইয়া সকলে ছাদে উঠিলেন। কেবল দ্বিতলস্থ দেবালয়ের দ্বার খোলা রহিল। কারণ, এই দ্বিতল এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, অন্য তলের সহিত কোন যোগ নাই, এবং এই তলে যে দেবতা আছেন, তাহা সাধারণের ও দেবালয় সাধারণের অর্থে নির্ম্মিত, সর্ব্বদা খোলা থাকে, এবং সকল সময়ে সাধারণের প্রবেশের অধিকার আছে। ডাকাতদের কথা শুনিয়া আমি দেবালয়ের দ্বার দিয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, ১০।১২ জন ঘোড়সওয়ার অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দেবালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত। কিছু ক্ষণ পরে তাহারা আপন আপন গাঁঠরি হইতে মাখন ও ছাতু খুলিল এবং পকেট হইতে টাকা কড়ি বাহির করিয়া দেবদর্শন করিতে চলিয়া গেল। তাহারা দেবদর্শন করিয়াই গৌরীকুণ্ডের দিকে চলিল। মঠবাসীরা নিরুদ্বেগ হইলেন, আমরাও বাঁচিলাম। এই রাত্রি এখানেই বাস করিতে হইল।

মহাভারতে সভাপর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণবিষয়ে ময় দানব বলিতেছেন যে, “পূর্ব্বে আমি কৈলাসের উত্তরে ও মৈনাক পর্ব্বতের সন্নিধানে দানবদিগের যাগকালে একটি বিচিত্র মণিময়

সভা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহা দানবরাজ বৃষপর্ব্বার সভা ছিল।" অন্য স্থানে লিখিত আছে, "বিন্দুসরোবরের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য কতিপয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তথায় হিরণ্য পর্ব্বত; ঐ পর্ব্বতে স্বর্ণ পাওয়া যায়।" এই ডেডিফু হইতে ১৮।১৯ দিনের পথ উত্তরে মানসসরোবরের ন্যায় এক সরোবর আছে; তথায় স্বর্ণখনিও আছে। ডেডিফুতেই কতিপয় স্বর্ণব্যবসায়ীর নিকট শুনিলাম, 'তাহারা এই কৈলা-সের উত্তর হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া তাহা বিক্রয় করিবার জন্য মণ্ডিতে যাইতেছে।' তাহারা ইহাও বলিল যে, "স্বর্ণখনির নিকটেই সরোবর আছে। তথায় তিব্বতবাসী ভিন্ন অন্যে যাইতে পারে না।" এই মঠ হইতে বরাবর উত্তর দিকে গেলেই বিন্দু সরোবর ও হিরণ্য পর্ব্বত দর্শন করা যায়।

অদ্য গৌরীকুণ্ডে যাইব। মনে বড় আনন্দ, কিন্তু ভয়ও ততোধিক। এখান হইতে ১৩।১৪ মাইল না গেলে জনিংফু মঠ পাইব না। গৌরীকুণ্ডে মঠ নাই, বিশ্রামের স্থানও নাই। এখান হইতে নিরবচ্ছিন্ন চড়াই; তাহার মধ্যে আবার ৫।৬ মাইল চিরস্থায়ী বরফ। কৈলাসের ঊর্দ্ধশিখর বরফে সমাবৃত। যদিও কৈলাসের ঊর্দ্ধশিখরে উঠিব না, উঠিতে পারিবও না, তথাপি গৌরীকুণ্ডের ঊর্দ্ধদিকস্থ শিখর অতিক্রম করিয়া গৌরীকুণ্ডে নামিতে হইবে। এই সব চিন্তায় নিদ্রা আসিল না। রাত্রি অনুমান দুইটার পর আমরা যাত্রা করিলাম। ঠাণ্ডার ত কথাই নাই, তার পর চড়াই। এক একবার কিছু চলিতেছি—আর বিশ্রাম করিতেছি, এবং শীতনিবারণের জন্য মিছরী ও গোলমরিচ চিবাইতেছি। এইরূপ করিতে করিতে একটি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে প্রস্তরের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। কৈলাসযাত্রীরা এই সুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া যান। লোকপ্রবাদ এই যে, "পাপীরা কখনই এ সুড়ঙ্গ ভেদ করিতে পারে না।" আমি পাপী কি পুণ্যবান জানি না, তবে অনায়াসে এই ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ পথ ভেদ করিয়া চলিয়া গেলাম। মেঘদূতে কৈলাসবর্ণনাকালে কালিদাস এক সুড়ঙ্গের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, এই সুড়ঙ্গই সেই কালিদাসের উল্লিখিত সুড়ঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। ইহা কালিদাসের উল্লিখিত মেঘের গমনাগমনের সুড়ঙ্গ হউক আর নাই হউক, আমার গমনের সুড়ঙ্গ বটে। আমার সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ আমার অনুসরণ করিল, আর কেহ কেহ ভয়ে এ দিক্ ও দিক দিয়া চলিয়া

গেল। আমরা সুড়ঙ্গ পার হইয়া একটি নদীতে নামিলাম। নদী পার হইয়া কতক দূর উর্দ্ধে উঠিয়া দেখি, বরফমণ্ডিত কৈলাস। এই বরফ অতিক্রম করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। শরীরের বলে আর চলিতেছে না। মনই শরীরকে চালাইতেছে। শীতে হৃদয় গুর গুর করিতেছে, হস্ত পদের সাড় নাই; তাহার কথাও নাই। পদ স্খলিত হইতেছে, পদ মনের লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিতেছে না। উপর হইতেও বিন্দু বিন্দু বরফ পড়িতেছে; এখানে ত জমাট বরফ ছিলই, তাহার উপর আবার বরফ বিন্দু বিন্দু পড়িতেছে। এ যেন সোনায় সোহাগা। পর্ব্বতের সানুদেশ ও পর্ব্বতশিখর শুভ্র। বরফপাতে আমার বস্ত্র শুভ্র, মাথার উপরও বরফ পড়িয়াছে। মস্তকে বরফ পড়াতে বোধ হইতেছে, কৈলাস কৃপা করিয়া আমার মাথায় পুরস্কারস্বরূপ বরফের শিরোপা বাঁধিয়া দিয়াছেন।

শ্রীরামানন্দ ভারতী।

মাতৃগুপ্ত ও দ্বিতীয় প্রবরসেন।

[কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী অবলম্বনে।]

রাজা প্রবর সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিরণ্য কাশ্মীরের রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র তোরামন ভ্রাতার রাজকার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল সুখে অতিবাহিত হইল, কিন্তু সন্দেহবীজ হিরণ্যের হৃদয়ভূমিতে অঙ্কুরোৎপাদন করিলে তিনি তোরামনকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। তোরামনের রমণী ইক্ষ্বাকু-কুলজাতা অঞ্জনা দেবী স্বেচ্ছায় স্বামীর কারাসঙ্গিনী হইলেন। কিয়দ্দিবস পরে কারাগারে অঞ্জনার গর্ভসঞ্চার হইল। তিনি ভীত হইয়া এক কুম্ভকার-গৃহে উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি এক সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন তনয় প্রসব করিলেন। কুম্ভকার ও অঞ্জনা ভিন্ন তৃতীয় ব্যক্তি এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না। কুমার শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধমান হইতে লাগিলেন। খেলিবার সময় ক্রীড়াসঙ্গিগণ তাহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া ভাবিত, এবং কুমারের শাসনে তাহাদের সর্ব্বকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। কুম্ভকারপত্নী তাহাকে মৃৎপাত্র গড়িবার জন্য

মৃত্তিকা দিলে তিনি তদ্দ্বারা শিবলিঙ্গ গড়িতেন। একদা কুমারের মাতুল জয়েন্দ্র বালকের ব্যবহারে কিছু অসাধারণত্ব দেখিতে পাইয়া তাহার কুলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক কোনও উত্তর দিতে পারিল না। জয়েন্দ্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বালকের সঙ্গে কুম্ভকারালয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আপনার ভগিনী অঞ্জনাকে দেখিতে পাইলেন। ভ্রাতা ভগিনীর দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, ভগিনী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কুমার আপনার মাতাকে চিনিতেন না; কুম্ভকার-পত্নীই তাঁহার মাতা, তাঁহার এই সংস্কার ছিল। তিনি কুতূহলী হইয়া কুম্ভকার-পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! উহারা কে?" কুম্ভকারপত্নী বালককে বলিল, "বৎস! ইনি তোমার মাতা, উনি তোমার মাতুল। তোমার পিতা রাজার ভ্রাতা হইয়াও দৈবদুর্ব্বিপাকবশে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন।" ইহা শুনিয়া বালকের দুঃখের অবধি রহিল না। জয়েন্দ্র অসহিষ্ণু বালককে সময়োচিত সাবধানতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া, স্বরাজ্যে গমন করি-লেন। কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার উদ্ধারের চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। অঞ্জনা স্বামীর অনুগামিনী হইবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু কুমার তাঁহাকে এই দারুণ অধ্যবসায় হইতে নিবর্ত্তিত করিলেন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, কুম্ভকারপত্নী অঞ্জনার উপদেশে বালকের নাম প্রবর সেন রাখিয়াছিল। এই সময়ে হিরণ্যের মৃত্যু হইল। হিরণ্যের কোনও সন্তান ছিল না; সুতরাং কাশ্মীরের সিংহাসন শূন্য রহিল।

এই সময়ে মহারাজা বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে-ছিলেন। কাশ্মীর তাঁহার সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিত। বিক্রমাদিত্য বিদ্বজ্জনের কল্পবৃক্ষ ও অসমসাহসী ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে ভারতের আততায়ী শকজাতি দণ্ডাহত উরগের ন্যায় ভারতভূমি হইতে পলায়ন করিয়াছিল। তজ্জন্য বিক্রমাদিত্য গৌরবজনক শকারি উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। এই রাজার সভায় মাতৃগুপ্তনামক বিদ্বান্ ও সুকবি পুরুষ বাস করিতেছিলেন। মাতৃগুপ্ত ভারতবর্ষের বহু রাজসভা দর্শন করিয়া বিক্রমাদিত্যের যশে আকৃষ্ট হইয়া উজ্জয়িনী নগরে উপস্থিত হন। মাতৃগুপ্ত অলীক স্তুতিবাদে আপনার রসনাকে কলঙ্কিত করেন নাই। বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে রাজসভায় উপস্থিত থাকিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি অনুগ্রহের কোনও লক্ষণ দেখাইলেন না। মাতৃগুপ্ত ছায়ার

ন্যায় রাজসমীপে বাস করিয়া রাজসেবা করিতে লাগিলেন। মাতৃগুপ্ত রাজ-কিঙ্করীগণের প্রতি নেত্রপাত করিতেন না, রাজার নিন্দাকারিগণের সহিত কথোপকথন করিতেন না, এবং রাজসন্নিধানে কুবাক্য উচ্চারণ করিতেন না। তাঁহার সদ্ব্যবহারে রাজপারিষদগণের সন্তোষ জন্মিল। এইরূপে এক বৎসর অতীত হইল।

এক দিন রাজা নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে মাতৃগুপ্তকে দেখিতে পাইলেন। কবির ছিন্ন বস্ত্র ও দুর্ব্বল শরীর দেখিয়া রাজা লজ্জিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, আমাকে ধিক্! যে হেতু আমি এ পর্য্যন্ত এমন সুযোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করি নাই। রাজা মনে মনে এইরূপ ভাবিলেন বটে, কিন্তু কবির অবস্থোন্নতির কোন চেষ্টা করিলেন না। দেখিতে দেখিতে দারুণ শীত ঋতু উপস্থিত হইল। দিঙ্মুখ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। দিন ক্ষুদ্র হইল। এই দারুণ শীতে কবির ক্লেশের অবধি রহিল না। এমন দুরবস্থা যে, শীতবস্ত্র ক্রয় করিবার অর্থও ছিল না। এইরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াও তিনি রাজসেবা করিতে লাগিলেন।

একদা নিশা প্রহরাবশেষ থাকিতে বিক্রমাদিত্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তৎকালে প্রদীপগুলি শীতল পবনে স্তিমিতভাব ধারণ করিয়াছিল। প্রদীপগুলি উজ্জ্বল করিয়া দিবার জন্য তিনি ভৃত্যগণকে আহ্বান করিলেন। ভৃত্যগণ তখন গভীর নিদ্রায় অচৈতন্য ছিল, কিন্তু তখনও মাতৃগুপ্ত জাগরিত ছিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বাহিরে আছ?" মাতৃগুপ্ত নিজের নাম কীর্ত্তন করিলেন। শীত-কম্পিত মাতৃগুপ্ত রাজাদেশে রাজকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রদীপগুলি উত্তেজিত করিয়া দিলেন। রাজা মাতৃগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রির অবশেষ কত?" মাতৃগুপ্ত বলিলেন, এক প্রহর। "তুমি কিরূপে জানিলে? কেনই বা তুমি নিদ্রা যাও নাই?" মহারাজের এ কথার উত্তরে মাতৃগুপ্ত তখনই ছন্দোবদ্ধ বাক্যে বলিলেন, "মহারাজ!

মগ্ন হয়ে আছি আমি চিন্তার সাগরে।
শীতনিবারক বস্ত্র নাহিক শরীরে॥
ক্ষুধাতে আমার স্বর হইয়াছে ক্ষীণ।
কম্পিত অধরে ব্যক্ত অবস্থা সুদীন॥
নয়নেতে নিদ্রা মোর এবে না আসিছে।
অসতী নারীর মত চলিয়া গিয়াছে॥
রজনী সুদীর্ঘ মোর মনে হয় জ্ঞান।
মহারাজ! কুরাজার রাজ্যের সমান॥"

বিক্রমাদিত্য কবির দুঃসহ দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া, কবিকে সান্ত্বনা দিয়া বিদায় দিলেন। অনন্তর কিরূপে তাঁহার দুঃখোপশম হইতে পারে, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তথাকার মন্ত্রিগণ বিক্রমাদিত্যের নিকট এক জন রাজার প্রার্থনা করিয়াছিল। বিক্রমাদিত্য, সঙ্কল্প করিলেন, মাতৃগুপ্তকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তিনি তখনই দূত দ্বারা কাশ্মীরের মন্ত্রিগণের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, আমি মাতৃগুপ্ত নামক সুকবি, বিদ্বান্‌ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে তোমাদের রাজা করিলাম। তিনি আমার আদেশ-লিপি লইয়া তোমাদের নিকট উপস্থিত হইলে তোমরা তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে।

এ দিকে মাতৃগুপ্ত রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাসস্থানে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া রাজার মনে দয়ার সঞ্চার হইল না। আমার দুর্ভাগ্যই ইহার কারণ। সমুদ্রের যে স্থানে রত্ন পাওয়া যায়, যদি কেহ প্রতিকূলবায়ুবশতঃ তথায় উপনীত হইতে না পারে, তাহা হইলে সমুদ্রের দোষ কি? সৌভাগ্যলাভের জন্য আমার রাজানুগৃহীত ব্যক্তিগণের সেবা করা উচিত ছিল। যাহারা শিবের নিকটে থাকে, তাহাদের উপর শিবশরীরের ভস্ম পতিত হয়, কিন্তু যাহারা শিববৃষের সেবা করে, তাহাদের রত্নলাভ হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমার আর দুরাশায় মত্ত হইয়া এখানে থাকায় ফল নাই, অন্যত্র গমন করাই কর্ত্তব্য।

রজনী প্রভাত হইলে বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্তকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়া আপনার আদেশ লিপিবদ্ধ করিলেন। মাতৃগুপ্ত অবিলম্বে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে আপনার আদেশ-লিপি দিয়া অবিলম্বে কাশ্মীরে গমন করিতে বলিলেন। বলিয়া দিলেন, এই আদেশ-লিপি কাশ্মীরের মন্ত্রিগণকে প্রদান করিতে হইবে, তুমি ইহা পথিমধ্যে পাঠ করিও না। মাতৃগুপ্ত রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কাশ্মীরে যাত্রা করিলেন। লোকে মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীরে যাইতে দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "দেখ আমাদের রাজার বিবেচনা! এমন উপযুক্ত ব্যক্তিকে অবশেষে পত্রবাহক করিয়া কাশ্মীর রাজ্যে প্রেরণ করিলেন!" মাতৃগুপ্ত লোক-সাধারণের বাক্যে ক্ষুব্ধচিত্ত না হইয়া স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মাতৃগুপ্ত পথিমধ্যে নানা শুভলক্ষণ দেখিতে পাইলেন। এক দিন সর্পের উপরি খঞ্জনের নৃত্য দেখিলেন। এক দিন স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, তিনি রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিতেছেন, এবং সমুদ্র অতিক্রম করিতেছেন। ক্রমে কাশ্মীরের সন্নিধানে উপনীত হইলে তুষারধবল হিমাচল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।

ন্যায় রাজসমীপে বাস করিয়া রাজসেবা করিতে লাগিলেন। মাতৃগুপ্ত রাজ-কিঙ্করীগণের প্রতি নেত্রপাত করিতেন না, রাজার নিন্দাকারিগণের সহিত কথোপকথন করিতেন না, এবং রাজসন্নিধানে কুবাক্য উচ্চারণ করিতেন না। তাঁহার সদ্ব্যবহারে রাজপারিষদগণের সন্তোষ জন্মিল। এইরূপে এক বৎসর অতীত হইল।

এক দিন রাজা নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে মাতৃগুপ্তকে দেখিতে পাইলেন। কবির ছিন্ন বস্ত্র ও দুর্ব্বল শরীর দেখিয়া রাজা লজ্জিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, আমাকে ধিক্! যে হেতু আমি এ পর্য্যন্ত এমন সুযোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করি নাই। রাজা মনে মনে এইরূপ ভাবিলেন বটে, কিন্তু কবির অবস্থোন্নতির কোন চেষ্টা করিলেন না। দেখিতে দেখিতে দারুণ শীত ঋতু উপস্থিত হইল। দিঙ্মুখ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। দিন ক্ষুদ্র হইল। এই দারুণ শীতে কবির ক্লেশের অবধি রহিল না। এমন দুরবস্থা যে, শীতবস্ত্র ক্রয় করিবার অর্থও ছিল না। এইরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াও তিনি রাজসেবা করিতে লাগিলেন।

একদা নিশা প্রহরাবশেষ থাকিতে বিক্রমাদিত্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তৎকালে প্রদীপগুলি শীতল পবনে স্তিমিতভাব ধারণ করিয়াছিল। প্রদীপগুলি উজ্জ্বল করিয়া দিবার জন্য তিনি ভৃত্যগণকে আহ্বান করিলেন। ভৃত্যগণ তখন গভীর নিদ্রায় অচৈতন্য ছিল, কিন্তু তখনও মাতৃগুপ্ত জাগরিত ছিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বাহিরে আছ?" মাতৃগুপ্ত নিজের নাম কীর্ত্তন করিলেন। শীত-কম্পিত মাতৃগুপ্ত রাজাদেশে রাজকক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রদীপগুলি উত্তেজিত করিয়া দিলেন। রাজা মাতৃগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রির অবশেষ কত?" মাতৃগুপ্ত বলিলেন, এক প্রহর। "তুমি কিরূপে জানিলে? কেনই বা তুমি নিদ্রা যাও নাই?" মহারাজের এ কথার উত্তরে মাতৃগুপ্ত তখনই ছন্দোবদ্ধ বাক্যে বলিলেন, "মহারাজ!

মগ্ন হয়ে আছি আমি চিন্তার সাগরে।
শীতনিবারক বস্ত্র নাহিক শরীরে॥
ক্ষুধাতে আমার স্বর হইয়াছে ক্ষীণ।
কম্পিত অধরে ব্যক্ত অবস্থা সুদীন॥
নয়নেতে নিদ্রা মোর এবে না আসিছে।
অসতী নারীর মত চলিয়া গিয়াছে॥
রজনী সুদীর্ঘ মোর মনে হয় জ্ঞান।
মহারাজ! সুরাজার রাজ্যের সমান॥"

বিক্রমাদিত্য কবির দুঃসহ দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া, কবিকে সান্ত্বনা দিয়া বিদায় দিলেন। অনন্তর কিরূপে তাঁহার দুঃখোপশম হইতে পারে, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কাশ্মীর রাজ্যের জন্য

তথাকার মন্ত্রিগণ বিক্রমাদিত্যের নিকট এক জন রাজার প্রার্থনা করিয়াছিল। বিক্রমাদিত্য, সঙ্কল্প করিলেন, মাতৃগুপ্তকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তিনি তখনই দূত দ্বারা কাশ্মীরের মন্ত্রিগণের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, আমি মাতৃগুপ্ত নামক সুকবি, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে তোমাদের রাজা করিলাম। তিনি আমার আদেশ-লিপি লইয়া তোমাদের নিকট উপস্থিত হইলে তোমরা তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে।

এ দিকে মাতৃগুপ্ত রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাসস্থানে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া রাজার মনে দয়ার সঞ্চার হইল না। আমার দুর্ভাগ্যই ইহার কারণ। সমুদ্রের যে স্থানে রত্ন পাওয়া যায়, যদি কেহ প্রতিকূলবায়ুবশতঃ তথায় উপনীত হইতে না পারে, তাহা হইলে সমুদ্রের দোষ কি? সৌভাগ্যলাভের জন্য আমার রাজানুগৃহীত ব্যক্তিগণের সেবা করা উচিত ছিল। যাহারা শিবের নিকটে থাকে, তাহাদের উপর শিবশরীরের ভস্ম পতিত হয়, কিন্তু যাহারা শিববৃষের সেবা করে, তাহাদের রত্নলাভ হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমার আর দুরাশায় মত্ত হইয়া এখানে থাকায় ফল নাই, অন্যত্র গমন করাই কর্ত্তব্য।

রজনী প্রভাত হইলে বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্তকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়া আপনার আদেশ লিপিবদ্ধ করিলেন। মাতৃগুপ্ত অবিলম্বে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে আপনার আদেশ-লিপি দিয়া অবিলম্বে কাশ্মীরে গমন করিতে বলিলেন। বলিয়া দিলেন, এই আদেশ-লিপি কাশ্মীরের মন্ত্রিগণকে প্রদান করিতে হইবে, তুমি ইহা পথিমধ্যে পাঠ করিও না। মাতৃগুপ্ত রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কাশ্মীরে যাত্রা করিলেন। লোকে মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীরে যাইতে দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "দেখ আমাদের রাজার বিবেচনা! এমন উপযুক্ত ব্যক্তিকে অবশেষে পত্রবাহক করিয়া কাশ্মীর রাজ্যে প্রেরণ করিলেন!" মাতৃগুপ্ত লোক-সাধারণের বাক্যে ক্ষুব্ধচিত্ত না হইয়া স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মাতৃগুপ্ত পথিমধ্যে নানা শুভলক্ষণ দেখিতে পাইলেন। এক দিন সর্পের উপরি খঞ্জনের নৃত্য দেখিলেন। এক দিন স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, তিনি রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিতেছেন, এবং সমুদ্র অতিক্রম করিতেছেন। ক্রমে কাশ্মীরের সন্নিধানে উপনীত হইলে তুষারধবল হিমাচল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।

কাশ্মীরপ্রান্তে কাশ্মীররাজ্যের মন্ত্রিগণ মাতৃগুপ্তের অপেক্ষা করিতেছিলেন। মাতৃগুপ্ত তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজলিপি প্রদান করিলেন। মন্ত্রিগণ নির্জ্জনে পত্রার্থ অবগত হইয়া মাতৃগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নামই কি মাতৃগুপ্ত? তিনিই মাতৃগুপ্ত ইহা অবগত হইয়া মন্ত্রিগণ অভিষেকোপযোগী সামগ্রীসম্ভার আহরণ করিলেন। মাতৃগুপ্ত কাশ্মীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। অমাত্য ও প্রজাগণ তাঁহাকে রাজসম্বোধনে সংবর্দ্ধিত করিল। মাতৃগুপ্ত এত দিন পরে বিক্রমাদিত্যের অসাধারণ গুণগ্রাহিতা ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি পরিচয় লাভ করিলেন। তিনি মহামূল্য উপঢৌকন সহ বিক্রমাদিত্যের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "মহারাজ! আপনি এমন গম্ভীরপ্রকৃতি যে, আকার দেখিয়া কেহ আপনার মনোভাব বুঝিতে পারে না, ফল দ্বারাই আপনার অনুগ্রহ বুঝিতে পারা যায়।" অনন্তর মাতৃগুপ্ত সসৈন্যে কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলেন। রাজ্যমধ্যে পশুবধ নিবারিত হইল। নূতন রাজার দানের অবধি রহিল না। তাঁহার সভা বিদ্বজ্জনে পরিপূর্ণ হইল। এই সভার মেন্ঠ বা মাতৃমেন্ঠ নামক কবি, হয়গ্রীববধ-নামক মহাকাব্যের রচনা করিয়া রাজদত্ত পুষ্কল পারিতোষিক লাভ করিলেন। রাজা মাতৃগুপ্তস্বামী নাম দিয়া মধুসূদনের সুন্দর পবিত্র মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে মাতৃগুপ্ত চারি বৎসর নয় মাস এক দিন কাশ্মীর রাজ্যের শাসন করেন।

এ দিকে পিতার মৃত্যুর পর প্রবর সেন তীর্থভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, বিক্রমাদিত্য-প্রেরিত মাতৃগুপ্ত নামক এক ব্যক্তি কাশ্মীরের রাজা হইয়াছেন। প্রবর সেনের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি বিক্রমাদিত্যের সার্ব্বভৌমত্ব হইতে কাশ্মীরকে মুক্ত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। মন্ত্রিগণের অনেকে গোপনে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে মাতৃগুপ্তের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি মাতৃগুপ্তের কোনও দোষ দেখিতে পাইলেন না। প্রবর সেন বিক্রমাদিত্যকে আপনার শত্রুজ্ঞান করিয়া এক দল সৈন্য সহ তদ্বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ত্রিগর্ত্ত রাজ্য জয় করিলেন। এমন সময়ে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুসংবাদ সমুদায় ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রবর সেন বিক্রমাদিত্যকে পরমশত্রু মনে করিতেন, তথাপি তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া শোকে এমন অভিভূত হন যে, তিনি সে দিবস স্নানাহার করেন নাই, এবং নিদ্রিত হন নাই।

মাতৃগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ কাশ্মীর-সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। মাতৃগুপ্ত কাশ্মীর ত্যাগ করিতেছেন শুনিয়া প্রবর সেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কাশ্মীরত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতৃগুপ্ত বলিলেন, "রাজন্! যিনি আমাকে রাজা করিয়াছিলেন, সেই পরমধার্ম্মিক রাজসিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। আমি সূর্য্যকান্তমণিতুল্য, যত দিন সূর্য্য আমার উপর কিরণ বিতরণ করিতেছিলেন, তত দিন আমি উজ্জ্বল ছিলাম। সূর্য্য অস্তে গিয়াছেন, এখন আমি সামান্য প্রস্তর হইয়া পড়িয়াছি।" প্রবর সেন বলিলেন, "পণ্ডিতবর! কে তোমার অনিষ্ট করিয়াছে যে, তুমি নিজে তাহার প্রতীকারে অসমর্থ হইয়া বিক্রমাদিত্যের জন্য শোক করিতেছ?" মাতৃগুপ্ত বলিলেন, "রাজন্! আপনি এরূপ মনে করিবেন না যে, বিক্রমাদিত্য ভস্মে ঘৃত বা উষরভূমিতে বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কেহ আমার অনিষ্টচেষ্টা করিলে আমি স্বয়ং তাহার প্রতিকার করিতে পারিতাম। চন্দ্র সূর্য্য অস্তগত হইলে চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত মণি মলিন হয়; জড়পদার্থও উপকার বিস্মৃত হয় না। আমি কিরূপে বিক্রমাদিত্যের গুণগ্রাম বিস্মৃত হইব? আমি বিক্রমাদিত্যের শোকে রাজ্য ত্যাগ করিতেছি। বারাণসীতে গমন করিয়া শেষজীবন ধর্ম্মচর্চ্চায় অতিবাহিত করিব।" প্রবর সেন মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "ধন্য বিক্রমাদিত্য! যিনি তোমার ন্যায় রত্ন চিনিতে পারিয়াছিলেন।" প্রবর সেন মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীরত্যাগ না করিতে বারংবার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইল না। মাতৃগুপ্ত বলিলেন, "রাজন্! আমি সুখভোগের জন্য আর রাজত্ব করিতে চাহি না, আপনার পৈতৃক রাজ্য আপনি গ্রহণ করুন। আমি পার্থিব সুখের জন্য রাজ্য পরিত্যাগ না করিলে, বিক্রমাদিত্যের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে না।"

মাতৃগুপ্ত বারাণসী যাত্রা করিলেন। প্রবরসেন বিক্রমাদিত্যের ন্যায় মাতৃগুপ্তকে চিনিতে পারিয়াছেন, এই যশ উপার্জ্জন করিতে না পারিয়া, দুঃখিত হইলেন। কাশীতে গিয়া মাতৃগুপ্ত সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। তিনি ইহার পর দশ বৎসর জীবিত ছিলেন। প্রবরসেন কাশ্মীরের রাজস্ব প্রতি বৎসর মাতৃগুপ্তের নিকট প্রেরণ করিতেন। মাতৃগুপ্ত তাহা দরিদ্রসাৎ করিতেন। আমরা পাঠকগণকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি,—বিক্রমাদিত্য, প্রবরসেন ও মাতৃগুপ্তের মধ্যে কে বড়?

অনেকে মনে করেন, কালিদাস ও মাতৃগুপ্ত এক ব্যক্তি। আমাদের সেরূপ বোধ হয় না। বিক্রমাদিত্যের দীর্ঘ রাজত্বের শেষ পাঁচ বৎসর মাতৃগুপ্ত তাঁহার সহিত পরিচিত হন, কিন্তু কালিদাস অনেক দিন উজ্জয়িনীর রাজসভায় বাস করিয়াছিলেন। কালিদাসের কবিতা ও মাতৃগুপ্তের কবিতার রচনাপ্রণালী একবিধ নয়। মাতৃগুপ্ত-রচিত অনেক শ্লোক পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

মুখরা।

১

শীতের প্রভাত। আকাশ কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন। গাঢ় ধূসর কুহেলিকার অন্তরাল-বর্ত্তী তপন যেন ধূলিধূসর পুরাতন পটে চিত্রিত, তেজোহীন,—মলিন। অনিদ্রাকাতর যদি দীর্ঘরজনীব্যাপী অনিদ্রা-যাতনা-ভোগের পর উষার সুস্নিগ্ধ পবনের বীজনে তন্দ্রাতুর হইয়া পড়ে, তবে যেমন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলেও নিদ্রার আবেগ সহসা দূর হয় না, আজ সহরেও সেইরূপ প্রভাত হইলেও প্রভাতের চেতনা সম্পূর্ণ ফিরিয়া আইসে নাই। এখনও প্রভাতের নেত্র হইতে নিশার নিদ্রাবেশ দূর হয় নাই। কলিকাতার একটি প্রাসাদোপম সুবৃহৎ সুসজ্জিত গৃহের নিম্নতলে একটি কক্ষে গৃহস্বামীর মধ্যম পুত্র বসিয়া আছেন; নিকটে কয় জন পার্শ্বচর। কর্ম্মহীন ধনিপুত্রের এমন পার্শ্বচরের অভাব হয় না। ইঁহারা প্রভাতে আসিয়া চা-পান, সংবাদপত্র-পাঠ ও প্রতিবেশীদের সমালোচনা প্রভৃতি বিবিধ জল্পনায় প্রবৃত্ত হন। সকলেই বাঙ্গালী; সকলেরই বয়স ত্রিশ পার হইয়াছে, সুতরাং প্রৌঢ় বলাই সঙ্গত। মেজবাবুর ওষ্ঠাধর-চুম্বিত ফুরসীর নল অম্বুরিগন্ধী প্রচুর ধূম উদ্গীরিত করি-তেছে, কক্ষেও কুজ্ঝটিকা সৃষ্ট হইয়া কক্ষপ্রাচীরবিলম্বী বহুমূল্য চিত্রগুলিকে অস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছে। চা-পান শেষ হইয়া গিয়াছে; ভৃত্যগণ এখনও শূন্য পাত্রগুলা স্থানান্তরিত করে নাই।

মেজবাবু আলস্যসঙ্কুচিতনেত্রে ধূমপান করিতে করিতে এক জন পার্শ্বচরের নিকট আফিসের বড় 'সাহেবের' অত্যাচারের কথা শুনিতেছিলেন

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, কর্ত্তা ডাকিতেছেন। মেজবাবু আলস্য ত্যাগ করিলেন, মুখ বিকৃত করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, তাহার পর একান্ত অনিচ্ছায় উঠিলেন। ভাবটা এই,—কর্ত্তাকে নিতান্তই 'বাহাত্তরে' ধরিয়াছে; নহিলে সময় নাই, অসময় নাই, এমন ডাকাডাকিটা কি ভাল? কিন্তু সিন্ধুকের চাবী যাঁহার কাছে, তাঁহাকে ভক্তি না করি, একটু ভয় না করিলে চলে না। জগতে টাকার প্রভাব বড় অধিক। অগত্যা মেজবাবু তামাক হইতে 'সাহেব' পর্য্যন্ত সব চর্চ্চা ছাড়িয়া পিতার দর্শনে চলিলেন।

২

নিদ্রাতুর প্রহরী তাহার অজ্ঞাতে অদূরে আগত শত্রুসেনার তূর্য্যধ্বনিতে জাগিয়া যেমন মুহূর্ত্তে তন্দ্রাশূন্য, শঙ্কিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মেজবাবু তেমনই সজাগ, বিস্মিত, ভীত হইয়া পড়িলেন; বুঝিলেন, প্রলয় আসন্ন। পিতার চক্ষু রক্তবর্ণ, দেহ ক্রোধে কম্পমান, মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না।

পিতা কৃতী পুরুষ; দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া আপনার ক্ষমতায় ধনকুবের হইয়াছেন। তীক্ষ্ণ ব্যবসায়বুদ্ধি, অসাধারণ অধ্যবসায়, অনন্যসাধারণ আলস্যবিরাগ, অশেষ কর্ম্মক্ষমতা ও অবিচলিত চিত্তবৃত্তি,—এই সকলের শুভ সমাবেশে তিনি ব্যবসায়ে পদে পদে সফল হইয়াছেন। তিনি স্বভাবতঃ স্থির ধীর, কিন্তু একবার বিচলিত হইলে সহজে স্থির হইতেন না। কাহারও কাহারও ক্রোধ খড়ের আগুনের মত;—সহসা জ্বলিয়া উঠে—সহজেই নির্ব্বাপিত হয়। কাহারও কাহারও ক্রোধ বৃহৎ বনস্পতির কোটরগত বহ্নির মত, সহজে জ্বলে না, সহজে নির্ব্বাপিত হয় না। তাহার স্পর্শ ধ্বংসসহচর, তাহাতে পুষ্পিতদ্রুমলতাচ্ছাদিত শ্যাম বনভূমি বিগত-লতাপত্রপুষ্প,—শ্রীহীন হইয়া যায়। কর্ত্তার ক্রোধ সেইরূপ। সহজে তাঁহার রাগ হয় না; কিন্তু তিনি একবার রাগিলে কাহারও সাধ্য নাই, সে ক্রোধ শান্ত করে। হরনেত্রসম্ভব বহ্নির মত সে ক্রোধ ক্রোধের পাত্রের সর্ব্বনাশ করিয়া তবে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ব্যবসায়ে সত্যই মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ক্রমে সত্য তাঁহার প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; ক্রোধবশে কোন কথা বলিয়া ফেলিলে তিনি ন্যায়ান্যায়বিচার না করিয়া সেই কথা মত কার্য্য করিতেন। তিনি প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারিতেন না।

তাঁহার আশ্রিতদিগের পক্ষে তাঁহার আদেশ নিয়তির শাসনের মত অলঙ্ঘ্য ও কঠোর ছিল।

পুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া বজ্রকণ্ঠে পিতার আজ্ঞা ঘোষিত হইল, “দেবেশ্বর, তোমার স্ত্রী আমার আদেশের প্রতিবাদ করিয়া আমাকে অপমানিত করিয়াছে। তুমি হয় স্ত্রীত্যাগ কর, নয় সপরিবারে আমার গৃহত্যাগ কর।”

সেই মুহূর্ত্তে কক্ষমধ্যে বজ্রপাত হইলেও পুত্র অধিক বিস্মিত হইতেন না। এ আজ্ঞা একান্তই অপ্রত্যাশিত। তিনি নিরুত্তর রহিলেন।

পিতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি স্থির করিলে ?”

পুত্র বলিলেন, “আপনি পিতা, যে শাস্তি দিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু এ শাস্তি আমার নহে ; আপনার। আপনিই আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। আমাকে কে জানে ? আপনার পুত্র বলিয়াই আমার পরিচয়। আজ আমি সপরিবারে পথে দাঁড়াইলে লোকে আপনাকেই নিন্দা করিবে। ক্ষমা করুন।”

বৃদ্ধ অটল গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “তোমার বাচালতা শুনিবার জন্য তোমাকে ডাকি নাই। আমার আদেশ শুনিয়াছ। দুইএর এক তোমাকে করিতেই হইবে। কি করিবে, বল।”

পুত্র পিতার চরণে পতিত হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিলেন,—“ক্ষমা করুন। আমি তাহাকে শাসন করিব।”

পিতা শুনিলেন না।

পুত্রে পিতার কর্ম্মক্ষমতা, ব্যবসায়বুদ্ধি, অধ্যবসায়—কিছুই ছিল না ; কেবল পিতার ক্রোধান্ধতা বর্ত্তিয়াছিল। অপমানে পুত্রের হৃদয়ে সেই ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “আমি এমন নির্ব্বোধ নহি যে, আপনার ক্রোধের ভয়ে আমার পুত্রের জননীকে ত্যাগ করিব। তাহার শুভাশুভের জন্য আমি লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দায়ী। সে আমার বিবাহিতা পত্নী, ধর্ম্মপত্নী ;—অর্থের অপেক্ষা অনেক বড় ;—আমার পক্ষে অত্যাজ্য। হয় ত আপনার আদেশ প্রতিবাদের যোগ্য। আপনি পিতা, আমি পুত্র। আপনার পদে ধরিয়া তাহার হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছি। কিন্তু আপনার কথায় পাপী হইতে পারিব না। আমি অদ্যই আপনার গৃহ ত্যাগ করিব।”

পুত্রের এইরূপ ব্যবহারে বৃদ্ধ পিতার ক্রোধ প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমি হৃদয়-শোণিতে বিষধর পুষ্ট করিয়াছি। দূর হও। আজ হইতে আমার পক্ষে তুমি মৃত।"

সেই দিনই পত্নী ও পুত্রকে লইয়া আজন্মসুখলালিত দেবেশ্বর রিক্ত-হস্তে পিতার প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন।

দেবেশ্বরের জননী কাঁদিয়া লুটাইলেন; কিন্তু স্বামীর আদেশের বিরুদ্ধে কথা কহিবার সাধ্য তাঁহার নাই। তবে তাঁহার আশা ছিল, বৃদ্ধ আবার দেবেশ্বরকে ডাকিবেন। তাহার পুত্র সুরেশ্বর নহিলে বৃদ্ধের ভোজন হইত না, ভ্রমণ হইত না, বিশ্রাম হইত না। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পৌত্রটি পিতামহের একান্ত প্রিয় ছিল; এমন কি, তাঁহারই অতিরিক্ত আদরে সপ্তবর্ষবয়স্ক বালকের অক্ষরপরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই; কারণ, তাহার চক্ষের জল পিতামহের সহিত না। বৃদ্ধের কঠোর আদেশ ছিল, তাঁহার "দাদা"কে কেহ কখনও তিরস্কার পর্য্যন্ত না করে। দেবেশ্বরও বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, "বাবা বৈষ্ণব, কিন্তু নরমাংস ভোজন করেন। ছেলেটার মাথা খাইতেছেন!"

৩

সংসারসংগ্রামের উপযোগী শিক্ষা নাই, অর্থ নাই, সুসময়ে যাহারা সুহৃদ ছিল, তাহারা পিতার বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায় পুত্রের পক্ষ লইল না;—দেবেশ্বর চারি দিকে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি পিতার গৃহের অনতিদূরে একখানি জীর্ণ ক্ষুদ্র খোলার ঘর ভাড়া করিলেন। তাঁহার মুখে চিন্তার ছায়া, মনে সুখ নাই। বহুকষ্টে অনেক সন্ধানের ফলে অতি সামান্য বেতনে একটি চাকরী জুটিল। সে আয়ে সংসার চলে না। মা সর্ব্বদা সাহায্য পাঠাইতেন। দেবেশ্বর প্রথমে সে সাহায্যগ্রহণে সম্মত হন নাই, কিন্তু জননীর চক্ষে অশ্রু দেখিয়া সহজেই তিনি সম্মত হইলেন। বৃদ্ধ পিতা সে সাহায্যদানের কথা জানিতেন কি না, নিশ্চিত বলিতে পারি না; জানিলেও হয় ত জানিতেন না, এইরূপ ভাব দেখাইতেন।

ঐশ্বর্য্যপ্রাচুর্য্যে দেবেশ্বর যাহা প্রাপ্ত হন নাই, দারিদ্র্য দুঃখের মধ্যে তাহা পাইলেন। অদৃষ্টের এমনই উপহাস যে, কেহ সুখের সন্ধান করিয়া ব্যর্থকাম হয়, কেহ বিনা সন্ধানে অনায়াসে তাহা লাভ করে! সুখদেবতা অনেক সময় লক্ষ্মীর বরপুত্রদিগকে উপেক্ষা করিয়া দরিদ্রের ললাটে আপনার

স্নেহতিলক অঙ্কিত করিয়া দেন। অনেক সময় সুখ সম্ভব স্থান ত্যাগ করে ও অসম্ভব স্থানে প্রচুরতা প্রাপ্ত হয়। বৃহৎ সংসারের বিপুল কর্ত্তব্যের সহস্র উপলের মধ্যে দাম্পত্যসুখের যে সুধাধারা হারাইয়া যাইত, এবং তৃষ্ণার সময় সন্ধান না পাইয়া দেবেশ্বর ও কুমুদিনী উভয়েই যাহার অস্তিত্বে সন্দেহ করিতেন, এক্ষণে সেই সদাবর্দ্ধনশীল ধারার শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত নিঃশেষে পান করিতে পাইয়া উভয়ে অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ করিলেন। সে সুখস্বাদ তাঁহাদের পক্ষে একান্ত নূতন, তাঁহাদের অতৃপ্তপ্রেমতৃষাতুর হৃদয়ের পক্ষে বিশেষ শান্তিপ্রদ। পূর্ব্বে আলস্যের ভস্মাচ্ছাদনে যাহার দীপ্তি ম্লান হইয়াছিল, এক্ষণে দারিদ্র্যের বীজনে তাহা স্বপ্রকাশ দিব্যদীপ্তি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দেবেশ্বরের পত্নী কুমুদিনী স্বামীকে বলিল, "তুমি আমাকে ত্যাগ কর। তোমার ও সুরের কষ্ট সহিবে না। আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে, হইবে। পিত্রালয়ে দরিদ্রসংসারে ছু' বেলা ছু' মুঠা জুটিতেও পারে।"

দেবেশ্বর বলিলেন, "তাহা কখনই হইবে না। ছু' মুঠা আনিতে পারি, ছু' জনে খাইব; যদি এক মুঠা জুটে, ছু' জনে ভাগ করিয়া লইব। তুমি ও কথা আর মুখে আনিও না, আমি তত নীচ নহি। আমাদের জন্য ভাবি না। ভাবনা কেবল সুরের জন্য।"

দেবেশ্বর দেখিলেন, তাঁহার পত্নীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সেই দিন হইতে তিনি তাঁহার পত্নীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মুখরা ভার্য্যার যে এত গুণ ছিল, পূর্ব্বে দেবেশ্বর তাহা অনুমানও করিতে পারেন নাই। এখন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এক দিন তিনি সুন্দরী পত্নীর সুন্দর মুখ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এখন তাহার সহস্র সদ্গুণে মুগ্ধ হইলেন; হৃদয়ে শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর প্রেম স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইল। প্রেম যৌবনের স্বপ্নমাত্র; শ্রদ্ধাই প্রকৃত সুখের ভিত্তি। যে প্রেম শ্রদ্ধামূলক নহে, তাহা স্থায়ী হয় না। দেবেশ্বর দেখিলেন, যে পূর্ব্বে দশ জন দাসীকে আদেশ করিত, সে এক্ষণে দশ জন দাসীর কাজ করিতেছে; তাহার অজস্র যত্নে দারিদ্র্যের পঙ্কে শৃঙ্খলা ও সুখের শতদল বিকশিত হইয়া উঠিতেছে!

দেবেশ্বর সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতেন, যাহাতে সকল সুখে অভ্যস্ত পতির

কষ্ট না হয়, তাহার জন্য কুমুদিনী প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে; যাহা একান্ত অপ্রত্যাশিত, তাহাও যোগাইতেছে। প্রশংসার আবেগে তিনি পত্নীকে বক্ষে চাপিয়া তাহার অধরে চুম্বন করিতেন। সে চুম্বনে কুমুদিনীর হৃদয় পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিত; সে মনে করিত, স্বামীর এই আদরলাভের জন্য আমি কি না করিতে পারি?

কুমুদিনী তাঁহার পিতার কি আদেশের প্রতিবাদ করায় পিতা পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, দেবেশ্বর মনে করিয়াছিলেন, একদিন সুযোগমত পত্নীর নিকট তাহা জানিয়া লইবেন। কিন্তু পাছে সেই অপ্রিয় বিষয়ের অবতারণায় সংসারে নবপ্রতিষ্ঠিত এই সুখে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায় বহুদিন তাহা জিজ্ঞাসা করি করি করিয়া করিতে পারেন নাই। ক্রমে আর তাহা জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তি রহিল না।

৪

নূতন সংসারে দেবেশ্বর যথেষ্ট দাম্পত্যসুখ পাইলেন সত্য; কিন্তু কেবল ভাব ও অভাব, সুখ ও দুঃখ, চিন্তা ও কল্পনা লইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। সংসারযাত্রানির্ব্বাহের জন্য আরও কতকগুলি দ্রব্যের প্রয়োজন। সর্ব্ব সুখে পালিত—বিলাসে অভ্যস্ত ধনীর পুত্রের পক্ষে জীর্ণ খোলার ঘরে বাস, কদন্নভক্ষণ প্রভৃতি কেবল মানসিক কষ্টের কারণ নহে, স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণও বটে। জননীর স্নেহসাহায্য ছিল সত্য; কিন্তু নিদাঘের বর্ষণ যেমন ধরণীর একান্ত অসহ্য তাপমাত্র দূর করে—তাহাকে শীতল করিতে পারে না, সে সাহায্যে তেমনই একান্ত অসহ্য অভাব দূর হইত, তাহার অধিক বড় কিছু হইয়া উঠিত না। ইহার উপর চাকরীর শ্রম ছিল। যে কেবল চাকরদিগকে আদেশ করিতে জানে, সে আদেশ কত দূর পালিত হইল তাহা দেখিয়া লইতেও শিখে নাই, তাহার চাকরী বড় জ্বালা। যে বংশ-পরম্পরায় চাকরী করিয়া খায়, তাহার পক্ষে চাকরী এক কথা;—আর যে সহসা ঐশ্বর্য্যপ্রাচুর্য্য হইতে দারিদ্র্যে উপনীত হইয়া উদরান্নসংস্থানের জন্য চাকরী করে, তাহার এক কথা। শেষোক্তের হাল নাই, সে হাল ধরিতে জানে না, অথচ দায়ে পড়িয়া আবর্ত্তনাভি বীচিবিক্ষোভচঞ্চলা তরঙ্গিণীর প্রবাহে তরী ভাসাইয়াছে—সেই তরীতেই তাহার সব। সর্ব্বোপরি দুশ্চিন্তা ছিল। মানুষ আপনি সব সহিতে পারে, প্রিয়জনের কষ্ট তাহার পক্ষে একান্ত অসহনীয়। যখন অভ্যস্ত দ্রব্যাদির অভাবে পুত্র সুরেশ্বর কষ্ট

পাইত, তখন দেবেশ্বরের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিত। সহস্র চেষ্টাতেও তিনি পুত্রকে তাহার পূর্ব্বের অভ্যস্ত দ্রব্যাদি দিতে পারিতেন না। ফলে পুত্রও কষ্ট পাইত, পিতাও কষ্ট পাইতেন।

অল্প দিনেই দেবেশ্বরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি পীড়া গোপন করিয়া চাকরী করিতে লাগিলেন; পীড়ার কথা স্বীকারই করিতেন না। কিন্তু অসুস্থ শরীরে পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তার ফলে পীড়া ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। কুমুদিনী বলিত, "তোমার নিশ্চয় অসুখ করিয়াছে।" দেবেশ্বর সে কথা আমলেই আনিতেন না; বলিতেন, "তোমার রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছে।" কিন্তু এমন করিয়া কয় দিন চলে? অল্প দিনের মধ্যেই দেবেশ্বর শয্যা লইলেন। কুমুদিনী কাঁদিয়া বলিল, "তুমি আমার জন্য প্রাণপাত করিতে বসিয়াছ। তাহা হইবে না। তুমি আমাকে ত্যাগ কর; সুরেকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও।" দেবেশ্বর পত্নীর সরস অধরে আপনার শীর্ণ অধর সংস্থাপিত করিয়া সে প্রস্তাব উড়াইয়া দিলেন।

কিন্তু রোগে চিকিৎসা হইল না। ঔষধ ও পথ্য উভয়েরই অভাবে পীড়া বর্ষার লতার মত অপ্রতিহতগতিতে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দেবেশ্বরের দুশ্চিন্তাও বাড়িতে লাগিল। তিনি মরিলে তাঁহার পত্নী পুত্রের দশা কি হইবে, ভাবিয়া তিনি একান্ত কাতর হইলেন। হায়, অনাহারে পথপ্রান্তে প্রাণবিয়োগই কি তাহাদের শেষ গতি? দেবেশ্বর হৃদয়ে বিষম যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। রোগও বাড়িতে লাগিল।

শেষে দেবেশ্বর ভাবিলেন, মৃত্যুশয্যায় পিতার হস্তে তাঁহার পত্নীর ও পুত্রের ভার দিয়া যাইলে হয় ত তিনি ঠেলিতে পারিবেন না। তাহা হইলে তিনি মৃত্যুকালে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। যদি পত্নীর ও পুত্রের কোন উপায় হয়, এই আশায় তিনি সকল অপমান সহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। জীবনে যাহা করিতে সম্মত হন নাই, মৃত্যুকালে তাহা করিতে ইচ্ছুক হইলেন—তিনি পিতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। জীবনের হাট ভাঙ্গিবার সময় জীবনের সর্ব্বপ্রধান যাতনার কারণ দূর করিয়া তিনি পত্নীর ও পুত্রের উপায় করিতে চাহিলেন। দুর্ব্বল দেবেশ্বরের মনে এ বাসনা প্রবল হইতে লাগিল।

কয়বার বলি বলি করিয়া দেবেশ্বর পত্নীকে বলিলেন, "যদি বাবার সহিত

কুমুদিনী অনাহারে অনিদ্রায় স্বামীর শুশ্রূষা করিতেছিল। তাহারও দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। সে স্বামীর সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে উৎসুক। এই কথা শুনিয়া সে বলিল, "আমি যাইব।"

দেবেশ্বরের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। কুমুদিনী তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কি বিষম কষ্টকর কার্য্য করিতে চাহিল, তাহা তিনি বুঝিলেন।

৫

সেই দিন অপরাহ্নে বৃদ্ধ যখন রাশীকৃত হিসাবের খাতা লইয়া ব্যস্ত, সেই সময় তাঁহার কক্ষে দুই জন রমণী প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, প্রথমা তাঁহার পত্নী; দ্বিতীয়া তাঁহার মুখরা পুত্রবধূ,—বিষণ্ণা, মলিন-বসনা, অশ্রুবিপ্লুতা। উভয়েই রোরুদ্যমানা।

দেবেশ্বরের জননী অশ্রুকম্পিতকণ্ঠে স্বামীকে পুত্রের পীড়ার কথা ও তাহার শেষ ইচ্ছা জানাইলেন। বৃদ্ধ স্থির হইয়া শুনিলেন; মুহূর্ত্ত নিরুত্তর রহিলেন। তাঁহার মুখে যন্ত্রণাজনিত কুঞ্চন লক্ষিত হইল। বুঝি তিনি হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন, "তাহার কথায় আমার আর কাজ কি? আমার পক্ষে সে মৃত।"

শেষ কথাটি দেবেশ্বরের জননীর হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। অপমানিতা কুমুদিনী স্বামীর কাছে ফিরিয়া চলিল। স্বামীর শেষ ইচ্ছা যে পূর্ণ হইল না, এই কষ্টে তাহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। আপনার অপমান সে গ্রাহ্য করে নাই।

এ দিকে দেবেশ্বর উদ্বেগাকুলহৃদয়ে পত্নীর প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কুমুদিনীর মুখ দেখিয়া তাঁহার আর কিছু বুঝিতে বিলম্ব হইল না। দেবেশ্বরের শেষ আশাও নির্ব্বাপিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে জীবনী-শক্তিরও শেষ হইয়া আসিল।

তাহার পর চিকিৎসক, ঔষধ ও পথ্য, কিছুরই অভাব হইল না। মা ও ভ্রাতারা সে সকলের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু রোগ তখন চিকিৎসার অতীত, রোগীর জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। কিছুতেই কিছু হইল না।

চারি দিন পরে রাত্রিতে দেবেশ্বর বুঝিলেন, তাঁহার দিন ফুরাইয়াছে। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। সেই দিন নিশাশেষে জননীর কোলে মাথা রাখিয়া দেবেশ্বর জীবনের শেষ শ্বাস ত্যাগ করিলেন।

চরণসেবারতা পত্নীর অশ্রুসজল নয়নে সন্নদ্ধ দৃষ্টির উপর মৃত্যুর অন্ধকার যবনিকা পড়িল। কুমুদিনীর সর্ব্বনাশ হইল।

কিন্তু সহসা যদি দৈবদুর্য্যোগে নিশীথে আবাসগৃহ ভাঙ্গিয়া যায়, তবে গৃহস্থ কি করে? অপ্রত্যাশিতবিপৎপাতপ্রসূত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা দূর হইলেই সে সন্তানগুলি নিরাপদ আছে কি না দেখে, তাহার পর মাথা গুঁজিবার একটা স্থানের সন্ধান করিয়া সন্তানদিগকে লইয়া সেই বাত্যাবৃষ্টিভয়ঙ্করী নিশায় বিকশিতবিদ্যুদ্দীপ্তি পথে সেই আশ্রয়স্থানে গমন করে। কুমুদিনীও তাহাই করিল। স্বামীর মৃত্যুর পর সে পুত্রকে দ্বিগুণ আবেগে বক্ষে চাপিয়া ধরিল; শাশুড়ীর সাহায্যে তাঁহাকে লইয়া সেই জীর্ণ কুটীরে বাস করিতে লাগিল।

৬

সব যায়, স্মৃতি যায় না। সব যায়, প্রকৃতির স্বহস্তবদ্ধ বন্ধন বিছিন্ন হয় না। মানব বহুবর্ষের চেষ্টায় যাহা গঠিত করে, প্রকৃতি একটি ঘটনায় চূর্ণ করিয়া ফেলে। সাগরসলিলবিধৌত বল্মীকস্তূপের মত তাহার চিহ্ন-মাত্র থাকে না। মানব সহস্র যত্নে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে, এবং সহস্র চেষ্টায় যাহা দূর করিতে অসমর্থ হয়, আকস্মিক বিপৎপাত মুহূর্ত্তে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দেয়। মানুষ যখন ঘটনায় পড়িয়া শোণিতসম্বন্ধ শেষ করিতে উদ্যত হয়, প্রকৃতি তখন আপনার মনে আপনি হাসে; শেষে অকস্মাৎ এক দিন অতর্কিত ঘটনার সৃষ্টি করিয়া মানবকে তাহার দুর্ব্বলতা বুঝাইয়া দেয়। মুহূর্ত্তে সপ্রমাণ হয়, শোণিত আর সলিল এক নহে; শোণিতসম্বন্ধ বিলুপ্ত করা মানবের সাধ্যাতীত। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মানব চিরদিন পরাজিত।

দেবেশ্বরের পিতা মনে করিয়াছিলেন, তিনি উদ্ধত পুত্র দেবেশ্বরের সম্বন্ধে স্নেহের লেশ পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে দূর করিয়াছেন। বৃদ্ধ বুঝিতে পারেন নাই, অপত্যস্নেহ তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহারই হৃদয়ের চারি দিকে তাহার সহস্র মূল প্রসারিত করিয়া হৃদয় আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল। মৃত্যু তাহার মূলোৎ-পাটন করিয়া তাঁহাকে তাহা জানাইয়া দিল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত।

কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগিলে বেদনা যত সহজে প্রশমিত হয়, কঠিন হৃদয়ে তত সহজে মিলাইয়া যায় না। যে আঘাতে কোমল হৃদয়ে গভীর ক্ষত হয়, সে আঘাতে কঠিন হৃদয় শতধা ভগ্ন হইয়া যায়। বৃদ্ধেরও তাহাই

হইয়াছিল। কিন্তু সে বেদনার কথা তিনি ফুটিলেন না—আপনার বেদনা-বিধুর হৃদয়ের যাতনা আপনি গোপনে বহন করিতে লাগিলেন, আর কাহাকেও তাহার অংশ দিতে অস্বীকৃত হইয়া আপনি বিষম যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। সে যাতনার কথা আর কেহ জানিতে পারিল না।

৭

দেখিতে দেখিতে দেবেশ্বরের মৃত্যুর পর কয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। বর্ষার পর শরতের আগমনে প্রকৃতি প্রফুল্ল। আর দিবারাত্রি বারিপাত ও বিদ্যুদ্বিকাশ নাই। আকাশ নীল, কেবল মধ্যে মধ্যে সেই দিগন্তপ্রসারিত নীলিমার মধ্যে দুই একখানি বর্ষণলঘু, ক্রীড়াচঞ্চল, শুভ্র অভ্র ভাসিয়া যায়। তাহাদের বিদ্যুদ্বিকাশ রোগকাতরের শীর্ণ অধরে ম্লান হাসির সহিত উপমেয়। অপরাহ্নে বৃদ্ধ বারান্দায় বসিয়াছিলেন। পশ্চিম গগনে সূর্য্য একখানি ক্ষুদ্র মেঘে আবৃত; মেঘের সীমারেখায় দীপ্ত রবিকর ফুটিয়া বাহির হইতেছে, আর তাহারই পার্শ্বে বর্ণের বৈচিত্র্য,—কোথাও জবাকুসুমের রক্তরাগ, কোথাও গগনের নীলিমা, কোথাও বিকশিতপদ্মগর্ভের ক্ষীণ লোহিত আভা, কোথাও ক্ষীণ হরিৎ, উপরে গগনে কে যেন সিন্দূর ছড়াইয়া দিয়াছে।

বৃদ্ধ দেখিলেন, একখানি পাল্‌কীতে তাঁহার পত্নী গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্য তামাকু সাজিয়া আনিয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, সুরেশ্বর মৃত্যুশয্যায়, তিনি তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। বৃদ্ধ আর কোনও কথা কহিলেন না। সুযোগ পাইলেই ভৃত্য প্রভুর নিকট বাক্‌বাহুল্য প্রকাশ করে, সে বালকের পীড়ার কথা বলিতে লাগিল। দেবেশ্বরের মৃত্যুর পর হইতে বালকের বিমর্ষভাব, তাহার পীড়ার সঞ্চার, ক্রমে পীড়ার বৃদ্ধি—সে বৃদ্ধকে সব কথা শুনাইল। বৃদ্ধ অন্যান্য কথার মধ্যে বালকের আবাসস্থানের সন্ধান জানিয়া লইলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল। বৃদ্ধ ভাবিতে লাগিলেন; ফুরসীর নল হাতেই রহিল।

বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরের তরঙ্গমালার মত শত স্মৃতি বৃদ্ধের হৃদয় চঞ্চল করিয়া তুলিল। যে দিন সূতিকাগৃহদ্বারে ধাত্রী তাঁহাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রকে দেখাইয়াছিল, সে দিন সেই শিশুকে দেখিয়া তিনি হৃদয়ে কি আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর সে তাঁহারই অঙ্কে বর্দ্ধিত হইতেছিল। যে দিন দেবেশ্বর তাহাকে লইয়া চলিয়া যায়, সে দিন [illegible]

হৃদয় বেদনাক্লিষ্ট হয় নাই? আর আজ—তাঁহার ঐশ্বর্য্যপূর্ণ প্রাসাদের পার্শ্বেই সে দারিদ্র্যদুঃখজনিত পীড়ায় মরিতে বসিয়াছে!

সেই দিন অপরাহ্নে বৃদ্ধ কাহাকেও কিছু না বলিয়া যে কুটীরে সুরেশ্বর মৃত্যুশয্যায় শয়ান, একাকী সেই কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখের কক্ষটি শূন্য; বৃদ্ধ প্রবেশ করিলেন। মুক্ত দ্বারপথে দেখিলেন, দক্ষিণে আর একটি কক্ষে সুরেশ্বর মলিন শয্যায় শুইয়া আছে—যেন শয্যায় মিশাইয়া গিয়াছে, দেহ এমনই ক্ষীণ—বিবর্ণ। সুরেশ্বরের জননী পুত্রের শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন। গৃহে সিক্ত মৃত্তিকার দুর্গন্ধ। বাহিরে তখনও আলোক আছে; কিন্তু সে গৃহে তখনই প্রদীপ জ্বলিতে হইয়াছে। বৃদ্ধ চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। এই গৃহ তাঁহার স্নেহের শ্মশান, এই গৃহে তাঁহার পুত্র দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; এই গৃহে আজ তাঁহার প্রিয় পৌত্র দারিদ্র্যদুঃখপ্রসূত পীড়ায় মরিতে বসিয়াছে। উভয়েরই মৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী। বৃদ্ধের হৃদয়ে অনুতাপের বেদনা যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে পূর্ব্বের মত ডাকিলেন,—"দাদা!" শয্যাশায়ী বালক চমকিয়া চাহিল। দীর্ঘ কাল পরে পিতামহকে দেখিয়া সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে পূর্ব্বেরই মত আহ্বানের স্বরে উত্তর দিল—"দাদা!" তাহার পর উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। তাহার মাতা নিবারণ করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ দেখিলেন, সুরেশ্বর সেই সামান্য চাঞ্চল্যেই মলিন শয্যায় রক্তবমন করিল।

বৃদ্ধের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। প্রকৃতি একটি ঘটনায় স্পর্দ্ধিত হৃদয় ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়া দিল।

বৃদ্ধ সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি দ্বারে উপস্থিত হইতেই তাঁহার মুখরা পুত্রবধূ কক্ষমধ্য হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। বৃদ্ধ কক্ষমধ্যে পুত্রবধূর ক্রন্দনকম্পিত কণ্ঠস্বর শুনিলেন,—"যিনি তোমার পিতার মৃত্যুর কারণ, তাঁহার সহিত তোমার কোনও সম্বন্ধ নাই।"

বৃদ্ধ কিছু ক্ষণ বজ্রাহতের মত সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তাহার পর তিনি দীর্ণ বিদীর্ণ হৃদয়ে—কম্পিতপদে গৃহে ফিরিলেন। তখনও তাঁহার কর্ণে বালকের শেষ উচ্ছ্বসিত আহ্বান ধ্বনিত হইতেছিল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

হুমায়ূন ও শের সাহ।

৭

শের শাহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জালাল খাঁ পিতৃসিংহাসন অধিকার করিলেন। জালাল খাঁ জনসাধারণের নিকট সেলিম শাহ নামে পরিচিত ছিলেন। (১) তাঁহার রূঢ় ব্যবহারে রাজভক্ত ওমরাহ-বর্গ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ওমরাহদিগকে বিশ্বাস করিতেন না। শের শাহের সময়ে রাজা ও রাজপুরুষগণের মধ্যে যে মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এই ভাবে অন্তর্হিত হইল। সেলিম শাহ বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন না; পিতার অবলম্বিত শাসননীতির পরিহার করিয়া অভিনব পন্থার অনুসরণপূর্ব্বক কীর্ত্তিসংস্থাপন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালী প্রজার হিতকর কি না, তিনি আদৌ তাহার বিচার করিতেন না। (২) নয় বৎসর কাল রাজত্বের পর সেলিম শাহ কালগ্রাসে পতিত হইলে তদীয় দ্বাদশবর্ষবয়স্ক পুত্র ফিরোজ সাম্রাজ্যাধিকারী হইলেন। মহম্মদ নামে শের শাহের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। সেলিম মহম্মদের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ফিরোজ মহম্মদের ভগিনীর গর্ভজাত ছিলেন। সেলিমের মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে (৩) মহম্মদ ফিরোজকে বধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সেলিম জীবদ্দশাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মহম্মদ রাজ-

(১) আবদুল কাদের, ফিরিস্তা, আবুল ফজল ও অন্যান্য তৈমুরবংশাশ্রিত ইতিহাসবেত্তৃগণ জালাল খাঁকে সেলিম নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মিত দিল্লীর দুর্গ সেলিম-গড় নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু রাজমুদ্রায় তাঁহার নাম ইসলাম শাহ অঙ্কিত রহিয়াছে। যথা,—The world, through the favour of the Almighty has been rendered happy, since Islam Shah, the son of Sher Shah Sur has become king.

(২) They (his regulations) seem all silly and nonsensical. * * * In the first sentence of his paragraph we find land grants converted into money pensions, and in the last money pensions converted into land grants; merely because in both instances Sher Shah had enacted otherwise and Islam Shah was desirous of showing the world that he also had his 'own thunder.'

(৩) সকল ইতিহাসবেত্তাই ফিরোজের হত্যার সময় সম্বন্ধে একমত। কেবল তারিখ-ই-সালাতিন আফগানা গ্রন্থে, সেলিমের মৃত্যুর দুই মাস পরে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। এ জন্য সেলিম তাঁহাকে বধ করিয়া ফিরোজকে নিষ্কণ্টক করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজমহিষী ভ্রাতার প্রাণরক্ষার জন্য বারংবার কাকুতি মিনতি করাতে তাঁহার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হয় না। (৪) মহম্মদ যে সময় ফিরোজকে বধ করিতে উদ্যত হন, তখন তিনি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া মাতার কণ্ঠলগ্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতেও মহম্মদ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে বিরত হন নাই। মহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আদিল (ন্যায়পরায়ণ) উপাধি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি যথোপযুক্তরূপে রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন না বলিয়া লোকে তাঁহাকে আদলি বলিত। সাধারণ লোকে উচ্চারণের ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে আলদেলী (অন্ধ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিত।

আদিল অত্যন্ত কুক্রিয়ান্বিত ও বিলাসমগ্ন ছিলেন; তিনি রাজ্য-শাসন বিষয়ে কিছুমাত্র মনোনিবেশ করিতেন না; কার্য্যদক্ষ প্রধান মন্ত্রী হিমু (৫) সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। আদিল কর্ত্তৃক সিংহাসন অধিকৃত হইবার কিয়ৎ-কাল পরেই তাঁহার অপরিমিত ব্যয়ে রাজকোষের সঞ্চিত ধনরাশি নিঃশে-ষিত হইয়াছিল। তাঁহার পার্শ্বচর প্রিয়পাত্রগণের শোষণের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। এ জন্য আদিল ওমরাহবর্গের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্ব্ব্যবহারে সমস্ত দেশে বিদ্রোহের বেড়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। প্রথমতঃ চুণারে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল; আদিল ও হিমু তথায় গমন করিয়া বিদ্রোহের দমন করিলেন।

---

(৪) সেলিমের জীবদ্দশায় মহম্মদ কেবল আমোদ প্রমোদেই সমস্ত সময় অতি-বাহিত করিতেন। সেলিম তাঁহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়া স্বীয় মহিষীর (মহম্মদের ভগিনীর) মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার ভ্রাতা আমোদ ও লাম্পট্যই ভালবাসে; বাদ্য যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও গীতবাদ্যশ্রবণেই কালহরণ করিয়া থাকে। রাজত্ব তাহার স্পৃহনীয় নহে।" লোকচক্ষু হইতে আপনার রাজ্যলালসা গোপন রাখিয়া অন্ধত্ব অথবা মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য তিনি পাগলের ভান করিতেন।

(৫) হিমুর পূর্ণ নাম হেমচন্দ্র; জন্মস্থান রাজপুতানায়। হিমু দেখিতে অত্যন্ত কদাকার ছিলেন। তিনি প্রথমে দিল্লীতে দোকান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। এই সময়ে তিনি কোনও কারণে মহম্মদ আদিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র হন। মহম্মদ আদিল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করিয়া সমস্ত রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করেন।

কিন্তু বিদ্রোহদমন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই এব্রাহিম সুর নামক তাঁহার এক জন আত্মীয় (ভগিনীপতি) দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লইলেন। এব্রাহিম পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আদিল এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া এব্রাহিমকে বিনাশ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে এব্রাহিমের দূত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "জাঁহাপনা! আপনি এব্রাহিমকে মার্জ্জনা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার নিকট হোসেন প্রভৃতি ওমরাহগণকে প্রেরণ করিলেই তিনি আত্মসমর্পণ করিতে পারেন।" আদিল একান্ত দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন; তিনি এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া ওমরাহদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা এব্রাহিমের ভদ্র ব্যবহার ও প্রলোভনবাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ইহাতে তিনি এত দূর বলশালী হইয়া উঠিলেন যে, আদিল তাদৃশ প্রবল শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়া চূণারে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাংশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াই পরিতৃপ্ত রহিলেন। এব্রাহিমও অচিরে সুলতান উপাধি গ্রহণ করিয়া পশ্চিমাংশের শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু এব্রাহিম দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারিলেন না। তাঁহার সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই সেকন্দর নামক আদিলের আর এক জন আত্মীয় (ভগিনীপতি) পঞ্জাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। (৬) এব্রাহিম এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার বিষদন্ত উৎপাটন করিবার জন্য বিপুল বাহিনী সহ যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি শত্রুর নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন; দিল্লী ও আগ্রা সেকন্দরের হস্তগত হইল। এব্রাহিমের অধিকাংশ সৈন্য তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। এব্রাহিম দিল্লী ও আগ্রা ছাড়িয়া

(৬) এব্রাহিমের দিল্লী ও আগ্রা অধিকারের পর আদিল সন্দেহবশতঃ সেকন্দরকে বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হন। তাঁহার মনোভিলাষ কোনও ঘটনাসূত্রে তদীয় ভগিনীর (সেকন্দর-পত্নী) নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পত্নীর পরামর্শ মত সেকন্দর মৃগয়াব্যপদেশে আদিলের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক এব্রাহিমের নিকট উপনীত হইয়া পঞ্জাবের শাসনভার প্রার্থনা করেন। তিনি তথায় প্রত্যাখ্যাত হইয়া অভিমানভরে পঞ্জাবে গমন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

লইলে, আদিল সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাংশে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে এব্রাহিমের পরিবর্ত্তে সেকন্দর পশ্চিমাংশের অধিপতি হইলেন; আদিল পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বাংশের অধিপতি রহিলেন; এবং এব্রাহিম রাজ্যচ্যুত হইয়া নানা স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভারতের রাজলক্ষ্মী আফগানের পক্ষে একান্ত চঞ্চলা ছিলেন। এক বিপ্লব উপশমিত হইতে না হইতেই আর এক প্রবল ঝঞ্ঝা উত্থিত হইয়া কূলপ্লাবী তরঙ্গ তুলিত। সেকন্দর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন; কিন্তু দুই দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই হুমায়ুন বাদশাহ (৭) আফগান-অধিকৃত ভারত সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দর্শন করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন। সেকন্দর তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য অশীতি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ধাবিত হইলেন।

---

(৭) আমরা বলিয়াছি যে, হুমায়ুন ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া পারস্যরাজের শরণাপন্ন হন। পারস্য-ইতিহাস-লেখক সুপ্রসিদ্ধ সার জন ম্যাকলম স্বীয় গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন যে, হুমায়ুনের পারস্য দরবারে অবস্থানকালে শাহ তমশেপ তাঁহাকে আদর ও সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু বাদশাহের অনুচর জৌহরের লিখিত বৃত্তান্ত পড়িয়া আমরা অবগত হই যে, তিনি পারস্য দরবারে নানারূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন। এল্‌ফিনষ্টোন সাহেবও এই মতের পক্ষপাতী। তিনি বলেন যে, শাহ প্রথমতঃ তাঁহাকে যথোচিত সম্মানসহকারে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতানৈক্য ছিল। হুমায়ুন স্বমত পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলে তমশেপ তাঁহার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেন। যাহা হউক, পারস্যরাজ তমশেপ কান্দাহার ও কাবুল জয় করিবার জন্য নির্ব্বাসিত বাদশাহের অধীনে ১৪০০০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। তিনি এই সৈন্যদলের সাহায্যে ভ্রাতা মিরজা আস্করীকে পরাজিত করিয়া কান্দাহার দখল করেন। ভ্রাতৃস্নেহপরায়ণ হুমায়ুন মিরজা আস্করীকে ক্ষমা করেন। ইহার পর কাবুল রাজ্যও হুমায়ুনের পদানত হয়। এই সময় কামরাণ কাবুলে রাজত্ব করিতেছিলেন। কাবুল বিজিত হইবার পর হিন্দাল আসিয়া হুমায়ুনের সহিত যোগদান করেন। হুমায়ুনের উদারতা ও সদ্ব্যবহারে তাঁহার সঙ্গে আস্করী ও হিন্দালের সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়। কিন্তু রাজ্যচ্যুত কামরান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিকূলাচরণে ক্ষান্ত ছিলেন না। অবশেষে তিনিও নিঃসহায় হইয়া হুমায়ুনের হস্তে পতিত হন। হুমায়ুন তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করেন। ইহার পর বাদশাহ নিষ্কণ্টক হইয়া রাজত্ব করিতে থাকেন, এবং আফগানের কবল হইতে ভারত সাম্রাজ্য উদ্ধার করিবার উপায়-উদ্ভাবনে যত্নপর হন। তিনি পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সংবাদ পান যে, অন্তর্বিদ্রোহে আফগানশক্তি

সেকন্দর মোগল অধিপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য রাজধানী পরিত্যাগ করিলে এব্রাহিম পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিবার বাসনায় প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তিপরীক্ষা করিবার কাল্পী নামক স্থানে সসৈন্যে সমবেত হইলেন। আদিলও আপন সাম্রাজ্যের অপরার্দ্ধ শত্রুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছিলেন। এই সময় তিনিও শত্রুর বিষদন্ত ভগ্ন করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী হিমুকে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া প্রেরণ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ এব্রাহিমকে বিধ্বস্ত করিবার মনন করিয়া কাল্পীতে উপনীত হইলেন। তুমুল যুদ্ধে এব্রাহিম পরাজিত হইলেন; তাঁহার সমগ্র বাহিনী একবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল; তাঁহার মস্তক উত্তোলন করিবার ক্ষমতা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইল।

এব্রাহিম সমূলে বিনষ্ট হইতে না হইতেই আর এক নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ সুর স্বাধীনতা ঘোষণা পূর্ব্বক দিল্লীর সাম্রাজ্যেরদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজ্যলোলুপ পাঁচ জন প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন;—(১) আদিল,(২) এব্রাহিম,(৩) সেকন্দর,(৪) হুমায়ুন,(৫) মহম্মদসুর। এব্রাহিমের বিষদন্ত পুর্ব্বেই ভগ্ন হইয়াছিল; হুমায়ুন ও সেকন্দর পরস্পর বিবাদ করিয়া ক্ষীণবল হইতেছিলেন। এ জন্য আদিল মহম্মদ সুরকে দমন করাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়া হিমুকে চুণারে আহ্বান করিলেন। হিমু তদনুসারে চুণারে উপস্থিত হইয়াই সংবাদ পাইলেন যে, হুমায়ূন সেকন্দরকে

নিস্তেজ ও হীনবল হইয়াছে। এই সংবাদপ্রাপ্তির পর একদা মৃগয়ায় গমনকালে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণের বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। যে সকল ওমরাহ পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার অভিলাষী ছিলেন, তাঁহারা বাদশাহের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে অবিলম্বে ভারত আক্রমণে লিপ্ত করিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁহারা বলেন, 'এক জন লোক প্রেরণ করিয়া ক্রমান্বয়ে যে তিন জন লোকের সঙ্গে পথিমধ্যে তাহার দেখা হইবে, তাহাদের নাম জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক অদৃষ্টপরীক্ষা করিবার প্রাচীন নিয়ম প্রচলিত আছে।' হুমায়ূন অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া এ প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করেন। প্রেরিত লোকের সঙ্গে যে তিন ব্যক্তির ক্রমান্বয়ে দেখা হইয়াছিল, তাহাদের প্রথমের নাম দৌলত (সৌভাগ্য), দ্বিতীয়ের নাম মুরাদ (অভিলাষ), এবং তৃতীয়ের সাদিত (সুখ)। পরীক্ষার ফল বাদশাহের অনুকূল হওয়াতে তিনি অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই আফগানের কবল হইতে ভারত সাম্রাজ্যের উদ্ধার করিবার জন্য ভারতবর্ষে উপনীত হন।

যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়াছেন। (৮) কিন্তু আদিল ও তদীয় দক্ষিণবাহুস্বরূপ হিমু এই সংবাদ অবগত হইয়াও ও হুমায়ুনের বিরুদ্ধে শক্তিনিয়োগ না করিয়া বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ সুরকে সর্ব্বাগ্রে দমন করাই আবশ্যক বলিয়া অবধারণ করিলেন। তাঁহারা মহম্মদ সুরকে দমন করিলেন। সুর যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এব্রাহিমের উত্থানশক্তি পূর্ব্বেই রহিত হইয়াছিল; সেকন্দরও হুমায়ুনের হস্তে পরাজিত হইয়া হতবল হইয়াছিলেন; এক্ষণে মহম্মদ সুরও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। অতএব রঙ্গভূমিতে দুই জন মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী অবশিষ্ট রহিলেন,—হুমায়ুন ও আদিল। অতঃপর আদিল হুমায়ুনকে বিনষ্ট করিবার অন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

হুমায়ুন রণক্ষেত্রে জয়শ্রীলাভ করিয়া আবুল মালিককে পঞ্চনদ প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে অভিষিক্ত করিয়া হীনবল সেকন্দরকে সমূলে বিনষ্ট করিবার আদেশ দিলেন। তাহার পর তিনি সগৌরবে দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয়বার রাজসিংহাসন অধিকৃত করিলেন। বীরকেশরী বৈরাম খাঁর সাহায্যেই তিনি পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিলেন। তারদি বেগ দিল্লীর শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আবুল মালিকের কর্ত্তৃত্বাধীনে মোগলসৈন্যের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইল; এই অবকাশে সেকন্দর ক্রমশঃ বলসঞ্চয় করিলেন। হুমায়ুন এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার ধ্বংস করিবার জন্য বৈরাম খাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে রাজকুমার আকবরকে পঞ্জাবে প্রেরণ করিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। এক দিন সায়াহ্ন সময়ে হুমায়ুন পাঠগৃহের ছাদে বায়ুসেবনার্থ গমন করেন। তথা হইতে অবতরণ করিবার সময়ে তিনি আজানের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কলমা পাঠ করিয়া সোপানে

(৮) মোগল ও আফগান (সেকন্দর) সৈন্যে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে হুমায়ুন এবং তদীয় প্রধান সেনাপতি বৈরাম খাঁ সুকৌশলে সৈন্যপরিচালন করিয়াছিলেন; ত্রয়োদশ-বর্ষবয়স্ক শাহজাদা আকবর বিপুল পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হন। এই বালকের অসাধারণ পরাক্রমদর্শনে মোগলসৈন্যের হৃদয় এত দূর উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, তাহারা মৃত্যুর সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিল।

উপবেশন করেন। আজান-ধ্বনি শেষ হইলে তিনি যেমন দণ্ডায়মান হইবেন, অমনই তাঁহার পদস্খলন হয়। ইহাতেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার মৃতদেহ যমুনার তীরে সমাহিত হয়। আকবর তথায় একটি সৌষ্ঠবশালী গৃহ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন।(৯)

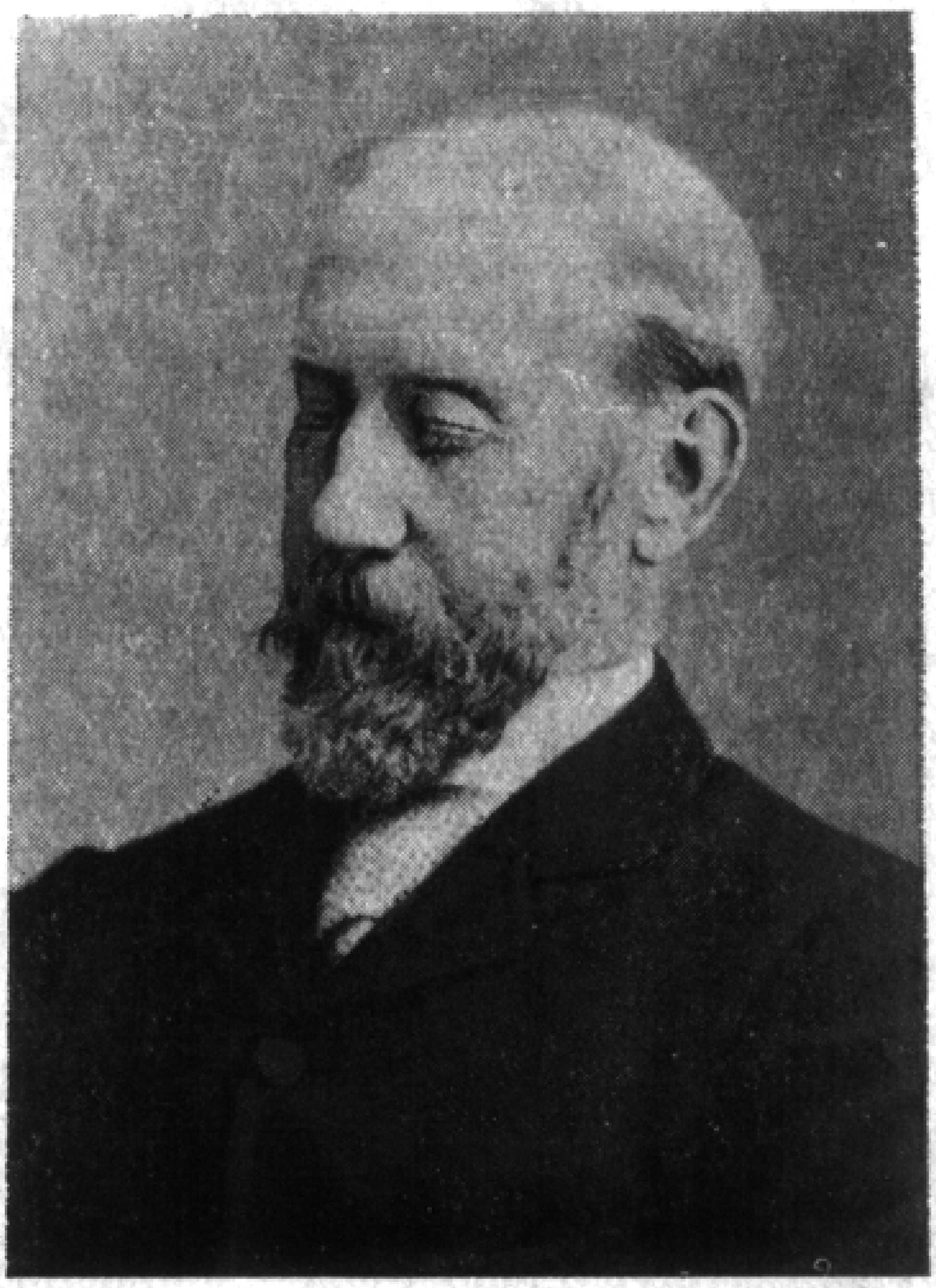
হুমায়ুন একপঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রমে মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি পঞ্চবিংশতি বৎসর দিল্লী ও কাবুলের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সুগঠিত উন্নত দেহ ও বীরশ্রী দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইত। হুমায়ুনের জীবনকাহিনী উপন্যাস অপেক্ষাও রহস্যময়ী। কখনও বা ভাগ্যলক্ষ্মীর করুণারাশি অজস্রধারে তাঁহার প্রতি বর্ষিত হইয়াছে, তাহার পর মুহূর্ত্তেই হয় ত তিনি বিপদের উত্তাল তরঙ্গমালায় পতিত হইয়া তৃণখণ্ডের ন্যায় বারংবার বিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার জীবনের প্রথমভাগ সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার পর তিনি এক দিনও শান্তিসুখে যাপন করিতে পারেন নাই। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে রাজ্যচ্যুত হইয়া তিনি উপর্য্যুপরি যেরূপ বিপদে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোনও নরপতিকে সেরূপ দুরবস্থায় পতিত হইতে হয় নাই। হুমায়ুন ভ্রাতৃস্নেহের দৃষ্টান্তস্থল; বস্তুতঃ অসাধারণ ভ্রাতৃস্নেহই তাঁহার সমস্ত দুর্দ্দশার মূল। তিনি ভ্রাতৃবৃন্দকে যতই স্নেহসূত্রে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা ততই তাঁহার অনিষ্টসাধন করিয়া কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৯) This mausoleum is one of the most splendid monuments which the munificence of princes has placed among the magnificent memorials of departed royalty in that country where these monuments abound to a degree perhaps unparalleled in any other. Though built of the most costly materials, and with a lavish expenditure exceeding any thing which preceded it the tomb of Humayoon is remarkable for the utter absence of everything like meretricious ornament. The spectator's attention is particularly arrested by the perfect chastity of design, and singular delicacy of execution, which this celebrated edifice exhibits. It is composed entirely of marble, in some of its parts exhibiting beautiful specimens of the most costly mosaic like the Tajmehal at Agra, built by Shah Jehan, after the same design, but still more costly, much more richly ornamented, and of considerably larger dimensions. The mausoleum of Humayoon is even now the admiration of travellers, and is altogether, according to the opinion of many, in better taste than that more celebrated and elaborate edifice, the Taj.

হুমায়ুন ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া পারস্যপতির সাহায্যে কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করেন। এই সময় তিনি কামরানের চক্ষুঃ উৎপাটন করিতে আদেশ দেন। এ বিষয়ে ইতিহাসবেত্তা মহম্মদ কাজিম ফেরিস্তা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা এ স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "মোগল ওমরাহবর্গমাত্রেই তাঁহাকে কামরাণের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া ভাবী বিপদের মূল উন্মূলিত করিতে বলিতেছিলেন। কিন্তু যদিও কামরাণ ভ্রাতৃবক্ষে পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাত করিয়া স্নেহের প্রতিদান দিয়াছিলেন, তথাপি হুমায়ুন ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার তাদৃশ মৃদু ব্যবহারে সৈন্যগণ বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেকেই অনুযোগ করিতে ছিল যে, তাঁহার উদারতাতেই মোগল-গণ বারংবার দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। অবশেষে বাদশাহ বাধ্য হইয়া আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কামরাণকে অন্ধ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। (১০) এই আদেশ প্রতিপলিত হইবার কয়েক দিন পরে তিনি দুর্ভাগ্য রাজকুমারকে দেখিতে যান। তাঁহার আগমনবার্ত্তা কামরাণের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলেন, "এই দুর্ভাগ্যকে দেখিলে আপনার রাজসম্মানের লাঘব হইবে না।" বাদ-শাহ ভ্রাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই; তাঁহার হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছিল।"

---

(১০) কামরাণ তাঁহার নিকট উপনীত হইলে তিনি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা জহোর-লিখিত বৃত্তান্ত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি— "The king however received him graciously, and pointed him to sit down on the bed on his right hand. * * * After some time, His Majesty called for a water melon, one third of which he took and divided with his brother. * * Preparation having been made for an entertainment the whole night was passed in jollity and carousing." ইহার চারি দিন পরে কামরাণকে অন্ধ করিবার রাজাদেশ প্রচারিত হয়। এই আদেশ কামরাণের শ্রুতি-গোচর হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমরা একবারে আমার জীবন বিনষ্ট কর, ইহাই বাঞ্ছনীয়।' রাজাদেশ প্রতিপালিত হইলে তিনি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, 'হে প্রভো, আমি ইহজীবনে যে কিছু পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত শাস্তি পাইলাম; পরকালে যেন তোমার করুণা লাভ করিতে পারি।'



সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ।



শ্রীযুক্ত ফিরোজসা মেটা।



শ্রীযুক্ত আনন্দ চার্লু।



মিষ্টার আলফ্রেড ওয়েব।

KUNTALINE PRESS.

হুমায়ূন মৃদুস্বভাব ও পরোপকারী ছিলেন, এ জন্যও তাঁহাকে অনেক সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইয়াছে। তিনি নানা বিদ্যার পারদর্শী ও কাব্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার ধনভাণ্ডার প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তিনি বুদ্ধিমান ও রসজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্যে সকলেই প্রীতিলাভ করিত। হুমায়ুন যুদ্ধক্ষেত্রেও পরাক্রম ও উদ্যম প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় ক্ষমাশীল ছিল। বস্তুতঃ যদি তিনি এত কোমল ও ধর্ম্মভীরু না হইতেন, তাহা হইলে সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

সম্পূর্ণ।

কংগ্রেস।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্!
শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

মাতৃপূজার এই মূলমন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের মেরুদণ্ড। পাশ্চাত্য সভ্যতার ও শিক্ষার প্রচারে ভারতবাসীদিগের হৃদয়ে মাতৃপূজার জাতীয় জীবনগঠনের যে আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, আনন্দমঠের মাতৃপূজার মন্ত্রে তাহারই বিকাশ; কংগ্রেস সেই আকাঙ্ক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল।

কংগ্রেস "জাতীয় মহাসভা", "জাতীয় "মহাসমিতি," "রাষ্ট্রীয় মহাসভা" প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র—সুতরাং তাহার সর্ব্বজনবোধ্য নামই আবশ্যক। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে জাতীয় জীবন পূর্ব্বে কখনও ছিল না; খণ্ডরাজ্যে শতধা বিভক্ত ভারতবর্ষ কাব্যে একচ্ছত্রাধীন হইলেও, ইতিহাসে তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণই প্রবল। এখন বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ এক দেশ; এই বৃটিশ-শাসনের ফলে ও প্রতীচ্যশিক্ষার বলে ভারতে জাতীয় জীবন সৃষ্ট হইতেছে। কংগ্রেসের কার্য্য সর্ব্বজাতির সুবিধার জন্য রাজভাষা ইংরাজীতে নির্ব্বাহিত হয়; সুতরাং কংগ্রেস নামেই ইহা পরিচিত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে কংগ্রেস শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে যে সকল ত্রুটি মার্জ্জনীয়,—কিছু দিন গত হইলে আর সে সকল অনুগ্রহের অবকাশ থাকে না; পরন্তু তীব্র সমালোচনার ভাগী হইতে হয়। সে হিসাবে কংগ্রেসের দৌর্ব্বল্যদোষের আলোচনা ও ত্রুটীসংশোধন আবশ্যক।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে মুষ্টিমেয় দেশহিতৈষী যে শুভকরী কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহার ফল সামান্য হইলেও, আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। জাতীয় জীবনে সপ্তদশ বর্ষ অতি সামান্য সময়। ইহারই মধ্যে মাতৃপূজার সঞ্জীবনমন্ত্রবলে যাহা সংসাধিত হইয়াছে, তাহাকে নগণ্য বলিতে পারি না। এখন ভারতবর্ষে জাতীয়-জীবন-গঠনের সূচনা দেখা গিয়াছে। ভারতের এক প্রান্তে বেদনার কারণ উপস্থিত হইলে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বেদনা-সচেতন হইয়া উঠে।

আমরা বিদেশী রাজার অধীন। রাজার নিকট অভাবজ্ঞাপনই আমাদের পক্ষে অভাবনিবারণের প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায়।

সত্য বটে, আমাদের আপনাদের চেষ্টায় দূর করিবার মত অভাব অনেক আছে। কিন্তু নূতন অধিকারলাভ রাজার কৃপা ব্যতীত সম্ভব নহে। অধীন জাতির কার্য্য রাজসাহায্যে যত সহজে সম্পন্ন হয়, আপনাদের চেষ্টায় তত সহজে সম্পন্ন হয় না। কাযেই আবেদন আর নিবেদন নিরর্থক নহে, নিরর্থক হয়ও নাই।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রথম সম্মিলন হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্ব বর্ষে কলিকাতায় আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নেতৃগণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের সেই সম্মিলনেই কংগ্রেসের সূত্রপাত। "থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটী" এই শুভ সম্মিলনের পথ সুগম করিয়াছিলেন। থিয়সফিষ্টদিগের সম্মিলনে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আন্তরিকতা-সংস্থাপন সহজসাধ্য হইয়াছিল।

সাধারণতঃ মিষ্টার হিউম কংগ্রেসের জনক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু যে কংগ্রেসের সহিত আমরা পরিচিত, তাহার জন্য ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড ডফরিণের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

মিষ্টার হিউম মনে করেন, যদি সামাজিক বিষয়ের আলোচনাকল্পে ভিন্ন ভিন্ন

যায়। এই উপলক্ষে শাসিত ও শাসকদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে যে যে প্রদেশে সম্মিলন হইবে, সেবার সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে সভাপতি-পদে বৃত করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল। এই সম্মিলনে রাজনীতির চর্চ্চা হয়, হিউমের তাহা অভিপ্রেত ছিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন, দেশের রাজনীতিচর্চ্চা একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্থিত রাজনীতিমূল সভাগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। তাহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কা অধিক।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার হিউম এই বিষয় বিবেচনা করিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শিমলায় লর্ড ডফরিণকে অবগত করান। লর্ড ডফরিণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলেন যে, তাঁহার মতে মিষ্টার হিউমের এই প্রস্তাব বিশেষফলোপধায়ী হইবে না। * তিনি বলিলেন, এ দেশে ইংলণ্ডের মত Opposition (গভর্মেণ্টের বিরোধী দল) নাই। সংবাদপত্রের সাহায্যে সে কার্য্য আংশিকরূপে সম্পন্ন হয় সত্য; কিন্তু সংবাদপত্রের মত সর্ব্বদা বিশ্বাসযোগ্য নহে; কাযেই দেশীয়গণ ইংরাজদিগের কার্য্যাদি সম্বন্ধে কিরূপ বিবেচনা করেন, ইংরাজদিগের তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নেতৃগণ বর্ষান্তে সম্মিলিত হইয়া শাসনের দোষ ও সে সকলের সংশোধনের উপায় কর্ত্তৃপক্ষীয়-

---

* ইহাতে লর্ড ডফরিণের দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সামাজিক বিষয়ের আলোচনায় মতভেদ অবশ্যম্ভাবী, মনোমালিন্য প্রায় অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান "সোশ্যাল কনফারেন্স" কংগ্রেসের অঙ্গীভূত নহে, পরন্তু তাহার সহিত সম্পর্কশূন্য, তথাপি কংগ্রেসমণ্ডপে তাহার সম্মিলন হেতু রক্ষণশীল ও পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী দলে মনোমালিন্য সঞ্চারিত হইয়াছে; তাহাতে কংগ্রেসের বলক্ষয় হইয়াছে। সামাজিক ব্যাপারের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক কি? ইংলণ্ডে বহুবর্ষের চেষ্টাতেও কুমারী বা বিধবা শ্যালিকার সহিত বিপত্নীক ভগিনীপতির বিবাহ চলিত হয় নাই। তাই বলিয়া কি ইংলণ্ড স্বায়ত্তশাসনের অনুপযুক্ত? বাল্যবিবাহের সমর্থক হিন্দুরা কি দেশের শাসনভার পাইবার অযোগ্য? কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন, সমাজসংস্কার না করিলে আমরা রাজনৈতিক অধিকার পাইবার যোগ্য হইব না। ইহার অর্থ কি? এতদুভয়ে সম্বন্ধ কোথায়? দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, কংগ্রেস বিচার ও শাসনবিভাগ পৃথক করিবার জন্য ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন; এই দুইটি প্রস্তাবের সহিত সমাজসংস্কারের কি সম্বন্ধ বিদ্যমান? আমাদের বিধবারা পুনরায় বিবাহ করেন না; আমাদের দুহিতারা অন্য দেশের বালিকাদিগের অপেক্ষা অল্প বয়সে বিবাহিতা হয়; আমাদের পত্নী ও দুহিতারা আমাদের সঙ্গে বন্ধুগৃহে প্রত্যভিবাদন করিতে গমন করেন না; আমাদের কন্যারা বিদ্যাশিক্ষার্থ অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে প্রেরিত হয়েন না—বলিয়া কি আমরা রাজনৈতিক অধিকারলাভের অযোগ্য?—লেখক।

দিগের গোচর করেন, তবে শাসিত ও শাসক উভয় পক্ষেরই বিশেষ উপকার হয়। এরূপ সভায় দেশের বা প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে সভাপতি করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ, তাঁহার সম্মুখে অনেকে তাঁহার ও তাঁহার অধীন বিভাগের দোষপ্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইতে পারেন। লর্ড ডফরিণের কথার সারবত্তা অনুভব করিয়া মিষ্টার হিউম আপনার ও তাঁহার প্রস্তাব, কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানের নেতাদিগের বিচারার্থ প্রেরণ করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে লর্ড ডফরিণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়া তদনুসারে কার্য্য আরব্ধ হয়। ডফরিণ মিষ্টর হিউমকে বলিয়াছিলেন, তিনি যত দিন এ দেশে বড়লাট থাকিবেন, ততদিন যেন এ সম্পর্কে তাঁহার নাম প্রকাশিত না হয়। মিষ্টার হিউম সে সত্য রক্ষা করিয়াছেন। তিনি যাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যতীত এ কথা আর কেহই জানিতেন না। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় Indian Poltics গ্রন্থে এ কথা লিপিবদ্ধ না করা পর্য্যন্ত ইহা সাধারণের অপরিজ্ঞাতই ছিল। কংগ্রেসের কল্পনা লর্ড ডফরিণের ব্যবস্থাপকসভার সদস্যনির্ব্বাচনের যে সামান্য অধিকার পাইয়া আমরা উল্লাসোৎফুল্ল হইয়া কংগ্রেসের সাফল্য প্রমাণ করি, সে অধিকার লর্ড ডফরিণের মন্তব্যের প্রসাদে প্রাপ্ত। কুক্ষণে আমাদের কোন পত্র-সম্পাদকের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটিল। সম্পাদকের অপরিণাম-দর্শিতার ফলে আমরা সংস্থাপকের সহানুভূতি হারাইলাম। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে "সেণ্ট এন্‌ড্রুজ" ডিনার উপেক্ষা করিয়া লর্ড ডফরিণ কংগ্রেসকে "a very big jump into the unknown" ও কংগ্রেস-ওয়ালাদিগকে "microscopic minority' বলিয়া অভিহিত করিলেন; ইহার পূর্ব্বে কলিকাতায় অধিবেশনের সময় তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত প্রধান প্রধান প্রতিনিধিবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ক্রমে শাসকদিগের সহিত কংগ্রেস সম্পর্কশূন্য হইয়া পড়িল; শাসকগণ এই অনুষ্ঠানকে শত্রুজ্ঞান করিতে লাগিলেন; শাসকদিগের সহানুভূতি আকর্ষণের আর কোন চেষ্টাই হইল না। কংগ্রেসে বক্তৃবর্গ শাসন-সমালোচনার প্রসঙ্গে সংযমের সীমা অতিক্রম করিয়া উৎসাহী প্রতিনিধি ও দর্শকাদির নিকট হইতে বিপুল করতালি লাভ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের স্বল্প-কালব্যাপী ইতিহাসে কংগ্রেস-কর্ণধারগণের এরূপ সহজ বিষয়বুদ্ধির অভাব বহুবার দৃষ্ট হইয়াছে।

বর্ত্তমান আকারে কংগ্রেস মিষ্টার হিউমের কীর্ত্তি না হউক, এক অনুষ্ঠান

মানস ক্ষেত্রে কংগ্রেসের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট আমরা যে কি পরিমাণ ঋণী, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। ইনি বিদেশী হইয়া আমাদের জন্য যেরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন,—যেরূপ শ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহা মনে করিলে তাঁহার প্রতি যেরূপ ভক্তির সঞ্চার হয়, সেই পরিমাণ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি কখনও ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন জাতি একত্রিত হইয়া জাতিতে পরিণত হয়, এবং সেই জাতি জড়ত্ব-শাপ-মুক্ত হইয়া পাষাণ-পঞ্জরে নবজীবনসঞ্চার অনুভব করে, তবে ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা-কিরণে উদ্ভাসিত হিউমের স্মৃতি দেবতার মত পূজিত হইবে। থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর সহিত সম্বন্ধই সম্ভবতঃ মিষ্টার হিউমের ভারতবাসীর প্রতি প্রীতির মুখ্য কারণ।

বিভিন্ন-প্রদেশের দেশহিতৈষীদিগের মধ্যে পরিচয়সংস্থাপন ও পরবর্ত্তী বর্ষে কি ভাবে রাজনৈতিক কার্য্য করিতে হইবে—তাহার নির্দ্ধারণ, এই দুই মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বড়দিনের অবকাশে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গের পুণায় সম্মিলিত হইবার কথা স্থির হয়। * কিন্তু সেই সময় পুণায় বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়।

প্রথম বৎসর বোম্বাই নগরে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে যে মুষ্টিমেয় প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কে তখন মনে করিয়াছিলেন যে, সে দিনের উপ্ত বীজ এত অল্প দিনেই সহস্রশাখ বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হইবে? কংগ্রেসের লব্ধ ফল যতই সামান্য হউক না কেন, স্বাধীন দেশেও এক একটি অধিকারলাভের জন্য যে পরিমাণ সময় ও অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার তুলনায় আমরা অনায়াসে প্রচুর পাইয়াছি। উদারনীতিশীল স্বাধীন ইংলণ্ডে "করণ্ ল রিফরম্ অ্যাক্টের" জন্য যত দিন লাগিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে উপলব্ধ হইবে, অধীন ও রক্ষণশীল ভারতে এই কয় বৎসরে কংগ্রেসের চেষ্টায় যাহা সাধিত হইয়াছে, তাহা যেমন বিস্ময়কর, গবর্মেণ্টের পক্ষেও তেমনই শ্লাঘার বিষয়।

বোম্বাই নগরের অধিবেশনে প্রতিনিধিসংখ্যা এক শতও হয় নাই। পর বৎসর কলিকাতার অধিবেশনে ৪৩৬জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সুধী রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে

* *Vide* Proceedings of the First Indian National Congress p. 5 Original edition.

সাদরসম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—এক দিন আমার বিক্ষিপ্ত স্বজাতীয়গণ একত্রিত হইবেন—আমরা স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত জীবন যাপন না করিয়া একটি জাতিতে পরিণত হইব, ইহাই আমার জীবনের অন্যতম স্বপ্ন। এই কংগ্রেস সেই জাতীয় একতার আরম্ভ। সেবার কর্ম্মযোগী ত্যাগশীল শ্রীযুক্ত দাদাভাই নারোজী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার অধিক পরিচয় অনাবশ্যক। কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন মান্দ্রাজে হয়। সেবার প্রতিনিধিসংখ্যা ৬০৭, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিবিশারদ রাজা সার তাঞ্জোর মাধব রাও। তিনি বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস বৃটিশ শাসনের সর্ব্বোচ্চ গৌরব, বৃটিশ জাতির গৌরবমুকুট। সেবার বোম্বাইয়ের সর্ব্ব সৎকর্ম্মে অগ্রণী, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপাত্র, মুসলমান-কুলতিলক শ্রীযুক্ত বদরুদ্দিন তয়াবজী সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন। মান্দ্রাজে মুসলমান-সম্প্রদায়ের নেতা মীর হুমায়ুনজা ও য়ুরেসিয়ান দলের নেতা মেসার্স হোয়াইট ও গ্যাঞ্জ কংগ্রেসের কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। মিষ্টার হোয়াইট মান্দ্রাজের স্থায়ী কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি ও মিষ্টার গ্যাঞ্জ অন্যতর অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। * এইবার মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা লর্ড কণেমারা প্রধান প্রতিনিধিদিগকে উদ্যানবিহারে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মানিত করেন। ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় অযোধ্যানাথের আহ্বানে, উদারহৃদয় মহাত্মা জর্জ ইউলের সভাপতিত্বে ১২৪৮ জন প্রতিনিধি এলাহাবাদে সমবেত হয়েন। ইহার পূর্ব্বেই লর্ড ডফ্‌রিণ "সেণ্ট এণ্ড্রুজ ডিনার" উপলক্ষে কংগ্রেসকে গালি দিয়াছিলেন। কংগ্রেস-বিরোধী সার অকল্যাণ্ড কল্‌ভিন তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। কাযেই 'আপকেওয়াস্তের' দল যে কংগ্রেসের অনিষ্টচেষ্টা করিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? কংগ্রেসের সম্মিলনস্থানপ্রাপ্তির বিষয়ে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিয়াছিল; কিন্তু অমিততেজ অযোধ্যানাথের উৎসাহ বাধা পাইয়া দ্বিগুণবলশালী হইয়া উঠিল। কংগ্রেসের আর কোনও অধিবেশনে বুঝি তেমন উৎসাহ দেখা যায় নাই। অযোধ্যানাথের আহ্বান আন্তরিকতাপূর্ণ; সভাপতি ইউলের অভিভাষণ সারগর্ভ, জ্বালাময়, মরণাহতের হৃদয়েও তাড়িৎসঞ্চারক্ষম।

এই সময়ে সার অকল্যাণ্ড কলভিনের লিখিত ও ভিঙ্গার রাজার নামে প্রচা-

---

* *Vide* Annual Report of Madras Standing Congress Cammittiee for 1888. স্থির হইয়াছিল, মিষ্টার হোয়াইটকে কংগ্রেসের সভাপতিত্বে বৃত করা হইবে; তাঁহার অকালমৃত্যুবশতঃ সে সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।—লেখক।

রিত Democracy not suited to In dia নামক পুস্তিকা এবং মিষ্টার হিউম ও সার অকল্যাণ্ড কল্‌ভিন যে পত্রে কংগ্রেসের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই পত্রদ্বয় প্রকাশিত হয়। মান্দ্রাজের স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার মিষ্টার নর্টন এই সময় লর্ড ডফরিণের "সেণ্ট এণ্ড্রুজ ডিনারে" অভিব্যক্ত বক্তৃতার উত্তরে Open letter লেখেন। উভয়েই ইংরাজ, উভয়েই পণ্ডিত, উভয়েই উৎকৃষ্ট বক্তা ও সুলেখক। উভয়েই গালিবিদ্যাবিশারদ। এই বিচার যোগ্যে যোগ্যে। যাঁহারা লর্ড ডফরিণের বক্তৃতা ও মিষ্টার নর্টনের উত্তর পাঠ করেন নাই, তাঁহাদিগকে তদুভয়ের কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা নিষ্ফল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন হয়। সেবার প্রতিনিধি-সংখ্যা ১৮৮৯; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ফিরোজশা মেটা; সভাপতি অকৃত্রিম ভারতসুহৃদ সার উইলিয়ম ওয়েডারবরণ। এই বৎসর মৃত মহাত্মা ব্রাডল কংগ্রেসে আগমন করেন; সম্ভবতঃ সেই জন্যই প্রতিনিধির সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল। পরবর্ষে কলিকাতার প্রতিনিধিসংখ্যা ৬৭৭; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি দরিদ্রবন্ধু স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ, সভাপতি শ্রীযুক্ত ফিরোজশা মেটা। এই সময় সহবাসসম্মতির আইন লইয়া ঘোর বাদানুবাদ চলিতেছিল। কংগ্রেসের নেতৃগণও দুই দলে বিভক্ত হইয়া কেহ বা আইনের সমর্থন, কেহ বা তাহার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। কংগ্রেস-বিরোধীরা আশা করিয়াছিলেন, এই গৃহবিবাদে কংগ্রেস ছিন্ন ভিন্ন হইয়া লোপ পাইবে। কিন্তু সামাজিক বিবাদের অগ্নিতাপ কংগ্রেসকে স্পর্শ করে নাই। পর বৎসর নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেবার প্রতিনিধি-সংখ্যা ৮১২ জন; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নারায়ণ স্বামী নায়ডু; সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত আনন্দ চার্লু বাহাদুর। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। পূর্ব্ব বৎসর নাগপুরে পণ্ডিত অযোধ্যানাথ এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু বিষম শ্রমে কাতর অবস্থায় নাগপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পীড়িত হইয়া পড়েন। পীড়া কয় দিনেই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল; গৃহে ফিরিয়া কর্ম্মবীর শয্যা লইলেন। সেই শয্যাই তাঁহার মৃত্যুশয্যা। যদি কেহ কংগ্রেসের জন্য প্রাণপাত করিয়া থাকেন—তবে সে পণ্ডিত অযোধ্যানাথ। পূর্ব্ববার অধিবেশনের জন্য স্থানপ্রাপ্তি কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। এবার অধুনা লোকান্তরিত দ্বারবঙ্গের দানশৌণ্ড মহারাজা লক্ষ্মীশ্বরের কৃপায় সে বিঘ্ন দূর হইল। তিনি বিপুল ব্যয়ে "

বাটী ক্রয় করিয়া, কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য অর্পিত করিলেন। এবার হোতা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; তন্ত্রধারক পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ। প্রতিনিধি-সংখ্যা ৬২৫।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে লাহোরে কংগ্রেসের নবম অধিবেশন হয়। এবার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সর্ব্বপ্রধান শিখ সর্দ্দার দয়াল সিংহ ; সভাপতি শ্রীযুক্ত দাদাভাই নারোজী। প্রতিনিধি-সংখ্যা ৮৬৭। পর বৎসর মান্দ্রাজে ১১৬৩ জন প্রতিনিধি সমবেত হয়েন। এবার শ্রীযুক্ত রঙ্গিয়া নায়ডু অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও পার্লামেণ্টের আইরিস সভ্য মিষ্টার আলফ্রেড ওয়েব সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন। তৎপরবৎসর পুণায় প্রতিনিধি-সংখ্যা ১৫৮৪ ; অভ্যর্থনা-সমিতি সভাপতি রাও বাহাদুর শ্রীযুক্ত ভিড়ে ; সভাপতি বাগ্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্র বাবুর অভিভাষণ সুদীর্ঘ, সারগর্ভ, বিবিধ তত্ত্বের সমাবেশে সমুজ্জল। পর বৎসর কলিকাতার প্রতিনিধি-সংখ্যা ৭৮৪ ; সভাপতি বোম্বাইবাসী সুপ্রথিত শ্রীযুক্ত রহিমতুল্লা মহম্মদ সায়ানী ; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারক সার রমেশচন্দ্র মিত্র। ভগ্নস্বাস্থ্য রমেশচন্দ্র অধিবেশনের সময়ে স্বয়ং সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বিজ্ঞবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার হইয়া কার্য্য সম্পাদন করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বেরারের রাজধানী অমরাবতী নগরে মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত শঙ্কর নায়ারের সভাপতিত্বে ৬৯২ জন প্রতিনিধি সমবেত হয়েন ; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত গণেশ শ্রীকৃষ্ণ কপর্দ্দী। পর বর্ষের সম্মিলন মান্দ্রাজে ; প্রতিনিধি-সংখ্যা ৬১৪ ; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুব্বা রাও পান্তলু ; সভাপতি শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে প্রতিনিধি-সংখ্যা ৭৩৯। এই অধিবেশনে সভাপতি করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছিলেন। এবার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বংশীলাল সিংহ। এই রোগক্লিষ্ট বৃদ্ধের উৎসাহ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। পর বর্ষের অধিবেশন লাহোরে। এবার সভাপতি বোম্বায়ের শ্রীযুক্ত চন্দাবরকর ; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন রায়। বর্ত্তমান বর্ষের অধিবেশন কলিকাতায় ; সভাপতি অর্থনীতিবিশারদ শ্রীযুক্ত দীনশা ইদলজী ওয়াচা ; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর।

কংগ্রেসের সংস্থাপনাবধি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গ যে অর্থব্যয়



শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।



শ্রীযুক্ত রহিমতুল্লা মহম্মদ সায়ানী।



শ্রীযুক্ত শঙ্কর নায়ার।



শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বসু।

KUNTALINE PRESS.

করিয়া, অসুবিধা তুচ্ছ করিয়া, মিলনমণ্ডপে সমাগত হইয়াছেন, আর সব ছাড়িয়া দিলেও, ইহাই কংগ্রেসের অসাধারণ সাফল্য।

কংগ্রেসের প্রার্থনার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি প্রধান—(১) ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার ও সভায় নির্ব্বাচনপ্রথার প্রবর্ত্তন ; (২) জুরীর বিচারের সম্প্রসারণ ; (৩) বিচার ও শাসনবিভাগের পার্থক্য-বিধান (৪) এ দেশে সামরিক বিদ্যালয় সংস্থাপন ; (৫) এ দেশে শাসনব্যয়ের সংক্ষেপ; (৬) এ দেশে সামরিক ব্যয়ের সঙ্কোচ ; (৭) একই সময়ে ভারতে ও ইংলণ্ডে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাগ্রহণ ; (৮) ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বঙ্গে প্রবর্ত্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তন।

এই সকল প্রার্থনার মধ্যে ব্যবস্থাপক-সভার সংস্কার বিষয়ে আমরা কতক পরিমাণে সফলকাম হইয়াছি। আন্দোলনের ফলে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে ব্যবস্থাপক-সভার সংস্কারবিধি বিধিবদ্ধ হয়। জুরীর বিচার সম্বন্ধেও কংগ্রেসের কার্য্য অনেকটা সফল। বঙ্গের ছোটলাট সার চার্লস ইলিয়ট জুরী-প্রথা সমূলে উৎপাটিত করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর যে ইস্তাহার জারী করেন, আন্দোলনের ফলে ১৫৪ দিনের মধ্যে তাহা প্রত্যাহৃত হয়। এ দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত নূতন। এই ইস্তাহারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকালে আমরা বেসরকারী ইংরাজদিগের নিকট প্রচুর সাহায্য পাইয়াছিলাম। স্বল্প চেষ্টায় আমরা বেসরকারী ইংরাজদিগের সাহায্য পাইতে পারি। সে বিষয়ে আমাদের চেষ্টার শোচনীয় অভাব।

বিচার ও শাসন বিভাগদ্বয়ের পার্থক্যবিধান বিষয়ে যেরূপ গভীর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে ও অনেক সহৃদয় প্রাচীন ইংরাজ কর্ম্মচারী যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সত্বরই সুফলের আশা করা যাইতে পারে। এই আন্দোলনের জন্য আমরা সার রিচার্ড গার্থ, লর্ড হবহাউস প্রভৃতি সহৃদয় সুবুদ্ধি ইংরাজদিগের নিকট বিশেষরূপ ঋণী। আমাদের পক্ষে এই সংস্কার-প্রার্থনা স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত। এই সংস্কারের জন্য তিনি অসাধারণ শ্রম করিয়াছিলেন; এই সংস্কারচেষ্টা তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য, এবং সম্ভবতঃ তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ। গভর্মেণ্ট ব্যয়বাহুল্যের ওজরে প্রস্তাবগ্রহণে আপত্তি করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত ফিরোজশা মেটা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন, ব্যয়বাহুল্য না করিয়াও এ কার্য্য করা যাইতে পারে।

শুনিতে পাওয়া যায়, রাজভ্রাতা ডিউক অব কনট কার্য্যপদেশে এ দেশে অবস্থিতিকালে ভারতে সামরিক-বিদ্যালয়-সংস্থাপনের প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। লর্ড কর্জ্জনের নবসংস্থাপিত Imperal Cadet Corps এ এ কার্য্য কতকটা অগ্রসর হইয়াছে।

দুর্দ্দশাদুঃখতাড়িত ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ এখন ঋতুপরিবর্ত্তনেরই মত স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণানুসন্ধানে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ মনোযোগী হইয়াছেন। প্রধানতঃ কংগ্রেস-সুহৃদগণের সমবেত চেষ্টায়, ইংলণ্ডে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল উভয় দলের সমবেত চেষ্টায়, সম্প্রতি ইংলণ্ডে Indian Famine Union সংস্থাপিত হইয়াছে। আশা করা যায়, ভারতের সর্ব্বত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্প্রসারিত না হউক, ভূমির কর দীর্ঘ ব্যবধানে পরিবর্ত্তনীয় হইতে পারে। এ বিষয়ে যে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের ও ইংলণ্ডের জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই আন্দোলনের সার্থকতা।

সার চার্লস ডিল্ক অন্ধ কংগ্রেস-সুহৃদ নহেন। একই সময় ইংলণ্ডে ও ভারতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা-গ্রহণের কথায় তিনিও বলিয়াছেন, মৃত অধ্যাপক ফসেটকে এ সম্বন্ধে যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, সে কথা রক্ষা করা হয় নাই। যাহা হউক, এখন আর জুয়াচুরী করিয়া শিক্ষিত ভারতবাসীদিগকে উত্তেজিত না করিয়া, এ ব্যাপার যেমন আছে, তেমনই রাখা ভাল। *

কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশনের সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কংগ্রেস দেশে নূতন ভাব জাগাইয়াছে। দেশের লোক নবোৎসাহে পূর্ণ হইয়াছে। দেশের বিক্ষিপ্ত সম্প্রদায় সকল একত্রিত একীভূত হইয়াছে। তাহারা জাতীয়-জীবন-সঞ্চারে সচেতন হইয়া, একই উদ্দেশ্যে এক হইয়াছে। দেশের লোক সাধারণ কর্ত্তব্যের উচ্চ আদর্শ পাইয়াছে। তাহাতে জাতীয় চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে; প্রাচ্যের নমনীয়তায় প্রতীচ্যের স্থৈর্য্য সঞ্চারিত করিতেছে।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যে জাতীয়ভাব সুপ্ত ছিল, তাহার আবিষ্কার কংগ্রেসের কার্য্য। কংগ্রেস মাতৃপূজার মন্ত্রবলে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। কংগ্রেসে যদি আর কিছুই না হইয়া থাকে, তথাপি আমাদের মধ্যে জাতীয়জীবনসঞ্চারেই সকল শ্রম ও অর্থ সার্থক হইয়াছে। এই যে সেদিন শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের বিপৎকালে বঙ্গবাসীরা আপনাদিগকে বিপন্ন জ্ঞান করিয়া তাঁহার

* Problems of Greater Britain, vol. II, 142.

সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, সে কি কেবল কথার কথা? কংগ্রেসের পূর্ব্বে সে ব্যাপার সম্ভব হইত না।

ইংরাজী শিক্ষাই এই জাতীয় ভাবের মূল। ইংরাজ আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, কংগ্রেস তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। কংগ্রেস গবর্মেণ্টের বিরাগের পাত্র না হইয়া আদরের বস্তু হইবার যোগ্য। লর্ড মেকলে যে শিক্ষার সমর্থন করিয়াছিলেন, কংগ্রেস তাহারই ফল।

কংগ্রেসে এ পর্য্যন্ত হিন্দু, মুসলমান, পারসী ও ইংরাজ সভাপতির আসন শোভিত করিয়াছেন। দেশীয় খৃষ্টান, য়ুরেশিয়ান ও ইহুদী দলের কোনও নেতা এ পর্য্যন্ত সে পদে বৃত হয়েন নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, য়ুরেশিয়ান সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা মান্দ্রাজের মিষ্টার হোয়াইটকে একবার সভাপতি করিবার কথা হইয়াছিল। তাঁহার অকালমৃত্যুতে সে শুভসঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দুঃখের বিষয়, এক্ষণে এই সম্প্রদায়ের সহিত কংগ্রেসের সম্বন্ধ-সূত্র বিচ্ছিন্নপ্রায়। ইহুদী সম্প্রদায় সংখ্যায় প্রায় নগণ্য; আমাদিগের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধও সামান্য। সুতরাং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন অনাবশ্যক। আশা করি, দেশীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কোনও নেতাকে আমরা শীঘ্রই কংগ্রেসের সভাপতি দেখিতে পাইব। কংগ্রেসের বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক এক জন দেশীয় খৃষ্টান। প্রতিনিধিদিগের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের লোকও জনসংখ্যার পরিমাণে নগণ্য নহেন। প্রদেশ হিসাবে দেখিতে হইলে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী (নূতন নাম—যুক্ত প্রদেশ) কেহ সভাপতি হয়েন নাই। ইহাতে মনোমালিন্যসঞ্চারের সম্ভাবনা আছে।

দুই জন মুসলমান কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন। কিন্তু আমরা যে মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট যথোপযুক্ত সাহায্য পাই নাই, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত সায়ানী তাঁহার বক্তৃতায় মুসলমানদিগের কংগ্রেসবিরাগের কারণের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে সে সকলের আলোচনা অনাবশ্যক। তাঁহার মত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে হইলে বলিতে হয়, মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের অভাবই তাঁহাদিগের কংগ্রেসে বিরাগের কারণ। কিন্তু এ কথা যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতের অভাব, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ ও এই সম্প্রদায়ের অবমাননা করা হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যা-তালিকায় দৃষ্ট হইবে, বৃটিশ-শাসনাধীন ভারতে—

মুসলমান	হিন্দু
পুরুষ ২৫৪৭২৩৫৭	পুরুষ ৭৮৬৪২২৬৬
শিক্ষিত ১৩০২৫৮২	শিক্ষিত ৬৭০৭৮০৬

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক। কিন্তু উপরে প্রদত্ত হিসাবে যাহা দেখা যায়, তাহার পরিমাণ মত প্রতিনিধি-সংখ্যা কংগ্রেসে দেখা যায় না। মুসলমানগণও রাজনৈতিক আন্দোলনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন, এবং সে জন্য স্বতন্ত্র সমিতিসংস্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। তবে কংগ্রেস তাঁহাদের বিরাগভাজন কেন? ইহাতে যে আমাদের নেতৃগণের কার্য্যকরী বুদ্ধির অভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, এ সত্য বলিলে আশা করি, কংগ্রেসদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইব না। নেতৃগণ যথোচিত চেষ্টা করিলে সম্ভবতঃ লক্ষ্ণৌ নগরে পরামর্শ-সভায় মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিতেন না। এই কংগ্রেসের অধিবেশনে ৭৩৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৩১৪ জন মুসলমান। যথোচিত চেষ্টা করিলে কি আমরা শ্রীযুক্ত হামিদ আলী ও শ্রীযুক্ত সরফউদ্দীনের মত কংগ্রেসের লোকদিগকে হারাইতাম? কেহ কেহ বলেন, সংখ্যার অল্পতা হেতু ব্যবস্থাপকসভার প্রতিনিধিনির্ব্বাচনে বিফল-মনোরথ হইবার সম্ভাবনায় মুসলমানগণ কংগ্রেস ত্যাগ করিতেছেন। এ আশঙ্কা অমূলক। নির্ব্বাচনাধিকারপ্রাপ্তির বর্ষেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মৌলবী সিরাজুল ইস্‌লাম সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন। নির্ব্বাচকদিগের অধিকাংশ হিন্দু হইলেও তাঁহারা যোগ্য ব্যক্তির নির্ব্বাচনে ধর্ম্মের বিরোধ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে শ্রীযুক্ত সায়ানী বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন। যত দূর স্মরণ হয়, মান্দ্রাজ হইতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম নির্ব্বাচিত সভ্য মীর হুমায়ুনজা। কংগ্রেসে হিন্দু প্রতিনিধির আধিক্য হেতু মুসলমানদিগের স্বার্থহানিকর কোনও প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হইবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। কারণ, চতুর্থ অধিবেশনের ত্রয়োদশ প্রস্তাবে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, কোন প্রস্তাবে হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সভ্যের আপত্তি হইলে তাহা ত্যক্ত হইবে। শ্রীযুক্ত তায়াবজী হাইকোর্টের জজ হইয়াও কংগ্রেসকে ভুলিতে পারেন নাই। আলিগড় কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মত মিষ্টার

বেকার ইংলণ্ডে কোনও বক্তৃতায় কংগ্রেসের নিন্দার করায় শ্রীযুক্ত তায়াবজী প্রকাশ্য সভায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। *

পার্শী সম্প্রদায়কে কংগ্রেসবিরোধী করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা যখন ভারতবাসী নহেন (!) তখন তাঁহাদের পক্ষে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া অকর্ত্তব্য। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ফিরোজশা মেটা ইহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার পর আর কিছু বলিবার অবকাশ নাই। পার্শীরা কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের নেতা নারোজী, মেটা, ওয়াচা প্রভৃতি কংগ্রেসের প্রাণ।

কংগ্রেসের স্থাপনাবধি ইহাকে বহু বিঘ্ন সহ্য করিতে হইয়াছে। কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতি মৃত মিষ্টার ইউল বলিয়াছিলেন, এরূপ অনুষ্ঠানের প্রথমে বিদ্রূপ, তৎপরে গালি সহ্য করিতে হয়। তাহার পর প্রার্থনা কতকাংশে পূর্ণ হয়; সর্ব্বশেষে ইহার প্রার্থনা পূর্ণ হয়, সঙ্গে সঙ্গে এত দিনেও সে সকল প্রার্থনা পূর্ণ হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশিত হয়। কংগ্রেসের বিরোধী দল কংগ্রেসকে হতাশ ব্যবহারাজীবের সম্মিলনক্ষেত্র বলিয়াছেন। কিন্তু দেখা যায়, যখনই হাইকোর্টের জজ নিয়োগের আবশ্যক হইয়াছে, তখনই কংগ্রেসের নেতৃগণের নির্ব্বাচন হইয়াছে। বোম্বাইয়ে তেলাং, তায়াবজী ও চন্দাবরকর, মান্দ্রাজে সুব্রহ্মণ্য আয়ার, পঞ্জাবে প্রতুলচন্দ্র, কলিকাতায় গুরুদাস, হাইকোর্টের এই সকল জজ কি পশারহীন ব্যবহারাজীব ছিলেন? রাণাডে সরকারী কর্ম্মচারী হইয়াও সর্ব্বদা পরামর্শ দান করিতেন; সামাজিক সমিতি উপলক্ষ করিয়া কংগ্রেসে আসিতেন। চন্দাবরকর একই সময়ে কংগ্রেসের সভাপতিত্বে ও হাইকোর্টের জজীয়তী পদে বৃত হয়েন। তিনি কংগ্রেসের সভাপতির আসন হইতে জজের আসনে উপবেশন করেন। সার রমেশচন্দ্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে যোগদান করেন। হাইকোর্টের দেশীয় জজদিগের মধ্যে বোধ হয় শ্রীযুক্ত আমীর আলী ব্যতীত আর সকলেই কংগ্রেস-সংসৃষ্ট। † উমেশচন্দ্র, মনোমোহন, অযোধ্যানাথ, বিশ্বম্ভরনাথ, আনন্দ চার্লু, বীর রাঘবচারী, ফিরোজোশা মেটা, খারে, নর্টন, কালীপ্রসন্ন—ইঁহারা যদি পশারহীন ব্যবহারাজীব হয়েন, তবে পশারশালী কে?

কখনও বা কংগ্রেস হতাশ কর্ম্মপ্রার্থীর মিলনক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়াছে।

---

* *Vide India*, August, 1894, p. 228

† ইনি স্বয়ং বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীকে বিদ্রূপ করিয়া nervous Babu নামে অভিহিত করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন।—লেখক।

আশা করি, রমেশচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথকে হতাশ কর্ম্মপ্রার্থী বলিবার দুঃসাহস অনৃতাশ্রয়ী বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যেও দুর্লভ। ইঁহারা রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াই কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন।

"বাবু কংগ্রেস" নাম লইয়া বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। এখনও যাঁহাকে বুঝাইতে হইবে যে, কংগ্রেস কেবল বাঙ্গালীর নহে, তাহার হয় বুঝিবার শক্তি নাই, নয় ত তিনি ইচ্ছা করিয়া বুঝিবেন না। যে সকল কারণে ইংরাজগণ বাঙ্গালীর উপর অসন্তুষ্ট, সে সকল কারণ সর্ব্বজনসুবিদিত। পাছে বাঙ্গালীদিগের প্রাধান্যে কংগ্রেস ইংরাজদিগের বিশেষ বিরাগভাজন হয়, এই আশঙ্কায় সার উইলিয়ম হণ্টার কংগ্রেস উপলক্ষে ভারতে আগমনোদ্যত মিষ্টার ডিগবীকে বলিয়াছিলেন, 'Don't let the Bangalees come too much to the front'! আমরা সে উপদেশে অবহেলা করি নাই। বঙ্গদেশের বাহিরে কোন অধিবেশনেই বাঙ্গালীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় নাই।

এ দেশে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যনির্ব্বাচনাধিকারপ্রাপ্তি হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই কংগ্রেস-সুহৃদ ; সুতরাং তাঁহারা যে দেশের নেতা, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যে সকল উদারহৃদয় ইংরাজ ভারতবাসীদিগের হিতচিন্তায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন, বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, রাজদ্রোহ-বিস্তারই তাঁহারা জীবনের কার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু হিউম, ওয়েডার-বরণ, জার্ডিন, নর্টন, গুডরিজ প্রভৃতির প্রতি কি সে কথা প্রযোজ্য?

অনেক সরকারী কর্ম্মচারী কংগ্রেস-বিরোধী ; কিন্তু বড়লাট লর্ড ল্যান্স-ডাউন ইহাকে "the more advanced liberal party", এবং সম্পূর্ণরূপে আইন-সঙ্গত বলিয়াছেন। * সার উইলিয়ম হণ্টার ইহাকে ভারতে প্রতীচ্য শিক্ষার স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়াছেন। তিনি বলেন, বিলাতের কোন রাজনৈতিক অনুষ্ঠানেও এমন বাক্যসংযম ও গাম্ভীর্য্য লক্ষিত হয় না। লর্ড ক্রোমার যথার্থই বলিয়াছেন, শিক্ষার বিস্তার, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাব, আইনচালিত শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন, রেলপথ ও তাড়িত বার্ত্তাবহের উন্নতি, য়ুরোপের সহিত সংস্রবের সুবিধা, য়ুরোপীয় ভাবের প্রভাব, এই সকলের প্রভাবে দেশে নূতন ভাব ও দেশীয়দিগের মনে নূতন আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হইয়া

* বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগকে কংগ্রেসে যোগ দিতে নিষেধ করার সম্বন্ধে মিষ্টার হিউমের

উঠিতেছে। সার চার্লস্ ডিল্ক বলেন, দেশে কংগ্রেসের আবির্ভাব প্রত্যাশিত ও অবশ্যম্ভাবী। † সার রিচার্ড গার্থের মত রক্ষণশীল রাজকর্ম্মচারীও কংগ্রেসের সমর্থন করিয়াছেন।

আমাদের দারিদ্র্য অতি কঠোর। আর কোন সভ্যদেশ এত দরিদ্র নহে। আমাদের দেশে প্রকৃতির স্বেচ্ছাদত্ত আশীর্ব্বাদ প্রচুর। সহজপ্রাপ্য উপাদান (Raw materials) ব্যবহারের দ্রব্যে পরিণত করিতে পারিলে প্রচুর লাভ হয়; তাহাতে দেশের ধন যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা তেমনই কমিয়া যায়। একান্ত সুখের বিষয়, কংগ্রেস বার্ষিক অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় দ্রব্যজাতের একটি প্রদর্শনী সংস্থাপিত করিতেছেন। কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতির অভাবে বা রাজকর্ম্মচারিগণের ভ্রুকুটীকুটিল মুখের ভয়ে যাঁহারা কংগ্রেসে যোগদানে বিরত, আশা করি, তাঁহারাও এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অগ্রসর হইবেন। ইহাতে কংগ্রেসের বললাভের সম্ভাবনা।

নবীন বলসঞ্চয়চেষ্টা কংগ্রেসের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কংগ্রেসের যে যথোপযুক্ত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে না, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নেতা-দিগের আর সে উৎসাহ নাই; আমরা ত্যাগস্বীকারে অসম্মত; সমাজ ঈর্ষ্যাদ্বেষে জর্জ্জরিত। সমবেত চেষ্টায় কার্য্য করিবার ক্ষমতা আমাদিগকে ত্যাগ করিতেছে। একদিন যে উৎসাহের ফলে প্রথম মান্দ্রাজ কংগ্রেসের কার্য্য-বিবরণের পরিশিষ্টে প্রদত্ত পুস্তিকা, Audi Alteram Partem, নর্টনের Oqen Letter, হিউমের Old Mans Hope ও The Star in the East, উডের Indians and Indian questions, ওয়েডারবরণের বক্তৃতা প্রভৃতি পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল, আজ সে উৎসাহ কোথায়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেস ত্যাগ করিতেছেন। পূর্ব্বে বঙ্গীয় জমীদার সম্প্রদায় যেরূপ সোৎসাহে কংগ্রেসে যোগ দিতেন, এখন আর তাঁহারা সেরূপ উৎসাহ দেখাইতেছেন না। এক্ষণে কয় জন জমীদার প্রকাশ্যরূপে কংগ্রেসে যোগ দেন? কলিকাতার প্রথম অধিবেশনে উত্তরপাড়ার 'জমীদারী মিণ্টে ঢালা আদোত মডেল' মৃত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, যখন আমার মত অন্ধ উনআশী বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধও কংগ্রেসের কার্য্যে যোগ দিতে আসিয়াছে, তখন ইহার সাধু উদ্দেশ্য যে সকল দিক হইতে খ্যাতনামা ব্যক্তি-দিগকে আকৃষ্ট করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? সেবার

† Problems of Greater Britain Vol II p. 144.

মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক জন বক্তা ছিলেন। এখন আর তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসে যোগ দিতে দেখি না। এখন রাজকর্ম্মচারীরা কংগ্রেসকে বিষনয়নে দেখিতেছেন। আমাদের কার্য্যনির্ব্বাহপ্রণালী তাঁহাদিগের যোগদানের পক্ষে অসম্ভব না করা কি একান্তই দুরূহ? তদ্ভিন্ন আমাদের কর্ণধার, অর্থবল, বা সমবেত চেষ্টার অভাব।

কংগ্রেস রক্ষা করিতে না পারিলে শত্রু হাসিবে; এবং সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এরূপ আর একটি অনুষ্ঠান করিবার আশা নিরাশার অতল তলে সমাহিত হইবে। আমাদের স্থায়ী ধনভাণ্ডার একান্ত আবশ্যক। মুষ্টিমেয় লোকের অনুষ্ঠান দেশের জনসাধারণের সহানুভূতির ভিত্তির উপর সংস্থাপিত না হইলে স্থায়ী হইতে পারে না। দেশের লোকের সহানুভূতির আকর্ষণ করিবার জন্য তাহাদিগকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও কার্য্য বুঝাইয়া দিতে হইবে। সে জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্যের প্রচার আবশ্যক। * আংলোইণ্ডিয়ান ও য়ুরেশিয়ান সম্প্রদায়ের Defence Assocition আছে। অভিজ্ঞতায় জানা গিয়াছে, আমাদের সেইরূপ একটি সমিতি আবশ্যক। সে কার্য্যের সূচনা কি কংগ্রেস হইতে হইলেই ভাল হয় না?

দেশের দারিদ্র্য ও ভূমিকর কংগ্রেসের একটি প্রধান আলোচনার বিষয়। সে বিষয়ে সাধারণের বুঝিবার সুবিধার জন্য গভর্মেণ্টের মন্তব্য ও অনুসৃত কার্য্য, প্রকাশিত প্রবন্ধাদি ও মতামত কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রচারিত হওয়া কর্ত্তব্য। মিষ্টার ডিগ্‌বির নূতন পুস্তক "Prosperous British India, শ্রীযুক্ত নারোজীর নূতন পুস্তক Poverty and Un-British Rule in India.—এ সকল পুস্তক কি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রকাশিত হওয়া উচিত নহে? বিচার ও শাসনবিভাগের পার্থক্যবিধান বিষয়ে এত দিনের ধারাবাহিক বিবরণ প্রকাশিত হইতে চলিল; কিন্তু সে জন্য আমরা সহৃদয় ইংরাজ লর্ড ষ্ট্যানলির নিকট কৃতজ্ঞ। ইতঃপূর্ব্বে এ বিষয়ে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ব্যয় স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয় বহন করিয়াছিলেন। এই অবসরে বলিতে ইচ্ছা হয়, আমাদের অনেক কার্য্য ইংরাজ নেতার অনুষ্ঠান। আমাদের কার্য্য আমরা করিতে পারি না, ইহা কি অল্প লজ্জার কথা?

---

* এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপকরণসংগ্রহার্থ আমি প্রায় ৪৫ খানি পুস্তিকাদি পাঠ করিয়াছি। ইহার অধিকাংশ পূর্ব্বে প্রচারিত। এখন এ সকলের অধিকাংশ (এমন কি কোন কোন অধিবেশনের কার্য্যবিবরণও) দুষ্প্রাপ্য। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।—লেখক।



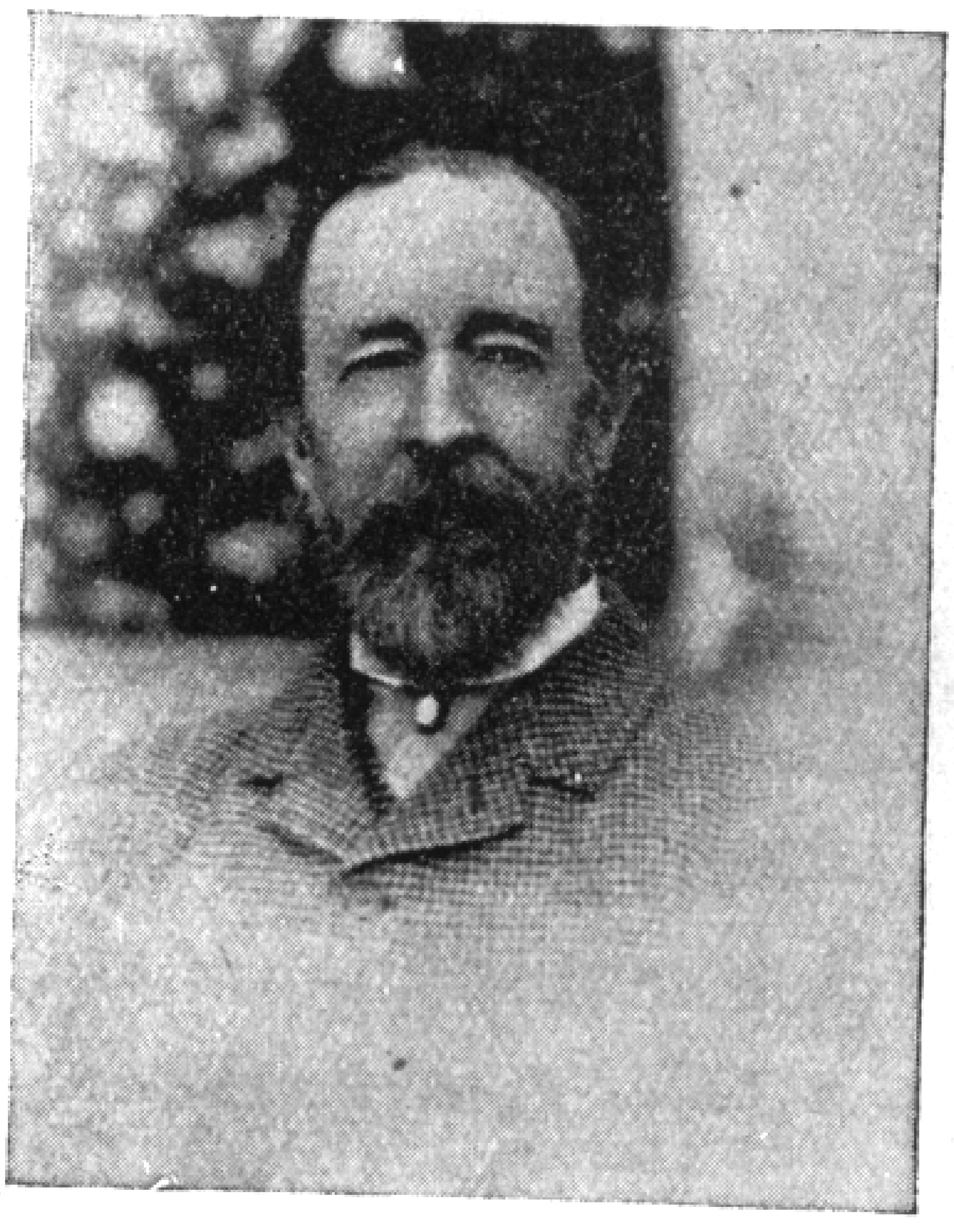
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত।



শ্রীযুক্ত চন্দা বরকর।



শ্রীযুক্ত দীনশা ইদলজী ওয়াচা।



মিষ্টার হিউম।

KUNTALINE PRESS.

আমাদের সভাপতি আছেন, সমিতি আছে, সম্পাদক আছে, কেরাণী বিদ্যমান, কোষাধ্যক্ষেরও অভাব নাই। কিন্তু সমিতির অধিবেশন হয় না; সম্পাদক দিনান্তে, সপ্তাহান্তে বা মাসান্তে আফিসে পদধূলি দেন; কেরাণী সম্পাদকের কার্য্যে বা নিজের কার্য্যে অন্যত্র থাকেন; কোষ শূন্য; অর্থসংগ্রহের কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, শিক্ষিত সম্প্রদায় কংগ্রেসের পক্ষপাতী; অনেকেই কংগ্রেসের জন্য সামান্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহেন। অথচ বৎসরে একাধিকবার শুনিতে পাই, অর্থাভাবে বৃটীশকমিটী (ইংলণ্ডে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভা) তুলিয়া দিতে হইতেছে। সেদিন সার্ উইলিয়ম ওয়েডারবরণ্ কোন সভাকে লিখিয়াছেন, we can't make bricks without straw—অর্থ না দিলে আমরা কি করিব? এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশীয় কোন পেটেণ্ট-ঔষধ-বিক্রেতার কথা মনে পড়িতেছে। তিনি বলিতেন, লক্ষ লোক প্রত্যেকে এক টাকা করিয়া দিলে আমি লক্ষপতি হইব, কিন্তু তাহারা কেহ দরিদ্র হইবে না! আমাদিগকেও এই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। উপযুক্ত বন্দোবস্ত থাকিলে অর্থসংগ্রহের জন্য বিশেষ কষ্ট বা ত্যাগস্বীকার করিতে হয় না।

নৈতিক পদস্খলনের জন্য নর্টনের সহিত দুর্ব্যবহার করিয়া আমার তাঁহার মত তেজস্বী সুহৃদকে হারাইয়াছি। কিন্তু যে দোষে তাঁহাকে হারাইয়াছি, কংগ্রেস-মণ্ডপে সেরূপ দোষ কি একবারে বিরল? * আমরা সামান্য চেষ্টায় ইউলের মত সুহৃদ পাইয়াছিলাম। বেসরকারী ইংরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্য চেষ্টায় তাঁহার মত লোক পাইতে পারি না কি? সে পক্ষে কি চেষ্টা করিয়াছি? য়ুরেশিয়ানগণ কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন। এবার আবার বুদ্ধির দোষে মুসলমান সম্প্রদায়কে হারাইতে বসিয়াছি। এ সময় সচেষ্ট হইয়া কংগ্রেসের উন্নতিকল্পে কার্য্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

* মান্দ্রাজ কংগ্রেসের পরও তিনি বঙ্গদেশে এক জনকে লিখিয়াছিলেন—My views as to Indian Politics remain unchanged. The longer I live in the country the more radical I become. The natives of India are entitled to political recognition quite apart from all matters purely personal between them and myself. I should be ashamed of myself if the action of... ... ... could influence my opinion upon the priciples of Indian administration. None the less, I should be glad to see more of your countrymen with a little additional backbone.

কংগ্রেস ভারতবর্ষে জাতীয় জীবনের সঞ্চার করিয়াছে। কংগ্রেস হইতে আমরা অনেক আশা করি। প্রথম যেবার কলিকাতায় কংগ্রেস হয়, সেবার অন্ধ কবিবর হেমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।—

"পূরব, বাঙ্গালা, আউধ, বিহার,
দূর কচ্ছ দেশ, হিমাদ্রির ধার,
তৈলঙ্গ মান্দ্রাজ, সহর বম্বাই,
সুরাটী গুজরাটী, মহারাঠী ভাই
মা ব'লে ভারতে ডাকিল!

* * *

"যে নীরদ উঠি 'রিপণ'-মিলনে
শুষ্ক তরুডালে সলিল-সিঞ্চনে
আশার অঙ্কুর তুলিল পরাণে
সে আশা আজি যে ফুটিল!
"জয় ভারতের, ভারতের জয়!
গাও সবে আজ প্রমত্তহৃদয়
ভারত জননী জাগিল!"

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

বিবিধ।

বিবাহ ও আয়ুষ্কাল।

সংস্কৃতে একটা চলিত প্রবাদবাক্য আছে যে, চিতা ও চিন্তা উভয়ের মধ্যে চিন্তাই গরীয়সী; কারণ, চিতা নির্জ্জীবকে দগ্ধ করে, চিন্তা সজীবকে দগ্ধ করে। ইহার প্রমাণেরও অভাব নাই। দুশ্চিন্তাদহনে একরাত্রির মধ্যে কারারুদ্ধা অনিন্দ্যসুন্দরী ফরাসী সাম্রাজ্ঞীর কেশদাম শ্বেত হইয়া গিয়াছিল; অকালবৃদ্ধের মধ্যে অনেকেই দুশ্চিন্তাপ্রপীড়িত। বিবাহিত জীবন দায়িত্বের জনক, দুশ্চিন্তার উর্ব্বর ক্ষেত্র। সুতরাং বিবাহিতের আয়ুষ্কাল স্বল্প হইবার কথা। এখন অর্থনীতি-শাস্ত্র আবার বলিতেছেন, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত দ্রুত চলিয়া উঠিতে

পারে না; সুতরাং কিছু কাল পরে জননী ধরণীর বক্ষের অমৃতরস শুষ্ক হইয়া যাইবে, ক্ষুধার্ত্ত সন্তানগণ তখন যতই আকর্ষণ করুক না কেন, তাহাদের শুষ্ক কণ্ঠতালু আর অমৃতরসসিক্ত হইবে না। এই বিভীষিকা এখন মাতৃবক্ষ হইতে স্নেহকে স্বস্থানচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছে। যে দেশে প্রচলিত উপকথায় শুনা যায়, মা ষষ্ঠী গৃহে স্থানাভাববশতঃ সন্তানদানে বিমুখ হইলে রমণী সমার্জ্জনীর অবিকৃত স্থান দেখাইয়া সন্তানলাভের জন্য সানুনয় প্রার্থনা করেন,—সে দেশেও এখন রমণীবক্ষ হইতে সন্তানলাভলালসা তিরোহিত হইতে বসিয়াছে। হিন্দুর পক্ষে সন্তানলাভ না করা "অসহ্য পীড়া"। প্রাচীন ইহুদী জাতির মধ্যেও "maiden blaew" বা "sterile curse" রমণীর পক্ষে লজ্জার কথা ছিল। এখন সে কথা পরিবর্ত্তিত। বরং বিপরীতমুখগামী স্রোত সমাজে অনিষ্ট উৎপাদিত করিয়াছে ও করিতেছে। এখন লোকে দায়িত্বদায়মুক্ত হইবার আশায়, দুশ্চিন্তামুক্তিপ্রয়াসে বিবাহবন্ধনবদ্ধ হইতে চাহিতেছে না। সাধারণ লোকের সাধারণ বিচার এই পর্য্যন্ত। এবার পাঠককে পণ্ডিতের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

ডাক্তার প্রিন্‌জিং স্বয়ং চিকিৎসাব্যবসায়ী। তিনি বলেন, বিবাহে আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত হয়। বিবাহিত পুরুষদিগের সহিত তুলনায় অবিবাহিত পুরুষদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার অত্যধিক। জীবন-বিমা আফিসে সন্ধান লইয়া জানা গিয়াছে, রোমানক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে ইভাঞ্জেলিকাল ধর্ম্ম-যাজকদিগের মৃত্যুর হার অপেক্ষা অধিক। এমন কথা অবশ্য কেহ বলিবেন না যে, বিধাতা পুরুষ রোমানক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকের সূতিকাগারে তাঁহার ললাটলিখন লিখিবার সময় পক্ষপাতপরবশ হইয়া তাঁহাকে স্বল্পায়ু করেন। অথচ দেখা যায়, ইভাঞ্জেলিক্যাল ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে সম্ভাবিত মৃত্যুর শতকরা পঁচাশিটি সফল হয়, আর রোমানক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে সে হার শতকরা এক শতের উপর দ্বাদশ। অথচ রোমানক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ; সুতরাং তাঁহাদের চিন্তা অল্প; আর ইভাঞ্জেলিক্যাল ধর্ম্মযাজকগণ সর্ব্বদাই বৃহৎ পরিবারের প্রতিপালন-চিন্তায় কাতর। ডাক্তারের মতে অবিবাহিত জীবন এই মৃত্যুর হারের জন্য অনেকটা দায়ী।

বিপত্নীক ও বিধবাদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার যত অধিক, সপত্নীক ও সধবাদিগের মধ্যে তত নহে। কুমারীদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার বিবাহিতাদিগের মধ্যে মৃত্যুর হারের অপেক্ষা অধিক নহে। বিপত্নীকদিগের মৃত্যুর কারণ—শুশ্রূষার অভাব। যে পত্নীর সযত্ন শুশ্রূষায় অভ্যস্ত, তাহার পক্ষে তাহার অভাব একান্ত কষ্টকর, দুঃসহ। স্মরণ, হইতেছে, বৃদ্ধ মন্ত্রী বিসমার্কের পত্নীর মৃত্যুসংবাদ-দানকালে কোন ইংরাজ পত্রে লেখক লিখিয়াছিলেন, বার্দ্ধক্যে পত্নীবিয়োগে সম্ভবতঃ বৃদ্ধের জীবন-দীপ শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইবে; কারণ, পতির সুবিধা অসুবিধা পত্নীর মত করিয়া কেহই লক্ষ্য করে না; পতির সামান্যমাত্র অসুবিধা দূর করিবার জন্য আর কেহই তেমন ব্যগ্র হয় না। বৃদ্ধের পক্ষে পত্নীর শুশ্রূষাই জীবনসংরক্ষক। আত্মহত্যা, মানসিক বিকার প্রভৃতি পরিবারিক জীবনের প্রভাবে নিবারিত হয়। যে গৃহে রমণীর শৃঙ্খলনিপুণ স্পর্শ নাই, সে গৃহ অনিন্দ্যসুন্দরী অন্ধ যুবতীর সহিত উপমেয়। রমণী লক্ষ্মীস্বরূপিণী। ভবভূতির সেই বাক্য স্মরণ করুন,—"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ"।—

"প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের সাগর,
করুণা-নিঝর, দয়ার নদী;

হ'ত মরুময় সব চরাচর
না থাকিতে তুমি জগতে যদি।"

সন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, অবিবাহিতদিগের মধ্যে আত্মহত্যার হার যত অধিক, বিবাহিতদিগের মধ্যে তত অধিক নহে। ডুরখিম আত্মহত্যা-বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন। তিনি বলেন, পুরুষদিগের মধ্যে অবিবাহিতদিগের আত্মহত্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; তাহার পর বিপত্নীক দল; সপত্নীকদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার অত্যল্প। মহিলাদিগের মধ্যে বিবাহিতাদিগের আত্মহত্যা সচরাচর ঘটে না; আবার অবিবাহিতাদিগের মধ্যে আত্মহত্যার হার বিধবাদিগের আত্মহত্যার হারের অপেক্ষা অল্প। অবিবাহিত, বিপত্নীক ও বিধবাদিগের মধ্যে আত্মহত্যা অধিক। অবিবাহিতদিগের মধ্যেই মানসিক বিকারের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই স্থানে একটি কথা বলা কর্ত্তব্য;—লেখক যে সমাজের কথা বলিয়াছেন, সে সমাজে বিবাহসংস্কার সকলের পক্ষে অনিবার্য্য নহে; সে সমাজে মানসিকবিকারগ্রস্তগণ প্রায়ই বিবাহ করিতে পায় না। জিয়র্জ্জ ভন মার ও কোল্‌ম্যান উভয়েই বলেন যে, সুস্থকায়গণ বিবাহবন্ধনবদ্ধ হয়, অসুস্থ, বিকলাঙ্গ বা মানসিক-বিকারগ্রস্তগণ বিবাহ করে না; সেই কারণে অবিবাহিতগণের মধ্যে মৃত্যুর হার অধিক হওয়া অসম্ভব নহে; অর্থাৎ, বিবাহিত জীবনের প্রভাবের, সংযমের ও শুশ্রূষার অভাবই যে আয়ুষ্কালসংক্ষেপের একমাত্র কারণ, এমন কথা বলা চলে না। এ কথার উত্তরে ডাক্তার প্রেন্‌জিং বলেন, বুঝা গেল, অসুস্থকায় অনেকে বিবাহবিরত থাকে, সুতরাং অবিবাহিতদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার অধিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু বিপত্নীক ও বিধবাদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার সপত্নীক ও সধবাদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার অপেক্ষা অধিক; সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিবাহিত জীবনে স্বাস্থ্যসুখসম্ভোগসম্ভাবনা অধিক; বিবাহিত জীবন আয়ুষ্কালবৃদ্ধির সহায়।

ডাক্তারের সিদ্ধান্ত এই যে, যাহারা সর্ব্বোপকারক্ষম গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করে, তাহারা বহুবিধ বিপদ হইতে মুক্ত। বিবাহিত গৃহস্থের পক্ষে জীবন মূল্যহীন—অথবা সামান্য কারণে ত্যজ্য নহে। বিবাহিত ব্যক্তির প্রথম চিন্তা—আমি মরিলে আমার উপর যাহারা নির্ভর করিতেছে, তাহাদের উপায় কি হইবে? কে তাহাদের আহার দিবে? সুতরাং সে ব্যক্তি সহস্র কষ্ট সহ্য করিয়াও মৃত্যু প্রার্থনা করে না; আবার বিবাহিত জীবনে সংযম অনিবার্য্য; যে পরিবারে বাস করে, তাহাকে অনেক বিষয়েই নিয়মপালন করিয়া চলিতে হয়; অবিবাহিতের জীবনে তাহা নাই। অধিকন্তু অবিবাহিতগণ অনেক সময় বহুবিধ অত্যাচারে শরীরকে পীড়িত করিয়া থাকেন। সুতরাং বিবাহ আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত করে।

য়ুরোপের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, অস্মদ্দেশেও সে সকল কথা অনেক স্থলে প্রয়োজ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

অমরনাথে অ্যানি বেসাণ্ট্।

গত অগষ্ট মাসে মনস্বিনী অ্যানি বেসাণ্ট্ অমরনাথ তীর্থ পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। এই তীর্থযাত্রার যে সরস বিবরণ তিনি "The Central Hindu College Magazine"এ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা আমরা "সাহিত্যের" পাঠকগণের বিনোদনার্থ ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম।

অমরনাথ একটি প্রসিদ্ধ গুহা। উহা হিমাদ্রির মধ্যস্থলে কাশ্মীর রাজ্যের ভিতর অবস্থিত। যতদিন কাশ্মীরের ইতিহাস প্রচারিত আছে, অমরনাথও ততদিন তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। এই তীর্থে যাইতে হইলে যথেষ্ট শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করা চাই। শরীরকে কি প্রকারে সহনক্ষম ও ইচ্ছাশক্তির বশীভূত করিতে হয়, সে শিক্ষা অমরনাথতীর্থযাত্রী যথেষ্টপরিমাণে লাভ করেন। যাত্রীকে এই শিক্ষাদানই যেন তীর্থভূমির একতম উদ্দেশ্য। যাত্রীরা তথায় নগ্নপদে যাইয়া থাকেন; এবং তাঁহারা এমন দুরারোহ পথ মনোনীত করেন যে, বিশেষ শারীর ক্লেশ, ধৈর্য্য ও সাহস ভিন্ন সে পথে চলা অসম্ভব।

অমরনাথে যাইবার দুইটি পথ আছে। একটি ভৈরবাল নামক তুঙ্গ অচলশিখরের উপর দিয়া; অপরটি গভীর গিরিসঙ্কটপ্রবাহিত নগনদীর উপরিস্থ তুষার-সেতুর উপর দিয়া। এই গিরিসঙ্কটের শিরোদেশেই অমরনাথ গুহা সংস্থিত। তীর্থপুণ্যাভিলাষীরা গমনকালে প্রথমোক্ত পথ ও প্রত্যাগমনসময়ে এই তুষার-সেতু অবলম্বন করিয়া থাকেন।

বিমল শুভ্র তুষারে গঠিত শিবলিঙ্গের জন্য অমরনাথের প্রসিদ্ধি। উপর হইতে পতিত নীহার-বিন্দুরাশি শুক্লপক্ষের কয় দিনে তুষার-কঠিন লিঙ্গে পরিণত হয়; আর কৃষ্ণপক্ষে ক্রমশঃ বিগলিত হইয়া শিবলিঙ্গটি অমাবস্যায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ পর্য্যায়ক্রম গঠন ও নাশে অমরনাথ-লিঙ্গ চিরন্তন বিস্ময়ের বিষয়ীভূত হইয়া আছে। অদ্যাবধি প্রতি বৎসর শ্রাবণী পূর্ণিমায়, অসংখ্য যাত্রী দলে দলে এই গুহায় মিলিত হয়, এবং জীবন-মৃত্যুর অধিরাজ মহাদেবের সমুজ্জ্বল স্বচ্ছ মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হইয়া থাকে। ধর্ম্মাত্মগণের প্রার্থনায় গুহাটি পবিত্র; স্বয়ং মহেশ্বরের ভীমকান্ত প্রভাব স্ফুরদ্দাম বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত লোমহর্ষণ উৎপাদন করিতেছে; আর সেই সুনির্ম্মল বিগ্রহের শ্বেত-নীল আলোকজ্যোতিঃ কি অপূর্ব্ব!

এ বৎসর শ্রাবণী পূর্ণিমা দু'বার ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় পূর্ণিমা তিথিতেই বহুতর যাত্রী অমরনাথে গিয়াছিলেন। আমরা তত দিন কাশ্মীরে থাকিব না বলিয়া, প্রথম পূর্ণিমাতেই অমরনাথে যাওয়া স্থির করিলাম। এবং তদনুসারে যথাসময়ে যাত্রা করিলাম।

প্রকৃতপক্ষে পৈলগাঁ হইতে তীর্থযাত্রার ক্লেশ আরব্ধ হয়। সাধারণ ঘোটক তাহার ও দিকে আর যাইতে পারে না। কিন্তু, পার্ব্বত্য অশ্ব পঞ্চতরণী অবধি যাইতে পারে। পঞ্চতরণী ভৈরবালের পূর্ব্বে সর্ব্বশেষ বিশ্রামের স্থান। কিন্তু তীর্থপুণ্যাশীরা পৈলগাঁ হইতে অমরনাথ পর্য্যন্ত ২০ ক্রোশ

আমরা পৈলগাঁর চারি ক্রোশ দূর হইতে পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিলাম। কারণ, বিষম বৃষ্টিপাত হইতেছিল, পথ অশ্বারোহণে গমনের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। পথে গণেশবাল দেখিয়া যাই। গণেশবাল লইদর নামক স্রোতস্বিনীর মধ্যস্থ একটি প্রকাণ্ড প্রস্তর,—কতকটা করি-মুখাকৃতি। কথিত আছে, কোন মুসলমান আক্রমণকারী অমরনাথ ধ্বংস করিবার মানসে অগ্রসর হইতেছিল; এই স্থানে গণেশজী আবির্ভূত হইয়া তাহার গতিরোধ করিয়াছিলেন। আমরা গণেশবালে পূজাসমাপন করিয়া, পুনশ্চ পৈলগাঁর পথ ধরিলাম; এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, উৎক্ষেপচঞ্চল লইদরের তটে আমাদের বিশ্রাম-শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে। খাদ্যাদি দ্রব্যের বাহক, পরিচারক ও মালিক (পথপ্রদর্শক) ব্যতীত আমরা ১২ জন যাত্রী ছিলাম।

মালিকেরা অদ্ভুত লোক। তাহারা বংশানুক্রমে কেবল পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। মুসলমান হইয়াও তাহারা অমরনাথ গুহার অলৌকিক পবিত্রতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান, এবং তাহারা সম্ভ্রমরক্ষায় সতত সযত্ন। প্রধান মালিকটি বড় মজার লোক। সে একাধিকবার গুহাভ্যন্তরে বসিয়া বিনিদ্রনয়নে রাত্রিযাপন করিয়াছে, এবং তাহার ভাগ্যে অপার্থিব অতিথিগণের দর্শনলাভও ঘটিয়াছে। অত্যধিক তুষারপাত নিবন্ধন আমরা ভৈরবাল অতিক্রম করিতে পারিব না বলিয়া, সে আমাদিগকে হতাশ করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু আমরা সময়ের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

২৭ শে অগষ্ট্ তারিখে আমরা পৈলগাঁ পরিত্যাগ করি, এবং পাঁচ ক্রোশ পথ চলিয়া সেই দিনই নগাধিরাজের শৃঙ্গমালায় সংবেষ্টিত চন্দনবাড়ী নামক মনোরম স্থানে তাঁবু ফেলিয়া রাত্রিযাপন করি-লাম। স্থানটির নৈসর্গিক দৃশ্য কি সমুদার! দেবদারুমণ্ডিত ক্রমনিম্ন সানুভাগ, সরলোন্নত শৈলশৃঙ্গ, বেগপ্রমত্ত নির্ঝরিণীচয় ও দ্রুতগামিনী গর্জ্জনভীষণা নগনদীগুলি অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এ দিকে বিবিধবর্ণে বিচিত্রোজ্জ্বল সংখ্যাতীত পুষ্পবিতান; আবার কোথাও মরকতহরিত বিস্তীর্ণ তৃণবীথি জ্যোতির্ম্ময় তুষার-শৃঙ্গের পদতল চুম্বন করিয়া পড়িয়া আছে; তার পর চিরস্থায়ী অনন্ত শ্বেতসুষমা!—আর কোনও বর্ণ নাই, বৈচিত্র্য নাই।

পর দিন আমরা তিন ক্রোশ মাত্র পথ চলিলাম—অত্যন্ত ঢালু দুরারোহ পথ। যতই উচ্চতর স্থানে উঠিতে লাগিলাম, বাতাস ততই বিরল হইতে লাগিল; এবং সেই জন্য আমাদের দলের কয়েক জনকে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে হইয়াছিল। আমরা দম লইবার জন্য বার বার থামিতে-ছিলাম, কিন্তু চলা আরম্ভ করিবামাত্র হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিলাম।

২৯শে সাত ক্রোশ অগ্রসর হই। পথিমধ্যে শেষনাগ নামক দুরধিগম্য শিখরবেষ্টিত হ্রদ দেখিয়া যাই। লইদর নদীর উৎপত্তি এই হ্রদ হইতে। ইহা নির্ঝর ও চতুপার্শ্বস্থ তুষাররাশির গলিত নীরে পরিপুষ্ট; ইহার জল কৃষ্ণবর্ণ। যাত্রীরা এই হ্রদে যথাবিধি স্নান করিয়া থাকেন; জল এত শীতল যে স্পর্শ করা যায় না; কিন্তু স্নানাবসানে তাঁহাদের পরমাত্মচিন্তা কি মধুর শান্তি-জ্ঞাপক! যাত্রী দলের এক জনও কি সর্পরাজের সন্দর্শনলাভ করে নাই? যাঁর নামে হ্রদটির নামকরণ?

সে রাত্রে বিশ্রামের জন্য আমরা পঞ্চতরণীর দুই ক্রোশ পশ্চাতে কেলনরে অবস্থিতি করিলাম। আমাদের সঙ্কল্প ছিল, পূর্ণিমার ঠিক এক দিন পূর্ব্বে সর্ব্বশেষ বিশ্রামস্থানে উপস্থিত হইব।

যে সকল তুষারস্তূপ আমাদের অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভয়ঙ্কর ঢালু; এবং যে নদীটী আমরা হাঁটিয়া পার হইয়াছিলাম, তাহার স্রোতোবেগ এমন প্রবল যে, আমরা

পার হইবার সময় ছয় জন হাত ধরাধরি করিয়া কোন মতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম ; নতুবা আমাদিগকে স্রোতোমুখে ভাসিয়া যাইতে হইত।

৩০ শে প্রভাতে আমরা পঞ্চতরণীতে পঁহুছিলাম। সেখানে যে নদীতে স্নান করিয়াছি, তাহার জল শুধু তুষারশীতল নহে, এমন প্রখরবেগসম্পন্ন যে, নদীগর্ভে দণ্ডায়মান থাকা দুরূহ। তথায় সমরেশ্বর শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলাম। তাহার উপর হইতে ঘণ্টা বাজাইয়া জানান দিলাম, এক দল যাত্রী পরদিন প্রাতে গুহাদর্শনার্থ ভৈরবাল অতিক্রম করিবে।

রাত্রি দুই ঘটিকার সময় গাত্রোত্থান করিয়া, আমরা সাড়ে তিনটার পূর্ব্বেই ভৈরবাল আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রখর শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, সেই দীর্ঘোন্নত পথে আরোহণ করিতে লাগিলাম। প্রভাতে সাড়ে ছয়টার সময় যখন আমরা পর্ব্বতের শিরোভাগে উপনীত হইলাম, তখন "স্বামী অমরনাথ কি জয়" ! শব্দে সে প্রদেশ বিকম্পিত হইতেছিল। আর অদূরে—অথচ বহু নিম্নে দেখিতে পাইলাম, অমরনাথের গুহামুখ। উপাসনা ও ধ্যানার্থ তথায় অল্প ক্ষণ বসিয়াছিলাম। পাহাড়টি যেন রক্ষকবেশে স্বয়ং ভৈরব। আরও দুই তিন দল যাত্রী আমাদের সঙ্গে স্তোত্রপাঠ করিতেছিলেন।

কিন্তু সেই পর্ব্বতশীর্ষ হইতে গুহাভিমুখে অবরোহণের সময়, আমাদের ভয়ঙ্কর কষ্ট হইয়াছিল। হিমানীসংলিপ্ত পথ মসৃণ কাচের মত পিচ্ছিল—পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। যদিও মালিকেরা বুঝিয়াছিল, আমরা যথেষ্ট সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু, তথাপি তাহারা তুষারপথে ধাপ কাটিয়া দিতে চাহিল। মধ্যে গর্ভযোনি নামক প্রস্তরস্তূপ মানদণ্ডের মত দণ্ডায়মান ; তাহার মধ্যভাগে একটি অল্পপরিসর 'ফাট'। যাত্রীকে সেই ফাটের ভিতর দিয়া যাইতে হয়,—তাহাতে দেহখানি প্রায় পিষ্ট হইয়া যায়।

অনবরত অবরোহণ করিতে করিতে যাত্রারম্ভের ছয় ঘণ্টার পর আমরা গুহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তথায় দরীসন্নিহিত একটি ছোট নির্ঝরের তুহিনসম শীতল নীরে স্নান করিতে হইল। তাহার পরেই সকল ক্লেশের পুরস্কার। অন্ধকার গুহাভ্যন্তরে যাইয়া দেখিলাম, একখানি প্রকাণ্ড হিমানীবেদীর উপর ত্রিকোণাকৃতি সমুজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি—এক প্রকার চঞ্চল আলোকপ্রভায় মনোহর। সেই আলো—সেই মূর্ত্তির চতুষ্পার্শ্বস্থ দুর্জ্জেয় কিরণ পার্থিব না স্বর্গীয়? কে জানে? সকলে ক্ষণেকের জন্য নিস্তব্ধ ছিল ; তাহার পর পুরোহিতকণ্ঠে অমরনাথের স্তবগান ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল ; আবার সমস্ত নিস্তব্ধ—শুধু নীরব ধ্যান—সেই দিব্য প্রভাবে, আর যুগ যুগান্তরের কাহিনীর চিন্তায় সকলে আত্মবিস্মৃত।

হঠাৎ যাত্রী দলের প্রায় সকলের চক্ষু উন্মীলিত হইল—সম্মুখে আশ্চর্য্য দৃশ্য ; এ সৌন্দর্য্য ত মৃত্যুকাতর ধরণীর নয়! কিন্তু দেবপীঠস্থলে আশ্চর্য্য কি আছে? কোথা হইতে কতকগুলি পারাবত মহেশ্বরের আশীরুত্তোলিত শুভ হস্তের ন্যায় অমল শুভ্র পক্ষ বিস্তার করিয়া, যাত্রিগণের মাথার উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া, গুপ্ত কুলায়ে ফিরিয়া গেল। পরক্ষণে শুধু দিব্য শান্তি।

পৈলগাঁ হইতে নগ্নপদে ছিলাম—সেখানে শ্রান্ত বিক্ষত পদতল তৃণ-পাদুকায় আবৃত করিলাম। তাহার পর, তুষারসেতুর সাহায্যে পুষ্পবিতানবিচিত্র সঙ্গমে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম, অশ্বাদি প্রস্তুত ;—তাহারা ক্লান্ত যাত্রী দলকে পঞ্চতরণীর শিবিরে ফিরাইয়া আনিল।

আবহবিদ্যা (৩)

অতি প্রাচীন কাল হইতে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষ বৃষ্টির চিন্তায় চিন্তাকুল। অন্নচিন্তা হইতেই বৃষ্টির চিন্তা। বৃষ্টির অভাবে অন্নাভাব। অন্নাভবে জঠরানল-প্রদীপ্তি, এবং তাহা হইতেই ব্যাকুল প্রার্থনা। এইরূপে নানা ছন্দোবন্ধে পর্জ্জন্যদেবের নিকট প্রার্থনার সৃষ্টি। এতৎপ্রসঙ্গে গীতার—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং॥ ৩।১৪, ১৫।

এই শ্লোকদ্বয় বোধ হয় অনেকেরই স্মরণপথে আসিবে। অক্ষর হইতে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন ও অন্ন হইতে জীব। ইহার গূঢ়ার্থ হয় ত অন্য কিছু থাকিতে পারে। কিন্তু আমার বোধ হয়, ইহাতে জ্ঞান (প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক) বিজ্ঞান, দর্শন ও অল্পবিস্তর কবিত্ব, এই সকলের মিশ্রণ আছে। অধুনাতন বৈজ্ঞানিকশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের নিকট ইহা এত স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। অন্ততঃ ইহা বলিতেই হইবে যে, উত্তাপ-বিশেষের প্রয়োগে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনকে যেমন দেশকালপাত্রনির্ব্বিশেষে জলে পরিণত হইতে দেখা যায়, যজ্ঞবিশেষ দ্বারা সেইরূপ সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র বৃষ্টির উৎপত্তি এ পর্য্যন্ত কেহই প্রমাণিত করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশে যেমন স্তব স্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া বৃষ্টিলাভের চেষ্টা চলিত আছে, পাশ্চাত্য-দেশে সেইরূপ কামান বিশেষের ভীষণ গর্জ্জন দ্বারা ভীত করিয়া দেবরাজের নিকট হইতে বৃষ্টিসংগ্রহের চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফল সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, প্রাচীন ভারতের মুনিরা যখন দেখিলেন, স্তব স্তুতি দ্বারা দেবরাজের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না—বাষ্পোদ্গিরণকারী যজ্ঞবিশেষ সকল সময় শস্যক্ষেত্র সিক্ত করিতে সক্ষম নহে, তখন হয় ত নৈসর্গিক নিয়মাবিষ্কারে মনোনিবেশ করেন। যদিও ইচ্ছামত বৃষ্টির উৎপাদন করা গেল না, তথাপি কখন কত ইঞ্চ বৃষ্টি হইবে, এবং হইবে কি না, কয়েক মাস পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারিলেও কৃষকের অনেক মঙ্গল হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা ভবিষ্যৎ বৃষ্টিজ্ঞানের উপায় আবিষ্কার

করিয়াছিলেন, এবং তাহাই প্রাচীন জ্যোতির্বিৎ ও বৈজ্ঞানিক বরাহমিহির সংক্ষেপে স্বরচিত গ্রন্থ বৃহৎসংহিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বৃহৎসংহিতার গর্ভলক্ষণ-শীর্ষক একবিংশ ও তৎপরবর্ত্তী কয়েকটি অধ্যায়ের বিস্তৃত বিবরণ দিবার পূর্ব্বে, যাঁহারা উক্ত গ্রন্থ দেখেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে বৃহৎসংহিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আবশ্যক হইতে পারে। আমার নিকট যে সংস্করণ আছে, তাহাতে অধ্যায়-সংখ্যা ১০৮টি। ইহাতে জ্যোতিষ, কৃষি-বিজ্ঞান, শকুনবিদ্যা, বাণিজ্য-বিষয়িণী নানা কথা, গৃহস্থের নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক তত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা, ঝড় বৃষ্টির লক্ষণ ইত্যাদি অনেক কথা আছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি অতি-বৈজ্ঞানিক, কতকগুলি বৈজ্ঞানিক, কতকগুলি বালকোচিত তত্ত্বনির্ণয়প্রয়াস, কতকগুলি পক্ককেশজনোচিত উপদেশ, কতকগুলি প্রয়োজনীয়, কতকগুলি হাস্যোদ্দীপক ও কতকগুলি বিষয়বিলাসীর বিলাসবর্দ্ধনকারী। যে সকল কথা পরীক্ষা করিবার যো নাই, সুতরাং সত্যাসত্য-নির্ণয়ের সুবিধার অভাব, সেইগুলিই অতিবৈজ্ঞানিক-পদবাচ্য। রেবতী নক্ষত্রের উপর শনি বসিলে ক্রৌঞ্চদ্বীপবাসী রাজাশ্রিত পুরুষদিগের, শরৎ ঋতুর শস্যের, শবর ও যবনদিগের পীড়া হয়। ক্ষেমবৃক্ষের ডালে দাঁতন করিলে সুন্দরী ভার্য্যা লাভ হয়। আবার দাঁতন হইলে পর ধুইয়া ফেলিয়া দিবার সময় যদি সেই দাঁতন প্রথমে খাড়া হইয়া পরে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে সেদিন মিষ্টভোজনলাভ ঘটিয়া থাকে। যদি গৃহের উপর কাক বসিয়া পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে মুখ করিয়া ডাকে, তাহা হইলে সেই গৃহস্থের যথাক্রমে রাজভয়, তস্করভয় বন্ধনভয় ও কলহভয় হয়। ধানের গুঁড়া, মাষকলাই, তিলের গুঁড়া আর ছাতু পচা মাংসের সহিত অল্প জলের দ্বারা মিলাইলে যে একটা মিশ্র পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাতে তেঁতুলের বীজ ভিজাইয়া পরে হলুদের ধূমে কয়েক দিন রাখিয়া রোপণ করিলে সেই বীজ হইতে তেঁতুলের বৃক্ষ উৎপন্ন না হইয়া তেঁতুলের লতা হইবে!—এইরূপ নানাবিধ বিষয় আছে।

মূল শ্লোকগুলিতে অতিসংক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু বলা হইয়াছে। অনেক সময় টীকাকারদিগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ভিন্ন শ্লোকগুলি কোন কাজেই লাগিত না। আমার নিকট উৎপল ভট্টের টীকার অনুবাদ আছে। সেই টীকায় কোন কোন শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। "গর্ভলক্ষণ" আদি অধ্যায়ে বরাহমিহির যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও নিজের নহে। দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন,—

তল্লক্ষণানি মুনিভির্যানি নিবদ্ধানি তানি দৃষ্টবেদম্।
ক্রিয়তে গর্গ-পরাশর-কাশ্যপ-বৎসাদি-রচিতানি ॥

অর্থাৎ, মেঘের গর্ভলক্ষণ সম্বন্ধে মুনি সকল (বশিষ্ঠাদি) যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ও গর্গ পরাশর কাশ্যপাদির রচিত গ্রন্থাদি দেখিয়া, আমি সেই সেই লক্ষণ লিখিতেছি। দুঃখের বিষয়, এই সকল ঋষিপ্রণীত মূল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই সকল গ্রন্থে না জানি কত আবশ্যক বিষয়ই সন্নিবিষ্ট ছিল। শুনিয়াছিলাম, কৃষি-পরাশর নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ কলিকাতায় প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু আমি এ যাবৎ তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।*

বৃহৎ-সংহিতার একবিংশ হইতে অষ্টাবিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বৃষ্টিসম্বন্ধীয় তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। (২১) গর্ভলক্ষণ, (২২) গর্ভধারণ, (২৩) প্রবর্ষণ, (২৪) রোহিণী-যোগ, (২৫) স্বাতীযোগ, (২৬) আষাঢ়ীযোগ, (২৭) বাতচক্র, (২৮) সদ্যোবৃষ্টি-লক্ষণ। ইহার মধ্যে একবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ই সমধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। ডিসেম্বরের এক দিন মেঘাদি পঞ্চ লক্ষণের অবস্থা বিশেষ পর্য্য-বেক্ষণ করিলে জুন মাসের এক দিনের বৃষ্টির অবস্থা জানিতে পারা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীন আবহবিদ্যামতে ২১ শে জুন তারিখে জল হইবে কি না জানিতে হইলে, তাহার ১৯৫ (চান্দ্রমান) দিন পূর্ব্বের অর্থাৎ ১২ ই ডিসেম্বরের আকাশের অবস্থা জানিলেই হইল। ১২ই ডিসেম্বর যদি কোন স্থানের শীর্ষদেশে মেঘ দেখা যায়, আর সেই মেঘ যদি কতকগুলি লক্ষণ-সমন্বিত হয়, তাহা হইলে সেই মেঘগুলির গর্ভ হইল বলা যায়; আর প্রায় ৭ চান্দ্র মাস গর্ভস্থ থাকিয়া ২১ শে জুন তারিখে বৃষ্টিরূপ সন্তান প্রসব করে। এইরূপ কয়েক মাস মেঘের গর্ভলক্ষণাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে ভাবী বর্ষাকালের বৃষ্টিবিবরণ সম্যক পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। তৃতীয় শ্লোকে আছে,—

দৈববিদবহিতচিত্তো হ্যনিশং যো গর্ভলক্ষণে ভবতি।
তস্য মুনেরিব বাণী ন ভবতি মিথ্যাম্বুনির্দ্দেশে ॥

---

*আমার নিকট একখানি পরাশর-প্রণীত 'কৃষি-সংগ্রহঃ' নামক বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক আছে। ইংরাজী ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মা (সম্ভবতঃ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়) এই কৃষি-সংগ্রহ মুদ্রিত করেন। গ্রন্থখানি ডিমাই আট পেজী ৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পরাশর-প্রণীত কৃষি-সংগ্রহের একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিও আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।—সাহিত্য-সম্পাদক।

অর্থাৎ, যে দৈবজ্ঞ দিবারাত্র মনোযোগের সহিত গর্ভলক্ষণ দেখেন, বৃষ্টির ভবিষ্যৎবাণী করিলে তাঁহার বাক্য মুনিদিগের বাণীর ন্যায় কখনও মিথ্যা হইবে না।

বৃষ্টিসম্বন্ধীয় ভবিষ্যৎবাণী করিতে হইলে বিশেষ মনোযোগের সহিত গর্ভলক্ষণের পর্য্যবেক্ষণ অপরিহার্য্য। কোন্ দিন হইতে দেখিতে আরম্ভ করা উচিত, তৎসম্বন্ধে অল্পবিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। দীপান্বিতার পরের দিন হইতে আরম্ভ করিলেই চলিতে পারে। ভারতের কোন কোন স্থানে ঐ দিন হইতে নূতন বৎসরও গণিত হইয়া থাকে।

গর্ভের পঞ্চ লক্ষণ, যথা,—"পবন-সলিল-বিদ্যুদ্‌গর্জ্জিতাভ্রান্বিতো"—পবন, জল, বিদ্যুৎ, গর্জ্জন ও মেঘ। জল বা বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন মেঘোদয় ব্যতিরেকে অসম্ভব। যদিও পবনের সহিত মেঘের এরূপ নিত্যসম্বন্ধ দেখা যায় না,—তথাপি গর্ভলক্ষণের সহিত মেঘাস্তিত্বের অভিন্নভাবতা রহিয়াছে। গর্ভ হইতে হইলে মেঘ থাকাই চাই। আবার মেঘ থাকিলেই যে গর্ভ হইবে, তাহাও নহে। অনেক প্রকার মেঘ আছে; তন্মধ্যে কতকগুলির গর্ভ হয়, আর অনেকগুলি বন্ধ্যাই থাকিয়া যায়।

তখনকার আবহবিদ্যায় উল্লিখিত মেঘের শ্রেণীবিভাগ আধুনিক বিভাগ হইতে কিছু বিভিন্ন ছিল। বৃহৎসংহিতায় আছে,—

মুক্তারজতনিকাশাস্তমালনীলোৎপলাঞ্জনাভাসাঃ।
জলচরসত্ত্বাকারা গর্ভেষু ঘনাঃ প্রভূতজলাঃ॥

অর্থাৎ, গর্ভের সময় যে মেঘ মুক্তা বা রৌপ্যবর্ণ, অথবা তমাল, নীলপদ্ম ও অঞ্জনের বর্ণ, আর জলজন্তুর আকৃতিবিশিষ্ট হয়, সে মেঘই প্রসবের সময় প্রভূত জল বর্ষণ করে। আধুনিক পাশ্চাত্য আবহবিদ্যায় মেঘের চারিপ্রকার শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। দুই প্রকার উচ্চ মেঘ ও দুই প্রকার নিম্ন মেঘ। উচ্চ মেঘ যথা,—cirus (ধূম্রাকার লঘু মেঘ), ও Stratus (স্তরাকার মেঘ); নিম্ন মেঘ যথা,—cumulus (সাদা তুলাস্তূপের ন্যায় মেঘ), ও Nimbus (কাকাণ্ডবর্ণ বৃষ্টিপ্রসূতি মেঘ)। তার পর আবার ইহাদের মিশ্রণে বিবিধসংজ্ঞক মিশ্র মেঘেরও উদয় হইয়া থাকে। বৃহৎসংহিতার উপর্য্যুক্ত মেঘবর্ণনা নিম্নমেঘদ্বয়কেই নির্দ্দেশ করিতেছে, বলা যায়।

বৃহৎসংহিতায় বলা হইয়াছে যে, চারি জন জ্যোতির্ব্বিদ দিবারাত্র গর্ভলক্ষণ দেখিবার জন্য নিযুক্ত থাকা আবশ্যক। গর্ভের সময় কতকগুলি লক্ষণ বর্ত্তমান

থাকিলে গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে, আর অন্য কতকগুলির বর্ত্তমানতা গর্ভ নষ্ট করিয়া দেয়। লক্ষণের মধ্যে আবার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ ও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ। মার্গশীর্ষ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত গর্ভদর্শনের সময়। এই সময়ের মধ্যে প্রত্যেক মাসে আবার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণের পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক।

গর্ভের সময় যদি উত্তর, পূর্ব্ব বা উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে মৃদুমন্দ বাতাস বহিতে থাকে, আকাশ সুনির্ম্মল নীলবর্ণ থাকে, চন্দ্র বা সূর্য্য সুন্দর-পরিবেশযুক্ত হয়; প্রাতে কিংবা সায়ংকালে রামধনুর উদয় হয়, বিদ্যুৎ চমকে, বা শুভগ্রহ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে। আর যদি গর্ভের সময় উল্কাপাত, বজ্রপাত, পাংশুপাত, দিগ্দাহ, ভূমিকম্প, ধূমকেতু, চন্দ্র কি সূর্য্যের গ্রহণ হয়, অথবা সূর্য্যমণ্ডলে তামস কীলক (কাল দাগ Sunspots and facule) প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে গর্ভপাত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত গর্ভলক্ষণ ও গর্ভপাতলক্ষণ ব্যতীত মেঘের পরিমাণ, স্থানবিভাগ এবং বর্ণ ও বায়ুর বেগ ও দিক্ সর্ব্বাগ্রে জানা একান্ত আবশ্যক।

শ্রীঈশানচন্দ্র দেব।

কবিতা-কুঞ্জ।

কবিতা ও প্রিয়া।

রচনা-বিভোর কবি যেমন করিয়া
আপন রচনাগুলি হাতে তুলি নিয়া
উলটি পালটি তারে পরাণ ভরিয়া
শতবার উচ্চারিয়া করে সম্ভাষণ,
সেইরূপ, হে প্রেয়সি! আমিও তোমার
সৌন্দর্য্য-সম্পদ-রাশি হেরি বারে বার
শতবার চলি গিয়া ফিরিয়া আবার,
তব প্রেম-মন্ত্র প্রিয়ে! করি উচ্চারণ!
কবিতা কবির আত্মা, তাই তারে টানে;
তুমি মোরে কিসে টান? কে জানে কে জানে!

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস।

দিল্লী।

দাঁড়ায়ে তোরণে পান্থ, হে রাজসুন্দরি!
নয়ন ভরিয়া আজি হেরিছে তোমারে;
বিজড়িত যুগান্তের স্মৃতির বল্লরী
মসীদ, সমাধি, হর্ম্ম্য, মন্দির, মিনারে;
ছিল বৈজয়ন্তকান্তি এ মর্ত্ত্য-ভুবনে,
সুশোভিয়া রাজরাণি। তব অঙ্কস্থল।
শিল্প-রত্নাকরে লভি রত্ন বিমোহনে
ভারত-মুকুটে তুমি মণি-সমুজ্জ্বল!
ছিলে সৌন্দর্য্যের সার বিপুল গৌরবে,
শোভার প্রবাহ ঢালি ধরণীমণ্ডলে;
তব সম রাজপূজা লভেছে কে কবে
রাজরক্তে অভিষিক্ত চরণ-কমলে?
আজি সে রাজশ্রী কোথা? কালের আঁধারে
লুণ্ঠিত প্রাসাদ, দুর্গ কাতারে কাতারে!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

প্রাচীন দিল্লী।

কি অসীম ধ্বংসস্তূপ দিগন্ত ব্যাপিয়া!
বিস্মিত-হৃদয়ে হেরি বিমুগ্ধ নয়নে!

হেরি শুধু সৌধারণ্য চাহিয়া চাহিয়া!
কি শুব্ধতা! লক্ষ শত সমাধি নির্জ্জনে
দূরে দূরে—বহু দূরে—গগনে গগনে
মিশেছে প্রাসাদ-চূড়া—সমুচ্চ শিখর।
গুল্মলতা বিমণ্ডিত তোরণে তোরণে।
কপোতের কণ্ঠে ফোটে অর্দ্ধভগ্ন স্বর।
এই কি সে ইন্দ্রপ্রস্থ—রাজরত্নাগার?
হইয়াছে ভারতের ভীষণ শ্মশান।
দুর্জ্জয় প্রাচীর, গড়, দুর্গের প্রাকার
ল'ভে কালগর্ভে ক্রমে মহা অবসান।
কালের অনন্ত কীর্ত্তি এ মর্ম্ম খোদিয়া
কি জ্বলন্ত স্মৃতিরূপে রহিল জাগিয়া!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

স্বপ্নসুন্দরী।

সুপ্তি-মরুমাঝে এ কি মায়া-মরীচিকা,
আঁধার রহস্যে এ কি স্বর্গ-দীপশিখা?
যত ভূত ভবিষ্যৎ মানসের ছায়া
সহসা দেয় কি দেখা ধরি দিব্য কায়া!
ব্যবধান অন্তরাল হরি' কি কুহকে
দূরত্বেরে কাছে আনে আঁখির পলকে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য হয়ে যায় পলে একাকার,
নিমিষে শুকায়ে যায় বিচ্ছেদ-পাথার।
কে তুমি ছলনাময়ী, আত্মা-সহচরী
নিদ্রার সমুদ্রে তুলি চেতনা-লহরী
ভাসায়ে দিয়েছ তব মায়ার তরণী!
সে মোহে আকাশ স্তব্ধ, বিস্মিতা ধরণী।
সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু—অপূর্ব্ব মিলন,
সজীব রাখিছে নিত্য দুর্ব্বহ জীবন।

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ।

ওয়ালটেয়ারে।

সম্মুখে সুনীল সিন্ধু গর্জ্জে অনিবার;
উন্মাদ উর্ম্মির নৃত্যে—শুভ্র ফেনলীলা;
পীড়িতা ধরণী, তাই আর্ত্তনাদ তা'র
স্বনিছে পবনস্বনে, বনরাজিনীলা
পশ্চাতে সমুদ্রবেলা; উন্নত ভূধর
সজ্জিত পল্লবে পুষ্পে—পাষাণ চরণে
রোধিছে সমুদ্রবেগ বীচি-ভয়ঙ্কর
শ্রান্তিহীন, তাই জাগে, গভীর গর্জ্জনে
নিষ্ফল আক্রোশ তার; তাই ফিরি যায়
ব্যর্থবেগ উর্ম্মিমালা—আসিতে আবার
উন্মাদকল্লোলরোলে। প্রকৃতি হেথায়
ভীষণসৌন্দর্য্যময়ী। স্মরিয়া তোমার
শান্তিসিক্ত শ্যাম শোভা স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল,
হে বঙ্গ, প্রবাসে মম হৃদয় চঞ্চল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। কার্ত্তিক। "ভারতী-মঙ্গল" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের রচিত একটি কবিতা। 'ভারতী-মঙ্গলে' কবিবর দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব দেখিলাম না। উপদেশ ও বক্তৃতা ছন্দোবন্ধ হইলেও কবিতা হয় না। বিচারপতি শ্রীযুক্ত সৈয়দ আমীর আলি সাহেব কর্ত্তৃক রচিত "পারস্য ভাষা ও সাহিত্য" এবারকার 'ভারতীর' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। ভারতী-সম্পাদিকা ফুটনোটে বলিতেছেন,—"জষ্টিস্ আমীর আলি বাঙ্গলা জানিলেও বাঙ্গলা ভাষায় প্রবন্ধরচনায় অনভ্যস্ত হওয়ায় সঙ্কোচবশতঃ ভারতীর জন্য এই প্রবন্ধটি ইংরাজীতেই রচনা করিয়াছিলেন; আমাদের উপর ভাষান্তরের ভার অর্পিত হইয়াছিল।" জষ্টিস্ আমীর আলি প্রথমে পারস্য ভাষার সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে "নির্ঝরিণীর জলস্রোতের ন্যায় ইহা (পারস্য ভাষা) অবিরল তরল মধুর সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। ভালবাসার কথা বলিবার জন্যই যেন ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল—এমনি ইহার মধুরতা! ইহার সাহিত্যভাণ্ডার বহুবিধ ইতিহাস, জীবনচরিত, দর্শন এবং কাব্যরত্নে পরিপূর্ণ।" আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক কেবল কবিগণের ও কাব্যের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি, ভবিষ্যতে ইতিহাস, জীবনচরিত, দর্শন প্রভৃতিরও পরিচয় দিবেন।

লেখক সবিস্ময়ে বলিতেছেন, "এ ভাষার ব্যাকরণ অতি সহজ এবং এত সহজে আয়ত্ত করা যায় যে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য মনে হয় কেন এ দেশে এ ভাষার আরো অধিক চর্চ্চা হয় নাই।"

এখন উদরান্নসংস্থানের উপায়-স্বরূপ ইংরাজী ভিন্ন আর কোন্ ভাষারই বা চর্চ্চা হইতেছে? আর সে ইংরাজী-চর্চ্চাই বা কতটুকু? সুতরাং বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। আব্বাস মার্ভাজী পারস্যের আদি কবি। তাঁহার ভাষা সহজ, সুমধুর। তাঁহার পরবর্ত্তী কবি ফিরদুসী সম্বন্ধে লেখক বলেন,—

"যদিও আব্বাস মার্ভাজীকে আদি কবি এবং পারসিক কাব্যের জন্মদাতা বলা যায়, তথাপি তৎপরবর্ত্তী কবি ফীরদুসী অধিকতর সম্মানের যোগ্য। মাসেদের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র তুস পল্লীতে ফীরদুসীর জন্ম হয়, তিনি দেশদেশান্তে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, দেশের প্রাচীন ভাষা, কাব্য, উপন্যাস এবং ইতিহাসে তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইতিহাস চর্চ্চাকালে তিনি পারস্যের একখানি বহু পুরাতন ইতিহাস পাইয়াছিলেন। তাহা হইতে বহু যত্নে বিবিধ আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করেন। সুলতান মামুদের নিয়ত উৎসাহে ফীরদুসী একখানি মহাকাব্য রচনা করেন—এই কাব্যখানি পৃথিবীর সমুদায় শ্রেষ্ঠ কাব্যের সহিত তুল্য স্থানের অধিকারী। ত্রিশ বৎসরের যত্ন, পরিশ্রম এবং অনুসন্ধানের ফলে 'সাহনামা' রচিত হইয়াছিল। সার উইলিয়াম জোন্স বলেন 'সাহনামা'তে ষষ্টিসহস্র দ্বিপদী শ্লোক আছে—প্রত্যেকটিই অতিসুমার্জ্জিত; সরসতা এবং মাধুর্য্য গুণে ইহা অনেক প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবির রচনার সমকক্ষ। এই কাব্যের ভাষা সুগম্ভীর, মহান, সংযত ও সঙ্গীতে পরিপূর্ণ; উপমাসৌন্দর্য্য অতুলনীয়, বর্ণনাকৌশলে প্রত্যেক দৃশ্য সমুজ্জ্বল চিত্রের ন্যায় উদ্ভাসিত। পারস্য ভাষায় এমন আর একখানি কাব্য নাই যাহার সহিত 'সাহনামার'

এবং সুলতান মামুদের মধ্যে যে বিবাদ হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। 'সাহনামা' সমাপ্ত হইলে সম্রাট কবিবরকে বহুমূল্য উপহারাদি দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন—কিন্তু যখন সময় উপস্থিত হইল তখন সভাসদদিগের কুমন্ত্রণায় অতি সামান্য উপহার দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন—ফীরদুসী সম্রাটের এই ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক আহত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করেন। এই কবিতার আরম্ভে ফীরদুসী লিখিয়াছেন, 'হে সম্রাট, হে বিশ্ববিজয়ি, তুমি আর কাহাকেও ভয় কর বা না কর অন্ততঃ সেই সর্ব্বশক্তিমানের কথা একেবারে বিস্মৃত হইও না।' ইহার পর সুলতান মামুদের বংশ, পিতৃপুরুষ এবং তাঁহার ব্যবহারের প্রতি কতকগুলি বিষদিগ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এই বলিয়া কবিতার উপসংহার করেন—'স্বভাব-তিক্ত কোন তরুকে যদি স্বর্গের নন্দনকাননে লইয়া বপন কর, যদি প্রতিদিন অতিযত্নে তাহাতে মন্দাকিনী-সলিল, দুগ্ধ এবং মধুরস সেচন কর, তবুও দেখিবে ফলপ্রসবের সময় তাহা তিক্ত ফলই প্রসব করিবে।' ফীরদুসী এই কবিতা সম্রাটের মস্তকে প্রচণ্ড বজ্রের ন্যায় নিক্ষেপ করিয়া বাগ্দাদে চলিয়া যান—সেখানকার খালিফ তাঁহাকে ক্রুদ্ধ মামুদের প্রতিশোধ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সুলতান কিছুকাল পরে আপনার অন্যায় বুঝিতে পারিয়া কবির যোগ্য বিবিধ উপহার তথায় তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। রাজভৃত্যগণ যখন এই বহুমূল্য অসংখ্য উপহার লইয়া কবির গৃহপ্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই কবির অনুচরগণ তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতেছিল। ফীরদুসীর একমাত্র দুহিতা তাঁহারি অনুরূপ গর্ব্বিতস্বভাব ছিলেন—সেই রাজ-উপঢৌকন তিনি স্পর্শমাত্র না করিয়াই সে সমস্ত নগরীর দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন। ফীরদুসীর রচিত 'সাহনামা' প্রাচ্য প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্যের সমুন্নত স্মৃতিমন্দির, যদি কখনও সর্ব্বসাধারণ্যে ইহা পারস্য ভাষায় পঠিত হয়, তবেই ইহার যোগ্য সমাদর হওয়া সম্ভব। ইহা যে আদি কবি বাল্মীকির রচনা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ থাকিবে না।"

আলোচ্য রচনার আদ্যোপান্তে প্রতিভাশালী লেখকের ভাবুকতা ও রসজ্ঞতার পরিচয় জাজ্জ্বল্যমান। জষ্টিস্ আমীর আলির ন্যায় শক্তিশালী সুলেখকগণ যদি ইংরাজী ভাষার কবলিত না হইতেন। ইঁহাদের ন্যায় সাহিত্যরথীদের সেবায় বঞ্চিত না হইলে মাতৃভাষার লাবণ্যশ্রী শতগুণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সৈয়দ সাহেব 'বাঙ্গলা ভাষায় প্রবন্ধরচনায় অনভ্যস্ত', ইহা আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যে 'ভারতীর' জন্য, বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টির জন্য, বাঙ্গালী পাঠকের তৃপ্তির জন্য এই প্রবন্ধটির রচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা সৌভাগ্য বলিয়া গণনা করি। 'প্রবাসিনীর' লিখিত "বেহারে বাঙ্গালিনী" একটি চলনসই বিদেশী নক্সা। চিত্রবস্তু চিত্তাকর্ষক ;—কিন্তু প্রবাসিনীর তূলিকা রেখাপাতে এখনও অনভ্যস্ত বলিয়া মনে হয়।

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রকাশ ভট্টাচার্য্যের রচিত "বাঙ্গালীর শ্রেণীবিভাগ—ক্ষত্রিয়" নামক প্রবন্ধটি আলোচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের "শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বর মহাদেব" সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামীর "চিত্রাঙ্কন" নামক প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন,—'বাঙ্গলা মাসিকে বিলাতী মাসিকপত্রাদির ন্যায় স্থায়ী সুন্দর হাফ্‌টোন দেখিতে পাই না। তাহা কতকটা আদর্শের দোষে, কতকটা ছাপিবার দোষে, এবং কতকটা বোধ হয়

কালীর দোষেই ঘটিয়া থাকে।" 'বিলাতী' হাফ্‌টোনের ন্যায় 'স্থায়ী' ও 'সুন্দর' 'হাফটোন্' বিরল নয়। তবে যদি সে সকল ছবি লেখকের দৃষ্টিগোচর না হইয়া থাকে, তাহা হইলে দুর্ভাগা সচিত্রপত্রের দল সম্পূর্ণ নাচার। বিলাতী পত্রেও হাফ্‌টোনের দুঃখ-দুর্দ্দশা অল্প নহে। অনেক সময়ে 'বিলাতী' পত্রের বিকলাঙ্গ বা মসীলিপ্ত ছবি দেখিয়াও অশ্রুসংবরণ করা যায় না। সচিত্র পত্রের চিত্রগৌরবে আমেরিকাই বোধ করি অগ্রণী। বিলাতী ও মার্কিণ সচিত্র পত্র দেখিয়া অন্ততঃ আমাদের সেইরূপ মনে হয়। লেখক বলেন,—আর একটি 'মজ্জাগত দোষে' বাঙ্গলা মাসিকের ছবি কার্য্যালয় হইতে বাহির হইয়া গ্রাহকের গৃহে পঁহুছিবার পূর্ব্বে পথেই পঞ্চত্ব পায়;—ভাঁজিবার দোষে ছবিতে আর ছবিত্ব থাকে না। এ অভিযোগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু যে মজ্জাগত দোষ এই দুর্দ্দশার কারণ, লেখক তাহা ঠিক ধরিতে পারেন নাই। বিলাতী কাগজের কাট্‌তির কথাটা লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন। একাদশী করিয়াও কোনও মতে কাগজ চালান যায়, কিন্তু ছবি ও ছাপার বাহার অর্থসাপেক্ষ। এই মুষ্টিমেয় গ্রাহক লইয়া বাঙ্গালা মাসিক যাহা করিতেছে, অন্য দেশে তাহা কখনও সম্ভব হইত না।

গান।

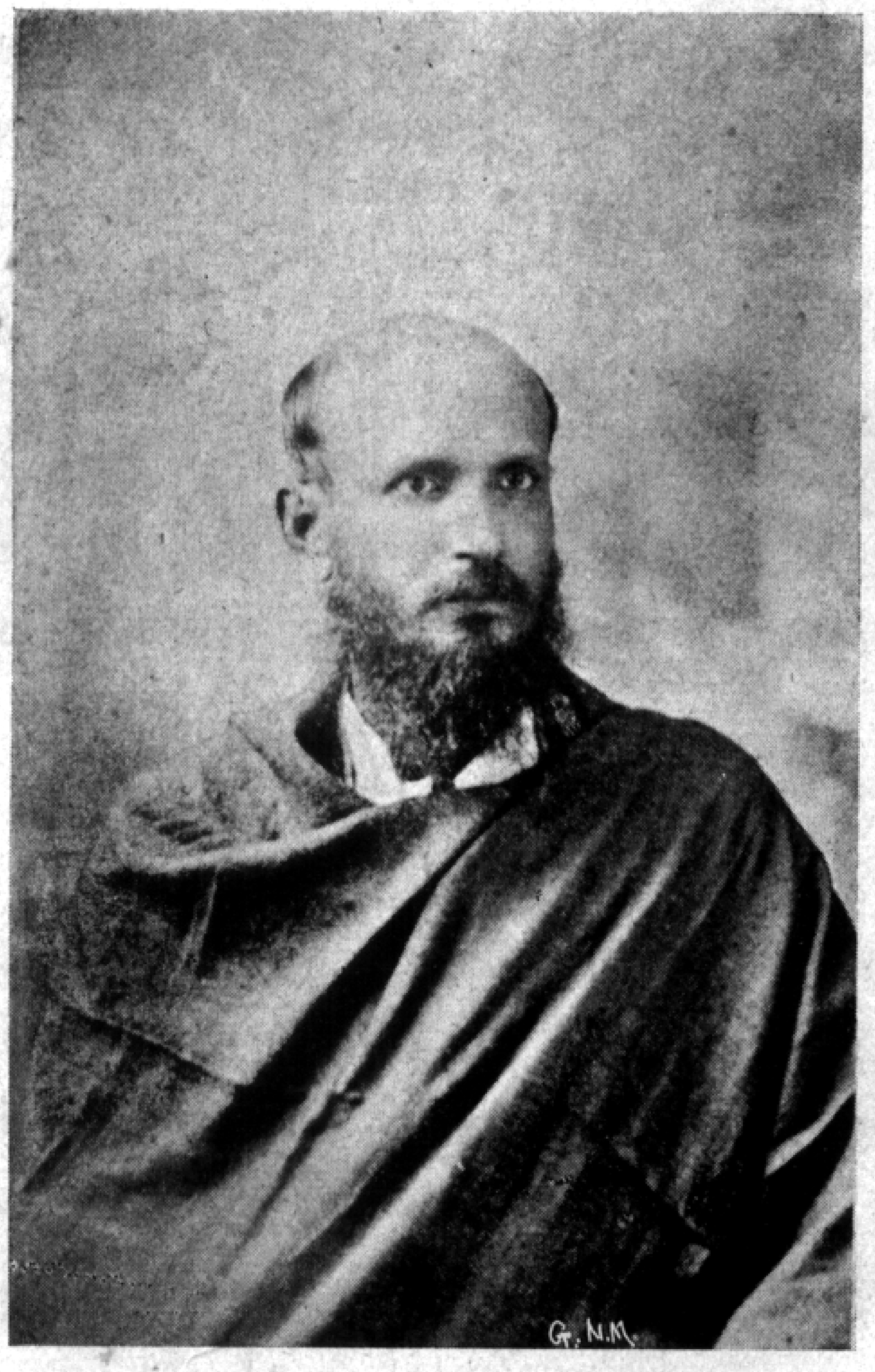
[সুরট—জয়জয়ন্তী ;—একতালা।]

হেথা নাই,—কোথা ভানু ভায়?
হেথা সে ডুবেছে প্রাবৃট-জলদ-ছায়।
নাহি হ্রাস, নাহি ক্ষয়,
নাহি মৃত্যু, নাহি লয়,
হেথা নাই, সেথা রয়,
নিতুই সে আসে যায়।

আজি ঘন বরিষণ,
বিশ্ব তমো-নিমগন,
কালি দীপ্ত মুক্তঘন
রবি-রশ্মি হেসে চায়।

আসা যাওয়া আশাবশে,
আমি হেথা আছি ব'সে,—
গিয়েছে—ফিরিবে গো সে
শারদীয়া পূর্ণিমায়।

শ্রীবিহারীলাল সরকার।



শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গে নীল।

২

কেন নীলকরদিগকে জমীদারী ইজারা দেওয়া হয়, চন্দ্রমোহন বাবুর এই প্রশ্নের উত্তরে রাণাঘাটের অন্যতম জমীদার বাবু শ্রীগোপাল পালচৌধুরী বলেন, না দিয়া উপায় কি? আইনে সুবিচার হয় না। যে অপরাধে দেশীয় জমীদার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন, সে অপরাধে যুরোপীয়ের অর্থদণ্ডের অধিক কিছু হয় না। এতদ্ব্যতীত রাজকর্ম্মচারীরা নীলকরদিগের পৃষ্ঠপোষক। আদালতে হাজির হইলে ইজারা-প্রদাতা জমীদারকে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, আর ইজারাদার সামান্য নীলকর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে চেয়ারে উপবেশন করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়। কাজেই মান রাখিবার জন্য জমীদারকে জমীদারী ইজারা দিতে হয়। নীলের মূল্য বাবদ যাহা ধরিয়া দেওয়া হইত, তাহাতে দাদনের টাকাই শোধ হইত না। কাজেই বীজের মূল্য, ষ্ট্যাম্প খরচা প্রভৃতিতে প্রজা ক্রমেই নীলকরের নিকট ঋণজালজড়িত হইয়া পড়িত। ফলে তাহাদের পক্ষে ক্রীতদাসের অবস্থাপ্রাপ্তি বিস্ময়কর নহে।

'কমিশন' বলেন, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে নীলকর-কৃত খুনের কোনও প্রমাণ তাঁহাদের হস্তগত হয় নাই। দাঙ্গাও অধিক হয় নাই; গ্রাম জ্বালানর প্রমাণাভাব। কেবল এক জন উচ্চমনা নীলকর বলিয়াছিলেন যে, তিনি গ্রাম জ্বালানর কথা অবগত আছেন। নীলকরের হুকুমে বাড়ীভাঙ্গা (১) ও কয়েদ করার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রজার গরু ধরিয়া লইয়া যাওয়া সচরাচরই ঘটিত। অনেক সময় যে খেজুরবাগান নষ্ট করিয়া নীল বুনান হইত, তাহাও অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই।

(১) আমরা এইরূপ একটি ঘটনার কথা অবগত আছি। পূর্ব্বোক্ত কাঠগড়া কুঠীর নিকটে কোন গ্রামে এক জন ভদ্রলোকের বাড়ী নীলকরের আদেশে ভাঙ্গা হয়। তিনি এই প্রদেশের কোন প্রসিদ্ধ বিষয়ী লোকের শরণ লইয়া নালিশ করেন। তাঁহার কৃপায় আদালতের বিচারে ভদ্রলোকটি যে খেসারতের ডিক্রি পান, তাহাতে তাঁহার কাঁচাঘরের স্থানে অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। সে অট্টালিকা আজও বর্ত্তমান। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তেমন লোকের হাতে পড়িলে নীলকরদিগকেও জব্দ হইতে হইত।—লেখক।

'কমিশন' স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হয়েন নাই। ছোটলাটও সে অপবাদ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। (২)

'কমিশনার'গণ গরু ধরা ও কয়েদের কথাই বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। ছোটলাট ক্রোধে আরক্ত হইয়া বলিয়াছেন, যে দেশে লোককে বলপূর্ব্বক ধরিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখা সচরাচর ঘটে, এবং অপরাধী বিনা শাস্তিতে অব্যাহতি পায়, সে দেশে আইন দুর্ব্বলকে সবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করে না। ইহা গভর্মেণ্টের পক্ষে কলঙ্কের কথা। নীলকরগণ ধৃত ব্যক্তিকে এক স্থানে অবরুদ্ধ রাখিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া, যাহাতে সন্ধান না হয় সে জন্য, ভিন্ন ভিন্ন কুঠীতে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ান হইত। "নীল-দর্পণে" মজুমদারের কাতরোক্তি, "দেড় মাসের মধ্যে চৌদ্দ কুঠীর জল খেলেন"—মিথ্যা নহে। নীল বুনিতে অনিচ্ছুক প্রজার সম্বন্ধে নীলকরের সাধারণ হুকুমই ছিল,—সাত কুঠীর জল খাওয়াও। ছোটলাট বিশ্বাস করেন, যাহাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখা হইত, তাহাদের মধ্যে 'রিপোর্টে' উল্লিখিত শীতল তরফদারের মত অনেক হতভাগ্যের আর কোন সন্ধানই পাওয়া যাইত না। (৩)

মিষ্টার ইডেন্ সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালতের নথী হইতে নীলকর-ঘটিত ৪৯টি গুরুতর মোকদ্দমার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া 'কমিশনে' দাখিল করেন। সেগুলির মধ্যে কয়টি পুরাতন হইলেও অধিকাংশ পূর্ব্বের কয় বৎসরে সংঘটিত।

নীলকরের প্রশ্রয় পাইয়া কুঠীর আমলারা অনেক সময় প্রজার নিকট টাকা আদায় করিত, এবং তাহাদের গাছ কাটিয়া লইত। কেবল আমলার অত্যাচারেই মুর্শিদাবাদের আনকুড়া কুঠীর প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া বিষম হাঙ্গামা বাধাইবার উদ্যোগ করে। আমরা নীলকুঠীর কার্য্যকলাপে অভিজ্ঞ বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়াছি, প্রজারা যে সামান্য দাদন পাইত,

---

(২) কিন্তু নীলকর-প্রপীড়িত প্রদেশে বসিয়া আমরা আজও এ বিষয়ে অনেক কথা শুনিতে পাই।—লেখক।

(৩) 'রিপোর্টে' আর একটি অভিযোগের উল্লেখ দেখিলাম না। কয়েদের আনুষঙ্গিক এই অত্যাচার উল্লেখযোগ্য। কোনও প্রজা নীল বুনিতে আপত্তি করিলে তাহাকে কয়েদ করিয়া তাহার মাথা মুড়াইয়া মাথায় মৃত্তিকা দিয়া তাহাতে নীলের বীজ বপন করা হইত।

আমলাদিগকে তাহারও অংশ দিতে হইত। (৪) এমনও হইয়াছে, নীলকর ইহা জানিতে পারিয়া স্বহস্তে দাদন দিয়া আমলাদিগকে অংশ দিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। প্রজারা তাঁহার অমতে দেওয়ানের বাসায় আসিয়া অংশ দিয়া গিয়াছে। কুম্ভীরের সহিত বিবাদ করিয়া কি জলে বাস করা চলে ?

নীলকরগণ অভিযোগ উপস্থিত করেন, দেওয়ানী বিভাগের রাজ-কর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগকে দেশ হইতে দূর করিবার জন্য, প্রজা ও জমীদারের পক্ষ অবলম্বন করেন। ছোটলাট বলেন, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বরং 'রিপোর্টে' প্রকাশ, ম্যাজিষ্ট্রেটগণ প্রজাকে যথোচিত সাহায্য দিয়া রক্ষা করেন নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ন্যায়বিচার করিলে প্রজার পক্ষে ক্লেশকর প্রচলিত প্রথামত নীলের চাষ বহুদিন পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। ছোটলাট 'কমিশনের' এই মতের সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন।

নীলকরগণ বলেন, প্রজারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বিদ্রোহী হয় নাই। জমীদার ও খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণের প্ররোচনায় তাহারা নীল বুনিতে অসম্মত হইয়াছে। পাদরীরা রাজনৈতিক আন্দোলনকারী হইয়াছেন। 'কমিশন' ও ছোটলাট এ অভিযোগের মূলে কোনও সত্যই পান নাই। বরং পাদরীরা অত্যাচার-প্রপীড়িত প্রজার পক্ষসমর্থন না করিলে নিন্দনীয় হইতেন। জমীদারগণ কোনরূপে প্রজাদিগকে উত্তেজিত করেন নাই। প্রজা-বিদ্রোহ স্বতঃপ্রণোদিত। 'কমিশনের' মত এই যে, প্রজার প্রতি অত্যাচারই নীলকরের বিরুদ্ধে প্রজার বিদ্রোহের কারণ।

নীল সম্বন্ধে প্রজার মনোভাব 'রিপোর্ট' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত কয় জন প্রজার সাক্ষ্য হইতে প্রতীয়মান হইবে ;—

দীনু মণ্ডল,—গলা কাটিয়া ফেলিলেও আমি নীল বুনিব না। মরিব, তবুও নীল বুনিব না।

জমীর মণ্ডল,—যে দেশে কেহ কখনও নীল বুনে নাই বা দেখে নাই, সেই দেশে যাইব।

(৪) "নীলদর্পণে" উড দেওয়ান 'গুপে গুওটা'কে বলিতেছেন, "আমি জানি না ?—ও শালা, পাজি, নেমক্‌হারাম, বেইমান। মাহিয়ানার টাকার তোদের কি হইয়া থাকে ?—তোমরা যদি নীলের দামের টাকা ভক্ষণ না কর, তবে কি ডেড্‌লি কমিশন হইত ? তা হইলে কি দুঃখী প্রজারা কাঁদিতে কাঁদিতে পাদরী সাহেবের কাছে যাইত ? তোমরা শালারা সব

হাজী মোল্লা,—অন্য দেশে যাইব, তবুও নীল বুনিব না। ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবুও নীল বুনিব না।

কবি মণ্ডল,—আমি কাহারও খাতিরে, এমন কি বাপ মার জন্যও নীল বুনিব না।

পাঁচু মোল্লা,—গুলি করিয়া মারিলেও নীল বুনিব না।

পাদরী হীল সাক্ষ্যে বলেন, তাঁহার অঞ্চলে প্রবাদ দাঁড়াইয়াছে, জমীর শত্রু নীল, মজুরের শত্রু আলস্য, আর জাতির শত্রু পাদরী হীল।

ছোটলাট বলিয়াছেন, রাজভক্তি, সাহস, উৎসাহ, অধ্যবসায় ও নিপুণতা ইংরাজ বংশগত দায়াধিকারসূত্রে পাইয়াছেন। দেশমধ্যে তাঁহাদের অবস্থান হিতকর হইবার কথা। কিন্তু যে স্থলে প্রজারা তাঁহাদের অবস্থান উপকারী মনে করে, সেই স্থলেই তাহা হিতকর; অন্যত্র নহে। মিষ্টার গবিন্সের মতে, বারাণসী অঞ্চলের নীলকরগণ সে প্রদেশের অশেষ কল্যাণকারী। এই মিষ্টার গবিন্সের চেষ্টাতেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহকালে বারাণসী অঞ্চল রক্ষা পাইয়াছিল। ছোটলাট বলেন, বারাণসী অঞ্চলের জল-হাওয়ায় এমন কিছু বিশেষত্ব নাই যে, সে অঞ্চলে যাঁহারা দেশের পক্ষে কল্যাণকর, অন্য অঞ্চলে তাঁহারা অন্যরূপ হইবেন। আসল কথা এই যে, সে অঞ্চলে নীলকরগণ প্রজার বিরুদ্ধে কার্য্য না করিয়া তাহার সহিত একযোগে কার্য্য করেন। ছোটলাটের আন্তরিক ইচ্ছা, এ প্রদেশেও নীলকরগণ দেশের পক্ষে শুভাবহ হয়েন। য়ুরোপীয়গণ আপনারা লাভ করিয়াও দেশীয়দিগের কত উপকার করিতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি মরেলগঞ্জের মিষ্টার মরেলের উল্লেখ করিয়াছেন। নীলকরগণ কুঠীর নিকটে মহকুমা-স্থাপনের বিরোধী; আর মিষ্টার মরেল স্বয়ং মরেলগঞ্জে মহকুমা সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

প্রজারা যে অনেক সময় দাদন লইয়া নীল বুননের পর আর যত্ন করিত না, তাহা যথার্থ। কারণ, যাহাতে তাহার লাভ নাই, তাহার প্রতি তাহার যত্ন আসিবে কোথা হইতে? (৫)

---

(৫) প্রজারা সময় সময় নীলের চারা বাহির হইলে আপনারাই রাত্রিযোগে ক্ষেত্রে গবাদি পশু ছাড়িয়া দিয়া চারা নষ্ট করিয়া কুঠীতে যাইয়া সংবাদ দিত—"গরুতে চারা নষ্ট করিয়া গিয়াছে।" কেহ কেহ বীজ যাহাতে অঙ্কুরিত না হয়, এই জন্য অগ্রে ভাজিয়া লইত। এই প্রসঙ্গে সার আলফ্রেড লায়েলের লিখিত ভারতীয় কৃষকের এই উক্তিটি একান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না,—

"Then comes a settlement Hakim, to teach us to plough and to weed,
(I sowed the cotton he gave me, but first I boiled the seed.")—
Verses written in India.

প্রজারা বলিত, নানা অত্যাচারে তাহারা নীল বুনিবার চুক্তি করিতে, এমন কি, বিনা চুক্তিতেও নীল করিতে বাধ্য হইত। তজ্জন্য তাহারা যে মূল্য পাইত, তাহা যৎসামান্য। নীলের পূর্ণ মূল্য পাইলেও লাভ হয় না। এ সকল কথাই প্রমাণিত হইয়াছিল। প্রজারা আরও বলে, তাহারা নীলের দাম বাবদে যে সামান্য মূল্য পাইত, তাহারও আবার এত কাটা যায় যে, অনেক সময় তাহাদের ঝুলি শূন্যই থাকে; কখনও যদি জমীর খাজনা সঙ্কুলান হয়, তাহা হইলেই তাহারা আপনাদিগকে ভাগ্যবান মনে করে। এই বিষয়ে নীলকরের আমলারাই প্রধানতঃ দোষী। (৬)

সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ছোটলাট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, এই বিবাদের জন্য কোন বিশেষ আইন-প্রণয়ন অনাবশ্যক। যে আইন বর্ত্তমান, তাহা নীলকর বা প্রজা, কাহারও ন্যায়বিচার-প্রাপ্তির পক্ষে অন্তরায় নহে,—তাহাতে কোন ক্রটি নাই। নীলকরগণ যে সকল অভি-যোগ উপস্থিত করিয়াছেন, সে সকলেরই প্রতীকারের উপায় প্রচলিত আইনে বর্ত্তমান। তবে নীলের মূল্য বাবদ প্রজা যাহা পায়, তাহাতে যখন অনেক সময় খাজনারই সঙ্কুলান হয় না, তখন ইহা প্রত্যাশা করা যায় না যে, সে অন্য লাভজনক ফসলের ন্যায় সমান যত্নে নীলের চাষ করিবে।

'কমিশনর'দিগের মধ্যে দুই জন (ফার্গুসন ও টেম্পল) প্রস্তাব করেন, প্রজা চুক্তিভঙ্গ করিলে তাহা ফৌজদারী বিধানে দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্য করা হউক। অপর তিন জন 'কমিশনর' ইহাতে ঘোর আপত্তি করেন, এবং ছোটলাটও তাঁহাদেরই পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি বলেন, নীল-সম্বন্ধীয় চুক্তি অন্য প্রকারের চুক্তি হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং যাহা Crime নহে, তাহার জন্য এক পক্ষকে Criminal বলিয়া গণ্য করা কোনরূপে সমর্থনীয় নহে। ১৮১০, ১৮৩২ ও ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। এবং প্রত্যেক বারই ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইয়াছিল। 'কমিশনে' নীলের ব্যবসায়ের সর্ব্বাঙ্গীন বিচার হইয়াছে।

---

(৬) নীলের বাণ্ডিল ওজনের সময় অত্যন্ত অবিচার হইত। নীল কুঠীতে আনিবামাত্র ওজন হইত না। গাদা দিয়া রাখা হইত। ওজনের সময় প্রজাদের বড় গাদা কখনও বা কুঠীর নিজ আবাদী বলিয়া চালান হইত, কখনও বা আমলারা আপনাদের কাহারও আবাদী বলিয়া মূল্য লইত। কতকগুলি ছোট গাদা প্রজাদের বলিয়া ওজন দিয়া, ওজনানুযায়ী সামান্য মূল্য তাহাদিগকে দেওয়া হইত।

ছোটলাট স্বয়ং কালীগঙ্গা ও কুমার নদীর পথে সিরাজগঞ্জ যাইবার সময় যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, নানা স্থানে বহু প্রজা একত্র হইয়া প্রার্থনা করে, গভর্মেণ্ট আদেশ প্রদান করিয়া তাহাদের নীল বুনা বন্ধ করিয়া দিন। এই দুই নদী দিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে ছোটলাটের ষ্টীমার প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ষাট বা সত্তর মাইল অতিক্রম করিত। নদীর দুই কূল ন্যায়বিচারপ্রার্থী প্রজাপুঞ্জে পূর্ণ থাকিত। নদীতীরবর্ত্তী গ্রামসমূহের রমণীরাও স্থানে স্থানে একত্র হইয়াছিল। পুরুষগণ যে বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে আসিয়া জড় হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্পূর্ণ চৌদ্দ ঘণ্টা কাল বিচারপ্রার্থী প্রজাপুঞ্জে পূর্ণ বেলাভূমির মধ্যবর্ত্তী জলপথে আগমন আর কোনও রাজকর্ম্মচারীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। তাহাদের ব্যবহার শ্রদ্ধাপূর্ণ—উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্নমাত্র নাই; সকলেই একই ভাবে অনুপ্রাণিত। লক্ষ লক্ষ নরনারীর পক্ষে এই ব্যবহার যে গভীর অর্থশূন্য, এরূপ বিবেচনা করা মূর্খের কার্য্য। ইহাতে যে organisation capacity for combined and simultaneous action in the cause দৃষ্ট হয়, তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

এই বৎসর নীলকর সভা দুইবার আবেদন করেন যে, গ্রাণ্ট যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। ইহার জন্য গ্রাণ্টকে দুইবারই সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল। তাঁহার কৈফিয়ৎ এরূপ সন্তোষজনক ও তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধ অভিযোগগুলি এরূপভাবে অপনীত যে, দুইবারই ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট তাঁহার সমর্থন করেন।

অক্টোবর মাসে প্রজারা নীলবুননে বাধা দিবে, শুনিয়া, গভর্মেণ্ট নীলের জেলাগুলিতে মিলিটারী পুলিশের সংখ্যাবৃদ্ধি করিলেন। নদীয়া ও যশোহরে দুই দল পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হইল, এবং দুইখানি রণতরী এই দুই জেলার জলপথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। শান্তিরক্ষার অন্য ব্যবস্থাও করা হইল। ইহার ফলে সামান্য হাঙ্গামা হইয়াই সব শেষ হইয়া গেল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত গভর্মেণ্ট এক মন্তব্যে গ্রাণ্টের মন্তব্যের প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া লেখেন যে, বড়লাটের মতে প্রকৃতপক্ষে প্রজা নীল বুনিয়া যাহা পাইত, তাহাতে ব্যয় সঙ্কুলান হইত না। ইহার জন্য প্রচলিত প্রথা যত দায়ী, নীলকরগণ তত নহে।

আদায়ে বাধা দিতেছে, কুঠীর নিজ আবাদী জমীতে বেদখল করিতেছে, এবং তাঁহাদের ও আমলাদিগের প্রাণহানির সম্ভাবনা করিয়া তুলিয়াছে। ৪ঠা মার্চ্চ নীলকরদিগের কোন 'ডেপুটেশন' বড়লাটকে এই সকল কথা জানান। খাজনার বিষয় প্রকৃত বোধ হওয়ায় নদীয়া, যশোহর, পাবনা ও ফরিদপুর জেলার জন্য দুই জন বিশেষ বিচারক নিযুক্ত হইলেন, এবং নীলকরদিগকে অন্তবিধ সাহায্যও প্রদত্ত হইল। এমন কি, দুই এক জন নীলকরকে লাটের খাজনা দাখিলের জন্য অতিরিক্ত সময়ও দেওয়া হইল। যশোহরের সাধুহাটী প্রভৃতি স্থানে গুরুতর হাঙ্গামা,—এমন কি, খুনও হইয়াছিল।

নীলকরদিগের অভিযোগে ছোটলাট বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। 'কমিশনের' রিপোর্ট' ও তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলে সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট ও তাঁহার মন্ত্রণাসভা নীলের চুক্তিভঙ্গে ফৌজদারী বিচারের প্রবর্ত্তন আবশ্যক কি না বিবেচনা করিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল 'ডেসপ্যাচে' ভারতগভর্মেণ্টকে লিখিলেন যে, ভারতীয় Law Commissioner-গণ, ব্যবস্থাপক সভা, ষ্টেট সেক্রেটারী, 'নীল-কমিশনে'র অধিকাংশ সভ্য, বাঙ্গালা গভর্মেণ্ট ও ভারতগভর্মেণ্টও যখন ইহার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ভারতগভর্মেণ্টের বর্ত্তমান প্রস্তাবে সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট সম্মতি দিতে পারেন না; চুক্তিভঙ্গে ফৌজদারী বিচারের ব্যবস্থা করিবার জন্য যে আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার প্রত্যাখ্যান করা হউক।

এই সময় লর্ড ক্যানিং লেখেন, নীলকরগণ অপ্রকৃত চুক্তিতে বাধ্য করিলে বা অবৈধ উপায়ে চুক্তি পূরণ করাইয়া লইলে প্রজা যে আইনে প্রতীকার পাইতে পারে, সে বিষয়ে প্রজা বহুদিনই অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছে। মিষ্টার বকলাণ্ড স্বপ্রণীত 'বাঙ্গালার বিবরণে' সত্যই বলিয়াছেন, নীলের ব্যবসায় নিশ্চয় বহুদিন হইতেই বিনাশোন্মুখ হইয়াছিল; নিম্নবঙ্গে আর পূর্ব্বের মত মাথা তুলিতে পারে নাই।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় এই সময়ের কথায় লিখিয়াছেন, তখন বঙ্গের নীলকরগণ স্বেচ্ছাচারী রাজপ্রভাবে দেশশাসন করিতেন; ছোটলাট হালিডে প্রকৃত ব্যাপার অবগত ছিলেন না; নীলকরগণ তাঁহাকে

জন্মিয়াছিল, দেশের নীলকুঠীতে গভর্মেণ্টের অংশ আছে। প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা কিছু অধিক বুদ্ধিমান, তাহারা বিশ্বাস করিত, কতকগুলি নীলকুঠীর সহিত ছোটলাটের স্বার্থ-সম্পর্ক বর্ত্তমান। অন্ততঃ নীলকরগণ এইরূপ কথা রটাইতে ছাড়িতেন না। অত্যাচার অনাচারে নীলকরগণ কনষ্টেবল হইতে দেশের শাসনকর্ত্তা পর্য্যন্ত সকলেরই সমর্থন পাইতেন। তাঁহারা আপনাদের বিচারালয়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার করিয়া দণ্ডবিধান করিতেন। তাঁহারা আপনাদের জেলে লোক কয়েদ করিতেন; সময় সময় আরও কুকাণ্ড করিতেন। তাঁহারা কাহাকেও সম্মান করিতেন না; জমীদার ও প্রজা সকলেই তাঁহাদের ভয়ে কাঁপিত। তাঁহারা লোকের জীবন ও সম্পত্তির হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা ছিলেন, এবং যথেচ্ছচারে ক্ষমতার ষোল-আনা সদ্ব্যবহার করিতে ক্রটি করিতেন না। উপায়ান্তরবিহীন প্রজারা নীরবে সব সহ্য করিত। তাহারা কোনরূপ বাধা প্রদান করিলে গ্রাম লুট হইত—কখনও বা গ্রাম জ্বালান হইত,—সময় সময় খুনও হইত। ম্যাজিষ্ট্রেট নীলকরকে শাস্তি না দিয়া পীড়িত প্রজার দণ্ডবিধান করিতেন। নীল নষ্ট করা প্রভৃতি ওজুহাতে প্রজাপক্ষের প্রধানগণকে জেলে দেওয়া হইত। কাজেই প্রজারা আর উচ্চবাচ্য করিত না।

শিশিরবাবু নীলবিদ্রোহের আরম্ভের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, নদীয়া জেলায় চৌগাছা গ্রামে বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামক দুই ব্যক্তি বাস করিতেন। বিষ্ণুচরণ সামান্য ভূম্যধিকারী; দিগম্বর মহাজন। উভয়েই পূর্ব্বে অনেক নীলকুঠীর দেওয়ান ছিলেন; কিন্তু নীলকরের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া কর্ম্মত্যাগ করেন। ইহাঁরা বুঝিলেন, প্রজা মরিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সামান্য চেষ্টায় নীলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। ইঁহারা বঙ্গে নীলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহবৈজয়ন্তী উড্ডীন করিলেন। গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইয়া প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রজার সাহসে কুলাইল না। তখন ইঁহারা বুঝিলেন, প্রকাশ্য দাঙ্গায় হারাইয়া নীলকরের পশার নষ্ট করিতে না পারিলে কোনও ফল হইবে না। তাঁহারা নিজ ব্যয়ে বাখরগঞ্জ হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; কিন্তু প্রথম দাঙ্গাতেই পরাজিত হইলেন। সুখের বিষয়, মিষ্টার টটেনহাম (পরে হাইকোর্টের জজ) তখন নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট; তিনি নীলকরপ্রিয় ছিলেন না।—সংবাদ পাইয়া অকুস্থলে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং প্রথম দোষ যে নীল-করের, তাহা বুঝিয়া স্থায়বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে প্রজার সাহস বাড়িতে লাগিল। বিশ্বাস-দ্বয় মোকদ্দমায় প্রজাদিগকে অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। টটেনহাম বদলী হইলেন; কিন্তু বিশ্বাসদিগের নিকট ভরসা পাইয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের প্রজারা দলবদ্ধ হইতে লাগিল। নীলকরগণ নানা প্রকার অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অটল রহিলেন; প্রজার নামে দাদনের বাকীর নালিশেও তাহাদের দেনা শোধ করিয়া দিতে লাগিলেন। ফলে দুই বৎসরের মধ্যে দুই একটি করিয়া সমস্ত কুঠীর প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ইহাতে বিশ্বাসদিগের সতের হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তাঁহা-দের মত লোকের পক্ষে ইহা সামান্য না হইলেও, ফলের তুলনায় ব্যয় নগণ্য। তাঁহাদের নামও আজ সুপ্রসিদ্ধ।

এই সময় দুইটি স্মরণযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়;—(১) নীলদর্পণের প্রকাশ; (২) হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু।

নীলের ব্যাপারে হরিশ্চন্দ্র প্রজার পক্ষ হইয়া যে শ্রম করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। সে সময় অত্যাচারপীড়িত প্রজা যে সকল আবেদনে গবর্মেণ্টকে দুঃখকথা জানাইয়াছিল, সে সমস্তই প্রায় হরিশ্চন্দ্রের লিখিত। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান' সভা প্রজার পক্ষ অবলম্বন করেন। বাঙ্গালীর মুখপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তখন হরিশ্চন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত হইত। সিপাহীবিদ্রোহকালে তিনি স্বীয় পত্রে যে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন, তাহাতে বড়লাট পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি স্বীয় পত্রে অসাধারণ দক্ষতার সহিত প্রজার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। মফঃস্বল হইতে দরিদ্র প্রজা কলিকাতায় আসিলে হরিশ্চন্দ্র তাহাকে কেবল পরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না; তিনি অকাতরে অন্নদান করিতেন। গুরুশ্রমে তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েন। 'নীল-কমিশনের' কার্য্য শেষ হইলে আপনার ঐকান্তিক নিঃস্বার্থ চেষ্টা ফলবতী দেখিয়া সফলসাধন হরিশ্চন্দ্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েন। (১৪ই জুন ১৮৬১) নীলকরগণ মেয়ার্স মানহানির মোকদ্দমায় * ডিগ্রী করিয়া

* পেট্রিয়টে লিখিত হয় যে, ঐ নীলকর হরমণি নামক কোন স্ত্রীলোককে হরণ করেন। তৎপূর্ব্বে পাদরী লং ও বনিচ ঐরূপ আভাস দেন। হরিশ্চন্দ্র মোকদ্দমায় অভিযোগ সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন; এবং কেবল খরচার জন্ত দায়ী হয়েন। নীলকর হিল তাঁহার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মানহানির নালিশের চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হয়েন।—লেখক

তাঁহার বসতবাটী পর্য্যন্ত ক্রোক করেন। সুখের বিষয়, 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার' কতিপয় সভ্য টাকা দিয়া ডিক্রী শোধ করিয়াছেন। সভা তাঁহার বিধবা পত্নীকে যাবজ্জীবন মাসহারা দিয়াছিলেন। তাঁহার স্মরণচিহ্নস্থাপনের উদ্দেশে ১০,৫০০ টাকা সংগৃহীত হয়। 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা' গৃহের দ্বারদেশে 'হরিশ্চন্দ্র লাইব্রেরী' লিখিত একখানি প্রস্তরই তাহার নিদর্শন।

বিদেশী গল্প।

জলকন্যা।

শত শত বৎসর পূর্ব্বে এক দিন সন্ধ্যার সময় একটি সুন্দর হ্রদের ধারে এক বৃদ্ধ ধীবর তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে বসিয়া জাল বুনিতেছিল। স্থানটি বড়ই মনোহর ও নির্জ্জন। অন্য লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। ধীবরের কুটীরের পশ্চাতে এক গভীর দুর্ভেদ্য অরণ্য, এবং অরণ্যের অপর পারে এক নগর। কথিত ছিল, এই অরণ্য ভূত প্রেতের আবাসস্থান। এই কারণে কেহ সে বনে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না। কিন্তু বৃদ্ধ ধীবর প্রত্যহ উচ্চস্বরে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নির্ব্বিঘ্নে বন অতিক্রম করিয়া নগরে মৎস্য বিক্রয় করিয়া আসিত।

সে দিন সন্ধ্যাকালে জাল বুনিতে বুনিতে সহসা অরণ্যমধ্যে অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইল। চমকিয়া বৃদ্ধ ধীবর সেই দিকে চাহিল ও দেখিল, অরণ্যের নিবিড় বৃক্ষরাশি ভেদ করিয়া এক শুভ্রবর্ণ অমানুষিক বৃহৎ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। ভীত হইয়া সে উচ্চস্বরে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল, এবং তৎক্ষণাৎ দেখিল যে, সেই মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র নদীতে বিলীন হইয়া গেল। সে বিস্ময়পূর্ণনয়নে সহসা পুনরায় দেখিল যে, শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া এক মনুষ্যমূর্ত্তি অরণ্যের মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। অশ্বারোহী নিকটে আসিলে ধীবর দেখিল, এক জন সুসজ্জিত যুবক যোদ্ধা; তাহার দেহ সুগঠিত, বদনমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর, মস্তকে উজ্জ্বল মনোহর উষ্ণীষ; কটিদেশে বহুমূল্য মণিমুক্তাখচিত তরবারি। যোদ্ধা কুটীরের সম্মুখে আসিয়া বৃদ্ধ ধীবরকে সম্বোধন করিয়া সেই রাত্রির জন্য আতিথ্য ভিক্ষা চাহিলেন। ধীবর আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজের কুটীরে লইয়া চলিল। যোদ্ধা তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "তুমি ইচ্ছায় আমাকে আশ্রয় না দিলে আমি বলপূর্ব্বক থাকিতাম; কারণ, এই হ্রদ দুস্তর; আর ঐ মায়াকাননের ভিতর দিয়া ফিরিয়া যাওয়াও অসম্ভব।" উভয়ে কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ধীবরপত্নী সম্ভ্রান্ত অতিথি দেখিয়া তাঁহাকে সমাদর করিয়া একখানি আসনে বসিতে দিল, এবং রন্ধনশালায় আহারের উদ্যোগ

করিতে গেল। কিছু ক্ষণ পরে বৃদ্ধা ফিরিয়া আসিল, এবং ধীবর, ধীবরপত্নী ও যুবক বসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। যোদ্ধা বলিলেন, তাঁহার নাম 'হুল্ডব্রাণ্ড'। অরণ্যের অপর পারে—নগরে তাঁহার প্রাসাদ। তিনি পূর্ব্ব দিন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, সহসা কুটীরের বাহির জলের শব্দ শ্রুত হইল, এবং মনে হইল, যেন কেহ বাহির হইতে জানালার উপরে সজোরে জল ফেলিতেছে। ইহা শুনিয়া ধীবর বিরক্তিব্যঞ্জক ভ্রূকুটী করিয়া সেই দিকে চাহিল। কিন্তু আরও দুই তিনবার ঐরূপ শব্দ শ্রুত হইল, এবং অবশেষে গৃহের ভিতরে জলের ধারা বহিয়া আসিল। তখন বৃদ্ধ অত্যন্ত কুপিত হইয়া জানালার নিকট উঠিয়া গিয়া উচ্চস্বরে বলিল, "উনডিন্! তুমি এ সকল কুঅভ্যাস ও তামাসা কি কখনও ছাড়িবে না?—বিশেষতঃ আজ আমাদের গৃহে এক জন সম্ভ্রান্ত অতিথি আসিয়াছেন!"

বাহির হইতে কেহ উত্তর দিল না; কেবল মধুর মৃদু হাস্যধ্বনি সকলের কর্ণে প্রবেশ করিল। ধীবর আসিয়া হুল্ডব্রাণ্ডকে বলিল, "মহাশয়! আশা করি, আপনি এই সকল বা অন্য কোনও ঘটনায় বিরক্ত হইবেন না। আমাদের পালিতা কন্যা উন্‌ডিন্ বড় দুষ্ট। তাহার বয়স যদিও এখন সপ্তদশ বৎসর হইয়াছে, তথাপি এখনও তাহার বালিকাসুলভ চঞ্চলতা যায় নাই;—কিন্তু আর যাহাই করুক, তাহার মন বড়ই সরল এবং"—ধীবরপত্নী একটু বিরক্তির স্বরে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, তুমি ত ভাল বলিবেই। সমস্ত দিন বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া হয় ত তোমার এই সকল দুষ্টামি ভাল লাগে। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে সারা দিন গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকি, এবং পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া যাই, উন্‌ডিনের নিকট ত কোন সাহায্য পাই না, বরং সে আমাকে কেবল বিরক্ত ও জ্বালাতন করে।"

ধীবর হাসিয়া বলিল, "তা যাই করুক, উহার উপর বেশী রাগ করা যায় না।"

সহসা দ্বার খুলিয়া গেল, এবং একটি পরমসুন্দরী বালিকা হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিল, এবং বীণাবিনিন্দিতস্বরে বলিল, "বাবা, তুমি আমার সহিত তামাসা করিতেছ? কোথায় তোমার অতিথি?"

বলিতে বলিতে তাহার চঞ্চল দৃষ্টি যুবক যোদ্ধার উপর পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ নীরব হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বিস্মিতনয়নে অতিথির প্রতি চাহিয়া রহিল! সহসা এই নির্জ্জন স্থানে ধীবরের ক্ষুদ্র কুটীরে এই অপূর্ব্বসুন্দরী বালিকাকে দেখিয়া হুল্ডব্রাণ্ড বিস্মিত হইয়া মুগ্ধ-নয়নে তাহার লাবণ্যপূর্ণ বদনকমল দেখিতে লাগিলেন, এবং ভাবিলেন যে, এখনই বুঝি বালিকা লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইবে!—কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিল। কিছু ক্ষণ স্থিরনয়নে হুল্ডব্রাণ্ডকে নিরীক্ষণ করিয়া বালিকার যেন সাহস হইল। সে ধীরে ধীরে যুবকের নিকটে গিয়া ভূমিতে জানু পাতিয়া বসিয়া তাহার গলদেশের স্বর্ণহার হস্তে লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'তুমি কিরূপে এত দিন পরে আমাদের এই ক্ষুদ্র কুটীরে আসিলে? তুমি কি ঐ ভয়ঙ্কর অরণ্য হইতে আসিয়াছ?" বালিকার কথা শেষ না হইতেই ধীবরপত্নী তাহাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল, বলিল, "যাও, নিজের কাজ করগে।" উন্‌ডিন্ উঠিয়া একখানি ছোট তক্তা টানিয়া যুবকের পদতলে বসিল, এবং তাহার বুনিবার জাল হস্তে লইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মা, আমি এখানে বসিয়াই কাজ করিব।" তৎপরে পুনরায় ধীবর হুল্ডব্রাণ্ডের সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু উন্‌ডিন তাহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমি অতিথিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? কিন্তু এখনও কোনও উত্তর পাই নাই।" অতিথি বলিলেন, "আমি ঐ বনের ভিতর হইতে আসিয়াছি।"

"ঐ ভয়ঙ্কর অরণ্যের মধ্যে কেন প্রবেশ করিয়াছিলে, আর সেখানে কি দেখিলে? শুনিয়াছি, উহার ভিতর অনেক প্রকার অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর বস্তু আছে; তুমি কি কি দেখিয়াছ, তাহা শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। আমাকে সেই সকল বৃত্তান্ত বল।" হুল্‌ডব্রাণ্ড শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার পর বালিকার প্রতি চাহিয়া গম্ভীরস্বরে কি বলিতে আরম্ভ করিতেছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ ধীবর বলিয়া উঠিল, "মহাশয়, আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছেন, রাত্রিও অধিক হইয়াছে, আহারাদিও হয় নাই; এক্ষণে সেই সকল কথা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই।" বৃদ্ধের নিষেধ শুনিয়া উন্‌ডিন্ উঠিয়া দ্রুতপদে বৃদ্ধের সম্মুখে গিয়া বলিল, "কেন বাবা? বলিতেই হইবে। যখন আমার ইচ্ছা, তখন নিশ্চয় বলিবে! দেখি কে বাধা দেয়!"

অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বালিকা এই কথাগুলি বলিল, কিন্তু তাহার সুন্দর মুখের কোনও বিকৃতি হইল না। তাহার হাসি ও চঞ্চলতা দেখিয়া যুবক যেমন মোহিত হইয়াছিলেন, তাহার এই উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তেমনই মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ধীবর উন্‌ডিনকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিল। তখন উন্‌ডিন্ বলিল, "আমার শুনিতে এত ইচ্ছা, আর তুমি আমাকে শুনিতে দিবে না? আচ্ছা, তোমরা তোমাদের অন্ধকার ছোট কুটীরে একা থাকো।"

এই বলিয়া বালিকা বিদ্যুৎবেগে বাহিরে চলিয়া গেল, এবং ঝড় বৃষ্টি ও অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হইল। অন্ধকার রাত্রে তাহাকে সহসা চলিয়া যাইতে দেখিয়া ধীবর উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "উন্‌ডিন্! কি করিলে? এই ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টির সময় রাত্রে কোথায় গেলে? এখনই ফিরিয়া আইস।" কিন্তু কেহ উত্তর দিল না। তখন হুল্‌ডব্রাণ্ডের প্রতি চাহিয়া বৃদ্ধ বলিল, "উন্‌ডিন্ বড় দুষ্ট মেয়ে, আরও কয়েকবার এইরূপ করিয়াছে; খুঁজিয়া কোথায়ও পাই নাই, আবার নিজেই ফিরিয়া আসিয়াছে। মহাশয়! এই ঝড়ে ও অন্ধকারে তাহাকে পাওয়া অসম্ভব। ও বড় দুষ্ট; নিকটেই কোথাও আছে, আমরা একটু অপেক্ষা করিয়া দেখি, ঝড় একটু কমিলে খুঁজিতে যাইব।" এই বলিয়া ধীবর নীরব হইল। তৎপরে আবার বলিতে লাগিল,—

"আপনি হয় ত আমাদের পালিতা কন্যা উন্‌ডিনের বিষয় জানিতে কৌতূহলী হইয়াছেন। কিরূপে তাহাকে পাইয়াছি, তাহা আমি আপনাকে বলিতেছি। পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে আমার একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। আমার আর কোনও সন্তান সন্ততি ছিল না। বুড়া বয়সের একমাত্র মেয়েটি আমাদের অত্যন্ত আদরের হইল। যখন বয়স দুই বৎসর, তখন এক দিন আমি সহরে মৎস্য বিক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিলাম। গৃহের নিকটে আসিয়া দেখিলাম, আমার পত্নী উচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কুটীর হইতে দৌড়িয়া আমার দিকে আসিতেছে। আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। আমি বলিয়া উঠিলাম, "দয়াময় ভগবন! কি হইয়াছে? কোথায় মেয়ে? শীঘ্র বল!" আমার পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল, "যাঁহাকে ডাকিলে, তাঁহারই নিকট গিয়াছে।" তাহার পর পত্নীর নিকট শুনিলাম যে, সে হ্রদের ধারে কন্যাটিকে কোলে লইয়া বসিয়াছিল, সহসা শিশু জলের প্রতি চাহিয়া হ্রদে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেল। আমরা কত খুঁজিলাম, কিন্তু আর সেই হৃদয়ের ধনকে ফিরিয়া পাইলাম না। সেইদিন রাত্রে আমরা শোকার্ত্তহৃদয়ে নীরবে কুটীরে বসিয়াছিলাম। সহসা দ্বার খুলিয়া গেল, এবং একটি সুন্দরী বালিকা হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে বহুমূল্য সুন্দর বস্ত্র, কিন্তু তাহার সমস্ত দেহ আর্দ্র; বস্ত্র ও কেশ হইতে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিতেছে। কিছুক্ষণ বিস্মিত

ও নির্ব্বাক ভাবে আমরা তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর আমি বলিলাম, এইমাত্র আমাদের প্রাণাধিক সন্তানকে হারাইয়াছি; তাই আমাদের সান্ত্বনা করিতে বুঝি দয়াময় এই সুন্দর শিশুকে পাঠাইয়াছেন। সেই দিন অবধি উন্‌ডিন্ আমাদের নিকট রহিয়াছে। কাহার সন্তান, কিরূপে কোথা হইতে আসিল, কিছুই জানিতে পারি নাই। কিন্তু বোধ হয়, বহু দূরে কোন অপরিচিত সুন্দর দেশে বাস করিত। কারণ, সে 'স্ফটিক প্রাসাদ' ও 'প্রবাল মন্দিরের' গল্প করিত। আমি উহার নাম ডরথিয়া ('ভগবানের উপহার') রাখিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু বালিকা তাহাতে কোনও মতে স্বীকৃতা হইল না। সে জেদ করিয়া বলিল, তাহার নাম 'উন্‌ডিন'। আমরা অগত্যা তাহাই রাখিলাম। উন্‌ডিন্ বড় চঞ্চলপ্রকৃতি—" সহসা জলপ্রবাহের শব্দ হইল, এবং অতিবেগে কুটীরের ভিতরে জল বহিয়া আসিল। তখন বৃদ্ধ ধীবর ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"উন্‌ডিন্! উন্‌ডিন্! তুমি এখন কোথায়!" যুবক ও ধীবর দ্রুতপদে বাহিরে গেলেন। তখন ঝড় বৃষ্টি কমিয়াছে, মেঘ সরিয়া গিয়াছে, এবং চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল হইয়াছে। যে ক্ষুদ্র নদী অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া বহিয়া হ্রদে পড়িয়াছে, তাহা স্ফীত হইয়া মাঠ বন সমুদায় প্লাবিত করিয়াছে, এবং সেই জল বেগে কুটীরের চারি দিকে বহিতেছে। দু' জনে দুই দিকে অন্বেষণ করিতে বাহির হইলেন, এবং বার বার নাম ধরিয়া উন্‌ডিন্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে সহসা হুল্ডব্রাণ্ড দেখিলেন যে, জলে বেষ্টিত একটি উচ্চ স্থানে উন্‌ডিন্ একটি বৃক্ষতলে বসিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতেছে! সহসা যুবক জ্যোৎস্নাকিরণে চতুর্দ্দিকে জলপ্রবাহ ও বৃক্ষতলে সেই অপূর্ব্বসুন্দরী বালিকাকে দেখিয়া যেন কোনও স্বপ্নের ন্যায় বোধ করিলেন। হুল্ডব্রাণ্ড জলে সন্তরণ করিয়া তাঁহার নিকট গেলেন। বালিকা তাঁহার গলদেশ বাহু দ্বারা বেষ্টিত করিয়া হুল্ডব্রাণ্ডকে নিকটে বসাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "সুন্দর যোদ্ধা! এখানে বসিয়া তোমার গল্প আমায় বল।" বালিকার এইরূপ ব্যবহারে যুবক যোদ্ধা হতবুদ্ধি ও মোহিত হইয়া তাহাকে স্নেহালিঙ্গন করিলেন। এমন সময় বৃদ্ধ ধীবর সেই স্থানে আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া ক্রোধভরে তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিল, এবং উন্‌ডিন্‌কে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা করিল। যুবক লজ্জিত হইল। কিন্তু বালিকা বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইল না। অবশেষে বৃদ্ধ ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন হুল্ডব্রাণ্ড বালিকাকে বলিলেন "উন্‌ডিন্, বৃদ্ধ পিতার দুঃখ দেখিয়া কি তোমার একটুও মায়া হয় না? এখনই তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাওয়া উচিত।" ইহা শুনিয়া বালিকা বিস্ময়পূর্ণ বড় বড় নয়ন দুইটি তাহার দিকে ফিরাইয়া চিন্তিতভাবে বলিল, "তুমি যদি তাহা মনে কর, তবে অবশ্য যাওয়া উচিত; কিন্তু বাড়ী গিয়া আমাকে নিশ্চয় গল্প বলিতে হইবে।"

তৎপরে সকলে গৃহে ফিরিল। তখন রাত্রি অবসিতপ্রায়। গৃহে ফিরিয়া উন্‌ডিনের অনুরোধে হুল্ডব্রাণ্ড তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।—"ঐ অরণ্যের অপর পারে—নগরে সাত আট দিন হইল অস্ত্রোৎসব হইয়াছিল। তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। উৎসবে এক দিন এক সুন্দরী কুমারীকে দেখিলাম। শুনিলাম যে, তিনি নগরের এক জন ধনী সম্রান্তের পালিতা কন্যা। উৎসবের নৃত্যে আমি তাহার সহিত তিন দিন নৃত্য করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাকে প্রথম দিন যত সুন্দরী মনে করিয়াছিলাম, পরে দেখিলাম, তাহা নয়। তথাপি সে আমার উপর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসন্ন বলিয়া আমিও তাহার নিকট সর্ব্বদা থাকিতাম। অন্যান্য যোদ্ধারা যেমন তাহাদের প্রণয়িনীর নিকট হইতে কোনও প্রণয়োপহার চাহিয়া রাখিত, আমিও সেইরূপ একদিন উপহার চাহিলাম। কিন্তু বারটাল্ডা বলিল 'তুমি যখন ঐ মায়াকাননে প্রবেশপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া

ফিরিয়া আসিবে, তখন উপহার পাইবে।' তাহার উপহার পাইবার নিমিত্ত আমি বিশেষ উৎসুক ছিলাম না; কিন্তু তাহার কথা না রাখিলে আমার কাপুরুষতা প্রকাশ পায়, এই নিমিত্ত আমি কল্য প্রাতঃকালে অশ্বারোহণ করিয়া অরণ্য পার হইব স্থির করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলাম।"

অরণ্যগর্ভে যুবক যে সকল বিভীষিকা দেখিয়াছিলেন, সে সকলের বর্ণনা করিয়া পরে তিনি বলিলেন, "শেষে আমি এই কুটীরে আসিয়াছি।" ধীবর বলিল, "ভগবানের কৃপায় আপনি বনের ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এখন আপনি নির্ব্বিঘ্নে গৃহে ফিরিতে পারিলেই আনন্দ।" উন্‌ডিন্ সহসা হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল। হুল্‌ডব্রাণ্ড বালিকার প্রতি চাহিয়া বলিলেন; "আমি আসিয়াছি বলিয়া তুমি এত আহ্লাদ প্রকাশ করিলে, আবার এখন যাইব শুনিয়া আনন্দে হাসিতেছ কেন?" "কেন হাসিতেছি, জান? তুমি এখন এ স্থান হইতে যাইতে পারিবে না। নদী ও হ্রদের অবস্থা দেখিতেছ না? আমি উহাদের বেশ চিনি। এখন তোমার যাওয়া অসম্ভব।"

ইহা শুনিয়া যুবক ও ধীবর বাহিরে গেল; এবং দেখিল, বালিকার কথা সত্য। চতুর্দ্দিকে জলরাশি, ছোট কুটীরখানি যেন দ্বীপের ন্যায় উপরে ভাসিতেছে।

২

হ্রদ ও নদীর জল যেন কোনও ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে সহসা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যুবক দেখিলেন, শীঘ্র এই স্থান হইতে বহির্গত হইবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু তিনি সে জন্য দুঃখিত হইলেন না। অত্যন্ত সুখে ও আনন্দে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। হুল্‌ডব্রাণ্ড সমস্ত দিন তীর ও ধনুক লইয়া বেড়াইতেন, এবং জলচর পক্ষী বা অন্য কোনও শিকারের চেষ্টায় থাকিতেন। যে দিন কোন মৃত পক্ষী লইয়া ফিরিতেন, উন্‌ডিন্ তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া বলিত, "এইরূপে অসহায় জীবের প্রাণহরণ করা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা।" বালিকা মৃত পক্ষীকে বক্ষে লইয়া অশ্রু ফেলিত। আবার যে দিন যুবক শূন্যহস্তে ফিরিতেন, সে দিন বালিকা তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া বলিত যে, "তোমার অনবধানতার জন্য রাত্রে মাংসের অভাবে কেবল মৎস্য আহার করিয়া থাকিতে হইবে।" কিন্তু বালিকার এইরূপ বিপরীত ভাব ও সময়ে সময়ে এরূপ স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া হুল্‌ডব্রাণ্ড কিছুমাত্র বিরক্ত হইতেন না! তাহার সরল হাসি, করুণ অশ্রু ও মধুর বচনে নবীন অতিথি বিমুগ্ধ হইতেন।

এই রূপে যুবক ধীবরের কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। এই নির্জ্জন স্থানে সরলা বালিকার সহবাসে পবিত্র সুখ ও আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে হুল্‌ডব্রাণ্ড উন্‌ডিনের অত্যন্ত অনুরাগী হইলেন। তিনি সরলা, সুন্দরী বালিকার লাবণ্যময় মুখ না দেখিলে যেন সমস্তই অন্ধকার দেখিতেন। এই শান্তিময় সরল সুখময় আনন্দে কেবল একটি কারণে যুবক বড়ই ব্যথিত হইতেন। উন্‌ডিন সারা দিন ধীবর পত্নীকে বিরক্ত করিত, এবং এই জন্য সর্ব্বদা তিরস্কৃত হইত। হুল্‌ডব্রাণ্ড জানিতেন যে, বালিকারই দোষ, তথাপি চঞ্চলপ্রকৃতি সরলা বালিকাকে এইরূপ তিরস্কৃত হইতে দেখিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন।

এক দিন সন্ধ্যাকালে কুটীরবাসিগণ সম্মুখের ছোট গৃহে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। সহসা বাহির হইতে কে দ্বারে করাঘাত করিল। চতুর্দ্দিক জলে প্লাবিত, এ স্থানে মনুষ্য আসিবার কোন পথ নাই, কেবল নিকটে ভীষণ অরণ্য। সহসা দ্বারে করাঘাত শ্রবণ করিয়া সকলে ভীত ও চমকিত হইল। হুল্‌ড ব্রাণ্ড এক লম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তরবারি

ধরিলেন, কিন্তু উন্‌ডিন দ্রুতপদে দ্বারের নিকটে গিয়া উচ্চস্বরে বলিল, "মর্ত্ত্যের প্রেতাত্মা, তোমার যদি মন্দ অভিসন্ধি থাকে, কুহেলবর্ণ তোমাকে যথোচিত শিক্ষা দিবে।" বালিকার এই অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া সকলে অধিকতর ভীত হইল, এবং বিস্মিতনয়নে সকলে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। বাহির হইতে উত্তর হইল, "আমি প্রেতাত্মা নই, কিন্তু আমার এই নরদেহে ভগবানের সেই স্বর্গীয় আত্মার এক পরমাণু অবস্থান করে। তোমরা কে এই কুটীরে? যদি ভগবানে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে দ্বার খুলিয়া আমাকে আশ্রয় দাও।" অপরিচিত ব্যক্তির কথা সমাপ্ত না হইতেই বালিকা দ্বার খুলিয়া দিল, এবং এক জন বৃদ্ধ পুরোহিত কুটীরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু উন্‌ডিনকে দেখিবামাত্র বিস্মিতনয়নে দ্বারদেশে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা এই নির্জন স্থানে সামান্য দরিদ্রের কুটীরে বালিকার অসামান্য অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া যেন অপার্থিব মনে হইল। তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া তাহার প্রতি গম্ভীরভাবে চাহিয়া বলিলেন, "ভগবানের নাম কর।"

বালিকা তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঠাকুর, আমি প্রেতাত্মা বা অমানুষিক কিছু নহি। দেখুন, আমি ভগবানের নামে কিছুমাত্র ভয় পাই-তেছি না, আমিও ভগবানে বিশ্বাস করি। ঠাকুর, গৃহে আসুন, এখানে আপনার কোন ভয় নাই।"

বৃদ্ধ পুরোহিত গৃহের মধ্যে অগ্রসর হইলেন। ধীবর ও ধীবরপত্নী তাঁহাকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিল। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র আর্দ্র দেখিয়া তাহারা অতি যত্নে তাঁহাকে শুষ্ক বস্ত্র দিল, এবং আহার করাইয়া বিশ্রামের স্থান দিল। কিছু ক্ষণ বিশ্রাম ও ক্লান্তি দূর করিয়া পুরোহিত তাঁহার পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন যে, অরণ্যের অপর পারে নগরে বাস করেন। প্রাতঃকালে একটি ক্ষুদ্র নৌকায় উঠিয়া নদী পার হইতেছিলেন। সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিক-শক্তি-বলে নদী-জলে ভয়ঙ্কর স্রোত ও তরঙ্গ উঠিল। বৃদ্ধ মাঝি দুই জন সামলাইতে পারিল না, নৌকা ডুবিয়া গেল, তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। চেতনা হইবার পর সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, এক ক্ষুদ্র কুটীরের নিকট বৃক্ষতলে পড়িয়া আছেন। তাহার পর পুরোহিত বলিলেন, "আমি ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি যে, তোমাদের নিকট আসিয়াছি; কিন্তু কিরূপে যে গৃহে ফিরিয়া যাইব, তাহা জানি না। কারণ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর এই জলপ্লাবন দেখিয়া মনে হইতেছে যে, শীঘ্র এই স্থান হইতে বহির্গত হইবার সম্ভাবনা নাই।"

পুরোহিতের এই কথা শুনিয়া উন্‌ডিন উঠিয়া হুল্ডব্রাণ্ডের নিকট গিয়া বসিল, এবং যুবকের স্কন্ধে তাহার ক্ষুদ্র সুন্দর মস্তক রাখিয়া মৃদুমধুরস্বরে "বলিল, "তবে তুমি আমাদের ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না, এখানেই থাকিতে হইবে, আর যাইতে পারিবে না।"

যুবক বালিকার এই সরল স্নেহপূর্ণ বাক্যের কোনও উত্তর দিলেন না। নানা চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইতেছিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, যথার্থই বুঝি আর নগরে ফিরিতে পারিবেন না। এই নির্জন সুন্দর শান্তিপূর্ণ স্থানে চিরজীবন কাটাইতে হইবে। তিনি বালিকার অবনত মস্তকের প্রতি চাহিলেন। তাহার অপার্থিব অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের প্রতি অতৃপ্তনয়নে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার হৃদয়ে গভীর মধুর পবিত্র প্রেম জাগিয়া উঠিল—পুরোহিত সম্মুখে! এই সময় ধীবরপত্নী উন্‌ডিনের প্রতি চাহিয়া যুবকের স্কন্ধে মস্তক রাখিতে দেখিয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া উঠিল। যুবকের চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হইল। বৃদ্ধার তিরস্কার তাঁহার

বাগ্‌দত্তা পত্নী ; ঠাকুর, যদি উহার পিতা মাতার কোন আপত্তি না থাকে, অদ্য রাত্রেই আমাদের দু' জনকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করুন।"

উন্‌ডিন ও হুল্‌ড্‌ব্রাণ্ডের ভালবাসা দেখিয়া ধীবর ও তাহার পত্নী ইহাই আশা করিয়াছিল। কিন্তু সহসা যোদ্ধার মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া তাহারা চমকিত হইল। হুল্‌ড্‌ব্রাণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়া বালিকার মুখে এক নূতন ভাব দেখা দিল। উনডিন্ নীরবে মস্তক নত করিল। পুরোহিত ধীবরের নিকট বালিকার ও যুবকের সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, ধীবর ও ধীবরপত্নীর কোন আপত্তি না থাকিলে তিনি সেই রাত্রেই উনডিন্ ও হুল্‌ড্‌ব্রাণ্ডের বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন। বৃদ্ধ ও তাহার পত্নী আহ্লাদের সহিত অনুমতি দিল, এবং বিবাহের সমুদায় আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুরোহিত দুইটি অঙ্গুরীয় চাহিলেন। তখন উনডিন্ "আমার কাছে আছে" বলিয়া দ্রুতপদে অপর কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং দুইটি বহুমূল্য অঙ্গুরীয় লইয়া আসিল। ধীবর ও তাহার পত্নী বিস্মিতনয়নে চাহিয়া রহিল। তাহারা পূর্ব্বে কখনও এই অঙ্গুরীয় দুইটি দেখে নাই। তখন বালিকা বলিল, "যখন তোমাদের নিকট আসিতেছিলাম, আমার পিতা এই দুইটি আমার বস্ত্রে বাঁধিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন; বিবাহ স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা অতি গোপনে রাখিয়া দিবে। তোমাদের কুটীরে আসিবার পর যখন তোমরা আমার বস্ত্র খুলিয়া ফেল, আমি পিতার আজ্ঞা মত উহা গোপনে রাখিয়া দিয়াছিলাম।" উনডিনের এই নূতন কথা শুনিয়া তাহারা দু' জন তাহাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু পুরোহিত ঠাকুর তাহাদের কথায় বাধা দিয়া সকলকে বিবাহ কার্য্যের জন্ম প্রস্তুত হইতে বলিলেন।

বিবাহ হইয়া গেল। উন্‌ডিন কম্পিতদেহে সলজ্জভাবে অবনতমস্তকে স্বামীর পার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। পুরোহিত বলিলেন, "এ স্থানে আর কোন মনুষ্য বাস করে না ; কিন্তু বিবাহের সময় জানালার মধ্য দিয়া দেখিলাম, এক জন দীর্ঘকায়, শ্বেতবস্ত্রপরিহিত বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া বিবাহ কার্য্য দেখিতেছিলেন বোধ হয়, সেই ব্যক্তি এখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।"

ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অত্যন্ত ভীত হইল, এবং হুল্‌ড্‌ব্রাণ্ড চমকিয়া উঠিয়া তাহার তরবারি অর্দ্ধনিষ্কোষিত করিয়া দ্রুতপদে জানালার নিকটে গিয়া বাহিরে চাহিল। দেখিল, বহু দূরে এক শ্বেত মনুষ্যমূর্ত্তি ধীরে ধীরে অরণ্যের নিবিড় বৃক্ষরাজির মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে। এই মূর্ত্তি অপরিচিত নহে; কারণ, তিনি অরণ্যে ভ্রমণকালে উহা দেখিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে ও বিবাহ সম্পন্ন হইবার পর কিছু ক্ষণ উন্‌ডিন্ নীরব ও শান্ত ছিল। কিন্তু সহসা তাহার পূর্ব্ব চঞ্চলতা দেখা দিল; সে নানা রকম দুষ্টামি করিয়া সকলকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে বৃদ্ধ পুরোহিতকেও বিরক্ত করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া হুল্‌ড্‌ব্রাণ্ড একটু বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বালিকা তাহা গ্রাহ্য করিল না। তাহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া পুরোহিত তাহার প্রতি স্থিরনয়নে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বৎসে, তোমার সুন্দর সরল মুখ দেখিলে সকলেরই হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়; কিন্তু তুমি এখন আর এক জনের সহিত পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে; দেখিও, যাহার জীবনের সঙ্গিনী হইলে, যাহার হৃদয়ের সহিত এক হইলে, তাহার সহিত যেন আত্মায় আত্মায় মিলিত হইবার চেষ্টা কর, নচেৎ সুখী হইবে না।"

উনডিন্ নীরবে পুরোহিতের বাক্য শুনিতেছিল, সহসা হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "আত্মা! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অবশ্য উচিত কথাই হইবে; কিন্তু যাহার আত্মা নাই, সে কিরূপে আত্মার উন্নতি করিবে?"

বালিকা বিদ্রূপ করিতেছে মনে করিয়া পুরোহিত বিরক্ত হইয়া নীরবে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কিন্তু বালিকা দ্রুতপদে তাঁহার নিকট গিয়া অতি কাতর মৃদু স্বরে বলিল,

"ঠাকুর, আমার উপর রাগ করিবেন না। আমার কথা আগে শ্রবণ করুন, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য।"

ক্ষণকাল নীরব হইয়া উন্‌ডিন আগ্রহের সহিত কি বলিতে আরম্ভ করিতেছিল, সহসা কি কারণে তাহার বাক্য রুদ্ধ হইল। শিহরিয়া বালিকা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

উনডিনের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শুনিয়া ও তাহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলে ভীত ও উদ্বিগ্নচিত্তে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

কিছু ক্ষণ পরে অশ্রুসংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে নয়ন মুছিয়া বালিকা পুরোহিতের প্রতি চাহিয়া ব্যগ্রতাপূর্ণ গম্ভীরস্বরে বলিল,

"আত্মা—আত্মা বোধ হয় কোন সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর পদার্থ হইবে। ঠাকুর, মনুষ্যদেহে এই অজ্ঞাত আত্মা না থাকিলে কি ভাল হইত না?"

সেই ক্ষুদ্র গৃহে যাহারা ছিল, তাহারা সকলে ভীত ও বিস্মিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু উন্‌ডিন কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পুরোহিতের মুখের দিকে স্থিরনয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার বদনে তীব্র ঔৎসুক্যপূর্ণ কৌতূহল প্রতিফলিত হইল। উন্‌ডিন পুনরায় বলিল,

"আত্মার ভার বহন করা বোধ হয় অত্যন্ত কঠিন। কি ভীষণ ভার! এখনই তাহার আগমন-আশঙ্কায় আমার হৃদয় এক অজ্ঞাত, অপূর্ব্ব মর্ম্মান্তিক বেদনায় অভিভূত হইতেছে। এত দিন আমার হৃদয়ে কোনরূপ চিন্তা বা দুঃখ ছিল না, বড় সুখে ও আনন্দে জীবন কাটিয়াছে।" এই বলিয়া উন্‌ডিন পুনরায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ পুরোহিত চিন্তিতহৃদয়ে স্থিরনয়নে বালিকার প্রতি চাহিয়া গম্ভীরস্বরে তাহাকে ভগবানের নাম লইতে আজ্ঞা করিলেন। বালিকা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে জানু পাতিয়া করযোড়ে অবিচলিত গম্ভীরস্বরে ভক্তিভাবে পুরোহিতের সহিত বারবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করিল।

তখন পুরোহিত হুল্ডব্রাণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি চিন্তা করিও না। এই বালিকার মধ্যে কুলক্ষণ বা বা অশুভ চিহ্ন দেখিতে পাই না। কিন্তু আমাদের অজ্ঞাত, গুপ্ত ও বিস্ময়াবহ কিছু আছে, আমরা এখনও তাহা জানিতে পারি নাই। তুমি এই সরলা পবিত্রহৃদয়া বালিকাকে ঈশ্বরসমক্ষে বিবাহ করিয়াছ; উহাকে চিরকাল আদর, যত্ন করিও, সুশিক্ষা দিও; সুখী হইবে।"

নব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া পুরোহিত শয়ন করিতে গেলেন।

পুরোহিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া ও বালিকার অপার্থিব সৌন্দর্য্য দেখিয়া হুল্ডব্রাণ্ডের সকল সন্দেহ ও ভয় দূর হইল। সুখে ও আনন্দে বিবাহরাত্রি কাটিয়া গেল।

পর দিন প্রভাতে হুল্ডব্রাণ্ডের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া, সকলের হৃদয়ে যে এক আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বিদূরিত হইল, এবং উন্‌ডিনের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলে বিমুগ্ধ হইল। তাহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখকমল প্রেমে কোমল ও প্রতিভাদীপ্তিপ্রদীপ্ত হইয়া এক নূতন সৌন্দর্য্যে বিভাবিত হইয়াছে; তাহার নির্ম্মল পবিত্র আত্মা নয়নে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। তাহার বালিকামূর্ত্তি সলজ্জ গম্ভীর ভাবে প্রস্ফুটিত। পুরোহিতের

নিকট গিয়া বালিকা জানু পাতিয়া বিনীতস্বরে পূর্ব্বকৃত ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাহিল, এবং তাহার আত্মার উন্নতির জন্য ভগবানের নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে বারবার অনুরোধ করিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বার বার বলিতে লাগিল, "তোমরা কত যত্নে কত আদরে সন্তানের ন্যায় আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ, তাহা এত দিনে বুঝিলাম। সেই স্নেহের কিছু প্রতিদান করি নাই, বরং কত বিরক্ত করিয়াছি, কত ক্লেশ দিয়াছি। হায়! এখন কি রূপে তোমাদের ছাড়িয়া যাইব?" সমস্ত দিন উন্‌ডিন্‌ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত তাহার মাতাকে গৃহকর্ম্মে যথাসাধ্য সাহায্য করিল। সহসা সন্ধ্যাকালে উনডিনের আর এক নূতন পরিবর্ত্তন হইল। তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ ও উজ্জ্বল হাস্যময় মুখকমল বিষাদের ছায়াপাতে মলিন হইল, এবং বালিকা নীরবে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।

অবশেষে হুল্ডব্রাণ্ডকে ডাকিয়া কুটীরের কিয়ৎ দূরে লইয়া গিয়া বলিল, "দেখ, জল একেবারে সরিয়া গিয়াছে, নদী কেমন শান্তভাবে বহিয়া যাইতেছে। তুমি এখন অক্লেশে এই স্থান হইতে যাত্রা করিতে পারিবে।"

হুল্ডব্রাণ্ড সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল যে, যথার্থই এক রাত্রেই সহসা জল সরিয়া গিয়াছে, এবং জলপ্লাবনের চিহ্নমাত্রও নাই। যুবক আনন্দে ও প্রেমপূর্ণনয়নে বালিকার প্রতি চাহিয়া সস্নেহে বলিল, "উন্‌ডিন্‌! এখন ত আর একা যাইব না। তুমিও যাইবে।"

কিন্তু উন্‌ডিন্‌ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুকম্পিতস্বরে বলিল, "স্বামিন্‌, তাহা তুমি এখনই স্থির করিবে। নদীর মধ্যে ঐ ছোট নির্জন দ্বীপের উপর চল। সেখানে তোমাকে সমুদায় বলিব! আমার কথা শুনিয়া যদি তুমি আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, ঐ শীতল নদীবক্ষে আশ্রয় লইব।"

এ বলিয়া উন্‌ডিন্‌ হুল্ডব্রাণ্ডকে লইয়া ধীরে ধীরে সেই স্থানে গিয়া দ্বীপের শ্যামল ঘাসের উপর বসিল, এবং তাহাকে বলিল, "তুমি আমার সম্মুখে বস, আমি তোমার নয়নে আমার অদৃষ্ট জানিয়া লইব। আমি যাহা বলিব, তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উন্‌ডিন্‌ গম্ভীরস্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—"তুমি হয় ত জান যে, জগতে অনেক প্রকার প্রাণী আছে,—যাহারা সচরাচর মনুষ্যের দৃষ্টির অগোচর। তাহারা পঞ্চভূতে সৃষ্ট, এবং পঞ্চভূতে লয় পায়। তাহাদের আকৃতি মনুষ্যের ন্যায়। কিন্তু ইহাদের সর্ব্বদা কেহ দেখিতে পায় না। অগ্নির উজ্জ্বল শিখায় এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী আনন্দে ক্রীড়া করে, এবং জ্যোতিঃ বিস্তার করে। মৃত্তিকার মধ্যে পৃথিবীর গর্ভে দুষ্ট ক্ষুদ্র প্রাণিগণ বাস করে, এবং নির্ম্মল বায়ুতে প্রাণিগণ সুখে ভ্রমণ করে, শীতল জলে বহুবিধ জলপ্রাণী সুখে ও আনন্দে বাস করে। গভীর সাগরতলে স্ফটিকের মধ্য দিয়া চন্দ্র-সূর্য্য-কিরণ নিম্নে প্রবেশ করিয়া সেই সুন্দর পুরী আলোকিত করে। প্রবাল-বৃক্ষ সকল উচ্চে উঠিয়া কত বর্ণের ফল ও ফুল ধারণ করে। এই সৌন্দর্য্যের রাজ্যে জলপ্রাণিগণ আনন্দে বাস করে; শঙ্খের উপর বেড়ায়। এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি সাগরজলে ও নদীজলে আচ্ছাদিত থাকে। যাহারা এই জলরাজ্যে বাস করে, তাহাদের আকৃতি মনুষ্যমূর্ত্তির ন্যায়, কিন্তু অধিকতর সুন্দর। কখনও কোনও জলবালিকা খেলা করিতে করিতে সাগরবক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছে, এবং মনুষ্যের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া তাহাদিগকে বিমুগ্ধ ও বিস্ময়াপন্ন করিয়াছে। তুমি উন্‌ডিন্‌দিগের নাম শুনিয়া থাকিবে—কিন্তু আর অধিক বলিবার কি প্রয়োজন? স্বামিন্‌; তোমার সম্মুখে এক জন 'উন্‌ডিন্‌' দেখিতেছ?"

ফেলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "কিন্তু যদিও আমাদের আকৃতি মনুষ্যের ন্যায়, তথাপি আমরা মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতাম। কিন্তু হায়! আমাদের একটি মহা অভাব, একটি দুঃখের কারণ আছে। আমাদের আত্মা নাই। মৃত্যুর পর আমাদের আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। আমরা যে ভূতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতেই বিলীন হইয়া যাই—আমাদের আর চিহ্নমাত্র থাকে না। মনুষ্য মৃত্যুর পর পবিত্র, অমর, অনন্ত অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু হায়! আমরা তাহাতে বঞ্চিত। আমরা ভৌতিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হই। এবং যত দিন জীবিত থাকি, সেই শক্তি আমাদের আজ্ঞার অধীন থাকে। কিন্তু মৃত্যু হইলে সেই জল, বায়ু, মৃত্তিকা, অগ্নির মধ্যে আমরা বিলীন হইয়া যাই। সুতরাং আমাদের কোন চিন্তা কোন দুঃখ নাই, আমরা আনন্দে ও সুখে জীবন কাটাই। কিন্তু আশা অনন্ত; তাই জগতের যাবতীয় জীব আপন আপন অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থা পাইবার অভিলাষী। 'আত্মা' পাওয়া আমাদের নিতান্ত অসম্ভব বা অসাধ্য নহে। কথিত আছে, কোন জলপ্রাণী যদি মনুষ্যের সহিত বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হয়, তাহা হইলে সে আত্মা লাভ করিতে পারে। আমার পিতা এক জন অত্যন্ত প্রতিভাশালী জলরাজ। আমি তাঁহার একমাত্র অতি আদরের সন্তান। পিতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইল যে তাঁহার কন্যা আত্মা লাভ করে! যদিও এই বাসনা পূর্ণ হইলে আমাকে মনুষ্যের ন্যায় শোক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তথাপি তিনি এই ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন না, এবং যাহাতে উহা সফল হয়, তাহারই চেষ্টা করিলেন। স্বামিন্, এত দিনে পিতার সেই বাসনা পূর্ণ হইল, এত দিনে আমি 'আত্মা' লাভ করিয়াছি। যদি তুমি আমাকে ত্যাগ কর, তাহা হইলে আমার কি হইবে, তাহা ভাবিলেও আমি আত্মহারা হই। কিন্তু নাথ, তোমাকে আমি কিছু বলিব না। তুমি স্বেচ্ছায় স্থির কর। যদি আমাকে চলিয়া যাইতে আজ্ঞা কর, আমি এখনই এই নদীজলে প্রবেশ করিব। আমার পিতৃব্য এই নদীতে বাস করেন, তিনি আদর করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবেন। যখন ক্ষুদ্র আত্ম-বিহীন জলবালা ছিলাম, তখন তিনিই আমাকে পিতার আজ্ঞামত বৃদ্ধ ধীবরের নিকট দিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে আত্মায় বিভূষিতা হইয়া প্রেম ও সহিষ্ণুতায় পূর্ণ রমণী-হৃদয় লইয়া গৃহে পিতা মাতার নিকট চিরজন্মের মত ফিরিয়া যাইব।"

হল্‌ডব্রাণ্ড বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া উন্‌ডিনের এই সকল অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। তাহার শেষ কথায় হৃদয় বিগলিত হইল। সেই পবিত্র নির্ম্মল অতুলনীয় সৌন্দর্য্য, সেই গম্ভীর বালিকামূর্ত্তি, তাহার নয়নে সেই পবিত্র স্বর্গীয় নবপ্রাপ্ত পুণ্য আত্মার বিমল আলোক দেখিয়া হল্‌ডব্রাণ্ডের সকল সন্দেহ, সকল আশঙ্কা দূর হইল। তিনি আত্মহারা হইয়া উন্‌ডিন্‌কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তৎক্ষণাৎ বারবার শপথ করিলেন, "ইহজন্মে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।"

* * *

হল্‌ডব্রাণ্ড জলকন্যাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। গৃহে কিছু দিন সুখে কাটিল। কিন্তু হায়! তাহার পর সে প্রবল প্রেমে অবসাদ আসিল। হল্‌ডব্রাণ্ড আবার বারটাণ্ডার মায়াপাশে পড়িলেন। অনাদৃতা উন্‌ডিন্ নীরবে সব সহ্য করিত, কেবল স্বামীকে বলিত, "সলিলবিহার-কালে আমাকে কোনও কুবাক্য কহিও না, বিপন্ন হইবে।" সে স্বামীর গৃহে একটি প্রস্রবণের মুখ প্রস্তর দিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখিল। একদিন তাহার নিষেধ ভুলিয়া হল্‌ডব্রাণ্ড তরীবিহারকালে উন্‌ডিনকে কুবাক্য কহিল। জলরাশি প্রলয়গর্জ্জনে বিলোড়িত হইয়া উঠিল। উন্‌ডিন্ অদৃশ্য হইয়া গেল! হল্‌ডব্রাণ্ড বহুকষ্টে উদ্ধার পাইলেন। সমারোহে হল্‌ডব্রাণ্ডের সহিত বারটাণ্ডার বিবাহ স্থির হইল। বিবাহনিশায় সেই রুদ্ধ নির্ঝরমুখ প্রস্তর-

মুক্ত হইল। সেই মুক্ত নির্ঝরধারাপ্রবাহে উদ্ভিদ্ আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অঙ্গে শ্বেত বাস, আননে বিষাদ। বিরহিণী পতিকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। শেষে গতজীবন হল্‌ভ্রাণ্ডের দেহ রক্ষা করিয়া আবার নির্ঝরপথে তিরোহিত হইয়া গেল।

শ্রীস্নেহলতা সেন।

হিমারণ্য।

৫

এই পুরস্কারে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এই পথটি এত দুর্গম যে, পথের চিহ্নমাত্রও নাই। বরফ ভাঙ্গিয়া লোক গিয়াছে; তাহাদের পদচিহ্নমাত্র আছে, সেই পদচিহ্নের অনুসরণে আমরা চলিতেছি। বৃহৎ ও খণ্ড খণ্ড প্রস্তর, তাহার উপর নূতন বরফ পড়িয়া পিচ্ছিল হইয়াছে। এক প্রস্তর হইতে অপর প্রস্তরে লম্ফ প্রদান করিয়া চলিতেছি। একটু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলেই সর্ব্বনাশ! দুই হস্তে দুই লাঠি। এই দুই লাঠির উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তর সকল অতিক্রম করিতেছি। এইরূপ ভাবে অনুমান তিন মাইল যাইয়া দেখি, খুব উচ্চ একটি প্রস্তর। প্রস্তরটি নানাবিধ বর্ণের নিশান দ্বারায় অলঙ্কৃত। এই দেশীয় লোকেরা এই প্রস্তরকে বন্য জন্তুর শৃঙ্গ ও দন্ত দ্বারা সাজাইয়া রাখিয়াছে। এই প্রস্তরখণ্ডটি দোলমা অর্থাৎ শক্তিমূর্ত্তি বলিয়া পূজিত। মহাত্মা জিপচুণ এই প্রস্তরখণ্ডেই শক্তিমূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছিলেন। আমি এই প্রস্তরখণ্ডের সমীপে উপস্থিত হইলাম; প্রদক্ষিণ করিয়া পূজা করিলাম। মনের আনন্দে কৈলাসপতির কৃপায় শরীর ভুলিয়া গিয়াছি, এমন আত্মহারা হইলাম। মন প্রাণ কৈলাসপতির শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম। বাহ্য-জ্ঞান রহিত হইল, কৈলাসপতির কৃপাও বুঝিতে পারিলাম। এ স্থানে কত ক্ষণ ছিলাম, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তাহার পর সঙ্গীদের তাড়নায় আবার চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর চলিয়া নিম্নে দেখিলাম,—গৌরীকুণ্ড। গৌরীকুণ্ড একটি হ্রদ। জলভাগ ও স্থলভাগ উভয়ই বরফ দ্বারা আবৃত, কেবল কুণ্ডের পশ্চিম দিকে দশ বার হাত নীল জল দৃষ্টিগোচর হইল। কুণ্ডটির পরিধি ২।৩ মাইলের কম হইবে না। কুণ্ডের পশ্চিম তীর হইতে জলভাগকে আলিঙ্গন করিয়া একটি লিঙ্গবৎ শৃঙ্গ ঊর্দ্ধ দিকে উঠিয়াছে। এই

শৃঙ্গের বামে দক্ষিণে অনেকগুলি শৃঙ্গ ভেদ করিয়া কৈলাসের উচ্চশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত শৃঙ্গগুলি বরফে আবৃত। এই বরফ কখনও গলে না, চিরস্থায়ী। আমি ধীরে ধীরে কুণ্ডের তীরে নামিলাম। অঙ্গবস্ত্র খুলিয়া ফেলিলাম। যষ্টি দ্বারা বরফ ভাঙ্গিয়া কুণ্ডে স্নান করিলাম। "ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম" এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়া স্নান শেষ করিলাম। সঙ্গীরা শুষ্ক বস্ত্রে আমার শরীর মুছাইয়া দিলেন; কারণ, আমি অসাড় হইয়া গিয়াছিলাম। গা মুছিবার বা বস্ত্র পরিধান করিবার শক্তি ছিল না। এই স্থান সমুদ্র-সমতল হইতে ২২০২৮ফিট উচ্চ। ঊর্দ্ধে যে প্রস্তরখণ্ডের কথা লিখিয়াছি, তথা হইতে গৌরীকুণ্ড অনেক নীচে। ঊর্দ্ধ হইতে গৌরীকুণ্ড পাতাল বলিয়া বোধ হয়। রাস্তাও দুই মাইলের কম নহে। গৌরীকুণ্ডের তীরে প্রকাণ্ড প্রস্তর। এই প্রস্তরের উপর দিয়া চলা বড়ই ক্লেশকর। গৌরীকুণ্ডের তীরে একটা গুহা আছে। উহাতে তিন চার জন লোক বাস করিতে পারে, কিন্তু অগ্নি ব্যতীত এখানে টিকিবার উপায় নাই। আমাদের সঙ্গে কাঠ ছিল না; সুতরাং গৌরীকুণ্ডে আমাদের থাকা হইল না। এই দেশের প্রথা যে, গৌরীকুণ্ডে স্নান করিয়া কিছু আহার করা চাই। আমাদের সঙ্গে আহারীয় ছিল। আমরা এখানে কিছু আহার করিলাম। আহার করিয়া আমার কাঠের বাটিটি ঝুলিতে রাখিতেছি, এমন সময় আমার একমাত্র ভোজনপাত্র কাঠের বাটি গৌরীকুণ্ডের ভিতর পড়িয়া গেল। অনেক অনুসন্ধানেও তাহা পাইলাম না। আমরা গৌরীকুণ্ডে কিছু ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলাম। এই সময় অনবরত ঝড় বৃষ্টি ও বরফপাত হইতেছিল। জীবনের আশা কিছুমাত্র ছিল না; তবে কৈলাস বলিয়া মনের আবেগও ছিল না, কোন রকম চিন্তা বা নিরুৎসাহ ছিল না। এইরূপে নিম্নে অবতরণ করিয়া একটি নদী পাইলাম। নদীও সজলা। নদী দিয়া খরতর স্রোত বহিতেছে। নদীর উভয় তীর তৃণাচ্ছাদিত। গ্রাম্য পথের ন্যায় তীরে পথও আছে। রৌদ্র উঠিয়াছে, শীতও কমিয়াছে। এই রাস্তাতে একেবারে চড়াই নাই; এখন অল্প অল্প উৎরাই। পথ চলিতে আর কষ্ট নাই, তবে মধ্যে মধ্যে নদীর এক পার হইতে পর পারে যাইতে হইতেছে। রাস্তায় বড় লোক জন দেখিলাম না। দারচিনের রাস্তাই আমাদিগকে দারচিন লইয়া যাইতেছে, তবে মধ্যে মধ্যে কৈলাস-পরিক্রমকারী দুই এক জন লামাকে দেখিতে পাইলাম।

তাঁহারা মৌনী হইয়া কৈলাস পরিক্রম করিতেছেন। আর এক জন দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে আমাদিগের বিপরীত দিকে যাইতেছেন। আমরা যে নদীর পার দিয়া যাইতেছি, সেই নদীর উভয় তীরই জলসিক্ত, সুতরাং ভিজিতে ভিজিতে বেলা তিনটার সময় জংলিফু মঠে উপস্থিত হইলাম। দেশবাসীরা কৈলাসকে বড়ই মান্য করে। ইহারা তিন প্রকার পদ্ধতি অনুসারে কৈলাস পরিক্রম করে। কেহ কেহ প্রত্যূষে দারচিন্ পরিত্যাগ করিয়া রাত্রের মধ্যে দারচিনে আসিয়া উপস্থিত হয়। কেহ কেহ প্রত্যেক মঠে এক এক দিন করিয়া বিশ্রাম করিয়া দারচিনে ফিরিয়া আসে। আর যাহারা পরম ভক্ত, তাহারা একবার সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করে; দণ্ডবৎ করিয়া কৈলাস প্রদক্ষিণ করে; তাহাদের বার তের দিনের কম কৈলাস প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হয় না। ইহারা বুকে একটি ভেড়ার ছাল বাঁধে ও সঙ্গে এক জন লোক থাকে। সেই আহারীয় প্রস্তুত করিয়া দেয়; যথায় সন্ধ্যা উপস্থিত হয়, তথায় রাত্রিযাপন করে। আমরা অদ্য সংনিফু মঠে বাসা করিলাম। মঠে স্থান ছিল না; মঠের রন্ধনশালায় আমার স্থান হইল। স্থানটি মন্দ নহে; একটু গরম পাইয়া বেশ আনন্দে দিন কাটাইলাম। সঙ্গে আহারীয় ছিল না, লামাও কৃপা করিলেন না, সুতরাং চা খাইয়া রাত্রি কাটাইতে হইল। এখানকার লামাটি ধর্ম্মের ধার ধরেন না; একটি বিবাহও করিয়াছেন, বাণিজ্য ব্যবসায় লইয়া ব্যতিব্যস্ত। মঠে থাকেন না; মঠের নিম্নে তাম্বু খাটাইয়া সপরিবারে বাস করেন। ব্যবসায় বাণিজ্য ভিন্ন অন্য কথা নাই। ইঁহার নামে লাশাতে অভিযোগ হইয়াছে; শীঘ্রই পদচ্যুত হইবার সম্ভাবনা। ২৭শে আষাঢ় জংলিফুতে আসিলাম। ২৮শে আষাঢ় অনুমান ৮টার সময় দারচিনে ফিরিয়া আসিলাম। দারচিন হইতে কৈলাস পরিক্রম করিয়া দারচিন্ পর্য্যন্ত ৪০ মাইলের কম হইবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দারচিনে আসিলাম বটে, কিন্তু শরীর একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে আসিয়া একান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলাম। উপবাস আমার অভ্যস্ত থাকিলেও হিমালয়ে উপবাস সহ্য হইল না। গত রাত্রি উপবাসী ছিলাম বলিয়া অদ্য আমার এই দুর্দ্দশা। বেলা অনুমান ৮টার সময় দারচিনে পঁহুছিলাম।

দারচিন মঠের প্রধান লামা ও পদচ্যুত লামার নিকট আমার পঁহুছ-সংবাদ গেল ; তাঁহারা আমার আহারীয় পাঠাইয়া দিলেন। অদ্য ২৮শে আষাঢ় এখানে বিশ্রাম করিলাম। দারচিন হইতে মানস সরোবর দুই দিনের পথ। ২৯শে আষাঢ় প্রাতঃকালে দারচিন্ পরিত্যাগ করিলাম। অদ্য অনেকগুলি লোক আমাদের সঙ্গী। এক সঙ্গে ১০।১২ জন লোক দারচিন্ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে চলিতে আরম্ভ করিলাম। অদ্যকার পথ সমভূমি হইলেও বড় জটিল। পশ্চাতে কৈলাস, সম্মুখে রাবণ হ্রদ, পূর্ব্ব দিকে মানস সরোবর, মধ্যে মাঠ ; মাঠের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি। কৈলাস হইতে যত নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, সমস্ত নদীই এই মাঠ ভেদ করিয়া রাবণ হ্রদে পড়িয়াছে, সুতরাং এই মাঠটিকে মাঠ না বলিয়া বিল বলিলেও চলে। একে হিমপ্রধান প্রদেশ, তাহাতে বিল। বিলে জলের অভাব নাই। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী অতিক্রম করিতে হইতেছে, সুতরাং অল্প চলিতেই বস্ত্রাদি ভিজিয়া গেল, পা অসাড় হইয়া উঠিল ; বাতাস প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে ৪।৫ ঘণ্টাতে চারি মাইল পথ আসিলাম। ক্ষুধা পিপাসার ত কথাই নাই। চলৎশক্তির পর্য্যন্ত অভাব হইল। এই মাঠের মধ্যে ভুটিয়াদের একটি ডং ছিল ; সেই ডুংএ অনেকগুলি প্রান্তসীমার ব্যবসায়ী হিন্দু আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাণিজ্য করিতেছিল। আমি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহারা আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া বসিবার আসন ও পানীয় চা দিল। আমি কিছু সুস্থ হইয়া আবার চলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তাহারা আমার ইচ্ছার প্রতি-কূলে বলিল, "আপনি কিছু আহার করুন, এবং আরও দুই এক ঘণ্টা বিশ্রাম করুন ; পরে আমরা আপনার সঙ্গে যাইয়া আপনাকে বরখায় রাখিয়া আসিব।"

বরখা একটি ছোট খাট রাজধানী। বরখার রাজা আজ বরখায় নাই ; তিনি অদ্য কৈলাস প্রদক্ষিণ করিতে গিয়াছেন। এক জন সামান্য কর্ম্মচারীর উপর রাজধানীর তত্ত্বাবধানের ভার। আমি এখানে অনুমান দুই ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে বরখায় পঁহুছিলাম। বরখার রাজাকে বরখাতজ্জুন কহে। রাজধানীটি রাবণ হ্রদের উপকূলে স্থাপিত। চারি দিকেই মাঠ, গাছ পালার নাম গন্ধও নাই। ঘুঁটে ও ছাগলের নাদে কাষ্ঠের কার্য্য হইয়া থাকে। বাড়ী ঘরের মধ্যে অতিথিশালা ও রাজবাটী উল্লেখযোগ্য। রাজবাটী সামান্য, একতালা, দেখিতে অতি কদাকার, ধূমের কালীতে কৃষ্ণবর্ণ, প্রায় চারি দিকেই

ঘুটিয়া ও ছাগলের নাদের স্তূপ। দশ বারটি কুকুর রাজবাটীর প্রহরী; তাহারা বিকট চীৎকার করিয়া দিন রাত্রি পথিকদিগের ত্রাস জন্মাইতেছে। সেই দিক দিয়া অপরিচিত লোকের যাতায়াতের উপায় নাই। অতিথিশালাটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। তিব্বত, ভোট ও প্রান্তবাসী ব্যবসায়ীরা এখানে আসিয়া অশ্রয় গ্রহণ করে, এবং ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া থাকে। আমি অতিথিশালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গীরা রাজকীয় কর্ম্মচারীর নিকট চলিয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্ম্মচারীকে সঙ্গে করিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। কর্ম্মচারী আসিয়া আমার রাত্রিবাসের জন্য দুইটি কুঠরী পরিষ্কার করাইয়া দিলেন। একটিতে আমার থাকিবার স্থান হইল, অপরটিতে রন্ধনশালা ও সঙ্গীদের থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজভাণ্ডার হইতে ঘুঁটে, ছাগলের নাদ, ছাতু, মাখন ও লবণ আসিল; ইহাই এ দেশে রাজকীয় অভ্যর্থনা। আমি রাজকীয় অভ্যর্থনায় প্রীত হইলাম। রন্ধনের আয়োজন হইতে লাগিল, এবং নগরবাসীরা আমাকে দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই তাম্বুতে বাস করে। শীতকালে এখানে কেহই থাকিতে পারে না। রাজাকেও সদলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থানে যাইতে হয়, প্রজারাও রাজার অনুকরণ করে। এখানকার ৪।৫টি লোক কিছু কিছু হিন্দী জানে; ইহারা বাণিজ্যের জন্য হিন্দুস্থানে যাইয়া হিন্দী শিক্ষা করিয়াছে। সুতরাং এখানে আর আমায় কোনও প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইল না। প্রজারা আমাকে বুঝিল; আমিও প্রজাদিগকে বুঝিলাম; তবে এক জন প্রজা আমাকে এই বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল, "আমার ছয়টি ঘোড়া ডাকাতে লইয়া গিয়াছে; তাহা কোথায় আছে বলিয়া দাও।" আমি বলিলাম, "তোমার ঘোড়া ডাকাতে লইয়া গিয়াছে, আমি কেমন করিয়া সন্ধান বলিয়া দিব?" সে বলিল, "তুমি সাধু সব জান, কেবল আমাকে প্রবঞ্চনা করিতেছ।" এই বলিয়া সে বিরক্তির সহিত চলিয়া গেল। যেমন নিম্নদেশে সাধু দেখিলেই লোক ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কথা জিজ্ঞাসা করে, এবং ঔষধ চায়, সেইরূপ ইহারাও আমার নিকট নানাপ্রকার কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিতে লাগিল, এবং ঔষধ প্রার্থনা করিল। আমি ইহাদের কোন ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে পারিলাম না, সকলেই দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল। আমিও নিস্তার পাইলাম।

বরখার রাজার অনুমতি লইয়া যাইতে হইবে। আমি ইতঃপূর্ব্বে রাজার অনুমতি লইয়াছি, আমাকে আর কোনও প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইল না। আমি এই স্থানে রাত্রিযাপন করিলাম। দারচিন্ হইতে বরখা ছয় মাইল। বরখা হইতে মানস সরোবর আট মাইল। অদ্য ৩০শে আষাঢ় সংক্রান্তি। পূর্ব্বে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম, সংক্রান্তির দিবসে মানস সরোবরে গিয়া স্নান করিব; অদ্য প্রত্যূষে উঠিয়া সেই সংকল্প পূর্ণ করিবার জন্য দ্রুতবেগে মানস সরোবরের দিকে ছুটিতে লাগিলাম। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যাত্রা করিয়াছিলাম। এখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে, চতুর্দ্দিকের বরফ-মণ্ডিত পর্ব্বতগুলি মাথা উঁচু করিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইয়া সুবর্ণকিরণময় হস্ত পর্ব্বতের মস্তকে অর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। এই আশীর্ব্বাদে পর্ব্বতশিখর যেন আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া প্রস্রবণরূপ গলদশ্রুতে ধরাকে সিক্ত করিতেছেন। ধরা রাবণ হ্রদ ও মানস সরোবর রূপ উভয় হস্তে পর্ব্বতের অশ্রুবেগ ধারণ করিয়াছেন। প্রভাত হইয়াছে, রৌদ্র উঠিয়াছে, শীতও একটু কমিয়াছে। এ দিকে আমার হৃদয়ে মানস সরোবর যাইবার জন্য উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এখন পূর্ব্ব দিকে চলিতেছি; দক্ষিণ ভাগে রাবণ হ্রদ, বামভাগে একটি ক্ষুদ্র বরফ-মণ্ডিত পর্ব্বত; রাস্তা সবুজ বর্ণ ঘাস ও কণ্টকে আবৃত, হ্রদের জল গভীর নীলবর্ণ। এই মনোহর দৃশ্য বর্ণনার অতীত। রাবণ হ্রদের মধ্যে একটি পর্ব্বতময় দ্বীপ। এই দ্বীপস্থ পর্ব্বতও তুষার-মণ্ডিত। এই সব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনের আবেগে সরোবরের দিকে ছুটিতেছি, এমন সময় দুইটি বস্তু দেখা গেল। সেই দুইটি বস্তুকে আমার সঙ্গীরা মনে করিলেন, ঘোটকারোহণে দুই জন ডাকাত আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এখানে ডাকাতের বড় ভয়। কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি রাজা, কি প্রজা, সকলেই ডাকাতের ভয়ে ভীত। রাস্তায় চলিতে চলিতে সম্মুখে যা কিছু চলৎ বস্তু দেখা যায়, তাহাকেই ডাকাত বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়; কারণ, বিভীষিকাময় স্থানে ভয়ের এমনই মহিমা যে, সম্মুখে যাহা কিছু বস্তু দেখা যায়, তাহাই ভয়জনক বলিয়া মনে হয়। সম্মুখস্থ জিনিস দুইটি যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই সঙ্গীদের ভয়বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমরা বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গের জিনিসপত্র টাকা কড়ি আহারীয় প্রভৃতি কণ্টকগুল্মের নীচে লুকাইয়া রাখিলাম। পরস্পর অন্যমনস্ক হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। সেই দুইটি জিনিস নিকট হইতে নিকটে আসিল। এখন দেখিলাম, তাহারা দুইটি মনুষ্য বোঝা ঘাড়ে করিয়া

আমাদের দিকে আসিতেছে। ক্রমে তাহারা আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন দেখিলাম, তাহারা দু' জন লামা, মানস সরোবর হইতে আসিতেছে, কৈলাসে যাইবে। দুই জনেই হস্তে জপ-চক্র ঘুরাইতেছে, আর বলিতেছে, "ওঁ মানিপেমাহুঁং"। ইহা এই দেশীয় লোকদিগের মহামন্ত্র। লামাদ্বয় আমাদের নিকট বসিল; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মানস সরোবর কত দূর?" লামা উত্তর করিলেন, "বরখা হইতে যত দূর আসিয়াছেন, আর অত দূর।" এই বলিয়া লামাদ্বয় উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমাদের মধ্যে হাসির উচ্চরব উঠিল। আমি আমার দোভাষী ভৃত্য বিষ্ণুসিংহকে বলিলাম, "ভাল ডাকাত দেখিয়াছিলে বটে!" বিষ্ণু সিংহ বলিল, "এ বড় ভয়ানক স্থান; ডাকাতে পরিপূর্ণ; অতি সাবধানতার সহিত চলিতে হইবে। যদি ইহারা ডাকাত হইত, তবে কি হইত?" আমি আর বিষ্ণু সিংহের কথার উত্তর দিলাম না। সকলে সরোবরের দিকে চলিতে লাগিলাম। বিষ্ণুসিংহ লামাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "এ পথে ডাকাতের ভয় আছে কি না?" লামা উত্তর করিয়াছিলেন, "আজ কোনও ডাকাত দেখি নাই বটে, কিন্তু ভয় খুব।" সে যাহা হউক, আমরা চলিতে লাগিলাম। এখন রাস্তা ঢেউ খেলান, একবার উপরে উঠিতেছি, একবার নিম্নে অবতরণ করিতে হইতেছে। যখন ঊর্দ্ধে উঠিতেছি, তখন মানস সরোবর নয়নগোচর হইতেছে; আর যখন নিম্নে অবতরণ করিতেছি, তখন আর সরোবর দেখিতে পাইতেছি না। এইরূপ ক্ষণিক দর্শন, তার পরক্ষণেই অদর্শনে মন অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি ক্রমাগত দৌড়িয়া একটি উচ্চ স্থানে যাইয়া উঠিলাম। সেইখান হইতে সরোবরের দর্শন অতি মনোহর। চারি দিকই পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত, মধ্যে নীলবর্ণ, জলরাশি পবনের আবেগে আন্দোলিত হইয়া এ দিক ও দিক ছুটিতেছে এবং সমুদ্রবৎ বীচিমালায় তীরভাগকে আক্রমণ করিতেছে। যখন ঢেউ ছুটিতেছে, তখন বোধ হইতেছে যে, নীলবর্ণ জলরাশি হইতে শুভ্র মুক্তামালা উদ্বেলিত হইয়া তীরের দিকে ছুটিতেছে। এই জলের মধ্যে অসংখ্য চক্রবাক চক্রবাকী ক্রীড়া করিতেছে, এবং বহুসংখ্যক রাজহংস মানস সরোবরের বক্ষে বিচরণ করিতেছে। এই হংস ও চক্রবাক চক্রবাকীর বর্ণ কর্পূরবৎ শুভ্র। ইহা দর্শন করিয়া মনে হইল, মানস সরোবর শ্বেতপদ্মমালায় বিভূষিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কৃষ্ণাঙ্গে শুভ্র মহা শোভা সম্পন্ন করিতেছে। মানস সরোবরের চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতপ্রাচীরও বরফে আবৃত। আমি যেখানে বসিয়া আছি, এই স্থান

ভ্রমণ করিতে হইলে জুগুমফা হইতে নাংমুনা মঠে যাইতে হয়; নাংমুনা হইতে ঝিগেফ, ঝিগেফ হইতে সারালুং, সারালুং হইতে বণ্ডী, বণ্ডী হইতে ইয়াংগো, ইয়াংগো হইতে ঠোকর, ঠোকর হইতে খুচুর। এই সব স্থানে এক একটি মঠ আছে। প্রত্যেক মঠে যাত্রীদের বিশ্রামের স্থান আছে। এক মঠ হইতে অপর মঠ ১০।১২ মাইলের কম হইবে না। সুতরাং মানস সরোবরের পরিধি মঠের গণনা অনুসারে ৮০ হইতে ৮৫ মাইল। আমার বিচার অনুসারে মানস সরোবরটি অষ্ট-দল পদ্মের অনুরূপ, এক একটি পদ্মে এক একটি মঠ সংস্থাপিত। এই মঠের মধ্যে জুগুমফা মঠ সর্ব্বপ্রধান, এবং ঠোকর মঠ দ্বিতীয়। অদ্য আমার বিশ্রামস্থান জুগুমফা মঠ; আমি এই স্থানে কিছু ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া জুগুমফাতে আসিলাম। মানস সরোবরের পশ্চিমতীরকে আলিঙ্গন করিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত উর্দ্ধে উঠিয়াছে। এই পর্ব্বতে অনেকগুলি স্বাভাবিক গুহা আছে; এবং পর্ব্বতকে আশ্রয় করিয়া মঠ প্রস্তুত হইয়াছে। এই মঠে যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য যথেষ্ট স্থান আছে; কিন্তু কে যাত্রী, কে ডাকাত, মঠের অধিকারী তাহা চিনিতে না পারিয়া যাত্রীদিগকেও স্থান দেন না। আমি মঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে পর মঠের এক জন লামা আমাকে মঠে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। ইহা শুনিয়া বিষ্ণু সিং মঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রধান লামাকে আমার পরিচয় দিয়া দিল, এবং লামা মঠের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আমাকে মঠের মধ্যে লইয়া গেলেন। এই মঠেও আমি একটি ভাল কুঠুরী পাইলাম। এই মঠে প্রবেশ করিয়া দেখি, প্রথমেই রাস্তার বাম পার্শ্বে রন্ধনশালা। এই রন্ধনশালাতে মঠের সমস্ত লোকের রন্ধন হয় ও অতিথিদিগেরও রন্ধন হইয়া থাকে। রন্ধনশালায় মঠের কর্ম্মচারী লামার বাস। যত আগন্তুক ও ব্যবসায়ী এই রন্ধনশালায় স্থান পাইয়া থাকেন। রন্ধনশালার পশ্চিম দিকে আর একটি কুঠুরী, সেই কুঠুরীতে আমার বাসস্থান নির্ণীত হইল। এই কুঠুরীর মধ্যে অনেক জিনিসপত্র ছিল, তাহা এ দিক ও দিক সরাইয়া আমার স্থান হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে বড় ডাকাতের ভয়। বাহিরে জিনিসপত্র রাখিলে ডাকাতেরা তাহা অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। বাণিজ্যব্যবসায়ীদের পক্ষে মঠই কেল্লা; এখানে তাহারা জিনিসপত্র রাখে ও নিজেরা থাকে। এ দিকে জুগুমফার ন্যায় আর নিরাপদ স্থান নাই। আমার কুঠুরীর পশ্চিম দিকে হল্ ঘরের ন্যায় একটি বৃহৎ কুঠুরী। কুঠুরীর পূর্ব্ব দিকে সুবৃহৎ গুহা। গুহার ঈশান দিকে হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, এবং অনেকগুলি

অতি গোপনে সুরক্ষিত। সকলের ভাগ্যে এই পুস্তকদর্শন ঘটে না, কেবল দেবদর্শন করিয়াই চলিয়া যান। লামার সঙ্গে সদ্ভাব হওয়াতে আমি এই পুস্তকগুলি দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই গুহাটি অন্ধকারময়, আলোক ভিন্ন এই গুহাতে প্রবেশ করা যায় না। মানস সরোবর আমাদের একটি পীঠস্থান। সতীর দক্ষিণ হস্ত এই মানস সরোবরেই পড়িয়াছিল। এই পীঠের ভৈরব অমর, দেবী দাক্ষায়ণী। এই গুপ্ত গুহাই পীঠস্থান। এই গুহার সম্মুখেই যে হল ঘরটির উল্লেখ করিয়াছি, সেই হল্ ঘরের প্রায় চতুর্দ্দিকই পশমের গদি দ্বারা সুসজ্জিত, গদির উপর লাল নীল বস্ত্রের আবরণ। এই আসনে লামারা বসিয়া জপ করেন, এবং বিশেষ পর্ব্বদিবসে এই স্থান হইতে গুহাস্থিত দেবীর দর্শন হইয়া থাকে। পর্ব্বদিবস উপস্থিত হইলে এই ঘর ও গুহাটি আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়, সুতরাং তখন দেবীদর্শনের আর কোনও কষ্ট হয় না। এই ঘর হইতে বাহির হইয়াই ঊর্দ্ধ দিকে সিঁড়ি, সিঁড়ির পর ছাদ, ছাদের উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে দ্বিতল ও ত্রিতল চার পাঁচখানি ঘর আছে। এই সব ঘরে লামাদিগের বাস। প্রধান লামার বসিবার ঘরের পশ্চাতে তাঁহার যোগাসন। সেই যোগাসনের গৃহটি অতি সঙ্কীর্ণ; অতি কষ্টে তাহার মধ্যে প্রবেশ করা যায়, এবং সেই গৃহটি হইতে সরোবর দেখা যায়। গৃহটির পশ্চাৎভাগে আর একটি দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া বাহিরে গেলেই তীরস্থ পর্ব্বতে উঠা যায়। এই পর্ব্বতের ঊর্দ্ধদেশে একটি গৃহ আছে, সেই গৃহে একটি যোগিনীর বাস। দুই বৎসর হইল, তিনি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এখনও বাহির হন নাই। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলিলেন, আরও দুই বৎসর আমি এখানে থাকিব। ইঁহার সঙ্গে যোগ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাহাতে জানিলাম, ইনি এক জন প্রধান রাজযোগী। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও মহাযোগী। ইনি ইঁহার ভ্রাতার শিষ্যা। পূর্ব্বে ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই স্থানেই বাস করিতেন, অদ্য তিনি কৈলাসে চলিয়া গিয়াছেন। রাস্তাতে যে লামাটির সহিত দেখা হইয়াছিল, তিনিই ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও গুরু। ইনি এই গৃহ হইতে বাহির হন না; মঠবাসীরা দয়া করিয়া যাহা কিছু দেন, তাহাতেই ইঁহার উদর পূর্ণ হয়। ইঁহারা উভয়েই শৈব। এই পর্ব্বতে আরও চার পাঁচটি গৃহ আছে। যাহারা মঠের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না, তাহারা ঐ সব গৃহে বাস করে ও সোরা লবণ প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্য রাখে। আমি মঠে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম ও লামাপ্রদত্ত চা পান করিলাম। পরে স্নানার্থ সরোবরতীরে গমন করিলাম। মঠ

হইতে সরোবরতীর অর্দ্ধমাইল নিম্নে। মঠ হইতে সরোবরে অবরোহণ করিবার একটি রাস্তা আছে। সেই রাস্তা দিয়া সরোবরে গেলাম। সরোবরের জল স্পর্শ করিয়া সরোবরে স্নান করিতে ইচ্ছা হইল। বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, খুব হাওয়া উঠিয়াছে, সরোবর হইতে প্রচণ্ড ঢেউ উঠিয়া তীরকে আক্রমণ করিতেছে। আমি শীতে কম্পান্বিতকলেবর; ঢেউয়ের সঙ্গে যত মৎস্য উঠিতেছে, তাহা তীরপ্রস্তরে আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ গতাসু হইতেছে। আমি সরোবর দর্শন করিতেছি; যত দূর দৃষ্টি চলে, তত দূরই নিম্নে দেখিতেছি প্রস্তর, আর কিছুই নাই। আমি কাহারও কথা না শুনিয়া গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিলাম, এবং সরোবরের মধ্যে ঝম্পপ্রদান করিয়া পড়িলাম; খুব অবগাহন করিলাম; শত শত ডুব দিলাম, আর ইচ্ছামত জলপান করিলাম। প্রাণের আনন্দে শীতের কষ্ট অনুভব করিতে পারিলাম না। এখানে প্রায় সমস্ত দিনই বসিয়াছিলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে জুগুমফায় ফিরিয়া আসিলাম। এই জুগুমফার সকলেই জপযোগী; কেবল প্রধান লামা প্রাণায়াম-যোগী; ইঁহারা মহাশঙ্খমালা জপ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ রুদ্রাক্ষমালাও জপ করেন। মঠবাসীরা সকলেই বিনীত, শান্ত, অতিথিসেবাতৎপর ও উদার। এই মহাতীর্থে আসিয়া আমার মনে হইল, এই তীর্থের ব্রাহ্মণ লামা ও ডাবা; ইঁহাদিগকে ভোজন দেওয়া উচিত। ইহা প্রধান লামাকে বলাতে তিনি বলিলেন, "বেশ, ভোজন করাইলেই চলিবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা কি খাইবেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "চা, ছাতু ও মাংস।" তাঁহার ইচ্ছানুসারে সমস্ত প্রস্তুত হইল, এবং ভোজন কার্য্য শেষ হইয়া গেল। লামার সঙ্গে এখন আমার খুব ভাব হইয়াছে, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। তিনি শাস্ত্রপাঠ করিয়া আমাকে শুনাইতেছেন, আমিও চণ্ডীপাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেছি। আমি চণ্ডীপাঠ করিতেছি, আর তিনি বলিতেছেন, "এই চণ্ডী আমার কাছেও আছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আর কি কি গ্রন্থ আছে?" তিনি কহিলেন, "বিষ্ণুর সহস্রনাম ও ভগবৎগীতা আছে।" তাঁহার সহিত আমার যত কথা হইয়াছিল, সমস্তই দোভাষীর মারফৎ। তাঁহার কথা দোভাষী আমাকে হিন্দী করিয়া বুঝাইতেছিল; আমার কথা তাঁহাকে তিব্বতীয় ভাষায় বুঝাইতেছিল; কারণ তিনিও হিন্দী জানেন না, আমিও তিব্বতীয় জানি না। মাঝে মাঝে আকার ইঙ্গিতেও কথাবার্ত্তা হইতেছে। আমি বলিলাম, এই মঠে তিন দিন বাস করিয়াই আমি মানস সরোবর প্রদক্ষিণ করিতে যাইব।" তিনি বলিলেন, "তাহা হইবে না; কারণ সরোবরের চতুর্দ্দিকেই ডাকাত-

দিগের আড্ডা। যত দিন ইচ্ছা, আপনি এখানে বাস করুন, মানস সরোবর দর্শন ও সরোবরে স্নান করুন ; ইচ্ছা করিয়া বিপদ আহ্বান করা উচিত নহে।" আমি তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিলাম, এবং সরোবর-প্রদক্ষিণের সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম।

এখানে পঞ্চ রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। অদ্য ষষ্ঠ দিবস প্রাতঃকালে লামার জন্য বর্‌খা হইতে ঘোটক আসিয়াছে। লামা অদ্য বরখায় যাইবেন, এবং কল্য বরখার রাজার সঙ্গে ছেক্‌রামুণ্ডী যাইবেন। এখানকার রাজারা বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া থাকেন, এবং আষাঢ় শ্রাবণ মাসে অধীন ও নিকটস্থ 'মণ্ডী' অর্থাৎ বাজারে গমন করেন। তাঁহাদের সঙ্গে এক জন লামা থাকেন। লামা শাস্ত্র পাঠ করিয়া রাজাদিগকে শুনান, এবং লামারাও ব্যবসায় বাণিজ্য করেন। তাই এই মঠের লামা দুই মাসের জন্য মঠ পরিত্যাগ করিবেন। মঠ পরিত্যাগ করিবার পুর্ব্বে লামা বলিলেন, "আপনি কি করিবেন ও এখন কোথায় যাইবেন?" আমি বলিলাম, "আমি কল্যই এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া ঘুচুর মঠে যাইব ; তথা হইতে তক্‌লাখার্ হইয়া খুজরুনাথে যাইব।" লামা বলিলেন, "তা বেশ। খুজরুনাথ হইতে ফিরিবার সময় আপনি ছেক্‌রামুণ্ডি হইয়া যাইবেন। তথায় আমার সঙ্গে ও বর্‌খার রাজার সঙ্গে দেখা হইবে।" এই বলিয়া লামা চলিয়া গেলেন। আমিও স্নানার্থ মানসরোবরতীরে গেলাম। অদ্য বড় হাওয়া উঠিয়াছে, হাওয়ার জন্য মানস সরোবরের অধিবাসী চক্র-বাক চক্রবাকীরা আসে নাই ; কেবল একটি হংস ও হংসী সরোবরের বক্ষে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। হংসের আকার দেশীয় রাজহংসের অনুরূপ। শরীর শুভ্র, চঞ্চু ও চরণ রক্তবর্ণ, গতি মন্থর। আমি স্নান করিয়া হংস হংসী দর্শন করিতে লাগিলাম, এবং অদ্যও সন্ধ্যার সময় বাসস্থানে ফিরিলাম। বাসায় আসিয়া শুনিলাম, সীমান্তবাসী কয়েক জন যাত্রী সরোবরে আসিতেছিল, পথিমধ্যে তাহাদের সমস্ত দ্রব্য ও বস্ত্রাদি ডাকাতেরা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে. তাহারা মঠের আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমি অগোণে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলাম, কথা সত্য। আমার সঙ্গে এত দিন এক জন নানক-পন্থী সাধু ছিল। আমি বাসায় আসিয়া দেখিলাম, সে চলিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, আমার সঙ্গে যা কিছু আহারীয় ছিল, তাহার কিছুই নাই। কি করিব, মঠ হইতে আহারীয় সংগ্রহ করিলাম, এবং সেই রাত্রি এখানে বাস করিলাম। পরদিবস প্রাতঃকালে জুগুমফা পরিত্যাগ-

পূর্ব্বক মানস সরোবরের পূর্ব্ব তীর ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। বেলা ১১ টার সময় ঘুচুর মঠে উপনীত হইলাম। এই মঠে আড়ম্বর কিছুই নাই; একটি দেবালয় ও একটি পুস্তকালয় আছে, এবং দু জন লামা এখানে বাস করেন। আমি মঠে উপস্থিত হইবামাত্র লামা আমাকে রন্ধনশালায় স্থান দিলেন, ও আতিথ্যসৎকার করিলেন। অদ্য এই মঠে অনেকগুলি অতিথি। তাহার মধ্যে দুই জন লামা লাসা হইতে আসিয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই অদ্য ৯ দিন হইল উপবাসব্রত গ্রহণ করিয়া ভজন করিতেছেন। চাও পান করেন না, কেবল দিনান্তে একবারমাত্র দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া পান করেন। প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যসমাপন করিয়া পাঠে বসেন; মধ্যে মধ্যে ডম্বরুধ্বনি করেন; আবার পাঠ করেন। এইরূপে সমস্ত দিন রাত্রি কাটাইয়া দেন। দিনে পাঠ ও ডম্বরুবাদন, রাত্রিতে জপ ও ধ্যান করেন। এইরূপ করিয়া ২৪ ঘণ্টা কাটাইয়া দেন। আর দুই দিন ইঁহারা এই ব্রতে যাপন করিবেন, এবং তৃতীয় দিবসে এখান হইতে কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান করিবেন। এই মঠে বৌদ্ধ মূর্ত্তি ভিন্ন অপর মূর্ত্তি নাই। মঠটি দ্বিতল। উপর তলাতে অতিথিশালা। আজ সেই অতিথিশালা শূন্য; কারণ, আমরা সকলেই নিম্ন তলে বাস করিতেছি। অপরাহ্ণে আমরা সকলেই দ্বিতীয় তলাতে উঠিলাম। দুই জন লামা প্রকাণ্ড দুই বাঁশী বাজাইতে লাগিল। এই বাঁশীগুলি পিত্তলনির্ম্মিত, দশ হাত লম্বা এবং আওয়াজ বড় গম্ভীর। এই বাঁশীর সঙ্গে সুবৃহৎ নাগরা ও ডম্বরু বাজিতে লাগিল। আমাদের সম্মুখেই মানস সরোবর, আমি দর্শন করিতেছি, আর লামাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, "তোমরা কাশীলামাকে এত সম্মান কর কেন?" লামা বলিলেন, "শুনুন, আমাদের এই দেশ পূর্ব্বে রাক্ষসে পরিপূর্ণ ছিল। আমরাও রাক্ষস ছিলাম। কাশী হইতে পদ্ম মুনি গ্রন্থ লইয়া জ্বালামুখীতে যান। জ্বালামুখী হইতে তিব্বতে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন ও মঠ সংস্থাপন করেন, এবং আমাদিগকে "ওঁ মণিপদ্মেহুঁ" এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, এবং লাসাতে আপনার আসন সংস্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন। পদ্মমুনি যশীমঠ হইতে নিতি পাসের নিকটবর্ত্তী হোতিপাস দিয়া ত্রেতাপুরী আসেন। ত্রেতাপুরী, কৈলাস ও মানস সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া লাসায় যান। এখনও সেই পদ্মমুনি লাসার প্রধান লামা হইয়া আছেন। তবে তিনি দেহ জীর্ণ হইলে জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনিই যে আবার নূতন দেহ ধারণ করিয়া পুনরাবর্ত্তন করেন, তাহার প্রমাণ কি?" লামা উত্তর করিলেন, "প্রমাণ আছে। যখন প্রধান

লামার নূতন দেহ হয়, তখন লাসার প্রধান মঠের কোন সিন্দুকে কত টাকা আছে, কোথায় কি জিনিসপত্র আছে, তাহা বলিতে হয়। যদি তিনি বলিতে না পারেন তাহা হইলে লামার প্রধান আসনে তিনি বসিতে পারিবেন না। তত দিন প্রধান লামার আসন শূন্য থাকিবে। তবে ফলকথা এই যে, লাসার প্রধান লামার পদ অধিক দিন শূন্য থাকে না। তাঁহার সঙ্গে এই সব কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে রাত্রি হইয়া গেল। আমরা সন্ধ্যার পরে নিম্ন তলে চলিয়া আসিলাম। আমরা যেমন কোন গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বে 'ওঁ নমো গণেশায়' লিখি, এই দেশের গ্রন্থলেখকেরা সেইরূপ কাশীর নাম লিখিয়া থাকেন। কেহ কেহ এই পদ্মমুনিকে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য পদ্মপাদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কেহ কেহ বলেন, কাশীর সারনাথ হইতে প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং কাশী হইতেই কোনও বৌদ্ধ শ্রমণ তিব্বতে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করেন। ইহার মীমাংসা পরে হইবে। অদ্য শ্রাবণের সপ্তম দিবস অতীত হইল; অদ্য এই ঘুচুর গুমফাতেই রাত্রিবাস করিলাম। ইতঃপূর্ব্বে যে জুগুমফার নাম উল্লেখ করিয়াছি, যেখানে আমি ছয় রাত্রি বাস করিয়াছিলাম, সেই গুমফার নিম্নে একটি খাল আছে। খালটি মানস সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া রাবণ হ্রদে যাইয়া পড়িয়াছে। এই খালটিতে জল নাই। এই খালটির মধ্য দিয়া পশ্চিম দিকে গমন করিলেই রাক্ষস তালে যাওয়া যায়। রাক্ষসতাল এই মানস সরোবর হইতে তিন মাইল। মানস সরোবর হইতে যে খালটি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই খালটিকে দেশীয় লোকেরা শতদ্রু বলিয়া থাকে। শতদ্রুর উৎপত্তিস্থান মানস সরোবর। এই খালটি অন্তঃসলিলা, এবং অধিক বরফপাত হইলে বরফ গলিয়া এই খালটি মানস সরোবরের ও রাবণ হ্রদের জলভাগকে এক করিয়া দেয়। রাবণ হ্রদের উত্তর দিক দিয়া শতদ্রু বাহির হইয়া নিম্নে গিয়া পড়িয়াছে। এই খালের উত্তর তীরে একটি উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে। এই উষ্ণপ্রস্রবণটি জুগুমফার পর্ব্বতের ঠিক পূর্ব্ব দিকে। এই উষ্ণ প্রস্রবণের তীরে তিনটি গুহা আছে। মধ্যে মধ্যে কোনও কোনও সাধু আসিয়া এই গুহাতে বাস করেন। আপাততঃ গুহা শূন্য। ডাকাতের ভয়ে আর এখন কেহ গুহাতে বাস করেন না।

গুম্‌ফা শব্দের অর্থ মঠ।

চিন্তা-প্রক্রিয়া।

কিরূপে আমাদের চিন্তাকার্য্য সাধিত হয়, সম্প্রতি বিজ্ঞান-বিদ্‌গণ সে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আলো, উত্তাপ প্রভৃতির বিস্তারের কারণ-ব্যাখ্যার বেলা যেরূপ হইয়াছে, এখানেও ঠিক্ তাহাই হইয়াছে; অর্থাৎ, সেই অগতির গতি ঈথরের সাহায্যে চিন্তা-প্রক্রিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।*

এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, যখনই আমরা কোন বিষয় চিন্তা করি, তখনই আমাদের মস্তিষ্ক-কোটরে কিঞ্চিৎ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে; এবং সম্ভবতঃ সেই পরিবর্ত্তনবশতঃ ঈথর-তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে।

এই ঊর্ম্মিমালা সর্ব্বত্র সকল মস্তিষ্কেই অল্লাধিকপরিমাণে আঘাত করে বটে, কিন্তু সকলে তাহার সম্যক্ অনুভব করিতে পারে না। এক জন চিন্তা-গ্রাহী (thought-reader) অনায়াসে তাহা অনুভব করিতে পারে; অর্থাৎ, সম্যক্-শিক্ষিত ও অভ্যস্ত মস্তিষ্কই কেবল তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে এই দাঁড়ায় যে, কেবল সেই শিক্ষিত মস্তিষ্কের অধিকারীই চিন্তাকারীর মনের কথা জানিতে পারিয়া থাকে।

সময়ে সময়ে অশিক্ষিত অনধিকারী মস্তিষ্কও এই তরঙ্গ ধরিতে পারে; যেমন বিদেশগত সন্তানের বিপদ্‌বার্ত্তা অনেক সময়ে মাতা গৃহে থাকিয়া জানিতে পারেন। † সেখানে বোধ হয়, বিদেশে বিপাকে পতিত সন্তানের মনে সর্ব্বদা মায়ের কোমল হস্ত, আশা-প্রদ বাণী ও দেবতার সমীপে সাগ্রহ প্রার্থনার কথা

---

* কথাটা ঠিক্ হইল না;—"একের মনের ভাব কিরূপে অন্যে জানিতে পারে, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে", বলিলে ঠিক্ হয়।

† আমাদের পরিচিত একটি মহিলা একদিন সন্ধ্যাবেলা অদূরবর্ত্তী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিলেন। তখন ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার ছয় বৎসরের শিশুটি উঠানে খেলা করিতেছিল। এ দিকে তিনি পাড়াগাঁয়ের স্ত্রীলোকদের চিরপ্রচলিতপ্রথানুসারে কলসী লইয়া আকণ্ঠ জলে অবতরণ করিলেন; তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। কোথায় নিদাঘতাপে ক্লিষ্ট শরীর অবগাহন দ্বারা আরাম লাভ করিবে, না সেদিন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অগ্নিময়ী জ্বালা অনুভূত হইতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি কলসীতে জল লইয়া গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিলেন, আর পথে তাঁহার মনে বারংবার কেবল ইহাই জাগিতে লাগিল যে, নিশ্চয় সন্তানের কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। বাড়ীতে আসিয়া দেখেন, ছেলের পরিধেয় বস্ত্রে আগুন লাগিয়াছে, আর সে গৃহের ইতস্ততঃ 'মা-গো মা-গো!' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। হতবুদ্ধি মা

উদিত হওয়াতে, তাহার চিন্তার তরঙ্গের জোর (অভিঘাত) অপেক্ষাকৃত অধিক হয়, অথবা হইতে পারে; সর্ব্বদা সন্তানের বিপদাশঙ্কায় জননীর মস্তিষ্ক নিরতিশয় অনুভব-প্রখর (sensitive) হইয়া তরঙ্গাভিঘাতগ্রহণের পক্ষে অসাধারণরূপে অনুকূল-অবস্থাপন্ন থাকে।

ফলতঃ যেমন আলোর ঈথর-তরঙ্গ সাক্ষাৎসম্বন্ধে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করিতে হয়, উত্তাপের ঈথর-তরঙ্গ যেমন ত্বক্ বা তাপমান যন্ত্র দ্বারা অনুভব করিতে হয়, সেইরূপ এই চিন্তার তরঙ্গ উপযুক্ত শিক্ষিত মস্তিষ্ক দ্বারা গ্রহণ করিতে হয়।

আমরা প্রায় অষ্টপ্রহরই কোন না কোন বিষয় চিন্তা করিয়া থাকি। সেই জন্য এই তরঙ্গ অবিশ্রান্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রসারিত ও প্রতিহত হইতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন জড় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই তরঙ্গের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার সুযোগ হয় নাই। ফটোগ্রাফীর প্লেটে ইহার কোন দাগ-পড়ে না; আলো, উত্তাপ, চুম্বক বা বিদ্যুতের উৎপত্তি ইহা হইতে হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু এক জনের মস্তিষ্কসঞ্জাত এই তরঙ্গ অপরের মস্তিষ্কে নিপতিত হইলে, এবং সেই সময়ে শেষোক্তের মস্তিষ্ক অনুকূল-অবস্থাপন্ন (যেমন hypnotised) থাকিলে, প্রথমের চিন্তা দ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তি যে কলের পুতুলের ন্যায় অবলীলাক্রমে পরিচালিত হইতে পারে, তাহা ফ্রান্সের মত সভ্যদেশের ধর্ম্মাধিকরণে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এই চিন্তা-তরঙ্গের আর একটি ফল এই যে, আমাদের সহচর বন্ধুগণ সচ্চিন্তা করিলে আমরাও অল্পাধিকপরিমাণে সেই চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকি। সেই জন্যই সৎসঙ্গে থাকিলে সৎ ও অসৎসঙ্গে থাকিলে অসৎ হওয়ার কথাটা নিতান্ত উপবচন নহে।

পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ আশা করেন যে, কালে এমন

তাড়াতাড়ি কলসীর সমস্ত জল তাহার গায়ে ঢালিয়া দিলেন; আগুন নিভিল বটে, কিন্তু জীবন-প্রদীপও সেই সঙ্গে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। উষ্ণদেহে হঠাৎ শৈত্যসংযোগই বোধ হয় এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ।

হতভাগিনী জননী এই ঘটনার পরে যে কয় দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন নিজের হৃদয়ে সন্তানের আকস্মিক বিপদের রহস্যময় অনুভবের কথা ও তাঁহারই নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ তাঁহার বাছার অকালমৃত্যুর কথা সাশ্রুনয়নে নিরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিতেন।

এই ধর্ম্মপ্রাণা রমণীর কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই; আসর জমকাইবার জন্য গল্পের আকার ইকার বাড়াইয়া বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না।—লেখক।

কোন রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হইবে, যাহাকে কেবলমাত্র চিন্তার সাহায্যে বিশ্লিষ্ট করা যাইবে—যেমন তাড়িতের সাহায্যে করা হইয়া থাকে। তাঁহারা আরও বলেন যে, যখন এ কথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, চিন্তা দ্বারা মস্তিষ্কের ভিতরে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তখন মস্তিষ্কের বাহিরে অনন্ত কোটী পদার্থের মধ্যে কোন একটি পদার্থের উপর সেইরূপ কোন পরিবর্ত্তন যে হয় না, তাহা কে বলিল? আর তাহাতে অবিশ্বাস বা বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? মেরুজ্যোতিঃ (Aurora borealis) বিকাশ পাইলে সহস্র-মাইল-দূরস্থিত দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের শলাকা বিচলিত হয়, এবং কোটীযোজনদূরস্থিত সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্কসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ইহাও কি সামান্য বিস্ময়ের কথা? অথচ ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য।

অন্য এক জন বিজ্ঞানবিৎ বলেন যে, মস্তিষ্কে যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের কথা বলা হইতেছে, তাহা বর্ত্তমান কোন লেবরীটরীতে প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং এই আপাতস্বীকৃত পরিবর্ত্তনটাকে হয় একটা কল্পিত ব্যাখ্যা (theory) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, না হয় 'রাসায়নিক পরিবর্ত্তন' শব্দের বর্ত্তমান পরিসর বর্দ্ধিত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের উপাদানের মধ্যে প্রচলিত জড়-বিজ্ঞানের অনধিগত কোনও পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃত কথাটা খুলিয়া বলিতে লজ্জা কি? তাহা এই যে, জীবন মরণ চিন্তন প্রভৃতি ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা এখন পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক জানি না। তবে এ সব বিষয়ে যাহা কিছু বলা হইতেছে, সকলই অন্ধকারে লোষ্ট্রনিক্ষেপ,—কেবল সুবিধা-মূলক আত্মচিত্ত-প্রবোধদায়ক কল্পিত ব্যাখ্যার ছড়াছড়ি। মানুষ কোন বিষয় বুঝিতে না পারিলে তাহা স্বীকার করিতে চায় না; বুঝি তাহার আত্মসম্মান-জ্ঞান আহত হয়। তাই সে নিশীথ-প্রদীপের তৈল ধ্বংস করিয়া নানারূপ ব্যাখ্যার উদ্ভাবন করে; কত অসংলগ্ন কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন তত্ত্বের আবিষ্কার করে; সংক্ষেপে সে নীরস আত্ম-প্রতারণা হইতে নিংড়াইয়া আত্মপ্রসাদের মধু আদায় করিয়া থাকে। মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডকে সহসা বিনা মেঘে অন্ধকারাবৃত হইতে দেখিয়া অজ্ঞ লোকে আত্মচিত্তপ্রবোধপ্রদ ব্যাখ্যা বাহির করে যে, রাহু-নামক নির্ম্মম দৈত্য প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া ফেলে! "পরস্পর প্রশংসা-সমিতি"র সভ্য বিজ্ঞগণ এই ব্যাখ্যা শুনিয়া হাসিয়া টেবিল ফাটাইবার উপক্রম করেন। কিন্তু সেই বিজ্ঞেরাই আবার আলোর বিস্তার, উত্তাপের বিকীরণ, রঞ্জেন আলোর দুরাবগাহিনী শক্তি, বিনা তারে টেলিগ্রাফী—প্রভৃতি

বিষয় সম্যক বুঝিতে না পারিয়া শেষে দুর্ব্বোধ্য ঈথর-তরঙ্গের সাহায্যে একটা ব্যাখ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন।

এ দিকে, ঈথর জিনিসটা কি, তাহা যৌগিক কি মৌলিক, তাহার মধ্যে জাতিভেদ আছে কি না, এ সব বিষয়ে কেহই নিশ্চিত কিছু জানেন না, বা সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। তাহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত ঈথরের কোনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাপক সংজ্ঞাই মিলিতেছে না। আর নিত্য নূতন ঘটনা ইহার স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়াতে বেচারা কোথাও স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অনতিদূরবর্ত্তী কালে সে হয় ত এই গুরুভারে পঙ্গু হইয়া কোন যোগ্যতর প্রতিনিধির হস্তে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া পেন্সন লইয়া প্রত্নতত্ত্বের রাজ্যে বাস করিবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছে; তাহার নাম 'কেলরিক্' (Caloric)। পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে বলিতেন যে, কেলরিক নামে এক অতি সূক্ষ্ম তরলাতিতরল পদার্থের প্রবেশবশতঃই কোন বস্তু উত্তপ্ত হইয়া উঠে; অগ্নি, সূর্য্যকিরণ প্রভৃতিতে এই জিনিস প্রচুরপরিমাণে বিদ্যমান আছে, সেই জন্য কোন পদার্থ ইহাদের সংস্রবে বা সান্নিধ্যে আসিলে, তাহাতে কেলরিক্ প্রবেশ করিয়া তাহাকে উত্তপ্ত করে। কিন্তু পরে যখন জড়-বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর সাহায্যে ধাতুর তারসংযোগে ব্যবধানস্থিত পদার্থকেও উত্তপ্ত করা গেল, অথচ মধ্যবর্ত্তী তার উষ্ণ হইল না, তখন কেলরিক্‌কে অকর্ম্মণ্য বিবেচনায় পেন্সন দিয়া বিদায় করা হইল; এবং তাহার স্থলে হাল-আমলের কর্ম্মোপযোগী নূতন আমদানী স্পন্দন-বাদকে (Vibration theory) মহা সমারোহে অভিষিক্ত করা হইল। ঈথর সম্বন্ধেও কালে সেরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ঈথরের সংজ্ঞা এ পর্য্যন্ত যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কতকটা এইরূপ;—ইহা একটি অবাঙ্‌মনসগোচর অতীন্দ্রিয় অতিশিথিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ।

এই সূক্ষ্ম ঈথর ও স্থূল জড় পদার্থের মত পরস্পরবিসদৃশ বিপরীত পদার্থ (?) কিরূপে মিশ খাইতে পারে, এবং একে অন্যের মধ্যে শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া এই নিরেট কঠিন জগতের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহাও বিবেচ্য। এমন কি, এই আপত্তির উত্থাপন করিয়া অনেকে ঈথরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে নারাজ। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিন্ এই আপত্তির একটি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, বায়ব্য ও তরল পদার্থের নিশ্চল অবস্থায় কোনরূপ সংহতত্ব (rigidity) নাই সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে

দ্রুতবেগে চালিত করিতে পারিলে সংহত করা যাইতে পারে; ঘূর্ণিবায়ু ও জলাবর্ত্ত তাহার দৃষ্টান্ত। কেবল দ্রুতগতিবশতঃই ইহারা দৈত্যের ন্যায় বল পাইয়া থাকে। সেইরূপ ঈথরের দ্রুত স্পন্দন হইতে তাহার সংহতির উদ্ভবও আশ্চর্য্য-জনক নহে।

তিনি প্রসঙ্গতঃ আরও বলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন মূল পদার্থের উপাদানস্বরূপ যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পরমাণু আছে, হইতে পারে, সেই সব পরমাণুও এই ঈথ-রেরই ন্যূনাধিকবেগে ঘূর্ণনের ফলমাত্র। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে জগতে কেবল একটিমাত্র মূল পদার্থ (ঈথর) আছে স্বীকার করিলেই চলিতে পারে; মিছামিছি আর পৌনে ছয় ডজন ভূতের বোঝা বহিতে হয় না। ফলতঃ এই অভিনব মত সপ্রমাণ করিয়া উঠিতে পারিলে জগতে সমানতাপাদনের (generalisation) পরাকাষ্ঠা হইল, বলিতে হইবে।

অন্য দিক্ হইতেও সম্প্রতি এইরূপ আর একটি মত বিজ্ঞানের ধর্ম্মাধিকরণে স্বত্ব-সাব্যস্তের দাবীতে আরজী লইয়া উপস্থিত। সেই পক্ষের উকীলেরা বলিতে-ছেন যে, সূক্ষ্মাণু (micratom) নামক অতিসূক্ষ্ম এক জাতীয় পরমাণু হইতেই যাবতীয় জড় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে; অর্থাৎ, আপাত-প্রতীয়মান সমুদয় বিভিন্ন-শ্রেণীস্থ মৌলিক পদার্থের পরমাণুই এই অভিনব সূক্ষ্মাণুর বিশিষ্ট অবস্থামাত্র। ফলতঃ, বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই যেন দেখিতে পাই,—Generalisation is the order of the day.

লর্ড কেল্‌ভিনের মীমাংসায় একটু খট্‌কা আছে। যদি শুদ্ধ ঘূর্ণনগতির বেগ-বৃদ্ধিবশতঃ ঈথরের মত অতি সূক্ষ্ম—ধরিতে-ছুঁইতে-নারি—পদার্থকে কঠিনী-ভূত করা যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, উহা নিশ্চয় চাপ-সহ (compressible); আরও যদি চাপসহ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, উহার অণু (molecule) আছে। ইহার পরের সিঁড়িতে নামিয়াই স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ অণুগুলি স্থিতিস্থাপক। এখন যদি অণু স্থিতিস্থাপক বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তবে উহার ঐ স্থিতিস্থাপকতা গুণ বুঝাইবার জন্য দ্বিতীয় এক ঈথরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; অর্থাৎ, যে সরিষার সাহায্যে ভূত ছাড়ান অভিপ্রেত ছিল, সেই সরিষাকেই ভূতে পাইয়া বসে!

কেহ কেহ ঈথরের সাহায্য ব্যতিরেকেও চিন্তা-প্রক্রিয়া বুঝাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, আলো ও উত্তাপের বিকীরণ, বিনা তারে টেলিগ্রাফী, চিন্তাকার্য্য প্রভৃতি সকলের মধ্যেই অজ্ঞাতকুলশীল ঈথরকে ডাকিয়া আনা হয় কেন?

মানিলাম, যেন ঐ অত্যূর্দ্ধ আকাশে,—যেখানে বায়ু নাই, বাষ্প নাই, মৃত্তিকা নাই, কঠিন তরল বা বায়বা কোনও পদার্থই নাই, সেখানে—চন্দ্রসূর্য্যাদির আলো ও উত্তাপের জন্য একটা ভূতলসংলগ্ন পথের আবিষ্কারের অভিপ্রায়ে ঈথর বা তদ্রূপ কোন রহস্যময় পদার্থের অস্তিত্ব-কল্পনা আবশ্যক; কিন্তু তাই বলিয়া চিন্তন-ব্যাপারের মত একটা সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির কার্য্যের বেলাও যে তাহারই শরণাপন্ন হইতে হইবে, এমন কি কথা? বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান কি আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট নহে?

এই ত আমাদের আজন্মপরিচিত আমরণ-সহচর অষ্টপ্রহর-সেব্য বায়ুরাশির মধ্যেও এমন তিনটি ভূত লুক্কায়িত ছিল যে, এ পর্য্যন্ত কোন ওঝাই তাহাদিগকে ধরিতে পারেন নাই। এইরূপ নিত্য নূতন পদার্থ ও শক্তি (force) জগতে কতই আবিষ্কৃত হইতেছে ও হইবে। কালে হয় ত এমন কোন পদার্থ বা শক্তির অবিষ্কার হইবে, যাহার সাহায্যে জীবন মরণ ও চিন্তন ক্রিয়ার কারণ বিশদীকৃত হইতে পারে। অবশ্য, সেই পদার্থ ও শক্তিকে জড়বিজ্ঞানের অধিকারে আনিতে জড়পদার্থের বর্ত্তমান সীমার পরিসর বর্দ্ধিত করিতে হইবে। হইতে পারে, আমরা যখন চিন্তা করি, তখন সেই পদার্থ অপরের মনেও সেই চিন্তার উদ্রেক (induce) করিয়া থাকে। আমরা জানি যে, একখণ্ড লৌহকে তামার তারের মধ্যে রাখিয়া সেই তারের দুই মুখ একটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে, লৌহখণ্ডটির মধ্যে এক নূতন শক্তি সঞ্জাত হইয়া উহাকে চুম্বক-লৌহে পরিণত করে। গৃহের মধ্যে কোথাও একটি ব্যাটারী চালাইয়া দিলে সেই গৃহস্থিত যাবতীয় চুম্বক-শলাকা তাহা দ্বারা অল্পাধিকপরিমাণে অভিভূত হইয়া থাকে। সেইরূপ, হইতে পারে যে, আমাদের চিন্তন-ক্রিয়া দ্বারা (মানব-মস্তিষ্কে বা বায়ু-মণ্ডলে কোন একটি অজ্ঞাত পদার্থের অস্তিত্ববশতঃ) সেই চিন্তা অপরের মস্তিষ্কেও উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। সেই পদার্থ খুব সম্ভবতঃ বর্ত্তমানে পরিচিত যাবতীয় জড় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ এক পৃথক রকমের; কিন্তু তাহাতে আসে যায় কি? আভিভৌতিক বিদ্যাটা (Hypnotes) আদ্যোপান্তই ত সমুদয় প্রাকৃতিক ব্যাপারের বাহিরে; অথচ সে দিন চলিয়া গিয়াছে, যখন এই ব্যাপারে বিশ্বাস করা অশিক্ষা বা অপশিক্ষার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু এখন শিক্ষিতদের মধ্যে প্রায় সকলেই

---

* সম্প্রতি বায়ুমণ্ডলে Helium, Argon ও Crypton নামক তিনটি নূতন স্থূল পদার্থের আবিষ্কার হইয়াছে। Etherium সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ আছে। উহাকে ধরিলে চারিটি হয়।

উহাতে বিশ্বাস করেন ; এমন কি, এখন এ সম্বন্ধে কিছু না জানাই বরং শিক্ষাভাব বা সঙ্কীর্ণ মনের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে ভাই, "চিরদিন সমান যায় না", এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া জড় পদার্থ ও প্রাকৃতিক ঘটনার সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত কর। Ether, Psychic force প্রভৃতি অভ্যাগত অতিথিদিগকে সময় বুঝিয়া সাদরে গৃহে লইয়া যাও ; ইহাদিগকে অস্পৃশ্য বা হেয় মনে না করিয়া 'জল-চল' করিয়া লও।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ময়ূরপুচ্ছ।

জীবনের বসন্তপ্রভাতে কোন এক দুর্বোধ কারণে নিদারুণ অদৃষ্টের প্রচণ্ড প্রকোপে পড়িয়া মহামারীর এক দুর্বৎসরে অকস্মাৎ আমার পত্নীটিকে হারাইয়া বসিলাম। সকাল সকাল প্রশংসার সহিত সব ক'টা পাশই করিয়াছিলাম, এবং আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনুমান দুই বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছিলাম। অবশ্য তেমন পশার তখনও হয় নাই বটে, কিন্তু কষ্টসহিষ্ণু ও অধ্যবসায়পরায়ণ ছিলাম বলিয়া আমার অপেক্ষা প্রাচীনতর উকীলদের মধ্যে আমার একটু প্রতিপত্তিও জন্মিয়াছিল। অর্থ না লইয়া আমার সমবয়স্ক সহযোগী এক উকীলের সাহায্যে চরম দণ্ডে দণ্ডিত জন কয়েক আসামীকে দায়রার বিচারে খালাস করিয়াছিলাম ; এ জন্য তখন নামও একটু হইয়াছিল। এ ছাড়া আমার শ্বশুরদের প্রতিষ্ঠিত একখানি প্রতিপত্তিশালী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছিল ; মধ্যে মধ্যে তাহাতে প্রায়ই প্রবন্ধ লিখিতাম। এবং কখনও কখনও এমনও শুনিতে পাইতাম যে, বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ প্রাচীন ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞেরা আমার কোনও কোনও প্রবন্ধের সুখ্যাতি করিয়াছেন। সুতরাং তখন নবীন উৎসাহে বিচিত্র মোহে সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট-তপনের স্নিগ্ধোজ্জ্বল তরুণালোকে সবে মাত্র জীবন-তরণীখানি ভাসাইয়াছি ; সুখের এই ষোল কলার যেটুকু বাকি ছিল, যেন সেটুকু পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই ছ' মাস আগে আমার সহধর্ম্মিণী আমায় একটি পুত্রসন্তান উপহার দিয়াছে। ঠিক এমন সময় হঠাৎ একখানা কালো মেঘ দেখা দিল, এবং অনতিবিলম্বে প্রতিকূল বাতাসের বিষম ঝট্‌কায় আমার সাধের নৌকা ডুবিল। আমার স্ত্রী মরিল ; আমার সব

মাত্র সঙ্গে লইয়া বম্বে হইতে জাহাজে চড়িলাম। খোকা তার দিদিমার কাছে রহিল।

২

শ্বাশুড়ীর নিকট যে সত্য করিয়া আসিয়াছিলাম, বিলাতে পদার্পণ করিয়াই তাহার প্রথমটি ভঙ্গ করিলাম। অর্থাৎ, টেলিগ্রাফ আর করিলাম না। ভাবপ্রধান ভারতবর্ষ হইতে কর্ম্মপ্রধান বিলাতে আসিবার পথেই এই প্রাকৃটিকাল জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলাম। আমি যখন বিলাতে আসিলাম, তখন আমাদের 'টর্ম্' খুলিবার বিলম্ব আছে। সুতরাং আমি লণ্ডনে না থাকিয়া, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভ্রাতৃসম্পর্কীয় আমার যে আত্মীয় এডিনবরায় ডাক্তারী শিখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার বাসায় গিয়া উঠিলাম। প্রাচীন এডিনবরায় সহস্রবৎসরব্যাপী ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব, ভগ্নাবশেষপ্রাসাদ, সুরম্য উদ্যান, বিচিত্র গ্রাম্যসৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যসম্পাদনকারী প্রিয়দর্শনের স্পর্শের মত তৃপ্তিকর জলহাওয়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রায় দুই মাস কাল এডিনবরায় অতিবাহিত করিলাম। আমার আত্মীয় সেই বৎসর ডাক্তারীতে শেষ পরীক্ষা দিতেছিলেন, এবং প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি অনেক দিন এডিনবরায় ছিলেন, এবং পাশ্চাত্য ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতাবিবর্জ্জিত হইয়া নিজের চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য বরাবর রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। এ জন্য এডিনবরার সকলেই তাঁহাকে খাতির করিত ও ভালবাসিত। এই আদর্শ ছাত্রটি এখানে অনেক বর্দ্ধিষ্ণু ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত ছিলেন। আমার এই আত্মীয় কিছু মৌন প্রকৃতির লোক বলিয়া চিঠিপত্রের বড় বাড়াবাড়ি করিতেন না। এই জন্য দেশে তাঁর অনেক আত্মীয় তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া ও তাঁহার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন। যাক্, তাঁহার আত্মীয় বলিয়া তাঁর বন্ধুপরিবারের অনেকগুলির সঙ্গে আমিও এই অনতি-দীর্ঘকালের মধ্যে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এডিনবরায় প্রবাস আমার ইতিহাসে একটি যুগসৃষ্টিকারী অধ্যায়। কেন, নীচের এই চিঠিখানি পড়িলে বুঝা যাইবে। চিঠিতে যে ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহাই এই আখ্যায়িকার সূত্রপাত।

—"প্রিয় বামাচরণ! 'জেসীর খবর কি? জেসীর খবর কি?' ক'রে তুমি আমায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলে! এত দিনে তোমার জেসীর সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু খবরদার! এ চিঠি যাকে তাকে দেখিও না, বা এ সম্বন্ধে যার তার কাছে গল্প করো না। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, তাতে এ রকম ব্যাপারে আমি

সহজেই অন্য লোকের চেয়ে আমাকে বেশী ভুল বোঝা তোমার পক্ষে আদবেই অসঙ্গত নয়। তবে এই ক' বছরে তোমার মন জেনেছি; তাতে তুমি যে আমায় ভুল বুঝবে না, সে বিশ্বাসও আমার হয়েছে। তাই কোন কথা গোপন না ক'রে সব কথাই তোমায় খুলে লিখছি। সেজ দাদার একজামিন হয়ে গেছে। তাঁর আর এখানে ভাল লাগছিল না। আমিও আপাততঃ বেকার। সুতরাং আমরা দিনকতকের জন্য পল্লীগ্রাম অঞ্চলে একটু ঘুরে আস্‌তে গেছলুম। আমরা যখন গ্রামে গিয়া পঁহুছিলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সেখানে হোটেল নেই, কাজেই সে রাত্রে আর বাসা খুঁজে নিয়ে থাক্‌বার সুবিধা হল না। সেজদাদার একটি স্ত্রী-বন্ধুর বাড়ী এই গ্রামে। আমরা সে রাত্রির জন্য তাঁরই অতিথি হয়ে রইলুম। বাড়ীখানি বেশী বড় নয় বটে, কিন্তু ছোট্ট একটি নদীর প্রায় উপরে অবস্থিত। ষ্টেশনের এত কাছে যে, ঢিল্ ছুড়ে ফেলা যায়। বাড়ীতে দুটিমাত্র লোক, এবং দুটিই স্ত্রীলোক। আমরা যাঁর অতিথি হয়েছিলুম, তাঁর নাম মিসেস হেরণ, বয়স অনুমান ৬৫ হ'বে। তাঁর নিজের ছেলে পুলে কিছুই নেই। কিন্তু ভাইপো, ভাইঝি, বোনপো, বোনঝির অভাব নাই। এ ছাড়া গ্রামের সকলেরই তিনি মা। এবং তাঁর মিষ্টি স্বভাবের খাতিরে সবাই তাঁর বাধ্য, সকলেই তাঁকে ভক্তি করে। মেরী তাঁর এক বোনঝির নাম। বয়স প্রায় উনিশ হবে। সে তার মাসীর কাছেই থাকে। মেরী দেখতে সুন্দরী। এখুনি হেস না; আগে সব কথা শোনো, বলতে দাও। আমরা যখন গেলেম, মেরীর একটি দশ বছরের বোন ও চার্লস ষ্টুয়ার্ট বলে আর একটি ছোক্‌রা তখন ছুটিতে সেখানে এসেছে। ষ্টুয়ার্টের সঙ্গে সেজদাদার অনেক দিনের আলাপ, এবং সেই খাতিরে আমার সঙ্গেও খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আমরা আর তাকে মিষ্টার ষ্টুয়ার্ট বল্‌তুম না; চার্লি বলেই ডাকতুম। আমরা দিন দুই থেকে চলে আস্‌বো মনে করে গেছলুম। কিন্তু মিসেস্ হেরণ ছাড়বার লোক নহেন। সুতরাং দু'দিনের যায়গায় আমাদের আট দিনের উপর হয়ে গেল। 'আর্ণস ভিউ'য়ে (মিসেস্ হেরণের বাড়ীর নাম) ঘর তত বেশী নাই; সুতরাং আমি ঠিক তাঁর বাড়ীর সাম্‌নে আর একটা বাড়ীতে একটা ঘর নিয়ে ছিলুম। তাতে একটা বিছানা ছিল। চার্লিতে আমাতে তাতেই শুতুম। সেজদা' মিসেস হেরণের বাড়ীতেই থাক্‌তেন। ঘর আমি একটা আলাদা নিয়েছিলুম বটে, কিন্তু সেখানে কতক্ষণই বা থাকা হ'ত? সমস্ত দিনই আর্ণস ভিউয়ে কাট্‌ত, কেবল একবার

ছিল। বোধ করি সেই জন্যই তাকে আমার অত ভাল লাগ্‌ত। অতএব বুঝতেই পারছ, ঘুম যতটুকু হত!

মিসেস হেরণের আদর যত্নের কথা আর তোমায় কি বল্‌ব! দেশে থাক্‌তে আমরা মনে কর্ত্তুম, যত্ন আদর কত্তে আমাদের মত বুঝি কেউ নয়। কিন্তু মিসেস হেরণের ব্যাপার দেখে আমার সে ধারণা গেছে। মার্কিণ রোডস্ সাহেবকে বার বচ্ছর ধ'রে তোমরা নিজেদের এক জনের মত করে কি ভাবে রেখেছিলে, জান ত? ঠিক সেই রকম যত্নে, বরং তারও চেয়ে বেশী করে মিসেস হেরণ আমাদের রেখেছিলেন। বাড়ীর কোন স্থানই আমাদের অগম্য ছিল না। খাবার পাছে জুড়িয়ে যায় বলে অর্দ্ধেক দিন আমরা রান্নাঘরে বসে খেতুম; সুধু তাই নয়, মিসেস হেরণের ধারণা, তিনি ও মেরী নিজে হাতে ক'রে সব না কল্লে আমাদের কষ্ট হবে। চাকর বাকরের কিছু করবার হুকুম ছিল না। এর উপর আমাদেরও বসে থাকবার যোটি ছিল না। তিনি নিয়ম করেছিলেন, গৃহস্থালীর কাজে আমাদের মধ্যে যে তাঁর সহায় হবে, সে 'কার্ভ' করবার অধিকার পাবে। সুতরাং সে সম্মানলাভের জন্য আমরা প্রত্যেকে প্রাণপণে চেষ্টা করতুম। কেউ বা আলু কুটে, কেউ বা মশলা পিষে, এমন কি, কেউ বা উনুন ধরিয়ে দিয়ে প্রতিদ্বন্দিতা করতুম। মেরী এই সুযোগে খুব ফাঁকি দিত। কেবলই বল্‌তো,—'আমি আস্‌ছি'। কিন্তু তাই বলে মনে করো না, মেরী কিছু কম খাট্‌তো। গৃহস্থালীর সমস্ত ভারই তার উপর ছিল, এবং এক দিনের জন্যে কেউ বল্‌তে পার্‌বে না যে, বেবন্দোবস্ত হয়েছিল। আমি বুঝতে পাচ্ছি, তুমি ফের হাস্‌ছো। কিন্তু তাই বলে আমি মিথ্যা কথা কি করে কই। হাস আর যাই কর, মেরীর মত মেয়ে ভাই। আমি কখনও দেখি নি! এক দিনের কাণ্ড শুন্‌বে? ড্রইং-রুমে বসে মিসেস হেরণেতে আমাতে এক দিন গল্প কচ্ছি, বাড়ীর কথাই বেশী হচ্ছে। শুনতে শুনতে তাঁর চোক দিয়ে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে দেখে আমি অন্য প্রসঙ্গের অবতারণার চেষ্টা কচ্ছি, এবং তিনিও নিজেকে সাম্‌লে নেবার জন্য কি একটা কাজের অছিলে করে পাশের ঘরে চলে গেছেন। এর মধ্যে মেরীটা কখন এসে উপস্থিত হয়েছে, আমি কিচ্ছু জানতে পারি নি; এবং ফস্ করে রুমাল দিয়ে আমার চোক বেঁধে আমার মাথায় টোকা মেরে দাঁড়িয়ে আছে! আমি বল্‌ছি, 'এই চার্লি! কি করিস?' শুনে সে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বল্‌লে, 'এই—এ—মিত্র! ধরতে পারলে না!' এমন মেয়ে কখন কোথাও দেখেছ? তুমি রাগ করো না, বা দুষ্য

কিছু ভেব না; আমার বোধ হয়, আমি মেরীকে ভালবেসেছি। তুমি হ'লে হয় ত প্রেমে পড়তে। মেরী আমায় ভালবাসে কি না, বা আমার সম্বন্ধে কি ভাবে, এখনও ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। ... ...
... ...ইতি—

পুঃ—মেরী ও মিসেস হেরণকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আমি কিছু উপহার দিতে চাই। পছন্দ সম্বন্ধে তোমায় আর কি ব'লে দেব? দাদার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে খাঁটি আমাদের দেশী কোন রকম ভাল জিনিস, যত শিগ্‌গির পার, পাঠাতে চাও। সেজদাদার আজও টাকা আস্‌ছে না কেন? তার যে ভারি কষ্ট হচ্ছে। অন্ততঃ দাদাকে বলে তার একটা বন্দোবস্ত করতেই চাও। বুঝলে? গাফিলি করো না। বেণী বাবুর খবর কি? আজও কি সে সেই রকম নিজের পকেট থেকে সব খরচ চালাচ্ছে? খোকা কত বড় হ'ল? সে কি বলে? নিমু আজও ফেরেনি? পার্লামেণ্ট এখন বন্ধ। কাগজের জন্য এ মেলেও কিছু লিখতে পারলুম না। ৪ নং * কি বলে? মনে করো না যেন, মেরীর ছবি পাবে; সেটি হচ্ছে না। ভেবেছ, scandal mongering করে বেড়াবে—আমার costএ?—তা আর নয়।"

উল্লিখিত ঘটনার অব্যবহিত পরেই আমি এডিনবরা থেকে লণ্ডনে এসেছি। আমাদের 'ইন্' খুলিবার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অন্য কোনও বাসা ভাড়া না করিয়া আমার শ্বশুরের বন্ধু মিঃ মুখার্জ্জির বাটীতেই বাসা লইয়াছি। মিসেস মুখার্জ্জি ও তাঁহার মাতা বিলাতী রমণী; কিন্তু সে কারণে আমার কোন অসুবিধা নাই। বরং মিসেস মুখার্জ্জিকে আমি ঠিক ব্রাহ্মণীরূপে পরিণত করিয়াছি, এবং তাঁহার সাহায্যে লুচি, মাছের কচুরি, মুগের ডালের খিচুড়ি, ডিমের কালিয়া, চিঁড়ের পরমান্ন এবং ছানার পায়েস প্রভৃতি দেশী সুখাদ্যের চলন ইহাঁদের পরিবারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বরং সুখেই আছি। একদিন এই রন্ধন ব্যাপার লইয়া টেবিলে খুব হাসিও পড়িয়া গিয়াছিল। সে দিন সুজীর পায়েস হয়, এবং সুলতানা অর্থাৎ কিস্‌মিস্ না দিয়া মিসেস মুখার্জ্জি পায়েস রাঁধিয়াছেন, এই কথা বলিতে গিয়া তিনি বলেন, I have cooked the suji without the Pa-esh. হাসির চোটে মিঃ মুখার্জ্জির ও আমার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল! আমার সম্বন্ধীদের পরামর্শের যদি কোন মূল্য

* বামাচরণের চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীকে আমি '৪ নং' বলিতাম। হিসাবে তৃতীয় বটে, কিন্তু মাঝে

থাকে, তবে সেই মত কাজ করিয়া মুখুর্জ্জ্যে সাহেবের অশীতিবর্ষীয়া শ্বাশুড়ীকে 'গুল'লওয়াইতে পারিলেই আমার ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়। অপরং বা কিং ভবিষ্যতি!

ইতিমধ্যে বিবিধ ভাষায় এবং বিচিত্র বিষয়ে বামাচরণের সহিত আমার যে দিস্তার উপর দিস্তা পরিমাণ পত্রব্যবহার চলিয়াছিল, পাঠকের তাহা জানিয়া কাজ নাই। পাঠিকার তাহা জানিতে নাই।

৩

আমি বিলাতে যাইবার অনুমান দেড় বৎসরের মধ্যে বাছাবাছা গুটিকতক পরামর্শ প্রদান করিয়া সেজদাদা দেশে ফিরিলেন। চার্লি, নিমু এবং আমার বাকি ছুর্ব্বিষহ দেড় বৎসর লইয়া আমি বিচিত্র বিজন প্রবাসে পড়িয়া রহিলাম। মিসেস মুখার্জ্জি এংলো-ইণ্ডিয়ান নন, সুতরাং নেটিভবিদ্বেষিণী ছিলেন না। নচেৎ তিনি নেটিভকে বিবাহ করিতেন না। অধিকন্তু মিষ্টার মুখার্জ্জি এক জন প্রসিদ্ধ পার্শী বণিকের প্রাইভেট সেক্রেটারী থাকায় ভারতবর্ষীয়দের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়াছিল। তাঁর স্বামীর বন্ধুর জামাই বলিয়া আমায় খুব যত্ন করিতেন; বাজে লৌকিকতার একটা পুরু পরদার আড়াল আনিয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা অকারণ অন্ধকারের সৃষ্টি করেন নাই। এ জন্য প্রবাসে থাকিয়াও আমার অনেকটা মনে হইত, যেন বাড়ীতেই আছি। আমার সহযোগী অন্য প্রবাসী বাঙ্গালীর তুলনায় এ সৌভাগ্যটুকু আমিই লাভ করিয়াছিলাম।

অধ্যয়ন ও পরীক্ষাদানের মধ্যে যে অবকাশ পাইতাম, তাহা আমাদের আবাস-সংলগ্ন উদ্যানে, বা ব্রিটিশ মিউজিয়মে, বা পার্লামেণ্টে লেক্‌চার শুনিয়া কাটাইয়া দিতাম। থিয়েটার বা মিউজিকে দৈবাৎ কখনও কখনও যাইতাম বটে, কিন্তু নাচ তামাসা আমি বড় ভালবাসি না। দীর্ঘ অবসরে মিসেস্‌ হেরণের আর্ণস্‌ ভিউয়ে যাইতাম। কোন বার বা ছ'দিন, কোন বার বা দশ দিনও থাকিতাম। মেরী সেখানে অচলা ছিল; সুতরাং তাহার সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতে লাগিল। মিসেস হেরণের চাকর দাসীর অভাব ছিল না। কিন্তু আমার সমস্ত কাজ মেরী নিজে করিত। মিসেস হেরণের ইহাতে আপত্তি ছিল না। বরং তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন। মেয়েছেলে আলস্যের উপাসনা করিবে, ইহা তিনি মোটে দেখিতে পারিতেন না। কোন দিন হয় ত আমার কোটের বোতাম ছিঁড়িয়া গেছে, আমার তত খেয়াল নাই; কিন্তু পরদিন কোট পরিতে গিয়া

আলস্যের খাতিরে একটা নেক্‌টাই দু' তিন দিন ব্যবহার করিতেছি। হঠাৎ একদিন কাপড় পরিতে গিয়া দেখিলাম, সেটার স্থলে অন্য একটা নেক্‌টাই রহিয়াছে। বুঝিলাম, মেরীর ইচ্ছা নয়,—একটা উপরি উপরি দু' তিন দিন ব্যবহার করি। আমার একটা নেশা ছিল, আমি নিজের জুতা নিজে ছাড়া আর কাউকে ব্রস্‌ করিতে দিতাম না। মেরী ইহা জানিত ও বুঝিয়াছিল,—এটা আমার একটা মৌতাৎ। সুতরাং সে চাকরদের কখনও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। অন্য বিষয়ে আমার ইচ্ছা সে যেন খড়ি পাতিয়া বলিয়া দিত। এক কথায় মেরী আমার অন্তর্য্যামী হইয়া উঠিয়াছিল। 'আর্ণস ভিউ'য়ে চার্লিতে আমাতে প্রায় এক সঙ্গেই যাইতাম। এবং মহিমাময়ী মেরীর গুণ গান করিয়া যখন নিদ্রার পূর্ব্বে চার্লির কাছে সব কথা বলিতাম, তখন তাহার প্রত্যুত্তরে সে সহজ সরল ভাবে বলিত, "of course, she must do it. It's her duty।" কিন্তু কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের খাতিরে যে এতটা সম্ভব নয়, ভালবাসা বা তাহারই মত কোনও সুকোমল একনিষ্ঠ রমণীহৃদয়-জাত অকৃত্রিম বৃত্তির প্রভাবের ফলেই যে আমার প্রতি মেরীর এই সস্নেহ আচরণের কৈফিয়ৎ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, চার্লিকে তাহা বুঝাইতে হইলে অস্ত্রচিকিৎসার আবশ্যক হইত। আমি ডাক্তার নহি, সুতরাং দ্বিরুক্তি না করিয়া চার্লি যাহা বলিত, তাই নীরবে শুনিয়া যাইতাম। যেখানে যাই না কেন, আমার বিগতজীবনা প্রিয়তমার ফটো একখানি বরাবরই আমার সঙ্গে লইতাম। 'আর্ণস্‌ ভিউ'য়ে যাইবার সময়ও একখানি করিয়া ছবি আমার সঙ্গে থাকিত। যেবারকার কথা বলিতেছি, সেবার লণ্ডনে ফিরিবার আগের দিন রাত্রে তোরঙ্গ গুছাইতে গিয়া দেখি, আমার সে ছবিখানি চুরি গিয়াছে! বুঝিলাম, এ কাজ মেরীর। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। "তোমার স্ত্রীর ছবি আমি কি জানি? আমার তাহাতে দরকার?" প্রভৃতি বলিয়া মেরী কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল, এবং অনেক জেদের পর স্বীকার করিল। যখন ফিরিয়া চাহিলাম, তখন বলিল, "আর ন্যাকাম কর্‌তে হবে না। ওঁর স্ত্রীর ছবি ওঁর কাছে একখানি বই নেই।" আমি পরাস্ত হইয়া আর দ্বিতীয় কথা কহিলাম না। শয়ন করিতে গিয়া মেরীর ব্যবহারের বিষয়ে অনুযোগ করিলে চার্লি বলিল, "I believe she has a right to do it, especially when she says her poor dead sister resembled your late wife so awfully." আমি বোবা হইয়া গেলাম। ফিরেবারে আসিয়া দেখিলাম, সুন্দর ফ্রেমে বাঁধাইয়া অতি যত্নে মেরী সে ছবি তাহার কক্ষে

টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে ;—ছবির নীচে কার্ডবোর্ডের উপরে কাউপারের সেই অমর ছত্রটি—"Oh! that those lips had language!" নিজের হাতের বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে, এবং ছবির চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া একটি কৃত্রিম ফুলের বেড় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। দেখিলাম বটে, কিন্তু আমার স্ত্রীর ছবির প্রতি মেরীর এই সস্নেহ আচরণের কারণ কেবলমাত্র যে তার ভগ্নী ও আমার স্ত্রীর আকৃতিগত সাদৃশ্যপ্রবণতা, তাহা ভাবিতে পারিলাম না। অনেক তর্ক আমার মনে উঠিয়াছিল, এবং রমণীহৃদয়ের রহস্য সম্বন্ধে আমি যে অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করিয়াছিলাম, তাহার সাহায্যে মেরীর এই আচরণের পরিমাণচেষ্টাও করিয়াছিলাম। কিন্তু সে বিষয়ের বিচারে কাজ নাই। দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে মেরীর সঙ্গে আর একবারমাত্র আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন দেখিয়াছিলাম, মেরীর সে বালিকাসুলভ চপলতা প্রৌঢ়া গৃহিণীর দায়িত্ববোধী সহজাত গাম্ভীর্য্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। মেরীকে সেবার বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। সে দিন—শেষ বিদায়ের দিন—আজও সে কথা আমার মনে আছে। সত্যগোপনের আবশ্যক নাই। নিঃসন্তান বৃদ্ধা বিধবার অকৃত্রিম অশ্রুজল ও তাঁহার বিদায়কালীন আচরণ দেখিয়া যথার্থই আমার মনে হইয়াছিল, আমি প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিতেছি না ; যেন গৃহত্যাগ করিয়া প্রবাসযাত্রা করিতেছি। আমিও চক্ষের জল রাখিতে পারি নাই। মেরী কাঁদিয়াছিল কি না, ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু সে যখন আমায় গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিল, তখন দেখিলাম, সূর্য্যোদয়ের সময় যেমন সমুদ্রের নীল জল লালাভ হইয়া উঠে, তাহার সেই নিবিড়নীল চোখ দুটি তেমনই লাল-আভা-যুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার আরক্তিম কপোলে কে যেন সদ্যোজাত শিশিরস্নাত গোলাপ বসাইয়া দিয়াছে। মেরী আমার সহিত কথা কহিল না—তাই বলিব ? না বলিব,—কথা কহিতে পারিল না ? যাই হউক, আমি গাড়ীতে উঠিলে সে কাগজের একটা মোড়ক আমার হাতে দিল। আমি তাহার হস্ত চুম্বন করিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মোড়ক খুলিয়া দেখিলাম, একখানি রেশমের রুমাল,—তাহার এক কোণে আমার নামের মনোগ্রাম, এবং আর এক কোণে Forget me not ফুলের একটি গুচ্ছের উপর Remember কথাটি সুচারু সূক্ষ্ম সূচের অক্ষরে লেখা। এবং তাহার নীচে, আমার স্ত্রীর লোহার দরুণ সেই সোনাটুকু দিয়া আমি যে একটা স্কার্ফপিন করাইয়াছিলাম, সেইটি বিদ্ধ রহিয়াছে। মেরীর হৃদয়ের রহস্য

চরিত্ররক্ষা ও ব্যবসায়োপযোগী মার্কা-মারা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া প্রায় চার বৎসরের পরে দেশে ফিরিলাম। আমার যে কয় জন বন্ধু ভয় করিয়াছিলেন—মেম বিবাহ করিয়া আসিব, তাঁহারা ট্রেন হইতে আমায় একলা নামিতে দেখিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হাবড়া ষ্টেশনে প্রথম পদার্পণ করিতেই বামাচরণ বলিল, "এই! মেরীর ছবি কই? দেখি!" মেরীর সে রুমাল আমার পকেটেই ছিল। আমি বামাচরণকে দিলাম। দেখিয়া সে বলিল, "শুধু একটা বাজে Keepsak—ধেৎ।"

৪

ইহার পর প্রায় দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমার পশার প্রতিপত্তি নাম ও প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এখন প্রতিষ্ঠিত। লোকে বলে, ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় আমি এখন দ্বিতীয় মনোমোহন ঘোষ। তাঁহার মত আমি চিঁড়ে-প্রিয় বলিয়া বামাচরণ যখন তখন ঠাট্টা করিয়া বলে,—'তোমার চিঁড়ে খাবার ফল ফলেছে!' আমার শ্বশুরের আত্মীয় বন্ধু অনুচর-বর্গ বলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে আমি তাঁহার কাগজের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব! আমিই এখন সবএডিটার, কার্য্যতঃ আমিই সব করি, আমার শ্বশুর কেবল পাশ করেন মাত্র। আমার একটা মস্ত রোগ আছে,—কেহ কাছে না থাকিলে আমি এক কলমও লিখিতে পারি না। অথচ লিখিবার সময় কেহ একটা কথা কহিলে আমার লেখা হয় না! বামাচরণ তাহাদের পার্টিসনের পর হইতে আমার বাড়ীর খুব নিকটেই থাকিত, এবং তাহার একটা মস্ত গুণ ছিল, এক ছিলিম তামাক ও যা হ'ক একখানা সাময়িকপত্র তাহার হাতে দিয়া আমার পাঠাগারের আরামচৌকিতে তাহাকে কোনও গতিকে শোয়াইতে পারিলে সে নীরবে পড়িতে থাকিত। সুতরাং আমার অভীষ্টসিদ্ধির খুবই সুযোগ হইত। তাই কাপি লিখিবার সময় প্রায়ই বামাচরণকে টানিয়া লইয়া যাইতাম, এবং লেখা শেষ করিয়া তাহার মতামত জানিবার জন্য তাহাকে শুনাইতাম। বামাচরণের লজিক বড় সুবিধা গোছের ছিল না। কিন্তু ভাবপ্রবণতায়, ভাষার শালীতায় ও বাক্যবিন্যাসে সে সিদ্ধহস্ত। সুতরাং যাই লিখি না কেন, ছাপায় বাহির হইবার পূর্ব্বে তাহাকে না শুনাইয়া আমার তৃপ্তি হইত না। শুধু তাই নয়; বামাচরণের জননী এক জন খ্যাতনামা গ্রন্থকর্ত্রী। সামাজিক বা গার্হস্থ্য প্রবন্ধ লিখিবার সময় তাঁহার মতের উপর আমায় অনেকটা নির্ভর করিতে হইত।

বামাচরণের মত সহজে বুঝাইতে পারিতাম না। সুতরাং আমার পক্ষে বামাচরণ যে অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল, অর্থাৎ সাহিত্যিক বিষয়ে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। যাক্, সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া জীবনের অপ্রতিহত গতি নিতান্ত একঘেয়ে রকমে বহিয়া চলিয়াছে। রোমান্স নাই, কবিতা নাই। সত্য বলিতে কি, রন্ধনে দ্রৌপদী হইলেও বৌঠাকরুণ এমন বেতালা যে, বাড়ীতে একটু হারমোনিয়মের সুর অবধি নাই। থাকিবার মধ্যে আছে কেবল দাদার বিহঙ্গমমণ্ডলীর বিচিত্র স্বরাভাস, তাস, পাশা ও দাবা, এবং পণ্ডিত মহাশয়ের যত্নে হরের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত মুড়ি, নারিকেল, শশা ও কাঁচা লঙ্কা। যদি বল, কেন খোকা এবং দাদার ছেলে হীরেন? খোকা ত তার দিদিমার কাছেই থাকে, ক্বচিৎ কখনও দু' এক দিন এখানে রাত্রিযাপন করে। হীরেন? তার ত টিকি দেখবার যো নাই। বামাচরণের ছেলে শিবে তার "বন্দুক" (বন্ধু, হওয়া অবধি সে একরকম সেইখানে থাকে বল্লেই হয়। তবে বৈচিত্র্য যে একেবারেই ছিল না, তাহা বলিতে পারি না। বামাচরণ নিতান্ত অতর্কিতভাবে ৪নংকে সোহাগ করিতেছে, হয় ত ৪ নং যখন নিতান্ত অতর্কিতভাবে আমাদেরই জন্য দারুণ উৎসাহে রন্ধনশালায় বসিয়া লুচি বেলিয়া দিতেছে, অথবা ফুলকপি ও ভেটকি মাছের পুর দিয়া কচুরী করিতেছে, তখন অকস্মাৎ ঠিক তাহার মাঝখানে গিয়া পড়িয়া তাহাদিগকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়া তাহাদের সলজ্জ হাসি দেখিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিতাম, তাহা যে যথার্থই বৈচিত্র্যের উপাদানে প্রস্তুত, তাহাতে সন্দেহমাত্র ছিল না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এত আত্মীয়তা সত্ত্বেও মেরীর সহিত কখনও পত্রব্যবহার ছিল না। আমি দেশে ফিরিয়া আসিয়াও মেরীর খবর পাইতাম, কিন্তু সে চার্লির পত্রে। এই কয় বৎসরে মেরীর অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। মেরী তার মাসীর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া এক সিভিলিয়ানকে বিবাহ করে, এবং তাহার সহিত কলিকাতায় আসে। আমি ফিরিয়া আসিবার ৩।৪ বৎসরের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। তার পর আমি মেরীর সহিত বার কয়েক সাক্ষাৎ করিতে যাই, এবং আমার সহিত তাহার উত্তরোত্তর আন্তরিকতাশূন্য ব্যবহার ও উপেক্ষা ও অবহেলার ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার সংস্রব ত্যাগ করি।

কলিকাতার সমাজে অতি অল্প দিন থাকিয়াই মেরী ঘোর এংলোইণ্ডিয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম, তাহার স্বামীর প্রভাব অতিক্রম করিতে

না পারিয়াই মেরীর এই অধঃপতন হইয়াছিল। তাহার স্বামীর সহিত আমার নামমাত্র পরিচয় ছিল।

৫

সে বৎসর পূজার অবকাশে বর্ম্মায় বিজয়ের নিকট গিয়াছি। আমার যাইবার পর প্রায় দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। একদিন সকালে অনুমান বেলা ১০টার সময় বিজয়ের বাংলোর বারান্দায় আরামচৌকিতে বসিয়া চুরুট টানিতে টানিতে Mandalay Herald পড়িতেছি, এমন সময় একটা লোক আসিয়া অভিবাদন করিয়া যাহা জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইতে বুঝিলাম, কোনও জরুরী কাজের খাতিরে সে বিজয়কে তখনই চায়। বিজয় তখন পরিদর্শন কার্য্যে বাহির হইয়াছিল, এবং ১১টার সময় ফিরিবে, তাহা আমি জানিতাম। সুতরাং "এখনই ফিরিবে" বলিয়া লোকটিকে আমি বসাইলাম, এবং এ কথা সে কথার পর বুঝিলাম, চন্দরের অর্থাৎ বিজয়চন্দ্রের তেজারতী কারবারসংক্রান্ত কোনও বিষয়কার্য্য উপলক্ষে সে বিজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

লোকটা বাগানের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল; আমি কাগজ পড়িতে লাগিলাম। পড়িতে পড়িতে এক স্থলে দেখিলাম, স্থানীয় District settlement officer একটি মিথ্যা মোকদ্দমায় পড়িয়াছেন। প্যারাটি শেষ করিবার পূর্ব্বেই কিন্তু চন্দরের বাইক আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং অনতিবিলম্বে সোলার টুপি হাতে করিয়া সে আসিয়া দেখা দিল। লক্ষ্য করিলাম, চন্দর আজ বড় গম্ভীর। আমার সঙ্গে কোনও কথা না কহিয়া চন্দর সেই লোকের সঙ্গে অন্য ঘরে গেল, এবং অনুমান আধ ঘণ্টা পরে ছোট একটি ক্যাশ বাক্স লইয়া আমার নিকট আসিয়া বসিল। "কি-ও?" বলিয়া আমি বাক্সের ঢাকা খুলিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, মণি-মুক্তার খানকয়েক অলঙ্কারের সঙ্গে হীরা-বসান একটি ময়ূরপুচ্ছের ব্রূচ রহিয়াছে। হঠাৎ একটু তফাৎ হইতে দেখিলে ঠিক যেন একটি সমুজ্জ্বল ধূমকেতুর মত বোধ হয়। "দিব্য জিনিসটি ত? লোকটা যদি ছাড়াতে না পারে ত তোমার গুরু মশাইনীকে ওটা আমি প্রেজেণ্ট করিব" বলিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া দিলাম। "আর দু' শো' টাকার প্রেজেণ্টে কাজ নেই" বলিয়া বাক্স লইয়া চন্দর তাহা লোহার সিন্দুকে তুলিতে গেল।

চন্দর লোকটা খুব জোগাড়ে। এর মধ্যে কখন যে সেই অভিযুক্ত Settlement officerএর মোকদ্দমায় আমায় নিযুক্ত করিয়া ৩০০০৲ টাকায়

আমি আমার মক্কেলকে লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসিলাম। আমাকে উপলক্ষ করিয়া মিলার একটা মস্ত 'পার্টি' দিল।

৬

বহুকাল যাবৎ আর মেরীর সহিত কোনও সম্পর্কই ছিল না, এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাহার স্বামীর সহিত আমার সামান্যই পরিচয় হইয়াছিল। তা' ছাড়া, 'মিলার'টা এত সাধারণ নাম যে, আমার এই মক্কেল মিলারের মেরীর স্বামী মিলার হওয়া যে একেবারেই অসম্ভব নয়, তাহা আমি খেয়ালই করি নাই। যখন জানিতে পারিলাম, মিলার মেরীর স্বামী, তখন আমি কিছুতেই টাকা লইতে স্বীকৃত হইলাম না। মিলারও ছাড়ে না, মেরীও ছাড়ে না; শেষ অনেক হাঙ্গামার পর আমি সহস্র মুদ্রা লইতে স্বীকার করিলাম। তবে মেরীর সঙ্গে এ কথাও হইল, আমি যেমন তাহার অনুরোধে টাকা গ্রহণ করিতেছি, তাহাকেও তেমনই কোনও একটা বিশেষ বিষয়ে আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে। কৃতজ্ঞহৃদয়া মেরী কাঁদিয়া ফেলিল। চন্দর মফস্বলে চলিয়া গেল, এবং মেরী ও তাহার স্বামীর অনুরোধ এড়াইতে না পরিয়া চন্দর ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাহাদেরই বাড়ীতে রহিলাম। ডিনারের পর রোজই অনেকক্ষণ ধরিয়া গল্প হয়। একদিন কি কথায় মেরী বলিল, "দেখ, ময়ূরের পালক আমাদের কেমন সয় না। সত্যি বলতে কি, সেই পাখা এসে অবধি কিন্তু আমার একদিনও ভাল যায় নি। তবে আমি বড় ভালবাসি বলে এখানে আসিবার সময়েও চাট্টি খুলে নিয়ে একটা ব্রুচ করিয়েছিলুম।" মেরী জানিত না,—আমি জানি, সে ব্রুচ কোথায় কেমন করিয়া কাহার কাছে গিয়াছে। মফস্বল হইতে বিজয়চন্দ্র ফিরিয়া আসিলে আমি কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগ করিলাম, এবং ফিরিবার পূর্ব্বদিন তাহাকে টিকিট কিনিতে পাঠাইয়া তাহার লোহার সিন্দুক খুলিলাম, এবং মেরীর যে যে অলঙ্কার তাহার নিকট ৮০০৲ টাকায় বন্ধক ছিল, তাহা লইয়া তাহার স্থলে আটখানি নোট রাখিয়া দিলাম, এবং সেই ময়ূরপুচ্ছের ধূমকেতু ব্রুচটি চন্দরের স্ত্রীকে দিয়া অসিলাম।

পরদিনই রওনা হইলাম, এবং যথাসময়ে কলিকাতায় পঁহুছিয়া দেখিলাম, টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে মিলার আমায় ৪০০০৲ টাকা পাঠাইয়াছে। তার সঙ্গে এক টেলিগ্রাম। তাহার মর্ম্ম এই, 'খরচা বাবদে এবং তার বিপক্ষে আর মোকদ্দমা করিব না বলিয়া উইলসনের নিকট হইতে এই টাকা আদায় হইয়াছে। ইহা

আমিও কালবিলম্ব না করিয়া মেরীর সেই বন্ধকী অলঙ্কার ও নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিলাম ;—

"মেরী ! আমার অত যত্নের উপহার এবং তোমার অত সাধের জিনিস সেই ময়ূরপুচ্ছের পাখাই তোমার ভাগ্যবৈগুণ্যের মূল বলিয়াই তোমার ধারণা হইয়াছিল জানিয়া, আমি তোমার সেই সপুচ্ছ ব্রূচটি নিজে লইয়াছি। কি বিচিত্র কুসংস্কার ! তাই বা কেমন করিয়া বলি ? যস্মিন্ দেশে যদাচার। অমন যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রশান্তপ্রভ ধূমকেতু, তাহাকেও আমাদের দেশে অলক্ষণ-সূচক বলিয়া মনে করে। তোমার সে ব্রূচ হঠাৎ দেখিয়া আমি তাহাকে ধূমকেতুর সহিত উপমিত করিয়াছিলাম। তাই এক একবার মনে হয়, হয় ত বা তবে সত্যই অশুভ। যাই হ'ক, আশা করি, এখন থেকে তোমার সৌভাগ্য-লক্ষ্মী অক্ষুণ্ণ থাকবেন। তোমার দেশের বাড়ীতে যদি সে পাখা আজও থাকে, তবে তাহা নষ্ট করিও। যদি দগ্ধ করিয়া নষ্ট কর, তবে সে ভস্ম আমাকে দিও ; আমাদের দেশে শিশু-চিকিৎসায় তাহার ব্যবহার আছে।

"তোমার মনে আছে, আমার কাছে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে, কোন একটি বিশেষ বিষয়ে আমার অনুরোধ রাখিবে ? আজ আমি সেই অনুরোধ করিতেছি, এবং ভরসা করি, তুমি তাহা রাখিবে। আজকের ডাকে আমি যে পার্শেল পাঠাইলাম, তাহা গ্রহণ করিও, এবং সে সম্বন্ধে আমায় কোন প্রশ্ন করিও না। মিলারকে আমার অভিবাদন দিও। লিলিয়ান কি বলে ? তার নূতন আর কি খেলনা চাই ?

"তোমাদের শ্রী—"

ব্যাপারটা এইখানে শেষ হইলেই গল্পটার বেশ Dramatic ending হইত ; কিন্তু তাহা হইলে সত্যের অপলাপ হয়। তাই আর একটিমাত্র ছত্রের প্রয়োজন।

চন্দরের স্ত্রী একদিন সেই ধূমকেতু-ব্রূচ পরিয়া মেরীর বাড়ী নিমন্ত্রণে যায়। মেরী সে কথা আমায় চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিল। ইহার এক মাসের মধ্যেই খবর আসে, চন্দরের চাকরী গিয়াছে।

পাঠক ! এ আখ্যায়িকার কি নাম হইবে ? ধূমকেতু ? পাঠিকা বলিতেছেন, "না, ময়ূরপুচ্ছ !" ইহার উপর আর কথা নাই, সুতরাং 'আমেন্' !

সহযোগী সাহিত্য।

জীবনচরিত।

কর্ণেল মহারাজা স্যার প্রতাপ সিংহ।

মানব সহজাত প্রবৃত্তিবশে শৌর্য্যানুরাগী। বীরমহিমার নিকট সকলের মস্তক সহজেই ভক্তিনম্র হইয়া পড়ে। নিখিলরসজ্ঞ কবি বা বিশ্বরহস্যভেদী দার্শনিক, রণকুশল যোদ্ধা বা নিঃস্বার্থ কর্ম্মযোগী এই মর্ত্ত্যভূমিতে অলৌকিক ক্ষমতা লইয়া যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের সময়ে মহারাজ প্রতাপ সিংহ ভারতবর্ষের এইরূপ এক জন মহাপুরুষ। স্যার প্রতাপ আজ সর্ব্বত্র পূজিত; তাঁহার পবিত্র নাম, বিশ্ববিখ্যাত বীর চিতোরের মহারাণার চিরার্চ্চিত শুভ স্মৃতি অম্লান রাখিয়াছে। এই মহাত্মার মহনীয় জীবন-কথা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, সন্দেহ নাই। কোন বিখ্যাত পত্রে তাঁহার যে ক্ষুদ্র জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহার সারভাগ গৃহীত হইল।

মহারাজাধিরাজ কর্ণেল স্যার প্রতাপ সিংহ G. C. S. I., K. C. B., LL. D. ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যোধপুর দুর্গে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহারাজ তক্ষৎ সিংহের দ্বিতীয় পুত্র। আলমন্দের রাজ্ঞী তাঁহার জননী। প্রতাপ বাল্যকালেই অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। কথিত আছে, জনকের সহিত 'বালসমুদ্র' প্রাসাদে অবস্থিতিকালে, বালক প্রতাপের হস্ত হইতে একটি বানর মিষ্টান্ন কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে। কিন্তু, বীর শিশু বানরকে এমন বলের সহিত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন যে, বহু স্থানে দংশন করিয়াও বানরটি তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। কপিবর এই অপ্রত্যাশিত 'শক্ত পাল্লায়' পড়িয়া বিশেষ শঙ্কিত হইয়াছিল। অবশেষে বহু কষ্টে সে বালকের হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়াছিল। মহারাজ শিশু পুত্রের এই সাহসের কথা শুনিয়া নিরতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন; এবং তখনই বন্ধু বান্ধবকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র ভবিষ্যতে এক জন প্রকৃত রাঠোর হইবেন। পিতার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে।

শৈশবের গল্প।

হিন্দী, উর্দ্দু ও পারসী ভাষায় তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি অনায়াসে ইংরাজী বুঝিতে ও কথা কহিতে পারেন।

বাল্যকাল হইতেই তিনি পুরুষোচিত খেলায় বিশেষ অনুরাগী। পোলো (Polo) খেলাতে যে তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা আছে, এ কথা "Morning Leader" প্রমুখ বিলাতী পত্রেও স্বীকৃত। ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে এই খেলার প্রচলন তিনিই প্রথমে করেন। অশ্বানুরাগও তাঁহার অল্প নয়। অশ্বারোহণ অদ্যাপি তাঁহার জীবনের প্রধান প্রসক্তি।

৩১ বৎসর বয়সে তিনি আত্মীয় মহারাজ রাম সিংহের নিকট রাজকার্য্য শিখিবার জন্য জয়পুরে যান। রাম সিংহের মত নীতিকুশল রাজা আধুনিক কালে জয়পুরে বা রাজপুতানায় জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই জয়পুরাবস্থান প্রতাপের

উন্নতির সূচনা।

নিরলস নিষ্ঠা, অনন্যসাধারণ ধৈর্য্য ও নিখিল সংবাদসংগ্রহে সহজ নিপুণতা দেখিয়া, জয়পুর-রাজ অচিরে প্রতাপের অনুরক্ত হইলেন। তদানীন্তন প্রধান সচিবের অযোগ্যতা নিবন্ধন যোধপুর-রাজ্যের অবস্থা বড়ই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতাপের গুণগ্রামদর্শনে, জয়পুরপতি স্বয়ং তাঁহাকে যোধপুরের অধিরাজ যশোবন্ত সিংহের নিকট লইয়া যান। তিনি মহারাজকে জানাইলেন, যুবক প্রতাপ অবকাশ পাইলে উচ্ছৃঙ্খল যোধপুর রাজ্যে অল্প দিনেই শৃঙ্খলাস্থাপন করিতে পারেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। যশোবন্ত সিংহ তাঁহার কথামত প্রতাপকে প্রধান অমাত্য-পদে বরণ করিলেন। তখন প্রতাপ সিংহের বয়স তেত্রিশ বৎসর মাত্র।

যে মহান কর্ত্তব্যভার তিনি একাকী বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন, তাহা যেমন গুরুতর, তেমনই দুঃসাধ্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু অচিরে জয়লক্ষ্মী এই আড়ম্বরহীন ধীরচিত্ত কর্ম্মীকে বিজয়মালা পরাইয়া দিলেন। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে, যিনি যোধপুরের

মন্ত্রিপদে।

উন্নত ও সুশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন, প্রতাপ সিংহের কি অক্লান্ত পরিশ্রম, অসামান্য নিপুণতা ও নিখিল বিঘ্নব্যর্থকর প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল।

ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া, দশ লক্ষ টাকা আয় বাড়াইয়া দেন; মহারাজার (যশোবন্ত সিংহের) রাজত্বাবসানের পূর্ব্বে, প্রতাপের চেষ্টায় রাজস্ব ৫৩ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এত দিন রাজকোষ ছিল না; প্রতাপ সিংহ নূতন রাজকোষাগার স্থাপিত করিয়া, বাৎসরিক আয় ব্যয় নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। যথারীতি বিচারকার্য্যের জন্য বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ব্যবস্থা-সংহিতা (Codes) প্রণয়ন করাইলেন। যে বাষ্পীয় রথের কল্যাণে আজ বহু দেশ সমৃদ্ধ, সে রথ যোধপুরে ছিল না। কিন্তু প্রতাপের চেষ্টায়, কয়েক বৎসরের মধ্যেই ৩৮১ মাইল রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মারবার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি নয়। সে শুষ্ক মরুময় দেশে দুর্ভিক্ষ আর জল-কষ্ট লাগিয়া আছে। প্রতাপ এই দারুণ জলাভাব-দুঃখ মোচন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বর্ষার বারিবিন্দুপাতে পুষ্ট গুটিকতক ক্ষুদ্র জলাশয় যোধপুর নগরের দেড় লক্ষ প্রাণীর সারা বর্ষের তৃষ্ণা কি করিয়া মিটাইত, তাহা "বিগলিত-করুণা জাহ্নবী যমুনার" তীরবাসী আমরা ভাবিতেই পারি না। "বালসমুদ্র" পুষ্করিণীকে বিস্তৃততর ও গভীরতর করিয়া, এবং নবনির্ম্মিত পয়ো-নালীর দ্বারা ইহার সহিত অন্য পুর-পুষ্করিণীগুলির সংযোগ করিয়া দিয়া, প্রতাপ তৃষ্ণার্ত্ত প্রজার জলপানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। "কায়লানা" প্রভৃতি আরও কতকগুলি জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি মারবারবাসীর আন্তরিক আশীর্ব্বাদে ধন্য হইয়াছেন।

মারবারের মত দেশে অরণ্যানীর সংরক্ষণ প্রয়োজনীয় ভাবিয়া, প্রতাপ ১৮৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে উদ্ভিজ্জবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি স্বদেশীয়কে দেরাদুনে পাঠাইয়া দেন। যশোবন্ত সিংহের রাজ্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই, প্রায় পাঁচ লক্ষ বিঘা বিস্তৃত বিশাল অটবী রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দেশের লোক দস্যু তস্করের অত্যাচারে একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতাপ তাহা-

দুর্বৃত্ত হইতেছিল, তিনি তাহাদিগকে ভূখণ্ড ও কৃষির জন্য গবাদি পশু দান করিয়া শান্ত করিলেন। ফলে যাহারা ধনুর্ব্বাণ বন্দুক কৃপাণ প্রভৃতি সংহারাস্ত্রে প্রজাকে নিত্য বিপন্ন করিত, আজ তাহারা কৃষিকার্য্যে রত থাকিয়া প্রজাকে অন্ন দিতেছে।

প্রতাপ স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়া, সকলের বিদ্যার্জ্জনের পথও সুগম করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে স্থানীয় শিক্ষিতেরাই সরকারী পদ পাইতেছেন; পরদেশী অর্থ লুটিবার অবসর পায় না। তাঁহার চেষ্টায় একটি বালিকা-বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে।

ইয়ুরোপীয় ঔষধের প্রচলন, চিকিৎসালয়-প্রতিষ্ঠা, মিউনিসিপাল সমিতির সৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, তিনি দেশের সুখ স্বাস্থ্যও বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন।

জেলের সংস্কার করিতেও তিনি ভুলেন নাই। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যে জেলবাড়ী তিনি নির্ম্মিত করাইয়া দেন, রাজপুতানার মধ্যে তাহা একটি সুন্দরতম কারাগার বলিয়া স্বীকৃত। প্রতাপের নিয়োগের পূর্ব্বে সৈনিকবিভাগও অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। সেনারা যথাসময়ে বেতন পাইত না। প্রতাপ সকলের বাকী বেতন চুকাইয়া, বিদেশীর পরিবর্ত্তে দেশীয় লোককে সেনাদলভুক্ত করিতে লাগিলেন।

১৮৮৯ সালে প্রতাপ স্বয়ং বিখ্যাত "সর্দ্দার রসালার" সৃষ্টি করেন। এক একটি দলে ছয় শত অশ্বারোহী সেনা লইয়া, দুইটি পল্টনে "সর্দ্দার রসালা" সংগঠিত। বাল্যকাল হইতে অশ্বারোহণপটু, কষ্টসহিষ্ণু রাজপুত সেনা রাজপুতানার গৌরব। নিজ হাতে গড়া এই নির্ভীক সেনাদলের অধিনায়ক প্রতাপ স্বয়ং।

জাইগীরদারদিগের সহিত প্রতাপের ব্যবহার ন্যায়বত্তা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, উভয়েরই পরিচায়ক। দস্যুবৃত্তি হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য, তিনি তাহাদের পুরাতন সমস্ত অধিকার ফিরাইয়া দেন। অথচ তাহাদের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিতে কঠোর দণ্ডের বিধানও করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে দয়া ও কঠোরতার অপূর্ব্ব সংমিলন ও অলৌকিক সাহসের উদাহরণস্বরূপ আমরা দুই চারিটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

বর্ডোয়া মারবারের অন্তর্গত দিদওয়ার একটি গ্রাম। সেখানকার মদ্‌খনিরা আগে রাজপুত ছিল, পরে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে। তাহারা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রজাবর্গকে নিরন্তর পীড়া দিতেছিল। প্রতাপ সিংহ শিকার করিতে যাইবার ব্যপদেশে, আপনার কতকগুলি বাছা বাছা রণকুশল সহচরদিগকে উপদেশ দিয়া রাখিলেন, তাঁহার প্রয়োজন হইলে ইঙ্গিতমাত্র যেন তাহারা সাহায্যার্থ উপস্থিত হয়। এইরূপ স্থির করিয়া, তিনি একদিন প্রত্যূষে দস্যুদলের আশ্রয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু প্রকৃতি তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিয়া বসিল। ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি হইতে লাগিল—অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য। তথাপি, অদম্য উৎসাহে অনুপ্রাণিত নিঃশঙ্ক প্রতাপের প্রতিজ্ঞা টলিল না। তিনি অনুচরবর্গের সহিত বরাবর চলিতে লাগিলেন; এবং তাহাদিগকে যথাস্থানে রাখিয়া, তিনি দুই জন মাত্র সঙ্গীর সহিত বগজী নামক দস্যুপতির গৃহে প্রবেশ করিলেন। দস্যুপতি সহসা এই অপ্রত্যাশিত অতিথিকে সম্মুখে দেখিয়া বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া,

বর্ডোয়ার দস্যুদমন।

থামিয়া পড়িল; কিন্তু তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতাপের উদ্দেশে বগজী গুলি ছুড়িল, কিন্তু তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল। তখন প্রতাপ, "রাজপুতের লক্ষ্য কখনও বিফল হয় না" বলিয়া গুলি করিয়া তদ্দণ্ডে দুর্বৃত্তকে বিনষ্ট করিলেন। তার পর যে ছোট খাট যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহাতে এক জন লদ্‌খনি হত ও দুই জন আহত হয়। ফলতঃ দলপতির মৃত্যুতে ভীত হইয়া অবশিষ্ট সকলেই আত্মসমর্পণ করিল। এ দিকে বগজীর স্ত্রী স্বামীর বিনাশসংবাদে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে শত্রুর দিকে ধাবিত হইল। অনুচরদিগকে তাহাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া, প্রতাপ নিজে স্থিরকণ্ঠে চণ্ডীকে নিজের অবস্থা ও কর্ত্তব্য জানাইলেন; এবং ক্ষমা চাহিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন। পরে দস্যুদলকে যোধপুরে বন্দিভাবে আনিয়া, কাহাকেও দণ্ডদানে, কাহাকেও বা পুরস্কৃত করিয়া, বশীভূত করেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখন যোধপুরের পরিশ্রমী নিপুণ কৃষক।

লোহিয়ানার ভীল-দমন।

কিন্তু লোহিয়ানা দলকে দমন করিতে প্রতাপের অধিকতর ক্লেশ হইয়াছিল। লোহিয়ানার রাণার (জাইগীরদার) অত্যাচারে, মারবার ও আরও দুই একটি নিকটস্থ দেশ সন্ত্রস্ত ছিল। অসংখ্য বনস্পতিবেষ্টিত দুর্গম পর্ব্বতে থাকিয়া রাণা নির্ভীক ও বলদৃপ্ত ভীল সৈন্যের সাহায্যে, অকস্মাৎ শ্যেন পক্ষীর মত নামিয়া দেশ লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যাইত। যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বন্দী করা অসম্ভব দেখিয়া তদানীন্তন রেসিডেণ্ট কর্ণেল P. W. Powlett কৌশলে তাহাকে যোধপুরে আনিয়া সতর্ক প্রহরীর পাহারায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দশহরার দিন প্রহরীদের অসাবধানতার সুযোগ পাইয়া দস্যুপতি পলায়ন করিল। তখন প্রতাপসিংহ তাহাকে ধরিয়া দিতে ও তাহার দলকে উচ্ছিন্ন করিতে প্রস্তুত হইলেন। বহুসংখ্যক সেনা লইয়া তিনি লোহিয়ানার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পাঁচ শত রণদক্ষ প্রভুগতপ্রাণ ভীল সহচর লইয়া রাণা দুর্গম পার্ব্বত্য দুর্গে বসিয়া প্রতাপের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছিল। সুতরাং কৌশলময় প্রতাপকে নূতন উপায় অবলম্বন করিতে হইল। তিনি প্রথমতঃ রাণার বনাশ্রয়ের আরও নিকটবর্ত্তী স্থানে শিবিরসংস্থাপন করিয়া, দুই জন ভীলকে হস্তগত করিলেন। দিনমানে ঘাসুড়িয়ার বেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি শত্রুর নানা তত্ত্ব সংগ্রহ করিতেন। কখন তিনি বেশ-পরিবর্ত্তন করিতেন, কখন্ বা শিবির হইতে বাহির হইতেন, তাহা তাঁহার নিজের লোকই জানিতে পারিত না। গভীর রাত্রে নীরবে ফিরিয়া সেনাদিগকে কর্ত্তব্যোপদেশ দিয়া তিনি পুনর্ব্বার ভীল-নারীর বেশে সেই দুটি বিশ্বাসভাজন ভীলপত্নীর সহিত শত্রুর অবস্থা জানিতে বাহির হইতেন। এইরূপে তিন মাসের মধ্যে সমস্ত জ্ঞাতব্য জানিয়া, তিনি নিঃশব্দে গন্তব্য বনপথ পরিষ্কার করাইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই রাণার বহু অনুচর ও আত্মীয় বন্দী হইল। কিন্তু রাণাকে জীবিতাবস্থায় ধরা গেল না। প্রতাপ কর্ত্তৃক নিরন্তর অনুসৃত হইয়া সে অকালে প্রাণত্যাগ করিল। রাণার পুত্র যোধপুরে আনীত হইয়া, শিক্ষার্থ "মেও কলেজে" প্রেরিত হইয়াছিল। লোহিয়ানার দুর্গাদি ও ভীলদিগের সুরক্ষিত গৃহ সকল ধ্বংস করিয়া, যশোবন্তপুর নামক নবনির্ম্মিত নগরে তাহাদের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

সুবিখ্যাত সেনাপতি Earl Roberts প্রণীত গ্রন্থে প্রতাপ সম্বন্ধে যে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন, এখানে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি "ভারতে একচল্লিশ বৎসর" নামক স্বীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"আমার যোধপুরের বন্ধু মহারাজ প্রতাপ সিংহ প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন যে, রাজপুতের চিরপ্রসিদ্ধ শৌর্য্য অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ আছে।" ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রেল প্রভাতে মহারাজ প্রতাপ সিংহ লর্ড রবার্টসের সহিত শূকর শিকার করিতে যান। একটি প্রকাণ্ড শূকর সেনাপতি কর্তৃক দুইবার আহত হইয়া সম্মুখস্থ পর্ব্বতাভিমুখে ছুটিতেছিল। শিকার সেখানে যাইলে তাঁহার অশ্বগতি প্রতিহত হইবে; সুতরাং তিনি পশ্চাৎস্থিত প্রতাপকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, পাহাড় ও শূকরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বরাহকে আমার দিকে তাড়া দাও। স্যার

অমিত বল ও সাহসের পরিচয়।

প্রতাপ সেনাপতির অনুজ্ঞা অচিরে পালনার্থ যেমন শূকরের সম্মুখীন হইবেন, অমনই একটি বিবরে পা লাগিয়া তাঁহার অশ্ব পড়িয়া গেল। ঘোটক উঠিলে প্রতাপ আপনি যেমন উঠিতে যাইবেন, অমনই সেই ক্রোধ-ভীষণ শূকর তাঁহার উরুদেশ ছিন্ন করিয়া সুদীর্ঘ দন্তে তাঁহার বাহু দংশন করিল। Lord Roberts লিখিয়াছেন, "তাঁহার সাহায্যার্থ গিয়া দেখিলাম, স্যার প্রতাপের দেহ হইতে প্রভূত রক্তপাত হইতেছে। তিনি কিন্তু শূকরের সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, উহার করাল মুখবিবর নিজ হস্তে চাপিয়া ধরিয়া আছেন।" তৎপরে প্রতাপসিংহ জন্তুটির মুখ ছাড়িয়া চকিতে উহার সম্মুখের পা ধরিয়া উল্টাইয়া ফেলিলেন; এবং তাঁহার শূকর-শিকারে চিরসঙ্গী শাণিত ছোরাখানি দিয়া উহাকে বিনষ্ট করিলেন। তাঁহার এই অসামান্য শৌর্য্য দেখিয়া Lord Roberts লিখিয়াছেন, "যিনি বন্য বরাহের বল ও ভার কত জানেন, তিনিই এ ক্ষেত্রে স্যার প্রতাপের সাহস ও উপস্থিতবুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিবেন।"

প্রতাপ সিংহের বয়ঃক্রম এখন ৫৬ বৎসর। তাঁহার শারীরগঠন অত্যন্ত সুন্দর। তাঁহাকে দেখিলেই এক জন প্রকৃত যোদ্ধা বলিয়া মনে হয়। "সর্দ্দার রসালার" নায়কের পরিচ্ছদেই তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর দেখায়। তাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা খুব অল্প। রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার

অন্যান্য কথা।

অভিজ্ঞতা ও সুনাম যথেষ্ট। ত্রিবাঙ্কোরের স্যার টি, মাধব রাও, গোয়ালিয়রের স্যার দিনকর রাও, হাইদ্রাবাদের নবাব স্যার সালার জঙ্গ প্রভৃতি যশস্বী রাজনীতিবিশারদগণের অপেক্ষা তিনি কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহেন। ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট প্রথম হইতেই তাঁহার গুণাবলীর পক্ষপাতী; তাঁহারা তাঁহাকে যে সকল স্পৃহনীয় উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছেন, তাহা পাঠকের একেবারে অবিদিত নয়। ইহা ভিন্ন তিনি সেনাপতি লক্‌হার্ট সাহেবের এ-ডি-কং হইয়া তীরা অভিযানে গিয়াছিলেন। তিনি প্রতাপের প্রশংসার অনেক কথা বলিয়াছেন।

প্রতাপ সিংহের সর্ব্বাধিক বলবতী বাসনা ছিল, তাঁহার স্বগঠিত অশ্বারোহী সেনাকে ইংরাজ শত্রুর বিপক্ষে নিয়োজিত করেন। এই চিরপোষিত কামনাও সেদিন ফলবতী হইয়াছে। গত ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, তিনি "সর্দ্দার রসালার" সেনাপতি হইয়া চীনদেশে গিয়াছিলেন—ইহা ত সকলেই জানেন। বড়লাট কর্জ্জন তাঁহাকে পরমসমাদরে চীনে পাঠাইয়াছিলেন।

তাঁহার একটি অভিলাষ কিন্তু পূর্ণ হইবার নয়। ইংরাজের হইয়া বোয়ার-

হইয়া তিনি রুসদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন, ইহাও তাঁহার অন্তিম বয়সের অন্যতম ইচ্ছা।

গত বৎসরের ২৬ জুলাই তিনি চীন হইতে কলিকাতায় ফিরেন। তাহার দুই দিন পূর্ব্বে তিনি K.C.B. উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তদুপলক্ষে বড়লাট কর্জ্জন তাঁহার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার শেষ কথাগুলির উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি :—

"মহারাজ প্রতাপ সিংহ এক জন বিক্রমশালী রাজপুত অভিজাত; তিনি এক জন প্রকৃত মৃগয়াকুশল নির্ভীক যোদ্ধা; তিনি যথার্থ ভদ্রলোক এবং ভারতসাম্রাজ্ঞীর এক জন বিশ্বাসী পরমভক্ত প্রজা। প্রার্থনা করি, যে যশোমাল্যে আজ আমি তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিতেছি, বহুদিন ধরিয়া তিনি যেন তাহা কণ্ঠে ধারণ করিতে পান। এ দেশের নবীন অভিজাতবর্গ প্রতাপের পুরুষোচিত ও প্রণোদক দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন।"

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। অগ্রহায়ণ। স্বপ্নপ্রয়াণের কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সেরা মালী" সুখপাঠ্য রহস্য-রচনা। সামান্য ঘটনার উপাদান অবলম্বন করিয়া কবি হাস্যরসের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছেন। ভাষার অবাধ প্রবাহ, মিলের অপরূপ পারিপাট্য, রসিকতার সহজ নির্ম্মল উচ্ছ্বাস যেমন অনন্যসাধারণ, তেমনই উপভোগ্য। "সেরা মালী" উদার কবি-হৃদয়ের আনন্দ-কিরণে সমুজ্জ্বল,—বসন্তে 'চারু তরুলতার চেকনাই' ও প্রচ্ছন্ন বকুলের মদির গন্ধের ন্যায় অকাল বর্ষার, প্রদোষে মালীর আনীত 'তপ্ত মুড়ি' ও কাঁচা লঙ্কা দেখিয়াও কবির আনন্দ-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সদানন্দ কবির মুড়ি-দর্শন-হর্ষ দেখিয়া কমলবিহারী সৌখীন কবিসম্প্রদায় লজ্জায় লাল হইয়া উঠিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু অকবি আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এ আনন্দ সংক্রামক।

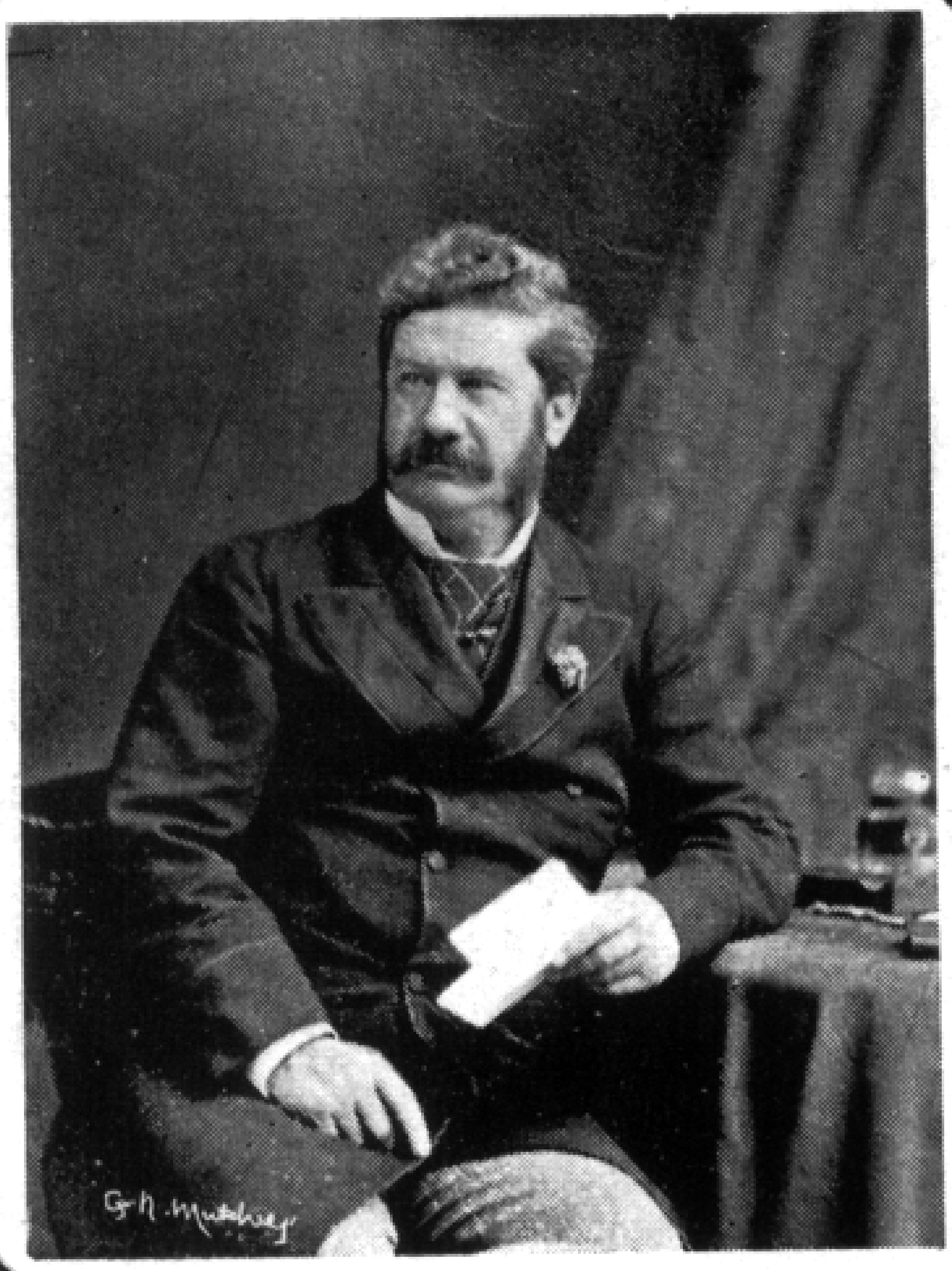
"ঘোর করি এল মেঘ শ্যামাইয়া তরু,
বাজিয়া উঠিল আর ভেকের ডমরু।"

প্রভৃতি মৌলিক বর্ণনায় আধুনিক 'কালির' বার্ণিশ নাই,—তাহা বিদেশী হাটের আমদানী বা বিদ্যাপতির বর্ষার প্রতিধ্বনি নহে;—কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব। দ্বিজেন্দ্রবাবু দর্শন-সমুদ্রে কবি-প্রতিভা বিসর্জ্জন দিয়া বাঙ্গালীকে বঞ্চিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের "নাট-দর্শন" একটি উৎকল-চিত্র। ক্রমে 'একঘেয়ে' হইয়া পড়িতেছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের "ভারতীয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ধ্বংস" এবারকার 'ভারতীর' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। সতীশবাবু বলেন,—"ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের প্রধানতঃ তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, মুসলমান বিজেতৃগণের অত্যাচার; দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণের অত্যুদারতা ও অনুদারতা; এবং তৃতীয়তঃ, তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের ভীষণ দুরাচার।" আলোচ্য নিবন্ধে সতীশবাবু সবিস্তারে এই কারণ-ত্রয়ের আলোচনা করিয়াছেন। সতীশবাবুর মতে,—"তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের ভীষণ দুরাচারই তাঁহাদের ধ্বংসের একমাত্র কারণ।" অন্যত্র,—"ব্রাহ্মণ দার্শনিকগণ অথবা মুসলমান বিজেতৃগণ

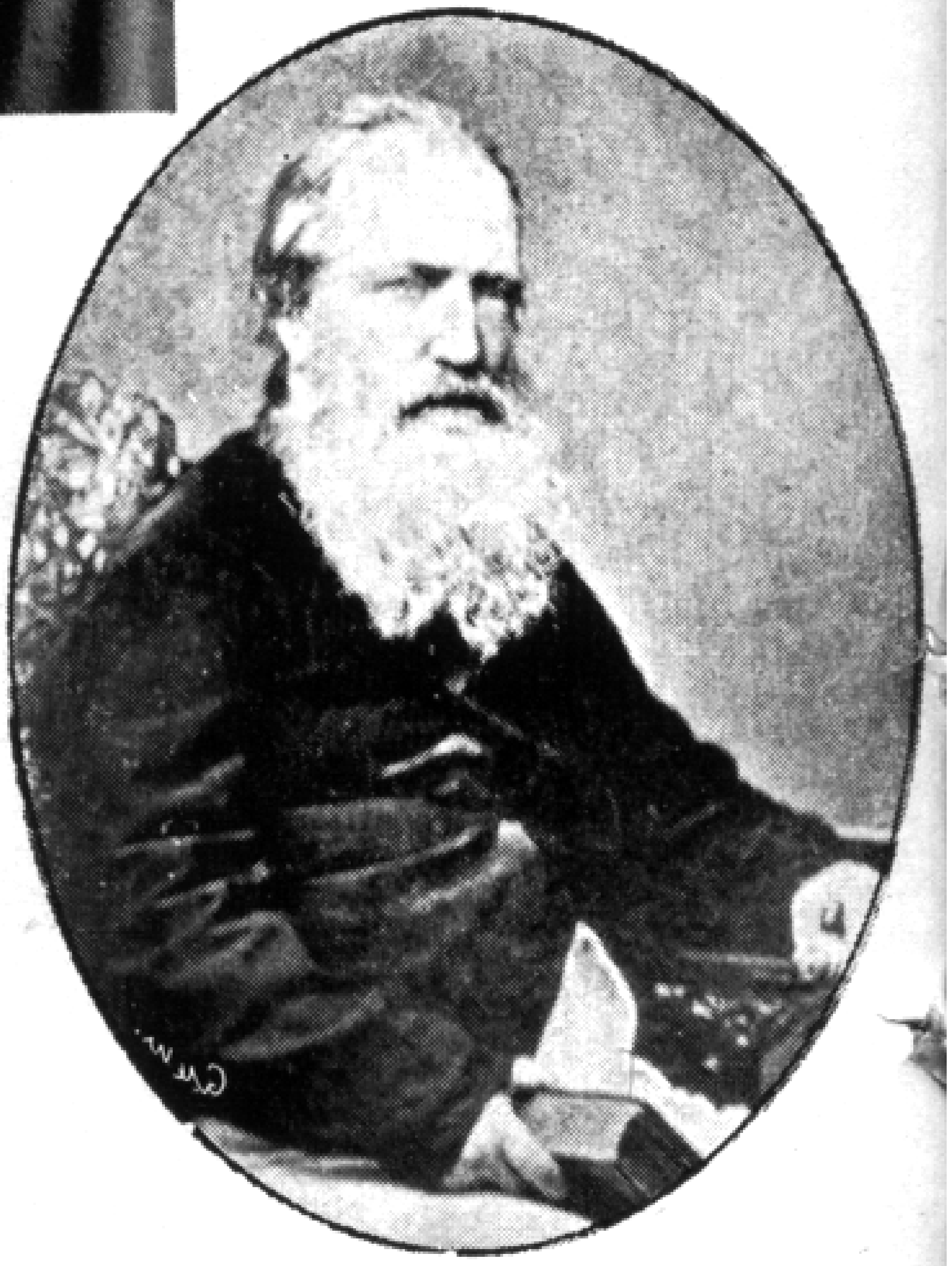
ইহাদের কেহই বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উন্মূলন করেন নাই। যিনি তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করেন।" উভয় উক্তি পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। তান্ত্রিক ধর্ম্মের অভ্যুদয় বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংসের মুখ্য কারণ, ইহাই বোধ করি লেখকের অভিপ্রেত। সতীশবাবু এই রচনায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ভূয়োদর্শন ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "ভূগোল পাঠনা" সুলিখিত ও সময়োপযোগী; শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের অনুশীলনযোগ্য। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর 'নূতন বাঙ্গালা ব্যাকরণ" উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ। লেখক যথাসম্ভব ধীরতা ও শীলতার সহিত সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে ব্যাকরণ লইয়া দুইটি পক্ষের সৃষ্টি হইয়াছে। এক পক্ষ সংস্কৃত ব্যাকরণের, এমন কি, দেবভাষার নামে রাগিয়া উঠেন ;—মনসা দেবীও ধুনার গন্ধে তত উত্তেজিত হন কি না, বলা যায় না। অপর পক্ষ সংস্কৃতমূলক ব্যাকরণের পক্ষপাতী, ভাষায় ব্যভিচারের বিরোধী। শাস্ত্রী মহাশয় এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের সুযোগ্য প্রতিনিধি। আশা করি, এই আলোচনার ফলে সত্যের দ্বার মুক্ত হইবে। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারতে জাতিগঠন" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থের "আর্য্যজাতির অস্ত্র-চিকিৎসা" বড় জটিল। দেখিতেছি, শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীর জন্ম গ্রন্থ-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে সমালোচনার সমালোচনা আমাদের উদ্দিষ্ট নহে। সমালোচনা প্রসঙ্গে জ্ঞান বাবু দুই একটি অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন,—সে সম্বন্ধে আমাদেরও কিছু বক্তব্য আছে। অশোকগুচ্ছের সমালোচনায় জ্ঞানবাবু বলিতেছেন,—"অশোক-গুচ্ছের বন্ধনে ব্রতী হইয়া প্রকাশক বঙ্গসাহিত্যসেবীর যেমন ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, তেমনি উহার মধ্য হইতে আগাছাগুলি ঝাড়িয়া না ফেলায় কবির অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক দোষভাগী বিবেচনা করিলে অন্যায়ও হইবে না।" কেন ? সম্পাদক বা গ্রন্থকারের দায়িত্ব প্রকাশকের স্কন্ধে আরোপিত করিবার হেতু কি ? 'উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে' দিবার চেষ্টা ন্যায়সঙ্গত নহে। 'মুকুরে'র সমালোচনায় জ্ঞানবাবু লিখিয়াছেন,—"ইহাতে আমরা যে নবীন কবির আভাস পাইতেছি, রবীন্দ্রনাথের শিষ্যবর্গের মধ্যে তিনি অক্ষয়কুমার বড়ালের পার্শ্বেই একটি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। অক্ষয় বাবু রবীন্দ্রনাথের শিষ্যবর্গের অন্যতর, আমরা এই নূতন সত্য জানিতাম না। এই সমালোচনায় আমরা যে নবীন সমালোচকের আভাস পাইতেছি, তিনি আপকেওয়াস্তে সম্প্রদায়ে 'একটি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।'











সার এস্‌লি ইডেন ।

সার পিটার গ্রাণ্ট ।   রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ ।   রেভারেণ্ড মিষ্টার লঙ ।

বঙ্গে নীল।

৩

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১২৬৭, ২রা আশ্বিন) ঢাকার কোন [illegible] "নীল-দর্পণ" প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পাদরী মিষ্টার লংএর যত্নে—তাঁহারই তত্ত্বাবধানে অমরকবি মধুসূদন কর্ত্তৃক "নীল-দর্পণ" ইংরাজীতে অনূদিত হয়। মোট ৩০০৲ টাকা ব্যয়ে ৫০০ খণ্ড পুস্তক ছাপা হয়। ইহার প্রকাশমাত্র নীলকর মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করিয়া "ইংলিশম্যান" ও "হরকরা" পত্রদ্বয়ের সম্পাদক-যুগলের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। * বঙ্কিমচন্দ্র "নীল-দর্পণের" কথায় বলিয়াছেন, "এই গ্রন্থের নিমিত্ত লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকার নিমিত্তই হউক, নীল-দর্পণ ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই সৌভাগ্য বাঙ্গালার আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন; সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন, এবং শুনিয়াছি, শেষে তাঁহার জীবননির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকরী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা নিজে কারাবদ্ধ কি কর্ম্মচ্যুত হয়েন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। একদিন রাত্রে নীল-দর্পণ লিখিতে লিখিতে দীনবন্ধু মেঘনা পার হইতেছিলেন, কূল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গেলে নৌকা হঠাৎ জলমগ্ন হইতে লাগিল। দাঁড়ী মাঝি সকলেই সন্তরণ আরম্ভ

---

* ভূমিকায় লিখিত ছিল, "দৈনিক সংবাদপত্র-সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা করুক, তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না; যে হেতু তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণশক্তি! ত্রিংশৎ মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মা যীশুসৃকে করাল-পাইলেট-করে অর্পণ করিয়াছিলেন। সম্পাদকযুগল সহস্রমুদ্রালোভ-পরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি?"
—লেখক।

করিল; দীনবন্ধু তাহাতে অক্ষম। দীনবন্ধু নীল-দর্পণ হস্তে করিয়া জলমজ্জনোন্মুখ নৌকায় নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন। এমন সময় হঠাৎ এক জন সন্তরণকারীর পদ মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াই সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, 'ভয় নাই, এখানে জল অল্প, নিকটে অবশ্য চর আছে?' বাস্তবিক নিকটে চর ছিল, তথায় নৌকা আনীত হইয়া চরলগ্ন হইলে দীনবন্ধু উঠিয়া নৌকার ছাদের উপর বসিয়া রহিলেন। তখনও সেই আর্দ্র নীল-দর্পণ তাঁহার হস্তে রহিয়াছে। এই সময় মেঘনায় ভাঁটা বহিতেছিল, সত্বরেই জোয়ার আসিয়া এই চর ডুবিয়া যাইবে, এবং সেই সঙ্গে এই জলপূর্ণ ভগ্নতরী ভাসিয়া যাইবে, তখন জীবনরক্ষার উপায় কি হইবে, এই ভাবনা দাঁড়ী মাঝি সকলেই ভাবিতেছিল, দীনবন্ধুও ভাবিতেছিলেন। তখন রাত্রি গভীর, আবার ঘোর অন্ধকার, চারি দিকে বেগবতীর বিষম স্রোতধ্বনি, ক্বচিৎ মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষীদিগের চীৎকার। জীবনরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া দীনবন্ধু একেবারে নিরাশ্বাস হইতেছিলেন, এমত সময় দূরে দাঁড়ের শব্দ শুনা গেল। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিবায় দূরবর্ত্তী নৌকারোহীরা উত্তর দিল, এবং সত্বরে আসিয়া দীনবন্ধু ও তৎসমভিব্যাহারীদিগকে উদ্ধার করিল।"

লং অনূদিত গ্রন্থগুলি প্রদান করিলে বাঙ্গলা গভর্মেণ্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী ও নীল-'কমিশনের' ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিষ্টার সীটন-কার গভর্মেণ্টের অনুমতি না লইয়াই ঐ সকল পুস্তক গভর্মেণ্টের কাগজপত্রের মত নানা লোকের নিকট পাঠাইয়া দেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৫শে মে তারিখে নীল-কর সভা পত্র লিখিয়া বেঙ্গল গভর্মেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইংরেজী "নীল-দর্পণ" গভর্মেণ্টের জ্ঞাতসারে বিলি করা হইয়াছে কি না? যদি গভর্মেণ্টের অজ্ঞাতসারে এই কার্য্য হইয়া থাকে, তবে যেন গভর্মেণ্ট তাহা স্বীকার করিয়া এই ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত বিষম গ্লানিকর পুস্তকের প্রচারকের নাম দেন। এই গ্লানিকর রচনায় গভর্মেণ্টের প্রতি শ্রদ্ধাহানি ও শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা। ইহার প্রচারককে আইনতঃ যথাসম্ভব দণ্ডিত করাই নীলকর সভার অভিপ্রেত। ছোটলাট তৎকালে পরেশনাথে থাকায় পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব ঘটিল। ২৯শে তারিখে নীল-কর সভা তাগিদ দিয়া লিখিলেন, পর দিবসই পত্রের উত্তর না পাইলে তাঁহারা সুপ্রীম গভর্মেণ্টকে জানাইয়া এ বিষয় ইংলণ্ডে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের গোচরে আনিবেন। ৩রা জুন বাঙ্গলা গভর্মেণ্ট উত্তর দিলেন, পুস্তক ছোটলাটের অনুপস্থিতিতে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে প্রচারিত

হইয়াছে, কিন্তু ছোটলাট প্রচারিত হইবার পর পাঠ করিয়া পুস্তকে মানহানিকর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে কোন সম্প্রদায়বিশেষের মানহানি হয় নাই, পুস্তকে নীলকরদিগের মত য়ুরোপীয় ও দেশীয় রাজকর্ম্মচারী ও কুঠীর আমলা সকলের প্রতি দোষ আরোপিত হইয়াছে, তথাপি ভ্রমক্রমে এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায়—নীলকরদিগের মনোবেদনায় ছোটলাট দুঃখিত। সভা ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ইংরেজী "নীল-দর্পণের" মুদ্রাকর ম্যানুয়েলের নামে নালিশ করিলেন। ম্যানুয়েলের জরিমানা হইল। এই মোকদ্দমায় ম্যানুয়েল লং মহোদয়ের অনুজ্ঞাতে তাঁহার নাম প্রকাশ করেন। লংএর নামে মোকদ্দমা রুজু হইল। মোকদ্দমার পূর্ব্বে, ২৫ জুন তারিখে মিষ্টার লং "নীল-দর্পণের" সহিত স্বীয় সংস্রবজ্ঞাপক এক বিজ্ঞাপনপত্র মুদ্রিত করিলেন। ইহাতে তিনি লেখেন যে, কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে দেশীয়দিগের মনোভাবজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তিনি ইহা অনুবাদিত করাইয়াছিলেন; মূলের অশ্লীল অংশসমূহ বর্জ্জিত হইলেও অনুবাদে কোন কোন আপত্তিকর অংশ রহিয়া গিয়াছে, ইহাতে তিনি দুঃখিত।

সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতি সার মর্ডণ্ট ওয়েলসের আদালতে ১৯ শে জুলাই (১৮৬১) বিচার আরব্ধ হইল। বাদীর পক্ষে ব্যারিষ্টার পিটারসন ও কাউই; প্রতিবাদীর পক্ষে এগ্নিণ্টন ও নিউমার্চ। জুরীপতি মিষ্টার এস্ আপকার, পঞ্চদশ জন জুররের মধ্যে দেশীয় কেবল মিষ্টার মাণিকজী রস্তমজী। বাদীর পক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হইলে প্রতিবাদী কোন সাক্ষ্য মান্য না করায় তাঁহার পক্ষের ব্যারিষ্টার বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর জজ জুরীকে 'চার্জ্জ' বুঝাইয়া দিলেন। সে সকল আইনের তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই। প্রায় সার্দ্ধ এক ঘণ্টা কাল বিবেচনার পর জুররগণ ফিরিয়া আসিয়া আবার জজের নিকট কয়টি বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিলেন, এবং পুনর্বিবেচনার পর লংকে দোষী নির্দ্ধারিত করিলেন। প্রতিবাদীর ব্যারিষ্টার মিষ্টার এগ্নিণ্টন চারি দিনের জন্য রায় প্রকাশ স্থগিত রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন; কারণ প্রতিবাদী arrest of judgment জন্য 'ফুলবেঞ্চে' আপীল করিতে ইচ্ছুক থাকিতে পারেন। জজ পরবর্ত্তী সোমবার পর্য্যন্ত সময় দিলেন। ২৪শে তারিখে অনেক বাদানুবাদের পর 'ফুলবেঞ্চে' 'মোশন' অগ্রাহ্য হওয়ায় বিচারপতি ওয়েলস লংকে বলিলেন, দণ্ড লঘু করিবার জন্য তাঁহার কিছু বলিবার থাকিলে বলিতে পারেন। উত্তরে লং একটি বিস্তৃত লিখিত মন্তব্য পাঠ করেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, তিনি এ দেশে বিংশ বর্ষ যাপন করিয়াছেন,—ইতঃপূর্ব্বে বাদী বা প্রতিবাদী রূপে কখনও আদালতে

উপস্থিত হয়েন নাই। তিনি দেশীয়দিগের সহিত মিশিয়া তাহাদের মনোভাব বিশেষরূপ অবগত আছেন। ইংরাজগণ এই পুস্তক পাঠ করিতে ইচ্ছা করায় তিনি ইহার অনুবাদ করাইয়াছেন—দেশীয়দিগের অনুরোধে নহে। পুস্তক ইংরাজদিগের মধ্যেই প্রচারিত হইয়াছে। বাদী পক্ষের ব্যারিষ্টার বলিয়াছেন, বাঙ্গলা 'নীল-দর্পণ' অত্যন্ত অনিষ্টকারী। সে কথা যদি প্রকৃত হয়, তবে কি তিনি ইহা ইংরাজ-সমাজের গোচর করিয়া সরকারের উপকার করেন নাই? তিনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদিগের জন্য সমস্ত বাঙ্গলা মৌলিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন; মিশনারী, গভর্মেণ্ট ও অনেক দেশীয় রাজার জন্য বহু দেশীয় পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন; এমন কি, মিশনরী-গণের অনুরোধে খৃষ্টধর্ম্মমতের বিরোধী পুস্তকসমূহের সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সমস্ত বিভিন্নমতাবলম্বী গ্রন্থের জন্য কি তিনি দায়ী হইবেন? সিপাহী-যুদ্ধের পর চারি বৎসরমাত্র অতীত হইয়াছে। সেই সময়ে ও গত আফগান যুদ্ধকালে স্পষ্টই দেখা গিয়াছে, ইংরাজগণ দেশীয়-দিগের মনোভাব কিছুই জানিতে পারেন না। তিনি যদি সিপাহী-যুদ্ধের পূর্ব্বে এইরূপ একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করিতে পারিতেন—তাহাতে যদি দেশীয়-দিগের প্রতি ইউরোপীয়গণের ব্যবহারের বিশেষ নিন্দা, সিপাহীদিগের প্রতি সিপাহী সেনাদলের কর্ম্মচারীদিগের অবজ্ঞার উল্লেখ, এবং দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের policyর নিন্দা থাকিত, তথাপি তাহাতে কত কোটী মুদ্রার ব্যয় ও কত জীবননাশ নিবারিত হইতে পারিত। অজ্ঞতাবশে আপনাদিগকে একান্ত নিরাপদ মনে করাতেই আফগান যুদ্ধে সরকারের দেড় কোটি টাকা ক্ষতি ও ইংলণ্ডের বিশেষ প্রতিপত্তিহানি হইয়াছে। যে নীলের জন্য সমস্ত দেশ তোলপাড় হইতেছে, যে নীলের জন্য দেশে অরাজকতা, গৃহদাহ ও গুপ্তহত্যা পর্য্যন্ত ঘটিতেছে, সেই নীল সম্বন্ধে দেশীয়দিগের মনোভাব সাধারণের গোচর করা কি বিদ্বেষের পরিচায়ক? যদিও তিনি প্রকৃতপক্ষে নীলের বিরোধী, তথাপি স্বেচ্ছায় কখনও নীলকরদিগের গ্লানি করেন নাই। 'কমিশনে' তাঁহার সাক্ষ্য সম্বন্ধে নীলকর-পক্ষীয়গণও বলিয়াছেন, তাহা অতিশয্যহীন ও গালিবর্জ্জিত। তিনি যখন 'চর্চ্চ মিশনরী কনফারেন্স' কর্ত্তৃক নীলের ব্যাপারে দৃষ্টি রাখিবার জন্য 'সব্ কমি-টীর' সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন, তখনও তাঁহার ব্যবহার নীলকরদিগের গ্লানিজনক বলিয়া উক্ত হয় নাই। তিনি কখনও নীলকরদিগের নিকটে বাস করেন নাই,

তাঁহাদিগের গ্লানি করিবেন ? তিনি খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক। স্বদেশীয়দিগের দোষ-সংশোধনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ; কারণ, বিশ বৎসর কাল ভারতে বাস করিয়া তিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশীয়দিগের অনেকের কুব্যবহারই এ দেশে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। সহস্র সহস্র ভারতবাসী তাঁহাকে বলিয়াছে, তাহারা খৃষ্টান য়ুরোপীয়দিগের ব্যবহার দেখিয়া খৃষ্টধর্ম্মের সম্বন্ধে ধারণা করে। এই বিশ বৎসর কাল তিনি দেশীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন। প্রজার অভাব ও কষ্ট দেখিয়া অনেক সময় তিনি মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছেন। প্রজারা লেখাপড়া জানে না,সুতরাং অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার তাহাদের পক্ষে অনধিগম্য, অন্ধকার। তাহার অবস্থার উন্নতি হইলে তাহার পক্ষে শিক্ষার পথ সুগম হইবে। তিনি প্রজার শিক্ষক ও পীড়ক সম্বন্ধে ও তাহার মাতৃভাষায় অজ্ঞতাপ্রসূত অপকারের বিষয়ে নানা পুস্তিকা ইংলণ্ডে প্রচারিত করিয়াছেন। তিনি যখন প্রজার বহু নিন্দনীয় রীতির কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে, নীলে তাহার কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, সে কথা গোপন করা কি সঙ্গত হইত! তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, এ ক্ষেত্রে তিনি বহু দেশীয় ও য়ুরোপীয় বন্ধুর সহানুভূতি লাভ করিবেন। ইংলণ্ডে যাঁহারা ভারতবর্ষ মুষ্টিমেয় অস্থায়ী ইউরোপীয়েয় স্বার্থের জন্য শাসিত না হইয়া ভারতবাসীর স্বার্থের ও উপকারের জন্য শাসিত দেখিতে চাহেন,তিনি তাঁহাদেরও সহানুভূতি পাইবেন।

উপসংহারে লং বলেন, ইহা যদি মানহানি হয়, তবে বহুবিবাহ বা কৌলীন্য-প্রথা, অহিফেন ব্যবসায়, অথবা মানবের স্বার্থসংশ্লিষ্ট যে কোন কুপ্রথার দোষ-প্রদর্শন মানহানিকর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তাহা হইলে, নৈতিক, সামাজিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে কোন প্রকার সংস্কার অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

রায়ে জজ বলেন, লং ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রথমতঃ 'ইংলিশম্যান' ও 'হরকরা' পত্রদ্বয়ের স্বত্বাধিকারীদিগকে এবং দ্বিতীয়তঃ নিম্ন বঙ্গের নীল-করসম্প্রদায়ের বিদ্বেষমূলক মানহানি করায় দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। অন্যান্য কথার পর জজ বলিলেন, তিনি পাদরী বিধায় দোষ আরও গুরুতর হইয়াছে। স্বদেশীয়-গণের গ্লানি করার অপরাধে দণ্ডিত হইবার সময়, তাঁহার পক্ষে স্বদেশীয়গণের কুব্যবহারই এ দেশে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়, এরূপ কথা বলা একান্ত অপ্রাসঙ্গিক। অধিকাংশ য়ুরোপীয় মনে করিতে পারেন, এ ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যবহারও খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিবে না। "You of

teacher of that inestimable precept 'do unto all men as you would they should do unto you."

বিচারে লংএর এক মাস কারাদণ্ড ও সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড হইল। স্বনামধন্য স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তৎক্ষণাৎ এক সহস্র মুদ্রা আদালতে দাখিল করিয়া দিলেন।

লং জনসাধারণের কিরূপ অনুরাগ ও শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ "গুড্ ওয়ার্ডস্" পত্রের কোন লেখক লিখিয়াছেন, কারা-গৃহে লংএর সহিত দর্শনেচ্ছুর সংখ্যা বড়লাটের দর্শনেচ্ছুর সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক।

এ দিকে ১৯শে জুন তারিখে ছোটলাট এক মন্তব্য লিখিয়া ভারত গভর্মেণ্টে দাখিল করিলেন। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি লিখিলেন, এ দেশে য়ুরোপীয়গণ দেশীয়দিগের সহিত যেরূপ সংস্রবশূন্যভাবে বাস করেন, তাহাতে, তাঁহার মতে, তাঁহাদিগের পক্ষে দেশীয়দিগের মনোভাব জানিবার জন্য অধিক চেষ্টিত হওয়া উচিত। সর্ব্বত্রই প্রচলিত গান ও বঙ্গে লোকপ্রিয় বাঙ্গালা নাটক হইতে দেশীয়দিগের মনোভাব জানিবার বিশেষ সুবিধা—কিন্তু এই উপায়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবজ্ঞাত। এই দোষেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে ব্যাপার সেরূপ গুরুতর না হইলেও য়ুরোপীয়দিগের সান্নিধ্য না থাকিলে দেশীয়গণ আপনাদের মধ্যে নীল সম্বন্ধে কিরূপ ভাব ব্যক্ত করে, তাহা জানিবার সুযোগ ত্যাগ করা উচিত হইত না। এ বিষয় তিনি সীটন-কারের সহিত একমত। তবে ভ্রমক্রমে পুস্তক সরকারীরূপে প্রচারিত হওয়ায় তিনি দুঃখিত। সীটন-কারের বিশ্বাস ছিল, পুস্তক সরকারী ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে।

২৭শে জুলাই সীটন-কার এক কৈফিয়ৎ লিখিয়া 'ইংলিশম্যান' পত্রে প্রেরণ করেন। তিনি তখন বাঙ্গালা গবর্মেণ্টের সেক্রেটারীর পদ হইতে বড়লাটের ব্যবস্থাপক-সভায় বঙ্গের আইন-সদস্যের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি লেখেন, বহুদিন পূর্ব্বে এই কৈফিয়ৎ দিতেন, কিন্তু মূল মোকদ্দমায় উভয় পক্ষ হইতেই সাক্ষী মান্য হওয়ায় পূর্ব্বে ইহা প্রকাশের সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। মনে করিয়াছিলেন, আদালতেই কৈফিয়ৎ দিবেন। কিন্তু মোকদ্দমা শুনানির সময় কোন পক্ষই তাঁহাতে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান না করায় তাহা হয় নাই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে রেভারেণ্ড মিষ্টার লং তাঁহাকে প্রথম এই পুস্তক

ক্রয় করেন। লং ও পুস্তকবিক্রেতা উভয়ের সহিত কথোপকথনে, এবং পুস্তক-পাঠে তিনি বেশ বুঝিতে পারেন, পুস্তক মফস্বলবাসী কোনও বাঙ্গালী কর্ত্তৃক লিখিত। গ্রন্থে গ্রন্থকারের গ্রাম্যজীবনের অভিজ্ঞতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহারই অনুমতিক্রমে পুস্তক এক জন বাঙ্গালী কর্ত্তৃক অনূদিত হয়, এবং ৫০০ খণ্ড মুদ্রিত হইয়া বাঙ্গালা গভর্মেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়। ভ্রমক্রমে ছোট-লাটের অনুমতি না লইয়া কেবল তাঁহারই অনুমতিক্রমে পুস্তক প্রচারিত হয়। মোকদ্দমার দাখিলী ফর্দ্দে দৃষ্ট হইবে, ২০২ খানা পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল। ফর্দ্দ মোকদ্দমায় দাখিল করা হইয়াছে। এরূপ ফর্দ্দ রক্ষিত হয় না ; সুতরাং ইহা নষ্ট করিলেও দোষের হইত না। তাহা হইলে আফিসের বাহিরে কেহই ইহার অস্তিত্বের বিষয় অবগত হইতে পারিত না। তাঁহার ভ্রমে কোন অনিষ্ট ঘটিয়া থাকিলে তাহার পরিমাণ গোপন না করিয়া প্রকাশ করিবার জন্যই তিনি উহা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতে defiance ভাব ছিল না। গ্রন্থ সরকারীরূপে প্রচারিত হওয়ার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। তাঁহার মতে—ইহাই তাঁহার মন্দ উদ্দেশ্যের অভাবের পরিচায়ক। গোপনে গ্লানি-প্রচার উদ্দেশ্য হইলে, পুস্তক সাধারণভাবে মাশুল দিয়া প্রচারিত হইলে, ধরিবার বিশেষ উপায় থাকিত না। ভারতবর্ষে ১৪খানি মাত্র পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল। তাহারও অধিকাংশ ফেরত আনাইয়া নষ্ট করা হইয়াছে। কলিকাতার কোন সংবাদপত্র বা সভাকে পুস্তক দেওয়া হয় নাই ; কারণ, নীলের বাদানুবাদে তাঁহারা কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন—সুতরাং নিরপেক্ষ বিচারে অসমর্থ। গোপনে কাহারও মনে পীড়াদান উদ্দেশ্য হইলে বঙ্গ দেশেই অধিক পুস্তক প্রচারিত হইত। তাহা না করিয়া অপর প্রদেশে চারিখানিমাত্র সংবাদপত্রে পুস্তক প্রদান করা হইয়াছে। অধিকাংশ পুস্তক বিলাতে সংবাদপত্রে প্রেরিত হইয়াছে। এই সকল পত্র বাদানুবাদ হইতে বহু দূরে ; দেশীয়দিগের মনোভাব সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনরূপ আগ্রহের সম্ভাবনা নাই। কতকগুলি ভদ্রলোককে পুস্তক পাঠান হইয়াছে সত্য ; তাহার কারণ, পূর্ব্বে নীলসংক্রান্ত সরকারীপ্রকাশিত কাগজপত্র তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। তবে তাঁহার ভ্রমে নানাপ্রকার মনান্তর ও মনঃকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি প্রকৃতই দুঃখিত। ভূমিকায় ইংরাজ সংবাদ-পত্রদ্বয় সম্বন্ধে গ্লানিকর কথা রহিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য তিনি ২৫শে মে তারিখে 'ইংলিশম্যান' পত্রের সম্পাদক মিষ্টার ব্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন,

হইয়াছে ও সে জন্য তিনি যে দুঃখিত, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু তাঁহার কোন কথা বা কার্য্য তাঁহার প্রতি আরোপিত নীল-কর-বিদ্বেষের ফল নহে; সুতরাং তাঁহার লজ্জিত হইবার বা সদসদ্‌জ্ঞানের বিচারে দোষী হইবার কোন কারণ নাই।

২৯শে জুলাই ইংলিশম্যান এই কৈফিয়ৎ সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে লিখিত হইল, সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎকালে মিষ্টার সীটন-কার কোনরূপ দুঃখপ্রকাশ করেন নাই। সে বিষয়ে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। ২৯শে তারিখে কৈফিয়ৎ ও মন্তব্য একত্র প্রকাশিত হয়।

ঐ তারিখেই সীটন-কার বাঙ্গলা গভর্মেণ্টকে পত্র লিখিয়া 'ইংলিশম্যানে' প্রকাশিত কৈফিয়ৎ পাঠাইয়া দেন। পত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলেন, মিষ্টার লং এ দেশের মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে প্রচলিত দেশীয় গ্রন্থাদি ইংরাজদিগের নিকট প্রচার করিবার জন্য সুপরিচিত। "বেঙ্গল আফিসে" তাঁহার সে কার্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দেশীয়দিগের মনোভাব জ্ঞাত থাকা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এ কার্য্যে দেশীয় সাময়িকপত্র ও পুস্তকাবলী প্রধান সহায়। কর্ত্তব্যবোধে তিনি 'নীল-দর্পণের' প্রতি ছোটলাটের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ছোটলাট তাহার অনুবাদের কথা জানিতেন। তবে এত অধিকসংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত হওয়া বোধ হয় ছোটলাটের অভিপ্রেত ছিল না। ছোটলাটের অজ্ঞাতে তাঁহার নিজের মতানুসারে পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল। 'নীল-দর্পণ' ও তজ্জাতীয় পুস্তকের প্রতি গভর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণে উদাসীন থাকা কোন রাজকর্ম্মচারীরই উচিত কার্য্য নহে। তাঁহার বিশ্বাস, এ কার্য্য না করিলে সেক্রেটারী-রূপে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইতেন। তবে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া ও ছোটলাটের অনুমতি না লইয়া পুস্তক প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে দোষের হইয়াছে।

তিনি তাঁহার বর্ত্তমান পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে গভর্মেণ্ট লজ্জিত ও বিব্রত হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় লং-এর বিচারের পরদিবসই মিষ্টার সীটান-কার পদত্যাগপত্র প্রদান করেন, এবং আপনার পূর্ব্ব পদে (অর্থাৎ বাঙ্গলা গভর্মেণ্টের সেক্রেটারীর পদে) প্রত্যাবর্ত্তনের অধিকারও ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয়েন। কিন্তু গ্রাণ্ট মহোদয় তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার



A Faded Photo by Fradelle & Marshall.

মিঃ ওয়ালটার এস্‌ সিটন-কার।

Mohila Press.

সর্ব্বশেষে তিনি লেখেন যে, তাঁহার ভ্রমে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে; গভর্মেণ্টও আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পান নাই; ইহাতে তিনি দুঃখিত। আন্তরিকতাপূর্ণ, মহদাশয় ধর্ম্মপ্রচারক মিষ্টার লংএর জন্য তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখিত; তাঁহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় তিনি তাঁহার সহিত সহানুভূতি করিতেছেন।

৩০শে জুলাই তারিখে এই পত্র ভারত গভর্মেণ্টের নিকট প্রেরণকালে ছোটলাট লেখেন, মিষ্টার সীটন-কার সরলভাবে স্বীয় ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন। ছোটলাটের দৃঢ় বিশ্বাস, এই পুস্তকের প্রচার বিষয়ে সম্প্রদায়বিশেষের মনে কষ্ট দেওয়া বা গভর্মেণ্টকে বিপন্ন করা সীটন-কারের উদ্দেশ্য ছিল না। পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিয়া তিনি স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ মহানুভবতারই পরিচয় দিয়াছেন। এই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিলে যে সরকারী কার্য্যের কোন সুবিধা হইবে, ছোট-লাটের এরূপ বিশ্বাস নাই।

ইহার উত্তরে ভারত গভর্মেণ্ট ৮ই অগষ্ট এক নাতিদীর্ঘ মন্তব্যের প্রকাশ করিলেন। তাহাতে "নীল-দর্পণ" প্রকাশ সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার পর শেষে লিখিত হইল যে, মিষ্টার সীটন-কার ভারত গভর্মেণ্টের বিষয় বিবেচনা না করিয়া এই কার্য্য করিয়াছেন। কার্য্য যেরূপ গুরুতর, তাহাতে ভারত গভর্মেণ্টকে জানান তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্যের সহিত কর্ত্তব্যে ত্রুটির সামঞ্জস্য করা দুর্ঘট। তিনি আদ্যোপান্ত সম্যক ন্যায়-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন, এবং শেষে যথোচিতভাবে পদত্যাগপত্র প্রদান করিয়াছেন। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া বিশেষ প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া স্বগুণে রাজকর্ম্মচারীদিগের মুখ্য শ্রেণীতে গণিত হইয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত অবিমৃশ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছেন। সেই জন্য সদস্যমণ্ডলী ও বড়লাট বাহাদুরের মতে বর্ত্তমান পদত্যাগের পর তিনি আর পূর্ব্বপদে (বাঙ্গলা গভর্মেণ্টের সেক্রেটারী) ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না।

১২ই অগষ্ট মিষ্টার সীটন-কার ভারত গভর্মেণ্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ক্ষমা-প্রার্থনা বড়লাট লর্ড ক্যানিং কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হয়। সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটও লিখিলেন যে, তাঁহার মতে সরকারীভাবে "নীল-দর্পণের" প্রচার অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে; সুতরাং মিষ্টার সীটন-কারকে আর সেক্রেটারীর পদ দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু উপসংহারে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, তাঁহার মত উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে বর্ত্তমান কার্য্য শেষ হইবার পর কোন উপযুক্ত পদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। পরে সীটন-কার কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ও ভারত-

গভর্মেণ্টের পররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, policyর খাতিরে আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া গভর্মেণ্ট তাঁহাকে অপদস্থ করেন।

এ দিকে শরৎকালে বেঙ্গল গভর্মেণ্ট মার্চ্চ মাসে নিযুক্ত বিশেষ বিচারক-দ্বয়ের মন্তব্য প্রেরণ করিলে ভারত গভর্মেণ্ট বলিলেন, বিশেষ বিচারক নিযুক্ত করিবার মূল উদ্দেশ্য বেঙ্গল গবমেণ্ট প্রণিধান করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই আশানুরূপ ফল ফলে নাই। ছোটলাট তাহা অস্বীকার করিয়া স্বীয় মতের সমর্থন করিলেন। ফলে ভারত গবর্মেণ্ট বলিলেন যে, তাঁহারা ছোট-লাটের উপর বা ছোটলাটের মতানুসারে কার্য্য করায় বিশেষ বিচারকদিগের উপর কোনরূপ দোষারোপ করেন নাই। কিন্তু ভারত গবর্মেণ্ট লিখিলেন যে, ছোটলাটের পত্রে ঔদ্ধত্য ও ভারত গবর্মেণ্টের প্রতি সম্মানের অভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই ব্যবহার উভয় গভর্মেণ্টের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধের বিরোধী।

নানা বাদানুবাদের পর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রেল তারিখে স্বীয় পদ-ত্যাগদিবসে সার জন পিটার গ্রাণ্ট এক মন্তব্যে তাঁহার যে পত্র ভারত গব-র্মেণ্ট কর্ত্তৃক অসম্মানসূচক বিবেচিত হইয়াছিল, তাহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন, এবং সেই সঙ্গে প্রার্থনা করিলেন যে, ভারত গবর্মেণ্টের প্রকাশিত পত্রে তাঁহার প্রতি দোষ আরোপিত হইয়াছে; সুতরাং পরবর্ত্তী যে সকল পত্রে সে দোষারোপ প্রত্যাহৃত হইয়াছে, সে সকল প্রকাশ করা হউক। তখন লর্ড এলগিন বড়লাট। তিনি ৩রা মে তারিখে ব্যক্ত করিলেন যে, যখন লর্ড ক্যানিং, তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার দুই জন সদস্য ও গ্রাণ্ট স্বয়ং অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর সে সকল প্রকাশ করা অনাবশ্যক।

গ্রাণ্ট মহোদয়ের অবসরগ্রহণের প্রাক্কালে (১৬ই এপ্রিল তারিখে) কলি-কাতা ও সহরতলীর অধিবাসীরা এক প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে বিদায়-অভি-নন্দন প্রদান করিবেন, স্থির করেন। এ অভিনন্দনপত্রে প্রথমেই নীলের হাঙ্গামে তিনি প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়া দেশের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ ছিল। তাঁহার বিদায় উপলক্ষ করিয়া তৎকালে দেশীয়দিগের মুখপত্র "হিন্দু-পেট্রিয়ট" দেশের পক্ষ হইয়া তাঁহার অশেষ গুণকীর্ত্তন করেন।

গ্রাণ্ট বাহাদুর বঙ্গদেশে পর্ণকুটীরবাসী প্রজা হইতে প্রাসাদবাসী ধনকুবের পর্য্যন্ত সকলেরই কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন, এই অভিনন্দন ও "হিন্দু-পেট্রিয়টের" উক্তি হইতেই তাহা উপলব্ধ হইবে।

নীলসংক্রান্ত আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াই আমরা বিদায় গ্রহণ করিব। ম্যাকআর্থার নামক এক নীলকর কোন খুনী মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া সুপ্রীমকোর্টের বিচারে অব্যাহতি লাভ করেন। মোকদ্দমা-সংক্রান্ত কাগজপত্র সরকারী কোন পুস্তকে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ম্যাকআর্থার ছোটলাট সার জন পিটার গ্রাণ্টের নামে মানহানির নালিশ রুজু করেন। তাঁহার পদত্যাগের কিছু পরেই নবসংস্থাপিত হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি সার বার্ণেস পীকক ঐ মোকদ্দমায় রায় প্রকাশ করেন। তিনি বলিলেন, প্রতিবাদীর পক্ষে এই সকল কাগজপত্র প্রকাশের কোন সঙ্গত কারণ বা হেতু দেখা যায় না। কিন্তু ইহা বিদ্বেষপ্রসূত নহে। বাদী বিনা খরচায় এক টাকার ডিক্রী পাইলেন।

বিহার অঞ্চলে যাহাই হউক, নিম্ন বঙ্গে নীলের অভিনয়ে এই স্থলেই যবনিকা-পতন। নিম্ন বঙ্গে যে দুই একটি কুঠি এখনও বর্ত্তমান, তাহারা জীবিত না জীবন্মৃত, বলা দুষ্কর।*

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

দৌলত কাজী ও লোর-চন্দ্রাণী।

ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর অতীত হইল, রোসাঙ্গের রাজসভায় থাকিয়া কবিবর দৌলত কাজী "সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী" কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। আলাওলের কাব্যাদি পাঠে জানা যায়, তখন রোসাঙ্গ রাজদরবার বিদ্যামোদী ও ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান ওমরাহবর্গে সমলঙ্কৃত ছিল। মহামতি মাগন ঠাকুর, সৈয়দ মহম্মদ খান, সৈয়দ মুসা, শ্রীমন্ত সোলেমান, নবরাজ মজলিশ, লস্কর উজীর আসরফ খান, সৈয়দ সউদ সাহ, ইঁহারা সকলেই রোসাঙ্গ রাজ্যের উচ্চ পদে সমারূঢ় ছিলেন। আলাওল মাগনের আদেশে 'পদ্মাবতী,' মাগন

---

* এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় আমরা ইংলণ্ডে মিষ্টার সীটন-কারকে পত্র লিখিয়াছিলাম ও তাঁহার প্রতিকৃতি চাহিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি নীল-সংক্রান্ত কতকগুলি বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া ও অনেক উপদেশ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন ও একখানি ফটো পাঠাইয়া দিয়াছেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত নীলের ব্যাপারে যাঁহারা প্রধান অভিনেতা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেবল ইনিই এখনও জীবিত।—লেখক।

ও মুসার আদেশে 'সয়ফল মুল্লুক ও বদিয়ুজ্জামান,' মহম্মদ খাঁর আদেশে 'সপ্ত-পয়কর,' শ্রীমন্ত সোলেমানের আদেশে 'লোর-চন্দ্রাণীর' শেষাংশ, নবরাজ মজলিশের আদেশে 'সেকান্দরনামা' এবং কবি দৌলত কাজী, আসরফ খাঁর আদেশে 'লোর-চন্দ্রাণী'র রচনা করেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উক্ত সকল মহাত্মাই অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ও কাব্যামোদী ছিলেন। সউদ শাহ রোসাঙ্গের কাজী ছিলেন, আলাওল এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। অপরাপর মহাত্মগণ কেহ অমাত্য-পদে, কেহ বা সেনাপতি-পদে আসীন ছিলেন।

কবি দৌলত কাজী স্বীয় প্রভু রোসাঙ্গ-রাজ রুস্তধর্ম্ম সুধর্ম্মের গুণানুকীর্ত্তনে মুক্তকণ্ঠ, কিন্তু তাঁহার আত্মবৃত্তান্ত-প্রকটনে একবারেই উদাসীন ছিলেন। অন্য কথা দূরে থাকুক, তাঁহার কাব্যে তদীয় বাসস্থানেরও উল্লেখ করিয়া যান নাই। তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি চট্টগ্রামবাসী ছিলেন। বোধ হয়, রোসাঙ্গ রাজসরকারের সহিত তাঁহার কোনরূপ সংস্রব ছিল। তাহা না হইলে তিনি রোসাঙ্গ-রাজের প্রশংসাগানে এরূপ পঞ্চমুখ হইবেন কেন? তদুদ্দেশ্যে কবির ভক্তিরসাপ্লুত হৃদয়ের কয়টি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

কর্ণফুলী নদী পূর্ব্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারী॥
তাহাতে মগধ বংশ 'ক্রমবুদ্ধিছার' (?)।
নামে 'রুস্তধর্ম্ম' রাজা ধর্ম্ম-অবতার॥
প্রতাপে প্রভাত-ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন॥
দেব গুরু পূজএ ধর্ম্মেতে তান মন।
সে পদদর্শনে হএ পাপের মোচন॥
পুণ্যফলে দেখে যদি রাজার চরণ।
নারকীও স্বর্গ পাএ সাফল্য জীবন॥
বিধবা নির্ব্বলী বৃদ্ধা বেচে রত্নভার॥
ভীম সম বলিয়া না করে বলাকার। *
সীতা সম সুন্দরী যদি সে রহে বনে।
রাজভয়ে না নিরখে সহস্রলোচনে। ইত্যাদি

রাজার বিশেষ অনুগত না হইলে, এরূপ বিমান-স্পর্শী গুণানুবাদ অন্য ব্যক্তি নিশ্চয়ই অনাবশ্যক ও অবান্তর মনে করিতেন। পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি রাজার চরণে কবির পুষ্পবিল্বদলের অর্ঘ্যই হউক, আর যাহাই হউক, তিনি যে বিশেষ গুণগ্রাহী ও গুণবান ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঁহারই সচিব (কবির কথায়—'ধর্ম্মপাত্র') 'লস্কর-উজীর'-উপাধিধারী আসরফ খাঁর আদেশে 'লোর-চন্দ্রাণীর' রচনা আরব্ধ হয়। ইঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

ধর্ম্মপাত্র শ্রীযুক্ত আসরফ খান।*
হানিফী মোজাব ধরে চিস্তি খান্দান॥
পীর গুরু অভ্যাগত পূজন্ত তৎপর।
লোক-উপকার করে নাহি আপ্তপর॥
মস্‌জিদ পুষ্করণী দিলা বহুল বিধান।
নানা দেশে গেল তান প্রতিষ্ঠা বাখান॥
* * *
মহারাজা আয়ুশেষ জানি শুদ্ধমন।
তান হস্তে রাজনীতি কৈলা সমর্পণ॥

মহাদেবী মনেত ভাবিল সুনিশ্চিত।
রাজপুত্র হস্তে ধিক† সুপাত্র পণ্ডিত॥
নৃপতিও পুত্রভাবে হরিষ সাদরে।
মহামাত্য করিলেন্ত আসরফ খাঁরে।
ছত্র সমে দিলা সৈন্য পতাকা দুন্দুভি।
স্বর্ণ অঙ্গরাগ আর বহুমূল্য ভূমি॥
দশ হস্তী প্রধান দিলেক বহু ঘোড়া।
রাজখড়্গ সমর্পিলা লস্কর কাপড়া॥

রাজা ইঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন;—এমন কি, দিনরাত্রি ইঁহাকে চক্ষুর অন্তরাল হইতে দিতেন না। ইঁহাদের অবিচ্ছেদ অবস্থানের একটি ঘটনা (অর্থাৎ বিপিনবিহার)‡ কবি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কাব্যপ্রণয়নার্থ কবির প্রতি আদেষ্টার আদেশবাক্যগুলি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

শেষে পুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি।
শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী॥
* * *
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে।
গুজার্তি গোহারী খেট ভাষা বহুতর॥
সহজে মহৎ সভা আনন্দ নিয়ড়।
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝএ সানন্দে॥

কোথায় গুজরাট, আর কোথায় রোসাঙ্গ (আরাকাণ)! আরাকাণের কোন সমিতিতে গুজরাথি ভাষার পর্য্যালোচনা হইয়াছিল, এ কথা বিশ্বাস করা যায় কি? আরাকাণে বাণিজ্য-ব্যপদেশে বিভিন্নভাষাভাষী লোকগণের সংঘট্ট হইত, স্বীকার করিলেও, গুজরাটের মত এত দূরদেশীয় ভাষা তথায় প্রচলিত ছিল, বিশ্বাস করিতে সহসা প্রবৃত্তি হয় না। খেঠ ও গোহারী কোন দেশের

---

* চট্টগ্রাম—রাঙ্গনিয়া থানার এলাকাস্থিত 'কদলপুর' নামক গ্রাম।—'লস্কর উজীরের ডীঘী' নামে যে প্রকাণ্ড জলাশয় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহা সম্ভবতঃ ইঁহারই কীর্ত্তি। হাটহাজারি থানার এলাকার 'পশ্চিম জোবরা' গ্রামের 'আলাওলের ডীঘী' নামক প্রকাণ্ড জলাশয়কেও কেহ কেহ কবি আলাওলের কীর্ত্তি মনে করেন।

† ধিক=অধিক। এই অর্থে অনেক স্থলে আলাওলও ইহা ব্যবহার করিয়াছেন।

‡ বিপিনবিহার বৃত্তান্তের এক স্থানে কবি 'দারাবতী' নামে এক নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'দারাবতী' চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে আরাকাণের কোথাও হইতে পারে কি না, তাহা ঐতি-হাসিকগণের অনুসন্ধেয়।

ভাষা? এই গোহারী-ভাষা-নিবদ্ধ 'লোর-চন্দ্রাণী' উপাখ্যান কোথায় গেল, অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় এখন আর কোন ফল হইবে না।

আগেই বলিয়া আসিয়াছি, আসরফ খাঁর আদেশে কবি দৌলত কাব্যখানির রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু হায়! নিষ্ঠুর কাল কবিবরের এই আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইবার অপেক্ষা করে নাই! হঠাৎ এক দিন গানের মাঝখানেই বীণার তন্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়!

আমাদের আলোচ্য কাব্যের প্রকৃত নাম "সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী।" কিন্তু সাধারণতঃ ইহা "সতী ময়না" বা "লোর-চন্দ্রাণী" নামেই সুপ্রসিদ্ধ। যে নামই হউক না কেন, উভয় গ্রন্থ অভিন্ন। এইরূপ নামদ্বয় প্রসিদ্ধিলাভ করার কারণও যে কিছু নাই, তাহা নয়। গ্রন্থখানি আখ্যান হিসাবে দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে লোর ও চন্দ্রাণীর বৃত্তান্ত, এবং দ্বিতীয় ভাগে ময়নাবতী রাণী ও ছাতনকুমারের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় ভাগের কিয়দংশ বিরচিত হইবার পর কবি দৌলতের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। এইখানে কবির ভবলীলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে জীবনবৃত্তেরও পর্য্যবসান! তাঁহার আরব্ধ কার্য্যও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এইরূপে "খণ্ডকাব্য পুস্তক আছিল চিরদিন।" কত দিন, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

এ সকল শেষ কথা অসাঙ্গ রহিল। শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা সে নৃপ মহাশয়॥
সুধর্ম্মার শেষে তিন নৃপ চলি গেল॥ শুভক্ষণে হইল রোসাঙ্গে অধিপতি।
তবে পুনি রাজ্যের হইল ভাগ্যোদয়। দুঃখী সুখী হইল দুর্জ্জয় অধিপতি॥

দৌলতের কীর্ত্তিত রোসাঙ্গ-পতি 'রুস্তধর্ম্ম সুধর্ম্মার', সংক্ষেপতঃ সুধর্ম্মার মৃত্যুর পর আরও তিন জন নৃপতি ক্রমান্বয়ে রোসাঙ্গ রাজ্য শাসন করিয়া কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দীর্ঘকালের পর 'শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার' আমলে সুপ্রসিদ্ধ কবি আলাওল এই অসমাপ্ত কাব্যের শেষভাগ রচনা করিয়া দিয়া কাব্যখানি পূর্ণাঙ্গ করিয়া দেন।

সুকবি আলাওল এই অংশ শ্রীমন্ত সোলেমান নামক 'শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার' কোন অমাত্যের আদেশে রচনা করেন। শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার গুণকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে আলাওল লিখিয়াছেন ঃ—

প্রথম যৌবন রাজা অভিনব কাম। চতুরঙ্গ মহীপতি সাগরান্ত সীমা।
কলিযুগে হৈল আসি অবতার রাম॥ নৌকাকুল-শব্দে টুটে সমুদ্রমহিমা॥
পাপলেশ নাহি চিত্তে সুপবিত্র মন। পূর্ব্ব নৃপ-ত্রাসে যথ দেশত্যাগী লোক।
চিত্তমধ্যে নিরঞ্জন ভক্তি অনুক্ষণ॥ পুনি পাসরিল আসি স্থানভ্রষ্ট দুঃখ॥

দুঃখিতের কর খণ্ডাইলা পুনঃ পুনঃ। তান মহাপাত্র শ্রীমন্ত সোলেমান।
তথাপিহ আদ্য হস্তে বাড়ে দশ গুণ। নানা বিদ্যা শাস্ত্রে শতশঃ অবধান।
সুধর্ম্মার কীর্ত্তি আদ্য খণ্ডের ভিতর। হেম রত্ন আদি যথ ভাণ্ডার সকল।
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা সে কীর্ত্তি লক্ষান্তর। পাত্রহস্তে দিলা রাজা তান করতল।

অন্যত্র স্বতন্ত্র প্রবন্ধে* আমরা আলাওলের জীবনবৃত্তের আলোচনা করিয়া জন্মকাল আনুমানিক ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আলাওল গৌড়-বাসী; তিনি ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে কি তৎপূর্ব্বে রোসাঙ্গে আগমন করেন। এই সময়েই শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা রোসাঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। সুতরাং ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বে সিংহাসনারোহণ করেন নাই, ইহা নিশ্চিত। এই সময়ে তাঁহার ১০ বৎসর রাজত্ব হইয়াছিল, অনুমান করিলে, ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন, বলিতে পারা যায়। ইহারই পূর্ব্বে নাকি তিন জন রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই তিন জনের রাজত্বের স্থিতিকাল কত? অবশ্য জানি যে, এক শতাব্দ হইতে এক বৎসরের মধ্যেও তিন জন অধিরাজের রাজত্বও অসম্ভব নহে। কিন্তু তিন জন রাজাই ক্ষীণায়ু ছিলেন অনুমান করিলে যুক্তিসঙ্গত হয় কি? গড়ে প্রত্যেকের ১০ বৎসর রাজত্ব ধরিয়া সাকল্যে ৩০ বৎসর রাজত্বকাল অনুমান করিলে অযৌক্তিক নাও হইতে পারে। অতএব ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সুধর্ম্মা রাজা ও দৌলত কাজী বিদ্যমান ছিলেন, বলিতে হয়। মৃত্যুকালে কাজী সাহেবের বয়ঃক্রম অন্যূন ৪০ বৎসর ধরিলে, তাঁহার জন্মকাল ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা দৌলত কাজী আলাওলের ৪৫ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন।

কবি আলাওল স্বরচিত 'পদ্মাবতীর' মুখবন্ধে লোর-চন্দ্রাণীর উল্লেখ করিয়াছেন,—

যে হেন দৌলত কাজী "চন্দ্রাণী" রচিল।
লস্কর উজীর আসরফে আজ্ঞা দিল।

পদ্মাবতীর পর হয় লোর-চন্দ্রাণী, নয় সয়ফল মুল্লুক বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। যখন 'লোর-চন্দ্রাণীর' উপসংহারভাগ ও 'সয়ফল মুল্লুকের' পূর্ব্বভাগ রচিত হয়, তখন শাহ সুজা রোসাঙ্গে আগমন করেন নাই। তাই, এই দুই স্থলে তাঁহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

---

* 'আলো'—২য় বর্ষ (১৩০৭) ১ম সংখ্যায় এবং "পূর্ণিমা"—৭ম বর্ষ (১৩০৬) ১২শ সংখ্যায় "কবিবর আলাওল" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।

'সয়ফল মুল্লুক' পাঠে আরও জানা যায় যে, মাগন ঠাকুর, সৈয়দ মুসা ও শ্রীমন্ত সোলেমান, ইঁহারা সমকালীন লোক ; তবে কি না, মাগন অগ্রেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন। হইতে পারে, মাগন তাঁহাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আলাওল কর্ত্তৃক 'লোর-চন্দ্রাণীর' শেষাংশ রচিত হইবার সময় মাগন জীবিত ছিলেন কি না, বলা যায় না।

আলাওল 'লোর-চন্দ্রাণীর' শেষে একটি কালজ্ঞাপক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মীমাংসা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে বলিয়াই তৎসাহায্যে কোনও সময়নির্ণয়ের চেষ্টা করি নাই। উহা পুস্তকসমাপ্তির কাল হওয়াই খুব সম্ভব। যাহা হউক, উক্ত কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া আমরা তাহার মীমাংসার ভার পাঠকগণের উপর অর্পণ করিতেছি। কেহ ইহার মীমাংসা করিয়া দিলে আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

মুসলমানী শক সংখ্যা শুন গুণিগণ। মগধের সনের শুনহ বিবরণ।
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন॥ যুগে শূন্য মধ্যে যুগ বামে দুর্গাঙ্কন॥
সিন্ধু শূন্য দেখিয়া অপর দুই দিকে। শ্রাবণের বসু দিন আশ্বিনে রুদ্রাঙ্গ।
শুক্র কলা নিধিরে রাখিলা বাম ভাগে॥ তদন্তরে লেখি পুস্তক করিলাম সাঙ্গ॥

মুদ্রিত গ্রন্থে যেমন পাঠ আছে, ঠিক তেমনটিই দেওয়া গেল। পাঠাশুদ্ধি থাকা সম্ভব।

লোর-রাজের প্রথমা মহিষী 'ময়নাবতী' ও দ্বিতীয়া মহিষী 'চন্দ্রাণী'। লোর চন্দ্রাণীকে লইয়া শ্বশুররাজ্যে বাস করিতে থাকেন ;—'ময়নাবতী' স্বরাজ্যে থাকেন। 'ছাতন' নামক এক বণিকপুত্র ময়নাবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎসকাশে এক 'কুট্টনী' মালিনী নিযুক্ত করে। মালিনী নানা অছিলায় রাণীর শৈশবধাত্রীর পদলাভ করে। লোরের কথা তুলিয়া রাণীকে রাজার প্রত্যাগমন সম্বন্ধে কখনও বা হতাশ্বাস করিতেছে, কখনও বা পত্যন্তর, চাই কি, রাজধানীস্থিত ছাতন-কুমারকে গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিতেছে। ময়নারাণী প্রকৃত সতী স্ত্রী—কিছুতেই টলেন নাই। মালিনী অগত্যা ষড়ঋতুর বর্ণনা জুড়িয়া দিল। প্রথমেই আষাঢ় মাস। (১) দৌলত কাজী বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত লিখিয়া অমরধামে গমন করেন। ইহার পর আলাওলের লেখা। ইনি আর দুই একটা প্রাসঙ্গিক কথার অবতারণানন্তর লোর-চন্দ্রাণী ও ময়নাবতীর মিলন সংঘটন করিয়া কাব্য

(১) কাব্যের আদেষ্টা 'আসরফ খাঁর' নামের প্রথমাক্ষর লইয়া কবি দৌলত বার মাস রচনার

সমাপ্ত করেন। বলিয়া রাখা উচিত, আলাওল কাব্যখানি শেষে মুসলমানী পরিচ্ছদে আবৃত করিয়াছেন।

'লোর-চন্দ্রাণী' মুদ্রিত হইয়াছে; গ্রন্থ সুবৃহৎ। ডিমাই আটপেজী প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা। চট্টগ্রাম-বাসী মুন্সী আলি মিঞা অনেক দিন পূর্ব্বে ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশ্রী সংস্করণ।

আলাওলের গুণাগুণ সম্বন্ধে সকলেই জানেন,—আমার কিছু বলাই ধৃষ্টতা। দৌলত কাজী আলাওল সাহেবের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের লোক,—সুতরাং কাজী সাহেবের ও আলাওলের ভাষায় একটু আণুবীক্ষণিক পার্থক্য আছে। হস্তলিখিত গ্রন্থ না পাইলে, ইহার আলোচনা চলে না। মুদ্রিত গ্রন্থে ইহার মৌলিকতা বিনষ্ট হইয়াছে।

ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর নিকট এই গ্রন্থ অতি মূল্যবান বিবেচিত হইবে। অন্যে ইহাতে প্রচুর আমোদ পাইবেন। সে কথা আমাদের বলিয়াই বা কাজ কি? নিম্নোদ্ধৃত অংশে তাহা সপ্রমাণ হইবে :—

রাগ—দক্ষিণান্ত শ্রী (শ্রীরাগ)।

প্রাণি মোর দহে দহে।
রাজার নন্দিনী কেনে রে ময়না এথ দুঃখ সহে রে।
প্রথম বরিষা দেখ প্রবেশ আষাঢ়।
বিরহিণী-বিরহ বাড়এ অতি গাঢ়॥
মদন অসিক যিনি নীরকলা ঘন।
শিখার নাচএ শিখী ধরিয়া পেখন॥
নব-নীর-পানে মত্ত চাতক চপল।
পীউ পীউ উচ্চ স্বরে ফুকারে মঙ্গল॥
কেহ নাচে কেহ গাএ সারস বিহঙ্গ।
দোলএ দম্পতী সব মদন-তরঙ্গ॥
আইসে পন্থিক জন বধূ প্রেম গুণি।
নির্জ্জন সঙ্কেত সুখ বরিষা রজনী॥
নিজ গৃহ অনুসারি আইসে বণিজার।
বরিষা নিকটে কান্ত না দেখি ময়নার॥
ঘরে ঘরে নিজ কান্ত করয়ে বিলাস।
কামাকুল কামিনী না ছাড়ে কান্তপাশ॥
তুই ময়নার দুঃখ দেখি বিরহে তাপিনী।
এ বোলিয়া ভূমি পড়ি বিলাপে মালিনী॥

পাঠাশুদ্ধিবশতঃ এখানে আষাঢ়ের উত্তর না দিয়া শ্রাবণের উত্তরটি তুলিয়া দিলাম।

রাগ—ভৈরব।

মালিনী কি কহব বেদনা ওর।
লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর॥
শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর।
তবে মোর না জুড়াএ এ তাপ শরীর॥
মদন অসিক জিনি বিজলীর রেহা।
তর্কয়ে যামিনী কাম্পএ মোর দেহা॥
না বোল না বোল ধাত্রি অনুচিত বোল।
আন পুরুষ নহে লোর সমতুল॥

লাখ পুরুষ নহে লোরের স্বরূপ।
কোথাএ গোময়-কীট কোথায়ে মধুপ॥
গরল সদৃশ পরপুরুষের সঙ্গ।
ডংশিয়া পলাএ যেন এ কালভুজঙ্গ॥
বিরহিণী রাণী ধনী জপয়তি লেহা।
লস্কর নায়ক মণি রসগুণগাহা॥

পাঠক দৌলত কাজীর রচনার নমুনা দেখিলেন। এখন আলাওলের রচনার কতকটা নমুনা দেখুন।

সঘন গর্জ্জন করে বিষবরিষণ।
যাহার নাহিক স্বামী সংশয় জীবন॥
ডাহুক দাদুরী রবে হিয়া জ্বলে বুকে।
গরল বরিখে যেন শিখিনী কুহুকে॥
বায়ু বৃষ্টি হইলে শীতল হএ তনু।
মোহর শরীরে জ্বলে বাড়ব কৃশানু॥
কোকিল দোরেফ নাদে কর্ণে ফুটে শাল।
বিচটীর পত্র প্রায় জাগে পুষ্পমাল॥
চতসৃসম চন্দনে অন্তর ধিক জ্বলে।
কলি পরে পলি যেন লিপএ কুলালে॥
কণ্টক ফুটয়ে অঙ্গে কোমল শয্যাত।
প্রিয় বিনে গৃহে মোর লাগএ উৎপাত॥
পুষ্পের সৌরভে মোর শ্বাস বন্ধ হএ।
সলিল বিহীনে হিত অহিত করএ॥
হিত শত্রু হইলে জীবন কিসে আর।
তাহে অনুচিত বাক্য বোল বারে বার॥
বিরহ মাতঙ্গ নিবারএ সিংহ পতি।
সিংহ শৃগালের নহে একত্রে বসতি॥
নিজ পতি বিনে ভিন্ন নাগরের সঙ্গ।
নাগরিকা নারীর মনে উপজএ রঙ্গ॥
ধাত্রি বোলি সহম্ তোর এথ দুর্ব্বচন।
অন্য হৈতে শাস্তি তারে দিতুম ততক্ষণ॥

স্থানে স্থানে কথার বাঁধুনি কিরূপ দেখুন। সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই ঋতু-বর্ণনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট,—বৈষ্ণবকবিতার গন্ধে আমোদিত।

(১) মাঘের পঞ্চমী কি মোর গুণ।
কামপুর মোর হইল শূন॥
তাতে ধাত্রি কহে রঙ্গের বাণী।
ঘায়েতে লবণ মিলাএ আনি॥
হাস্য পরিহাস্য বিকল ধাই।
মুই ব্যাকুল ছাঁই (সাত্রি) হারাই॥
—দৌলত কাজী।

(২) নব শীত ঘন কেশ মলয় মার্জ্জন
রঞ্জিত তরল কুঞ্জে।
কোকিল কাকলী কাল কল কূজিত
লুলিত ললিত নিকুঞ্জে॥
কেতকী চম্পক কদম্ব মরবক
বকুল নকুল রঙ্গে।
হেরইতে মধুর মধুপানে মধুকর
মালিনী মন বিভঙ্গে॥ (ঐ)

(৪) চন্দ্রিমা চন্দন দহে যেন অঙ্গ।
বরিখে বাদর বিষের তরঙ্গ॥
মলয়-সমীর আনলের তুল।
কঠিন কণ্টক মালতীর ফুল॥
—আলাওল।

প্রবন্ধ বড়ই দীর্ঘ হইল। একে প্রকাণ্ড গ্রন্থ, তাহাতে অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত মুসলমান কবির রচনা বলিয়া আমরা একটু বিস্তৃতভাবে ইহার আলোচনা

করি, যাহাতে এই গ্রন্থখানি বিশুদ্ধভাবে প্রচারিত হয়, তাহার উপায়বিধান করুন। প্রাচীন হস্তলিপির অভাব এখনও হয় নাই।

শ্রীআবদুল করিম।

হোসেন্ শাহ।

বঙ্গে যবনাধিকারের তিন শতাব্দী কাল অতীত হইয়াছে। পাঠান বহুপূর্ব্বেই দিল্লীশ্বরের অধীনতা-শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যের বা অরাজকতার বিস্তার করিয়াছে। এই মধ্যযুগে যবনাধিকৃত বঙ্গভূমির সর্ব্বত্র ইস্লামের অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত পতাকার জয়জয়কার; সর্ব্বত্র যবন-প্রভাব বিস্তৃত। মুসলমান জায়গীরদার ও তাহার আনুষঙ্গিক বিদেশীয় যুদ্ধব্যবসায়ী দলের সংখ্যা ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। দুর্দ্দম পাঠান সামন্তবর্গের পরস্পর ঈর্ষ্যাজনিত বিপ্লবাদিতে দেশ সম্পূর্ণ উপদ্রুত। নিরীহ মৃতপ্রায় হিন্দুসমাজ ধর্ম্মান্ধ যবনের সাময়িক অত্যাচারে ম্রিয়মাণ। এমন সময়ে এক ক্ষণজন্মা মুসলমান মহাপুরুষের হস্তে স্রোত ফিরিল। ইনি ইতিহাসখ্যাত, প্রথিতনামা, সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শা।

হোসেন শার বাল্যজীবন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকসমাজে বিস্তর মতভেদ লক্ষিত হয়। প্রসিদ্ধ ফেরেস্তা বলেন, 'ইনি সৈয়দ-বংশ-সম্ভূত; ভাগ্যপরিবর্ত্তন-কামনায় সুদূর আরবের মরুময় ভূখণ্ড হইতে বাঙ্গালার শস্যশালী জনপদে আসিয়া কালক্রমে গৌড়ের রাজ-মন্ত্রী হন।' রিয়াজ-উস্-সালাতিন্ গ্রন্থকার গোলাম হোসেন্ লিখিয়াছেন,—'আমরা গ্রন্থান্তরে দেখিয়াছি, হোসেন্ শা ও তদীয় ভ্রাতা ইউসুফ ও তাঁহাদের পিতা সৈয়দ আশরফ্ হোসেনী স্বীয় বাসস্থান তেরমজ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া রাঢ়ভূমির অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে বাস করেন। ভ্রাতৃদ্বয় তথাকার কাজীর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন। কাজী তাঁহাদের বংশপরিচয় জ্ঞাত হইয়া ও হোসেনের বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য করিয়া শেষে স্বীয় কন্যার সহিত হোসেনের বিবাহ দিলেন। অতঃপর সৈয়দ হোসেন গৌড়ের রাজসংসারে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হন।'

আমাদের এই মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর উপবিভাগের অন্তর্গত গণ্ডগ্রাম গনকর মির্জাপুরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে চাঁদপাড়া নামক গ্রাম বর্ত্তমান। গনকর অঞ্চলে জনশ্রুতি এই যে, হোসেন শা বাল্যে অত্রত্য জনৈক ব্রাহ্মণের গোরক্ষক

নিযুক্ত ছিলেন; এই কারণেই ভবিষ্যতে তিনি 'রাখাল বাদশা' উপাধি পান। প্রবাদ নির্দ্দেশ করিতেছে, ব্রাহ্মণ বামনী-বংশের প্রতিষ্ঠাতার মত এই বালকের অভাবনীয় ভাগ্য সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, এবং উপকথার রাজগণের সনাতন নিয়মে সুপ্ত বালকের শিরোভাগে ফণাবিস্তার করিয়া এক কালসর্প আতপনিবারণও করিয়াছিল। উপসংহারে কথিত হয়, হোসেন্ শার রাজপদপ্রাপ্তির পরে প্রতিপালক ব্রাহ্মণকে এক-আনা মাত্র রাজস্বে চাঁদপাড়া গ্রাম প্রদত্ত হয়; এই কারণে গ্রামের নাম 'এক আনা চাঁদপাড়া'। একআনায় অদ্যাপি এক প্রাচীন হর্ম্ম্যের ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। এ প্রদেশের বিশ্বাস, হোসেন্ হিন্দু মাতার গর্ভজাত। বাল্যে পিতৃহীন হইয়া অনাথিনীর সন্তান গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ গৃহস্থের রাখালী কার্য্যে ব্রতী হয়। ভাগ্যচক্রের অচিন্তিত-পূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে সাধারণ মুসলমানের সৈয়দ হইয়া উঠা বড় বিচিত্র নয়। পক্ষান্তরে দেশান্তরিত দরিদ্র সৈয়দেরও দেশীয় নিম্নশ্রেণীর হিন্দু পত্নী হওয়া নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। (১)

হোসেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া গৌড়ের বাদশাহ-দরবারে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। গৌড়ে তখন বিষম বিপ্লব; ষড়যন্ত্রে একের নিধন ও অপরের রাজ্যগ্রহণ তখন নিত্য ঘটনা। রাজসেনানী হাবসীদলেরই সর্ব্বময় প্রভুত্ব। এইরূপ এক ষড়যন্ত্রের অবকাশেই হাবসীদলের অন্যতম নায়ক সৈয়দ বদর দেওয়ানা (২) প্রথমে দুরাকাঙ্ক্ষ রাজমন্ত্রী বেশে অকর্ম্মণ্য নৃপতি মামুদ শাকে নিহত করিয়া, মজঃফর শা নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিশাচপ্রভৃতি দেওয়ানা অতঃপর হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজের অগ্রণী অনেকেরই উপর অমানুষিক অত্যাচার এবং কাহারও বা প্রাণসংহার করিয়া রাজপুরুষগণের হৃদয়ে বিষম আতঙ্ক উৎপাদন করিয়াছিল। হোসেন্ শা এই সময়েই প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইয়াছিলেন। মন্ত্রিবরের কূট কৌশলে মজঃফর শা রাজকোষে অর্থসঞ্চয়কল্পনায় সৈন্যসংখ্যার হ্রাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ রাজস্ব

(১) ডাক্তার বুকাননের রঙ্গপুর-বিবরণীতে লিখিত আছে, হোসেন শা রঙ্গপুরের বোদা বিভাগে দেবনগরে জন্মগ্রহণ করেন (Martin's Eastern India III. p. 448); সুলতান ইব্রাহিম তাঁহার পিতামহ। এই ইব্রাহিম জেলালুদ্দীনের (যদু সেন) হস্তে নিহত হন। এই ঘটনা ও উক্তির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। রঙ্গপুরের পাঠক

আদান ও অন্যান্য কঠোর উপায়ে দেশের সম্ভ্রান্ত লোকের উপর অত্যাচার যখন চরম সীমায় উপনীত হইল, সেই সময়ে (রিয়াজের মতে ৯০৩ হিঃ সালে) হোসেন্ অন্যান্য ওমরাহগণের সহযোগে বিদ্রোহের সূত্রপাত করিলেন।

ঐতিহাসিক নিজামুদ্দীনের মতে, বদর দেওয়ানার অত্যাচার ও অসদ্ব্যবহারে প্রজাপুঞ্জ ত্রস্ত হইলে সৈয়দ হোসেন্ কৌশলে রাজসৈন্যদলকে বশীভূত করিয়া একদা রজনীযোগে ত্রয়োদশ জন সশস্ত্র সৈনিকের সাহায্যে রাজপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। অপর দুই এক জন লেখকের মতে, মজঃফর শা ওরফে বদর দেওয়ানী চারি মাস কাল গৌড়ের দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া (৩) শেষে সদলে যুদ্ধার্থ বহির্গত হন। উভয় পক্ষের দুই সহস্র সৈন্য কালের করাল কবলে নিপতিত হইলে বিজয়শ্রী হোসেন্ শার অঙ্কগতা হইলেন। (৪) যে রূপেই হোসেনের রাজ্যলাভ ঘটুক, মজঃফরের কুকীর্ত্তির কেহই অপলাপ করেন নাই।

যাঁহারা বলেন, হোসেন শা যুদ্ধান্তে রাজ্যলাভ করেন, সেই ঐতিহাসিকগণের মতে, উচ্ছৃঙ্খল সেনাদল হোসেনের অভিমতেই গৌড়নগরী লুণ্ঠন করে। কথিত আছে, সেনানায়ক ও অমাত্যবর্গ নাগরিকগণের চিরসঞ্চিত ধনরাশি তাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইবে, এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াই হোসেন শার পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন যাহা হউক, কয়েক দিন পরে সৈন্যদলকে লুণ্ঠন হইতে বিরত হইবার আদেশ প্রচারিত হইল। বারংবার নিষেধ করিলেও সেনাদল আদেশপালন না করায় শেষে হোসেন শা অসংখ্য লুণ্ঠনকারীকে নিহত করিয়া অত্যাচার প্রশমিত করিলেন। কিন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্যের সিংহযোগ্য অংশগ্রহণে তাঁহার আপত্তি ছিল না। এই সময়ে তিনি তের শত রৌপ্যপাত্র প্রাপ্ত হন। মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, পুরাকাল হইতে লক্ষ্ণৌতী ও বঙ্গের ধনশালী অধিবাসিগণের মধ্যে ভোজনকালে রৌপ্যপাত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। নিমন্ত্রণ ও ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে যিনি যে পরিমাণে

---

(৩) রিয়াজ গ্রন্থে নির্দ্দেশ আছে, গৌড়ের অবরোধকালে শত্রু পক্ষের বন্দী সেনাগণকে মজঃফর হাবসী-জাতি-সুলভ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া স্বহস্তে বধ করিতেন। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, এইরূপে চারি সহস্র লোক নিহত হয়।

রৌপ্যপাত্র প্রদর্শন করিতে পারিতেন, তিনি সেই পরিমাণে সমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতেন।

গৌড়-অধিকার ও সিংহাসন-লাভ করিয়া হোসেন শাহ আলাউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করিলেন। (৫) ধীমান্ নবভূপতি প্রথমেই প্রকৃতিপুঞ্জের প্রীতি-আকর্ষণে মনোনিবেশ করিলেন। সদ্বংশজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে স্বপদে স্থিরতর রাখিয়া উপযুক্ত ব্যক্তির পদোন্নতি করিয়া সকলের সম্মানবর্দ্ধন করিলেন। উচ্ছৃঙ্খল পাইক দলই রাজবিদ্রোহ ঘটাইবার উপায়স্বরূপ ছিল ; ভবিষ্যৎ-বিপ্লব-পরিহারের মানসে হোসেন শা এই পদাতিক সেনাদলকে পদচ্যুত করিয়া ভিন্ন শ্রেণীর লোক নিযুক্ত করিলেন। (৬) ক্রমশঃ স্বপদে দৃঢ়তর হইয়া তিনি হাব্সী সেনা-বৃন্দকেও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ভয়েই সম্ভবতঃ তিনি গৌড় ছাড়িয়া নিকটবর্ত্তী একডালার সুদৃঢ় দুর্গে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের নির্দ্দেশ মতে হোসেন শা 'শেব-হঙ্গ' নামক এক দল শরীররক্ষী সেনার গঠন করেন। বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থে দেখা যায়, কেশব ছত্রী হোসেন শার শরীররক্ষী রাজপুত সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন। সম্ভবতঃ সুলতান হোসেন শার সুব্যবস্থা ও সুশাসনে অচিরেই দেশমধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল ; অশান্ত জায়গীরদার ও সামন্তবর্গের অত্যাচার ও সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা ত্বরায় বিদূরিত হইল। সমগ্র প্রজাবর্গ তাঁহার অনুরক্ত থাকায় তিনি সহজে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিলেন। তৎপরে আসাম প্রদেশে কামরূপ ও কামতা পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়ী সৈন্য ধাবিত হইল। হিন্দু রাজা পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিলেন। সুলতান পুত্রের প্রতি সেনা-পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। বর্ষার জলপ্লাবনে রাস্তা ঘাট দুর্গম হইয়া পড়িলে কামরূপ-রাজ পর্ব্বতাশ্রয় হইতে অবতরণ করিয়া বিপক্ষের গমনা-গমনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বহুসংখ্যক মুসলমান সৈন্য নিহত হইল ; রাজপুত্র কায়ক্লেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর হোসেন শাহ

(৫) প্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিকগণ হোসেন শাকে আলাউদ্দীন সৈয়দ শরিফ মক্কা নামেই নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু রিয়াজ গ্রন্থকার হোসেন শার নির্ম্মিত সোনা মসজীদ ও গৌড়ের অন্যান্য কয়েকটি সমাধিস্থলের শিলালিপিতে 'সৈয়দ আশরফ্ হোসেনের পুত্র সুলতান হোসেন শা' নামের উল্লেখ লক্ষ্য করিয়াছেন।

আক্রমণের হস্ত হইতে স্বরাষ্ট্ররক্ষণের কল্পনায় বাহাতি (৭) নদীর তীরে সুদৃঢ় দুর্গশ্রেণীর নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন।

তৎপরে বঙ্গের জনসংখ্যাবর্দ্ধন ও প্রজাবর্গের সুখস্বচ্ছন্দতাবিধানই হোসেন শার ব্রত হইল। সম্ভ্রান্ত ও সৎকুলজাত মুসলমান প্রজাবর্গের উন্নতির ব্যবস্থা হইল। স্থানে স্থানে মসজীদ ও অতিথিশালা নির্ম্মিত ও সাধু পুরুষদিগের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু নুর কুতব উল্ আলমের অতিথিশালার ব্যয়নির্ব্বাহার্থে বিস্তর ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইল। হিন্দুপ্রজার হিতসাধনেও হোসেন শা উদাসীন ছিলেন না। বস্তুতঃ রাজকীয় ব্যাপারে কৃতিত্ব তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার উপযুক্ত হইলেও, জাতিনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনই হোসেন শার অতুল কীর্ত্তি। হিন্দু পল্লীতে হিন্দুর মধ্যে লালিত হইয়া হোসেন সহজেই হিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পড়েন। উড়িষ্যা প্রভৃতির সমরে উচ্ছৃঙ্খল আফগান্ মুসলমান সেনাদলের হিন্দু-মন্দির চূর্ণীকরণ ও অন্যান্য অত্যাচার যে হোসেন শার অভিমত ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। অপিচ, বৈষ্ণব কবিগণের হোসেন শা সম্বন্ধে উক্তি তাঁহার সাধুতাই সপ্রমাণ করিতেছে। একালের খ্যাতনামা অনেক হিন্দুকেই হোসেন শার অধীনে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মে নিযুক্ত দেখিতে পাই। রাজকার্য্যে বাঙ্গালী হিন্দুর পারদর্শিতা সম্ভবতঃ ইতঃপূর্ব্বেই যবনরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু হোসেন শার পূর্ব্বে গৌড়ের সরকারে উচ্চতর বিশ্বস্ত রাজকার্য্যে হিন্দুর নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায় না। খ্যাতনামা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ গোপীনাথ বসু (পুরন্দর খাঁ উপাধি) হোসেন শার খ্যাতনামা উজীর ছিলেন। (৮) তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় গোবিন্দ ও প্রাণবল্লভ যথাক্রমে গন্ধর্ব্ব খাঁ এবং সুন্দরবর খাঁ নামে প্রথিত হইয়া উচ্চতর কর্ম্মে নিযুক্ত

---

(৭) ষ্টুয়ার্ট এখানে 'বেতিয়া' নদী পাঠগ্রহণ করিয়া গণ্ডকের উল্লেখ করেন। কিন্তু এই দুর্গনির্ম্মাণ ব্যাপার দুর্জ্জয় আসামীগণের বাধা দিবার নিমিত্ত, পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানের জন্য নহে। সেকন্দর লোদীর আক্রমণে জৌনপুররাজ হোসেন শার আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু পরাক্রান্ত হোসেন শাকে উত্ত্যক্ত করিতে দিল্লীশ্বরের সাহসে কুলায় নাই।

(৮) বর্ত্তমান হুগলী জেলার শেয়াখালা গ্রাম পুরন্দর খাঁর জন্মস্থান। অদ্যাপি তথায় পুরন্দরগড় নামক স্থান বর্ত্তমান। পুরন্দর খাঁর পিতামহও গৌড়-সরকারে চাকরী করিয়া সুবুদ্ধি খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। পুরন্দর খাঁ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের সংস্কারসাধন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকথিত কেশব ছত্রী বাদশার বিশ্বস্ত হিন্দু শরীররক্ষী সেনাদলের অধিনায়ক। মাধাইপুরের সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণকুমার সনাতন তাঁহার দবির-খাস (private secretary) এবং সনাতনের কনিষ্ঠ, পরে রূপ গোস্বামী সাকর মল্লিক নামে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরূপ সমাবেশ যে আকস্মিক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও ষোড়শের প্রথমার্দ্ধ আর্য্যজাতির মনস্বিতা ও ধর্ম্মপ্রকৃতির বিকাশে যে সহায়তা করিয়াছিল, সেরূপ আর কখনও হয় নাই। সুদূর পশ্চিমে লূথার প্রভৃতি মহাপুরুষেরা খৃষ্টীয় জগতে যে সময়ে ধর্ম্মবিপ্লবের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সমকালেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কবীর, নানক ও বল্লভাচার্য্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন। পরিশেষে এই নির্জীব কর্ম্মকাণ্ডপ্লাবিত বঙ্গভূমিও চৈতন্যের মধুময় প্রেমভক্তিতরঙ্গে আলোড়িত হইল। চৈতন্যের নবধর্ম্মপ্রচারের সহিত সুলতান. হোসেন শার সম্বন্ধ সাধারণের বিশেষ পরিজ্ঞাত না হইতে পারে; এজন্য বৈষ্ণব-গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।—

ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলী গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপাম॥
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ॥
গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিঞা।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥
বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়।
সেই ত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজি যবন কেহো ঞিহার না কর হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বলুন যাহা ঞিহার মন॥
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা যে পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল॥
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থপর্য্যটন।
তারে দেখিবারে আইসে দুই চারি জন॥
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে না গণি।
তার হিংসায় লাভ নাহি হয় মাত্র হানি॥

রাজারে প্রবোধি ছত্রী ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া॥
দবীরখাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তিঁহ লাগিলা কহিতে॥
যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোসাঞা।
তোমার ভাগ্যে তোমার দেশে জন্মিল আসিঞা।
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয়॥
মোরে কেনে পুছ তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশ সম॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয়ে সেই ত প্রমাণ॥
রাজা কহে শুন মোর চিত্তে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইঁহো নাহিক সংশয়॥
এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তর।
দবীরখাস আইলা তবে আপনার ঘর॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া॥
অর্দ্ধ রাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভুস্থানে।

—চৈতন্যচরিতামৃত; মধ্যখণ্ড; ১ম পরিচ্ছেদ।

'ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছসেবী, করি ম্লেচ্ছ-কর্ম্ম'—পতিতপাবন! নিজ গুণে দয়া করিয়া আমাদের উদ্ধার করিতে হইবে, ইত্যাদি কথায় রূপ সনাতন চৈতন্যের আশ্রয় লইয়া নবজীবন পাইলেন। তৎপরে,

'শ্রীরূপ সনাতন রামকেলী গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে॥
দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিঞা দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥

—চরিতামৃত; ষষ্ঠ; ১৯শ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কুটুম্ব ভরণার্থ অনেক ব্যয় করিয়া, ভাল ভাল ব্রাহ্মণের নিকট অনেক টাকা গচ্ছিত রাখিয়া দশ হাজার মুদ্রা লইয়া রাখিলেন। সনাতন মুদীর

গৃহে থাকিয়া উহা ব্যয় করিতে লাগিলেন। সনাতন পীড়ার ছল করিয়া রাজগৃহে যান না, বাসায় শাস্ত্রবিচারে কালাতিপাত করেন। রাজা এক দিন হঠাৎ আসিয়া এই ভাব দেখিলেন। বলিলেন, 'তুমি এরূপ করিয়া গৃহে বসিয়া থাকিলে আমার সমস্ত কর্ম্ম নষ্ট হয়; মনে কি আছে, বল।' সনাতন বলিলেন, 'আমা দ্বারা আর এ কার্য্য হইবে না। আপনি অন্য লোক নিযুক্ত করুন।' রাজা ক্রোধভরে বলিলেন, 'তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার। জীব বহু মারি সব থাকনা কৈল নাশ। এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্ব কার্য্য নাশ। * * * পলাইবে জানি সনাতনেরে বান্ধিলা। হেনকালে চলে রাজা উড়িয়া মারিতে। সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাতে। তেঁহো কহে যাবে তুমি দেবতা দুঃখ দিতে। মোর শক্তি নাই তোমার সঙ্গে যাইতে। তবে তারে রাখিয়া করিলা গমন (ষষ্ঠ ১৯শ পরিচ্ছেদ) এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া রূপ পূর্ব্বেই স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন। মুদীর নিকটে যে দশ হাজার টাকা গচ্ছিত ছিল, তাহাই ব্যয় করিয়া সনাতন আত্মমোচনের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। (মধ্যখণ্ড; ২০ পরিচ্ছেদ।)

উল্লিখিত উপাখ্যানে বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামীর বৈষ্ণবভক্তি ও রূপাদির নিকট শ্রুত গল্প গুজব ত্যাগ করিলে, হোসেন্ শাকে বিষম অত্যাচারী বলিয়া স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। চৈতন্যের কার্য্যকলাপ দেখিয়া মুসলমান বাদশাহও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন, চরিতামৃতেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। মনে হয়, প্রজার উপর অত্যাচার করাতেই রূপ সনাতনের প্রতি বাদশার কোপ সঞ্জাত হয়, এবং তাঁহারা দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এ স্থলে হোসেন শার পূর্ব্বপ্রভু সুবুদ্ধি রায়ের কথাও আলোচ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন :—

"পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড়-অধিকারী।
সৈয়দ হোসেন খাঁ করে তাহার চাকরী॥
দীঘি খোদাইতে তাঁরে মনাসিব্ কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥
পাছে যবে হোসেন শা গৌড়ে রাজা হৈলা।
সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহ বহু বাড়াইলা॥
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধি রায়েরে মারিতে কহে রাজা স্থানে॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।

স্ত্রী কহে জাতি লহ প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি লৈলে ইঁহো নাহি জীবে॥
স্ত্রী মরিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোঁয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা॥
তবে ত সুবুদ্ধি রায় সেই ছিদ্র পাঞা।
বারাণসী আইল সব বিষয় ছাড়িয়া॥"

—চরিতামৃত ; মধ্যখণ্ড ; ২৫শ পরিচ্ছেদ।

হোসেন শার মত সুবিজ্ঞ নরপতি যে বিনা কারণে স্ত্রীর কথায় "পোষ্টা পিতার" তুল্য ব্যক্তির এইরূপ লাঞ্ছনা করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। প্রথমে সুবুদ্ধি রায় কে, তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। পুরন্দর খাঁর পিতামহ সুবুদ্ধি খাঁকে কেহ কেহ এই সুবুদ্ধি রায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁহার উপর যবনদোষস্পর্শের কোন নিদর্শন নাই ; অধিকন্তু প্রিয় উজীরের পিতামহের উপর এরূপ আচরণ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বারেন্দ্রকুল-পঞ্জিকায় এক সুবুদ্ধি রায়ের উপর আলিয়ার খাঁনী যবন দোষ ঘটার উল্লেখ আছে। (৯) 'আলিয়ার খাঁন যবন সুবুদ্ধি রায়কে দস্তবান করিয়াছিল।' ইহাতে কি ভাবে নিগ্রহ হইয়াছিল, স্পষ্ট বুঝা যায় না। এই সুবুদ্ধি রায় ভাদুড়িয়ার প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণের ভাগিনেয়। ইনি সুবুদ্ধি ভাদুড়ী। ইঁহার পিতা পরমকুলীন শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী। এই আলিয়ার খাঁ কে, এবং এই ঘটনার সহিত হোসেন শার কি সম্বন্ধ, তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু কংসনারায়ণের ভাগিনেয়ের 'গৌড়-অধিকারী' বা গৌড় অঞ্চলের রাজস্বসংগ্রাহক জমীদার হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। (১০) যাহা হউক, চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণের সহিত বারেন্দ্রকুলজ্ঞের কথা মিলাইয়া অনুমান হয়, হোসেন শা রাজা হইয়া পূর্ব্বপ্রভু সুবুদ্ধিকে অধিকারীর পদও দিয়াছিলেন ; শেষে সুবুদ্ধি রায় কুবুদ্ধির ফলে হোসেনের আদেশে আলিয়ার খাঁর হস্তে নিগৃহীত হন, এবং তজ্জন্য তাঁহার জাতি যায়।

হোসেন শার রাজ্যকালের শেষভাগে (১১) চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিপ্লব ও

(৯) গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

(১০) বর্ত্তমান তাহেরপুরের জমীদারগণ এই কংসনারায়ণের দৌহিত্র-বংশ-সম্ভূত।

(১১) হোসেন শার রাজ্যকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে :—'মনসার ভাসানে লিখিত আছে :—

ঋতু শূন্য বেদ শশী যুক্ত শক।
সুলতান্ হোসেন শা নৃপতিতিলক।

সামাজিক অবস্থা সাধারণ পাঠকের অজ্ঞাত নাই। এই দেশব্যাপী সমাজ-বিপ্লবের বিবরণ-প্রদান বা তাহার কালানুসন্ধান বর্তমান প্রবন্ধের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু একালের বাঙ্গালী হিন্দুর মনস্বিতা-বিকাশের কথা উল্লেখ না করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করা যায় না। তিন শত বর্ষ যবনপদদলিত চিরসুপ্ত হিন্দুর এই পুনরুজ্জীবন বড়ই বৈচিত্র্যময়। যে কালে নবদ্বীপচন্দ্র গৌরাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে মহামহোপাধ্যায় রঘুনাথ শিরোমণির জ্ঞানালোকে বঙ্গভূমি উদ্ভাসিত, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অগাধ পাণ্ডিত্য ও গবেষণায় সমাজস্থিতির উপযোগী নিয়মাবলীর আবির্ভাব ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতির ধীশক্তিগৌরবে বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালীর অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মালদহ জেলার গল্পগুজব ও ইতিহাস।

(১) মহানন্দা নদী।—মহানন্দা মালদহ জেলার প্রধান নদী। কোন প্রাচীন গ্রন্থে মহানন্দার নাম পাওয়া যায় না। মহাভারতের বনপর্ব্বে নন্দা ও অপরনন্দা নাম্নী দুইটি নদীর ও অধিবঙ্গ নামক একটি তীর্থের নাম আছে। মহানন্দার প্রাচীন নাম নন্দা বা অপরনন্দা। কেহ কেহ বলেন যে, "মহানন্দার অপর নাম বাহুদা"। পশ্চিম ভারতের কোন নদী।

(২) রণচণ্ডী ও পাটলা চণ্ডী।—পুরাণে চণ্ডীপুরের রণচণ্ডী ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের পাটলা চণ্ডীর নাম আছে। পাটলা চণ্ডীর বর্ত্তমান নাম পাতালচণ্ডী। রণচণ্ডীর বর্ত্তমান দ্বারবাসিনী। রণচণ্ডীর মন্দিরের ভগ্ন স্তূপ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। লোকে বলে, কোন সময়ে দ্বারবাসিনী ও রাজমহলস্থ শিখর-বাসিনীর মধ্যে বিশালগঙ্গা নদী প্রবাহিত হইত। দ্বারবাসিনী হইতে নৌকা ছাড়িবার সময় একটি ও শিখরবাসিনীর নিকট নৌকা পঁহুছিলে একটি তোপ-ধ্বনি হইত।

(৩) গৌড়নগরে ৩৬০ জন সম্ভ্রান্ত লোক পাল্কী ব্যবহার করিতে পাই-তেন।—মুসলমান-রাজত্বকালে গৌড় নগরে রাজাজ্ঞা ব্যতীত কেহ হস্তী পাল্কী

ইহাতে ১৪০৬ শক—১৪৮৪।৮৫ খৃঃ হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ১৪৯৮ (৯০৩), ১৪৯৫ ও ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন্ শার রাজ্যারম্ভ বলিয়া তিন মত প্রচারিত আছে। রিয়াজ গ্রন্থকারের নির্দ্দেশ অনুসারে ৯২৭ হিঃ (১৫২০ খৃঃ) সালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ব্যবহার করিতে পাইত না। অট্টালিকা-নির্ম্মাণ করিতে হইলেও অনুমতি লইতে হইত। নগর সুশোভিত হইবে বলিয়া শাসনকর্ত্তৃগণ অট্টালিকা-নির্ম্মাণে আপত্তি করিতেন না। কথিত আছে, কেবল ৩৬০ জন সম্ভ্রান্ত লোক, পাল্কী ব্যবহার করিতে পাইতেন।

(৪) মালদহ নগরের নারীগণের প্রতি বেহুলার অভিশাপ।—পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বঙ্গে বেহুলার সম্পৃক্ত স্থানের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। যে সময় বঙ্গের অধিকাংশ সমুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ নদীর জলে নিমগ্ন ছিল, তখন জলরাশি হইতে অচিরোন্নত স্থলভাগে সর্পের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। বাঙ্গালার ইতর লোক সর্পপূজা করিত। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বোধ হয় শৈবোপাসনার প্রাবল্য ছিল। চাঁদ সদাগর ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না, জানা যায় নাই। গৌড়নগরে চাঁদ সদাগরের বাটী বলিয়া একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তন্ত্রবিভূতি নামক দুই শত বৎসরের প্রাচীন একখানি পদ্মা-পুরাণে, বেহুলার ঘটনা গৌড়ের নিকটে ঘটিয়াছিল, এইরূপ লিখিত আছে। চম্পাই নামক স্থান ও বেহুলা নাম্নী নদীও দেখা যায়। লোকে বলে, বেহুলা মৃত পতির সহ যখন কলার মান্দাসে ভাসিয়া যান, তখন মালদহ নগরের নারীগণ তাঁহাকে বোকা বুঝিয়া হাসিয়াছিল। তজ্জন্য বেহুলা তাহাদিগকে অভিশাপ দেন যে, "এই স্থানের স্ত্রীলোকেরা বৈধব্য-যন্ত্রণা অনুভব করিবে।" মালদহে বিধবা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী বটে।

(৫) রণজিৎ শাহার উপাখ্যান।—কোন সময়ে পুরাতন মালদহ নগরে রণজিৎ শাহা নামক এক জন অলৌকিকক্ষমতাশালী ব্যক্তি বাস করিতেন। শুনা যায়, পৃথিবীর কোথায় কোন ঘটনা হইতেছে, তিনি করামলকবৎ দেখিতে পাইতেন। দাবা খেলায় তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। একদা দাবা খেলিতে খেলিতে কিছু ক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার হস্তদ্বয় ভিজিয়া গেল। কারণজিজ্ঞাসু ক্রীড়াসঙ্গীদিগকে বলিলেন, অমুক সমুদ্রে এক বণিকের বাণিজ্যতরী জলমগ্ন হইল। বণিককে উদ্ধার করিয়া তীরে রাখিয়া আসিলাম। তজ্জন্য আমার হাত দুটি ভিজিয়া গিয়াছে। এক সময় কতিপয় ভদ্রলোক দুর্গাপ্রতিমা-দর্শনের জন্য স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ক্রীড়ার জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহারা প্রতিমা-দর্শনার্থ যাইতেছি বলিলে, রণজিৎ বলিলেন, ক্লেশস্বীকার করিয়া তত দুর যাইবার প্রয়োজন নাই; আমি প্রতিমা দেখাইতেছি। ভদ্রলোকেরা যে গ্রামে যাইতেছিলেন, অনুভব করিলেন, যেন সেই গ্রামে গিয়াছেন; চণ্ডীমণ্ডপ দেখিতে পাইলেন, দেবীমূর্ত্তি

দেখিলেন, বাদ্যকোলাহল শ্রবণ করিলেন! কিয়ৎক্ষণের মধ্যে সমস্ত মায়া অন্তর্হিত হইল।

(৬) মালদহের ঐশ্বর্য্য।—মালদহ নামটিই ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক। পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপিত হইলে, বোধ হয়, মালদহ স্থাপিত হয়। সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলক মালদহ নগরের উত্তরাংশ স্থাপিত করেন। মুসলমান-রাজত্বকালে, মালদহ বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। গৌড় নষ্ট হইলে মালদহের অধিবাসী ও ঐশ্বর্য্য আরও বর্দ্ধিত হয়। এখানে ভিন্নদেশীয়দিগের বাইশটি বাণিজ্যাগার ছিল। বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদাৎ লোকে পরমসুখে কালাতিপাত করিত। সোনা রূপা টাকা কড়ির কত গল্পই শুনা যায়। এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। বাণিজ্য ব্যবসায় লুপ্তপ্রায়, কিছু দিন পরে প্রাচীন মালদহ বোধ হয় অধিবাসি-শূন্য হইবে।

(৭) পশ্চিমপ্রদেশীয় গোঁসাইদের উপদ্রব।—মুসলমান-রাজত্বকালে বহুসংখ্যক দশনামী গোঁসাই বাণিজ্যোপলক্ষে এ দেশে আসিয়া বাস করিতে থাকে। রেশমী কাপড়ের ব্যবসায় করিয়া তাহারা প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়াছিল। মুসলমান-রাজত্বের শেষ দশায় বাণিজ্যের ভগ্নদশা উপস্থিত হইলে উহারা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। ইংরেজ রাজ্যের সুশাসনে উহাদের অত্যাচার প্রশমিত হইয়াছে। উহারা কালচক্রে নিষ্পিষ্ট হইয়া অস্তিত্ব বিসর্জ্জন করিতেছে।

(৮) গৌড়ে ভূতের উপদ্রব।—এ দেশের বৃদ্ধ লোকের মুখে শুনিয়াছি, গৌড় নষ্ট হইলে সেখানে ভূত প্রেতের দারুণ উপদ্রব উপস্থিত হয়। ভূতেরা দিনের বেলায় রাস্তার উপর খেলিয়া বেড়াইত! সে পথ দিয়া কেহ প্রাণ লইয়া যাইতে পারিত না! ভূতত্ব-প্রাপ্ত সেনাদল প্রান্তরে যুদ্ধাভিনয় করিত। এখনও নাকি কখন কখন রাত্রিকালে মশাল হাতে লইয়া ভূত-সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

(৯) 'হিঙ্গা! তুই মোরগা যা'।—কি করিতে হইবে, তাহা না বলিয়া কাহাকেও কোনও স্থানে যাইতে বলিলে, লোকে বলিয়া থাকে যে, ইহা 'হিঙ্গা! তুই মোরগা যা' হুকুমের ন্যায় হইল। এই প্রবাদের উৎপত্তির বিবরণ এই,—গৌড় নগরের পীরশা মন্দির প্রায় নির্ম্মিত হইলে, রাজা মন্দিরের উপর আরোহণ করিলেন। রাজমিস্ত্রীর কোন দোষ পাইয়া তাহাকে মন্দিরের উপর হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন। রাজমিস্ত্রী প্রাণত্যাগ করিল। স্বেচ্ছাচারী গৌড়েশ্বর রোষাবিষ্ট চিত্তে মন্দির হইতে অবরোহণ করিলেন। হিঙ্গা নামে এক পদাতিককে

নিকটে দেখিতে পাইয়া তাহাকে আদেশ করিলেন যে, 'হিঙ্গা! তুই মোরগাঁ যা।' হিঙ্গা কুপিত গৌড়পতিকে কারণজিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। মোরগাঁয় উপস্থিত হইয়া বিষণ্ণমনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। শুনা যায়, সনাতন গোস্বামী আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত হইয়া, হিঙ্গার সঙ্গে কতিপয় সুদক্ষ রাজমিস্ত্রীকে গৌড়ে পাঠাইয়া দেন। তৎকালে মুকুটগ্রাম বা মোরগাঁয় অনেক স্থপতির বাস ছিল।

(১০) ভাতিয়া গ্রামের পণ্ডিতদের বিবরণ।—গৌড়ের নিকটে ভাতিয়া নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। এই গ্রামে বহুসংখ্যক পণ্ডিতের বাস ছিল। ভাতিয়া অতি প্রসিদ্ধ স্থান। গৌড়ের উৎপত্তির পূর্ব্বে ভাতিয়া বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে ইহাকে ভাদিয়া বলা হইয়াছে। এখানে বিস্তর ধনী লোকেরও বাস ছিল। ভাতিয়া সমাজ একটি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতসমাজ। গঙ্গাস্রোতে প্রাচীন ভাতিয়া নষ্ট হইয়াছে। ভাতিয়ার প্রসিদ্ধ বিলের মধ্যে দুটি একটি উচ্চ স্থান কেবল প্রাচীন ভাতিয়ার দুটি একটি দেবস্থান ধারণ করিয়া আছে।

(১১) দেব-তলায় দানবের উপদ্রব।—বারেন্দ্রভূমির মধ্যে দেবতলা নামক স্থান আছে। পূর্ব্বে দেবতলা ও দেবতলার নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক লোক বাস করিত। এক সময়ে দেবতলার নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে হঠাৎ একটি সুড়ঙ্গ হয়। রাত্রিকালে একটি দানব সুরঙ্গ হইতে বাহির হইয়া মানুষ ধরিয়া খাইত। ইহাতে সে অঞ্চল লোকশূন্য হইয়া যায়। পারুয়ার কোন পীরের প্রভাবে দানবের দৌরাত্ম্য তিরোহিত হয়।

(১২) পারা-ঢালার পুষ্করিণী।—পুরাতন মালদহ নগরের ক্রোশাধিক পূর্ব্বে পারা-ঢালার পুষ্করিণী নামে একটি পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণীর চারি পার্শ্বে বিস্তর লোকের বসতি ছিল। কোনও সময়ে পুষ্করিণীর নিকটস্থ নদী দিয়া এক সওদাগর বাণিজ্যতরী লইয়া গমন করিতেছিলেন। সওদাগরের নৌকায় লক্ষ টাকার পারদ ছিল। তিনি মালদহে বেচিতে পারিবেন, এই আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার তত টাকার পারদ কেহ কিনিল না। সওদাগর মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বলিতেছিলেন যে, মালদহের নাম শুনিয়া আসিলাম, কিন্তু আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। এই সময়ে এক ধোপানী পুষ্করিণীতে কাপড় কাচিতেছিল। বণিকের কথা শুনিয়া জন্মভূমির অগৌরব দূর করিবার জন্য বণিকের সমস্ত পারদ খরিদ করিয়া পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিল। তদবধি এই পুষ্করিণী পারা-

(১৩) মালদহে বীরভদ্র গোস্বামী।—মালদহ এক সময়ে শাক্তপ্রধান স্থান ছিল। সর্ব্বমঙ্গলা, মঙ্গলচণ্ডী ও কালী দেবীর পূজাবেদী সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইত। বাশুলি, মশান-চামুণ্ডা প্রভৃতি পিশাচদেবতার সাড়ম্বরে পূজা হইত। মরিয়া বাশুলি বা মশান-দেবতা হইবার অনেকে কামনা করিত। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর ভগবৎপ্রেমের বন্যায় মালদহ আপ্লুত হয়। শুনা যায়, স্বয়ং নিত্যানন্দাত্মজ বীরভদ্র গোস্বামী মালদহে আসিয়াছিলেন। তাঁহার উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া মেঘগণ আকাশে নিশ্চলভাব ধারণ করিয়াছিল। অনেক লোক তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বৈষ্ণব-মত অবলম্বন করিয়াছে। তদবধি মালদহ একটি বৈষ্ণবপ্রধান স্থান হইয়াছে।

(১৪) রাইহোরাণীর উপাখ্যান।—রাইহোরাণী, পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানের এক দেবী। ইঁহার মূর্ত্তি নাই, বেদী আছে। সাধারণ লোকে রাইহোরাণীকে অত্যন্ত ভক্তি করে। মাধাইপুরের কালী, চণ্ডীপুরের রণচণ্ডী ও পাণ্ডুয়ার রাইহোরাণীর নিকট বৈশাখ মাসে অনেক মুসলমানও বলির জন্য ছাগ প্রেরণ করিয়া থাকে। কোন সময়ে এক ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক কোন স্থানে যাইতেছিলেন। এই স্থানে উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ পিপাসার্ত্ত হইয়া স্ত্রীকে এক বৃক্ষমূলে রাখিয়া জলের অন্বেষণে গমন করেন। এই সময়ে এক দল দস্যু এই অসহায়া ব্রাহ্মণজায়ার প্রতি বলপ্রকাশে উদ্যত হইলে, সহসা এক দেবীর আবির্ভাব হয়। দেবী দস্যুগণের সংহার করেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বৃক্ষমূলে দেবীর পীঠস্থাপন করেন। এই দেবীই রাইহোরাণী।

(১৫) মাধাইপুর।—মাধাইপুর বরেন্দ্রভূমির অন্তঃপাতী। মালদহ হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী। কোন সময়ে মাধাইপুরে বিস্তর লোকের বাস ছিল। অদ্যাপি বিস্তর অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। মাধাইপুরে মাধাই সিংহের কেল্লা নামক একটি ক্ষুদ্র কেল্লা ছিল। মাধাই সিংহ কে ও কোন সময়ের লোক, তাহা জানা যায় নাই। মাধাইপুর পাণ্ডুয়া হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নয়। এখানকার প্রকাণ্ড কালীমন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মাধাইপুরে বহুসংখ্যক দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন এই ক্ষুদ্র মন্দিরের অভ্যন্তরে শিব, গণেশ, কার্ত্তিক, সূর্য্য প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি আনিয়া রাখা হইয়াছে। মন্দিরের চারি পার্শ্বে বিস্তর বৃহৎ বৃহৎ দেবমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। কতকগুলি বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেব দেবীর মূর্ত্তিও এই স্থানে দেখা যায়। মন্দিরের

আপনাদের মুখে বাঁধিয়া লোক নৃত্য করিত। এখন আর লোকে এই সকল মুখ লইয়া নৃত্য করিতে সাহস পায় না। লোকের বিশ্বাস, ভজন সাধনের দেহ না হইলে ওরূপ করায় বিপদ হইতে পারে। মন্দিরের মধ্যে কতকগুলি সুদীর্ঘ খড়্গ থাকায় মন্দিরাভ্যন্তরের ভীষণতা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে।

(১৬) মালদহের তিন পীর।—মোকদম শাহ, কুতুব শাহ ও আখিসেরাজ বা পিরাণ-পীর মালদহের বিখ্যাত তিন পীর। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এই তিন পীরের কত উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। এই তিন পীরের সঙ্গে নাকি হিন্দু দেবতাদের সখ্য ছিল। মোকদম শাহ ত বাঘের উপর চড়িয়া বেড়াইতেন, এবং খড়ম পায় দিয়া নদী পার হইতেন! হিন্দু সন্ন্যাসীর ন্যায় মুসলমান পীরেরাও গাঁজা ভালবাসিতেন!

(১৭) লুচি-ভাজার পুকুর।—সাগরদীঘি কাটিতে বিস্তর শ্রমজীবী নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা প্রাত্যহিক কার্য্যাবসানে সন্ধ্যাকালে এক স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিত। প্রত্যেকে বিশ্রামস্থানের নিকট হইতে এক এক কোদাল মাটী কাটিয়া উঠাইত। ইহাতেই একটি অক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনিত হয়। শ্রমজীবীদের জন্য যে স্থানে লুচি ভাজা হইত, তাহা লুচি-ভাজার পুকুর নামে খ্যাত হইয়াছে।

(১৮) গৌড়ের কাগজ।—লোকে বলে, গৌড়ে বড় ভাল কাগজ প্রস্তুত হইত। এখানকার কাগজ দিল্লীর রাজসরকারে ব্যবহৃত হইত। দুই একটা কাগজ দেখিয়াছি। গুজব সত্য হইতে পারে।

(১৯) এখন বিজ্ঞান দানবের ভয়ে দেবগণ আর পৃথিবীতে আসেন না। পূর্ব্বে মানবের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ করিতেন ও নূতন নূতন বিদ্যা শিখাইয়া যাইতেন। এখন মানুষই দেবতাকে কত নূতন বিষয় শিখাইতে পারে। এক দিবস পুরাতন মালদহে রাত্রিকালে দ্বিতলের উপর এক ব্রাহ্মণ মাংস পাক করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, এবং ত্বরিতানন্দ সেবন করিয়া রন্ধনগ্লানির অপনোদন করিতেছিলেন। এই সময়ে নভোমার্গ দিয়া এক দেবপুরুষ গমন করিতেছিলেন। তিনি মাংসের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া ভোজন প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে ভীত হইয়াছিলেন, পরে দেবতার সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া ভোজন দান করিলেন। দেবপুরুষ পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়া ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রন্থ প্রদান করিয়া পুনরায় নভোমার্গে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলেন, তাহাতে

সর্পাঘাতের চিকিৎসা বর্ণিত আছে। লব্ধবিদ্য ব্রাহ্মণ নাকি সর্পদষ্ট মৃত ব্যক্তিকেও বাঁচাইতে পারিতেন। পুঁথিখানি কোথায় গেল, জিজ্ঞাসা করিলে, কেহই বলিতে পারেন না।

উল্লিখিত ঊনবিংশতিসংখ্যক গল্প ও গুজবের মধ্যে দুটি একটি ইতিহাসের কথাও থাকিতে পারে। গল্প গুজবগুলি সংগৃহীত থাকিলে ভবিষ্যতে কোন না কোন উপকারে আসিতে পারে।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

বিদেশী গল্প।

চিত্র। *

কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার সহবাসী সতীর্থগণ বলিত, "লোকটা মার্কিন। অতি দরিদ্র। স্বাস্থ্যও ভাল নয়; আত্মীয় স্বজন আছে বলিয়াও মনে হয় না। তা ছাড়া লোকটা কেমন যেন অদ্ভুত প্রকৃতির!"

পারিসের কোন অপরিচ্ছন্ন পল্লীর একটা বৃহৎ বাড়ীতে ইহাদের আবাস। ইহারা সকলেই শিল্প-ব্যবসায়ী;—কেহ চিত্রকর, কেহ চিত্রের আদর্শ, কেহ বা শিল্পশিক্ষার্থী। আত্মম্ভরিতায় ইহাদের হৃদয় পূর্ণ, এবং প্রায় সকলেই কমলার কৃপাদৃষ্টিলাভে বঞ্চিত।

কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ সৌহৃদ্য ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুখে দুঃখে আপদে বিপদে তাহাদের মধ্যে সহানুভূতি ও সমবেদনার ভাব পরিলক্ষিত হইত। শিল্পানুশীলনে তাহাদের তত অনুরাগ ছিল না। কর্ত্তব্যের পাশমুক্ত হইয়া আমোদ প্রমোদে, হাস্য পরিহাসে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনই তাহারা প্রীতিকর মনে করিত।

উক্ত প্রবাসী মার্কিন তাহাদের সহিত একত্র বাস করিত বটে, কিন্তু কখনও তাহাদের দলে মিশিত না। এই জন্য তাহার সতীর্থগণ তাহার প্রতি অপ্রসন্ন ছিল। সর্ব্বোচ্চ তলের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সে বাস করিত। দিবসের কতক অংশ সে বিভিন্ন চিত্রশালায় শিল্পসৌন্দর্য্য-সম্ভোগে অতিবাহিত করিত; অবশিষ্ট সময় আপনার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে চিত্রাঙ্কনে অবহিত থাকিত।

প্রবাসী মার্কিনের বয়স অধিক নয়। যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র। নাতিদীর্ঘ ক্ষীণ শরীর, কোমল শান্ত মুখশ্রী, কৃষ্ণতার নয়নদ্বয় কোটরগত, কিন্তু উজ্জ্বল।

আবাসের অন্যান্য শিল্পিগণ গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিতে যাইত, এবং শীতের প্রারম্ভে পুনরায় ফিরিয়া আসিত। মার্কিন যুবক কোথাও যাইত না। সে তাহার ক্ষুদ্র কক্ষটির মধ্যে আত্মকার্য্যে সমাহিত থাকিত। তাহাকে দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইত, শ্রমাধিক্যে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

তাহার সতীর্থগণ সকলেই বলাবলি করিত, "লোকটা কি করিয়া বাঁচিয়া আছে! আহার বিহার বেশ বিন্যাস আমোদ প্রমোদ কিছুতেই তাহার কোন অনুরাগ নাই। অনুক্ষণ কেবল চিত্র আর চিত্র! কি ভয়ানক! তা ছাড়া শুনিতে পাওয়া যায়, যখন তখন কেবল খক্ খক্ করিয়া কাশিতেছে। বোধ হয় লোকটার কাশরোগ আছে।"

শীতাগমে যখন শিল্পিগণ সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে,—বায়ুবিক্ষিপ্ত কার্পাসের ন্যায় তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় সহসা তাহাদের মধ্যে একটি রমণীর আবির্ভাব হইল। অমনই সমগ্র বাড়ীটিতে যেন নবীন জীবনীশক্তি,—নবউৎসাহের সঞ্চার হইল।

একদিন রাত্রে মার্কিন যুবক আপনার প্রকোষ্ঠে যাইতেছিল; দেখিল, নিম্নতলের একটি কক্ষ উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত ও হাস্যকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কক্ষটি ইতঃপূর্ব্বে শূন্য পড়িয়াছিল।

কুতূহলী হইয়া সে দ্বারের নিকট গেল। দেখিল, কক্ষাভ্যন্তরে তাহার পরিচিত কয়েকটি শিল্পী ও একটি নবাগতা রমণী বসিয়া আছে। রমণী যুবতী। অঙ্গে অঙ্গে রূপ উছলিয়া পড়িতেছে। মার্কিন যুবক মোহিত হইল। সেই উৎফুল্লযৌবনশ্রীপ্রভাসিত অপূর্ব্বরূপপ্রভা তাহাকে কয়েক মুহূর্ত্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল করিয়া রাখিল।

এমন সময়ে একটি যুবক যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোমার প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ জানিবার জন্য আমরা বিশেষ উৎসুক নই। তুমি যে আসিয়াছ, ইহাতেই আমরা পরম আহ্লাদিত হইয়াছি।"

"কারণ বলিব?—আমার আর ভাল লাগিল না।"—বলিয়া যুবতী আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বিশাল নয়ন দুটিতে যেন কেমন একটা বিষাদচাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। পরক্ষণেই একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাই তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছি; তোমরা কে আমার চিত্রাঙ্কণের অভিলাষী? পূর্ব্বাপেক্ষা আমার সৌন্দর্য্যশ্রী ত কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।"

সহসা মার্কিন যুবকের বোধ হইল, যেন কক্ষমধ্য হইতে কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। সে ধীরে ধীরে সোপানপথে আপনার প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল। ভগ্ন গবাক্ষ দিয়া শীতক্লিষ্ট পবন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। শূন্য কক্ষমধ্যে কি গভীর চিন্তায় সে ডুবিয়া রহিল। তাহার বোধ হইতেছিল, যুবতীর সেই বিষাদচঞ্চল দৃষ্টি যেন তাহার নয়নসমক্ষে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অমনই একটা প্রবল বাসনায় তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল মথিত হইয়া উঠিল। আপন মনে বলিতে লাগিল, "আমার বড় ইচ্ছা হয়, আমি তোমার ঐ মূর্ত্তি চিত্রে প্রতিফলিত করি।"

পরদিন সে গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, যুবতীর নাম নেটালি। নেটালি কুমারী। আরও অবগত হইল, নেটালি চিত্রকরদিগের চিত্রাদর্শ, এবং এই ভাবে অর্থোপার্জ্জনই তাহার ব্যবসায়। অন্যান্য আদর্শ অপেক্ষা নেটালির বিশেষত্ব আছে; এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী লাবণ্যময়ী 'আদর্শ' সর্ব্বত্র সুলভ নহে।

এখন হইতে প্রতিদিন তাহার [illegible]

দেখিতে লাগিল, ততই তাহার চিত্রাঙ্কনের জন্ত হৃদয়মধ্যে অদম্য বাসনার একটা প্রবল উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিল।

একদিন অপরাহ্ণে নেটালি এক জন চিত্রকরের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে, দেখিল, সেই ছিন্নবস্ত্রপরিহিত ক্ষীণদেহ মার্কিণ যুবক যেন কাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। নেটালিকে দেখিবামাত্র যুবক হৃদয়ে অতি দ্রুতস্পন্দন অনুভব করিতেছিল; সাহসে বুক বাঁধিয়া ধীরপদে নেটালির সম্মুখীন হইল, বিনম্র অথচ কাতর স্বরে বলিল, "আমি আপনার নিকট একটা ভিক্ষার জন্ত আসিয়াছি।" নেটালি বিস্মিতভাবে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বলুন আপনার কি কথা?"

নেটালির বোধ হইতেছিল, যুবকটি একটু স্বতন্ত্র ধরণের। যেমন সরল উক্তি, তেমনই নম্র প্রকৃতি!

যুবক বলিল, "আমি শুনিয়াছি, আপনি চিত্রকরদিগের চিত্রাদর্শ। প্রভূত অর্থ দিয়া তাহারা আপনার আদর্শানুরূপ চিত্র অঙ্কিত করে। আমার বড় সাধ, আমি একবার আপনার চিত্র চিত্রিত করি। যে দিন আপনাকে প্রথম দেখি, সেদিন দেখিয়াছি,—এখনও দেখিতেছি—আপনার মুখে এক দিব্যশ্রী। সেই দিন হইতে এই অদম্য বাসনা অহোরাত্র আমার অনুধাবন করিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু আমি বড় দরিদ্র, আমার অর্থ দিবার ক্ষমতা আদৌ নাই। কেবল আমি আপনার অনুগ্রহ দয়ার উপর নির্ভর করিতেছি;—যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার ঘরে যান, যদি তুলিতে আপনার ঐ মোহিনী প্রতিমার আদর্শ তুলিয়া লইবার অবকাশ আমায় প্রদান করেন। দরিদ্র আমি—আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি; ভিক্ষা ভিন্ন দরিদ্রের উপায়ান্তর কি?"

নেটালি নির্ব্বাক হইয়া যুবকের এই কাতর মিনতি শুনিতেছিল; বক্তব্য শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এতই দরিদ্র?"

"হাঁ,—আমি বড় দরিদ্র, দরিদ্রের এরূপ প্রার্থনা বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে।"

"না, আমি কাল আপনার ঘরে যাইব। আপনি কোন ঘরে থাকেন?"

যুবক আপনার ঘর দেখাইয়া দিল।

"কাল আসিব" বলিয়া নেটালি বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। যুবক আসিয়া বাধা দিল। বলিল, "আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কিন্তু কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের উপযুক্ত অবসর কখনও আসিবে কি না, বিধাতাই জানেন!"

নেটালি মৃদুস্বরে বলিল, "কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের কোনও প্রয়োজন নাই। আপনার ন্যায় প্রতিভাশালী চিত্রকরের পক্ষে একদিন প্রতিদানের অবসরপ্রাপ্তিও অসম্ভব নয়।"

নেটালি নীচে নামিয়া গেল। একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, তখনও সেই নবীন চিত্রকর একাগ্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

পরদিন প্রাতঃকালে নেটালি মার্কিন যুবকের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, কক্ষটি প্রকৃতই দারিদ্র্যের পরিচায়ক। এক কোণে একটি ছোট টেবিল, অপর কোণে একখানি ছোট লৌহ-খট্টা। ক্ষুদ্র গবাক্ষের সম্মুখে একখানি কাষ্ঠাসনের উপর চিত্রোপকরণ সজ্জিত। নেটালি যুবকের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল, সে মুখে দারিদ্র্যজনিত সঙ্কোচ বা বিষাদের চিহ্ন-

মাত্র লক্ষিত হইতেছে না। পরন্তু উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও আগ্রহভরে তাহা অধিকতর উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

সম্ভাষণানন্তর মার্কিন যুবক নেটালিকে বলিল, "দ্বারে আঘাতের শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম আপনি আসিয়াছেন।" নেটালি বলিল, "আপনি কি নিশ্চয় জানিতেন—আমি আসিব ?" যুবক বিনীতভাবে বলিল, "আপনি যে বলিয়াছিলেন--আপনি আসিবেন।"

তার পর যুবক নেটালিকে যথাস্থানে বসাইল। এবং চিত্রোপকরণ সংগ্রহ করিয়া আপনিও বসিল। যুবক নির্ব্বাক, অভিভূত, আত্মহারা। নেটালির বোধ হইল, যুবক যে কেবল রুদ্ধবাক্, তাহা নহে; চিত্রের চিন্তা ব্যতীত তাহার অন্য সমুদায় চিন্তাস্রোত যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কপোলযুগল আরক্ত, কৃষ্ণতার নয়নদ্বয় বিস্ফারিত, নাসারন্ধ্রে ক্বচিৎ নিশ্বাসপতন হইতেছে। এরূপ একাগ্রতা, এরূপ তন্ময়তা নেটালির সম্পূর্ণ নুতন বোধ হইতেছিল। যতবার যুবক ফিরিয়া ফিরিয়া তাহাকে দেখিতেছিল, ততবারই যেন নেটালি অন্তরের মধ্যে কেমন একটা কম্পন অনুভব করিতে লাগিল। কতবার যুবক বর্ণলিপ্ত তুলিকা হাতে তুলিয়া লইল, কিন্তু রেখাপাত পর্য্যন্ত করিতে পারিল না। তাহার নিমেষহীন নয়নদ্বয় নেটালির মুখে সন্নদ্ধ।

এমন সময় নেটালি বলিল, "আপনি আমার মুখের পানে অমন করিয়া চাহিয়া আছেন কেন ? আপনার দৃষ্টি দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন—যেন—" নেটালি আর কিছু বলিল না। একটু বিষাদময় হাস্তরেখা নেটালির অধরপ্রান্তে মিলাইয়া গেল।

যুবক চমকিয়া উঠিল। ললাট হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া ঈষৎসঙ্কোচনম্রস্বরে বলিল, "আমি যাহা চিত্রিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, সে ভাব সর্ব্বক্ষণ আপনার মুখে দেখিতে পাইতেছি না। এক একবার দেখিতেছি, এবং পরক্ষণেই হারাইয়া ফেলিতেছি। সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাকে সেই অবসরের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইতেছে। আপনার ঐ অতুলনীয় বাহ্য সৌন্দর্য্য —ঐ অনুপম মুখশ্রীই আমার চিত্রের বিষয় নহে। আমি চিত্রিত করিতে চাই আপনাকে,—আপনার অন্তরশ্রী!"

নেটালি একটু নীরস উপেক্ষার হাসি হাসিবার চেষ্টা করিল। হাসি আসিল না। সে বলিল, "আমার অন্তরশ্রী! ম'শায়! ঐটি করিবেন না। ইহাতে আপনার কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। এই দেহ, এই কেশজাল, এই চক্ষু—যাহার সকলেই প্রশংসা করে—আপনি তাহাই চিত্রিত করুন। কেবল আমাকে নয়।"

যুবক একটু বিষন্ন হইল; বলিল, "বোধ হয় আমার কথাগুলি কিছু আত্মম্ভরিতার পরিচায়ক হইয়াছে। ভাষার দৈন্যবশতঃ আমি আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। ভাষায় আমার মনোভাব ব্যক্ত করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।"

নেটালি বলিল, "আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু আপনাকে নিষেধ করিতেছি, আপনি ওরূপ চেষ্টা করিবেন না।"

অবশেষে যুবক চিত্রাঙ্কনে নিবিষ্ট হইল। কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। একবারমাত্র যুবক বলিল, "আপনার শীত বোধ হইতেছে না ত? আজ আমি ঘরে আগুন রাখিয়াছি।"

নেটালি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রতিদিন কি আপনি ঘরে আগুন রাখেন না?"

"না। কিন্তু আপনি যখনই আসিবেন, দেখিতে পাইবেন, ঘরে আগুন আছে।"

"তবে আমি প্রত্যহই আসিব। তাহা হইলে আপনাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিব।"

এই জন্য!—আপনি ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না! শীতের কষ্ট ভুলিয়া থাকা আমার পক্ষে খুব সহজ—।"

হাঁ—তা হ'তে পারে। শীতের কষ্ট ভুলিয়া থাকা আপনার পক্ষে যেমন সহজ, অন্যের পক্ষে মৃত্যুটাও ত তেমনই সহজ হইতে পারে",—বলিয়া নেটালি আরব্ধ চিত্রাভিমুখে অগ্রসর হইল। যুবক বাধা দিল, বলিল, "এখন নিকটে আসিবেন না! এখন দেখিবেন না। এখনও দেখিবার মত হয় নাই।"

নেটালি বলিল, "পূর্ব্বে কখন আমার নিজের দিকে চাহিতে আমার সাধ হয় নাই। জানি না, আজ কেন দেখিতে এত আগ্রহ হইতেছে! বোধ হয়, আপনি আমাকে কি গড়িয়া তুলিতেছেন, তাহাই দেখিবার জন্য।" বলিয়া একটু হাসিল।

তার পর নেটালি যখন নিম্নতলে আপনার কক্ষে চলিয়া গেল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারিল না। বসিয়া বসিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, "অন্যান্য চিত্রকরদিগের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম না। পৃথিবী সম্বন্ধে এখনও ইহার কোন অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। লোকটি খুব সৎপ্রকৃতি। শিল্পই যেন তাহার সর্ব্বস্ব। সরলতা, কোমলতা ও পবিত্রতার সহিত যেন তাহার অভিন্ন সৌহৃদ্য। ছোট ঘরটি যেন ঋষির কুটীর!" সহসা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে চাহিল, দেখিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আজকার দিনটা কি খারাপ! সমস্ত দিবাদণ্ডের উপর যেন কেমন একটা ম্লানতা ব্যাপিয়া আছে।"

ইহার কিছু দিন পরে অন্য এক জন চিত্রকর চিত্রাঙ্কনের অভিলাষে নেটালীকে আপনার কক্ষে লইয়া গিয়াছে। ঘটনা সে সমস্তই অবগত ছিল। নেটালিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তবে তুমি সেই মার্কিন চিত্রকরের কক্ষে গিয়াছিলে?"

"হাঁ।"

"ভাল—তাকে কেমন দেখলে?"

"কেমন দেখলেম!—বলবো কেমন দেখেলম?"

"বল না। শুনলেও খুসী হ'ব।"

"দেখলেম—তিনি অতীব মহান্। তুমি, আমি ও আমাদের অন্যান্য বন্ধুগণ সকলেই জড়শরীর; একমাত্র তিনি এই জড়শরীরমধ্যে প্রাণরূপে অবস্থিত।"

চিত্রকর চিত্র করিতে করিতে শিস্ দিতে দিতে ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "রমণীর পক্ষে প্রাণ লইয়া খেলা বড় বিপজ্জনক!"

ঈষৎঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে নেটালি বলিল, "তা সত্য বটে।"

সেই দিনই আবার নেটালি সেই মার্কিন যুবকের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। আবার সেই

চিত্তে চিত্রাঙ্কনে নিবিষ্ট। কেবল এক একবার তাহার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সম্মুখস্থ রমণীর উপর নিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

নেটালি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "অপরে আমাকে যে চোখে দেখে, এ আমাকে সে চোখে দেখে না! আমি যে একটি রমণী ইহার সম্মুখে বসিয়া আছি, ভ্রমেও এ কথা ইহার স্মরণে আসিতেছে না! ইহার অখণ্ড মনোযোগ কেবল ইহার অভীষ্ট চিত্রের প্রতি।"

যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার এই সংস্কার বদ্ধমূল হইতেছিল। অবশেষে সেই সংস্কার তাহার চিত্তের উপর এক মোহভাব বিস্তার করিল। সেই উন্মুক্তগবাক্ষ হিমানীসিক্ত নিস্তব্ধ কক্ষ যেন তখন তাহার নিকট শান্তির নিভৃত নিকেতন মনে হইল। কিছুতেই তাহার বিরক্তি বা ক্লেশ বোধ হইত না। এমন কি, তাহার নিজের বিষয় চিন্তা করাও যেন তাহার নিকট অনাবশ্যক মনে হইত। নেটালি তাহার হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা অবকাশের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল, যে সময়টা সে তাহার সম্মুখস্থ ব্যক্তির চিন্তায় অতিবাহিত করা অধিকতর প্রীতিকর মনে করিত। প্রথম হইতেই নেটালি চিত্রকরের শীর্ণ মুখাবয়বে কেমন একটা করুণ বিষাদের আভাষ দেখিতে পাইয়াছিল; এখন তাহার বৈচিত্র্যহীন দুঃখপূর্ণ সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী তাহার মর্ম্মস্থলে আধিপত্য বিস্তার করিল।

একদিন কথায় কথায় যুবক বলিয়াছিল, "আমেরিকার কোন স্থানে আমার জন্মভূমি। আমাদের বংশে কেহই দীর্ঘজীবী নহে। সেই স্বল্পায়ু বংশের পরিচয় দিবার নিমিত্ত একমাত্র আমি জীবিত আছি। একান্ত অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া পিতা মাতা তাঁহাদের যৌবনেই পরলোকে গমন করেন। পরের দয়ার উপর নির্ভর ব্যতীত আমার অন্য কোন জীবনাবলম্বন ছিল না। আশৈশব আমি কেবল একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। আমি যখন শিশু, তখন স্বপ্ন দেখিতাম, যেন আমি এখানে আসিয়াছি! তার পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার একমাত্র চেষ্টা হইল, কেমন করিয়া আমার সেই শৈশবস্বপ্ন সত্যে পরিণত করিব। আমার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, এক দিন না এক দিন আমার বাসনা ফলবতী হইবে। এত দিনে আমার সেই শুভ সময় আসিয়াছে।"

সমস্ত শুনিয়া নেটালি বলিল, "তবে কি এই চরম? জীবনে কি আপনার আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই?"

যুবক অবনতদৃষ্টিতে উত্তর দিল, "আমার যা কিছু সব এই।"

যুবক তাহার জীবন সম্বন্ধে তাহাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিল না বলিয়া নেটালি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিতা হইল। মনে করিল, "হয় ত জানিবার জন্য তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই।" নেটালি একটু ক্ষুন্ন হইল। তখনই আবার মনে হইল, "হয় ত সে সব কথাই অবগত আছেন।" অমনই যেন তাহার অতীত জীবনের সমুদায় ধিক্কার একটি বিদ্রূপহাস্তে তাহার অধরপ্রান্তে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। যুবক যখন তাহার মুখপানে চাহিল, তখনও সেই হাসি তাহার অধরপ্রান্তে অচঞ্চল হইয়া আছে। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও যুবকের মনোভাবের যেন বৈলক্ষণ্য হইল না। তাহার মুগ্ধ উন্মত্ত হৃদয়ে নেটালির জন্য প্রতিষ্ঠিত কৃতজ্ঞতার সিংহাসন সমভাবে অবিচলিত হইয়া রহিল।

নিকট সম্যক পরিচিত। কিন্তু কিছুতেই সে এই আকস্মিক পরিচয়ের কারণটু নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিত না। শুধু মনে পড়ে, একদিন নিশীথে তাহার গাঢ়নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; ত্রস্তভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া দ্রুতস্পন্দিত হৃদয়খানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল,—"এ কি!—কে ও?" কণ্ঠস্বর কক্ষের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল; পরক্ষণেই সোপানে পদধ্বনি হইল। ধ্বনি সোপান বাহিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া নিস্তব্ধ হইল; সঙ্গে সঙ্গে দ্বারমোচন ও অবরোধের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। নেটালি বসিয়া সব শুনিল, সব বুঝিল, তার পর ধীরে ধীরে শয়ন করিল।

ক্রমে এমন হইল যে, যুবকের প্রাত্যহিক জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাও নেটালির দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না। সে দেখিতে পাইতেছিল, যুবক দিন দিন ক্ষীণ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এখন আর সে প্রত্যহ প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হয় না; কিন্তু তাহার প্রতি রবিবার দুইবার করিয়া ধর্ম্মমন্দিরে গমন সমভাবে অব্যাহত আছে।

একদিন নেটালি যুবকের শয্যার উপর একখানি বাইবেল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানি কি আপনি পড়েন?

"হ্যাঁ।"

নেটালি বিস্ময়বিহ্বলনেত্রে যুবকের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "তবে ঈশ্বরে আপনার বিশ্বাস আছে।"

"হ্যাঁ।"

চিত্রাঙ্কন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, একদিন যুবক নেটালিকে বলিল, "এখন একবার চিত্রখানি দেখিবেন কি?"

নেটালি চিত্রসম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। যতক্ষণ সে চিত্রখানি দেখিতেছিল, যুবক উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। চিত্রদর্শনমাত্রে নেটালির মুখে এক অপূর্ব্ব বিস্ময়ের ভাব প্রতিভাত হইল, এবং পর মুহূর্ত্তে বিচিত্র আবেগভরে তাহার ললাট ও কপোলযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল। যুবকের দিকে ফিরিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে নেটালি বলিল, "আপনি আমাকে উপহাস করিতেছেন, এ চিত্র সম্যক্ ব্যর্থ হইয়াছে!"

সহসা আহত হইলে লোক যেমন কাঁপিয়া উঠে, যুবক তেমনই করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; একটু পশ্চাতে হটিয়া বিস্ফারিতনেত্রে কহিল, "আমি—আমি আপনাকে উপহাস করিতেছি! এ চিত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে!"

নেটালি চিত্র দর্শন করিয়া কহিল,—"এ মুখ আমার বটে, কিন্তু আমাতে যাহা নাই, তাহাই আপনি ইহাতে প্রতিফলিত করিয়াছেন! এ যে মহিমাময়ী রমণীর প্রতিকৃতি!—এ চিত্রে যে দেবীভাব প্রতিফলিত। আমার পক্ষে এ চিত্র কি বিদ্রূপাত্মক নয়?" স্বপ্নাবিষ্ট বিমূঢ়ের ন্যায় যুবক চিত্রপানে চাহিয়া রহিল। মৃদুস্বরে বলিল, "ইহা সত্য। সত্য সত্যই আপনার মুখে আমি ঐ ভাব উদ্ভাসিত দেখিয়াছি।"

নেটালি বলিল, "বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন চিত্রকর এ ভাব দেখিতে

যুবক বলিল, "আপনি উপহাস মনে করিবেন না। যদি ঐ ভাব আমি আপনাতে প্রত্যক্ষ না করিতাম, তবে এরূপ চিত্রাঙ্কন আমার সাধ্যায়ত্ত হইত না। আমি সত্য বলিতেছি, ইহাই আপনার স্বরূপ—আপনার হৃদয়ের ছবি।"

নেটালি বলিল, "আমার স্বরূপ! আপনি কি মনে করেন যে, আমার অন্যান্য চিত্রাঙ্কনকারিগণ এই চিত্র দেখিলে ইহা আমার প্রতিকৃতি বলিয়া চিনিতে পারিবে?" নেটালি চিত্রের দিকে আর একবার কটাক্ষপাত করিল। অমনই একটা কর্কশ হাস্যধ্বনিতে কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই আর একটি শব্দ। নেটালি আসনত্যাগ করিয়া জানু পাতিয়া চিত্রের সম্মুখে বসিয়া পড়িল। মৃণালভুজদ্বয় দুই পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত, অস্ফুট ক্রন্দনে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

যুবক তাহার নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল; অবনতদৃষ্টিতে বলিল, "আমি একান্তমনে চিত্রই আঁকিয়াছি। চিত্রের বিষয় চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা আমাকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই।"

পরদিন রবিবার। মেসন নামক এক জন চিত্রকর নীচে যাইতেছিল; সিঁড়ির উপর কৃষ্ণবেশাবৃতা একটি রমণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। রমণী তাহার অপরিচিতা নহে। বলিল,—"কে—নেটালি? তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে তুমি উপাসনা-মন্দির হইতে আসিতেছ!"

নেটালি বলিল "হাঁ,—আমি মার্কিন উপাসনা-মন্দির হইতে আসিতেছি।"

মেসনের মুখভঙ্গীতে ঘৃণার ভাব ব্যক্ত হইল। সে বলিল, "কোন ইষ্টলাভ হইল কি?"

"না।" সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়া নেটালি দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল। মেসন বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

নেটালি আপনার কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। একটি একটি করিয়া কক্ষের সমস্ত আলো জ্বালিয়া দিল। সে আলোকপ্লাবনেও তাহার হৃদয়ান্ধকার দূর হইল না। তখন সেই পরিহিত কৃষ্ণ পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল। অপবিত্রতার একটা দীপ্ত শিখা যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছিল। যাতনাক্লিষ্ট হৃদয়ে দ্রুতপদে কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বহুমূল্য বসন ভূষণ টানিয়া বাহির করিয়া অঙ্গ ভূষিত করিতে লাগিল। প্রত্যেক পদক্ষেপে সেই কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিদলিত হইতেছিল। সে অবশেষে বিকৃত হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "আর কখন তোমাকে অঙ্গে স্থান দিব না।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া নেটালি দর্পণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বহুমূল্য বসন ভূষণ দর্পণের অঙ্গে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। এইবার নেটালি বলিল, "ইহাই আমার যথার্থ স্বরূপ।"

দ্বার খুলিয়া দ্রুতপদে নেটালি নীচে নামিতেছিল, শুনিতে পাইল, নিম্নতলের একটা কক্ষ হইতে বীভৎস আনন্দকোলাহল উত্থিত হইতেছে। তাহার মধ্যে এক জনের কণ্ঠস্বর তাহার একান্ত পরিচিত। একটি অসৎচরিত্র ধনী যুবক উন্মত্তহৃদয়ে তাহার উপাসনা করিত; নেটালি বুঝিল—এ তাহার কণ্ঠস্বর।

সোপান অবতরণ করিয়া নেটালি সেই কক্ষদ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। অমনই 'নেটালি!—নেটালি! এসো এসো'! রবে কক্ষ কম্পিত হইয়া উঠিল।

দৃঢ়তার সহিত নেটালি তাহাদের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া বলিল, "না—না আমি যাব না!" নেটালি সে স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইল।

সোপানে উঠিতে উঠিতে যেন নেটালির সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিতেছিল। অবসন্ন পদদ্বয় দেহধারণে অক্ষম। সেই জনবিরল সোপানোপরি ভিত্তিগাত্রে অবসন্ন দেহভার ন্যস্ত করিয়া সে সেই অন্ধকাররাশির কানে কানে বলিতে লাগিল, "আর—আর কখনও আমি ও সংসর্গে মিশিব না। সে কেবল তোমারই জন্য। তুমি তাহা বুঝ কি?"

পরদিন প্রাতে নেটালি যখন আবার সেই মার্কিন যুবকের কক্ষে গেল, তখন তাহার পূর্ব্ব রাত্রের উত্তেজনা বা চাঞ্চল্যের চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান ছিল না। পরন্তু সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্থির, গম্ভীর।

যুবক তাহাকে বসিতে বলিল। সে বসিল না; ধীরে ধীরে চিত্রসম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আপনার কোথায় ভুল হইয়াছে; চিত্রে আপনি যে ভাব প্রতিফলিত করিয়াছেন, আমাতে যে সে ভাবের একান্ত অভাব, তাহা আপনার অগোচর ছিল না। শুধু আপনি কল্পনায় এ ভাব অনুভব করিয়াছেন; মনে করিয়াছিলেন, হয় ত আমার অতীত জীবনের কোন সময়ে ইহা আমাতে বিদ্যমান ছিল। ইহাতেই আপনার ভুল হইয়াছে। আমাতে এ ভাব কখনই ছিল না। বাল্য কৈশোর কিছুই আমার মনে পড়ে না। জীবন আমার যেমন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে, তেমনই করিয়াই শেষ হইবে। ইহাই আমার ভাগ্যলিপি। এই সহরের জঘন্য স্থানে আমার জন্ম। দারিদ্র্য, পশুত্ব ও পাপ ছাড়া আমি আর কিছুই জানিতাম না। আমার এই সৌন্দর্য্যই আমাকে সেই সকলের ঊর্দ্ধে তুলিয়াছে। আপনার প্রদত্ত ভাব আমাতে কেমন করিয়া আসিবে?"

যুবক নিস্পন্দ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া ছিল; অনেকক্ষণ পরে বলিল,—"তা বলিতে পারি না; ঈশ্বর জানেন।"

নেটালি একটু বিরক্তির সহিত হাসিয়া বলিল, "ঈশ্বর! হাঁ—ঈশ্বর!" আর কোনও কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

এখন হইতে প্রতি রবিবার নেটালি মার্কিন উপাসনা-মন্দিরে যাইতে আরম্ভ করিল। সেখানে গিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিতে পাইত, কিন্তু তাহাতে তাহার কোন বিশ্বাস ছিল না; বিশ্বাসবতী হইবার জন্য কোনও ব্যগ্রতাও তাহার ছিল না। পরন্তু ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণমাত্র তাহার মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি ভাসিয়া উঠিত।

ধর্ম্মমন্দিরে গেলেই সেই মার্কিন চিত্রকরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত। দেখিত, সে প্রশান্ত-চিত্তে ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিতেছে। আর কিছু না হউক, স্থানটি নেটালির নিকট শান্তিপূর্ণ বোধ হইত।

দিন দিন নেটালির শরীর ও মনের দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল; তাহার বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই দেখিতে পাইতেছিল, তাহার লাবণ্যোজ্জ্বল মুখকান্তির উপর পাণ্ডুর ছায়া পরিব্যাপ্ত হইতেছে। সে আর তাহাদের সহিত আমোদ প্রমোদে যোগ দেয় না; কথা কহিতেও যেন বিরক্তি বোধ করে। এমন কি, উপর্য্যুপরি হয় ত কয়েক দিন ধরিয়া আপনার কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ... কাহারও সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে না।

এ দিকে মার্কিন যুবক অবিশ্রান্তচিত্তে চিত্রকার্য্যে নিবিষ্ট। ক্রমশঃই তাহার শারীরিক দৌর্ব্বল্য বাড়িতেছে; এমন কি, স্থিরহস্তে তূলিকা-ধারণও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। একদিন নেটালি দেখিতে পাইল, যুবক চিত্রকরের শিথিল অঙ্গুলিবন্ধন হইতে চিত্রতূলিকা খসিয়া পড়িল।

যুবক নেটালির দিকে চাহিয়া বলিল, "শরীর যেন আমার দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। বোধ হয়, আমার জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়াছে। চিরবিশ্রামের বোধ হয় আর বেশী বিলম্ব নাই। এই অবসরে চিত্রখানি শেষ করিতে পারিলে আমার মনস্কাম সিদ্ধ হয়। যেমন করিয়াই হউক, চিত্রখানি শেষ করিতেই হইবে।"

পরদিন প্রভাতে নেটালি গিয়া দেখিল, যুবক তখনও শুইয়া আছে। শুনিল, তাহার শরীর বড় অসুস্থ। নেটালি চলিয়া আসিতেছিল, যুবক উঠিয়া দ্বার পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে আসিল; আপনার হাতের উপর হাতখানি তুলিয়া লইয়া বলিল, "সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই। এক জন পীড়িতকে কাল আমি রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। সে নির্ব্বান্ধব। তখনই আমার মনে হইল, আমারও ত এই দশা হইতে পারে, যদি আমি কোন দিন পীড়িত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকি, এবং কেহ আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের কথা জিজ্ঞাসা করে, আমি তখন কি করিব, কাহার কথা বলিব? আমার কে আছে! এই চিন্তা আমাকে আরও অবসন্ন করিয়াছে। তার পর সহসা আপনাকে মনে প'ড়িল; ভাবিলাম, এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া যদি আপনাকে স্মরণ করি, অবশ্য আপনি দেখা দিবেন।"

নেটালি বলিল, "নিশ্চয়। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।" যুবক পুনরায় বলিতে লাগিল, "আমি ত একাই থাকি। কিন্তু মৃত্যুসময়ে কোন পরিচিতের মুখ দেখিয়া মরা বোধ হয়—"

বাক্য শেষ না হইতেই নেটালি বলিল, "আপনার কথা শুনিয়া বোধ হয়, মৃত্যু যেন আপনার শিয়রে বসিয়া আছে।"

"তাই কি!"—বলিয়া যুবক নিস্তব্ধ হইল। কিছু ক্ষণ ধরিয়া অপলক চক্ষে নেটালির হাতখানি দেখিতে লাগিল, তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "তবে আপনি এখন আসুন।"

সেই দিন অপরাহ্নে নেটালি শুনিল, "মার্কিন চিত্রকর সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত—জীবন সংশয়াপন্ন।"

শুনিয়া নেটালির মুখশ্রী অধিকতর পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। আপনার কক্ষে আসিয়া অলঙ্কার প্রভৃতি মূল্যবান বস্তু যাহা কিছু ছিল, সমস্ত একত্র করিয়া একখানা রুমালে বাঁধিল। তার পর দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গিয়া একখানা গাড়ীতে চড়িয়া চলিয়া গেল।

যখন ফিরিয়া আসিল, দেখিল, দ্বারের সম্মুখে গৃহস্বামী দাঁড়াইয়া আছে। নেটালিকে দেখিয়া সে বলিল, "আপনাকে সেই মার্কিন যুবক দেখিতে চাহিয়াছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'তিনি আসিবেন কি?' সে বলিল,—'তিনি বলেছিলেন তিনি আসবেন'।"

যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় নেটালি যুবকের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, বহ্নিতাপ-বর্জ্জিত কক্ষে ক্ষুদ্র শয্যার উপর শীর্ণতনু মার্কিন যুবক মুদিতনেত্রে পড়িয়া আছে।

যুবক ক্ষণপরে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নেটালি। তাহার ম্লান অধর-প্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—"যদি এখনই আমার মৃত্যু হয়, তবে আর সময় পাইব না। তাই বলিতেছি, আপনি স্মরণ রাখিবেন—তাচ্ছীল্য করিবেন না, ঐ চিত্র আপনারই।"

এমন সময় ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নেটালি পূর্ব্বেই ডাক্তারকে সংবাদ পাঠাইয়া-ছিল। ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, নেটালি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রোগ কি সাংঘাতিক?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ। আপনি কি ইঁহার স্ত্রী?"

"না।"

"আমিও মনে করি নাই। যাই হউক, শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় আপনি ইঁহার কাছে আছেন?"

"হাঁ শেষ পর্য্যন্ত—।"

শেষ রাত্রে যুবক আর একবার চক্ষু মেলিল, দেখিল, তখনও নেটালি তথায় বসিয়া আছে। অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "আপনি এখনও এখানে বসিয়া আছেন! এই দরিদ্র পীড়িতের প্রতি অসীম করুণা প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু এই ভাবে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিলে আপনার বড় কষ্ট হইবে।"

নেটালি বলিল, "না। সে জন্য আপনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না।"

পরদিনও এমনই করিয়া অতিবাহিত হইল। রোগীর বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না।

এমনই করিয়া কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। চিকিৎসক প্রত্যহ তিন চারিবার করিয়া দেখিয়া যাইতেন। সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া নেটালি যুবকের সুচিকিৎসার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিল। প্রাণপাত করিয়া তাহার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত রহিল। এই কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সে একবারের জন্যও নিজের শয্যা স্পর্শ করে নাই।

এক দিন শেষরাত্রে যুবক অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। নেটালিকে কাছে আসিতে বলিল। নেটালি আসিলে উদ্ভ্রান্তচিত্তে বলিয়া উঠিল, "আমি আপনার কাছে অনেক ঋণী। এ জীবনে সে ঋণ অপরিশোধিতই রহিয়া গেল। হায়! চিত্রখানিও যদি শেষ করিতে পারিতাম!"

সাধারণতঃ, যুবকের কথা কহিবার বড় একটা শক্তি ছিল না। কিন্তু চিত্রের কথা বলিবার সময় যেন কেমন একটা অনৈসর্গিক তেজে তাহার হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিত। সম্পূর্ণপ্রায় চিত্রের চিন্তা অনুক্ষণ তাহার স্মৃতি মথিত করিতেছিল।

ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে পুনরায় যুবক বলিল, "আর দুই একবার তুলিকাস্পর্শে চিত্রখানির পূর্ণ সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য বিধাতা আমাকে উঠিয়া বসিবার শক্তি দিতেন। হায়, আমারা সে সুযোগ আর হইবে না। এ চিত্র অসম্পূর্ণ রাখিয়া মরিলেও আমার শক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। আর দুই একটি স্পর্শমাত্র— আর দুই একটি—"

নেটালি বারংবার যুবককে উত্তেজিত হইতে নিষেধ করিতেছিল। তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল, কি শারীরিক কি মানসিক, সামান্য উত্তেজনায় তাহার জীবনের অত্যন্ত আশঙ্কা।

যুবক তাহার কথা কানেও তুলিল না। স্থিরদৃষ্টিতে চিত্রের পানে চাহিয়া রহিল।

পরদিন চিকিৎসক আসিলেন। রোগীকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবার সময় নেটালিকে চুপে চুপে বলিয়া গেলেন, "আজ রাত্রে একটু বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। আমার আশঙ্কা হইতেছে হয় ত প্রভাত—" চিকিৎসক আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি যতই অধিক হইতেছিল, ততই নেটালি তাহার হৃদয়মধ্যে দ্রুত স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল। স্পন্দমান অবসন্ন হৃদয় দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া এক একবার আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, আবার আসিয়া সেই মৃত্যুচ্ছায়াপরিম্লান মুখখানির উপর নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে।

নেটালিকে দেখিলে এখন আর চিনিতে পারা যায় না। তাহার সেই আয়ত বিস্ফারিত নয়নদ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট, উজ্জ্বল লাবণ্যে-ঢল-ঢল মুখকান্তি পাংশুবর্ণ, হাস্যপরিহাসচটুল অধর কালিমালিপ্ত, উন্নত রমণীয় দেহ অবনত। নেটালি আর সে নেটালি নাই।—এ যেন নেটালির প্রেতমূর্ত্তি।

একটা, দুইটা, তিনটা বাজিয়া গেল। রোগীর বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। চারিটার সময় রোগীর ললাট ঈষৎ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। নেটালি শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ললাট মুছাইয়া দিতেছিল; যুবক চাহিয়া দেখিল। অবরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "এখন আমার মরণেও সুখ। চিত্রখানি যে শেষ করিতে পারিয়াছি, এ আমার পরম আহ্লাদের বিষয়। ইহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া মরিলে বুঝি স্বর্গে গেলেও আমি সুখী হইতে পারিতাম না!"

নেটালি শয্যা হইতে নামিয়া জানু পাতিয়া শয্যানিম্নে বসিল। আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিল, —"কি বলিলেন, চিত্র সম্পূর্ণ হইয়াছে! কেমন করিয়া—কখন?" অর্গলবদ্ধ শূন্য কক্ষে ধ্বনি ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোন উত্তর পাইল না।—কেহ উত্তর দিল না।

ত্রস্তভাবে নেটালি উঠিয়া দাঁড়াইল। কম্পিত হস্তখানি যুবকের নাসিকার নিকট লইয়া গেল; দেখিল, শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ;—বক্ষের উপর হাত দিয়া দেখিল, বক্ষঃস্পন্দন রহিত। তাহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। উন্মাদিনীর ন্যায় বলিতে লাগিল, "এত দিন মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই—এত দিন হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতে পারি নাই। এখন বলিলেও তুমি শুনিতে পাইবে না। এখন—এখন আমি নিঃসঙ্কোচে বলিব—তোমাকে আমি বড় ভালবাসি—প্রিয়তম! তোমাকে বড় ভালবাসি।"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া কণ্ঠস্বর কক্ষমধ্যে ফিরিতে লাগিল। মৃতের কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল কি না, কে জানে!

প্রাতে সকলেই শুনিল, মার্কিন যুবকের মৃত্যু হইয়াছে। সকলেই দুই চারিবার মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিল। দুই চারি জন আসিয়া দেখিয়াও গেল।

অন্যান্য সকলে চলিয়া গেলে দুই জন পরিণতবয়স্ক চিত্রকর তাহাকে দেখিতে আসিল। ইহারা কয়েক দিনমাত্র সেই বাড়ীতে আসিয়াছে। নেটালিকে তাহারা চিনিত না।

তাহারা কক্ষে প্রবেশমাত্র দেখিল, মৃতের শিয়রে একটি রমণী দাঁড়াইয়া আছে। রমণীর পরিচ্ছদ কৃষ্ণবর্ণ। সে তাহাদিগকে দেখিয়া দ্বারের অন্তরালে সরিয়া গেল।

শবের প্রতি চাহিয়া এক জন অপরকে বলিল, "কি সুন্দর মুখশ্রী! যেন মৃত্যু ইহাকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই। আহা, এই নবীন বয়স!"

কক্ষের অন্য দিকে চাহিয়া দেখিল, চিত্রাধারের উপর একখানি চিত্র রহিয়াছে। নিকটে গিয়া আলোর সম্মুখে চিত্রখানি তুলিয়া ধরিল। তার পর আর কাহারও মুখে কোন কথা নাই! আগন্তুকদ্বয় নির্ব্বাক, নিস্পন্দ! বহুক্ষণ পরে এক জন বলিল, "কি অপূর্ব্ব চিত্র! যেন জীবন্ত প্রতিমা! এই চিত্র নিশ্চয়ই যুবকের কোন প্রণয়ভাগিনী রমণীর চিত্র। চিত্রপটে যেন চিত্রাদর্শ ও চিত্রকরের অন্তর পর্য্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।"

দ্বারের অন্তরালে রমণী চমকিয়া উঠিয়া কপাটের সহিত মিশিয়া দাঁড়াইল।

পরদিন বাড়ীর সকলে যুবকের শবদেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য লইয়া গেল। বিবশা নেটালি তখন আপনার রুদ্ধ কক্ষে অশ্রুমোচন করিতেছে।

সারাদিন নেটালি অনাহারে নিজ কক্ষে বসিয়া রহিল; সন্ধ্যা হইল। প্রদোষতিমির আসিয়া কক্ষটিকে অন্ধকার করিয়া দিল। নেটালি উঠিল না; আলো জ্বালিল না।

গভীর রাত্রে সমগ্র বাড়ী যখন নিস্তব্ধ হইয়া গেল, নেটালি উঠিল। আলো জ্বালিয়া দর্পণ-সম্মুখে দাঁড়াইয়া অসংযত অরাল অলকরাশি সুসংযত করিল, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ সুবাসিত করিয়া অঙ্গে পরিল,—তার পর অতিসন্তর্পণে মার্কিন যুবকের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, শূন্য কক্ষ, শূন্য শয্যা! কেবল চিত্রাধারের উপর চিত্রপটখানি যেন স্থির কটাক্ষে তাহার পানে চাহিয়া আছে।

নেটালির সমস্ত শিরার মধ্য দিয়া যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। চিত্রপানে চাহিয়া আতঙ্ককম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আর আমাকে তিরস্কার করিও না! আর কেন অমন ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া আছ? তুমি বুঝিতেছ না, আজ আমি সমগ্র জীবনের অর্জ্জিত পাপরাশির উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প!"

ক্ষণকাল সেই অন্ধকারপূর্ণ ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে একটা ভীষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। তার পর নেটালি মন্থরপদে চিত্রসমীপে গিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিল। যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, শুভ্র আচ্ছাদনাস্তৃত শূন্য শয্যার উপর স্নিগ্ধ চন্দ্ররশ্মি খেলা করিতেছে। নেটালি কক্ষ পরিত্যাগ করিল। দ্বারপ্রান্তে আসিয়া একবার সেই শূন্য শয্যার পানে চাহিয়া দেখিল। তার পর ধীরে ধীরে সোপান অবতরণ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে সেই পরিণতবয়স্ক চিত্রকরদ্বয়—যাহারা পূর্ব্বদিন মার্কিন যুবকের চিত্রনৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল—একত্র নদীতীরে বেড়াইতেছিল, দেখিল, এক স্থানে বহু নরনারী সমবেত হইয়া কি দেখিতেছে। নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কি হইয়াছে? তোমরা কি দেখিতেছ?"

একটি রহস্যপ্রিয় ব্যক্তি বলিল, "একটি স্ত্রীলোক! এই দারুণ শীতের রাত্রেও কি কেহ জলে ডুবিয়া মরিতে পারে? আহা! শীতে না জানি বেচারার কত কষ্টই হইয়াছিল!"

চিত্রকরদ্বয় জনতাভেদ করিয়া অগ্রসর হইল, এবং দেখিয়াই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"কি ভয়ানক!—এ কি!"—নিরুদ্ধনিশ্বাসে সঙ্গীর পানে চাহিয়া বলিল, "মার্কিন যুবকের কক্ষে

আমরা কাল সেই যে চিত্র দেখিয়াছিলাম,—এই দেখ, এই দেখ সেই মুখ! এই সেই চিত্রের আদর্শ!"

হায়, নেটালীর নারী-জীবনের যে মহিমাময় ছবি জীবন এত দিন প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল, আজ মরণের স্পর্শমাত্রে তাহা কেমন পরিস্ফুট—কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীনলিনীভূষণ গুহ।

আবহবিদ্যা।

(৪)

দিবারাত্রি গর্ভলক্ষণ দেখিবার জন্যে কতকগুলি লোককে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদিগকে এ কার্য্যে অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত রাখা সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে। আমি তিন বৎসরের জন্য বলিলাম; কেন না, প্রত্যেক স্থানেরই কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, তাহা কতিপয় বৎসরের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত না হইলে জানা যাইবে না। আবহের ভবিষ্যৎ অবস্থা কিছু পূর্ব্বে জানিবার জন্যে গবর্মেণ্ট অনেক অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু আবহসংবাদ-জ্ঞাপক মহাশয়ের ভবিষ্যৎবাণী প্রায় প্রতি বৎসরই ব্যর্থ হইতে দেখা যায়। এমন অবস্থায়, তিন বৎসরের জন্য কোন এক স্থানে প্রাচীন ভারতীয় আবহবিদ্যার প্রণালী অনুসারে গর্ভলক্ষণাদি দেখাইয়া এই প্রণালীর পরীক্ষা করিতে যদি গবর্মেণ্টকে কোনরূপে উৎসাহিত ও ইচ্ছুক করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই কতকটা কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহার পথে আবার অনেক বিঘ্ন বিদ্যমান। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানানুসারে মন্‌সুন নামক প্রভঞ্জন ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে সমুদ্রোত্থিত জলীয় বাষ্প লইয়া আসে; আর ভারতের স্থানে স্থানে তাহা বর্ষণ করিয়া থাকে। এই প্রভঞ্জনের আগমন ও কোন স্থানে কত জল বর্ষণ করিবে, তাহার পরিমাণের সঙ্গে সার্দ্ধ ছয় মাস পূর্ব্বকার মেঘের যে কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহা বৈজ্ঞানিকদিগকে বিজ্ঞানসম্মত হেতু দ্বারা বুঝাইতে যাওয়া ও তাহাতে কৃতকার্য্যতার তিলমাত্র আশা করা একরূপ ধৃষ্টতা ও বাতুলতামাত্র।

তবে কি এ বিষয়ে আমরা কিছু করিতে পারি না? কিছু পারি বৈ কি। ভারত গবর্মেণ্টের আবহসংবাদ-জ্ঞাপক মহাশয় বৎসর বৎসর যে সকল আবহতত্ত্বসম্বন্ধীয় পুস্তকাদির প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার সাহায্যে যদি ভবিষ্যৎ

বৃষ্টির সহিত সাড়ে ছয় মাস পূর্ব্বকার মেঘের কোনরূপ একটা সম্বন্ধ দেখাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে হয় ত এ দিকে গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। গত কয়েক বৎসর আমি যাহা করিয়া আসিয়াছি, তাহা কতকটা এই ধরণের। তাহাও আবার অতি আংশিক ও অসম্পূর্ণরূপে করা যাইতে পারে। কেন না, শুভ ও অশুভ লক্ষণাদির বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতার বিষয় ছাড়িয়া দিলেও, আমি চাই দিবারাত্রি আকাশের মেঘের পরিমাণ, বর্ণ ও স্থানের পর্য্যবেক্ষণ। কিন্তু ভারতীয় আবহ-মানাগার সকলে মেঘের পরিমাণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেবল-মাত্র তিনবার দেখা হয়। পূর্ব্বাহ্ণে প্রাতে ৮টা ও ১০টার সময় ও অপরাহ্ণে ৪টার সময় কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে আকাশের দিকে চাহিয়া মেঘের পরিমাণ ও বিভাগ লিখিয়া রাখা হয় মাত্র। যাঁহাদের মেঘের অবস্থা-পরিবর্ত্তন দেখিবার অভ্যাস আছে, তাঁহারাই জানেন, এই কয়েক সেকেণ্ডের অবস্থাদর্শন কত অকিঞ্চিৎকর! এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টার মধ্যে আকাশের কত কি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে দেখা যায়। এই অকিঞ্চিৎকর আবহ-বিবরণ দ্বারা সহসা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা বা কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা নিতান্তই ধৃষ্টতা-ব্যঞ্জক, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, দৃষ্টান্তস্বরূপ গত বৎসরের ফলাফল পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

১৭ই মে (১৯০১) তারিখের Mussooree Courier নামক সাপ্তাহিক পত্রে দেরাদুনের ১৯০১ সনের বর্ষাকালে বৃষ্টি-বিবরণ প্রকাশ করা হয়। কেবলমাত্র পূর্ব্বাহ্ণে ৮টা ও ১০টা এবং অপরাহ্ণে ৪টার মেঘপরিমাণ দেখিয়া মে মাসের প্রথম হইতে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত পাঁচ মাসের মধ্যে কোন দিন বৃষ্টি হইবে, কোন দিন হইবে না, এতদ্বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়। এখানে সাধারণতঃ জুন মাসে বর্ষা আরম্ভ হইয়া সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বর্ষা থাকে। জুলাই ও অগষ্টের প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হয়। সুতরাং এই মাসদ্বয়ের কোনও এক দিনে বৃষ্টি হইবে বলিতে পারাতে, বিশেষ কিছু বিশেষত্ব নাই। মে ও জুলাই মাসে ক্বচিৎ বৃষ্টি হয়। সুতরাং এই দুই মাসের কোন এক দিনে বৃষ্টি হইবে,—ছয় মাস পূর্ব্বে বলিতে পারা নিশ্চয় কোনও নৈসর্গিক নিয়মের সূচক বলিয়া অনেকেই মনে করিবেন। সেই তারিখের পত্রে মুখবন্ধেই বলা হইয়াছিল যে, যদিও এক মাস পূর্ব্বেই বৃষ্টির ফলাফল গণনা করা হইয়াছিল, তথাপি এলাহাবাদ হইতে কোনও আবহ-বিবরণ (observation) প্রাপ্তির অপেক্ষায় এত দিন তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

নিম্নে নমুনাস্বরূপ Mussooree Courier হইতে দুই মাসের বর্ষাফল উদ্ধৃত হইল।

	মে মাস।					জুন মাস।					
রবিবার		৫	১২	১৯	০২৬		২	৯	১৬	০২৩	০৩০
সোমবার		০৬	১৩	০২০	২৭		০৩	১০	০১৭	২৪	
মঙ্গলবার		৭	১৪	০২১	২৮		০৪	০১১	১৮	০২৫	
বুধবার	১	০৮	১৫	২২	০২৯		৫	১২	১৯	০২৬	
বৃহস্পতিবার	২	৯	১৬	২৩	৩০		৬	১৩	২০	০২৭	
শুক্রবার	৩	১০	১৭	২৪	৩১		৭	১৪	২১	০২৮	
শনিবার	৪	১১	১৮	০২৫		১	৮	১৫	০২২	২৯	

যে সকল তারিখে বৃষ্টির সম্ভাবনা, সে তারিখের পূর্ব্বে ০ শূন্য নিবিষ্ট হইয়াছে।

মন্তব্যঃ—

(১) বৃহৎসংহিতানুসারে নক্ষত্রের স্থিতিকালানুসারে বৃষ্টির গণনা হয়। এক সূর্য্যের উদয় হইতে অন্য সূর্য্যের উদয় পর্য্যন্ত যে দিন, তাহার সহিত যখন নক্ষত্রের স্থিতিকালের একতা নাই, তখন উপর্য্যুক্ত তারিখে ২।১ দিন এদিক ওদিক হইবে।

(২) ১৭ই জুন তারিখ হইতে এবার দেরাদুনে মনসুনের আগমনের আশা করা যাইতে পারে।

(৩) আবহ-বিবরণের অসম্পূর্ণতা হেতু যদিও বৃষ্টি-পরিমাণ কত হইবে, বলা যাইতে পারে না, তথাপি এক সাধারণ নিয়মানুসারে বলা যায় যে, এবার বৃষ্টি সাধারণ গড়-পড়তা অপেক্ষা কম হইবে।

(৪) জুন ২৩, জুলাই ৩, ৪, ১১, ১২, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ৩১, অগষ্ট ১৫, ২৯ ও সেপ্টেম্বর ১, ২ তারিখে বৃষ্টি খুব কম হইবে।

(৫) সেপ্টেম্বরের বৃষ্টিসম্বন্ধীয় আবহ-বিবরণ অসম্পূর্ণ ছিল।

২৪শে মে তারিখের Mussooree Courier পত্রে ইহাও লিখিত হয় যে, আমার ও গেডগিল মহাশয়ের অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার নিকটবর্ত্তী বৃষ্টির দিন পড়িলে ২।৩ দিন এদিক ওদিক পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পরে যে বৃষ্টির দিন বলা হইয়াছিল, সেই সেই দিনে বৃষ্টি হইয়াছিল কি না, এখন তাহা দেখান যাইতেছে।

১৯০১।

তারিখ	মে মাস বৃষ্টির দিন (১)	মে মাস বৃষ্টির পরিমাণ (২)	জুন মাস বৃষ্টির দিন (১)	জুন মাস বৃষ্টির পরিমাণ (২)
১			পূ	০.৮১
২				০.১৩
পূ ৩			৩	
৪			৪	
৫		০.৬১		
৬	৬	০.৯৩		
৭				
৮	৮			
৯				
১০				
১১			১১	
১২				
১৩				
১৪				
১৫				০.০৮
১৬			অ	
অ ১৭		০.০৫	১৭	০.৭৫
১৮		০ ০৬		
১৯				
২০	২০			
২১	২১			
২২		০.০০	২২	০.০০
২৩			২৩	০.০০
২৪				
২৫	২৫		২৫	
২৬	২৬		২৬	০.০০
২৭			২৭	
২৮			২৮	
২৯	২৯			
৩০			৩০	
৩১		০.১১		

(১) যে সব দিনে বৃষ্টি হইবে, বলা হইয়াছিল। [প্রথম তালিকা দ্রষ্টব্য।]

(২) দেরাদুনের সর্ভে আফিসে যে সকল দিনে যত পরিমাণ বৃষ্টি মাপা হইয়াছে। বৃষ্টির পরিমাণ ইঞ্চিতে দেওয়া হয়। "পূ" পূর্ণিমার চিহ্ন। "অ" অমাবস্থার চিহ্ন।

এই তালিকায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার নিকটে কিরূপ বৃষ্টির দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

১৭ই জুন তারিখ হইতেই মনসুন প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু সেই প্রভঞ্জন কয়েক দিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। ইহাকেই হিমালয়স্থিত শৈলাবাস সকলে "ছোট বর্ষাৎ" বলিয়া থাকে।

জুন মাসের ২৫, ২৭, ২৮ ও ৩০ তারিখে বৃষ্টি না হইবার বহুবিধ কারণের মধ্যে এখন দেখা যায় যে, সেই সকল দিনে সূর্য্যমণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ দাগ সকল (spots and faculæ) দেখা গিয়াছিল। ২৬ তারিখের অল্প বৃষ্টি গবর্ন্মেণ্টের তালিকায় ছিল না।

আবহবিদ্যানুরাগী পাঠক মহাশয়দের কৌতূহলনিবারণার্থ কিরূপ আবহ-বিবরণ সম্মুখে রাখিয়া বৃষ্টিসম্বন্ধীয় উল্লিখিত ভবিষ্যৎবাণী করা হইয়াছিল, অতঃপর তাহা দেখান যাইতেছে।

তারিখ	মেঘের পরিমাণ			তারিখ	মেঘের পরিমাণ			তারিখ	মেঘের পরিমাণ		
	৮টা	১০টা	৪টা		৮টা	১০টা	৪টা		৮টা	১০টা	৪টা
অক্টোবর ২২	০	০	০	নবেম্বর ১১	১	০	৬	ডিসেম্বর ১	০	০	০
২৩	০	০	০	১২	২	০	০	২	৫	৭	১০
২৪	০	০	০	১৩	০	০	০	৩	০	০	০
২৫	০	০	০	১৪	৩	০	৪	৪	০	০	০
২৬	০	০	০	১৫	৮	৯	১০	৫	০	০	০
২৭	৭	৮	৯	১৬	৯	৭	১০	৬	০	০	০
২৮	০	০	২	১৭	০	০	০	৭	০	০	০
২৯	৬	৭	০	১৮	০	০	০	৮	৭	২	৯
৩০	০	০	০	১৯	৯	৮	০	৯	০	০	২
৩১	০	০	০	২০	৪	২	১	১০	৩	১	২
নবেম্বর ১	০	০	০	২১	৫	১	০	১১	১	১	২
২	০	০	০	২২	০	০	০	১২	২	০	৪
৩	০	০	০	২৩	০	১	২	১৩	২	৩	৮
৪	০	০	০	২৪	০	১	৯	১৪	১০	১০	৪
৫	০	০	০	২৫	৯	৫	৯	১৫	০	০	০
৬	০	০	২	২৬	২	০	০	১৬	০	০	৬
৭	০	০	০	২৭	০	০	০	১৭	৮	১০	১০
৮	০	০	০	২৮	১	০	১	১৮	১০	১০	১০
৯	০	০	০	২৯	০	০	০	১৯	১০	১০	৬
১০	০	০	৬	৩০	৩	০	৩	২০	০	২	১
								২১	৪		৮

২৭ শে অক্টোবরের প্রবর্ষণ-দিন ৬ই মে। ২৭শে অক্টোবরে অনেক মেঘ ছিল, সুতরাং ৬ই মে তারিখে বৃষ্টি হইবার কথা।

১০ই নবেম্বর পূর্ব্বদিনের প্রবর্ষণ-দিন ১০শে মে। গর্ভদিনে ৬ সংখ্যক

মেঘ ছিল ; অর্থাৎ, প্রায় অর্দ্ধেকের কিছু বেশী আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। এ স্থলে ঠিক বলা যায় না, শীর্ষস্থানে মেঘ ছিল কি না। সম্ভবতঃ ছিল ; কেন না, অর্দ্ধেকের কিছু বেশী আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, আর ৪টার সময় ৬ সংখ্যক মেঘ ছিল। রাত্রিতে হয় ত অধিকও ছিল। সুতরাং ২০শে মে তারিখে বৃষ্টি হইবে, বলা হইয়াছিল।

সর্ভে আফিসে দিনে একবারমাত্র পূর্ব্বাহ্ন ১০ টার সময় বৃষ্টি মাপা হয়। ১০টার পরে যে বৃষ্টি হয়, তাহা পরের দিন ১০টার সময় মাপা হয় ও পরের দিনের বৃষ্টি বলিয়াই লিখিত হয়। যথা, ২২শে মে তারিখে যে ০.০০ (অর্থাৎ অতি অল্প বৃষ্টি, যাহা মাপিবার পূর্ব্বেই অনেকটা শুকাইয়া গিয়াছিল) বৃষ্টি লিখিত হইয়াছে, তাহা ২১শে তারিখেই বিকাল বেলা পড়িয়াছিল। কিন্তু গবর্মেণ্টের তালিকায় ২২শে তারিখেই দেখান হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেক দিনেরই জানিতে হইবে।

গর্ভদিন ১৯শে ডিসেম্বরের প্রবর্ষণ-দিন ২৮শে জুন। নিয়ম এই যে, গর্ভদিনে বৃষ্টি হইয়া গেলে প্রবর্ষণকালে বৃষ্টি হয় না। বৃহৎসংহিতায় ইহাকে গর্ভপাত বলা হইয়াছে। ১৯শে ডিসেম্বর ০.১০ বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সমস্ত মেঘের গর্ভপাত হইয়াছিল কি না নিঃসন্দেহ না জানা থাকায়, ২৮শে জুন বৃষ্টি হইবে, বলা হইয়াছিল।

এখানে ৩।৪টি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া মেঘের সহিত বৃষ্টির সম্বন্ধ কথঞ্চিৎপরিমাণে পাঠকদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। উপরের তালিকাগুলিতে পাঠক মহাশয়েরা যেখানেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিবেন, সেখানেই জানিবেন, ব্যতিক্রমের যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান। কতকগুলি কারণ জ্ঞাত ও কতকগুলি আবহ-বিবরণের অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন অজ্ঞাত। কতকগুলি কারণ থাকা সত্ত্বেও গণনাকালে তাহা বিচারে আনা উচিত মনে হয় নাই। কেন না, স্থূল স্থূল বিষয়-গুলিই যখন অত্যন্ত আংশিকরূপে জ্ঞাত, তখন সূক্ষ্ম বিষয়গুলি বিবেচনায় আনিয়া প্রত্যেক দিনের পশ্চাতে এক একটি টীকা টিপ্পনী যোগ করিলে কেবল নিয়মের জটিলতা বর্দ্ধিত হইত ; অন্য কোনও বিশেষ লাভ হইত না।

শ্রীঈশানচন্দ্র দেব।

সহযোগী সাহিত্য।

বিবিধ।

মিশ্‌মি জাতি।

৪৪ গুর্খা দলের লেপ্টেনাণ্ট জি. এল্. এস্. ওয়ার্ড ১৮৯৯—১৯০০ মিশমি অভিযানে যুদ্ধক্ষেত্রে সংবাদ-বাহকের কার্য্য করিতেন। তিনি সেই সময়ে যুদ্ধবিভাগের জন্য মিশমি জাতির আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা তাহার সারসঙ্কলন করিয়া দিলাম।

মিশ্‌মি জাতি খর্ব্বকায়, কার্য্যপটু ও সুচতুর। মঙ্গোলিয়ান জাতির মুখের আকার সাধারণতঃ যেরূপ, তাহাদিগেরও সেইরূপ;—নাসিকা চেপ্টা ও চোয়াল লম্বা।

চুলিকাটা জাতি সাধারণতঃ নিষ্ঠুরতা ও বিপৎপ্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের ও বাণিজ্যের সম্পর্কে আসিয়া তাহারা কথঞ্চিৎপরিমাণে সভ্যভাব ধারণ করিয়াছে।

চুলিকাটা ও বেবেজিয়া জাতি প্রায় সম্মুখের চুল কাটিয়া ফেলে, এবং ছোট ছোট পাজামা ও কোর্ত্তা ব্যবহার করে। তাহারা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে, বিষাক্তবাণপূর্ণ তূণ ও হাতে ধনুক ও ঢাল ধারণ করে। যুদ্ধের সময় বরসা ব্যবহার করে, কিন্তু নাগাদিগের ন্যায় সদা সর্ব্বদা তাহারা ইহা সঙ্গে রাখে না। চুলিকাটা ও বেবেজিয়া জাতি দেখিতে প্রায় একরূপ; পরিচ্ছদ একই প্রকার, এবং চুলকাটার ধরণও সমান। বেবিজিয়া জাতিও নিষ্ঠুরতার জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু অভিযানের সময়ে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, বরং তাহাদিগকে বিশেষ ভীরু বলিয়াই লেফ্‌টেন্যাণ্ট ওয়ার্ডের মনে হইয়াছিল। তাহারা স্বয়ং স্বীকার করে যে, চুলিকাটা জাতি তাহাদের অপেক্ষা বলশালী। প্রবাদ আছে,—তাহারা নরমাংসাশী। লেফ্‌টেনাণ্ট ওয়ার্ড তাহার প্রমাণ পান নাই। এই কথা তাহাদের নিকট উত্থাপিত হইলে তাহারা বিশেষ আমোদ বোধ করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল, কথাটি মিথ্যা।

বেবেজিয়া ও চুলিকাটাদিগের বাড়ীগুলি দৈর্ঘ্যে ৪০ হইতে ২০০ ফিট ও প্রস্থে ১২ ফিট। বাড়ীগুলি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক পরিবারের সংখ্যা দাসদিগের সংখ্যার উপরে নির্ভর করে। ৪ ফিট উঁচু কাষ্ঠখণ্ডগুলির উপর গৃহগুলি নির্ম্মিত ও এক দিকে দুই ফিট প্রশস্ত একটা রাস্তা থাকে। শূকর প্রভৃতি জন্তুর উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য বাড়ীর সম্মুখে একটা বেড়া থাকে। বেবেজিয়া ও চুলিকাটাদিগের অনেক বাড়ীতে লেফ্‌টেনাণ্ট ওয়ার্ড প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক বাড়ীতে নিহত পশুদিগের মাথার হাড়গুলি একই প্রকারে সজ্জিত দেখিয়াছিলেন। মিশমিরা বানর ভক্ষণ করে ও বানরের হাড় বাড়ীতে সাজাইয়া রাখে। ঘরের মধ্যে তাকের উপরে সংসারের জিনিসপত্র রাখিয়া থাকে। প্রত্যেক ঘরে অগ্নি রাখে, এবং বংশনির্ম্মিত একটি পাত্র অগ্নির উপরে ঝোলান থাকে; খাইবার দ্রব্যগুলি ঝলসাইয়া লইবার জন্য সেইগুলি ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক ঘরের সহিত একটা করিয়া পায়খানা থাকে।

ঘরগুলি নীচু। প্রায় সোজা হইয়া তাহাদিগের মধ্যে দাঁড়ান যায় না। গৃহগুলি প্রায় চালাঘর।

অতিশয় অপরিষ্কৃত ও নির্ম্মাণপ্রণালী জঘন্য। এক একটি গ্রামে তিন হইতে চল্লিশটি পরিবার বাস করে। একটি বাড়ী হইতে আর একটি বাড়ী প্রায়ই দেখা যায় না, বাঁশ ও অন্যান্য গাছের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। প্রত্যেক গ্রামের পার্শ্বে একটা করিয়া বাঁশের বাগান; ঘরের মেজে প্রস্তুত করিবার জন্য বাঁশ বিশেষ প্রয়োজনীয়। পানীয় জল আনয়ন করিবার জন্যও তাহারা বাঁশের চোঙ পাইপের ন্যায় ব্যবহার করে।

গ্রামের চতুর্দ্দিকে প্রায়ই বেড়া দেওয়া থাকে, এবং কোন কোন স্থানে বাড়ীর চারি দিকে বেড়া দেওয়া থাকে।

মিশ্‌মি জাতির মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহের পূর্ব্বে মিশ্‌মি স্ত্রীলোকেরা পরপুরুষের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে পারে; কিন্তু বিবাহের পর স্বামীতে অনুরক্ত হয়। স্ত্রীলোকেরা বিবাহের পরে শান্ত ও পবিত্র ভাবে জীবন কাটায় বলিয়া খ্যাতি আছে। বিবাহের পরে কোন রমণী অসতী হইলে লোক গ্রাম্য যাদুকরের সাহায্য লইয়া থাকে। প্রায় সকল কাজে যাদুকরের সাহায্য লওয়া হয়। তাহারা বিশ্বাস করে যে, যাদুকরেরা সব জানে। যাদুকরেরা হাতে পায়ে ও গলায় ঘণ্টা ও অলঙ্কার ধারণ করে। অসতী স্ত্রীলোককে শুদ্ধ করিবার জন্য গ্রাম্য যাদুকরকে বাড়ীতে ডাকা হয়। যাদুকর অসতী স্ত্রীলোকের বগলে হাত দেয়। তাহাদের বিশ্বাস, দুষ্ট আত্মা সেইখানে থাকে, এবং নাড়ি ভুঁড়ি ছাড়ান একটা পক্ষী বাহির করে ও তাহা তখনই খাইয়া ফেলে। লোকের এই ধারণা, এই প্রক্রিয়ায় স্ত্রীলোকটি শুদ্ধ হইয়া যায়, এবং পরে আর অসৎপথে যাইবে না। এই ঘটনার পরে স্ত্রীলোকটির স্বামী অসচ্চরিত্র পুরুষটির দা ও রাঁধিবার বাসন প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য দণ্ডস্বরূপ কাড়িয়া লয়। যদি অপরাধী পুরুষ উক্ত দ্রব্যগুলি না দেয়, প্রায়ই রক্তারক্তি ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কখন কখন স্বামী তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়া থাকে।

কোন ব্যক্তি কোন বালিকাকে বিবাহ করিতে চাহিলে বালিকার পিতা মাতার সম্মতি লইতে হয়। গ্রাম্য লোকে গ্রামের বাহিরে একটা ঘর বাঁধিয়া দেয় ও তথায় উক্ত প্রণয়িযুগল কিছু দিনের জন্য বাস করে। পুরুষকে বালিকার পিতা মাতাকে উপঢৌকন দিতে হয়, এবং বিবাহের পরে বালিকার পিতা মাতা জামাতাকে উপঢৌকন দিয়া থাকে।

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে গ্রাম্য যাদুকরের পরামর্শ গৃহীত হইয়া থাকে, এবং যাদুকরের পরামর্শ-অনুসারে পুরুষ অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। প্রথমা স্ত্রী স্বামিগৃহেই থাকে। তাহাকে দাসীর ন্যায় থাকিতে হয় না, কিংবা স্বামী তাহার উপর কোন অত্যাচার করে না।

শিশু মরিয়া গেলে তখনই তাহাকে কবর দেওয়া হয়। কিন্তু প্রবীণ ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তিন দিন বাড়ীতে তাহার শব রক্ষিত হয় ও তাহার আত্মীয় স্বজন শোক করে। গ্রীষ্মকালে মারা গেলে শবটিতে ঘন ঘন বাতাস করে। গ্রামের বাহিরে সাধারণতঃ নদীর মধ্যে কবর খনন করে, অস্ত্র শস্ত্র ও অল্প স্বল্প বস্ত্র কবরে প্রোথিত করে। কাঠের কফিনে শব রক্ষিত হয় ও তাহার উপরে দুইখানি বড় বড় কাষ্ঠ রক্ষা করা হয়; কাষ্ঠগুলি পাতা ও মাদুর প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত করে।

ইহারা ভূতের ভয় করে। কোন ব্যক্তি যুদ্ধে যাইলে যে স্থানে সে হত হয়, সেইখানেই তাহাকে কবর দেওয়া হয়। রাস্তার ধারে কবর দেয় না; যেখানে লোকে যাতায়াত করে, সেখানে কবর

প্রচলিত আছে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ ধনী ও বহুসংখ্যক ক্রীতদাসের অধিকারী হইলে মৃত ব্যক্তিকে প্রায়ই দাহ করা হয়। ক্রীতদাসগণের শব প্রায় নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কোনও সম্প্রদায়ই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নহে।

সন্তান প্রসূত হইবার পরে দশ দিন পর্যান্ত প্রসূতি অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। গ্রাম হইতে দূরে জঙ্গলের মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সন্তানপ্রসবের সময়ে ডিগারু ও মেজু স্ত্রীলোকদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। শিশুদিগের জন্মমাত্র নামকরণ হয়। ইহারা মনে করে যে, যদি যমজ কন্যা বা যমজ পুত্র প্রসূত হয়, তাহা হইলে, একটির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

নব বঙ্গদর্শন।

আলোচনা।

শ্রীশ বাবুর নিবেদনের পর সম্পাদকীয় গদ্যে "সূচনা" ও পদ্যে "প্রহেলিকা"; 'ডবল ব্যারেল্ড গন'। কিন্তু সহযোগীর কাব্য-রস এখন বাদ রাখিয়া একবার তাঁহার উচ্চচূড় চিন্তা-শৈলে আরোহণ ও বিচরণ করিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রথমে "সূচনা"র আলোচনাই সঙ্গত।

শ্রীশ বাবুর নিবেদিত ও অমরকরমন্ত্রপূত সঞ্জীবনী সুধায় বঙ্গদর্শন 'পুনর্জীবিত' হইবামাত্র, অষ্টাদশবর্ষের সুদীর্ঘ সুপ্তিশেষে, গা ঝাড়া ও গোঁফে চাড়া দিয়া উঠিতে উঠিতেই, তৎক্ষণাৎ সম্পাদক মহাশয় বিক্রমাদিত্যের "দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা"-বিশিষ্ট অক্ষয় দিব্য সিংহাসন সন্নিভ বঙ্কিম বাবুর "বঙ্গদর্শন"-রূপ বত্রিশ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, অপরাপর বিচারারম্ভের পূর্ব্বে, শ্রীশ বাবুর তাক্ত সাহিত্য-নীতির 'জের' বা 'লেজুড়' ধরিয়া, বঙ্গদর্শনের বিগত ও আগত, বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন, পরস্পরবিরোধী সত্ত্বাপঙ্কক দৃঢ় দড়াদড়ি দ্বারা একত্র বাঁধিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে প্রয়াসের পূর্ব্বাভাস আমরা "উল্লেখেই" দিয়াছি। পরাভাস ও ভাষ্য এখনই অবার একটু দিতে বাধা হইতেছি। ইতিমধ্যে একটি প্রশ্ন হইতেছে এই যে, রবি বাবু এই বত্রিশ-সিংহাসনের যে পর্য্যায়ে উঠিলেন, সেটি কোন্ ও কেমন পর্য্যায়? এবং বঙ্কিমের অব্যবহিত পরিত্যক্ত ও অপরের অসংস্পৃষ্ট পরবর্ত্তী পর্য্যায় কি না? রবি বাবু অত্র সিংহাসনে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইলেন কাহার? শ্রীশ বাবুর "নিবেদন" শ্রবণ করিয়া ত জানিতেছি যে, বঙ্কিম বিক্রমাদিত্যের পর সঞ্জীব শালিবাহন উক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার পর শ্রীশচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ ভোজরাজদ্বয় কর্ত্তৃক উহা অধিকৃত হয়, এবং ঐ দুই মহাশয় একত্র এই সিংহাসনে উপবেশন ও শাসনদণ্ডের পরিচালন করেন। তাহার পর উহা অষ্টাদশ বৎসর ভূগর্ভে নিহিত থাকে। এখন রবি বাবু উহাতে আরোহণ করিয়াছেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে সর্ব্বাদি অধিষ্ঠান ইঁহারই বটে। কিন্তু প্রারম্ভকাল হইতে পরদায় পরদায় মাপিয়া ইহার কোন পর্য্যায় হইল? রবীন্দ্রনাথ বত্রিশ-সিংহাসনে বিক্রমকেশরী বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকার পাইলেন, অথবা চন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র ভোজ বাহ্লীকের উত্তরাধিকারী হইলেন?

বঙ্কিম বিক্রমাদিত্য বঙ্গদর্শনকে জলবুদ্বুদের সহিত তুলিত করিয়া উহার আবির্ভাবকালে

লিখিয়াছিলেন, "এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদ স্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে।"

উদয়ের চারি বৎসর পরে বঙ্গদর্শনের বিদায়কালে (সেই বিদায়ই।চিরবিদায়) বত্রিশ-সিংহাসন বর্জ্জন করিয়া উক্ত বিক্রমাদিত্য লিখিয়াছিলেন ;—"বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলাম ; আজ সেই জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল।"

পঁচিশ বৎসর পরে বিক্রমাদিত্যের ঐ বুদ্বুদ-রূপকের অনুসরণ করিয়া বত্রিশ-সিংহাসনের রবি রাজা তদীয় সূচনায় কাব্য ও বৈরাগ্য রসের উচ্ছ্বাস তুলিয়া ও তাহাতে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক বুকনি দিয়া ঐ বুদ্বুদেরই ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন ;—

"এই নশ্বর জগতে জলবুদ্বুদের সহিত কাহার তুলনা না হয়? ক্ষুদ্র সাময়িকপত্রের ত কথাই নাই; অতুলপ্রতাপান্বিত রোম সাম্রাজ্য কালস্রোতে জলবুদ্বুদের ন্যায় উদয় হইয়াছিল, বুদ্বুদের ন্যায় লীন হইয়াছে। কিন্তু জলবুদ্বুদ উঠে, মিশায় ; আবার উঠে, আবার মিশায়, আবার উঠে। আবির্ভাব, তিরোভাব, পুনরায় আবির্ভাব, ইহাই বিশ্বের নিয়ম, বিনাশ কিছুরই নাই।"

অতএব সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত এই যে, বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের বত্রিশ-সিংহাসনের বিনাশ হয় নাই। তাহা এত কাল শূন্য ছিল, এখন তিনি তাহাতে আরোহণ ও উপবেশন করিয়াছেন।

অতি উত্তম। সাহিত্য-সংসার দেখিয়া সুখী হইয়াছে ; রাজা বলিয়া স্বীকার করিতেছে। নশ্বর জগতের অবিনশ্বর হওয়াও খুব মঙ্গলকর। পরন্তু সম্পাদকীয় লেখাটিও শুনিতে বেশ সুন্দর। তাহার 'নবেলী' ভাবণা ললিত লবঙ্গলতার মত লতাইয়া লতাইয়া কানের ভিতর দিয়া প্রাণে গিয়া পশিতেছে ; কিন্তু লেখাটির "লজিক"টুকু চমৎকার নয় কি? তা অমন ললিত লেখায় "লজিক" দেখে কে,—সঙ্গতি অসঙ্গতিরই বা সন্ধান করে কে?

বঙ্গদর্শনের বিনাশ না থাকা আপাততঃ বড় আবশ্যক, অতএব "বিনাশ কিছুরই নাই" ; বিনাশ কিছুরই নাই, অতএব বঙ্গদর্শনেরও বিনাশ নাই ; বিনাশ কখনও হয় নাই, কখনও হইবে না।

বেশ। নিশ্চিন্ত! অখণ্ডনীয় অটল সিদ্ধান্ত! আবার চাই কি! সম্পাদক মনে করিলেন, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সত্যের গোড়া ঘেঁসিয়া নিপুণ হস্তে এমন কবিত্ব-কুঠারের কোপ চালাইলেন যে, বঙ্গদর্শনের অবিনাশিত্ব সপ্রমাণ হইয়া প্রমাণের জের আরও অনেকখানি রহিয়া গেল। আবার তাহার সঙ্গে সযুক্তি মস্ত একটা বিচিত্র উক্তি হইয়া গেল।

উক্তি বিচিত্র বটে ; যুক্তিও বিপুল। "বিনাশ কিছুরই নাই," কেন না, "জলবুদ্বুদ উঠে, মিশায়, আবার উঠে, আবার মিশায়, আবার উঠে।" এই দেখ, বঙ্গদর্শন বুদ্বুদ বিশ বৎসর বেমালুম বিলীন হইয়া 'গেছিল,' আবার উঠিল, ফুটিল। তবে আর বিনাশ রহিল কিরূপে? বুদ্বুদ উঠে, মিশায়, আবার যে ফুটে! অতএব সব অবিনশ্বর!

তা বটে। কিন্তু যে বুদ্বুদটা মিশায়, ঠিক সেইটাই কি সশরীরে আবার উঠে? না অন্য রকমের আর একটা উঠে?

বঙ্গদর্শন বুদ্বুদ ত উঠিল। রোম সাম্রাজ্য বুদ্বুদ, মোগল সাম্রাজ্য বুদ্বুদ উঠিয়াছে কি?

কই কখনও ত আর উঠিল না। নিশ্চয়ই সে বুদ্‌বুদগুলা বঙ্গদর্শন বুদ্‌বুদের চেয়ে নিতান্ত ছোট না হইলেও হইতে পারে। তবে তাহাদের তিরোভাবের পর আর আবির্ভাব হইল না কেন, হয় না কেন? অবিনাশী "সাধনা" বুদ্‌বুদ, "বালক" বুদ্‌বুদ এখন কূটস্থ চৈতন্তের কোন কোটরে বিরাজ করিতেছে? মৃত বঙ্গদর্শনের চিতায় 'তা' দিতে দিতে তাহারাই ত বরং ফুটিয়া ফুটিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। তাহার উপায় কি বলুন দেখি? যখন "বিনাশ কিছুরই নাই," তখন "বালক" ও "সাধনা"ও ত মরিয়া বিনষ্ট হয় নাই। এখন তাহারাই ত বত্রিশ-সিংহাসনে উঠিয়া বঙ্গদর্শন শবের দুই স্কন্ধে দুই জন চাপিয়া বসিয়াছে।

সম্পাদক হয় ত শুনিয়াছিলেন, এবং তেমন মনোযোগ দিয়াও শুনেন নাই যে, প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়েরই বিনাশ নাই, তাহার তিরোভাব হইলেও ভিন্ন ভিন্ন আকারে পুনরাবির্ভাব হয়। যে বস্তুটার বিলয় হইয়া যায়, সেইটারই যে আবার উদয় হয়, তাহা নয়। তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকৃতির অনন্ত শক্তিতে মিশ্রিত হইয়া সজাতিত্ব হেতু তাহারই সমবায়ে প্রবাহিত হইয়া প্রকৃতির প্রয়োজনানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ গঠিত ও প্রকটিত করে। স্থূলতঃ আসল কথাটা এই।

বঙ্কিম বাবুর ও তদীয় সহযোগী লেখকবর্গের প্রতিভায় চারি বৎসর কাল পরিচালিত বঙ্গ-দর্শনকে, অর্থাৎ তাহার স্থিতি ও গতি কর্তৃক সৃষ্ট, অবলম্বিত ও অনুকৃত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ানিচয়কে যদি একটা শক্তি বলিয়াই ধরা যায়, তাহা হইলে সে শক্তি বহুকাল পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়া, তাহার পর অপরাপর শক্তির সমবায়ে ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও বিক্ষিপ্ত ভাবে ব্যয়িত ও অভিব্যক্ত হইয়া, স্বকার্য্য সাধন করিয়া চুকিয়াছে। সে শক্তির অভিব্যক্তি তৎপরবর্ত্তী ও বর্ত্তমান সাময়িক পত্রনিচয়। কিন্তু এই সহজ সত্যটুকু স্বীকার করিলে সম্পাদকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। কাজেই তিনি অদ্ভুত যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে চাহেন যে, তিনি বিশ বৎসর পরে ব্যবহার করিবার অবসর পাইবেন বলিয়া বিলুপ্ত বঙ্গদর্শনের সমস্ত শক্তিখানি কই মাগুর মাছের মতন এক স্থানে জড় হইয়া 'জেয়ান' ছিল। এখন তিনি সেটাকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

সম্পাদক সানুকূল উত্তরের কামনা করিয়াই আধ জোরে আধ আবদারে জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন,—"বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন কি বাঙ্গালীর হইবে না?"

বড়ই দুঃখের কথা যে, ইহার উত্তরে লোকে বলে যে, বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর হইয়াছিল। কিন্তু সঞ্জীব শ্রীশাদির বঙ্গদর্শন বঙ্কিমের উপরোধ সত্ত্বেও বাঙ্গালীর পছন্দ হয় নাই। রবি বাবুর বঙ্গদর্শন হইবে কি না ঘোর সন্দেহ। এই কারণেই বঙ্কিমের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত রাখিবার কামনায় আমাদের পরমপূজনীয়া তদীয় সহধর্ম্মিণী বঙ্গদর্শন নামের পুনঃপ্রচারে ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি? বঙ্কিমের জন্য ব্যথাটা তাঁর নয়, আমাদেরই প্রাণে বড় বেশী। কেন না, বঙ্গদর্শনের পসারখানা ও বঙ্কিমের সাহিত্য-সম্ভ্রমটার আমরা প্রয়াসী। কাজেই আমরা তাঁহাকে যত ভালবাসি, তাঁহার পরিবারবর্গ কি আর তত?

সম্পাদক সতেজে বলিতেছেন,—"আমরা নামকে নামমাত্র মনে করি না। যে নামকে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, সে নামকে আমরা বিনাশ হইতে দিতে পারি না।"

কিন্তু সে নামকে আপনারা যে বিকৃত ম্লান ও মলিন করিবেন না ও করিতেছেন না, তাহার

যোগ্যতা কি আছে ? প্রাজ্ঞতা ও প্রতিভা প্রায় তাঁহার কাছাকাছি হবে কি ? সেটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা হইয়াছে কি ?

ইহারই উত্তরে হয় ত আপনারা বলিতেছেন,—"বঙ্গদর্শন নামের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার (নব সম্পাদকের) প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন।" এবং তাহাতেই তিনি সর্ব্বথা সমর্থ হইয়া সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে বিরত থাকিবেন।

এরূপ প্রক্রিয়ার কল্পনা করিয়া, বঙ্কিমত্ব প্রাপ্ত হইলে, আর কথা কি ? কিন্তু কৃত কার্য্যগুলি যে 'সরেজমিনে' মজুত।

পুনশ্চ, সম্পাদক উক্ত কথাই পুনরুক্ত করিয়া বিজ্ঞাপিত করিতেছেন,—"বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে এ পত্রের সম্পাদক যিনিই হউন না কেন, বঙ্গদর্শন নামের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন, বঙ্গদর্শনের প্রাচীন মহারথী এখনও যাঁহারা ইহলোকে আছেন, তাঁহারা এই নামের পতাকা উড্ডীন দেখিলে, ইহার তলে সমবেত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।"

তা প্রায় বৎসর পুরিল ত সেনাপতি "পতাকা" উড়াইয়াছেন, কতগুলি "মহারথী" অতিরথী তাঁর "পতাকাতলে সমবেত" ? দেখিবার মধ্যে দেখিতেছি, ত কেবলমাত্র স্বগণভ্রষ্ট চন্দ্রশেখরকে। তা তাঁকেও পংক্তির বাহিরে, একখানা ছেঁড়া পাতা পাতিয়া, গোটা দুই ক্ষুদের অন্নে, আপ্যায়িত করা হইয়াছে। রবিতেজে মলিন মুখুর্য্যে মহারথীর রথ টথ ত কিছুই দেখিতেছি না। "উঁহু" "ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই" ভাবের পদক্ষেপে শেষ পৃষ্ঠার ডগের উপর রথিত্ব করিতেছেন। তাও মাসে মাসে নয়। সেনাপতির মরজি অনুসারে।

সেনাপতি স্বয়ংই শত অক্ষৌহিণী। যে "আধুনিক" আড়াইটি কি তিনটি তুরুক-শোয়ার পতাকাতলে দাঁড়াইয়াছেন, "তাঁহারা বঙ্গদর্শনের নামেই নিজের রচনার আদর্শকে যথাসাধ্য উন্নত রাখিবার প্রয়াস পাইবেন।" তা ত বটে ! ঐটার জন্যই সেটা আটক ছিল।

'অতীত'টা ইতিহাসের বিষয়ীভূত বলিয়াই এত কাল লোকে জানিত। এখন নব সহযোগী অতীতটাকে "ইতিহাসের বিবরমধ্য" হইতে সটান বাহির করিয়া, প্রখর সূর্য্যালোকে আনিয়া, অতীত ও বর্ত্তমানের একটা অখণ্ড, অভিন্ন অস্তিত্ব বাঁধিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কারণ, সেটাতেও তাঁহার প্রয়োজন আছে। অন্ততঃ বঙ্কিমের ইতিহাসখানা, তিনি উক্ত "বিবর" হইতে বাহিরে আনিয়া, বর্ত্তমানের, অর্থাৎ বর্ত্তমান বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের অস্তিত্বের সহিত আঁটিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন।

"জাতীয় জীবনের লীলাভূমিকে সুবিস্তীর্ণ" করিবার জন্য বঙ্কিম বাবুর ইতিহাসটা আত্ম-অস্তিত্বের ইতিহাসের সহিত রবি বাবু বাঁধিয়া দিবেন ; কিন্তু, বঙ্কিম যাহা করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহা করিতে পারিবেন না, তাহা আগেই নিপুণতার সহিত বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়া রাখিতেছেন। যে হেতু বঙ্কিমের কাল ও বর্ত্তমান কাল এক নয় ; উভয়ে অনেক তফাৎ। অতএব "আধুনিক সাহিত্যে আমরা প্রতিভার সেই ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রবল স্বাদ উপভোগ করিতে পারিব না।" তবে কি "উপভোগ" করিবার প্রত্যাশা করিব বলুন দেখি ?

একবার বলা হইতেছে, বঙ্গদর্শনের সমস্তখানিই ছিল বঙ্কিম। আবার বলা হইতেছে,

রবি বাবু বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের কালটাকে "সাহিত্যের সংকীর্ণ খাত" ও স্বকীয় বঙ্গদর্শনের কালটিকে "সাহিত্যের বিস্তীর্ণ প্রবাহ" বলিয়া, এবং তদ্দ্বারা অবশ্য তাঁহার নিজের কাজের কাঠিন্যের আভাসটা ইসারায় বুঝাইয়া, লিখিয়াছেন,—"এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে, বর্ত্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্ত ভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা। কাজটা কঠিন। কারণ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে, চিরস্থায়ী সত্যের সহিত বিচিত্র মৃগতৃষ্ণিকার প্রভেদ নির্ণয় করা দুরূহ হইয়াছে।"

বলিতে পারি না, এ উক্তির আদৌ কোনও অর্থ হয় কি না; তা সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এত কালের মধ্যেও কি "বিচিত্র মৃগতৃষ্ণিকা হইতে চিরস্থায়ী" সত্যকে বাছিয়া লওয়া ও রাখা হয় নাই যে, নব-বঙ্গদর্শন-কারকে সে কাজটাও করিয়া, "বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্ত ভাবে তাঁহার পত্রে প্রতিফলিত" করিতে হইবে? আপাততঃ তিনি তাঁহার আগামী নববর্ষের সম্পাদকীয় মঙ্গলাচরণে পাঠকবর্গকে বলিবেন কি, এই সংবৎসরের মধ্যে "বঙ্গচিত্তের" কি কি "আদর্শের" প্রতিফলন তিনি ফলাইয়াছেন? এক বৎসরের বঙ্গদর্শনে যাহা "প্রতিফলিত" দেখা যাইতেছে, তাহার চৌদ্দ আনা পোনের গণ্ডা রকম তাঁহার নিজ চিত্ত; আর এক আনা পাঁচ গণ্ডা অপরের। এই চিত্তগুলির আত্মাভিব্যক্তিই কি 'বঙ্গ চিত্তের আদর্শ' এবং 'শ্রেষ্ঠ আদর্শ' বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? সম্পাদকীয় আদেশ ত তাহাই বটে।

রবি বাবু কেবল "বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিফলিত" করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। তাহাদের মধ্যে "সাহিত্যের আদর্শকে নিত্যকালের অচল শিখরের উপরে প্রতিষ্ঠা" করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ়। আমরা বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, "বঙ্গচিত্তের" অপরাপর "শ্রেষ্ঠ আদর্শ"গুলিকে নিত্যকালের অচল শিখরের উপরে" না আনিয়া কেবলমাত্র "সাহিত্যের আদর্শ"কেই সেখানে 'প্রতিষ্ঠা' করা হইতেছে যে? অপর "শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি" কি অপরাধে সে সম্ভ্রম ও সে সুখ হইতে বাদ পড়িল ও বঞ্চিত হইল? আর "সাহিত্যের আদর্শ"ই বা কোন গুণে, গৌরবে ও অপরিবর্ত্তনীয় 'পাক্কা' স্বরূপে, সটান "নিত্যকালের অচল শিখরের উপর" উঠিল? তা, তাহাকে "অচল শিখরের উপরে" 'একশা' টানিয়া তুলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার একটু আগে, "সাহিত্যের আদর্শ"টা কি, একটু ঠিক করিয়া লইলে ভাল হইত না কি? একটু খুলিয়া বলিয়া দিলে ভাল হয় না কি? কেন না, নিম্নস্থ নরলোকের সকলেই দেখিতেছে যে, "সাহিত্যের আদর্শ" স্বপ্রকৃতিতেই পরিবর্ত্তনশীল। দেশভেদে, কালভেদে, অবস্থাভেদে, জাতিভেদে, রুচিভেদে "সাহিত্যের আদর্শ" ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, এবং সেই সাময়িক আদর্শানুসারে সাহিত্য, ভিন্ন ভিন্ন যুগে, আত্মশরীর গঠিত করিয়াছে ও করিতেছে। পৃথিবীর যাবতীয় সাহিত্যের শরীর ও আত্মা ও ইতিহাসেই ত ইহার সাফাই সাক্ষী বিদ্যমান। পরন্তু "সাহিত্য" বলিলে তাহার শরীর ও আত্মা উভয়ই একত্র লইতে হয়; কোনটির একটি বাদ দিয়া, কূট কৌশলে পাশ কাটাইয়া গেলে চলে না; একটা নিরাকার ও নিরর্থক স্থায়ের ফাঁকি তুলিয়াও সেটাকে "নিত্যকালের অচল শিখরের উপরে" উঠান যায় না। অস্থলে, অকালে. "নিত্যানিত্য, অচল, অনন্ত, চিরস্থায়ী, সত্য, শ্রেষ্ঠ আদর্শ" এ সব লম্বা চওড়া কথার বেতালা কাওয়াজে কেবল বিদ্রূপ ও বিরক্তিই উদ্দীপিত হয়। ঐ সকল পাণ্ডিত্য একটু এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া এবং শব্দার্থ ও তাহার

ব্যবহার ও তদ্রূপ ছোট খাট বিষয়ে মনোযোগ দিলে ভাল হয় ; তাহার উপযোগিতা ও উপকারিতা উভয়ই আছে।

রবি বাবু তাঁহার উপরি-উক্ত "প্রতিষ্ঠা-প্রতিজ্ঞা" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"এ প্রতিজ্ঞা আমরা বিনয়ের সহিত এবং আশঙ্কার সহিত করিতেছি।"

"বিনয়"! বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের "বিনয়"। তা মন্দ নয়। বিনয় একটু থাকা ভাল। এবং "প্রতিজ্ঞা" "বিনয়ে"র সহিত করাও ভাল। কিন্তু আশঙ্কার সহিত কোনও "প্রতিজ্ঞা" করা চলে না। "আশঙ্কা" "প্রতিজ্ঞা"র প্রতিবাদ-জ্ঞাপক। "আশঙ্কা" সংশয়জনিত ভয় সূচিত করে। ভয়, সংশয় বা সন্দেহ শঙ্কা করিয়া "প্রতিজ্ঞা" করা হয় না। নিঃসংশয় নিঃসন্দেহ নিঃশঙ্ক চিত্তই "প্রতিজ্ঞা"য় সাহসী। শঙ্কায় সন্দেহে দোদুল্যমান ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা করা স্বাভাবিকতার বিপরীত,—অসম্ভব। কেন না, "প্রতিজ্ঞা", সর্ব্বথা দৃঢ়তাসূচক ; আশঙ্কায় সঙ্কুচিত ও সন্দেহে বিচলিত হওয়ার জ্ঞাপক নহে, ঠিক তাহার বিপরীত। ফলতঃ, "আশঙ্কার সহিত" একত্র "প্রতিজ্ঞা" শব্দের ব্যবহার চলে না। হয় "আশঙ্কার" স্থলে "সাহস," অথবা "প্রতিজ্ঞা"র স্থলে "প্রস্তাব" শব্দ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। শব্দ, অভিধানে অনেকানেকই আছে। তাহাদের উপযুক্ত, সঙ্গত ও শিষ্ট ব্যবহার হইলেই তবে বাক্য অর্থবোধক ও ভাবোদ্দীপক হয়।

সহযোগীর প্রথম সংখ্যাতেই দেখিতেছি, "বঙ্গচিত্তের" এক "শ্রেষ্ঠ আদর্শ"—"হিন্দু জাতির একনিষ্ঠতা"। এ "শ্রেষ্ঠ আদর্শ" লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন ও সংবৎসর ঘুরিতেছেন, শ্রীযুক্ত "ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়" নামক জনৈক খৃষ্টশিষ্য। ইনি বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় (হায়!—বঙ্গদর্শন!) এই প্রবন্ধে হিন্দুজাতির বংশধরগণকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শিখাইতেছেন! নিশ্চয় এটা বর্ত্তমান বঙ্গ-চিত্তের ও বঙ্গদর্শন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ; তাহাতে সন্দেহ করি না। কিন্তু বর্ণাশ্রমের এই আদর্শের উপদেষ্টার নামের উপর,—অন্নপ্রাশনের ও খৃষ্টীয় চূড়াকরণের প্রকৃত নামের উপর উপাধ্যায়ান্ত এই উৎকট পরদার আড়ালটা কেন? এটা কি বড়ই বেশী সন্দেহসঙ্কুল নয়? না এটাও "বঙ্গ চিত্তের" একটা শ্রেষ্ঠ আদর্শ? রবি বাবুর দ্বাদশপদী একটি পুরা সনেট বর্ণাশ্রমের শিরে "মটো" অঙ্কিত করিয়া, এই বাঙ্গালী পাদরী তাঁর যে আর্য্যোপদেশ আরম্ভ করিয়াছেন, ক্ষমা করুন, আমরা আর তাহার ভিতর ঢুকিব না। তা, "নিষ্ঠা" শব্দটিই চলিত, সেইটিই লোকে ব্যবহার করে। কেহ "নিষ্ঠা" স্থলে "নিষ্ঠতা" বলে না।

যে বঙ্গদর্শনের বক্ষে এক দিন বঙ্কিম বাবুর ও বাঙ্গলা ভাষার সুবিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠতম নবেল "বিষবৃক্ষ" ও "চন্দ্রশেখর" প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেই আজ রবি বাবুর "চোখের বালি" বাহির হইতেছে। কর্ত্তব্যানুরোধে এ বালি ঘাঁটিবার কর্ম্মভোগ যখন আমাদের করিতে হইয়াছে, তখন তাহার উপযুক্ত আলোচনা অবশ্যই হইবে। কিন্তু আজ নয়, কয়েক দিন পরে। আপাততঃ মোটের উপর এই বক্তব্য যে, রবিবাবু নির্ভীক স্বরে যে ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ ও সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যনীতির শৈথিল্য তাঁহার ও তদীয় বঙ্গদর্শনের পক্ষে "অমার্জ্জনীয়" প্রচার করিয়া তাহাদের সংস্পর্শবিরহিত হইতে প্রথমেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, সেই ভীরুতা,

একযোট হইয়া তাঁহার এই কুৎসিত আখ্যানের আরম্ভ হইতে উপস্থিত অধ্যায় পর্য্যন্ত পূর্ণগ্রাস করিয়াছে। ইহার প্লট এবং নায়িকার নাম ও চরিত্রটি অপরের লিখিত ও অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রকাশিত এবং রবি বাবুর বঙ্গদর্শনের এই প্রথম সংখ্যাতেই সমালোচিত একটি নবেলেরও নয়—'টেলে'র প্লট ও নায়ক নায়িকা চরিত্রের অবিকল অনুকৃতি;—সর্ব্বত্রেই একই আত্মায় উভয়ের একই রূপ গতি, এবং স্থানে স্থানে, এমন কি, একই শরীরে স্থিতি! সরলভাবেই বলিতেছি, রবি বাবু অজ্ঞাতে এই গলিতপঙ্কময় প্রমাদে পড়িয়া থাকিবেন। নিশ্চয়ই অজ্ঞাতে তিনি ইহা করিয়া বসিয়াছেন, নহিলে জানিয়া শুনিয়া এমনতর কাজে কেহই প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এ ব্যাপারটা কেবল বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের নয়, সমগ্র সাহিত্য-সংসারের একটা অতি বিস্ময়কর ও রহস্যময় সুসদৃশ ঘটনা। চোখের বালি সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বলিলাম, তাহা উহার আলোচনাকালে আমরা অক্ষরে অক্ষরেই দেখাইয়া দিব, এবং তৎকালে উক্ত বিস্ময়কর রহস্যের আমরা যে মীমাংসা করিয়াছি, তাহাও সবিস্তারে বলিব। তখনই তিনি সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা তাঁহার সরল ও বেদনাহীন কঠিন সমালোচক হইলেও, তাঁহার শত্রু ও নিন্দুক নহি।

তা, যাহাই হই, আমরা বলিতেছি ও আমাদের অত্যল্প আলোকানুসারে অবশ্যই বরাবর বলিব যে, রবি বাবু এত বড় লম্বা ও এমনতর কুৎসিত উপন্যাসে হাত দিয়া একেবারেই ভাল করেন নাই। ভগবান তাঁহাকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা এরূপ কার্য্যের আদৌ উপযোগী নহে। শক্তির প্রকৃত পরিমাণ ও প্রকৃতিটা ঠাওর না করিয়া ও তাহার পরিধিটাকে প্রকাণ্ড ও সর্ব্বদিক-স্পর্শী ভাবিয়া ইদানীং তিনি অনবরত তাহার অপব্যবহার ও অপচয় দ্বারা প্রায় প্রতিদিনই তাহাকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিতেছেন।

"চোখের বালি" যে বইখানির অবিকল অনুকৃতিবৎ, তাহার নাতিহ্রস্ব ও কিঞ্চিদতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, স্বয়ং মুখোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর নবদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই করিয়াছেন। অপ্রিয় সত্যোদ্‌ঘাটনে ও বিকৃতিবিশ্লেষণে ন্যায়তঃ বাধ্য বিচারক ও সমালোচকের অনুপযুক্ত অতিরিক্ত সদয়দৃষ্টিতে দেখিয়াও দোষজ্ঞাপন অপেক্ষা গুণকীর্ত্তনে অধিকতর অভিলাষী মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনতিক্রমণীয় কর্ত্তব্যের অনুরোধে, যেন একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিতান্ত বাধ্য হইয়াই বলিতেছেন;—"* * ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডচিত্র অঙ্কিত করিতে পারা এক; ক্ষুদ্র চিত্রগুলিকে অন্তর্গত করিয়া একটা বিশাল চিত্রপট আঁকা আর। পাঁচকড়ি বাবু প্রথমোক্ত রকমে কৃতকার্য্য; দ্বিতীয়োক্ত রকমে ব্যর্থপ্রয়াস! * * * * এই উপন্যাসের মুখ্য চিত্র উমাকেই দেখ। উমা একটি আস্ত জীবন্ত মানুষ হয় নাই—একটি রক্ত মাংসের বেদান্তদর্শন হইয়াছে মাত্র। * * পাঁচকড়ি বাবু স্বর্গের চিত্রই আঁকিতে গিয়াছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, তাহা নরকের চিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে পাপচিত্র পাঁচকড়ি বাবু আঁকিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? কেবল কি পাপচিত্র আঁকিবার জন্যই পাপচিত্র আঁকা?"

নূতন লেখক পাঁচকড়ি বাবুর সম্বন্ধেই যখন ইহা অতি সদয় ও মৃদু মন্তব্য, উচ্চতর স্তরের অভ্যস্ত ও পুরাতন লেখক রবীন্দ্রনাথ বাবুর বই "বালি" সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি বুঝিয়াছেন

রবি বাবুর এই বই অতঃপর "বঙ্গদর্শনে" বাহির হওয়া বন্ধ হইলেই, বোধ হয়, ভাল হয়। কারণ, তাঁহার এই "চোখের বালি" বঙ্কিম বাবুর হউক, তাঁহার হউক বা আর যাহারই হউক, বঙ্গদর্শনের মুখে চুণকালী মাখিয়া দিতেছে। তাহা একবারের জন্য হইলেও হইত। মাসে মাসে পূর্ব্বনামজাদা 'মান্তমান' লোকের মুখময় চুণকালী মাখানটা ভাল দেখায় কি?

রবি বাবু তাঁহার গদ্য ভাষা এমনতর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া 'ভ্যাল সা' করিয়া ফেলিতেছেন কেন? অবিশ্রান্ত রচনাতিসারই কি ইহার কারণ? তাঁর নিজেরই কথায় বাঙ্গালীর "নাড়ী স্বাভাবিক "অবস্থার চেয়েও যেমন দাবিয়া গেছে," ("ইয়ার" সঙ্গে এই "গেছে"টা নিত্য সম্বন্ধে লেগেই আছে, এবং বোধ করি খাঁটি 'বাংলা' ব্যাকরণের খাতিরেই হবে, ক্রমাগত কাণ ঝালাপালা 'করিয়া দেছে'।) তেমনই দাবা নাড়ীরই মত তাঁর ভাষার দেহখানার অস্থিমজ্জা দারিদ্র্যে ও দুর্ব্বলতায় দিন দিন 'যেন দাবিয়া যাচ্ছে'। রবি বাবু পদ্য গদ্য অনেকই লিখিয়াছেন; লিখিতেছেনও অনেক। দৈনিক সংবাদপত্রের দেশী সম্পাদকেও এত লেখা লেখে না ও এত ছাপে না। কিন্তু, বোধ করি, তাঁর নিদারুণ দাবুনিতেই, এখন সেটা নেহাত রগ-বসা "হইয়া গেছে"।

সহযোগীর এ সংখ্যার প্রবন্ধপর্য্যায়ে সম্পাদকীয় খাসকামরায় খৃষ্টোপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় ব্যতীত আরও দুই জন নব্য লেখক আছেন। এক জন শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন। 'আরেকটি" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। প্রথমোক্ত বাঙ্গালী টেইন। অতএব সেই সূত্রে "বাঙ্গালা প্রাচীন পদ্য সাহিত্য" সম্বন্ধে সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। ইহাঁর জীর্ণাজীর্ণ সমালোচনার ধার ও 'সুবলয়িত। ভাষার ভার পূর্ব্ববৎ যথাযথ জাগ্রত আছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে, তাহার ইতরবিশেষ হয় নাই। তিনি "লিপি-সংগ্রহ" "কামিনী-কুমার" প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথিপত্র হইতে যে গদ্য ছন্দ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর ভূতপূর্ব্ব ভাষা; তাঁর নিজের ভাষাটি অভূতপূর্ব্ব বটে।

"যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তি" নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ। লেখক ইহাতে বঙ্কিমী কায়দায় মহাভারতগত কেবল দ্যূত নয়, কাব্য সাহিত্যাদিরও সমালোচনায় সচেষ্ট হইয়াছেন; এবং "মৌলিক, প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণচরিত্র, মহাভারতের ভিত্তি, কাব্যাংশে অতুলনীয়, কাব্য সাহিত্যে অতীব বিরল, সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্য, সর্ব্বলোকবিস্ময়কর, প্রোজ্জ্বল বর্ণ" ইত্যাদি বাক্যজাল বিস্তার করিয়া সাড়ম্বরে আসর লইয়াছেন। আপশোষ কেবল এই যে, আসল কাজের কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। 'হাই কালচারের' হাব ভাব ও হাকিমী কায়দার 'কসরৎ' করিয়া দ্যূতক্রীড়া ও দ্রৌপদীদুর্গতির সেই দারুণ দাবানলের মধ্যেও বেশ একমাত্রা হাসির অবসর দিয়াছেন। তা, ইহাই বা কম কি? নাম সাকিমাদির সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়া, প্রকাশ্য 'সঙ' বাহির না করিয়া, প্রচ্ছন্ন ও প্রগাঢ় ভাবে যদি সঙের করণীয় কাজটা সিদ্ধ হইয়া যায়, সাময়িক-সম্পাদকের তাহাতেই সুবিধাই আছে। আসর-রক্ষার্থ স্বয়ং সাজিতে হয় না, অপরকেও রঙ মাখিতে সম্মত করিয়া সঙ সাজাইতে হয় না।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী—মাঘ। "হিন্দুস্থান" শ্রীমতী সরলা দেবীর রচিত একটি জাতীয় সঙ্গীত। গত কংগ্রেসে গীত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "ছদ্মনাম" একটি ক্ষুদ্র গল্প। বিলাতী 'বোটকা' গন্ধ অত্যন্ত প্রবল। নির্ম্মলার "নারাঙ্গি রঙ্গের শালের শাড়ীখানির" অন্তরাল হইতেও "গাউন" দেখা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "হিন্দু সমাজের শান্তিশীলতা" সুলিখিত সুচিন্তিত প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "ইউরোপীয় দশকসংখ্যার ইতিবৃত্তে" সপ্রমাণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষই দশক-সংখ্যার জন্মভূমি। দশকসংখ্যা কি? দশগুণোত্তর সংখ্যাপ্রণালীই কি লেখকের উদ্দিষ্ট? শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের সঙ্কলিত "ঐতিহাসিক পত্রাবলী" হইতে প্রাচীন মহারাষ্ট্র রাজ্যের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানা যায়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ "ভাষার সহিত ব্যাকরণের সম্বন্ধ" বিচার করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রবন্ধে পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন রায় চৌধুরী মূল পারস্য গ্রন্থ হইতে "জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনচরিত" সংগ্রহ করিয়াছেন। রায় চৌধুরী মহাশয় ইংরাজ ঐতিহাসিকের চর্ব্বিতচর্ব্বণ না করিয়া মূল পারস্য গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদের স্বদেশী ঐতিহাসিকগণের অনুকরণযোগ্য। "অভিরামের মন্ত্রণা" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সিংহের অঙ্কিত উৎকলচিত্রের অন্যতম।

প্রবাসী।—অগ্রহায়ণ ও পৌষ। "রামচন্দ্রের বিরহ" নামক নিবন্ধে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন রামায়ণ-বর্ণিত রাম-বিরহের অনুবাদ করিয়াছেন। রচনাটি সুখপাঠ্য ও ভাবুকতায় অনুপ্রাণিত। উপসংহারে লেখক বলেন, "এই বিরহগাথা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলে * * * ইহার বিবিধ কবিত্বপূর্ণ বর্ণনাগুলিতে কালিদাসাদি কবিগণ কোন্ ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন, উত্তরচরিতের বিলাপাত্মক স্বর্গীয় প্রেমকথা কোন মূল গীতির প্রতিধ্বনিস্বরূপ হইয়া এত সুন্দর হইয়াছে, তাহাও পরিষ্কার জানা যাইবে।" লেখক "পরিষ্কার জানিয়া" থাকিবেন, সকলের জানিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রমাণপ্রয়োগ না করিয়া এমন কথা লিখিতে নাই। বাল্মীকি ও ভবভূতি, এ উভয়ের করুণরসরচনায়—রামবিলাপে যে স্বাতন্ত্র্য ও বিভিন্নতা বিদ্যমান, তাহাও পরিষ্কার জানিবার যোগ্য বটে। আশা করি, দীনেশ বাবু ভবিষ্যতে রামায়ণানুকারী কালিদাসাদির বাল্মীকিলুণ্ঠনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজের মত প্রতিপন্ন করিবেন। "রাজা রবি বর্ম্মা" প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ চিত্রকর রবি বর্ম্মার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও প্রতিভার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মুদ্রণস্বত্ব" সময়োপযোগী উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ। "কুম্ভীর" একটি ক্ষুদ্র গল্প। আখ্যানবস্তুর বিশেষত্ব নাই; ভাষায় দেবেন্দ্রের কার্ম্মুকটঙ্কার শুনিতেছি বটে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র হালদারের "গিলগিট ও গিলগিটী" মনোজ্ঞ রচনা। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "মোতিয়া" দৃশ্য কাব্য,—'প্রকরণিকা' সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মৌলিকের "নীলগিরির টোডা জাতি" কৌতুকাবহ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ" প্রবন্ধে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছেন। "বিবিধ প্রসঙ্গ" বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ, সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ।

কবিতাকুঞ্জ ।

নিশীথ-পাপিয়া ।

নিশি নিশি নিদ্রাভঙ্গে উদ্ভ্রান্ত-হৃদয়ে
শুনিয়াছি ও সঙ্গীত । উঠিত সুস্বর
চমকিয়া মুগ্ধ-আঁখি নক্ষত্রনিকর
সুপ্ত দিগঙ্গনা-কোলে । তারই সঙ্গ ল'য়ে
উঠিত বাসনা মোর ; ত্রিদিব-আলয়ে
প্রবেশিয়া, লুণ্ঠিত সে নন্দন ভিতর
অপ্সরার প্রীতিসুধা, পরিত সুন্দর
মিলন-মালিকাখানি আত্ম-বিনিময়ে ।
কিন্তু, হে বিহগবর, আজিকার গান
কোন্ সুরে সাধিয়াছ ? হের আচম্বিতে
এ কি কালো মেঘছায়া ছাইল পরাণ ;
দরধারে ভাসে বক্ষ—নারি নিবারিতে ।
হায় ! চন্দ্রালোকে হেন নিশীথ প্লাবিয়া
কি গান গাহিছ তুমি কে দিবে বলিয়া ?

৺নিত্যকৃষ্ণ বসু ।

আগরা ।

আগরা!—উজ্জ্বল তব রূপরত্নহারে
সমগ্র বিশ্বের চক্ষু করেছ তৃষিত !
কি মাধুর্য্যে ছড়াইয়া দীপ্তি চারিধারে
বক্ষে শোভে 'মমতাজ' অমরবাঞ্ছিত !
কি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ফুটে এ মর্ত্ত্য কৌস্তুভে,
গ্রহরশ্মি বিমলিন—হিয়া আত্মহারা !
মনে হয় স্বপ্ন সত্য এ রাজ-বৈভবে
ঐশ্বর্য্য তাণ্ডব এ কি উন্মাদের পারা !
শোভে পারিজাত সম এ পৃথ্বী-নন্দনে,
কীর্ত্তিদীপ্ত সম্রাটের প্রাসাদ-নগরী ;
তপস্যা-সৃজিত যেন বিমান গগনে,
চরণ চুমিয়া বহে যমুনা-লহরী ;—
হে ঐশ্বর্য্যময়ি ! আজি ভূ-ভারতে তুমি
কি সৌন্দর্য্য-সাধনার শিল্পতীর্থভূমি !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম ।

ভুল ।

ভুল সুখ, ভুল শান্তি, ভুলই ত সান্ত্বনা ;—
তবুও ভুলিতে আমি পারিলাম কই !
এত দুঃখ এত কষ্ট এত যে যাতনা,—
তবুও তোমারে আমি ভেবে সুখী রই !
জানি আমি—এ ধরণী নহে মিলনের ;—
হেথা শুধু বাসনার আকুল আহ্বান ।
ভালবাসা হেথা শুধু মোহ ক্ষণিকের ;
তারি তরে মিছামিছি মান অভিমান !
বৈতরণী-পরপারে মিলনের কূলে ?
জানি আমি দেখা হবে তোমায় আমায় ।
তখন—তখনো তুমি থাকিবে কি ভুলে ?
আমি যে বেঁধেছি বুক সেই সান্ত্বনায় !
সেইখানে দুই প্রাণে বদ্ধ আলিঙ্গনে
অভিন্ন উভয়ে র'ব অনন্ত বন্ধনে ।

শ্রীনলিনীভূষণ গুহ ।

দেখিবে কি ?

(ভল্টেয়ার হইতে ।)

তুমি কি দেখিবে বালা, কি মধুর আলো
জ্বালিয়াছ হৃদয়ে আমার ?
কথায় ভাষায় শুধু তাই ফুটে ভাল
যে লালসা তুচ্ছ অতি হায় ।
নীরবে,—দেখ লো চেয়ে—কত ভালবাসি
প্রণয় নীরব চিরদিন ।
এ নয়নে,—দেখে যাও—শুধু ওই হাসি
জাগায়েছে শকতি নবীন !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।



Photo by Bourne & Shepherd.

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

জন্ম, ২০শে পৌষ ১২৪৮। মৃত্যু, ২২শে ফাল্গুন ১৩০৮।

Mohila Press.

মাধবেন্দ্র পুরী ও ঈশ্বর পুরী।

[স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম্. এ. প্রণীত।]

গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরুর নাম ঈশ্বর পুরী। হালিসহরের সন্নিকটে কুমারহট্ট নামে এক গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামই ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান। সম্ভবতঃ তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু তদ্বিষয়ে আমি কোনও সঠিক প্রমাণ পাই নাই। তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন; কিন্তু কি কারণে এইরূপ আচরণ করেন, তাহা আমরা পরিজ্ঞাত নহি। তিনি কৃষ্ণনামামৃত নামক এক-খানি গ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। গৌরাঙ্গ যে সময়ে নবদ্বীপে ব্যাকরণের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্যাপৃত, তৎকালে ঈশ্বর পুরী ভ্রমণ করিতে করিতে নবদ্বীপে আগমন করিয়া কিছু দিন তথায় ছিলেন। এই সময়েই তাঁহার সহিত গৌরাঙ্গের প্রথম পরিচয় হয়। তিনি একদিন ঈশ্বর পুরীকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে 'ভিক্ষা' করাইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে পুরী গোস্বামী গৌরাঙ্গের অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে আপনার কৃষ্ণনামামৃত পাঠ করিয়া শুনাইতেন। একদা ঐরূপ পাঠাবসরে তিনি গৌরাঙ্গকে আপন কাব্যের দোষ দেখিলে উল্লেখ করিতে বলেন। গৌরাঙ্গ তাঁহার একটা ধাতু দূষিলেন; বলিলেন, এ ধাতু আপনি আত্মনেপদীর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ইহা 'আত্মনেপদী' নহে। এই বলিয়া গৌরাঙ্গ প্রস্থান করিলে পর পুরী গোসাঞী রাত্রিকালে সেই ধাতুটির আত্মনেপদে সমু-দায় বিভক্তি রূপ করিয়া রাখিলেন, এবং পরদিন গৌরাঙ্গকে তাহা শুনাইয়া দিলেন। গৌরাঙ্গকে পরাভব মানিতে হইল। ঈশ্বর পুরীকে তিনি আপনা অপেক্ষা পণ্ডিত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।

শোকার্ত্তহৃদয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া গৌরাঙ্গ যখন গয়াধামে বিচরণ করিতে-ছিলেন, তৎকালে একদা অকস্মাৎ ঈশ্বর পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহাকে আপনার হৃদয়ের বেদনা জনাইলেন, এবং তাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান ভিক্ষা করিলেন।

যিনি গৌরাঙ্গেরও গুরু, তিনি কীদৃশ ব্যক্তি ছিলেন, ইহা জানিতে সকলেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কি কৃষ্ণদাস, কি বৃন্দাবন দাস, কেহই সে কথা বিস্তারিত লিখিয়া যান নাই। আমরা যদি তাঁহার কৃষ্ণনামামৃত

গ্রন্থখানি পাইতাম, তাহা হইলে পাঠকের কৌতূহল কিয়ৎপরিমাণে চরিতার্থ করিতে পারিতাম। এবং তাঁহার মানসিক চিত্র বিশ্বস্তরূপে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইতাম। এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, তিনি জ্ঞানমার্গের উপেক্ষা করিয়া ভক্তিমার্গের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করিলে তিনি হৃদয়ের আবেগে অধীর হইয়া উঠিতেন, এবং অশ্রুপাত করিয়া ধরণী সিক্ত করিতেন।

ঈশ্বর পুরী নিজে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহার নিকটেই ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রের জীবনবৃত্তান্তও অন্ধকারাবৃত। তবে তিনি যে এক জন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া যে সকল গল্প রচিত হইয়াছে, তাহাতেই তাহা বুঝা যায়। কথিত আছে, গৌরাঙ্গ নিজেই মাধবেন্দ্রকে 'ভক্তি রসের আদি সূত্রধার' বলিয়া বর্ণনা করিতেন। ঈশ্বর পুরী গৌরাঙ্গকে যে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দেন, মাধবেন্দ্র পুরীই তাহার মূল উপদেষ্টা। এই মাধবেন্দ্র অদ্বৈত নাড়িয়ালের,—যিনি বৈষ্ণবসমাজে অদ্বৈতাচার্য্য নামে বিখ্যাত,—গুরু ছিলেন; এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহিতও তাঁহার সৌহার্দ্দ্য ছিল। মাধবেন্দ্রের শিষ্যের শিষ্য হইয়াই গৌরাঙ্গ অদ্বৈত নাড়িয়ালের সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন, এবং তদবস্থায় নিত্যানন্দ আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দেন। অতএব, মাধবেন্দ্র হইতেই গৌরাঙ্গ সমাজের জন্ম ধরিতে হয়।

মাধবেন্দ্রের জীবনের গল্প-মিশ্রিত ইতিহাস চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা এইরূপ;—মাধব পুরী সন্ন্যাসী হইবার পর একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত; রাত্রিদিন জ্ঞান নাই। ক্ষণে উঠেন, ক্ষণে পড়েন। স্থান অস্থান বলিয়া চৈতন্য নাই। তিনি গোবর্দ্ধন শৈল প্রদক্ষিণ করিয়া গোবিন্দকুণ্ডে স্নান করিয়া বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন। এ দিকে সন্ধ্যা আগতপ্রায়। কিছুমাত্র ভোজন হয় নাই। তাঁহার অযাচক বৃত্তি ছিল। ভিক্ষা করিতে কাহারও দ্বারে যাইতেন না। কেহ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কিছু আহার করিতে দিত, তাহাই তিনি গ্রহণ করিতেন; অন্যথা উপবাসী থাকিতেন। বৃক্ষমূলে সন্ধ্যাকালে অনাহারে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে এক গোপবালক দুগ্ধভাণ্ড হস্তে লইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "পুরী, এই দুগ্ধ লও, এবং পান কর। তুমি কেন মাগিয়া খাও না?—এরূপে কি ভাবিতেছ?"

পুরী বালকের সৌন্দর্য্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহার মধুর বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তুমি কেমনে জানিলে আমি উপবাসী আছি? তুমি কে?" বালক কহিল, "আমি গোপ; এই গ্রামেই আমার বাস; আমার গ্রামে কেহ উপবাসী থাকে না। কেহ মাগিয়া খায়, কেহ বা কিঞ্চিৎ দুগ্ধ খাইয়া থাকে; আর যে অযাচকবৃত্তি হয়, আমাকে তাহার আহার যোগাইতে হয়। কতকগুলি স্ত্রীলোক জল লইতে আসিয়া তোমার অবস্থা দেখিয়া গেল, এবং দুগ্ধ দিয়া আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিল। আমার গোদোহনের সময় উপস্থিত; আমি অপেক্ষা করিতে পারি না। এই ভাণ্ড রহিল, পরে আসিয়া লইয়া যাইব।" এই বলিয়া বালক চলিয়া গেল। পুরী গোসাঞী চমৎকৃত হইলেন। দুগ্ধপান করিয়া ভাণ্ড ধৌত করিয়া বালকের পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আর সে দেখা দিল না। সন্ন্যাসী বৃক্ষমূলে বসিয়া হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালেও তাঁহার নিদ্রা নাই। শেষরাত্রিতে কিছু তন্দ্রার আবেশ হইলে স্বপ্ন দেখিলেন যে, সেই বালকটি তাঁহার সমীপে আসিয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক এক কুঞ্জে লইয়া গেল, এবং কহিল, "আমি এই কুঞ্জে বাস করি। সম্প্রতি শীত গ্রীষ্ম ও দাবাগ্নিতে অতিশয় ক্লেশানুভব করিয়া থাকি। তুমি গ্রামের লোক আনিয়া আমাকে এই স্থান হইতে লইয়া পর্ব্বতের উপর উত্তম স্থানে স্থাপন কর; এবং তথায় মঠ নির্ম্মাণ করিয়া শীতল জলে আমার অঙ্গ মার্জ্জন কর। আমি তোমার পথ নিরীক্ষণ করিয়া আছি। সর্ব্বদাই ভাবি, কবে মাধব আসিয়া আমার সেবা করিবে। আমি তোমার প্রেমের বশীভূত হইয়া সেবা অঙ্গীকার করিব, এবং দর্শন দিয়া সংসার ত্রাণ করিব। আমি গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপাল, আমি বজ্রের স্থাপিত, এবং এই স্থানের অধিকারী। ম্লেচ্ছের ভয়ে আমার সেবকগণ শৈল হইতে আমাকে কুঞ্জে লুকাইয়া রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে। তদবধি আমি এই স্থানেই বাস করিতেছি।" এই কথা বলিয়া বালক অন্তর্হিত হইল। মাধব পুরীরও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বিচার করিলেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলাম, কিন্তু চিনিতে পারিলাম না!" এই ভাবিয়া প্রেমাবেশে তিনি ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন, এবং কিছু কাল ক্রন্দন করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা-পালনের জন্য সুস্থির হইলেন। প্রাতঃস্নান করিয়া গ্রামের মধ্যে গিয়া সকল লোককে একত্রিত করিলেন, এবং কহিলেন, "গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণ তোমাদের গ্রামের অধিকারী। তিনি নিবিড় বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন; তথায় আমি প্রবেশ করিতে পারিতেছি না। তোমরা কুঠার কোদাল লইয়া আমার সঙ্গে আইস। সকলে

মিলিয়া তাঁহাকে বাহির করিব।" গ্রামের লোক হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সঙ্গে গেল। এবং বন কটিয়া প্রবেশের দ্বার করিল। এইরূপে নিবিড় বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা দেখিতে পাইল যে, ঠাকুর তৃণদলে ও মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছেন। তখন সকলে মহানন্দে প্রস্তরমূর্ত্তি উত্তোলন করিয়া পর্ব্বতের উপর লইয়া গেল, এবং প্রস্তরের সিংহাসন করিয়া তাহার উপর বসাইল। গোবিন্দকুণ্ডের জলে তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জিত হইল, এবং এক মহোৎসব আরব্ধ হইল। প্রতিমার অঙ্গে অনেক ময়লা পড়িয়াছিল; মাধব পুরী স্বহস্তে তাহা দুর করিয়া, ঠাকুরকে স্নান করাইলেন, এবং অনেক তৈল দিয়া তাঁহার অঙ্গ চিক্কণ করিলেন। পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া এইরূপে তিনি ঠাকুরকে প্রকাশ করিলেন। গ্রামিক লোক অন্ন ব্যঞ্জনের উপকরণ উপহার দিয়া অন্নকূট সাজাইলেন, এবং গোপালের ভোগ দিলেন। গোপাল অনেক দিনের ক্ষুধায় কাতর ছিলেন, সব খাইয়া ফেলিলেন। তবে

"যদ্যপি গোপনে সব অন্নব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্তস্পর্শে পুনঃ তেমতি হইল॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি।
তার ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাই॥"

এইরূপে গোপাল প্রকট হইলেন শুনিয়া চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম্য লোক বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য আনিয়া দিতে লাগিলেন, এবং পুরী গোসাঞী গোপালের ভোগ লাগাইতে লাগিলেন। এক জন ধনবান ক্ষত্রিয় তাঁহার একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ব্রজবাসী গোপগণ এক এক জন এক এক গাভী দান করিল। গৌড় অর্থাৎ বাঙ্গলা হইতে দুই জন বৈরাগী ব্রাহ্মণ আসিয়া পঁহুছিলেন। মাধব তাঁহাদিগকে আপন শিষ্য করিয়া ঠাকুরের সেবাইত করিয়া দিলেন।

দুই বৎসর এইরূপে গোপালের সেবা করিয়া মাধব একদিন পুনর্ব্বার স্বপ্নে ঠাকুরকে বলিতে শুনিলেন, "দেখ মাধব! তোমার তৈলে ও সুশীতল জলেও আমার শরীরের তাপ মিটিতেছে না। তুমি যদি আমার শরীরে চন্দন দাও, আমার শরীরের জ্বালার কিছু উপশম হয়। নীলাচল হইতে তুমি আমার জন্য চন্দন সংগ্রহ করিয়া আন।" মাধব শুনিয়াই ব্যস্ত হইয়া পূর্ব্বদেশে যাত্রা করিলেন। পথে শান্তিপুরে অদ্বৈত নাড়িয়ালের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন। অদ্বৈত তাঁহার প্রেম দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং তাঁহার স্থানে মন্ত্রদীক্ষা

করিলেন। রেমুনা গ্রামে গোপীনাথের মন্দিরে গোপীনাথকে দেখিয়া তাঁহার মন অতিশয় বিহ্বল হইল। তিনি নাচিয়া নাচিয়া গান করিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ পরে মন্দিরের জগমোহনে বসিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ঠাকুরের কিরূপ সেবা হয়, জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসার কারণ এই যে, তিনি অনুমানে বুঝিলেন যে, গোপীনাথের অতি উত্তম ভোগ হয়; ইচ্ছা যে, ফিরিয়া গিয়া তিনিও গোপালের তাদৃশ ভোগের ব্যবস্থা করিবেন। ব্রাহ্মণেরা কহিল যে, সন্ধ্যাকালে গোপীনাথের অমৃতকেলী নামে ক্ষীর ভোগ হইয়া থাকে। দ্বাদশ মৃৎপাত্রে অমৃতসমান ক্ষীর ঠাকুর আহার করেন। তাহার নাম গোপীনাথের ক্ষীর। পৃথিবীতে কুত্রাপি তাদৃশ ভোগ নাই। কহিতে কহিতে অমৃত-কেলীর সময় উপস্থিত হইল। মাধব স্বচক্ষে ক্ষীর ভোগ দেখিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন,—

"অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই॥"

ফলতঃ ঈদৃশী ইচ্ছা মনোমধ্যে উদিত হইলে তিনি কিছু লজ্জা বোধ করিলেন, এবং বিষ্ণু স্মরণ করিলেন। এমন সময়ে ভোগের আরতি বাজিল। আরতি দেখিয়া ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া মাধব বাহির হইয়া গেলেন; কাহাকেও কিছু বলিলেন না। তিনি অযাচিতবৃত্তি ও বিরক্ত উদাসীন। কদাচ কাহাকেও কিছু যাচ্ঞা করেন না। প্রেমামৃতে তদীয় হৃদয় তৃপ্ত। ক্ষুধাতৃষ্ণা জানেন না। অদ্য ক্ষীর খাইতে ইচ্ছা হওয়ায় মনোমধ্যে ঘৃণা বোধ হইল। তিনি একাকী গ্রামের শূন্য হাটখোলায় গিয়া শয়ন করিয়া থাকিলেন। এ দিকে পূজারি গোপীনাথকে শয়ন করাইয়া স্বয়ং শয়ন করিলে ঠাকুর তাহাকে স্বপ্নে কহিলেন, "ওগো পূজারি! উঠ, দ্বার উদ্ঘাটন কর। সন্ন্যাসীর জন্য আমি একটি ক্ষীর রাখিয়াছি। আমার ধড়ার অঞ্চলে তাহা ঢাকা আছে। আমার মায়ায় তোমরা তাহা কেহ দেখিতে পাও নাই। মাধব নামে এক সান্ন্যাসী হাটে বসিয়া আছে। তাহাকে শীঘ্র এই ক্ষীর দাওগে।" পূজারী স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রিতেই স্নান করিয়া মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটন করিল। ঠাকুরের ধড়ার অঞ্চলতলে ক্ষীর পাইল, এবং তাহা লইয়া বাহিরে আসিয়া 'মাধব সন্ন্যাসী কোথা?' বলিয়া হাটে ভ্রমণ করিতে লাগিল। মাধব আপন পরিচয় দিলে কহিল, "তোমার সমান ভাগ্যবান নাই। গোপীনাথ তোমার জন্য এই ক্ষীর চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন; আমার হস্ত দিয়া পাঠাইলেন!" শুনিয়া মাধবের আর আনন্দের সীমা

রহিল না। তিনি ক্ষীর খাইয়া মৃৎপাত্রটি ভাঙ্গিয়া টুকরাগুলি বহির্ব্বাসে বাঁধিয়া রাখিলেন, এবং পরে প্রত্যহ তাহার এক একটি ঠিকরি ভক্ষণ করিতেন। এই ঘটনাতে রেমুনার গোপীনাথ ক্ষীরচোরা বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

মাধব নীলাচলে পঁহুছিয়া তথাকার রাজপুরুষগণের সাহায্যে কর্পূর ও চন্দন সংগ্রহ করিয়া সেবকের মস্তকে অশেষ পরিশ্রমসহকারে তাহা লইয়া রেমুনায় প্রত্যাগমন করিলে, গোপাল স্বপ্নে তাঁহাকে কহিলেন,"দেখ মাধব! বহুদূরবর্ত্তী ম্লেচ্ছ-শাসিত দেশে হইতে বৃন্দাবনে চন্দন আনিতে তোমার অনেক ক্লেশ হইবে, তাহার আবশ্যক নাই। এই গোপীনাথ ও আমি অভিন্ন। ইহাঁর শরীরে তুমি চন্দন প্রদান কর,আমার শরীর শীতল হইবে।" তখন আপনার প্রতি ঠাকুরের মমতা দেখিয়া মাধব বিস্মিত হইলেন, এবং চন্দন লইয়া আর বৃন্দাবনে না আসিয়া রেমুনার ক্ষীরচোরা গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গেই তাহা কিছু দিন ধরিয়া লেপন করিতে থাকিলেন। ফলতঃ তাঁহাকে চন্দন আনিতে আদেশ দেওয়া ছলনামাত্র। কোথায় বৃন্দাবন, কোথায় নীলাচল! মাধব সঙ্গিহীন হইয়া একাকী ভ্রমণ করিতেন। একাকী ম্লেছ রাজার দেশে ভ্রমণ করিয়া কিরূপে এত দূরদেশ হইতে চন্দন আনিবার জন্ত সাহস কুলায়, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্যই ঠাকুর মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু মাধবের প্রেম ও অনুরাগ অসামান্য। তিনি বাধা বিঘ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আদেশপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠাকুর তাঁহার প্রেমমূলক সাহসের পরিচয় পাইয়া অতিরিক্ত ক্লেশ দেওয়া অনর্থক বিবেচনায় রেমুনাতেই তাঁহার হস্তে চন্দন পরিলেন।

এই সকল গল্পের মধ্যে যেটুকু সত্য আছে, তাহা বাছিয়া লওয়া দুষ্কর নহে। মাধবেন্দ্র পুরী শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠাপিত পুরী নামক সম্প্রদায়বিশেষের এক জন সন্ন্যাসী ছিলেন। জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভই এই সন্ন্যাসীদের সাধন ভজনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু মাধব তাদৃশ উদ্দেশ্য অসার ও নীরস বোধে তাহা পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদ-মূলক ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার বিবেচনায় শুষ্ক বোধ হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হয় নাই। তিনি কৃষ্ণের চরিত্রে তদপেক্ষা চিত্তাকর্ষক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি 'গোপালকে' আপনার ইষ্টদেবতা বলিয়া গ্রহণ করেন,এবং বৃন্দাবনে গিয়া এক গোপালবিগ্রহ প্রকট করেন। এই সময়ে বৃন্দাবনের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। মুসলমানদের অত্যাচারে কৃষ্ণোপাসকেরা আপনা-

দের দেব দেবীর প্রতিমা জলে বা জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিয়া পলায়ন করিয়াছিল। মাধব জঙ্গলের মধ্যে এক গোপালমূর্ত্তি কুড়াইয়া পাইয়া তাহা প্রকট করেন। ইহাতে তাঁহাকে গোপাল-মন্ত্রের উপাসক বলিয়া মনে হয়।

আপন সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদ মত পরিত্যাগ করায়, মাধবকে এক জন স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। যে মতে আমাতে তোমাতে, কিংবা আমাতে ও গৃহের প্রকারে, এবং আমাতে ও ঈশ্বরে কোনও ভেদ নাই, সে মত বড়ই জটিল বলিয়া মনে হয়। আমাতে ও ঈশ্বরে যদি কোনও ভেদ না থাকে, তবে নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর নাই। অদ্বৈতবাদ মত বৌদ্ধগণের নাস্তিবাদখণ্ডনের জন্য শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু অদ্বৈতবাদ ও নাস্তিকতায় যে কি ভেদ আছে, তাহা বুঝা দুষ্কর। ঘোর নাস্তিকও নিজের অস্তিত্বে সন্দিহান হইতে পারে না। যদি নিজের অস্তিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব হয়, তবে ঈশ্বর নাই, আমিই আছি, ইহা সহজ কথা। আর নিজের সামর্থ্য ও প্রকৃতি স্মরণ করিয়া আমিই ঈশ্বর বলিয়া বুদ্ধিমান লোকে যে কি প্রকারে ভ্রান্ত হইতে পারে, ইহা বুঝিয়া উঠা দায়।

ফলতঃ পৃথিবীতে এরূপ উদার স্বভাব লোক অনেক আছেন, যাঁহারা দুর্ব্বোধ কথাকে গভীর সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া লন। যে কথা হঠাৎ বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হয় না, অশেষ চেষ্টাতেই যাহা হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য, তাহাই তাঁহাদের মতে ধ্রুব সত্য। তাঁহাদিগকে শুধু একবার বুঝাইয়া দিলেই হইল যে, তোমরা যাহা দেখিতেছ বলিয়া ভাব, বাস্তবিক তাহার মানসিক অস্তিত্ব ভিন্ন বাহ্য অস্তিত্ব নাই। তখন তোমার পাণ্ডিত্যে তাঁহারা মুগ্ধ হইবেন। তোমাকে অগাধ পণ্ডিত ও দুরূহ সত্যের আবিষ্কারকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহাদের কোনও বাধা থাকিবে না। তাহার পর তুমি যদি বল, অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, পৃথিবীতে জ্ঞান ভিন্ন বাহ্যবস্তু আর কিছুই নাই, তখন সে সিদ্ধান্ত অসিদ্ধান্ত কি না, তাহা তাঁহাদের নিশ্চয় করিবার শক্তি নাই; তাহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহারা অঙ্গীকার করিয়া লইবেন, কারণ, তোমার অগাধ পাণ্ডিত্যের জ্যোতিতে তাঁহাদের চক্ষু ঝলসাইয়া যাইবে। কিন্তু চক্ষে দেখিতেছি কঠিন, তরল, শ্বেত কৃষ্ণ ইত্যাদি অসংখ্য বাহ্যবস্তু রহিয়াছে, সে সব কি? উহাই অগাধ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। উহা হইতে তুমি জন্মিয়াছ, উহাতেই তুমি মিশিয়া যাইবে; এক্ষণেও তুমিই উহা। অতএব সপ্রমাণ হইল, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।

এক্ষণে এই পাণ্ডিত্যের অবগুণ্ঠনমোচনে যত্নবান হইলে মূল প্রবন্ধ হইতে

দূরে যাইতে হয়। এখানে এই পর্য্যন্ত লিখিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, মাধবের বিবেচনায়, এই "তত্ত্বমসি" বাক্য অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। মরিয়া কি না আমি একটা গাছ হইব বা মাটি হইব, ইহা তাহা যে তাঁহার হৃদয়ে বড়ই নীরস বোধ হইল। গাছকে "ব্রহ্ম" বলিলেই বা কি? গাছ, সেই গাছ। কোন সহৃদয় ব্যক্তি মরিয়া গাছে পরিণত হইতে ইচ্ছা করে? গাছ পাথরের ন্যায় ব্রহ্মে মিশাইয়া গেলে যদি আমাদের স্বাধীন অস্তিত্বের সহিত স্বাধীন আনন্দানুভবের ঐকান্তিক অভাব হয়, সে কি ভয়ানক দুরদৃষ্ট! যদি আমি ব্রহ্ম হই, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি যে, আমি তাদৃশ অবস্থা কামনা করি না। মাধব এই দৃঢ় সত্য হৃদয়ঙ্গম করিলে, অদ্বৈতবাদ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ তাঁহার হৃদয় হইতে অপসৃত হইয়া গেল। যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি অবশ্যই সবিশেষ, অর্থাৎ আমা হইতে ও সংসার হইতে পৃথক। তাঁহাতে লীন হওয়ায় সুখ নাই, তাঁহার সহিত মিলনেই সুখ। আমরা এক্ষণে ঈশ্বরের দর্শনলাভে বঞ্চিত। কিন্তু একদা তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অধিকারী হইব। এই বিষম সংসারক্লেশের মধ্যেই আত্মার বিলোপ হইবে না। পরন্তু পরলোকে ইহার জন্য ঈশ্বর বিমিশ্র সুখের স্থানের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বরে লীন হওয়া অপেক্ষা এই বিশ্বাস মাধবের পক্ষে সরস ও উপাদেয় বলিয়া বোধ হইল।

মাধব শঙ্করের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদকে বিসর্জ্জন দিয়া যখন সবিশেষ ব্রহ্মবাদ অঙ্গীকার করিলেন, তখন ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণই মনুষ্যকল্পিত ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ চিত্র বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল। তখন তিনি গোপাল-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া এক জন ভাগবত হইলেন। বৃন্দাবনে গোপালমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন, এবং এই জীবনের শেষে কবে গোপালকে প্রত্যক্ষ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ করিবেন, সেই চিন্তাতেই মগ্ন থাকিতেন। পরলোকে বেদে "যদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং," তাহা মাধবের ভাষায় "মধুরা" বা মথুরা। বিশ্বব্যাপী মাধুর্য্যের উৎস তথায় বিরাজমান। আর সেই "মধুরার" যিনি ঈশ্বর, তিনিই মাধবের "মথুরানাথ"।

মাধবের শেষদশায় চিত্র এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।—তাঁহার অনেক শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে এক জনের নাম রামচন্দ্র পুরী। ইনি মাধবের ন্যায় "তত্ত্বমসি" মত পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এবং মাধব যখন সবিশেষব্রহ্মবাদী, রামচন্দ্র তখনও নির্ব্বিশেষব্রহ্মবাদী, এবং ব্রহ্মে লীন হওয়াই শ্রেষ্ঠ সাধ্য বস্তু, বলিয়া

অদ্বৈতবাদ বিসর্জ্জন দিয়া ভাগবত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। মতভেদ হওয়ায় স্বভাবতঃই শেষে মাধবকে পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তি করিতেন না। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে সমধিক ভক্তি করিতেন, এবং শেষ দশায় মাধব যখন একান্ত রুগ্ন হইলেন, তখন তাঁহার সেবা সুশ্রূষা করিতেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, মাধব অযাচক সন্ন্যাসী ছিলেন।—মধ্যে মধ্যে উপবাসে তাঁহার দিনযাপন হইত। কোনও গ্রামে বা মঠে গিয়া তিনি অনাহারে বসিয়া আছেন দেখিলে তত্রত্য লোকেরা তাঁহার নিরীহ ভাবে মুগ্ধ হইত, এবং সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তির আতিশয্যবশতঃ তাঁহাকে আহার সামগ্রী আনিয়া দিত। পরে তিনি খ্যাতিলাভ করিলে যখন সকলে তাঁহাকে চিনিতে পারিল, তখন তাঁহাকে দেখিলেই লোক ভক্তিভাবে নানা দ্রব্য উপহার দিত। তাহাতেই তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। তিনি হৃদয়াবেগে নানা স্থানে পর্য্যটন করিতেন; এক স্থানে থাকিতে পারিতেন না। এইরূপে তাঁহার শেষ দশা উপস্থিত হইলে তাঁহার লালনপালনের ভার শিষ্যদের হস্তে পড়িল। ঈদৃশ অবস্থায় একদা রামচন্দ্র পুরী তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্র পুরী করে অন্তর্ধান।
"রামচন্দ্র পুরী তবে আইলা তাঁর স্থান॥
"পুরী গোসাঞী করে কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন।
"'মথুরা না যাইনু' বলি করেন ক্রন্দন॥
"রামচন্দ্র পুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
"শিষ্য হইয়া গুরুরে কহে ভয় নাহি করে॥
"'তুমি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
"ব্রহ্মবিদ হইয়া কেন করহ রোদন'॥
"শুনি মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
"'দূর দূর পাপী' বলি ভর্ৎসনা করিল॥
"'কৃষ্ণ না পাইনু মুই না পাইনু মথুরা।
"আপন দুঃখে মরোঁ। এই দিতে আইল জ্বালা॥
"মোরে মুখ না দেখাবি যা তুই যথি তথি।
"তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি॥
"কৃষ্ণ না পাইনু মুই মরোঁ আপন দুঃখে।
"মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে॥'
"এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল।
"সেই অপরাধে ইহার বাসনা জন্মিল॥
"শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ।
"সর্ব্বলোকে নিন্দা করে নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ॥
"ঈশ্বর পুরী করেন শ্রীপাদসেবন।
"স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদিমার্জ্জন॥
"নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন স্মরণ।
"কৃষ্ণলীলা শ্লোক শুনান অনুক্ষণ॥
"তুষ্ট হইয়া পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
"বর দিলেন কৃষ্ণ তোমার হউক প্রেমধন॥
"সেই হইতে ঈশ্বর পুরী প্রেমের সাগর।
"রামচন্দ্র পুরী হইল সর্ব্বনিন্দাকর॥

* * *

"সদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান।
"এই শ্লোক পড়ি তেঁহ কৈল অন্তর্ধান॥

" অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
" মথুরানাথ কদাবলোক্যসে ॥
" হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
" দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥

" এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ।
" কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাববিশেষ ॥
" পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
" সেই প্রেমাঙ্কুরে বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর ॥

মাধবেন্দ্রের এই শেষ চিত্র অতীব হৃদয়গ্রাহী। 'অয়ি দীন' শ্লোকটি তাঁহারই নিজের রচনা, এবং ইহা তাঁহার হৃদয়ের অগাধ ভাব এরূপ সরলভাবে প্রকাশিত করিয়াছে যে, পাঠ করিলেই আমাদিগকে তন্ময় হইতে হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে এরূপ অমূল্য রত্ন অতি বিরল। তদ্গত হইয়া এই শ্লোক পাঠ করিলে চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারা নির্গত না হয়, এমন মানব বোধ করি অত্যন্ত বিরল।

প্রতারিকা।

চিত্রকর ডি—এক দিন বলিলেন, "আমি কেবলমাত্র এক জনকেই ভাল-বাসিয়াছিলাম। তাহার সহবাসে পাঁচ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন সুখ, সাফল্য ও একান্ত শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। সে কাছে থাকিলে কাজ এমন অনায়াসসাধ্য এবং কল্পনা এমন উদ্দীপনাময়ী হইত যে, বলিতে গেলে সে-ই আমার বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠার মূল। প্রথম দর্শনেই মনে হইয়াছিল, স্মরণাতীত কাল হইতেই সে যেন আমারই। তাহার রূপরাশি, তাহার চরিত্রগৌরব, আমার সমস্ত কল্পনাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিয়াছিল। সে আমায় কখনও পরিত্যাগ করে নাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভালবাসিয়া, আমারই গৃহে, আমারই অঙ্কে চিরনিদ্রিত হইয়াছিল। তথাপি যখন তাহার কথা আমার মনে হয়, তখনই ক্রোধে হৃদয় জ্বলিয়া উঠে। সে কমনীয় ও রমণীয় তনুলতা, ইহুদী নারীর মত সুঠাম গঠন, আরক্ত কপোলতল, সুগোল কোমল মুখমণ্ডল, দৃষ্টির অনুরূপ কোমল মধুর বচন—সেই পাঁচ বৎসর ধরিয়া যেমন দেখিয়াছিলাম, মনে পড়িলে, নিদারুণ ক্রোধে বলিয়া ফেলি, 'আমি তোমায় ঘৃণা করি'।

"তাহার নাম ক্লটিলডি। আমাদিগের মিলনস্থল বন্ধুবান্ধবদিগের গৃহে সে মাদাম ডিলোটী নামে পরিচিতা ছিল। সেখানে সকলেই তাহাকে কোন বাণিজ্যপোতাধ্যক্ষের বিধবা পত্নী বলিয়া জানিত। বাস্তবিক ক্লটিলডির কথা-

বার্ত্তা শ্রবণ করিলে বোধ হইত, সে অনেক দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছে। কথায় কথায় হয় ত কখন বলিয়া ফেলিত 'যখন আমি ট্যাম্পিকোয় ছিলাম'; কখনও বা বলিত, 'আমি একবার ভ্যালপা রাইসো বন্দরে গিয়াছিলাম; ইত্যাদি। ইহা ছাড়া তাহার কথা, হাবভাব কিংবা ব্যবহারে বিদেশভ্রমণের লেশমাত্র চিহ্ন ছিল না। সে সুরুচিসঙ্গত পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকিত, এবং প্যারিসের সৌখীন রমণী ছিল। লোকে যেরূপ অঙ্গাবরণ দেখিলে সৈনিক ও নাবিকের পত্নী বলিয়া চিনিতে পারে, তাদৃশ কোনও ভ্রমণবেশ সে কখনও পরিধান করিত না।

"যখনই বুঝিতে পারিলাম, তাহাকে ভালবাসিয়াছি, তখনই তাহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষ করিলাম। এক জন আমার পক্ষ হইতে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন; কিন্তু উত্তরে সে এইমাত্র বলিল, 'আমি আর কখনও বিবাহ করিব না।' সেই দিন হইতে আমি আর ইচ্ছা করিয়াই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম না। যখন আমার চিত্ত তাহার চিন্তায় একেবারে নিমগ্ন হইল, তখন কাজকর্ম্ম একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। আমি দেশভ্রমণের সংকল্প করিলাম। যাত্রার আয়োজনে বিশেষরূপ ব্যস্ত আছি, এমন সময় একদিন প্রভাতে মাদাম ডিলোটী আমার পরম বিস্ময় উৎপাদন করিয়া আমার কক্ষে মুক্ত ড্রয়ার সমূহ ও ইতঃস্তত-বিক্ষিপ্ত তোরঙ্গের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছ কেন? আমায় ভালবাস ব'লে কি? আমিও ভালবাসি।'—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।—'কিন্তু আমি বিবাহিতা।' তাহার পর সে তাহার জীবনের ইতিহাস আমাকে শুনাইল।

"সে এক প্রেম ও পলায়নের কাহিনী। তাহার স্বামী তাহাকে মাতাল হইয়া প্রহার করিত। তিন বৎসর পরে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইল। তাহার স্বজনবর্গ প্যারিসের মধ্যে বেশ সম্ভ্রান্ত ছিলেন। সে জন্য সে বিলক্ষণ আত্ম-গৌরব অনুভব করিত। কিন্তু বিবাহের পর হইতেই তাহার স্বজনবর্গ তাহার সহিত আলাপ ব্যবহার বন্ধ করিয়াছিলেন। সে প্রাগুও রাবির * ভ্রাতুষ্পুত্রী। তাহার ভগিনী কোনও উচ্চপদস্থ সৈনিকের বিধবা পত্নী; সেণ্টজর্ম্মানের অরণ্যভূমির প্রধান রক্ষককে পুনরায় বিবাহ করিয়াছিল। আর সে স্বামী কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইলেও ভাগ্যক্রমে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আপনার

---

* রাবি—ইহুদী সম্প্রদায়ের পুরোহিত।

আয়বৃদ্ধি করিবার উপযোগী কতকগুলি গুণও তাহার ছিল। সে চসী-ডি-এণ্টিন ও ফবার্গ সেণ্টহেনরী প্রভৃতি স্থানের ধনকুবেরদিগের গৃহে সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী ছিল; সুতরাং জীবিকানির্ব্বাহ যোগ্য প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত।

"দীর্ঘ হইলেও কাহিনীটি বড় মর্ম্ম-স্পর্শী, এবং রমণীসুলভ কথোপকথনে অপরিহার্য্য, সুন্দর, মধুর, পুনরুক্তিতে পরিপূর্ণ। বাস্তবিক গল্পটি শেষ করিতে তাহার কয়েক দিন কাটিয়া গেল। বিজন পথ ও প্রশান্ত প্রান্তরের মধ্যস্থিত এভিনিউ ডি ইম্প্যারাট্রাইসে আমাদের উভয়ের জন্য একটি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। তাহার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার কথা শুনিতে শুনিতে আমি বৎসরপরিমিত কাল অতিবাহিত করিতে পারিতাম। কাজের কথা মনে পড়িত না। সেই আমায় প্রথমে চিত্রশালায় পাঠাইয়া দিল। আমি কিন্তু তাহাকে শিক্ষাদান কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে পারিলাম না। উন্নত ভাবে জীবন-যাপন সম্বন্ধে তাহার আগ্রহ দেখিয়া আমি বিচলিত হইয়াছিলাম। 'স্বোপার্জ্জিত দ্রব্য ভিন্ন কোন জিনিসই গ্রহণ করিব না,' তাহার মুখে এইরূপ স্পষ্ট কথা শুনিয়া আমি আপনাকে কথঞ্চিৎ আত্ম-সম্ভ্রমচ্যুত মনে করিলাম বটে, কিন্তু, তাহার তেজস্বিতার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সমস্ত দিন আমরা স্বতন্ত্র স্থানে থাকিতাম; আবার সন্ধ্যাকালে উভয়ে আমাদের ক্ষুদ্র গৃহটিতে মিলিত হইতাম।

"কি আনন্দেই আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম! তাহার গৃহে ফিরিতে কালবিলম্ব হইলে আমি কত না অধীর হইতাম, এবং আমার বাটী আসিবার পূর্ব্বে সে গৃহে ফিরিলে কত না সুখী হইতাম! প্যারিস হইতে প্রত্যা-বর্ত্তনকালে সে আমায় সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ আনিয়া দিত। কতবার আমি তাহাকে কতরূপ উপহারদ্রব্য গ্রহণ করিবার জন্য নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করিতাম; কিন্তু, সে হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিত, 'তোমার অপেক্ষা আমার অবস্থা অনেক স্বচ্ছল। বাস্তবিক শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে তাহার বেশ উপার্জ্জন ছিল। সে সর্ব্বদাই বহুমূল্য সুচারু পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকিত— আপনার দেহ-বর্ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সে যে সকল কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ মনোনীত করিয়াছিল, তাহা মখমলের চারু কোমলতা ও শাটিনের উজ্জলতায় মণ্ডিত ছিল। দর্শনমাত্র পরিচ্ছদের সেই অযত্ন-বিন্যস্ত শাটিন ও লেসের সংমিশ্রণ দর্শকের বিস্ময়-বিহ্বল নয়নে প্রতিভাত হইত। সে বলিত, তাহার কার্য্য আদৌ শ্রমসাধ্য নহে। তাহার ছাত্রীগণ কেহ বা ব্যাঙ্কের সত্বাধিকারীর

কন্যা, কেহ বা দালালের কন্যা। ছাত্রীরা তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিত, ভালবাসিত। কতবার সে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ উপহাররূপে প্রাপ্ত বলয় ও অঙ্গুরীয়ক আমাকে দেখাইত। কেবল কাজের সময় ভিন্ন আমরা কেহ কাহারও সঙ্গত্যাগ, কিংবা একাকী কোনও স্থানে গমন করিতাম না। কেবল রবিবারে সে তাহার ভগিনী প্রধান বনরক্ষকের পত্নীর সহিত সেণ্টজার্ম্মানে সাক্ষাৎ করিতে যাইত। ভগিনীর সহিত এখন তাহার আর কোনও মনোমালিন্য ছিল না। আমি ষ্টেশন অবধি তাহার সঙ্গে যাইতাম। সে আবার সেই দিনই ফিরিয়া আসিত। প্রায়ই গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিবসে পথিমধ্যে কোনও নদীতট অথবা বনমধ্যস্থ ষ্টেশনে উভয়ে মিলিত হইবার পরামর্শ করিয়া রাখিতাম। সে বালকবালিকাদিগের সুন্দর আকৃতি ও তাহাদের পারিবারিক সুখ-শান্তির কত গল্প করিত। গ্রহবৈগুণ্যে গৃহ-সুখবঞ্চিতা সেই রমণীর অবস্থা স্মরণ করিয়া তাহার জন্য হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। তাহার ন্যায় রমণীর পক্ষে তাদৃশ যন্ত্রণাকর অবস্থার সত্যটুকু ভুলাইয়া দিবার জন্য আমার স্নেহ দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিত।

" 'তে হি নো দিবসা গতঃ'—তখন অবিশ্বাসের ছায়ামাত্র ছিল না। কত উৎসাহেই আমি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতাম। অন্তরে সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না। তাহার কথা ও কাহিনী এত সত্য ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত! কেবল এক বিষয়ে আমি তাহার নিন্দা করিতাম। যে সকল বাটীতে তাহার গতিবিধি ছিল, এবং যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে সে শিক্ষাদান করিত, তৎসম্বন্ধে গল্প আরম্ভ করিলে, সে আপনার বক্তব্য বিষয়গুলি অপর্য্যাপ্ত বর্ণনাবাহুল্য ও কাল্পনিক আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিত; কিন্তু মূল আখ্যায়িকার সহিত এই সকল অবান্তর বিষয়ের কোনও সংস্রবই থাকিত না। স্বয়ং অবিচলিত থাকিয়া আপনার চারি পার্শ্বে কেবলই উপন্যাসের সৃষ্টি করিত। নাটকীয় ঘটনার রচনায় তাহার জীবন অতিবাহিত হইত। এই সকল কল্পনা আমার সুখে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। আমি কেবল তাহাকেই সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য সমাজ সংসার সব ত্যাগ করিতে চাহিতাম; কিন্তু দেখিতাম, সে তুচ্ছ বিষয়ে একান্ত লিপ্ত রহিয়াছে। যাহা হউক, যাহার পূর্ব্বজীবন একটি বিষাদপূর্ণ উপন্যাসের মত, এবং ভবিষ্যৎ জীবন আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সেই মন্দভাগিনী যুবতীর এ ত্রুটী আমি সহজেই মার্জ্জনা করিতে পারিতাম।

"কেবল একবারমাত্র একটা সন্দেহ অথবা ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্ব্বাভাস আমার

মনে উদিত হইয়াছিল। এক রবিবার রাত্রে সে আর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল না। আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। কি করিব? সেণ্টজার্ম্মানে যাইব কি? হয় ত তাহাতে লোকে তাহার চরিত্রে সন্দিহান হইবে। মানসিক যন্ত্রণা ও উদ্বেগে অতিকষ্টে রাত্রিযাপন করিয়া আমি প্রভাতে যাত্রা করিব স্থির করিতেছি, এমন সময়ে সে ক্লান্তদেহে পাণ্ডুমুখে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার ভগিনী পীড়িতা, সুশ্রূষা করিবার জন্য কাজেই সেখানে তাহাকে রাত্রি-বাস করিতে হইয়াছিল। পঁহুছিবার সময়ে রেলওয়ে গার্ডের অভদ্রতার, ট্রেন আসিতে বিলম্ব প্রভৃতির কথা, যাহা প্রধান জিজ্ঞাস্য বিষয়টিকে কাল্পনিক বচন-বন্যায় ডুবাইয়া দিতেছিল, এবং যে কথাগুলি সে সামান্য প্রশ্নমাত্রে বলিয়া যাইতেছিল, সেই বচনবাহুল্যে অণুমাত্র সন্দেহ না করিয়া আমি তাহার সমস্ত কথাই বিশ্বাস করিয়া লইলাম। সেই সপ্তাহে সে দুইবার কি তিনবার সেণ্ট-জার্ম্মানে রাত্রিযাপন করিয়াছিল। তাহার পর ভগিনী আরোগ্যলাভ করিলে সে আবার পূর্ব্ববৎ নিয়মিতভাবে শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

"দুর্ভাগ্যক্রমে এই ঘটনার অল্প দিন পরেই সে নিজে পীড়িতা হইয়া পড়িল। একদিন অধ্যাপনাশেষে সে কম্পিত, ঘর্ম্মাপ্লুত, জ্বরতপ্ত দেহে গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ উপস্থিত হইল। প্রথম হইতেই রোগ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, এবং অচিরে ডাক্তার বলিলেন, আর আশা নাই। নৈরাশ্যে আমি উন্মত্তপ্রায় হইলাম। তখন কেবল তাহার জীবনের চরম মুহূর্ত্ত শান্তি-স্নিগ্ধ করিবার কথাই আমার মনে উঠিতেছিল। যে আত্মীয় স্বজনকে সে অত ভালবাসিত, যাঁহাদের কথা মনে করিয়া সে ততখানি আত্মগৌরব উপভোগ করিত, আমি তাঁহাদিগকে তাহার অন্তিম শয্যার পার্শ্বে লইয়া আসিব। তাহাকে কোনও কথা না বলিয়া আমি সেণ্ট-জার্ম্মানে তাহার ভগিনীর নিকটে পত্র লিখিলাম, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার খুল্লতাত প্রধান রাবির নিকট চলিয়া গেলাম। কিরূপ অসময়ে আমি তাঁহার গৃহে উপনীত হইয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণই হয় না। অতর্কিত বিপৎপাতে জীবন এমনই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, এবং সব এমন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। বোধ হয়, সদাশয় রাবি তখন আহারে বসিয়াছিলেন। বিস্মিত ও কুতূহলী হইয়া তিনি আমার সহিত আলাপ করিবার জন্য বাহিরের প্রকোষ্ঠে আসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম 'মহাশয়! মানুষের জীবনে এমন সময়ও আছে, যখন সকল রোষ ও ঘৃণা বিসর্জ্জন দিতে হয়।'

"তিনি বার্দ্ধক্যমহিমাপূর্ণ মুখখানি আমার দিকে ফিরাইয়া বিহ্বল-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেন।

"আমি আবার বলিলাম—'আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর মরণকাল উপস্থিত।' 'আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী! আবার ত কোন ভ্রাতুষ্পুত্রী নাই! আপনার ভুল হইয়া থাকিবে।'

"'মহাশয়, মিনতি করি, এখন সমস্ত ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আমি মাদাম ডিলোটির কথা বলিতেছি;—তাঁহার স্বামী কাপ্তেন—"

"'আমি মাদাম ডিলোটীকে চিনি না, বাপু! তোমার ভুল হইয়াছে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি।'

"তিনি আমাকে প্রবঞ্চক অথবা উন্মাদগ্রস্ত মনে করিয়া ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে ঠেলিয়া দিলেন। বাস্তবিক সে সময়ে সকলেই আমাকে অদ্ভুত লোক মনে করিয়াছিল। যে কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত, অতি ভয়ানক। তবে ত সে আমার নিকট মিথ্যা পরিচয় দিয়াছে। কেন? সহসা একটা কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। যে ছাত্রীদের কথা সে সর্ব্বদা বলিত, তাহাদের মধ্যে জনৈক বিখ্যাত ব্যাঙ্কসত্ত্বাধিকারীর কন্যার বাড়ীতে যাইবার জন্য গাড়োয়ানকে বলিলাম। সেখানে চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম'। 'মাদাম ডিলোটী আছেন?'

"'ও নামের কেহ ত এখানে থাকেন না।'

"'হাঁ, তা ত জানি; তিনি না তোমাদের বাড়ীর মহিলাদিগকে গান শেখান?'

"'আমাদের বাড়ীতে মহিলাদের কথা একটি পিয়ানোও নাই।' সে সক্রোধে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।'

"আমি আর কোনও অনুসন্ধান করিলাম না। নিশ্চিত বুঝিলাম, অন্যত্র প্রশ্নের ঐরূপ উত্তরই মিলিবে।

"গৃহে পঁহুছিবামাত্র সেণ্টজর্ম্মান পোষ্টাফিসের মুদ্রাযুক্ত একখানি পত্র পাইলাম। লিপির বিষয়টি সহজেই অনুমান করিয়া পত্র খুলিলাম। প্রধান বনরক্ষক মাদাম ডিলোটীর কোনও কথাই জানেন না। অধিকন্তু তাঁহার স্ত্রী পুত্রও নাই।

"এইটিই শেষ আঘাত। তবে ত পাঁচ বৎসর ধরিয়া সে যত কথা বলিয়াছিল সে সমস্তই মিথ্যা। সহস্র ঈর্ষাপূর্ণ চিন্তা আমার হৃদয় অধিকার

করিল। কি করিতে যাইতেছি, কিছুই না বুঝিয়া, আমি মুমূর্ষুর গৃহে প্রবেশ করিলাম। যে সকল প্রশ্ন আমায় যন্ত্রণা দিতেছিল, তাহা পীড়িতের শয্যার উপর একেবারে বর্ষিত হইল।—'কেন তুমি রবিবারে সেণ্টজার্ম্মানে যাইতে? কোথা তুমি দিনযাপন করিতে? কোথা রাত্রিবাস করিতে? বল, উত্তর দাও।' তাহার প্রকৃত কাহিনী জানিবার জন্য আমি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার মুখোপরি নত হইয়া তথনও তাহার গর্ব্বস্ফুরিত সুন্দর লোচনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে নির্ব্বাক ও নিশ্চল হইয়া রহিল।

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলাম, 'তুমি কথনও কাহাকেও শিক্ষা দাও নাই। আমি সকল স্থানেই গিয়াছিলাম। কেহই তোমায় চেনে না! টাকা কোথা হইতে আসিত? লেস্, অলঙ্কার, এ সব তুমি কোথায় পাইতে?" সে শুধু নিরাশাপূর্ণ বিষণ্ণদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। আর কিছু বলিল না। সত্য বলিতে গেলে আমার তাহাকে ক্ষমা করিয়া শান্তিতে মরিতে দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু আমি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতাম, সুতরাং আমার ঈর্ষ্যা করুণা অপেক্ষা বলবতী হইয়াছিল। আমি আবার বলিতে লাগিলাম, "পাঁচ বৎসর ধরিয়া তুমি আমাকে প্রতারিত করিয়াছ। প্রতিদিন প্রতিদণ্ডে তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। তুমি আমার জীবনের সমস্তই জানিতে, কিন্তু আমি তোমার কিছুই জানিতাম না। কিছুই না, কিছুই না,—এমন কি, তোমার নামটি পর্য্যন্ত জানিতাম না। ও নাম তোমার নহে; তুমি যে নামে পরিচিতা, সে কি সত্যই তোমার প্রকৃত নাম? হা মিথ্যাবাদিনী! কি? সে মরিতে বসিয়াছে, কিন্তু এথনও আমি তাহার নামটিও জানি না। বল, বল তুমি কে? তুমি কোথা হইতে আসিয়াছিলে? কেন তুমি আমার জীবনে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলে? বল, একটুও বল।'

"ব্যর্থ চেষ্টা! উত্তর দিবার পরিবর্ত্তে পাছে তাহার অন্তিম দৃষ্টি জীবনের গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দেয়, এই মনে করিয়াই যেন সে অতিকষ্টে প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইল। এইরূপে হতভাগিনীর জীবনলীলা শেষ হইয়া গেল। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে মিথ্যাবাদিনী রহিয়া গেল। *

শ্রীসতীশচন্দ্র বসু।

উত্তর রাঢ়ের মহীপাল।

মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ-নলহাটী শাখা রেলপথের বাড়ালা ষ্টেশন হইতে সার্দ্ধ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে এবং মুর্শিদাবাদের অন্যতম প্রসিদ্ধ স্থান গয়সাবাদ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে মহীপাল নামে একটি গ্রাম বিদ্যমান আছে। এই মহীপাল গ্রামে কতকগুলি প্রাচীন ভগ্নস্তূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং ইহার চারি পার্শ্বে প্রায় তিন চারি ক্রোশ বিস্তৃত স্থান একটি মহানগরীর ভগ্নাবশেষ বলিয়া প্রতীত হয়। অগণ্য মৃৎপাত্রচূর্ণ ও স্থানে স্থানে অরণ্যমধ্যে নিহিত সৌধভিত্তির চিহ্ন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই মহীপাল হইতে প্রায় সার্দ্ধ তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে সাগরদীঘি নামে এক প্রকাণ্ড দীঘি আছে। সাগর-দীঘি দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ হইবে। এরূপ বিশাল দীঘি মুর্শিদাবাদে আর দ্বিতীয় নাই। সাগরদীঘির নামানুসারে তথায় একটি রেলওয়ে ষ্টেশনও স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত মহীপাল নগর ও সাগরদীঘি পালবংশীয় রাজা মহীপাল কর্ত্তৃক স্থাপিত ও খনিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাগরদীঘি সম্বন্ধে একটি শ্লোক লোকমুখে শ্রুত হওয়া যায়। পূর্ব্বে তাহা দীঘীর ঘাট-সংলগ্ন প্রস্তরফলকে লিখিত ছিল বলিয়া শুনা গিয়া থাকে। উক্ত শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাগরদীঘি পালবংশীয়দিগের দ্বারা খনিত হয়, এবং সাধারণ প্রবাদ এই যে, তাহা পালবংশীয় রাজা মহীপালেরই কীর্ত্তি। উক্ত মহীপাল সম্বন্ধে যত দূর জানা গিয়াছে, আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রাচীন ইতিহাসের পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে, পালবংশীয় রাজগণ এক কালে মগধে রাজত্ব করিতেন। পরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাঁহাদের করায়ত্ত হইলে রাঢ়-বঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজত্ব পরিব্যাপ্ত হয়। পালবংশীয়দিগের বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপাল, মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করেন। সেই সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে শূরবংশীয় আদিশূর বা জয়ন্তের পুত্র ভূশূর রাজত্ব করিতেন। আদিশূরের সময় কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন হয়। ধর্ম্মপাল ভূশূরের নিকট হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করিলে, ভূশূর রাঢ়দেশে নূতন পুণ্ড্র নগর স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত পুণ্ড্র

নগর দক্ষিণরাঢ়ে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া স্থির হয়। (১) প্রথমে সমগ্র রাঢ় প্রদেশই শূরবংশীয়দিগের অধীন ছিল। ক্রমে উত্তর রাঢ় তাঁহাদের হস্তচ্যুত হওয়ায় পালবংশীয়েরা তাহা অধিকার করেন। মহীপালদেব উক্ত উত্তর রাঢ়ে রাজত্ব করিতেন, তাহাও অবগত হওয়া যায়। মহীপাল উত্তর রাঢ়ে নিজের নামানুসারে যে নগর স্থাপিত করেন, তাহা ক্রমে ৩।৪ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বহুসংখ্যক অট্টালিকা ও মন্দিরাদি দ্বারা ভূষিত হইয়াছিল। মহীপাল দেবের প্রাসাদের ও অন্যান্য অনেক সৌধাদির চিহ্ন মহীপাল ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ স্থান গয়সাবাদ পূর্ব্বে মহীপাল নগরেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল; পরে, মহীপালের ইষ্টক প্রস্তরাদি দ্বারা, পাঠান রাজত্বকালে তাহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। এই গয়সাবাদ ও মহীপালের নিকটস্থ স্থান হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লেয়ার্ড একটি দ্বাদশহস্তযুক্ত প্রস্তরমূর্ত্তি, কতকগুলি পালি অক্ষরে খোদিত প্রস্তরফলক ও মুদ্রা এসিয়াটিক মিউজিয়মে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত দ্বাদশহস্তযুক্ত মূর্ত্তি বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করিয়া থাকেন। অদ্যাপি মহীপাল ও গয়সাবাদে অনেক ভগ্নস্তূপ ও প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মপাল যে পালবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উত্তর রাঢ়ের মহীপালও সম্ভবতঃ সেই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ধর্ম্মপালের সহিত তাঁহার কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল কি না, বুঝা যায় না। ধর্ম্মপালের পর যে সকল পালবংশীয় রাজা গৌড়ের একাধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহারা ধর্ম্মপালের অনুজ বাক্‌পাল হইতে উদ্ভূত হন। পালবংশীয়দের তাম্রশাসনাদিতে এই মহীপালের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। অথচ সাগরদীঘির প্রস্তরফলকে লিখিত প্রচলিত শ্লোক হইতে তাঁহাকে পালবংশীয় বলিয়া জানিতে পারা যায়। শ্লোকে মহীপালদেবের নাম নাই; তাহাতে সাগরদীঘি পালবংশকৃত খাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণে তাহাকে মহীপালের খনিত দীঘি বলিয়াই ব্যক্ত করিয়া থাকে। এই প্রবাদ পুরুষপুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। মহীপালের রাজধানী মহীপাল নগরের নিকটে হওয়ায় সাগরদীঘি মহীপালের খনিত বলিয়াই প্রতীত হয়। সুতরাং সাগরদীঘির শ্লোকানুসারে মহীপালদেব পালবংশীয়ই হইতেছেন। আবার ধর্ম্মপাল ও মহীপাল সমসাময়িক বলিয়া জানিতে

(১) কেহ কেহ হুগলী জেলার পাণ্ডুয়াকে ভূশূর-স্থাপিত নূতন পুণ্ড্র বলিয়া অনুমান

পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ রাজেন্দ্রদেব বা কোপ্পরকেশরীর দিগ্বিজয়জ্ঞাপক তিরুমলয়ের গিরিলিপি-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজেন্দ্র চোল বিহার, রাঢ়, বঙ্গ প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন। সে সময়ে দণ্ডভুক্তি বা দণ্ড-বিহারে (বর্ত্তমান বিহারে) ধর্ম্মপাল, উত্তর রাঢ়ে মহীপাল, দক্ষিণ রাঢ়ে (২) রণশূর ও বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেন। উক্ত নৃপতিগণ রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মপাল প্রথমে মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, পরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করেন। তাহা হইলে তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে মগধ বা বিহারেরই অধীশ্বর হইতেছেন। পাল-বংশীয়দিগের বিবরণ হইতে কেবল একজনমাত্র ধর্ম্মপালের বিবরণ অবগত হওয়া যায়, এবং রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়সময়ে মগধে সেই সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-পালের রাজত্ব স্থির হওয়ায় উত্তর রাঢ়ের মহীপাল তাঁহারই সমসাময়িক বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই মহীপাল ব্যতীত আরও অনেক মহীপালের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (৩) তন্মধ্যে দুই জন মহীপাল ধর্ম্মপালের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মদনপালাদির তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত মহীপালদ্বয় ধর্ম্মপালের অনেক-পুরুষ-পরবর্ত্তী। রাজেন্দ্র চোলদেবের গিরি-লিপিতে উত্তর রাঢ়ের মহীপালকে ধর্ম্মপালের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করায়, এবং সাগরদীঘির শ্লোকোক্ত সময়ের সহিত ধর্ম্মপালের সময়ের সামঞ্জস্য হওয়ায়, উত্তর রাঢ়ের মহীপাল যে ধর্ম্মপালবংশীয় মহীপালদ্বয়ের অন্যতর হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। (৪) উত্তর রাঢ়ের মহী-পাল ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ও পালবংশীয় হইতেছেন; অথচ ধর্ম্মপালবংশের

---

(২) গিরিলিপির মূলে তক্কনলাঢ়ম্ ও উত্তরলাঢ়ম্ শব্দ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ তাহাকে গুজরাটের অন্তর্গত লাট বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। কিন্তু 'বঙ্গাল' দেশের সহিত তাহাদের উল্লেখ থাকায়, তাহাদিগকে দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ় বলিয়া স্থির করাই সঙ্গত।

(৩) গোয়ালিয়র, কনোজ প্রভৃতির রাজবংশেও মহীপাল নামে রাজার নাম দৃষ্ট হয়।

(৪) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বিশ্বকোষে পাল রাজবংশের প্রস্তাবে উত্তর রাঢ়ের মহীপালকে ধর্ম্মপালবংশীয় প্রথম মহীপাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। রাজেন্দ্র চোলের গিরিলিপি হইতে যখন ধর্ম্মপাল ও মহীপালকে সমসাময়িক বলিয়া বুঝা যাইতেছে, এবং সাগরদীঘির শ্লোকোক্ত সময়ের সহিত ধর্ম্মপালের সময়েরও যখন ঐক্য হইতেছে, তখন উত্তর রাঢ়ের মহীপালকে পালরাজবংশের প্রথম মহীপাল হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া

তালিকায় তাঁহার কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। এমন স্থলে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে প্রসিদ্ধ পালবংশে ধর্ম্মপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মহীপাল তাহারই অন্য এক শাখা হইতে উদ্ভূত হন, (৫) এবং ধর্ম্মপালের গৌড়-বিজয়ের পর তাঁহারই সাহায্যে উত্তর রাঢ়ে রাজত্ব আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজেন্দ্র চোলের গিরিলিপি হইতে জানা যায় যে, যে সময়ে ধর্ম্মপাল বিহারে ও মহীপাল উত্তর রাঢ়ে রাজত্ব করিতেন, সে সময়ে দক্ষিণ রাঢ় রণশূর নামক রাজার অধীন ছিল। এই রণশূর যে আদিশূর-বংশীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কুলজী গ্রন্থ হইতে আদিশূর, তৎপুত্র ভূশূর, ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূর ও ক্ষিতিশূরের প্রপৌত্র ধরাশূরের বিবরণ অবগত হওয়া যায়। কিন্তু রণশূরের কোনও বিবরণ জানিতে পারা যায় না। ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হারাইয়া যখন দক্ষিণ রাঢ়ে নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন, তখন রণশূর যে তাঁহার পরবর্ত্তী, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে, এবং তিনি যে ক্ষিতি-শূরেরও পরবর্ত্তী, তাহাও আলোচনার দ্বারা স্থির হইয়া থাকে। রাঢ়ীয় কুলজী গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, ক্ষিতিশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণকে ৫৬ খানি গ্রাম দান করেন, এবং সেই সেই গ্রাম হইতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ৫৬ গাঞির উৎপত্তি হয়। (৬) উক্ত ৫৬ খানি গ্রামের মধ্যে কতকগুলি উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত হওয়ায় (৭) তৎকালে উত্তর রাঢ় যে শূরবংশীয়দের অধীন ছিল, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। মহীপালদেবকে উত্তর রাঢ়ে রাজত্ব করিতে দেখিয়া এইরূপ অনুমান হয় যে, উত্তর রাঢ় পরে শূরবংশীয়দের হস্তচ্যুত হয়, এবং রণশূরকে কেবল দক্ষিণ রাঢ়ের রাজা বলিয়া উল্লেখ করায়, উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ব্রাহ্মণগণের স্থাপয়িতা ক্ষিতিশূর রণশূরের পূর্ব্ববর্ত্তীই হইবেন। সুতরাং

---

(৫) কাপ্তেন লেয়ার্ড উত্তর রাঢ়ের মহীপালকে সমুদ্রপালের বংশধর বলিয়া অনুমান করেন।—Asiatic Society's Journal, 1853, P. 518. এই সমুদ্রপাল এক জন যোগী ছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্যের ৯০ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহে প্রবেশ করিয়া ৫৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহাতে বিক্রমাদিত্যের ১৪৫ বৎসর রাজত্ব হয়।—Asiatic Researches, Vol. IX. P. 135. এই প্রবাদ ব্যতীত সমুদ্রপালের আর কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।

(৬) ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরস্য সুতেন চ। ক্রিয়ন্তে গাঞিসংজ্ঞানি তেষাং স্থান-বিনির্ণয়াৎ॥—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, ১১৬ পৃ।

(৭) যাঁহারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ভিন্ন ভিন্ন গাঞি কোন কোন গ্রাম হইতে হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান সময়ে সেই সকল গ্রামের অবস্থান কোথায়,—জানিতে চাহেন, তাঁহারা বঙ্গের

রণশূরকে ক্ষিতিশূরের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। রণশূরের রাজত্বের প্রথমে অথবা ক্ষিতিশূরের রাজত্বের শেষভাগে উত্তর রাঢ় মহীপালদেবের হস্তগত হয়। তিনি পালবংশীয় হওয়ায় তাঁহাদের অপর শাখা হইতে উদ্ভূত ধর্ম্মপালদেব যে তাঁহাকে উত্তর রাঢ়ের অধিকারে সাহায্য করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

এক্ষণে আমরা মহীপাল ও ধর্ম্মপালের সময়নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছি। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সাগরদীঘি মহীপালের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। উক্ত সাগরদীঘির যে শ্লোক প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্মহত্যার মুক্তির জন্য ৭৪০ শাকে পালবংশকৃত এই খাত খনিত হয়। উহার খননকার্য্যে ১০ সহস্র বর্ব্বর (কুলী), ৬ সহস্র খনক, ১০ লক্ষ ইষ্টক, দুই দুই লক্ষ তৃণ কাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং শত সহস্র গো, প্রত্যেক ব্যক্তিকে ষট্‌পলাধিক সুবর্ণ, অসংখ্য শীতবস্ত্র ও ধৌত বস্ত্র এবং ব্রাহ্মণদিগকে শালগ্রামের নিকট সশস্য ভূমি ও দক্ষিণা প্রদত্ত হয়। (৮) ৭৪০ শাকে সাগরদীঘী খনিত হইলে তাহার পূর্ব্বে যে মহীপাল উত্তর রাঢ়ে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজেন্দ্র চোলের গিরিলিপি অনুসারে ধর্ম্মপাল ও মহীপাল সমসাময়িক হওয়ায়, ধর্ম্মপালের সময় অবধারণ করিতে পারিলে, সাগরদীঘির শ্লোকোক্ত সময়ে মহীপাল বর্ত্তমান ছিলেন কি না, তাহা অনায়াসে বুঝা

---

(৮) "শাকে সপ্তদশাব্দীকে স্থিতে সাগরদীর্ঘিকা।
পালবংশকৃতং খাতং ব্রহ্মহামুক্তিহেতুনা॥
বর্ব্বরা দশসাহস্রাঃ ষট্‌সহস্রাণি খাতকাঃ।
ইষ্টকা দশলক্ষাণি তৃণং কাষ্ঠং দ্বয়ং দ্বয়ং॥
গবাং শতসহস্রাণি সুবর্ণং ষট্‌পলাধিকং।
শীতবস্ত্রাণ্যসংখ্যানি ধৌতং বস্ত্রং জনং জনং॥
সশস্যভূমিদানঞ্চ শালগ্রামস্য সন্নিধৌ।
বিপ্রেভ্যো দক্ষিণা দত্তা ইতি সাগরদীর্ঘিকা॥"

এই শ্লোকটি পূর্ব্বে সাগরদীঘির একটি বাঁধা ঘাটে সংলগ্ন প্রস্তরখণ্ডে লিখিত ছিল। উক্ত প্রস্তরখণ্ডের এক্ষণে কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রস্তরফলক হইতে সাধারণে পাঠ করিয়া এই শ্লোকটি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে। যেরূপ আকারে শ্লোকটি পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত অশুদ্ধ। আমরা দুই তিন জনের নিকট হইতে শ্লোকটি সংগ্রহ করিয়া, যত দূর সম্ভব, শুদ্ধাকারে প্রকাশ করিলাম। আমাদের প্রকাশিত শ্লোকে কোনও শব্দ পরিবর্ত্তিত হয় নাই; তবে অশুদ্ধ বিভক্তিগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত শ্লোকস্থ সময় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলো-

যাইবে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আদিশূরের পুত্র ভূশূরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ধর্ম্মপাল গৌড়রাজ্য অধিকার করেন। বারেন্দ্র কুলজী গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, রাজা ধর্ম্মপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঞি ওঝাকে ধামসার গ্রাম দান করিয়াছিলেন। (৯) এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, ভট্টনারায়ণের পিতা ক্ষিতীশ আদিশূরের সময়ে কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আগমন করেন। ভট্টনারায়ণ নিজে কান্যকুব্জ হইতে না আসিলেও, তিনি যে আদিশূর ও ভূশূরের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং আদিশূরের কয়েক বৎসর পরে যে ধর্ম্মপালের রাজত্ব আরব্ধ হয়, তাহা বেশ বুঝা

চনা করা যাইতেছে। উক্ত শ্লোকের 'সপ্তদশাব্দী' শব্দের পূর্ব্বে যখন 'শাক' শব্দ আছে, তখন 'অব্দ' শব্দের বৎসর অর্থ করা সঙ্গত নহে, এবং সেরূপ অর্থ করিলে সপ্তদশাব্দীর ৭০ অর্থ হয়। ৭০ শাকে মহীপালের বর্ত্তমান থাকা কদাচ সম্ভবযোগ্য নহে। সুতরাং 'অব্দ' শব্দের ভিন্ন অর্থই হইবে। 'অব্দ' শব্দে মেঘও বুঝায়, যথা—"অব্দঃ সংবৎসরে মেঘে গিরিভেদে চ মুস্তকে।" —বিশ্বপ্রকাশ। জ্যোতিস্তত্ত্বানুযায়ী আবর্ত্ত, সম্বর্ত্ত, পুষ্কর ও দ্রোণভেদে মেঘ চারি প্রকার। সুতরাং 'অব্দ' অর্থে ৪ সংখ্যা বুঝিতে হইবে। 'দশাব্দী' পদটি সমাহারে সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার অর্থ ৪০। তাহা হইলে সপ্তদশাব্দীকের অর্থ ৭৪০ হইতেছে। উক্ত শ্লোকের একটি পাঠে 'শাকে সপ্তদশাধিকে' দৃষ্ট হয়। 'শাকে সপ্তদশাধিকে' পাঠে ছন্দোরক্ষা হয় না। সুতরাং 'শাকে সপ্তদশাব্দীকে' পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। 'সপ্তদশাধিকের' ৭১০ শাক বুঝায়। কেহ কেহ 'সপ্তদশাব্দীকে' পদকে 'সপ্তদশাব্ধিকে' পড়িয়া থাকেন। তাহাতেও ছন্দোরক্ষা হয় না। সুতরাং 'সপ্তদশাব্দীকে' পাঠই প্রকৃত। 'সপ্তদশাব্ধিকে' পাঠেও ৭৪০ অর্থ বুঝায়; কারণ, সংখ্যা বুঝাইতে 'অব্ধি' শব্দ প্রায়ই ৪ অর্থে প্রযুক্ত হয়, কদাচ ৭ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৭ অর্থ ধরিয়া লইলেও ৭৭০ অর্থ বুঝায়। ফলতঃ, উক্ত শ্লোকের যেরূপ পাঠ হউক না কেন, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, সাগরদীঘি ৮ম শকাব্দে খনিত হইয়াছিল। শ্লোকের 'ব্রহ্মহামুক্তি-হেতুনা' সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে।—রাজা মহীপালদেব যে স্থানে সাগরদীঘি খনিত হইয়াছে, তথায় উপস্থিত হইলে, দুইটি ব্রাহ্মণবালক রাজার সৈন্য সামন্ত দেখিয়া ভয়ে একটি বৃক্ষের উপর উঠিয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত করে। তন্মধ্যে একটি ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণত্যাগ করিলে, রাজা তাহা অবগত হইয়া, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অর্দ্ধ ক্রোশ দীর্ঘ এই দীঘি খনন করাইয়া দেন। সাগরদীঘিতে পূর্ব্বে দশটি বাঁধা ঘাট ছিল। এক্ষণে কেবল তাহাদের সামান্য চিহ্নমাত্র দেখা যায়।

(৯) "রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখমমরধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞিবিপ্রং গুণযুতনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
বস্ত্রান্তে দক্ষিণার্থং সকলকরদ্বৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ॥"
—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস; ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, ৯ম পৃ।

যাইতেছে। এক্ষণে আদিশূরের সময়নির্ণয় করিতে পারিলে ধর্ম্মপালের সময়ও অনায়াসে নির্ণীত হইতে পারে। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, কাশ্মীররাজ জয়াপীড় গৌড়রাজ জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই সাহায্যে জয়ন্ত পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর হন। এই জয়ন্ত যে আদিশূর, তাহারও প্রমাণ আছে। কুলজী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ভূশূর আদিশূরের পুত্র। (১০) কোন কোন কুলজী গ্রন্থে তিনি জয়ন্তের পুত্র বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছেন। (১১) সুতরাং জয়ন্ত যে আদিশূরের নামান্তর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজতরঙ্গিণীপাঠে জানা যায় যে, জয়াপীড় ৬৬৭ শাক হইতে ৬৯৮ শাক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। আদিশূর তাঁহার সমসাময়িক হইলে, তাঁহার পর ভূশূর ও ধর্ম্মপালের সময় স্থির করা কর্ত্তব্য। ৬৯০ শাকে ভূশূরের রাজত্বারম্ভ ধরিয়া লইলে, তাহার কয়েক বৎসর পরে যে ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক গৌড়বিজয় হয়, এরূপ স্থির করা যাইতে পারে। যদি আমরা ৭১০ শাকে ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক গৌড়বিজয়ের সময় নির্দ্দেশ করি; তাহা হইলে বোধ করি নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। ৭১০ শাকে গৌড়বিজয় হইলে তাহার কিছু পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল যে মগধে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং, ৭০৭ শাক বা ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আমরা ধর্ম্মপালের রাজত্বারম্ভের কাল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। (১২) ধর্ম্মপালের সময় সম্বন্ধে আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারায়ণপালের তাম্রশাসনপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি অরাতিবর্গকে পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধ নামক রাজাকে কান্যকুব্জ প্রদান করিয়াছিলেন। (১৩) কান্যকুব্জের

---

(১০) ভূশূর নামক পুত্র আদি নৃপতির,
মুনিপঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যাঁর স্থির।
—রামজয়কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকা। সম্বন্ধনির্ণয়, ৩৩১ পৃ।

(১১) "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ।"
—ব্রাহ্মণডাঙ্গানিবাসী বংশী বিদ্যারত্ন ঘটকের সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা।
'আদিশূরসুতেন চ' এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম খণ্ড,
১ম ভাগ ১১৪ পৃ।

(১২) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বিশ্বকোষে পালরাজবংশে ৭৮৫ খৃষ্টাব্দেই ধর্ম্মপালের রাজত্বারম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১৩) "জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানতিবামনায়॥"
—নারায়ণপালের তাম্রশাসন, ৩য় শ্লোক।

রাজবংশে চক্রায়ুধ নামক রাজার কোনও উল্লেখ দৃষ্ট না হইলেও, ইন্দ্র রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত ইন্দ্ররাজ সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূট বা রাঠোরবংশীয় ছিলেন। রাষ্ট্রকূটবংশীয়েরা পশ্চিমভারতে রাজত্ব করিতেন। এক সময় কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটবংশের তালিকায় ৪ জন ইন্দ্র-রাজের নাম দৃষ্ট হয়। (১৪) নারায়ণ পালের তাম্রশাসনোক্ত ইন্দ্ররাজকে আমরা ৩য় ইন্দ্ররাজ মনে করিয়া থাকি। কারণ, পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে, অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত ধর্ম্মপালের সময়ের সহিত অপরাপর ইন্দ্ররাজের সময়ের অনেক পার্থক্য হইয়া পড়ে। ৩য় ইন্দ্ররাজের পর আমরা ২য় কর্ক রাজকে রাষ্ট্রকূট-বংশের তালিকায় দেখিতে পাই। রাষ্ট্রকূট বংশের ৭৪৪ শকাব্দের ১২ই বৈশাখের একখানি তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয় যে, গৌড়েশ্বরের অক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মালবপতি কর্করাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১৫) এই গৌড়েশ্বর যে ধর্ম্মপাল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ২য় কর্করাজের পূর্ব্ববর্ত্তী ৩য় ইন্দ্ররাজ যে ধর্ম্মপাল কর্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। জৈন হরিবংশে লিখিত আছে যে, ৭০৫ শকাব্দে উত্তর প্রদেশে কৃষ্ণনৃপজ ইন্দ্রায়ুধ নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। (১৬) রাষ্ট্রকূটবংশের তালিকায় ২য় কৃষ্ণ-রাজের এক পুরুষ পরে ৩য় ইন্দ্ররাজের উল্লেখ আছে। (১৭) উক্ত তালিকার দ্বারা রাজগণের পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু কাহার পর কাহার রাজত্বকাল সম্ভব হইতে পারে, ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং

'মহোদয়শ্রী' শব্দের অর্থ কান্যকুব্জের রাজলক্ষ্মী। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন হইতেও জানা যায় যে, তিনি কান্যকুব্জপতিকে স্বরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

"ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগান্ধারকীরৈ-
র্ভূপৈর্ব্যালোলমৌলিপ্রণতিপরিণতৈঃ সাধুসঙ্গীর্য্যমানঃ।
হৃষ্যৎপঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকান্যকুব্জঃ সললিতচলিতভ্রূলতালক্ষ্ম যেন॥"

—ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন, ২২শ শ্লোক।

(১৪) Indian Antiquary, Vol. XI. P. 109.

(১৫) সাহিত্য, ১৩০১, অগ্রহায়ণ, ৫১৭ পৃঃ।

(১৬) "শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং।
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্।"

—জৈন হরিবংশ; ৬৬ সর্গ।

(১৭) Indian Antiquary, Vol. XI. p. 109.

কৃষ্ণরাজের এক পুরুষ পরে ইন্দ্ররাজের নাম দৃষ্ট হইতেছে; সুতরাং ৩য় ইন্দ্র-রাজকে কৃষ্ণনৃপজ বলা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। সুতরাং ইন্দ্রায়ুধকে ইন্দ্ররাজ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। ৭০৫ শকাব্দে ইন্দ্ররাজের রাজত্বকাল হইলে, তাঁহার সমসাময়িক ধর্ম্মপালের রাজত্বারম্ভ অনায়াসে ৭০৭ শাকে হইতে পারে। ধর্ম্মপালের সময় সম্বন্ধে আরও দুই একটি বিশিষ্ট প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে। প্রভাবক-চরিত প্রভৃতি জৈনগ্রন্থ হইতে শূরপাল বা বপ্পভট্টির বিবরণ অবগত হওয়া যায়। প্রভাবক-চরিতে লিখিত আছে যে, ৮০৭ সংবৎ বা ৬৭৩ শাকে শূরপাল বা বপ্পভট্টির দীক্ষা হয়। সেই সময়ে কনোজে যশোবর্ম্মা নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আম-রাজ কান্যকুব্জের অধীশ্বর হন। আমরাজের সহিত গৌড়াধিপতি ধর্ম্মের শত্রুতা ছিল। শূরপাল প্রথমে আমরাজের সভায় ছিলেন। পরে ধর্ম্মের সভায় গমন করেন। সেই সময়ে বাক্‌পতি ধর্ম্মের সভাপতি ছিলেন। শূরপাল অবশেষে পুনর্ব্বার আমরাজের সভায় উপস্থিত হন। ইহার পর ধর্ম্ম ও আমরাজের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। ৮৯০ সংবতে বা ৭৫৬ শাকে মগধতীর্থে আমরাজের মৃত্যু ঘটে। তাহা হইলে ধর্ম্মপাল তাঁহার সম-সাময়িক হওয়ায় ইহার পূর্ব্বে ধর্ম্মপালের রাজত্বারম্ভ ও গৌড়বিজয়ের বিষয় স্বীকার করিতে হয়। যে সময়ে আমরাজের রাজত্বকাল দেখা যাইতেছে, সেই সময়ে চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতে দেখায়, আমরাজকেই চক্রায়ুধ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ আমরাজ বা চক্রা-য়ুধের সহিত ধর্ম্মের শত্রুতা ছিল, পরে মিত্রতা স্থাপিত হয়। এবং চক্রা-য়ুধ বা আমরাজ রাষ্ট্রকূটবংশীয় ইন্দ্ররাজ কর্ত্তৃক কান্যকুব্জচ্যুত হইলে ধর্ম্ম-পাল তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া আমরাজ বা চক্রায়ুধকে উক্ত রাজ্য অর্পণ করেন। (১৮) সুতরাং জৈনগ্রন্থানুসারে ৬৭৩ শাকে যশোবর্ম্মা দেবের

(১৮) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বিশ্বকোষে লিখিত পালবংশে আমরাজের পুত্র পিতৃদ্বেষী দন্দুককে ইন্দ্রায়ুধ বা ইন্দ্ররাজ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, নারায়ণ পালের তাম্রশাসন ইন্দ্ররাজকে ধর্ম্মপালের অরাতি বলিয়া উল্লেখ করায়, তাঁহার মিত্র আমরাজ বা চক্রায়ুধের বিদ্রোহী পুত্রকে তাহা বলা যাইতে পারে না। জৈন হরিবংশে ইন্দ্রায়ুধকে কৃষ্ণনৃপজ বলা হইয়াছে, এবং আমরা যখন রাষ্ট্রকূট রাজবংশের তালিকায় ইন্দ্রের অল্প পূর্ব্বেই কৃষ্ণরাজের নাম পাইতেছি, তখন তাঁহাকে রাষ্ট্রকূট বংশীয় বলিয়া স্থির করাই কর্ত্তব্য। নগেন্দ্র বাবু পালরাজের তাম্রশাসনের উল্লেখ করিয়া এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল পিতা চক্রায়ুধকে

অবস্থান ও ৭৫৬ শাক পর্য্যন্ত আমরাজের রাজত্বকাল হইলে, আমরা যে সময়ে ধর্ম্মপালের রাজত্বারম্ভ নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইতে পারে। জৈন গ্রন্থে দেখা যায় যে, বাক্‌পতি ধর্ম্মপালের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজতরঙ্গিণী-পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে, কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মাকে পরাস্ত করিয়া বাক্‌পতি, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণকে কাশ্মীরে লইয়া গিয়াছিলেন। (১৯) ৬১৯ শাক হইতে ৬৫৫ শাক পর্য্যন্ত ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল স্থির হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর ৭১০ শাকে গৌড়াধিপতি ধর্ম্মপালের সভায় বাক্‌পতির বর্ত্তমান থাকা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমরা বারংবার যে রাজেন্দ্র চোল দেবের দিগ্বিজয়ের কথা বলিয়াছি, তাঁহার সময় হইতেও ধর্ম্মপাল ও মহীপালের সময় নির্ণীত হয়। রাজেন্দ্র চোল বা বোপ্পরকেশরী তামিল কবি কম্বনের প্রধান সহায় ছিলেন। কম্বন তদীয় রামায়ণের একটি শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন, ৮০৮ শাকে রাজেন্দ্র চোল দেব বর্ত্তমান ছিলেন। (২০) আমাদের বিবেচনায়, উক্ত সময় রাজেন্দ্র চোল দেবের রাজত্বের শেষভাগ হইবে। সাধারণতঃ নৃপতিগণের দিগ্বিজয়ের প্রথানুসারে, রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বের প্রথম ভাগে তাঁহারও দিগ্বিজয় সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং ৭৫৮ শাকে তৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মপাল মহীপাল প্রভৃতি যে পরাজিত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ধর্ম্মপাল যে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার বিবরণ আলোচনা করিলে তাহার প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং ৭০৭ শাকে তাঁহার রাজত্বারম্ভ ও ৭১০ শাকে তৎকর্ত্তৃক গৌড়বিজয় হইলে, ৭৫৮ শাক বা ৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ও মহীপাল যে রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা অনায়াসেই স্বীকার করা যাইতে পারে।

পুনরায় কান্যকুব্জ রাজ্য দান করিয়াছিলেন; তাহাতে পঞ্চালবাসিগণ হর্ষলাভ করিয়াছিলেন। কোন শ্লোক হইতে তিনি এইরূপ স্থির করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, চক্রায়ুধ পুনরায় পুত্র কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়ায় ধর্ম্মপাল তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে স্থাপিত করিতে পারেন।

(১৯) অধ্যাপক ভাণ্ডারকর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ৭৫৩ খৃষ্টাব্দ বা ৬৭৫ শাক যশোবর্ম্মার মৃত্যুর সময়। কিন্তু পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে তাহার অনেক পরে যশোবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। নগেন্দ্র বাবু ৭৭৫ খৃষ্টাব্দ বা ৬৯৭ শাক যে আমরাজের রাজ্যারোহণের কাল অনুমান করিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

(২১) এই সমস্ত প্রমাণের আলোচনা করিলে, ৭৪০ শাকেই সাগরদীঘি খনিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতীত হয়। ৭৪০ শাকে সাগরদীঘি খনিত হইলে, তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে মহীপাল উত্তর রাঢ়ে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা ৭৩৫ শাকে বা ৮১৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর রাঢ়ে মহীপালের রাজত্বারম্ভ ও মহীপাল নগরের নির্ম্মাণ, এবং ৭৬৫ শাক বা ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বের শেষ অনুমান করিয়া থাকি। সুতরাং ৭৫৮ শাক বা ৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক তাঁহার পরাজয় অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। রণশূরকে ক্ষিতিশূরের পুত্র স্বীকার করিলে, ৭৩২ শাক বা ৮১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বারম্ভ অনুমান করা যাইতে পারে, এবং ৭৩৫ শাক বা ৮১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি যে মহীপাল কর্ত্তৃক উত্তররাঢ়চ্যুত হন, তাহাও স্বীকার করা যায়। ফলতঃ, যেরূপে হউক, মহীপাল যে ৮ম শকাব্দে বা ৯ম খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা স্থির হইয়া থাকে।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

হাজারা।

পাঞ্জাবের অন্যান্য গ্রাম নগরের ন্যায়, এ প্রদেশের গ্রাম নগর প্রাচীরবেষ্টিত নহে। অধিকাংশ গৃহ অনুচ্চ, এবং মৃত্তিকায় নির্ম্মিত। ছাদে কর্ত্তিত বৃক্ষের পাড়ান দিয়া তদুপরি বৃক্ষের শাখা বিস্তারিত করিয়া স্তূপাকারে মৃত্তিকা-ঢালিয়া দেওয়া হয়। তদুপরি গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকা লেপন করিয়া দিলে, কিছু দিন পরে শুষ্ক হইয়া যায়; এইরূপে সুন্দর ছাদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢালু সীমায় বাঁশ কিংবা কাষ্ঠের নল বদ্ধ করিয়া দিলে বৃষ্টিজল-নির্গমনের যথেষ্ট সুবিধা হইয়া থাকে। শীতকালে উপর্য্যুপরি কয়েক মাস বরফে আচ্ছন্ন থাকিয়া ছাদ এত দৃঢ় হইয়া যায় যে, বহুকাল তাহার সংস্কার আবশ্যক হয় না। পথের দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধভাবে গৃহ সকল নির্ম্মিত হয়। মধ্যে গমনাগমনের পথ। তাহার দুই ধারে পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বৃষ্টিপতনের পরই দেখিতে পাওয়া যায়, জলরাশি সেই প্রণালী দিয়া নিম্ন-প্রদেশে পতিত হইতেছে। সুতরাং, সঞ্চিত জলে আবর্জ্জনা

(২১) নগেন্দ্র বাবু ধর্ম্মপালের রাজত্বকাল ৪৫ বৎসর স্থির করিয়াছেন। কিন্তু সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য করিতে হইলে ধর্ম্মপালের রাজত্বকাল আরও কিছু দীর্ঘ করা আবশ্যক।

পচিয়া (সচরাচর বঙ্গদেশের গ্রাম নগরের যেরূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়) সংক্রামক ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। উপর পাহাড়ে এইরূপ দ্বিতল গৃহও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নিম্নতলে গৃহপালিত পশু অবস্থান করে; উপর তলায় গৃহস্থ বাস করিয়া থাকে। তাহাতে নিম্নস্থিত পশুদিগের উত্তাপ উপরতলায় পঁহুছিয়া গৃহ সকল যথেষ্ট উষ্ণ করিয়া রাখে। পুরাকালে কোথাও একটিও পাকা ইমারত ছিল না। এখন স্থানে স্থানে ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইতেছে।

গ্রামের বহির্ভাগে ও নগরের প্রত্যেক পল্লীতে একটি সাধারণ গৃহ (Town Hall) বর্ত্তমান থাকে। তাহাকে মুজরা কহে। তথায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অধিবাসিগণ উপস্থিত হইয়া প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। বিপদে সম্পদে সেই স্থানেই সকলে সমবেত হয়; অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইলে তথায় আশ্রয় পাইয়া থাকে। হাজারাবাসিগণ বড়ই অতিথিপ্রিয়। অতিথি আসিলে প্রত্যেক গৃহ হইতে প্রতিদিন তাহাদের ভোজ্যবস্তু আসিয়া থাকে। এইরূপে যত দিনে সকলের অতিথিসেবা না হয়, তত দিন হাজারাবাসীরা অতিথিকে গ্রামান্তরে যাইতে দিতে কোনও প্রকারেই সম্মত হয় না! তাহার পর যদি শুভক্ষণে কখন কোনও ফকীর আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাঁহার সেবার আর সীমা থাকে না। কেহ শীতবস্ত্র আনিয়া উপস্থিত করিতেছে; কেহ উপাদেয় বস্তু আনিয়া উপহার দিতেছে; কেহ ধর্ম্মকথা শুনিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া নিকটে উপবিষ্ট আছে। আবার যদি কোনও সাধু কোন প্রকার কেরামত, সুস্বরে কোরাণ-পাঠ ও ধর্ম্মকথা প্রভৃতি বলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সে গ্রাম কি নগর পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়ে। সুতরাং সাধুকে প্রচ্ছন্নভাবে পলায়ন করিতে হয়! শুনিতে পাওয়া যায়, এইরূপ এক কেরামতি সাধু ইয়ার্কিস্থানের কোন গ্রামে উপস্থিত হইয়া কেরামত দেখাইয়া সকলের ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে তিনি স্থানান্তরিত হইতে চাহিলে সকলেই তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। অগত্যা সাধুকে আরও কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করিতে হইল। আবার যাইবার কথা তুলিলে সকলে কাঁদিতে লাগিল। এবং করযোড়ে প্রার্থনা করিল যে, তিনি যেন কখনও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া না যান। কিন্তু সাধু কিছুতেই তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন সকলে মন্ত্রণা করিয়া

করিয়া অমূল্য রত্নের ন্যায় প্রত্যেক গৃহে প্রোথিত করিয়া তদুপরি সমাধিস্থান নির্ম্মাণ করিয়া সাধুর পূজা করিতে আরম্ভ করিল! ব্রিটিশ প্রতাপের প্রভাবে এইরূপ ঘটনা প্রকাশ্যভাবে ঘটিতে আর শুনা যায় না বটে, কিন্তু 'কেরামতি' সাধুদিগের প্রতি ইহাদিগের অচলা ভক্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান।

আরবের মুসলমানেরা কোরাণ ঈশ্বরবাক্য ও হজরত মহম্মদকে প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করে। সম্প্রদায়বিশেষে এমন বিশ্বাসও জন্মিয়াছে যে, হজরত খাজী খাজার ও হজরত আলি প্রভৃতি কয়েক জন মহাত্মা, আমাদের পরশুরাম, অশ্বত্থামা ও বেদব্যাস প্রভৃতির ন্যায় চিরজীবী; তাঁহারা সময়ে সময়ে বাসত্যাগ করিয়া ফকীরের বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সুতরাং 'কেরামতি' সাধু দেখিলেই সাধারণ মুসলমানদিগের স্মরণপথে সেই কথা উপস্থিত হয়, এবং কাহারও প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হইলেই ইহারা ভাবিয়া বসে,—"হয় ত ইনি তাঁহাদেরই এক জন হইবেন।" এই বিশ্বাসে অনেক স্থানে অনেক প্রকার অনিষ্ট হইয়াছে। মধ্য এসিয়ায়, আফগানিস্থানে, কাফিরস্থানে ও হাজরার উত্তর প্রান্ত ইয়ার্কিস্থানে এইরূপ 'কেরামতি' ফকীর উপস্থিত হইয়া সময়ে সময়ে লোকসংগ্রহ করিয়া রাজার বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান হইয়াছে। ফল কিছু হউক আর না হউক, সর্ব্বদাই এইরূপ ফকীরদিগের আবির্ভাব আশঙ্কার কারণ হইয়া থাকে। প্রজাগণ সাধারণতঃ নিরীহ ও নির্ব্বিবাদী, কিন্তু ধর্ম্মান্ধ। ইহারা এইরূপ ফকীরদিগের প্ররোচনায় এত দূর উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, সম্মুখসংগ্রামে প্রাণ দিতে অণুমাত্র ইতস্ততঃ করে না! শুনিতে পাওয়া যায়, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে বিতাড়িত অনেক মুসলমান অদ্যাপি ফকীরের বেশে ঐ সকল দেশে বাস করিতেছে। তাহারা অবসর পাইলেই প্রজাদিগকে রাজ-বিদ্রোহে উন্মত্ত করিয়া তুলে।

প্রত্যেক গ্রামে এক একটি মসজিদ (ভজনালয়) থাকে। তাহার কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ সচরাচর তিন ব্যক্তি নিযুক্ত হয়। প্রথম খাদিম;—তাহাকে মসজিদ ও প্রাঙ্গন পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। উজু (হস্তমুখাদি প্রক্ষালন) করিবার নিমিত্ত জল) যোগান ও অন্যান্য সামান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। তাহার জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক গৃহে ভিক্ষা নির্দ্দিষ্ট আছে। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ইমাম (পুরোহিত) কহে। ইনি নেমাজের (উপাসনার) সমস্ত কার্য্য (আজান, উপাসনা) নির্ব্বাহ করেন, কোরাণ পাঠ করিয়া শুনান, এবং 'ষতনা' (জাতকর্ম্ম), বিবাহ ও শ্রাদ্ধ কার্য্যের সম্পাদন ও গ্রাম্য বালকদিগকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। এই

জন্য তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ভূমি দান করা হইয়া থাকে। তৃতীয় ব্যক্তির উপাধি ঘাসিন; সমাধিস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ, মৃত শরীরের অবগাহন, ও প্রতিদিন কবর-স্থানে নেমাজ করা তাঁহার কার্য্য; অনেক স্থানে স্বয়ং ইমামই কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত লাভের জন্য ঘাসিনের কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে নিন্দিত হইতে হয়। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, ইমাম পদস্থ ব্যক্তি, গ্রাম নগরের সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিচক্ষণ, পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা অনেক উন্নত। প্রত্যেক গৃহস্থকেই উৎপন্ন শস্যের অগ্রভাগ তাঁহার সেবার জন্য প্রেরণ করিতে হয়। শুভাশুভ কার্য্যে তাঁহাকে দক্ষিণা দান করিতে হয়। এ জন্য সাধারণ লোক অপেক্ষা গ্রাম নগরে ইমামের মর্য্যাদা অধিক। ইমামের প্রধান উপাধি মোল্লা।

প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ একখানি গৃহেই বাস করিয়া থাকে। গৃহের পরিমাণ ২০ × ১২ ফিট। তন্মধ্যে তাহারা সপরিবারে অবস্থিতি করে। একটু সম্পন্ন হইলে গো মহিষ ছাগ মেষ প্রভৃতি পশুপাল সংগ্রহ করিয়া থাকে, এবং তাহাই তাহাদিগের সম্পত্তি। কখনও কখনও তাহাদিগকে প্রয়োজন মত ঐরূপ অনেক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। দরিদ্র গৃহস্থেরা রাত্রিকালে গৃহপালিত পশুর সহিত একত্র অবস্থান করে। প্রাতে দোহনকার্য্য সম্পন্ন হইলে ছোট ছোট বালকেরা একত্র হইয়া গ্রামের সমস্ত পশু বাহিরে চরাইতে লইয়া যায়।

শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

অমৃত না গরল?

একেকে এক। একে একে দুই,—এ বেদের কথা। একে একে এক, এ প্রেমের কথা। বিবর্ত্তবাদ প্রেমের মন্ত্র। জীবনসংগ্রাম—বসন্তে ঐ তরুশাখে পাখীর কলহ কোলাহল। তুমি দেখিতেছ বিবাদ বিসংবাদ,—আমি দেখি শতের মধ্যে দুই—দুইএর মধ্যে এক। সুরে সুরে চোখে চোখে দুটি প্রাণ এক। অত বিবাদের ইন্ধন যোগায় কে? গাহিবার অত স্ফূর্ত্তি কোথা হইতে? প্রেমের বরফশিলা নীরব গভীর অসীম; তাই ত শত স্রোতস্বতীর প্রাণ! কত বাপী, কূপ, তড়াগ শুখাইয়া ঐ কাদম্বিনীর সঞ্চার হইয়াছিল। তখন কত হাহাকার, কত শাপ অভিশাপ। যখন ঝঞ্ঝাবাতে দিক্ বিদীর্ণ হইল, অশনি-পাতে গিরিশিখর চূর্ণ করিল, তখনই বা কত ভাবনা! যখন অমৃতধারায়

ধরা পরিতৃপ্ত করিল, জীব জীবনলাভ করিল, তরুলতা মুঞ্জরিত হইল, তখন জয়ধ্বনিতে জগৎ পূর্ণ হইল।

শিশু বর্ত্তমান লইয়া, যুবা অতীত ও বর্ত্তমান লইয়া, কিন্তু বৃদ্ধ কেবল ভবিষ্যৎ লইয়া পরিতুষ্ট। প্রজাপতি সুন্দর পাখা দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া আকাশে উড়িতেছে, শিশুর মন মাতিয়াছে! সে তাহাকে ধরিবে। ধরিতে ছুটিয়া কাঁটায় গা ছড়িতেছে, হোঁচট খাইয়া পড়িতেছে, তাহাতে কি? ধরিয়া কি হইবে, তা সে ভাবে না। ধরিতেই হইবে। প্রজাপতি তাহার ধাবনস্পৃহা উদ্রিক্ত করিয়াছিল। এখন ধরাই তাহার ধরিবার উদ্দেশ্য, প্রজাপতি অকিঞ্চিৎকর! ধরিতেই হইবে। কঠোর হস্তে সে যেই ধরিল, প্রজাপতির প্রাণান্ত হইল, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, সে ত ধরিয়াছে। ধরাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল, ধরিয়া সে তৃপ্ত হইল। অভাগা প্রজাপতি প্রাণ হারাইল, শিশু আনন্দে নৃত্য করিল।

যাদব ও মাধবের গলায় গলায় ভাব। দু'জনে এক মুহূর্ত্ত ছাড়া নাই, খেলার সঙ্গী, খাবার সাথী, ক্লাসের প্রতিবাদী দু'জনে। এখনই হাতে হাতে, এখনই হাতাহাতি। অতি অকিঞ্চিৎকর কারণে একটা ঘুড়ি লোটা লইয়া দুই জনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধাইয়াছে। প্রাণান্ত সংগ্রাম। আর যে কখন মুখদেখাদেখি হইবে, আশা নাই। দুই জনেই বাড়ী গিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া গাল ফুলাইয়া বসিয়া আছে। প্রতিহিংসা অনুতাপ মনে কি জাগিয়াছে? কিছুই নাই। ঝগড়ার সময় ঝগড়া উদ্দেশ্য হইয়াছিল, ঝগড়া মিটিয়াছে, উদ্দেশ্য ফুরাইয়াছে। আবার যেমন চোখচোখি, মুহূর্ত্তে সব কথা ভুলিয়া আবার যে ভাব সেই ভাব—ভালবাসা ও সৌহৃদ্য।

অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশায় যুবার উদ্যম উৎসাহের প্রাণতা। যুবার উদ্যম শিশুর উদ্যমের মত; কেবল চঞ্চল নহে; কারণ, তাহার উৎস দুইটি—দুইটিই সতেজ—অতীত ও ভবিষ্যৎ। অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা তাহার বর্ত্তমান কার্য্যের প্রসূতি। সেই, সেই কাতর নয়নে লালস দৃষ্টি, সেই সিংহীবিনিন্দিত সদর্প ভ্রূকুটী, সেই নদী-পুলিনে চন্দ্রকিরণে করুণ-কাহিনী। অথবা অন্তিম শয়নে পিতার চরম অনুজ্ঞা, বিদেশযাত্রাকালে করযোড়ে ভগবানের নিকট মায়ের একান্ত অনুনয়—সে কি ভুলিবার, সে কি ভুলিবার? সাগরতরঙ্গে গিরিলিপি মসৃণ হইবে, সময়স্রোতে হৃদয়-চিত্রিত সে ছবি কখন মুছিবে না।

সংসারের বঙ্কিম পথে চলিতে চলিতে কত কি দেখিলাম, এক সঙ্গে যাহাদিগকে লইয়া মহাপ্রয়াণ আরম্ভ করিয়াছিলাম, একে একে তাহাদিগকে পথিপার্শ্বে বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছি। কত জনের সঙ্গে পথের মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, 'হাউ ডু ইউ ডু' করিয়া তাহাদের কেমন করস্পর্শ করিয়াছিলাম। একে একে সকলকে ভুলিয়াছি। কেবল এক দিনের একখানি ছবি এখনও ভুলি নাই বটে, সে কেবল বয়সটা এখনও তেমন পাকে নাই বলিয়া। বিসর্জ্জন করিয়াছি সকলই পরের সেবায়, উদ্যম উৎসাহের তীব্রতা কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না ভীষণ জীবনসংগ্রামে। সমুদ্র এখন শান্ত হইয়াছে, ঝটিকা এখন আর বহে না। তুমি বলিবে, স্নায়ু-নালে ধুলা পরিপূর্ণ হইয়া বিদ্যুতের গতি রুদ্ধ করিয়াছে—আমি বলি তা নয়। দৃষ্টি বর্ত্তমান অতিক্রম করিয়াছে, অতীতের দিকে ত চায় না। কে কি বলে, কে কি করে, আর অনুভব করিতে পারিও না, ইচ্ছাও নাই। কে কি বলিয়াছিল, করিয়াছিল, সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছি। দৃষ্টি দূরে দূরে সাগরের পর পারে—"ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম" সেই দিকে একান্ত অবহিত। ইহাই ভগবানের নিয়ম—ইহাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব।

কথাটা বুঝি ভাঙ্গিয়া বলিতে পারি নাই। মনুষ্য ও মনুষ্যসংহতি সমাজ একইরূপে আকৃষ্ট হয়। যে ভাব ও অভাব, আশা ও আশঙ্কা, চিন্তা ও ব্যবসায় এক জন মনুষ্যকে প্রণোদিত করে, মনুষ্যসমাজও তাহাতেই প্রণোদিত হয়। আবার শিশু যেমন বর্ত্তমান লইয়া পরিতুষ্ট, অসভ্যও তেমনই বর্ত্তমান ভিন্ন আর কিছুই জানে না। যুবা ও অর্দ্ধসভ্য সমানভাবে অতীত ও ভবিষ্যতে পরিচালিত হয়। পূর্ণব্যাবৃত সভ্য সমাজ অতীত ও বর্ত্তমান বিসর্জ্জন করে কেবল ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কামনায়।

সকল স্নেহের আদর্শ মাতৃস্নেহ। মা নিজের সুখ সৌভাগ্য বিসর্জ্জন করেন সন্তানের মঙ্গলকামনায়। সেও কেবল বর্ত্তমান মঙ্গল নহে, দূর ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য। অসভ্য সমাজে নিত্য বিবাদ বিসংবাদ। অন্ধকার কুটীরে সূর্য্যরশ্মির মধ্যে মলকণা বায়ুভরে যেমন সহস্র আবর্ত্তে ঘুরিতে থাকে, অসভ্য সমাজে দলাদলি বিবাদ বিসংবাদ,—কি আন্তর্জাতিক ও কি বহির্জাতিক,—নিত্য, নিয়ত, চিরন্তন। তবে কেন একটি বিবাদ চিরানুস্থত হয় না? একবার জ্বলে, আবার নিভে, আবার জ্বলে? কালিকার শত্রু আজিকার মিত্র, আজি যে মিত্র, কালি সে শত্রু। কি সমাজবন্ধনে, কি রাজ্যের বিস্তারে, দূরদর্শিতা ভবিষ্যৎ ভাবনার নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায় না।

ব্যাবৃত সমাজে মনুষ্যের রূপ রাগ অনুশীলিত হয়। তাহা নিজে সুন্দর দেখাইবার জন্য নহে, ভবিষ্যৎ বংশ সুন্দর হইবে বলিয়া। বিবাহে সুন্দরী গুণবতী রমণী নির্ব্বাচিত হয় কেবল দাম্পত্য সুখের জন্য নহে, ভবিষ্যতে সুসন্তান কর্ষিত—পরিবার সৃষ্ট হইবার জন্য। বর্ত্তমান বংশ করভার বহন করিয়াও বাপী খনন করে ভবিষ্যবংশ সুখভোগ করিবে বলিয়া।

এই উপচিকীর্ষা বৃত্তি বিবর্ত্তন বৃক্ষের সুরভি কুসুম। জীবনসংগ্রাম বর্ত্তমানের জন্য নহে। গৃহস্থ উৎকৃষ্ট ফল পাইবার আশায় বৃক্ষরোপণ করে। বিজিগীষা মনুষ্যপ্রকৃতিতে ব্যাবৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান মনুষ্যের বর্ত্তমান সুখের জন্য নহে। ক্রমাবনতি স্থলবিশেষে, সময়বিশেষে, বা জাতিবিশেষে পরিদৃষ্ট হইলেও, ক্রমোন্নতিই মানবপ্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট বিধান। গ্রীস বা রোম নষ্ট হইয়াছে বর্ত্তমানের অনুকরণ করিয়া। যে জাতি বা যে সমাজ ভবিষ্য পুরুষের মঙ্গলের জন্য স্বার্থবিসর্জ্জন করিবে, সেই জাতি ও সেই সমাজ অনন্ত উন্নতি লাভ করিবে। পরার্থপরতা চিরমঙ্গলের নিদান। বিবর্ত্তবাদ এই মহাসত্য শিক্ষা দেয়। ভারতে মুসলমান রাজ্যের ধ্বংস হইয়াছে স্বার্থপরতা হেতু। শাসনকর্ত্তৃগণ শাসিতগণের মঙ্গলচিন্তা কখনও হৃদয়ে স্থান দেয় নাই। আকবর ভাবিয়াছিলেন কিসে মোগলরাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হইবে; ভাবেন নাই,—প্রজাগণের কিসে কল্যাণ হয়। ব্রাহ্মণসমাজ ঘৃণিত শূদ্রগণকে গণ্ডির বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, আজি ব্রাহ্মণ শূদ্রের গৃহে সূপকার। বুদ্ধদেব শ্রমণাচার্য্য ও উপাসকগণের মধ্যে রেখা টানিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের উদ্বেলনে প্রাকার চূর্ণ হইলে দুর্গনিপাতে বিলম্বমাত্র হইবে না।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

সঙ্গিনী।*

সে দিন সন্ধ্যাবসানে কাব্যখানির যে দুটি পংক্তি প্রথম দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহা একান্ত সুন্দর। এবং আজ উহার আলোচনা-মুখে সেই দুটি ছত্রের উল্লেখ করিতে সমধিক আনন্দ পাইতেছি। সৌন্দর্য্যের চিরন্তন চর্চ্চাও অবসাদকরী নহে—এবং সৌন্দর্য্যভোগানন্দ সহৃদয়-সমাজে যত বিভক্ত হয়, ততই মহত্তর হইয়া উঠে।

---

* শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ প্রণীত।

সঙ্গিনীর নিকুঞ্জে দাঁড়াইয়া প্রথম শুনিয়াছিলাম,

সত্যেরে সুন্দর করি' কবিতা সুন্দরী
অই দেখ দাঁড়াইয়া পথ আলো করি'।

ভরসা হইল, লতাগৃহ তমঃপুঞ্জে বিলীন নহে, পুষ্পবীথি কণ্টক-সঙ্কুল নয়।

আনন্দের কথা, আলোচ্য গ্রন্থখানি গীতিকাব্য। কাব্য-বিভাগে দেখা যায়, গীতিকাব্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, "কাব্যেষু নাটকং রম্যং।" কিন্তু নাটক ত গীতিকাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। নাটকের কবি পাত্র সাজিয়া এতগুলি নরনারীর হৃদয় যতবার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেন, তত বারই গীতিকবিতার সৃষ্টি করেন। মূলে গীতিকবি না হইলে, কেহই নিপুণ নাটককার হইতে পারেন না। শ্রেষ্ঠ নাটককার কালিদাস সেক্সপীয়র শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি বলিয়াও প্রখ্যাত।

কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেকের ধারণা, গীতি-কবি শুধু উদ্ভট কল্পনার পরিচর্য্যায় সময় নষ্ট করেন। তাঁহারা মনে করেন, গীতি-কাব্যে সত্য কিছুই নাই—কেবল কতকগুলি পরিপাটী শব্দ, শ্রুতিমধুর মিল, আর মলয় বসন্ত কৌমুদী প্রেমের বৃথা আবৃত্তি। তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণার উত্তরস্বরূপ ইংরাজ কবি কীট্‌স্ বলিয়াছিলেন,—

"Beauty is truth—truth beauty"—That is all
Ye know on earth, and all ye need to know.

সত্যই সৌন্দর্য্য, এবং যাহা সুন্দর, তাহাই সত্য। কবি সত্য ছাড়া আর কিছুই বলেন না; কারণ, কবির মনোভূমি সৌন্দর্য্যের জন্মস্থান। তবে, তোমার কাছে যাহা অসম্ভব, কবি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখেন তাহা সত্য। তুমি যে সত্যকে অনুভব করিতে পার না, কবি-হৃদয় তাহাই অনুভব করিয়া পুলকিত হয়;—যদি ধন্য হইতে চাও, সেই অজ্ঞাতপূর্ব্ব কবি-গীত সত্য জানিয়া লও। তুমি শুধু বহির্জ্জগৎকে চিনিয়াছ—অন্তর্জ্জগতের কথা কবির কাছে শিখিয়া লও। কিন্তু সত্যপ্রচার বিষয়ে কবি বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেন, আর সকল প্রকার সত্যও প্রচার করেন না। তিনি অনুগ্রহ করিয়া উপদেশ দেন না; সত্যকে মোহন বেশ পরাইয়া, সৌন্দর্য্যের আভরণে সাজাইয়া মনোহর করিয়া তুলেন—নীরসকে সরস করিয়া দেন। আর, যাহা সঙ্কীর্ণ নীচত্বপ্রকাশক, কবির পবিত্র হৃদয়-মন্দিরে তাহার স্থান নাই।

পরন্তু, গীতি-কবির সৌভাগ্য বড়ই দুরূহ। তিনি যে অনুপম দেবতার দান লইয়া মর্ত্ত্যভূমে আসেন, তাহা যেমন মহৎ, তেমনই বিচিত্র বেদনায় জ্বালাময়। তাঁহার হৃদয়ের ভাব, ভাষার ভূলোক হইতে বহু উচ্চে। তাঁর keen feelings ভাষায় কি সম্যক বিকশিত হইতে পারে? তাই, ভাল গীতিকবিতা suggestive হইবেই। একটি দুটি কথায় গীতিকবি যে অনুভূতি প্রকাশ করিতে যান, তাহা না জানি কত নিপুণতাপেক্ষী! শুধু মিল নয়, শুধু ছন্দ নয়—কবির কাজ পাঠকের হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিবে, পাঠককেও কবি করিয়া তুলিবে। কেবল বর্ণনা নয়, শুধু ঘটনাপরম্পরার সমাবেশ নয়—হৃদয় ভেদ করিয়া যে হৃদয়ের গান বাহির হইয়া পড়ে, তাহাই গীতি-কবিতা। তুমি যখন

অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছ, গীতি-কবি তখন বন্ধুর মত আসিয়া তোমাকে দুটি কথা শুনাইলেন—তুমি পুলকিতনেত্রে দেখিলে,

"হৃদয়ের ভাব-রাজ্যে হিরণ আবাস
নিত্য নব স্বর্গ যাহে নিত্য পরকাশ।"

তাই বলিতেছি, আনন্দের কথা—'সঙ্গিনী' গীতি-কাব্য।

সঙ্গিনীর প্রথম ও প্রধান গুণ দেখিলাম, Boldness—কোথা অকারণ বৃথা সঙ্কোচ নাই। এক একটি কবিতা আপনার রূপরসে বিভোর—পর জনে কে কি বলিল, তাহা শুনিবার জন্য উৎসুক নহে—অথচ বিনম্র সৌন্দর্য্যে মোহিনী, সহজ সারল্যে অকুণ্ঠিতা। কবিতারাণীর "অমৃত পরশ লাগি" কবির যখন "পরাণ উঠিবে জাগি", তখন কবি—

বর পেয়ে দেবতার স্নেহে,
শরবে ফিরিয়া যাবে গেহে,

আর ততক্ষণ,

শ্যামা তটিনীর তীরে, বাঁশরী বাজিবে ধীরে,
সৌরভ বহিবে সমীরণে।

কিন্তু,"কূলে এসে ডোবে যদি ভক্তের তরণী"? এ ভয়ও স্বাভাবিক। সর্ব্বত্রই "স্নেহঃ পাপশঙ্কী।"

আমাদের স্ত্রীকবিদের রচনায় সাধারণতঃ এই Boldnessএর একান্ত অভাব। বৃথা লজ্জা ভয়ে হৃদয়ের বক্তব্যকে কুণ্ঠিত করিবার কি প্রয়োজন? অবশ্য প্রকাশ করিবার ভঙ্গীতে যথোচিত শালীনতা-রক্ষা অপরিহার্য্য।

রচয়িত্রী যখন নিঃসঙ্কোচে "কলঙ্কিনী"কে নিজ বক্ষে স্থান দিয়া বলিতেছেন,

ঘৃণা লাঞ্ছনার কার নাহি অধিকার;
সংসার খেলার ঘরে,
ওলো কে না ভুল করে?
আয় আয় হৃদয়ে আমার।

তখন উদ্ধত হৃদয় বিনম্র হইয়া যায়। মনে হয়, আমরা কাহাকেও অপরাধী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারি না। দুর্ব্বল মানব-হৃদয়ের বহুবিধ ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী। আমি একটি বিশেষ ভুল করি নাই বলিয়া, অপর ভ্রান্তকে ঘৃণা করিবার কি অধিকার পাইয়াছি? কাল হয় ত আমাকেও সেই ভ্রমের জন্য দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। উপদেষ্টার অসংখ্য উপদেশ বিফল হইতে পারে; কবি যখন বলিলেন,

সংসার খেলার ঘরে,
ওলো কে না ভুল করে?

তখন আর দণ্ডদাতার হাত উঠিবে না। চির সত্য তারও হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে—সেও কি জীবনে ভুল করে নাই? উপদেষ্টা যখন কর্ত্তব্যকে কঠোর ভয়ানক করিয়া তুলিবার জন্য বিব্রত, [illegible] একটি সত্যকে [illegible] প্রকাশ করিয়া বাঞ্ছিত সাফল্য লাভ করিলেন।

সঙ্গিনীর কবি প্রাকৃতিক চিত্রাঙ্কনেও বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ "বর্ষার নদী" উদ্ধৃত করিলাম।

ঘন মেঘাচ্ছন্ন নভ—আসন্ন শ্রাবণ ;
নদীবক্ষে জাগিয়াছে যৌবনপ্লাবন।
সলিল-প্রতিভা ফুটি যায় যেন ছুটি ছুটি ;
দুলে দুলে চলে সাথে পাগল পবন।

সম্মুখে যেন খরবাহিনী স্রোতস্বতী দেখিতে পাইতেছি—দুই কূল পরিপ্লাবিত—যৌবনমদে উচ্ছ্বসিত ; আর বিশাল আকাশ ঘনশ্যাম মেঘে সমাচ্ছন্ন। বর্ষণ হইল বলিয়া !

লেখিকা মানবজীবনকে তটিনীর সঙ্গে উপমিত করিয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহার বর্ণনও সুন্দর। জীবন কৈশোরে শান্ত মধুর লীলাময় ; যৌবন-মুখে,

শত আশা কাঁপে বুকে ; পরাণ ব্যাকুলি যাপে
নিঃসঙ্গ শয়ন ;

তার পর, যৌবনে,

শান্ত নদী আপনারে করিল জটিল
শত ঘূর্ণিপাকে ;
তরী তীর নাহি আর, অন্ধকার একাকার,
মুক্ত বন্যা ডাকে !
চুরমার সুখ শান্তি, কাঁদে তৃষা সুখ শান্তি
অন্তর মাঝার ;
হাসিতে বিজলি জ্বালা, অশ্রুতে গরল ঢালা
গানে হাহাকার !

যৌবনের বিপ্লব কবি অতি সুন্দর ভাবায় ব্যক্ত করিয়াছেন। দুঃসহ জ্বালাময় যৌবনের প্রকৃতি রচয়িত্রীর কবিতায় সম্যক প্রতিফলিত হইয়াছে। ছত্র কয়টি পাঠ করিয়া মনে পড়ে,

"প্রাপ্তোঽহং যৌবনক্ষেত্রিবিষধরসদৃশৈরিন্দ্রিয়ৈর্দষ্টগাত্রো।" ইত্যাদি।

সঙ্গিনীর গুটিকতক চতুর্দ্দশপদীও বেশ হইয়াছে। ভাল সনেট বাঙ্গালায় অতি অল্প। উৎকৃষ্ট সনেট আশুগামী তীরের মত ক্ষিপ্র ও নিশিতমুখ, দীপ্ত উল্কার মত জ্বালাময়, অতি লঘু, অথচ মর্ম্মস্পর্শী হওয়া চাই। রুদ্ধ আবেগ যেমন কবির হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতে চায়, সনেটের ভাবও চতুর্দ্দশ-পদের বন্ধন তেমনই করিয়া ভগ্ন করিতে চাহিবে। বাঙ্গালায় এমন কবিতার নিতান্ত অভাব।

সঙ্গিনীর "সঙ্গীত-স্মৃতি" নামক চতুর্দ্দশপদীটি আমার বেশ লাগিয়াছিল। তাহার ভিতর একটি জ্বালাময় প্রাণ যেন ছুটিয়া বেড়াইতেছে। একদিন সায়াহ্নে শান্ত নদীর উপর দিয়া তরণী বাহিয়া যাইতেছিলাম। তটিনী মুকুরের মত স্বচ্ছ। নভস্তলে সুধাংশু হাসিয়া উঠিল ; তখন ছোট ছোট তরঙ্গের সহিত কৌমুদীর কি ললিত লীলা ! তরীখানি ধীরে যাইতেছিল ; কিন্তু সহসা,

কে গেল রে কোথা দিয়া আহা আচম্বিতে

সব সংজ্ঞা বিরহিত ছিনু মুগ্ধ প্রাণে ;
কি কথা জানায়ে গেল প্রাণ পূর্ণ করি!
আজো চাহি মনোভুলে সে অতীত পানে
ব্যাকুল বিহ্বল তানে বক্ষ উঠে ভরি'।

ঠিক এমনই প্রাণ সঙ্গিনীর সকল কবিতাতে নাই। কিন্তু এমন অনেক লাইন আছে, যাহা পাঠকের চিত্তে বিপ্লব—অন্ততঃ হিল্লোলের সৃষ্টি করে। যখন পড়ি, 'সেই সুখ, সেই স্মৃতিখানি' তখনই হৃদয়ে অতীত দিনের কোন না কোন একটি স্মৃতি জাগিয়া উঠে। প্রায় সকলকারই অতীত জীবনে দু' চারিটি এমন ঘটনা থাকেই, যাহা কবির এই চারিটি কথায় সন্দীপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। মানব-চিত্তে এমন কতক গুলি feeling প্রায়ই letent অবস্থায় থাকে, যাহা একটুকু বহ্নিকণার স্পর্শমাত্রেই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। বিষয়গুণে কখন তাহা অমৃতাপভাতি—পূর্ণিমার কৌমুদীর মত উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ; কখন বা তাপ প্রচণ্ড—মধ্যাহ্নের রুদ্র কিরণের মত প্রখর, দাহকারী। সেই দীপক বহ্নিকণা কবির প্রতিভা—সুনিপুণ ভাবপ্রকাশ।

"প্রাণের আভাষে" কবি বলিতেছেন,

কে যেন সুদূরে বসি' সাদর আহ্বানে
ডেকে নিল স্বপ্নপুরে মোর মুগ্ধ প্রাণে।

পৃথিবীর কষ্ট সেখানে কিছু ছিল না। কল্পনাদেবী বদান্য হস্তে অমৃত দান করিতেছিলেন। মিলনভূয়িষ্ঠ প্রীতিরসে নিমগ্ন ছিলাম। তার পর, সহসা যখন মোহ ভাঙ্গিয়া গেল, প্রত্যক্ষের আঘাতে কি দারুণ বেদনা! "অশ্রু ভ'রে এল দুটি নয়নে নীরবে।"

এতক্ষণ আশায় উৎফুল্ল হইয়া ভাবিতেছিলাম, এই আমার "কনক-নিকষ-স্নিগ্ধা" প্রেয়সী, কিন্তু এ যে বিদ্যুৎ!

রচয়িত্রী একাধিকবার এই হত-আশার কথা বলিতে গিয়াছেন। আমার মনে হয়, তিনি যেন সর্ব্বত্র সফল হয়েন নাই। তিনি যেন হৃদয়ের নৈরাশ্য লইয়া বাক্যের অভিনয় করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার imagination আর feeling এ যেন তেমন খাপ খায় নাই—উভয়ের সংযোগ যেন সম্পূর্ণ হয় নাই। "আমি বড় কষ্ট পাইতেছি; কত দূর হাঁটিয়া মরণের রাজ্যে যাইতে পারিব বলিতে পার? সেখানে অকালমৃত্যু আছে কি? সেখানে কি এমন রোগ শোক আছে?" ইত্যাদি সন্ধানে শ্রোতা বিরক্ত হইতে পারে। "আন্ বিষ" "দে দড়ি" প্রভৃতি শুনিলে মনে হয়—কে যেন অভিনয় করিতেছে—তাহার হৃদয়ের যন্ত্রণা যেন তেমন গভীর নয়। হৃদয় যখন সংপীড়িত, তখন কি 'লেক্‌চার' দিবার সময়? তখনকার একটি দীর্ঘশ্বাস, মর্ম্মশোণিতের মত উত্তপ্ত দুটি অশ্রুবিন্দু হৃদয়ের নিদারুণ বেদনা জানাইয়া দেয়—পাষাণকেও বিগলিত করে। তখনকার কাতরোক্তি চারি দিকের বিচার করে না—অন্ধ নিরাশ্রয় উন্মাদের মত এক দিকে ছুটিয়া চলে। লেখিকা যখন মরণের উদ্দেশে বলিতেছেন,

সেই বুঝি সুখলোক
নাই রোগ, নাই শোক
তাই স্নেহময় মৃত্যু
ছাড়িতে না চায়!

তখন আমাদের সহজে মনে হয় না যে, তিনি সত্য সত্যই মরণকে "স্নেহময়" দেখেন। হৃদয় যখন বেদনায় নিপীড়িত, তখন শুধু বলিতে পারে :—

"মরণ রে! তুঁহু মম শ্যাম সমান!"

হে মৃত্যু, তোমার রাজ্যে রোগ আছে কি-না, শোক আছে কিনা, জানিতে চাহি না ; হে মরণ! শুধু তোমাকে চাই। তুমি এস—প্রিয়তম শ্যামের মত! আমি চাই তোমার সেই "large embraces", যা' "keen lifepain!" আমার নিখিল অঙ্গ, আজন্মের সাধ আকাঙ্ক্ষা শুধু তোমাকে চাহে—ওগো মৃত্যু! তোমারই জন্ম খসিয়া মরিতেছে! দেখ দেখ, "নিরদয় মাধব" আমাকে কি অবহেলা করেছে! এখন, তুমি একমাত্র স্নিগ্ধ বন্ধুজনের মত এস—আমাকে ত্যাগ করিও না।

প্রকৃত নৈরাশ্যদগ্ধ হৃদয় মরণের জন্য এমনই একান্ত কাতর। প্রকৃত নৈরাশ্যদগ্ধের মানসিক মৃত্যু অনিবার্য্য। পৃথিবীর নিখিল প্রিয়বস্তু যখন হারাইয়াছে, তখনই হৃদয় মরণকে প্রিয়তম করিয়া লইতে পারে। অন্যথা, মরণ-তত্ত্ব বুঝাইয়া মরণ-প্রীতির পরিচয় দিয়া, পাঠকচিত্তে আন্তরিক বেদনার উদ্রেক করা অসম্ভব।

সঙ্গিনীর নৈরাশ্য-সূচক কবিতাগুলি একাধিক স্থানে এইরূপ কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট।

মৃত্যুর অগম্য লোকের অধিরাজ অমৃতময়ের নিকট লেখিকা যে "নিবেদন' করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভক্ত-হৃদয়ের প্রেমমহান গর্ব্বের দিব্য আভায় কবিতাটি সমুজ্জ্বল।

কণামাত্র প্রসাদের
ভিখারী নহি ত আমি
সারাখানি প্রাণ মোরে
দিতে হবে অন্তর্য্যামী।

যথার্থ ভক্তজনোচিত হইয়াছে। "জাহ্নবীর প্রতি বরুণা" নামক মনোরম কবিতাটিতে কবি এই ধরণের কথা বলিয়াছেন :--

স্নেহ ভিক্ষা নাহি লই :—
হৃদয়-বাণিজ্যে সে যে তুচ্ছ বিনিময়।

মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "প্রদীপে" লিখিয়াছেন, "লেখিকা প্রেমের কথা লইয়া বেশী নাড়া চাড়া করেন নাই।" সঙ্গিনীর কবি 'প্রেম' এই শব্দটি বারবার আবৃত্তি না করুন, কাব্যের সর্ব্বত্র প্রেম বিদ্যমান। প্রেমের অবিকৃত মর্ম্ম সম্যক্ বুঝিয়াই তিনি লিখিয়াছেন,

লালসার জ্বালাহীন, নির্ম্মল নিষ্কাম
প্রেম—আত্মশুদ্ধি, তৃপ্তি, চিত্তের বিশ্রাম।

তিনি যে, "বিকশিত কুসুমোদ্যানে ধ্বংসের ছায়া দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়াছেন," তাহাও প্রেমের বশে। তিনি সুন্দরকে যথার্থ ভালবাসিয়াছেন, তাই তাহার বিনাশ-চিন্তাতেও কাতর। তিনি যে, "তরুণ বয়সেই জীবনের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া একটুকু গম্ভীর ভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন," তাহাও প্রেমের খাতিরে। কবি দেখিয়াছেন, পৃথিবীর সকল আনন্দে, মানবের নিখিল সুখে বিষাদের ছায়া পড়িবেই।

Ay, in the very temple of delight
Veil'd Melancholy has her sovran Shirne.

তাই, কবি-হৃদয় শঙ্কিত—কখন প্রেমের পুষ্প শুকাইয়া যায়,—কখন প্রেমের পেলব অন্তরে আঘাত লাগে। যেখানে প্রেম, সেইখানেই "Divine Melancholy," সেইখানেই Majestic pain—হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম ও পবিত্রতম বৃত্তি প্রেম, ললিত কবিতার প্রাণ। সঙ্গিনীর প্রত্যেক কবিতাই প্রেমের অমৃতে অভিষিক্ত।

সঙ্গিনীর ভাষা সম্বন্ধে দু' চারি কথা বলিয়া আজিকার আলোচনা শেষ করিব। সূর্য্য ও সমুদ্রের পূজারি Swinburnএর নায়িকা যেমন

Glad, but not flushed with gladness,
Since joys go by;
Sad, but not bent with sadness,
Since sorrows die;

সুরমাসুন্দরীর ভাষাও অনেকটা সেইরূপ। তাঁহার ভাষা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল নয়—অথচ সঙ্কোচে 'আড়ষ্ট' নয়। কিন্তু সময়ে সময়ে তিনি যেন ভাষাকে ন্যায্য স্বাধীনতা দান করেন নাই,—তাই, অনুভবের গভীরত্ব থাকিলেও, ভাষা স্থানে স্থানে তাহার পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। আমি বলিতেছি না, তাঁহার ভাষা মন্দ। প্রত্যুত, সঙ্গিনীর ভাষা উপাদেয়। তবে, আমার মনে হয়, লেখিকা ভাষাকে ভাবের সম্পূর্ণ অনুগত করিয়া লইতে পারেন নাই—তাঁহার হাতে ভাষা সম্পূর্ণ pliant বা yielding হয় নাই। প্রথম উদ্যমে কোন লেখকের নিকট তাহার আশা করাও অনুচিত। আর এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সফল হওয়া অল্প ক্ষমতার কথা নয়।

আমার বিশ্বাস, সঙ্গিনীর ভাষায় কবি প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর ছায়া বা প্রভাব লক্ষিত হয়। যেমন, "প্রকৃতির প্রতি" কবিতাটি পড়িলে, গীতিকার "পল্লীবাসিনীর" ভাষা ও ছন্দ মনে পড়ে। "হৃদিজাত", "মণিমূর্ত্তি তারকা," "অলোক আলোক" প্রভৃতি শব্দ অনেকটা প্রমথনাথের অনুকরণে সৃষ্ট বলিয়া মনে হয়।

কবি সমাপনে সঙ্গিনীকে বলিতেছেন,

আরো কাছে এস স'রে
এক-দণ্ড থাকি ম'রে
থেমে থাক্ গীত গান, বীণার ঝঙ্কার।

এই বিশ্রামের পর, আমরা লেখিকার নিকট উৎকৃষ্টতর গীতিকবিতার আশায় রহিলাম। তিনি সঙ্গিনীর বীণায় যে সকল গান শুনাইয়াছেন, তাহার অনেক সুর বহুদিন ধরিয়া শ্রবণে ধ্বনিত হইবে। সুন্দরকে কে কবে সহজে ভুলিতে পারে?

শ্রীমন্মথ নাথ সেন।

"সাহিত্য" ও সাহিত্য সমালোচনা।

সুচালিত সহযোগী মাসিকপত্র সকলের উল্লেখ ও আলোচনা এই পত্রের একটা অঙ্গ। এটা এখন ইহার পুরাতন ও প্রচলিত পদ্ধতি হইয়াই দাঁড়াইয়াছে।

পদ্ধতিটি আমরা নিজেই প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম; করিয়া ভাল কি মন্দ করিয়াছিলাম, ঠিক বলিতে পারি না। কারণ, পরে এই পদ্ধতি অপরে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলেও, এবং ইহা দ্বারা উপযুক্ত আদর-সম্ভ্রম-বিরহিত ও অবহেলার অন্ধকার কক্ষে নিহিত, নিত্যবর্দ্ধনশীল, সহযোগী বাঙ্গালা সাহিত্যের লেখকগণের সাধারণতঃ উপেক্ষিত ও অজিজ্ঞাসিত রচনাবলীর,—অন্ততঃ অনেক প্রবন্ধের একটা উল্লেখ আলোচনা প্রাপ্তির পথ,—সাধারণ্যে প্রদর্শিত চিহ্নিত ও আকৃষ্ট হওয়ার একটা প্রকৃষ্ট সুযোগ হইলেও, আমরা ইহাতে কোন অংশেই সুখী হইতে পারি নাই। স্বদেশীয় সহযোগী সাহিত্যের সুনিয়মিত সমালোচনা পদ্ধতির প্রবর্ত্তনের দিন হইতেই, এই ক্ষুদ্র পত্রের ও অকৃতী সম্পাদকের কেবল শত্রুবৃদ্ধি হইয়াই চলিয়াছে, বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, চিরপোষিত ও একান্ত বাঞ্ছিত বন্ধুত্বের স্থলে, অজ্ঞাতে ও অকারণে মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে। বলুন, ইহা অপেক্ষা অভাগ্য ও আক্ষেপের বিষয়, সংসারী ও সামাজিক জীবের পক্ষে আর অধিক কি হইতে পারে?

সাহিত্যের সাধারণ ও নির্ব্বিবাদ প্রাঙ্গনের সম্যক অসূয়াশূন্য ও শান্ত স্থানে দাঁড়াইয়া, স্বকীয় আলোক ও সমালোচনার শিষ্টানুমোদিত ও সমীচীন নিয়মানুসারে রচনার সাহিত্য-গত গুণাগুণের নির্দ্দেশ করিয়া স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিলে, রচয়িতার স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে ও তদীয় ব্যক্তিত্ব ব্যথা পাইয়া, অবৈধভাবে বিদ্বেষবিষাগ্নির উদ্গার করিতে, অথবা সেটা চতুরতার সহিত তৎকালের জন্য চাপিয়া রাখিয়া সময়ান্তরে অপর প্রকারে সমালোচককে অভিশপ্ত ও অপদস্থ করিতে, কেবল অভাগ্য ইঙ্গ-বঙ্গেই দেখা যাইতেছে।

অন্যত্র কিন্তু ব্যবস্থা এরূপ নয়। সমালোচনার শর তীক্ষ্ণানুভব হইলে বা অন্যায় নিক্ষিপ্ত ও অসহ্য বোধ হইলে, সশস্ত্র সাহিত্যক্ষেত্রস্থ হইয়া, সম্মুখ-সংগ্রাম করাই সভ্যতানুমোদিত রীতি, এবং সরলতা ও সাহসিকতার পরিচায়ক। শত্রুর সুপ্তাবস্থায় গুপ্ত ঘাতকের ছুরিকার চালনা করা, অন্ততঃ সাহিত্য-সেবীদের পক্ষে শোভা পায় না। তা আমাদের বড় সাধের বাঙ্গালা সাহিত্য প্রায় এইরূপ মহত্ত্বেই পঁহুছিতে চলিয়াছে।

বলিতে কি, নিজের নিকটে নিজ সম্মান রক্ষা করিয়া, সহযোগী সাহিত্যের সমালোচনার স্বপ্রবর্ত্তিত পদ্ধতি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার উপযুক্ত উপায় থাকিলে, আমরা নিশ্চয়ই ঐ অকৃতজ্ঞ কার্য্য হইতে এত দিন অবসর গ্রহণ করিতাম, প্রতিভাভিমানস্ফীত, বাক-সিদ্ধ সহযোগী লেখকবর্গের অতি বেগ্নে

অমরপুরগামী অপরিসীম অহঙ্কারের পুষ্টিসাধনে অক্ষম হইলে, তাহার অঙ্গ-স্পর্শ করিয়া কোনও ক্রমেই আত্মস্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায় হইতাম না। সংসারে নিজের নির্বিঘ্নতা ও নিশ্চিন্ততা কে না চায়, এবং সম্ভব ও সহজ হইলে, কেই বা তাহার সহিত এক মাত্রা অধিক ইষ্ট ও আরাম সংযুক্ত করিবার চেষ্টা না করে? মোসাহেবী সমালোচনা ও "বসওয়েলী" উপাসনার বিনিময়ে সুলভ সৌহৃদ্যের সুখসংগ্রহে সবিশেষ শক্তিবান না হইলেও, অন্ততঃ সমালোচনাটাকে বাণপ্রস্থে প্রেরণ করা বা অসীম সমাধিতে বিলীন করা, কিছুই অসাধ্য ছিল না। কিন্তু অঙ্গীকৃত ও স্বপ্রবর্ত্তিত কার্য্যের মধ্যপথ হইতে নিঃশব্দে প্রত্যাবর্ত্তন বা পলায়ন করাটা নিতান্তই কাপুরুষতাব্যঞ্জক, এবং এ ক্ষেত্রে একান্তই আত্ম-প্রীতি ও স্বার্থপরতার পরিচায়ক হইয়া পড়ে; সুতরাং আমরা মাসিক সাহিত্য সমালোচনার অপ্রীতিকর কাজটা অগত্যাই ছাড়িতে পারি নাই, এবং বলা বাহুল্য যে, এই পত্রের চিরাগত ও অপরিবর্ত্তিত বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সেটা সম্প্রতি সম্ভবও হইতেছে না।

আত্মপক্ষের এই কথা কয়টা,—আন্তরিক আক্ষেপেরই কথা কয়টা বলিবার অবসর অনেক দিন হইতেই হইয়াছিল, এবং দিন দিন তাহার কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া, কেবল 'ক্রমবিকাশ' হইয়া চলিলেও, 'বলি বলি' করিয়া বলা হয় নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রতি আরোপিত অমূলক অভিযোগ ও অসূয়ার কথা কেবল শুনিয়াই চলিয়াছি, এবং শুনিতেই থাকিব, তাহার সন্দেহ নাই। তথাচ আজ এ বিষয়ে সাধারণতঃ আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল, এবং যাহা আমরা অকপটে অনুভব ও বিবেচনা করি, স্পষ্টই ব্যক্ত করিলাম। সরলান্তঃকরণের কথা সর্ব্বত্রই কিঞ্চিৎ সহৃদয়তার সহিত গৃহীত হইবে, মনে করা অন্যায় বা অতিরিক্ত প্রত্যাশা না হইতে পারে। সকলেরই, বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠ শক্তি ও সুমার্জ্জিত বুদ্ধির অধিকারী সাহিত্য-সেবী সহযোগী ও আমাদের সর্ব্বথা শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর্গের বিশুদ্ধ-চিত্তে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, সমালোচনা-সঞ্জাত উচিত উক্তিতে যদি একটা অঙ্কুশ সংযুক্ত থাকা যথার্থ ঘটনাই হয়, তবে একান্ত ইতর ও নিন্দাজীবীর কদর্য্য জিহ্বা ভিন্ন অপর কোথাও সে অঙ্কুশ অসূয়ার বা অপ্রীতির বেদনাদায়ক অঙ্কুশ নয়; সেটা সমালোচনার নিজেরই স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য অঙ্গ। সমালোচনা বিকৃত ও বিকলাঙ্গ না করিয়া, তাহার সে অঙ্গের সে অঙ্কুশের তীক্ষ্ণতা নিস্তেজ তরল ও কোমল করা যদি আদৌ সম্ভব হয়, তবে বড় জোর, তাহাতে অতিরিক্তমাত্রায় বিনয় নম্রতার নবনীত মাখাইয়া, বা মাত্রাহীন শিষ্টাচারের

অজস্র দুগ্ধ তক্র ঢালিয়া, সে চেষ্টা চলিতে পারে; যদিও অত্যাধিকপরিমাণে তাহা একটা বিসদৃশ ও বিদ্রূপকর ব্যাপার বই আর কিছুই হয় না। কিন্তু তাহারও ঊর্দ্ধে উঠিয়া, সেটাকে যদি তোষামোদে তৈলাক্ত করিয়া স্তুতিবাদের তৈলেই পুনঃপুনঃ 'সাঁতলাইতে' হয়, তাহা হইলে তাহার আর স্বাভাবিক ধাতু রক্ষিত হয় না, সমালোচনা উপাসনারও উপরে আরও অর্দ্ধ গজ অতিরিক্ত উচ্চ হইয়া দাঁড়ায়। "সাহিত্য" তাহাতে অবশ্যই অসমর্থ। নহিলে পার্য্যমানে কাহারও আত্মাভিমানে ন্যায় বা অন্যায় আঘাত করিয়া, অপ্রীতি উৎপাদন করিতে ও অভিসম্পাতভাজন হইতে স্বভাবতঃই ইচ্ছা করে না। কেন করিবে? "সাহিত্য" তাহার জন্মাবধি শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে, পরিচিত অপরিচিত বিচার না করিয়া, সকলকেই যথাবিহিত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে; তাহা হইতে কখনও বিচলিত হইবে না।

অন্ততঃ এই একটা বিষয় আমরা নিঃশঙ্ক ও নিঃসংশয় চিত্তে ব্যক্ত করিতে পারি যে, "সাহিত্য" সাহিত্যক্ষেত্রে আর কিছু করিতে না পারুক, অদ্যাবধি এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখনও সেই সদা-পরিবর্ত্তনশীল সংসারে নিজের অবলম্বিত অভিমত, নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্ত্তন, প্রত্যাহার বা অস্বীকার করে নাই। সুখে দুঃখে, সুখ্যাতি ও নিন্দায়, সে আত্মগত প্রণালীতেই পরিচালিত হইয়া একই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে; চাঞ্চল্যে চালিত বা সুবিধা অসুবিধার বশবর্ত্তী হইয়া, স্বপথবিচ্যুত ও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয় নাই, ইহাই তাহার একমাত্র সান্ত্বনা। এবং সত্যপরায়ণ হইলে, তাহার শত্রু বা প্রতিযোগী পক্ষেরও কেহ ইহা অস্বীকার করিবেন না, এমন আশাও করিতে পারি। সাহিত্যের সমালোচনা সময়ে সময়ে উগ্র, তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইতে পারে, হইয়াই থাকে, হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহার উপাদান ও অভিপ্রায় কখনও নিছক নিন্দা ও নিরবচ্ছিন্ন স্তবস্তুতি নহে; সর্ব্বোপরি তাহার সমালোচনা স্বপ্নেও কখনও অসূয়া-সঞ্জাত নহে, ইহাও অপক্ষপাতী বিচারকগণ স্বীকার করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না। সুখ্যাতির স্থলে "সাহিত্য" মুক্তকণ্ঠেই সুখ্যাতি করিয়া থাকে; পক্ষান্তরে কর্ত্তব্যানুরোধে দোষ দর্শাইতেও সে সঙ্কুচিত হয় না। তথাচ, সবিশেষ ক্লেশের সহিতই তাহাকে সে কার্য্যটি সম্পন্ন করিতে হয়। যাঁহাদের আত্মাভিমান আত্মপ্রশংসা ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে চায় না, মৃদু স্পর্শেই মানিনী কামিনীর মত ফণা উঁচাইয়া 'ফোঁস্ ফোঁস্' গর্জ্জে, প্রধানতঃ তাঁহারাই সাহিত্যের সমালোচনার সব সময়ে ঠিক আপনাদের

বাঞ্ছানুরূপ বস্তুটি না পাইয়া, তাহাতে অসূয়া ও অশিষ্টাচারাদির স্বকপোল-কল্পিত গন্ধ পান, এবং সেই গন্ধে মগজগুলাকে পরিপূর্ণ ও প্লাবিত হইতে দিয়া, অসীম আত্মপ্রশংসাপিপাসার নিদারুণ অন্তর্জালায় অগ্নিক্ষিপ্ত বার্ত্তাকুবৎ দীর্ঘ দাহে দগ্ধীভূত হইতে থাকেন। জানি না, ইহা আধিভৌতিক কি আধি-দৈবিক দুঃখের দহন। কিন্তু নিশ্চয়ই ইহা তাঁহাদের আত্মসৃষ্ট অহেতুক দুঃখ, এবং দুর্জ্জয় দুরাকাঙ্ক্ষাজনিত দুর্গতি। সংসারের অসংখ্য প্রকৃত ক্লেশের অতিরিক্ত জীবের এই আত্মকল্পিত অসহ্য ক্লেশে আমরা নিজেই নিরতিশয় ক্লিষ্ট। কিন্তু এই ক্ষুদ্র "সাহিত্য" কোনও অংশে ইহার কারণ নহে। তথাপি যদি "কারণ" বলিয়া কল্পিত হয়, সেটা অমূলক কবি-কল্পনামাত্র,—কল্পনা-কারীর ভ্রান্তি ও সাহিত্যের অভাগ্য।

"সাহিত্য" সাহিত্যাধিকার ভিন্ন অপর কোনও অধিকারেই কখনও কাহারও সমালোচনা করে না। সম্যক্‌রূপে সেই অধিকারের অভ্যন্তরে থাকিয়া, এবং তাহার অতীত, অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল না হইয়া, সকলেরই, বিশেষতঃ সব্রতে ব্রতী সাহিত্য-সেবিমাত্রেরই শুভকামনা করে। সব সময়ে সকলকে তুষ্ট করিতে না পারিলেও কখনও কাহাকেও রুষ্ট করিতে চাহে না; ইহা উল্লিখিত আত্মসিংহত্বাভিমানী ও কৃত্রিমকলাভিনয়ী ক্রূর ও কপট ব্যক্তিগণ ভিন্ন আর সকলেই বুঝেন ও বুঝিবেন, সন্দেহ নাই।

রবি বাবুর কবিতার ছন্দ।

কিছু দিন পূর্ব্বে "ভারতীতে" শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী মহাশয় 'কবিতার ছন্দ ও মিল' সম্বন্ধে একটি সুপাঠ্য চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উহাতে প্রধানতঃ নব্য বঙ্গের প্রিয় গীতিকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিতার ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। আমরাও অদ্য এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি।

রবি বাবুর লেখা সম্বন্ধে যত বেশী আলোচনা হয়, ততই দেশের গৌরব ও বাঙ্গালীর গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রকাশ পায়,—মনে করি। যে দেশের লোক প্রকৃত গুণগ্রাহী, সে দেশে প্রসিদ্ধ কবিদিগের কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের

আলোচনায় তাঁহাদের রচনার ভাবভঙ্গী, উৎস প্রভৃতির নির্ণয়ে বিশেষ উপকার আছে।

ঈশ্বরানুগ্রহে আমরা বর্ত্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের মত এক জন চতুরগ্রশিরস্ক প্রতিভাবান্ কবি পাইয়াছি। তাঁহার জীবনের না হউক, রচনার বিশ্লেষণের সময় আসিয়াছে, সন্দেহ নাই। তাই আমরা ভারতীর প্রবন্ধ উপলক্ষে তাঁহার রচনা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

বিহারী বাবু লিখিয়াছেন যে, কোন শব্দের আদিতে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দ একাক্ষর হইলে, সেই অক্ষরটিকে রবি বাবু গুরু ধরিয়া থাকেন; কিন্তু সেই শব্দটি একাধিক-অক্ষর-বিশিষ্ট হইলে তিনি তাহার শেষ বর্ণটিকে গুরু ধরেন না। কথাটা ঠিক্; রবি বাবু ঐ রূপই করেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের মতে কবির এই পার্থক্য করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কবি লিখিয়াছেন,

কহিলাম আমি তুমি ভূস্বামী,
ভূমির অন্ত নাই,

আমরা লিখিতে চাই—

কহিলাম আমি হৃদয়-স্বামি
ব'সহ হৃদয়াসনে।

কবি লিখিয়াছেন—

স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে
কহিলাম জোড় করে; (মানসী, ১৫৭ পৃষ্ঠা।)

আমরা লিখিতে চাই—

স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রাতে
কহিলাম যোড় করে;

পাঠকের কানে কি আমাদের এই পরিবর্ত্তিত লাইন কয়টি কুৎসিত শুনাইতেছে? কবি লিখিয়াছেন;—

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম
উঠিল কলস্বর,
গাছের শাখে জাগিল পাখী
কুসুমে মধুকর।

উঠিল জাগি রাজাধিরাজ,
জাগিল রাণী মাতা,
কচালি আঁখি কুমার সাথে
জাগিল রাজভ্রাতা।

সোনার তরী, ১৯ পৃঃ।

উদ্ধৃত কবিতায় 'কলস্বর' ও 'রাজভ্রাতা' শব্দের প্রত্যেকটিকেই কবি চারি অক্ষর ধরিয়াছেন। আমরা উহাদিগকে পাঁচ অক্ষর ধরিয়া কবিতা দুটিকে নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্ত্তিত করিতে চাই:—

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম
উঠিল কলস্বর,
গাছের শাখে জাগিল পাখী

উঠিল জাগি রাজাধিরাজ,
জাগিল রাণীর মাতা,
কচালি আঁখি কুমার সাথে

কবি এইরূপ "কলধ্বনিকেও ৪ অক্ষর ধরিয়াছেন ; যথা মানসী, ১৪৪ পৃঃ—

সেথায় পশে না কলধ্বনি।

কবি 'অনুগ্রহ' শব্দকে পাঁচ অক্ষর করিয়াছেন, যথা—

চাহি না আমি অনুগ্রহ,
বচন এত শত।—মানসী, ১১৮ পৃঃ।

কিন্তু তিনি 'শুভগ্রহ' শব্দকে ৪ অক্ষরের বেশী মর্য্যাদা দিতে রাজী নন। নিম্নলিখিত কবিতায় আমরা 'শুভগ্রহ' শব্দকে পাঁচ অক্ষরই ধরিয়া লইলাম ; দেখা যাক্, কেমন হয়,—

আজিকে তব শুভগ্রহ
বাঁচিয়ে এলে তাই।
উচিত হয় মিঠাই এনে
খাইতে দে(ও)য়া ভাই !

পাঠক কি এ স্থলে ছন্দোভঙ্গ দোষ পাইতেছেন ?

কবি 'পুরস্কার শব্দকে ৫ ও 'পুরদ্বার' শব্দকে ৪ অক্ষর ধরিয়াছেন।

রবি বাবুর মতে 'প্রতিধ্বনি' শব্দকে পাঁচ অক্ষর ধরা উচিত, কিন্তু সমাসবদ্ধ না থাকিয়া ব্যস্তভাবে 'প্রতিধ্বনি' থাকিলে ৪ অক্ষর ধরা তাঁহার অভিমত। তাঁহার হিসাবে নিম্নলিখিত দুইটি কবিতার প্রথমটি শুদ্ধ ও দ্বিতীয়টি ছন্দোভঙ্গদোষদুষ্ট :—

১নং। স্তব্ধ নিশীথে নিমাই নিমাই
ডাকে জননী,
বিদ্রূপভরে 'নাই নাই'
বলে প্রতিধ্বনি।

২নং। স্তব্ধ নিশীথে নিমাই নিমাই
ডাকে জননী,
আঁধারে ডুবিছে ব্যর্থ তাহার
প্রতিধ্বনি।

আমাদের কানে বা জ্ঞানে উক্ত দুই স্থলে পার্থক্য করিবার কোন কারণ কিছু পাইলাম না। বরং তাহা আমাদের নিকট অস্বাভাবিক বোধ হয়।

রবিবাবু 'বেদব্যাস' শব্দকে ৫ অক্ষর ধরিয়াছেন, যথা মানসী, ১২৪ পৃষ্ঠা,—

কে বলিতে চায় মোরা নহি বীর
প্রমাণ যে তার রয়েছে গভীর,
পূর্ব্বপুরুষ ছুঁড়িতেন তীর
সাক্ষী বেদব্যাস।

কিন্তু 'বেদব্যাস' না থাকিয়া 'মুনি ব্যাস' থাকিলেই তিনি ৪ অক্ষর ধরিতেন। আমরা কবির এই একদেশদর্শিতায় ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।

ফলতঃ 'বেদব্যাস' শব্দকে পাঁচ অক্ষরের সম্মান দেওয়া, এবং 'কলস্বর' ও 'রাজ-ভ্রাতা' শব্দকে সে সম্মানে বঞ্চিত করিবার মূলে একদেশদর্শিতা ভিন্ন অন্য কি আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। উক্ত তিনটি শব্দই তুল্যরূপে সমাসবদ্ধ ও সর্ব্বাংশে সমাবস্থ নয় কি ?

কবির এই পক্ষপাত দোষের উদাহরণ আরও আছে। আমরা মানসী ও সোনার তরী অবলম্বনেই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থন করিব। কবির অন্যান্য বই খুঁজিলে আরও রাশি রাশি উদাহরণ উদ্ধৃত হইতে পারে।

জলোচ্ছ্বাস শব্দটিকে কবি ৫ অক্ষর ধরিয়াছেন; যথা সোনার তরী, ২০৭ পৃঃ—

হুহু ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস!
অন্ধ আবেগে করে গর্জ্জন
জলোচ্ছ্বাস।

কিন্তু তুল্যাবস্থ সন্ধি-সমাস-বদ্ধ 'মনোব্যাকুলতা' শব্দকে ৭ অক্ষর না ধরিয়া ৬ অক্ষর ধরিয়াছেন। যথা, মানসী, ২১২ পৃঃ—

(শুধু) একটি মুখের এক নিমিষের
একটি মুখের কথা,
তারি তরে বহি চিরজীবনের
চিরমনোব্যাকুলতা।

আমাদের মনে হয়, (ক) সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বে 'রাজভ্রাতা' 'মনোদ্বার' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় একাধিক-অক্ষর-বিশিষ্ট ভিন্ন শব্দ থাকিলে, এবং উভয় শব্দের মধ্যে সন্ধি সমাস থাকিলে, ঐ সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে আবশ্যক মত দীর্ঘ ধরা যাইতে পারে। যেখানে সন্ধি না হইয়া কেবল সমাস হইয়াছে, সেখানেও দীর্ঘ ধরা যাইতে পারে।

রবিবাবুর লেখা দেখিয়া বোধ হয় যে, পূর্ব্বপদ একাক্ষর হইলেই তিনি কেবল দীর্ঘ ধরিতে ইচ্ছুক, অন্যত্র নহে।—

আর, যদি পূর্ব্বপদ পরপদের সহিত রক্তে মাংসে মিলিত হইয়া একটি অবিচ্ছিন্ন অভিধান-লভ্য নূতন পদের সৃষ্টি করে, (যেমন বেদব্যাস, প্রতিধ্বনি, অনুগ্রহ, পুরদ্বার প্রভৃতি শব্দে) তাহা হইলে তিনি সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণকে দীর্ঘ ধরিতে রাজী আছেন; কিন্তু 'মুনি ব্যাস' প্রতিধ্বনি, শুভগ্রহ, মনোদ্বার প্রভৃতি স্থলে রাজী নন। আমরা এরূপ পক্ষপাতের পক্ষপাতী নহি।

কবিও দুই এক স্থলে অজ্ঞাতসারে আমাদের প্রস্তাবিত প্রসারিত নিয়মের অনুসরণ না করিয়াছেন, এমন নহে। তিনি 'জলোচ্ছ্বাস শব্দের 'লো' এবং 'কাণ্ডজ্ঞান' শব্দের 'ণ্ড'কে দীর্ঘ ধরিয়াছেন। প্রথম শব্দটির ব্যবহারস্থল পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। শেষোক্ত শব্দটি ১৩০৫ সনের ভারতীর ৯৭৪ পৃষ্ঠাঙ্ক 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নামক কবিতায় ঐ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

অনেক মূর্খে করে দানধ্যান,
কার আছে হেন কাণ্ডজ্ঞান।

(খ) যেখানে সন্ধি বা সমাস কিছুই হয় নাই, সেখানেও আবশ্যকমত দীর্ঘ ধরা যাইতে পারে; অর্থাৎ, নিম্নলিখিত নমুনায় কবিতা লেখা যাইতে পারে, তাহাতে ছন্দোভঙ্গ দোষ স্পর্শে না।

জোছনার মত স্বচ্ছ শীতল হাসি হাসি মুখ অমিয় উৎস
হৃদয় কি শোভা ধরে ঝরে তাহার স্বরে।

এখানে তাহার শব্দের 'র'কে দীর্ঘ ধরা হইল।

কবিও অন্ততঃ একবার অজ্ঞাতসারে, বোধ হয়, ভাষার সহজ প্রকৃতির প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া, এরূপ স্থলে দীর্ঘ ধরিয়াছেন। যথা:—

বিজ্ঞ ভাবে নাড়িব শির মোদের বড় এ পৃথিবীর
অসংশয়ে করি স্থির কেহই নহে আর।

মানসী, ১২০ পৃঃ।

এখানে 'করি' শব্দের 'রি' দীর্ঘ ধরিয়াছেন।

উক্ত উভয় নিয়ম সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা আছে,—

উপরি-লিখিত যে যে স্থলে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণকে 'আবশ্যকমত' দীর্ঘ ধরিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, ঐ সকল স্থলে সর্ব্বদাই দীর্ঘ ধরিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। অর্থাৎ, কোন কবি ইচ্ছা করিলে রবি বাবুর মত হ্রস্বও ধরিতে পারেন, কেহ বা ইচ্ছা করিলে দীর্ঘও ধরিতে পারেন।

কিন্তু যে স্থলে ঐ সংযুক্ত বর্ণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যতি পড়িবে, সে স্থলে তাহার পূর্ব্ববর্ণকে দীর্ঘ ধরা কদাপি সঙ্গত নহে। যথা,—

চমকি মুখ দু হাতে ঢাকে লজ্জাহীন প্রদীপ কেন
সরমে টুটে মন, নিভে নি সেই ক্ষণ।

সোনার তরী।

এ স্থলে প্রদীপ শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী 'ন' অক্ষরটিকে দীর্ঘ ধরিতে কেহই পরামর্শ দিবেন না।

নির্ব্বাত সম সে ঘোর কাননে
বসি ঋষিবর স্তিমিতনয়নে।

এখানেও উক্ত কারণেই 'ঋষিবর' শব্দের 'র' দীর্ঘ ধরা অনুচিত।

এমন কি, সমাসবদ্ধ শব্দের বেলাও এরূপ স্থলে দীর্ঘ ধরা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত। যথা,—

কোথা সে পাষাণী কোথায় এখন,
মম হৃদি-অধীশ্বরী যেই জন।

এখানে 'অধীশ্বরী' শব্দের 'ধী'কে দীর্ঘ ধরা অনুচিত।

যদি প্রশ্ন উঠে যে, কোনও পাকাপাকি নিয়মে দীর্ঘ না ধরিয়া আবশ্যকমত দীর্ঘ ধরিলে পাঠকের পড়িতে বড়ই অসুবিধা হইবে। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যাঁহাদের কান আছে, অর্থাৎ একটু সঙ্গীতের সুরে বাঁধা কান আছে, তাঁহাদের পড়িতে কোনও স্থলেই কষ্ট হইবে না। কিন্তু যাঁহাদের তেমন কান নাই,সুতরাং যাঁহারা কোন সোজাসুজি বাঁধা পথ না পাইলে বারংবার স্খলিতপদ হন, তাঁহাদের দুরবস্থা চিরদিনই থাকিবে। কারণ, কবি সর্ব্বদাই এক বাঁধা নিয়মে চলিবেন, এরূপ আশা করা অন্যায়। রবিবাবু কোন বর্ণকে হ্রস্ব দীর্ঘ ধরা সম্বন্ধে কতরূপ স্বাধীনতা লইয়াছেন, তাহার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দিতেছি ; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার কবিতা পড়িতে কোনও নিপুণ পাঠকের ক্লেশ হইয়াছে, আমরা এরূপ মনে করিতে পারি না।

(১) কবি 'ঙ্গ' বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণকে কথন বা হ্রস্ব, কথন বা দীর্ঘ ধরিয়াছেন। হ্রস্ব, যথা,—

নয়ন যদি মুদিয়া থাক,
সে ভুল কভু ভাঙ্গিবে নাক।—মানসী, ১২০ পৃঃ।

দীর্ঘ, যথা—

নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি,
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি।
—সোনার তরী, ২০৬ পৃঃ।

কখনো ধীরে ধীরে ভেসে যায়,
কখনো মিশে যায় ভাঙ্গিয়া।
—মানসী, ১৮৭ পৃঃ।

(২) সাধারণতঃ তিনি 'ঙ'এর পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণকে হ্রস্ব ধরিয়া থাকেন ; যথা,—

রাঙা ফুল হয়ে উঠিছে ফুটিয়া
হৃদয় শোণিত পাত। মানসী, ১৩৭ পৃঃ।

কিন্তু প্রয়োজনানুসারে কখনও দীর্ঘও ধরিয়া থাকেন ; যথা—মানসী, ১৩৭ পৃঃ—

কখনো ঘন নীল বিজুলি ঝিলিমিল
কখনো উষারাগে রাঙিয়া।

(৩) ক্ষ বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে কখন হ্রস্ব কখন বা দীর্ঘ ধরিয়াছেন।

হ্রস্ব, যথা—

ম্যাট্‌সিনি-লীলা এমন সরেস,
এরা সে কথার না জানিল লেশ,

হায় অশিক্ষিত অভাগা স্বদেশ—
লজ্জায় মুখ ঢাকো।
—মানসী, ১২৬ পৃঃ।

দীর্ঘ, যথা

ভয় নাই যার কি করিবে তার
এই প্রতিকূল স্রোতে,
তোমারি শিক্ষা করিবে রক্ষা
তোমারি বাক্য হ'তে।
মানসী, ১৬১ ও ১৬২ পৃঃ।

(৪) ঔকারকে প্রায় সর্ব্বত্রই দীর্ঘ করিয়াছেন ; কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে হ্রস্ব করিয়াছেন ; যথা

দূর হৌক এ বিড়ম্বনা,
বিদ্রূপের ভাণ!
সবারে চাহে, বেদনা দিতে,
বেদনা ভরা প্রাণ।
—মানসী, ১১৩ পৃঃ।

আজি মোর মন, কি জানি কেমন,
বসন্ত আজি মধুময়।
* * * *
জগৎ ছানিয়ে, কি দিব আনিয়ে,
জীবন যৌবন করি ক্ষয়।
—মানসী, ১৭৯ পৃঃ।

(৫) কবি সাধারণতঃ এক শব্দের অন্তর্গত সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণকে দীর্ঘ ধরিয়াছেন, কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত স্থলে হ্রস্ব ধরিয়াছেন :—

ওই কারা ব'সে আছে দূরে,
কল্পনা উদয়াচলপুরে।—মানসী, ১৪৫ পৃঃ।

এখানে 'কল্পনা' শব্দের ক হ্রস্ব ধরা হইয়াছে।

হেথা কেন দাঁড়ায়েছ কবি,
যেন কাষ্ঠ-পুত্তল ছবি।—মানসী, ১৪১ পৃঃ।

এখানে কাষ্ঠ শব্দকে দুই অক্ষর ধরা হইয়াছে।

রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে,
সাত সমুদ্র তের নদী পার,
যেখানে যত মধুর ছবি আছে,
বাকী ত কিছু রাখিনি দেখিবার।
—সোনার তরী, ১৫ পৃঃ।

এখানে 'সমুদ্র' শব্দকে ৩ অক্ষর ধরা হইয়াছে।

দেখ হেথা নূতন জগৎ,
ওই কারা আত্মহারাবৎ।
যশ অপযশ বাণী, কেন কিছু নাহি মানি,
রচিছে সুদূর ভবিষ্যৎ।
—মানসী, ১৪৪ পৃঃ।

উদ্ধৃত কবিতায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রের সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে হ্রস্ব ধরা হইয়াছে।

(৬) সাধারণতঃ কবি অনুস্বারের পূর্ব্ব বর্ণকে দীর্ঘ ধরিয়াছেন, কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে হ্রস্ব ধরিয়াছেন।

ইতিহাস নাহি করিল পরশ,
ওয়াশিংটনের জন্ম-বরষ,
মুখস্থ হ'ল নাক।
—মানসী, ১২৬ পৃঃ।

ফলতঃ আমাদের কবি ছন্দঃ বিষয়ে এইরূপ যথেষ্ট স্বাধীনতা লইয়াছেন, এবং তাহাই প্রার্থনীয়। কারণ, ছন্দঃশৃঙ্খলকে যত শিথিল করা যায়, ততই কবির উদ্দাম ভাবরাশি অবাধে চলিবার সুবিধা পায়। কিন্তু পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এবং আবার বলিতেছি যে, সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্ব বর্ণকে দীর্ঘ ধরা সম্বন্ধে, তিনি স্বেচ্ছায় কয়েকটি আত্মকৃত শৃঙ্খল পায়ে পরিয়াছেন। তাঁহার জানা উচিত ছিল, এ দেশে তাঁহার অনুকরণকারী ভক্ত লেখকের সংখ্যা অল্প নহে।

এক্ষণে ভারতীর প্রবন্ধের অন্য একটি বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।—

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন যে, কোন কবিই সংস্কৃত ছন্দঃগুলি প্রাদেশিক ভাষায় আনিতে যাইয়া সংস্কৃত হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের নিয়ম উৎকৃষ্টভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই। সেই সম্বন্ধে বিহারী বাবু লিখিয়াছেন যে, "কবিরা সেরূপ চেষ্টা করেন নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়াই স্খলিতপদ হইয়াছেন। তাঁহারা প্রাদেশিক ভাষায় এইটুকু বিশেষত্ব প্রবেশ করাইয়াছেন যে, তাঁহারা সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বাক্ষর, পূর্ব্ব পদের হইলে, গুরু বলিয়া ধরেন নাই।"

আমরা যত দূর জানি, এবং যত দূর বুঝি, স্বর্গীয় ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সংস্কৃত হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের নিয়ম সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। যথা—অন্নদামঙ্গলে—

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে,
অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে।
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে, সতী দে, সতী দে, সতী দে।

ইহা ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে রচিত হইয়াছে। (ইহার উভয় চরণস্থ ১ম, ৪র্থ, ৭ম, ও ১০ম অক্ষর লঘু ও অবশিষ্ট সমুদায় বর্ণ গুরু হইয়া থাকে।) এখানে সংস্কৃতের অবিকল অনুকরণে আ, ঈ প্রভৃতি স্বরকে গুরু ধরা হইয়াছে, এমন কি, 'ভুজঙ্গপ্রয়াতে' শব্দের ঙ্গকেও সংস্কৃতরীত্যনুসারে গুরু ধরা হইয়াছে।

বাসবদত্তায়—

বরিন না ইহ নরে, কহি নহি ধ্বনি করে।
নৃপবরে করপুটে স্তুতি করে দ্রুত উঠে।

ইহা গজগতি ছন্দে রচিত। (এই ছন্দে ৪র্থ, ৮ম, ১২শ ও ১৬শ অক্ষর গুরু হওয়া চাই।) এখানে অবিকল সংস্কৃত রীতির অনুসারে আ ঈ প্রভৃতি স্বরকে, এবং 'ধ্বনি' শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী 'হি' অক্ষরকে গুরু ধরা হইয়াছে। সদ্ভাবশতকে—

ধন্য স্বাধীন দ্বিজ। সুখময় তব তরু কোটর!
কি সুখ-মধুপূর্ণ তব চিত্ত-সরসিজ। সুধাময় তব তিক্ত ফলনিকর!

ইহা আর্য্যা ছন্দে রচিত। (ইহার ১ম ও ৩য় চরণে ১২ মাত্রা, ২য় চরণে ১৮ মাত্রা, এবং ৪র্থ চরণে ১৫ মাত্রা থাকা নিয়ম।) এখানে সংস্কৃত গুরু লঘু নিয়ম সম্পূর্ণরূপে পালিত হইয়াছে বলিয়াই "ধন্য স্বাধীন দ্বিজ" এই চরণে বার মাত্রা হইয়াছে। সদ্ভাব-শতকে—

নম নিত্য নিরাময় বিশ্বপতে, গ্রহ তারক মণ্ডিত নীল নভঃ
নম চিন্ময় সত্য সনাতন হে। ধন ধান্য ভরা রমণীয় ধরা।

ইহা তোটকে ছন্দে রচিত। (ইহার প্রত্যেক তৃতীয় অক্ষর গুরু হইয়া থাকে।) এখানে অবিকল সংস্কৃতের অনুকরণে 'নভঃ' শব্দের ভ-কে গুরু ধরা হইয়াছে।

উপরে যে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত হইল, আশা করি, পাঠক তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, অন্ততঃ তিন জন বাঙ্গলী কবি সংস্কৃতের গুরু-লঘু-নিয়ম অব্যাহত রাখিয়া কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন; সদ্ভাবশতক-কার সময়ে সময়ে স্খলিতপদ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা ইচ্ছা করিয়া নহে, ইহা নিশ্চিত।

এই প্রসঙ্গে বিহারী বাবু আর একটি কথা তুলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালা ছন্দে যদি দীর্ঘস্বরের সমস্তই গুরু উচ্চারিত হয়, তবে অত্যন্ত শ্রুতিকটুত্ব দোষ ঘটে।" এই জন্য তিনি রবি বাবুর অবলম্বিত নিয়ম (যাহাতে কেবল ঐকার, ঔকার, অনুস্বার ও বিসর্গ, সংযুক্ত বর্ণ, এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ দীর্ঘ ধরা হইয়াছে,) অনুসরণ করাই সঙ্গত মনে করেন।

এ বিষয়েও লেখকের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। সংস্কৃত গুরু লঘু রীতি অবিকল অবলম্বন করিলে শ্রুতিকটুত্ব দোষ ঘটে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই; বরং অনেক স্থলেই শ্রুতিমধুর হয়, ইহাই আমাদের ধারণা। "[illegible]" "নম নিত্য নিরাময়" প্রভৃতি পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতাকে কেমন

করিয়া শ্রুতিকটু বলিব? "বাসবদত্তার" নিম্নলিখিত পজ্‌ঝটিকা ছন্দে রচিত পংক্তি কয়েকটি লওয়া যাক্;—

শীতল ধরণীতল জলপাতে
ছাড়িল বাদল দক্ষিণ বাতে। ইত্যাদি।

এই কবিতা এবং দ্বিজেন্দ্র বাবুর "কর্ণবিমর্দ্দনকাহিনীর"

জান না কি কদাচন মূঢ়,
কর্ণবিমর্দ্দন-মর্ম্ম কি গূঢ়,

প্রভৃতি কবিতা যদি শ্রুতিমধুর না হয়, তবে কোন্ কবিতাকে শ্রুতিমধুর বলিব, জানি না। উল্লিখিত কবিতাগুলি রবি বাবুর নিয়মে লিখিলে এই সৌন্দর্য্য থাকিত কি?

সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্র অনুসারে, যে সকল সংস্কৃত ছন্দের শেষ অক্ষর গুরু হওয়া আবশ্যক, (যেমন তোটক, গজগতি, দ্রুতগতি, ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি ছন্দঃ) সেগুলি রবি বাবুর প্রণালীতে অবিকল ভাবে বাঙ্গালায় আনাই প্রায় অসম্ভব। কারণ, প্রতি লাইনের সর্ব্বশেষ বর্ণটিকে রবি বাবুর প্রণালীতে কিরূপে গুরু করা হইবে? হয় সর্ব্বশেষ বর্ণের পরে একটি অনুস্বার, না হয় ঐকার বা ঔকার দিতে হইবে। (বিসর্গ দিলেও চলিবে না, কারণ তিনি পদের অন্তস্থিত বিসর্গযুক্ত বর্ণকে দীর্ঘ ধরেন না,) কিন্তু বাঙ্গালায় সেরূপ লক্ষণাক্রান্ত শব্দ অতি অল্পই আছে। এরূপ স্থলে সংস্কৃতের অনুক্রমে আ ঈ ঊ প্রভৃতিকে দীর্ঘ ধরিলে কবির লেখনী একটু স্বাধীন স্ফূর্ত্তির অবকাশ পায়।

তবে, বলা যাইতে পারে যে, সংস্কৃতের ছন্দোলক্ষণের বাঙ্গলায় অবিকল অনুসরণ না করিলে ক্ষতি কি? ক্ষতি আছে। অন্ততঃ তাহাতে বাঙ্গলা ভাষার অক্ষমতা প্রকাশ পায়; ছন্দের মাধুর্য্য যে আহত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

ফলতঃ যদি কোন কবি সংস্কৃত গুরু লঘু প্রণালী অক্ষত রাখিয়া কবিতা লিখিতে পারেন, তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং গৌরব আছে। বিশেষতঃ তোটক, পজ্‌ঝটিকা, মধুমতী, ভাবিনী প্রভৃতি যে সকল ছন্দঃ এত কাল বাঙ্গলা ভাষায় চলিত থাকিয়া বৈচিত্র্যসম্পাদন করিতেছে, সেগুলি সংস্কৃত গুরু লঘু প্রণালীতেই লিখিত হওয়া উচিত। রবি বাবুর নিয়মে কেবল অনুস্বার, ঐকার, ঔকার ও সংযুক্ত বর্ণের ভরসায় থাকিলে, কবিহৃদয়ের অনেক সুকুমার ভাব-

আমরা এ কথা ভুলি নাই যে, রবি বাবুর নিয়মে এক দিকে যেমন দীর্ঘ-স্বরের অভাবজনিত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, অন্য দিকে তেমনই হ্রস্ব-স্বর-প্রাচুর্য্যের সুবিধা হয়। কিন্তু সংস্কৃত নিয়মেও হ্রস্ব স্বরের অভাব হয় না;—অ ই উ ঋ, এই চারিটি স্বরবর্ণের ব্যবহার বাঙ্গলায় যথেষ্টপরিমাণে আছে।

তোটক প্রভৃতি যে সকল সংস্কৃত ছন্দে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ-স্থাপনের ব্যবস্থা আছে, সেই সব ছন্দে বাঙ্গালায় কবিতা লিখিতে হইলে, সংস্কৃত গুরু লঘু ভেদ প্রণালী অবলম্বন করাই সঙ্গত। রবি বাবুর নিয়মে লিখিতে গেলে গুরুবর্ণের অনুসন্ধানে অনেক সময়ে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে হইবে; তদুপরি সংযুক্তাক্ষরের বাহুল্যবশতঃ রচনাও শল্লকীর ন্যায় কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। * সেই জন্য আমরা এই সকল স্থলে সংস্কৃত নিয়মের পক্ষপাতী। রবি বাবু এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত তোটক ছন্দটিও বাঙ্গলায় আনিবার চেষ্টা করেন নাই; করিলে বুঝা যাইত, তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করেন। আমাদের বোধ হয়, তিনি সংস্কৃত নিয়মেরই অনুসরণ করিতেন।

নিম্নে রবি বাবুর প্রণালীতে লিখিত একটি তোটক দেওয়া যাইতেছে:—

মম সুস্থ সমস্ত এ চিত্ত নব
হবে সুন্দরি যৌতুক-দ্রব্য তব।

যদিও তোটকের লক্ষণানুসারে উভয় ছত্রেরই শেষ বর্ণ গুরু হওয়া উচিত ছিল, তথাপি তাহা রবি বাবুর প্রণালীতে অনায়াসসাধ্য নয় বলিয়া, আমরা এখানে পরিত্যাগ করিলাম।

এখন প্রাচীন প্রণালীতে লিখিত একটি তোটক দেওয়া যাক্—

মম জীবন যৌবন যার তরে
বল সে জন কেন ছি! রাগ করে।

বিহারী বাবুর প্রবন্ধের আর একটি কথার আলোচনা আবশ্যক।

তিনি লিখিয়াছেন যে, সাধারণতঃ পয়ারের কম অক্ষর হইলে রবি বাবু গুরু লঘু ভেদে কবিতা লিখিয়া থাকেন। আর, যদি যতি আট অক্ষরের কমে পড়ে, তবে পয়ারাধিকে ও পয়ারেও কখনও কখনও গুরু লঘু ভেদে লিখিয়া থাকেন।

---

* গোবিন্দ বাবুর 'যমুনা-লহরী' ও 'কত কাল পরে' প্রভৃতি ভারতসঙ্গীত কিয়ৎপরিমাণে সংস্কৃত প্রণালীতে লিখিত। তাহাতে উহাদের কেমন এক বিচিত্র সৌন্দর্য্য হইয়াছে; রবি বাবুর প্রণালীতে লিখিতে গেলে সংযুক্ত বর্ণের বাহুল্যবশতঃ সে সৌন্দর্য্য কখনই রক্ষা

কথাটা সর্ব্বাংশে ঠিক্ নহে। যতি আট অক্ষরে পড়া সত্ত্বেও তিনি ইচ্ছা-মত কখন বা পয়ার গুরু লঘু ভেদে লিখিয়াছেন, কখন বা লেখেন নাই। একটি উদাহরণ দিতেছি।

মানসীর 'নিষ্ফল উপহার' শীর্ষক কবিতাটিতে যতি আট অক্ষরে পড়িয়াছে, ছন্দটিও নিতান্ত পয়ার, অথচ উহা গুরু লঘু ভেদে লিখিত হইয়াছে। যথা :—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল,
উর্দ্ধে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর তাহে পশি জলধার,
ছল ছল করতালি দেয় অনিবার।

মানসী, ১৫৩ পৃঃ।

বিহারী বাবুর কথানুসারে রবি বাবু তখনই পয়ারে গুরুলঘু ভেদ মানিয়া চলেন, যখন যতি আট অক্ষরের কমে পড়ে। এখানে বিহারী বাবুর কথা খাটিল কৈ ? *

কবি ইচ্ছা করিলে এখানেও গুরু লঘু ভেদ না মানিয়া লিখিতে পারিতেন।

নিম্নের কবিতার প্রথমাংশে পয়ারের অপেক্ষা অক্ষর কম আছে, যতিও আট আট অক্ষরের কমেই পড়িয়াছে ; অথচ এখানে কবি গুরু লঘু ভেদ পালন করেন নাই :—

কেন আন বসন্তনিশীথে
আঁখি ভরা আবেশ বিহ্বল ;
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল ?

মানসী, ৬৫ পৃঃ।

---

* বিহারী বাবু স্বীয় মতের সমর্থনের জন্য গুরু লঘু ভেদে লিখিত পয়ারের উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, (উহাতে বাস্তবিক আট অক্ষরের আগেই যতি পড়িয়াছে, সুতরাং উহা তাঁহার মত প্রতিপন্ন করিতেছে,)

অঙ্গে অঙ্গে বাঁধিছ রঙ্গ পাশে
বাহুতে জড়িত ললিত লতা।

আমাদের মতে এটিকে পয়ার বলা যায় না। ইহাতে যে চৌদ্দ অক্ষর আছে, তাহা না গণিয়া, শুধু পড়িয়া, বুঝিতে পারি নাই। যদি চৌদ্দ অক্ষর হইলেই পয়ার হয়, তবে কি বিহারী বাবু নীচের লাইন কয়টিকেও পয়ার বলিবেন ?—

পাখীরা সব গাছে গান আপন মনে,
বালিকা বধূ ঘাটে যায় শাশুড়ীর সনে !

অথবা—

কেঁদ না, প্রাণ, তব হইবে না রাঁধিতে,

তিনি ইচ্ছা করিলেই কবিতাটিকে গুরু লঘু ভেদ প্রণালীতেও আনিতে পারিতেন।

নিম্নের কবিতারও প্রথম দুই ছত্রের পয়ারের অপেক্ষা অল্প অক্ষর আছে, যতিও আট অক্ষরের আগে পড়িয়াছে, অথচ তিনি গুরু লঘু ভেদ মানেন নাই; কারণ মানিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। কবি এরূপ স্থলে, কখনও মানেন, কখনও বা মানেন না।

সেই গানে সেই ফুল্ল ফুলে, ভেবেছিনু এ হৃদয় অনন্ত অমৃতময়
সেই প্রাতে প্রথম যৌবনে; প্রেম চিরদিন রয় এ চির জীবনে
মানসী, ৭০ পৃঃ।

কবি ইচ্ছা করিলেই ইহাকে গুরু লঘু ভেদ প্রণালীতে লিখিতে পারিতেন, তাহাতে ছন্দোমাধুর্য্য নষ্ট হইত না।

মানসীর "কবির প্রতি নিবেদন" শীর্ষক কবিতাটি ঠিক এইরূপ ছন্দেই রচিত, অথচ কবি সেখানে আপনা হইতেই গুরু লঘু ভেদ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন।

বিহারী বাবু লিখিয়াছেন, "আট অক্ষর চরণ বিশিষ্ট দীর্ঘ ত্রিপদী কি চৌপদীতে কবিবর কেবল অক্ষর গণনা করিয়াই প্রায় লেখেন।" অতঃপর তিনি আপনার কথা প্রমাণিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

আজি বর্ষা গাঢ়তম নিবিড় কুন্তল সম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটী তীরে। ইত্যাদি।

আমরা তাঁহার কথার খণ্ডনের জন্য নিম্নলিখিত কয় ছত্র উদ্ধৃত করিতে পারি কি না?

শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য-নদীর তীরে রহিনু পড়ি'। সোনার তরী, ৩ পৃঃ।

স্থূল কথা এই যে, কবি কোন স্থলে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদে কবিতা লেখেন, এবং কখন লেখেন না, তাহা আলোচনা করিবার এখনও সময় আসে নাই। তিনি সবে সে দিন এই নূতন প্রণালীতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কালে যে তিনি প্রায় সকল রকম কবিতায় এই প্রণালীর প্রবর্ত্তন না করিবেন, তাহার নিশ্চয়তা কি? * মনে করুন, এখন পর্য্যন্ত তিনি

---

* রবি বাবু যে যে স্থলে এই নূতন প্রণালীতে কবিতা লিখিয়াছেন, বিহারী বাবু তাহার আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন, "বোধ করি প্রাদেশিক ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদে কবিতা রচনার ইহাই সাধারণ ও সর্ব্ব নিয়ম।"

নিম্নলিখিত ধরণের কবিতায় গুরু লঘু প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন নাই; কালে যে না করিবেন, সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আছে। কারণ কবিতাগুলি নিতান্ত শ্রুতিকটু হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

(ক) প্রতি লাইনে পনর অক্ষর, যতি আট অক্ষরে:—

শত শত চন্দ্রমা কৌমুদী ঢালিছে,
অপ্সরা রাশি রাশি নিশিদিন খেলিছে।

(খ) প্রতি লাইনে ১৬ অক্ষর, যতি ৮ অক্ষরে:—

অবিরত অন্তরে জাগে সখা কত কথা,
জানিতে না দেই তোমা মর্ম্মে পাইবে ব্যথা।

(গ) প্রতি লাইনে ১৭ অক্ষর, যতি ৮ অক্ষরে:—

মাসান্তে একখানি চায় চিঠি তব দুখিনী,
ভাবিয়ে পোহাই আমি বিনিদ্র মধু যামিনী।

(ঘ) প্রতি লাইনে ১৮ অক্ষর, যতি ৮ অক্ষরে:—

দক্ষিণ সমীরণ তাহে গাছে চিক্কণ পাতা,
সুষুপ্ত সাধগুলি একে একে জেগে তুলে মাথা।

এখন একটি প্রশ্ন:—কোনও কবিতা পড়িতে আরম্ভ করিবার-পূর্ব্বে উহা গুরু লঘু ভেদ প্রণালীতে লিখিত কি না, তাহা জানিবার ও জানিয়া পাঠকের প্রস্তুত হইবার, কোনও উপায় আছে কি? উত্তর:—নাই। কবিতাটি পড়িতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে পাঠক জানিতে পারিবেন যে, উহা কোন্ প্রণালীতে লিখিত। সোনার তরীর 'সোনার তরী' শীর্ষক প্রহেলিকাগর্ভ প্রথম কবিতাটির প্রথম দুই পৃষ্ঠা পড়িয়া বুঝিবার যো নাই যে, উহা কবি গুরু লঘু প্রণালীতে লিখিয়াছেন; কিন্তু তৃতীয় পৃষ্ঠায় আসিয়া তাহা জানিতে পারা যায়। মানসীর নীচের কবিতাটি লওয়া যাক্:—

প্রভাতের আলোকের সনে বহিয়া নূতন প্রাণ ঝরিয়া পড়ে না গান
অনাবৃত প্রভাত গগনে, ঊর্দ্ধ নয়ন এ ভুবনে।

এই শ্লোকটি পড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে রঙ্গলালের "একতায় হিন্দু-রাজগণ" প্রমুখ কবিতাটির ছন্দের কথা মনে পড়ে; কিন্তু ৪র্থ লাইনে আসিয়া

---

* বলা বাহুল্য, এরূপ মন্তব্যপ্রকাশের সময় এখনও অনেক দূরে। কারণ, যাঁহাকে এই নব-প্রথার প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে, তিনিই এখনও এই প্রথার সীমা পরিসর সম্যক নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

জানা যায় যে, উভয় কবিতার প্রণালীতে পার্থক্য আছে; রঙ্গ বাবুর কবিতায় গুরু লঘু ভেদ নাই, ইহাতে তাহা আছে।

ফলতঃ কবিতা গুরু লঘু ভেদে লিখিত কি না, পড়িতে পড়িতে তাহা ক্রমে বুঝা যায়। যতি স্থান বা কবিতার অক্ষর। এমন কি, কোন কবিতার কিয়দংশ নূতন ও অপরাংশ পুরাতন প্রণালীতে লিখিত হইলেও, নিপুণ পাঠকের পক্ষে পড়া অনায়াস-সাধ্য হইয়া থাকে। যথা সোনার তরীর ৯ পৃষ্ঠায়—

দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধ্যে বেলা
শৈশবে কত গল্প কত বাল্য খেলা।

এখানে হঠাৎ "শৈশবে" শব্দটির ঐকার গুরু ধরা হইয়াছে। এইরূপ ঐ পুস্তকের "সুপ্তোত্থিতা" নামক কবিতার "কে পরালে মালা" এই চরণটির "কে" শব্দটিকে গুরু (অর্থাৎ দুই বর্ণের সমান) ধরা হইয়াছে; অথচ রবি বাবু অন্য কোথাও একারকে গুরু বলিয়া ধরেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া অভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এ সব কবিতা পড়া কষ্টকর হইবে, এমন বলিতে পারি না।

তবে দুই এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না। নীচের কবিতাটি কবিবর দীনবন্ধু মিত্রের "রাত পোহাল, ফরসা হল, ফুটলো কত ফুল" ইত্যাদি কবিতার মত নাচুনী ছন্দে লিখিত মনে করিয়া হয় ত পাঠক পড়িতে আরম্ভ করিবেন; কিন্তু তৃতীয় চরণে আসিয়া তাঁহাকে অপ্রস্তুত হইতে হইবে; এবং দুই চরণ উজাইয়া গিয়া আবার নূতন করিয়া গুরু লঘু মানিয়া পড়িতে হইবে :—

সন্ধ্যা-পবন কুঞ্জভবন
নির্জ্জন নদীতীর,
আর চাহি শুধু বুক ভরা মধু
ভালবাসা প্রেয়সীর।

এইরূপ উজাইয়া যাওয়া বাঙ্গালা কবিতায় নূতন নহে; নীচের কবিতাটি তাহার প্রমাণ।—

কড়্ কড়্ সড়্ সড়্ বহিছে ঝড়,
পড়ে ঘর কোঠা বাড়ী গাছ বড় বড়।

এই প্রবন্ধে অনেক স্থলে 'গুরু লঘু ভেদে লিখিত', 'গুরু লঘু ভেদ প্রণালীতে লিখিত' এইরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা ইচ্ছা করিলে, উহার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত অল্পাক্ষরে গ্রথিত সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে ব্যবহৃত 'মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লিখিত', এইরূপ ভাষার ব্যবহার করিতে পারিতাম। ফলতঃ, যেখানে গুরু লঘু বিচার করিয়া মাত্রা হিসাবে লেখা হয়, তাহাকে জাতিচ্ছন্দঃ,

মাত্রাবৃত্তি বা মাত্রাবৃত্তচ্ছন্দঃ বলা যায়; যেখানে কেবল অক্ষর গণিয়া লেখা হয়, তাহাকে বর্ণবৃত্তচ্ছন্দঃ, অক্ষরবৃত্তি, বা শুধু 'বৃত্ত' বলা হয়।

"পদ্যং চতুষ্পদং তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ॥"

এই প্রবন্ধের শেষাংশে সংক্ষেপের জন্য 'গুরু-লঘু ভেদে' না লিখিয়া 'নূতন নিয়মে' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং 'বর্ণবৃত্ত ছন্দের পরিবর্তে 'পুরাতন নিয়ম' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। পাঠক, এ সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

জীবন-চরিত।

জন রিচার্ড গ্রীন।

কর্ন্‌হিল্‌ ম্যাগাজিন নামক পত্রে মিসেস্ ক্রেটন "ইংরাজ জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের" প্রণেতা মিঃ গ্রীনের সম্বন্ধীয় বিবিধ মনোরম কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার কথোপকথন সম্বন্ধে লেখিকা বলেন যে, "সে সময়ে তাঁহাকে আপনার আলোচ্য বিষয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়া বোধ হইত।" এমন কি, অনেক অশিক্ষিত ও মূর্খ ব্যক্তিও ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার উদ্দীপনার অংশগ্রহণে বাধ্য হইত। তাঁহার উৎসাহ অপর ব্যক্তিগণকে অনুপ্রাণিত করিত। আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃত পরীক্ষার জন্য পুস্তকসমূহ আলমারি হইতে বার বার বাহির করা হইত, এবং পুনরায় যথাস্থানে রক্ষিত হইত। আমোদ-প্রমোদের স্রোত যেন বৈদ্যুতিক প্রবাহে বহিতে থাকিত। লেখিকা লিখিয়াছেন, তিনি সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অসম্বদ্ধ ঘটনাতেও সবিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন। তিনি যেরূপ আত্মসংযত ও স্বীয় বিদ্যাপ্রকাশে যত্নশীল ছিলেন, তাহাতে অসৎকর্ম্মের তীব্র প্রতিবাদ তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না; কিন্তু তথাপি সময়ে সময়ে তিনি ক্রূদৃষ্টিতে অসৎকর্ম্মের তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতি তাঁহার নিরতিশয় ঘৃণা ছিল।

লেখিকা বলেন যে, ঐতিহাসিক মহোদয় তাঁহার পরিচিত বালিকাগণের সহিত বেশ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিতেন। তিনি বলেন, 'আমি যখন নিতান্তই বালিকা, সেই সময় প্রথম তাঁহার সহিত পরিচিত হই। আমার অধ্যয়নাদি সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহ কখন মন্দীভূত হয় নাই। তিনি বলিতেন, 'তুমি যাহা কিছু লিখিয়াছ, তাহা পুনরায় পড়িও, এবং যে সমস্ত স্থান মনোরম হইয়াছে বোধ হইবে, তাহা কাটিয়া ফেলিও।' এই কঠোর উপদেশ আমি কখনও বিস্মৃত হই নাই। আমরা ভাবিতাম, তাঁহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বুঝি কখনও শেষ হইবে না। তিনি উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে প্রায়ই কথোপকথন করিতেন। কিন্তু তিনি অধিকাংশ

সময়েই পুনর্ব্বার ভাল করিয়া লিখিবার জন্তই লিখিতেন, এইরূপ বোধ হয়। অবশেষে এক দিন প্রথম অধ্যায় মুদ্রিত হইল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া আমাকে উহা শুনাইলেন। যদিও আমি তখন সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকামাত্র, তথাপি বিশেষ মনোযোগের সহিত আমার মন্তব্য ও সমালোচনা শ্রবণ করিলেন। অপরাপর ব্যক্তিগণের মতানুসারে ঐ অধ্যায় পুনঃপুনঃ সংশোধিত ও একাধিকবার পুনর্লিখিত হইয়াছিল, তথাপি আমার মতামতের কথা বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন।

আমার বেশ মনে পড়ে, এক দিন গ্রীষ্মকালে অপরাহ্নসময়ে তিনি আলমারি হইতে স্পেনসারের একখানা পুস্তক গ্রহণ করিয়া উদ্যানে যাইবার দ্বারপথের একটা সোপানে বসিয়া আমাকে উচ্চকণ্ঠে পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। উত্তেজনায় তাঁহার নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছিল।

মিসেস্ ক্রেটন তাঁহাকে কখনও ধর্ম্মপ্রচার করিতে শুনেন নাই। তিনি তাঁহার বক্তৃতাসমূহে স্পষ্টতঃ কার্য্যকর বিষয়ের উপদেশ দিতেন। লেখিকা বলেন, তিনি একবার তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে বিবিধ বিষয়ের মধ্যে চুল আঁচড়াইবার ব্রস ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন।

ফ্রীম্যান ও গ্রীনের ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতার বিষয়ে মিসেস্ ক্রেটন লিখিয়াছেন,—"যখন মিঃ গ্রীনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধুগণ বিশেষ চিন্তিত ছিলেন, সেই সময়ে অক্স্ফোর্ডে মিঃ ফ্রীম্যানের সহিত এক দিন আমি একত্র ভোজন করিয়াছিলাম, তাহা আমার বেশ মনে আছে। ভোজনের সময় মিঃ ফ্রীম্যান শুনিলেন যে, মিঃ গ্রীন য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন ও পথের অপর পার্শ্বে এক বন্ধুর সহিত বাস করিবেন, স্থির করিয়াছেন। অতিকষ্টে তিনি ভোজসমাপ্তি অবধি অপেক্ষা করিয়াছিলেন; তাহার পর তাঁহার বন্ধুকে অভিবাদন করিবার জন্ত দ্রুতপদে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। মিঃ গ্রীনের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কাহারও সহিত কোন কথা কহেন নাই, কেবল অগ্নিকুণ্ডের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া আপনার দীর্ঘশ্মশ্রু আন্দোলন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, 'জনি কি সুন্দর!' অবশ্য তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে, তাঁহার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই 'জনি' কে, তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না।

বিজ্ঞান।

নূতন সৌর-জগতের আবির্ভাব।

গত বৎসর আমরা একটি নূতন সৌরমণ্ডলের গঠনারম্ভ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি,—বস্তুতঃ একটি নূতন সৌর-জগতের গঠনারম্ভ ও জন্ম হইয়াছে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা এক্ষণে একটি নূতন জগতের জন্ম পর্য্যবেক্ষণ ও প্রতিকৃতি (photo) গ্রহণ করিয়াছি।

এই আশ্চর্য্য ঘটনা পারসিউস (perseus) নামক রাশিতে লক্ষিত হইতেছে। আকাশের অপরাপর স্থানের ন্যায় ঐ স্থানের প্রতিকৃতিও প্রায় গৃহীত হইত। এই সকল

প্রতিকৃতিতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র তারকা ইতস্ততঃ-প্রক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু যে স্থানে এই নূতন তারকাটি সহসা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে, সেই স্থানে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দৃষ্টিগোচর হইত না।

১৯০১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী শেষ প্রতিকৃতি গৃহীত হয়। ২১শে তারিখের রাত্রিতে জনৈক জ্যোতিষী পারসিউস নামক নক্ষত্রপুঞ্জে একটি উজ্জ্বল নূতন নক্ষত্র দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

জ্যোতিষিগণ তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বকৃত প্রতিকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, যেখানে এই বিস্ময়কর নূতন নক্ষত্র দেদীপ্যমান, দুই দিবস পূর্ব্বে সেই স্থানে একটি সামান্য বিন্দুও ছিল না!

সহসা এরূপ হইবার কারণ কি? যে স্থানে পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, তথায় উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগণের অন্যতরের এই আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ কি হইতে পারে? প্রথমে যে ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এই;—শূন্যগর্ভে দুইটি সুবৃহৎ পদার্থের সংঘর্ষে এই নূতন দৃশ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত দুই বৃহৎ পদার্থ এত দিন অদৃশ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে পরস্পরের সংঘর্ষে সহসা উভয়েই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।

[illegible] কোন জাতীয়? [illegible] বিগতজীবন, ব্যয়িতশক্তি নির্ব্বাপিতাগ্নি দুইটি সূর্য্যই হইবে। লক্ষ লক্ষ বৎসর [illegible] জ্যোতির্বিকীরণ [illegible] হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি উহারা শীতল ও তমোময় হইলেও, উহাদের পূর্ব্বতন গতি সমানই ছিল। অবশেষে শূন্যমার্গে প্রবলবেগে ধাবিত হইতে হইতে উহারা ভয়ানক বেগে পরস্পরের উপর পতিত হয়, এবং সেই প্রতিঘাতে তাহাদের নিরুদ্ধ গতি উত্তাপে পরিণত হইলে, উহারা গলিত হইয়া অগ্নিময় উত্তপ্ত বাষ্পে পরিণত হয়। এইরূপে পূর্ব্বে যে স্থান শূন্য ছিল, সেই স্থানে দেদীপ্যমান নূতন তারকার রূপে তাহারা বহুদূরস্থ পর্য্যবেক্ষণকারীর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল।

দুইটি গতজীবন তারকার সংঘর্ষে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, এই মতের পরিবর্ত্তে বিভিন্ন মতের উৎপত্তি হইল। এই নূতন মতে, দুইটি পদার্থের অন্যতরটি নির্ব্বাপিত সূর্য্য নহে; পরন্তু [illegible] সুবৃহৎ শীতল উল্কার সমষ্টি বা বহুবিস্তৃত অদৃষ্টপূর্ব্ব বাষ্পীয় পদার্থ, অথবা খুব সম্ভবতঃ নীহারিকা (Nebula) হইবে। কোনও গতদাহন সূর্য্য সম্ভবতঃ ভীষণবেগে উক্ত উল্কা, বাষ্প, বা নীহারিকা ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়া থাকিবে, এবং সেই সংঘর্ষে নীহারিকায় উত্তাপের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

এই শেষোক্ত মত নূতন তারকার অনেক ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত মনোরম ব্যাখ্যা হয় বলিয়া, এই মত পূর্ব্বোক্ত মতের স্থান অধিকার করিয়াছে।

গণনা দ্বারা ইহা বেশ জানা যায় যে, নক্ষত্রসমূহের গতি এরূপ বেগশীল যে, যদ্যপি উক্ত গতি সহসা প্রতিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রতিরোধী পদার্থপুঞ্জকে নীহারিকায় পরিণত করিবার মত অগ্নি উৎপন্ন হইতে পারে।

এইরূপে যখন পারসিউস নামক রাশিতে নূতন তারকার সৃষ্টিকারী নির্ব্বাপিত সূর্য্য বহুবিস্তৃত উল্কা-পুঞ্জে বা নীহারিকার উপর প্রতি সেকেণ্ডে শত শত মাইল গতিশীল বেগে পতিত হয়, সেই সময় প্রতিরোধী পদার্থপুঞ্জের আঘাতে উহার গতির কিয়দংশ বাধা প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিতে পরিণত হয়। উক্ত অগ্নির তেজ এত অত্যধিক হইয়াছিল যে, প্রাগুক্ত

নির্ব্বাপিত সূর্য্য প্রজ্বলিত ও সম্ভবতঃ উহার কিয়দংশ বিগলিত ও বাষ্পে পরিণত হয়। ঠিক এই সময়েই উল্কা ও নীহারিকায় অগ্নিসংযোগ হয়, এবং সেই অগ্নির ভয়াবহ শিখাসমূহ, এই সমস্ত অনর্থের কারণীভূত সেই সূর্য্যের সমীপ হইতে, প্রস্তরপাতে উদ্ভূত জলরাশির বৃত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয় ও সমস্ত পদার্থপুঞ্জকে অগ্নিময় করিয়া তুলে। এই অগ্ন্যুৎপাতের প্রাথমিক অবস্থায় নূতন তারকাটি উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎপরে আর যে যে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

এক্ষণে আমরা এই ব্যাপারের দ্বিতীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। এই সময়ে যে সকল অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহাই একটি নূতন সৌর-জগৎ-গঠনের প্রথম সূত্রপাত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

নূতন তারকাটি কয়েক সপ্তাহ অসামান্য উজ্জ্বলতার সহিত প্রকাশমান হইয়া অতি শীঘ্র হীনপ্রভ হইতে লাগিল। কয়েক মাসের মধ্যেই ইহা স্থূল চক্ষুর দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু ইহার তেজোহ্রাসের সমসময়ে আর একটি নূতন ঘটনার আরম্ভ হইয়াছিল। তারকাটির পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ একটি নীহারিকা দৃষ্ট হইয়াছিল।

স্পেকট্রস্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যেই এই পরিবর্ত্তনের প্রথম সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। এই যন্ত্রে তারকার পরিচায়ক রেখা (Line) সমূহ অপসৃত ও নীহারিকার পরিচায়ক রেখাসমূহ পরিস্ফুট হইতেছিল।

এই ব্যাপার ব্যাখ্যার অতীত নহে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, পূর্ব্বোক্ত সংঘর্ষের ফলে প্রতিরোধী পদার্থপুঞ্জের অন্ততঃ কিয়দংশ অতিরিক্ত উত্তাপে বাষ্পে পরিণত হয়। নীহারিকার বাষ্পরাশি ভিন্ন আর কি ?

কিন্তু সহসা নভেম্বর মাসে দৃষ্ট হইল যে, উক্ত নীহারিকা অতীব বিস্ময়কর আকৃতি গ্রহণ করিয়াছে। জমাট বাঁধিয়া কঠিন গ্রহাদিতে বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদের এই সৌরজগতের আকৃতি যেরূপ ছিল, এই নূতন নীহারিকাও অবিকল সেইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে!

যেরূপ পদার্থ হইতে আমাদের সূর্য্য গঠিত হইয়াছে, উক্ত নীহারিকার মধ্যস্থলে সেইরূপ উজ্জ্বল অপেক্ষাকৃত কঠিন পদার্থ দৃষ্ট হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকে আংশিক-গঠিত গোলাকার অনেক পদার্থ আছে। যে সমস্ত গোলাকৃতি পদার্থ হইতে পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সহিত এই সমস্ত নূতন পদার্থের সৌসাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক।

আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কতকগুলি গোলাকৃতি পদার্থ কঠিন হইতেছে, কতকগুলিতে বা সামান্য ঔজ্জ্বল্যও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সম্ভবতঃ যে সকল গোলাকৃতি পদার্থে ঐরূপ ঔজ্জ্বল্য দেখা যাইতেছে, উহারা পুনরায় বিভক্ত ও বিভিন্ন গোলাকৃতি পদার্থে পরিণত হইবে। লাপ্লাসের (Laplaes) মতে, আমাদের সৌরজগতের গঠনও ঠিক এই রূপেই হইয়াছিল।

কিন্তু আরও একটি বিস্ময়াবহ ব্যাপার ঘটিয়াছে। তাহার তুলনায় পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারগুলি কিছুই নহে।

১১ই নভেম্বর তারিখে প্রচারিত হইল যে, পারসিউস রাশির অন্তর্গত নূতন নীহারিকা গতিশীল হইয়াছে, এবং উহার গতি সত্যসত্যই পরিমিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে সকল উজ্জ্বল কঠিন পদার্থের কথা বলা হইয়াছে, পুনরায় তাহাদের প্রতিকৃতি-গ্রহণের সময় দেখা গেল যে, তাহারা স্থানপরিবর্ত্তন করিয়াছে! জ্যোতিষীরা সেই গতির পরিমাণ স্থির করিয়া অবধারণ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ পৃথিবী হইতে নূতন নীহারিকার দূরত্ব শত শত অর্ব্বুদ মাইল। আর সম্ভবতঃ সেই নীহারিকার গতি এক সেকেণ্ডে ৭৮০০০ আটাত্তর হাজার মাইল।

ইহা একবারেই আমাদের ধারণার অতীত। যত গতি এ পর্য্যন্ত পরিমিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সেকেণ্ডে ২০০ মাইলই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যদি এই নক্ষত্রের ব্যবধান পূর্ব্বোক্তের দশমাংশও ধরা যায়, তাহা হইলেও সেকেণ্ডে সহস্র সহস্র মাইল হয়।

বস্তুতঃ এই বিস্ময়কর নীহারিকার উজ্জ্বল বাষ্পসম্ভার যেরূপ বেগে ধাবিত হইতেছে, তাহা কেবল আলোকের গতির সহিতই তুলিত হইতে পারে। কারণ, কেবল আলোকের গতিই সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। আমাদের নীহারিকার ব্যবধান যদি সহস্র অর্ব্বুদ মাইলও হয়, তাহা হইলে, আলোকের গতি উহার গতির দ্বিগুণ অপেক্ষা সামান্য অধিক।

চিত্রশালা।

দেবতার আশীর্ব্বাদ।

আধুনিক জর্ম্মাণ সুকুমার শিল্পের ইতিহাসে হার্ম্মাণ কল্‌ব্যাকের স্থান অতি উচ্চে। লিপিকুশল পিতার পুত্র অনুরূপ ললিত কলার সাধনায় সিদ্ধিলাভের যে অবসর পায়, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু কল্‌ব্যাকের এ সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। হার্ম্মাণের পিতা উইলিয়ম কল্‌ব্যাকও এক জন প্রসিদ্ধ চিত্রকর ও জর্ম্মানীর একটি প্রধান শিল্পকেন্দ্র মুনিকের বরপুত্র ছিলেন। হার্ম্মাণ প্রধানতঃ তাঁহার পিতারই ছাত্র। পিলেটির কাছেও তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে রোম ও ভিয়ানায় শিক্ষার্থ গিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ভিয়ানায় মেডেল পান। বর্ত্তমান কালে স্বদেশী চিত্রকরগণের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন।

হার্ম্মাণ কল্‌ব্যাকের অব্যর্থ তুলিকার স্পর্শে বিশ্বের সৌন্দর্য্য বিবিধ আকারে ও বিচিত্র মহিমায় পরিব্যক্ত শিল্পচাতুর্য্যে যে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহার বিকাশস্বরূপ তৎপ্রণীত বহু চিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু তন্মধ্যে চিকাগো প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত "কথক" বিশেষ প্রসিদ্ধ। আর একখানি উল্লেখযোগ্য আলেখ্য "হ্যাম্‌লিনের বংশীবাদক"। রবার্ট ব্রাউনিংয়ের কৌতুকময়ী কবিতায় এই চিত্রের সুন্দর ইতিহাস আছে।

"দেবতার আশীর্ব্বাদ" কলব্যাকের আর একখানি বিখ্যাত চিত্র। শিশুর আগমন কল্পনাটিকে কি সুন্দর মধুর স্বাভাবিক অথচ অভিনব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া অমর শিল্পী মূক সৌন্দর্য্যকে ভাবের রহস্যময়ী প্রভায় বিশ্ববিমোহিনী করিয়া তুলিয়াছেন। এ সৌন্দর্য্য, এ শরীরিণী কল্পনা অনুপমেয়।



দেবতার আশীর্ব্বাদ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। ফাল্গুন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের "দেবদর্শন" একটি চলনসই কবিতা। লেখকের ভাষা ও রচনাপ্রণালী আশাপ্রদ; তাই এক বিষয়ে তাঁহাকে সাবধান হইতে বলি। "কাঙ্গাল স্মৃতি" প্রভৃতি অপরূপ ও উদ্ভট বাক্যবিন্যাসের দৌরাত্ম্য বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জে আজ কাল অত্যন্ত প্রবল। বাঙ্গালা ভাষার 'ধাতু'র সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া বিদেশী বিশেষণের আমদানী করিলে পাদপূরণ চলিতে পারে, কিন্তু তাহা কখনও ভাষায় 'খাপ' খাইবে না। "কাঙ্গাল' বাঙ্গালা বটে, এবং তাহা বাঙ্গালীর অন্বর্থ বিশেষণ, সে বিষয়েও বোধ করি মতান্তর নাই। কিন্তু 'কাঙ্গাল স্মৃতি' যে 'বিড়ালনয়না'র দেশবাসিনী, 'হরিণলোচনা'র অন্তরবাসিনী নহে, আশা করি, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। এরূপ বিদেশী আভরণে ভাষার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয় না, বরং সম্ভ্রমই নষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "সচ্চরিত্র" নামক গল্পটির আমরা রসগ্রহ করিতে পারিলাম না। প্রভাত বাবুর প্রভাব "সচ্চরিত্রে" একবারে প্রতিফলিত হয় নাই। তা, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কখনও সমান হয় না। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত "ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যায়" আলোচনা করিতেছেন। কংগ্রেস-সাহিত্যের পুনরাবৃত্তি। বাঙ্গালা মাসিকে এই সকল প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া দত্ত মহাশয় বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "মালিক মহম্মদের পদ্মাবত এবং আলোয়াল-কৃত অনুবাদ" নামক প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য। লেখক উভয় কবির তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, "আলোয়ালের প্রতিভা মালিক মহম্মদের প্রতিভার অনেকটা অনুরূপ,—মূল হইতে অনুবাদ কবিত্বের হিসাবে ন্যূন নহে। উভয় কাব্যেই প্রকৃত কাব্যোচিত আদর্শ চরিত্রের অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মূল্যবান সুচিন্তিত ভাব এবং কবিত্বপূর্ণ বর্ণনার মুক্ত পরিবেশন দ্রষ্টব্য। কবিদ্বয় যে স্বাভাবিক শক্তিশালী, তাহার নিদর্শন প্রতি পত্রেই আছে। প্রতি পত্রেই দু একটি উজ্জ্বল উপমা, অল্প কথায় অভিব্যক্ত সুন্দর কোন বর্ণনা কবিদ্বয়ের মনস্বিতার পরিচয় প্রদান করিবে। মালিক মহম্মদের রচনায় ধর্ম্মের কথা অধিকতর স্ফুট, আলোয়ালের রচনায় শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রচুর নিদর্শন এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির পরিচয় সমধিক। আলোয়াল পাণ্ডিত্য হিসাবে মালিক মহম্মদ হইতে শ্রেষ্ঠ। * * * মূল কাব্যের প্রত্যেক স্থানেই ঈশ্বরের অপার করুণার প্রতি ইঙ্গিত আছে, তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সুন্দরীগণের রূপবর্ণনা ও বিরহগীতি পড়িতে পড়িতে আমরা কবির সঙ্গে এক উন্নততর রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হই, সে স্থলে এই প্রণয়কাহিনী একটি অপূর্ব্ব ধর্ম্মকাহিনীর রূপকের স্থান গ্রহণ করে। প্রকৃত কথা বলিতে মালিক মহম্মদ চিরবাগ্মী,—পাষাণের মধ্যে ক্ষুদ্র কীটকেও তিনি ভুলেন নাই।" এই প্রবন্ধে দীনেশ বাবু খোকার মত আধ-আধ ও অস্পষ্ট ভাষায় দিব্য ভাবুকতা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ ভারতী "ভারতের ভাবী দশা"র অনুসন্ধানে নিতান্ত ব্যগ্র। তাঁহার ধিক্কার, নিরাশা, স্বজাতির প্রতি রোষ দেখিয়া আমাদের দশা এখনই অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং "ভাবী দশা"র ভাবনা আপাততঃ অনেক পাঠক 'শিকায়' তুলিয়া রাখিবেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর রচিত ও সাহিত্য পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে

পঠিত "ব্যাকরণ ও বাঙ্গলা ভাষা" নামক নিবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও চিন্তাশীলতা প্রশংসনীয়। রচনাটি রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ। এই ঘোরতর তর্কযুদ্ধের ফলাফল বা জয় পরাজয় চক্ষুষ্মান পণ্ডিতগণের বিচারসাপেক্ষ। আমরা সে বিষয়ে বাক্যব্যয় করিব না। কিন্তু এক বিষয়ে পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী তাঁহার প্রতিপক্ষকে অবলীলায় পরাজিত করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু পরিষদের অধিবেশনে শাস্ত্রী মহাশয়কে পদে পদে বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত ও অবজ্ঞার শেলে অত্যন্ত আহত করিয়া প্রগল্‌ভ-সম্প্রদায়ের প্রীতিবর্দ্ধন ও আত্মমর্য্যাদার অপচয় করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধের যে 'মার্জ্জিত' 'সংস্কৃত' ও 'ছাঁটিত' সংস্করণ পরে "বঙ্গদর্শনে" মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও প্রগল্‌ভতার অভাব নাই। শাস্ত্রী মহাশয় যে 'ঢিলে'র পালটা 'পাটকেল' লইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই, ইহা আমরা সাহিত্যের সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। এই সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিনয়ে ও শীলতায় তিনি সম্পূর্ণ জয়ী, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। রবীন্দ্র বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী প্রবীণ লেখকও যে ক্ষেত্রে "মোটা লাঠী" চালাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই, সে ক্ষেত্রে এই সংযম ও শিষ্টতার পরিচয় দিয়া শাস্ত্রী মহাশয় যে অনুকরণ-যোগ্য আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন, আশা করি, আমরা সকলে তাহার অনুসরণ করিতে শিখিব। তর্কের উদ্দেশ্য সত্যের সন্ধান,—শাণিত ভাষার সাহায্যে প্রতিপক্ষকে ধিক্কৃত ও লাঞ্ছিত করিলে সে উদ্দেশ্য আদৌ সিদ্ধ হয় না।—যে তর্কে প্রতিহিংসাবৃত্তি সত্যানুসন্ধানের সম্ভাবনাকে গ্রাস করিয়া ফেলে, সেরূপ তর্ক—যদি তাহাকে আদৌ তর্ক বলা যায়—মৎস্য-হট্টে অনায়াসে বিরাজ করিতে পারে, কিন্তু কোনও 'পরিষদে' বা সাহিত্যের পুণ্যক্ষেত্রে তাহার স্থান নাই। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন "চতুর্দ্দশ ভুবন" প্রবন্ধে পৌরাণিক সপ্ত পাতাল ও সপ্ত দেবলোকের সংস্থাননির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রবন্ধে বহু অধ্যয়ন ও গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্তও সম্পূর্ণ অভিনব। কিন্তু স্বীকৃত ও গৃহীত হইবে কি না, বলা যায় না। তাঁহার মতে, (১) "ভূলোক ও ভারতবর্ষ এক," (২) "ভারতের পশ্চিম দিকে অপগস্থান পারস্য ও বাহ্লিক-সনাথ স্বাধীন তাতার ভুবর্লোকের অন্তর্গত," ইত্যাদি। চতুর্দ্দশ ভুবনের প্রচলিত ব্যাখ্যা ও বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আবিষ্কৃত সিদ্ধান্তের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ ও অধিকারী, তাঁহারা ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা অনেক শিখিতে পারিব।